শ্রীচৈতন্যদর্শনে
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর
Srimad Bhagavat

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্যদর্শনে

# প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর


তৎপ্রেষ্ঠ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ

(শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রাক্তন সভাপতি ও আচার্য্য)

সংকলিত


**মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ**

**শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।**

প্রকাশক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ
(সাধারণ সম্পাদক ও আচার্য )
মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

দ্বিতীয়-সংস্করণ
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ১৩৬তম আবির্ভাব তিথি

৫ গোবিন্দ ৫২২ শ্রীগৌরাব্দ
২ ফাল্গুন ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ খৃষ্টাব্দ

*—প্রাপ্তিস্থান—*

গ্রন্থবিভাগ
মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ—শ্রীমায়াপুর
জেলা—নদীয়া, পঃ বঃ। পিনঃ—৭৪১৩১৩
☎(০৩৪৭২) ২৪৫২১৬, ২৪৫১৩৭

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট
৭০-বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা-২৬
☎(০৩৩) ২৪৬৫৭৪০৯

ভিক্ষাঃ—১৭৫ টাকা

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস' কম্পিউটার বিভাগ হইতে
শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# নিবেদন

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব-শতবার্ষিকী উৎসবের সময় অস্মদীয় গুরুদেব প্রভুপাদপ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের লেখনী ও বক্তৃতাবলী সংকলন করে'—দুই খণ্ডে এই গ্রন্থটি "শ্রীচৈতন্যদর্শনে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর" সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। এবার তাঁহারই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ করে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি।

এই গ্রন্থটি আমাদের মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিমলকৃষ্ণ দাস এবং সর্বোপরি শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজের প্রচেষ্টায় মঠের Computer-এ compose করে এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। বার্দ্ধক্যে পদক্ষেপ করেও শ্রীঅনাথবন্ধু দাসাধিকারী চরম ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে গ্রন্থটির প্রথম প্রুফ সংশোধন এবং দ্বিতীয় বারের জন্য শ্রীশ্বেতদ্বীপ দাসাধিকারী অর্থাৎ নির্ভুলভাবে যাহাতে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, সেই বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নশীল হন। এই সেবা কার্য্যের জন্য তারা সকলেই গুরু-বৈষ্ণবগণের আশীর্বাদ লাভ করবে।

----যতি

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ<br>
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।<br>
২৩-১১-২০০৮

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

## প্রথম খণ্ডের

# মুখবন্ধ

অস্মদীয় গুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অবদান পরমার্থ-জগতে অতুলনীয়। গৌড়ীয় গগনে তিনি জীববৃন্দের নিত্যকল্যাণপ্রদাতা উজ্জ্বল আচার্য্য-ভাস্কর। তাঁহার প্রচেষ্টায় আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম, ধাম ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানাত্মক বাণী বিঘোষিত হইতেছে। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদকর্ত্তৃক ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে বর্ণিত শুদ্ধা---উত্তমা ভক্তি---প্রেমভক্তি লাভ করিতে হইলে আজ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে এবং তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহেই তাহা প্রাপ্তব্য। তাঁহার লিখিত গ্রন্থাবলী, পত্রাবলী, বক্তৃতাবলী, প্রবন্ধাবলী, পদ্যাবলী, সংলাপ ও হরিকথামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম্ম বিশদরূপে সংরক্ষিত; যাহার কিছু কিছু আমরা ইতঃপূর্ব্বে ছোট ছোট গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছি এবং তাঁহার হরিকথামৃতের পীযূষধারাও প্রকাশ করার সৌভাগ্য আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি, কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার বহু অবদান এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য; তজ্জন্য তাঁহার সেই সকল অফুরন্ত অমূল্য লেখার কিছু কিছু সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার আবির্ভাব-শতবার্ষিকী-উপলক্ষ্যে কয়েকখণ্ডে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত প্রয়াসী হইয়াছি। প্রেসের নানা বিভ্রাটের জন্য এবং আমাদের প্রুফ দেখার সময় সঙ্কীর্ণ হওয়ায় কিছু কিছু ত্রুটি রহিয়া গেল। সহৃদয় পাঠকগণ মহাপুরুষের এই হরিকথা পাঠ করিয়া নিজ নিজ জীবনে অনুশীলন করিলে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন এবং আমরা নিজদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব।

নিবেদক---

বৈষ্ণবদাসানুদাস

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# দ্বিতীয় খণ্ডের
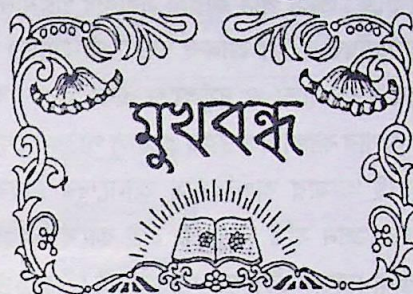
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপেই অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে সন্দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। তিনি শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপাদি-গোস্বামিবর্গ-প্রকটিত শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার লুপ্তগৌরব-উদ্ধার, আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও মঠরাজের শাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীরূপানুগ আচার্যভাস্কররূপে লুপ্ততীর্থোদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ-সেবা-প্রকাশ, ভক্তিগ্রন্থপ্রণয়ন ও ভক্তি সদাচার-প্রচার-ব্যপদেশে বিশ্বের সর্বত্র 'শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন'-বৈজয়ন্তী উড্ডীনপূর্বক শ্রীগৌর-নাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-মহিমা-জ্ঞাপকাত্মক শ্রীগৌরনাম-প্রচারদ্বারা বিশ্বের যে হিতসাধন করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। বিভিন্ন ভাষায় শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থসমূহ-প্রকাশ, বিভিন্ন ভাষায় দৈনিক-সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক-পারমার্থিক-বার্তাবহ-সমূহ প্রবর্তন, বিভিন্ন স্থানে বিরাট আকারে ভাগবত-প্রদর্শনী- উন্মোচন, দ্বারে দ্বারে কৃপাসিক্ত প্রচারকগণ-প্রেরণ, সভা-সমিতি আহ্বানপূর্ব্বক আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার অসমোর্ধত্ব-প্রদর্শন, ছায়াচিত্রযোগে ভগবদ্-ভাগবত-লীলা প্রদর্শন প্রভৃতি বহুবিধ অভিনব উপায়ে যেরূপ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন তাহা পূর্ববর্তী কোন আচার্যের লীলায় পরিদৃষ্ট হয় না। ১২৮০ বঙ্গাব্দের মাঘী কৃষ্ণ-পঞ্চমী হইতে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণী কৃষ্ণ-চতুর্থী পর্য্যন্ত ৬২ বৎসর ১০ মাস কাল প্রকট-লীলা করিয়া তিনি গৌড়ীয়-আচার্যভাস্কররূপে দেদীপ্যমান ছিলেন।

"কীর্তির্যস্য স জীবতি।" তাঁহার অতুল কীর্তিতে---তাঁহার পত্রাবলী, প্রবন্ধাবলী, বক্তৃতাবলী, পদ্যাবলী ও হরিকথামৃতে তিনি ভজনপরায়ণ সুধীগণের দিব্যনয়ন-সমক্ষে নিত্যকাল অবস্থান করিবেন। তাঁহার শতবর্ষপূর্তি-আবির্ভাব মহোৎসব-কালে এই সকলের একটি উজ্জ্বল সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। 'মূঢ়ঃ কর্তাহমিতি মন্যতে', 'সত্যং

পরং ধীমহি', 'বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্', 'শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া', 'ধ্যেয়ং সদা শ্রীচৈতন্যচরণারবিন্দম্', 'অথ উপদেশামৃতসারঃ'---শীর্ষক ৬টি অধ্যায়ে ''শ্রীচৈতন্যদর্শনে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর''---গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া সুধীবৃন্দ পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া আনন্দ ভরে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। এই কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা এবং মুদ্রণে অত্যধিক খরচ-বৃদ্ধির দিনেও শ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণায় গ্রন্থরত্ন শ্রদ্ধালু পাঠকগণের হস্তে প্রদান করিবার সৌভাগ্য হইতেছে, ইহাই আমার অপরিসীম আনন্দের বিষয়। পরম স্নেহভাজন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমান্ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ এই কার্যে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া নিশ্চয়ই শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ কৃপা-ভাজন হইয়াছে। তাহার এই সেবাচেষ্টা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, ইহাই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-চরণে একান্ত প্রার্থনা।

একজন মহীয়সী মহিলা শ্রীল প্রভুপাদের অবদান পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে বিশেষ যত্নবতী ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রসঙ্গ শ্রবণ ও পাঠ করিয়া তিনি কতই না উল্লসিত হইতেন। তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল শ্রীল প্রভুপাদের অবদানবৈশিষ্ট্য জগতে প্রচারিত হইয়া বিশ্বের নিত্যকল্যাণ বিহিত হউক। তাঁহার নাম শ্রীমতী উমা গুহ। তিনি এখন আর ইহজগতে নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলে তাঁহার নিত্য কল্যাণ কামনা করিতেছি।

নিবেদন---

বৈষ্ণবদাসানুদাস

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু *শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ*

# সঙ্কেত চিহ্ন

অঃ—অন্ত

আঃ—আদি

মঃ—মধ্য

পূঃ—পূর্ব

ভাঃ—শ্রীমদ্ভাগবত

চৈঃ চঃ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

চৈঃ ভাঃ—শ্রীচৈতন্যভাগবত

গীঃ—শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

ভঃ রঃ সিঃ—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু

কঠ—কঠ উপনিষদ

মনু—মনু-সংহিতা

শ্বেতাশ্বঃ—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ

হঃ ভঃ বিঃ—শ্রীহরিভক্তিবিলাস

মহাভাঃ—মহাভারত

বিষ্ণু পুঃ—বিষ্ণুপুরাণ

চৈঃ চন্দ্রামৃতম্—চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্

## প্রথম খণ্ডের

দ্বিতীয় খণ্ডের

# সূচীপত্র

শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা

**প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর**

# প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
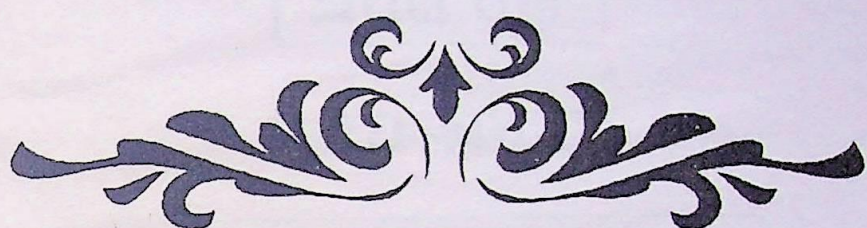
# শ্রীচৈতন্যদর্শনে

# প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

## প্রথম খণ্ড

## প্রথম অধ্যায়

### মূঢ়ঃ কর্ত্তাহমিতি মন্যতে

(১)

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।। (গীতা ৩।২৭)

এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয়-তর্পণের মায়া-মৃগ হইয়া বিচরণ করিতেছে। এই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া সংঘর্ষই এই জগতের স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য এখানে সংঘর্ষের মধ্যে একটা মিলন বা ঐকতানের জন্য মানবের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়।

প্রেয়ঃ অর্থাৎ আপাততঃ যাহা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বলিয়া বিবেচিত হয় অনেকে তাহাকেই মিলন বা ঐকতানের সূত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে সংঘর্ষের ব্যবধান বিস্তৃতই হইয়া পড়ে। আমরা কেবল বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট করিয়াছি, এই অভিজ্ঞতা লইয়াই অন্তিমকালে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমাদিগকে ধরাধাম হইতে চলিয়া যাইতে হয়।

এই প্রত্যক্ষের পথ হইতে বহু ধর্ম্মের দোকান জগতে স্পষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। ঐ সকলকে মনোধর্ম্মের পণ্যবীথিকা বলা যায়; তাহাতে অনেক আপাত চাকচিক্যযুক্ত মনোহারী জিনিষ পাওয়া যায়। তাহা অতি সহজেই বিশ্বমানবের স্বাভাবিকী বহির্ম্মুখী বৃত্তিগুলিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

জগতে এইরূপ মনোধর্ম্মের শত শত প্রকার দোকান এবং উহাদের বিভিন্ন প্রলোভনের বাগ্‌বৈখরী—উহাদের মানব জগতের প্রতি প্রস্তাবিত শান্তি-প্রদানের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি দেখিয়া ও শুনিয়া আমাদের মাথা গুলাইয়া যায়। আমরা বুঝিতে পারি না—স্থির করিতে পারি না, কোন্ জিনিষটি গ্রহণ করিব।

শতকরা ৯৯.৯ লোকই তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুসন্ধিৎসু বলিয়া প্রত্যক্ষের পথের প্রেয়োধর্ম্মের বা মনোধর্ম্মের কোন না কোন একটিকে স্ব-স্ব ধর্ম্ম বা সমাজগত, জাতিগত, বংশপরম্পরাগত ধর্ম্ম বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রকৃত-প্রস্তাবে ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ, ঐকান্তিক সত্য, বাস্তব নিত্যসত্য কিরূপে লাভ হইবে,—এরূপ অকৃত্রিম, অকপট অনুসন্ধিৎসা আমাদের শতকরা প্রায় শত জনেরই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাকে সময় সময় আমরা সত্যানুসন্ধিৎসা বলিয়া মনে করি, তাহার সহিতও প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিস্পৃহা মিশ্রিত থাকে। কাজেই আত্মধর্ম্মের কথা আমাদের নিকট একমাত্র গ্রহণীয় ধর্ম্ম বলিয়া বৃত হয় না।

প্রেয়ের পথ পুষ্পিত ও পিচ্ছিল, শ্রেয়ের পথ নানা কণ্টক-পূর্ণ। শ্রেয়ঃ জিনিষটি হরিতকীর মত। উহা আপাততঃ বড়ই তিক্ত, কষায় বোধ হয়, মোটেই গ্রহণে রুচি হয় না কিন্তু পরিণামে তাহা মঙ্গলপ্রদ।

জগতের লোকের নানাপ্রকার অকর্ত্তব্য-বিষয়ে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, অকৃত্যে কৃত্যবিচার উদিত হইয়াছে। তাই তাহারা অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, কুকর্ম্ম ও গৌণ জগতের সৎকর্ম্ম প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত। জাগতিক বিচারে যাঁহারা ধনে, বিদ্যায়, পাণ্ডিত্যে, প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদিত, তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত হইয়া য়ুরোপের বিগত মহাসমরে কিরূপেই বা বিনষ্ট হইলেন! রুশ-জাপান-যুদ্ধ, য়ুরোপের আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বা আধুনিক নানাপ্রকার ব্যক্ত-অব্যক্ত জাতীয়-সংঘর্ষের কোনটাই মানবজাতির বা বিশ্বসমাজের কোন স্থায়ী উপকার করিতে পারিবে না। উহারা আপাত যতই উত্তেজক ও বিশ্ব-প্রগতির পোষক বলিয়া কল্পিত হউক, কার্য্যতঃ উহারা জগন্নাশকর উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে।

ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সাযুক্ত মানবজাতি কখনও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের বিষয় ধারণা করিতে পারে না। তাহারা কেবল প্রত্যক্ষের দ্বারা চালিত হইয়া অনুমান-বলে ভবিষ্যতের বিকৃত ও কল্পিত ধারণা পোষণ করে। অতীতের অভিজ্ঞান তাহাদিগকে বাস্তব মঙ্গলময়ী শিক্ষাপ্রদানের পরিবর্ত্তে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জীবন-বীমা করিবারই পরামর্শ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে অমঙ্গলের পথে ধাবিত করায়।

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে কেন্দ্র করিয়াই আমরা বিশ্ব-পরিক্রমা করি। আমাদের যাবতীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা হয়। যদি বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুতে—যদি ভোগ করা অপেক্ষা ত্যাগে—যদি ভূরি ভোজন অপেক্ষা উপবাসে আমাদের অধিকতর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে আমরা মৃত্যু, ত্যাগ, উপবাস প্রভৃতি বাহ্য স্থূল

ভোগ-বিরোধি ব্যাপারগুলি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হই না। এমনও দেখা গিয়াছে যে, মৃত্যুর পর, লোকে যশঃ কীর্ত্তন করিবে কিম্বা ভাবিকালে কোন না কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিলাভ হইবে, এই জন্য লোকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম প্রাণকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া মৃত্যুতে জ্বালা-নিবারণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিলাভের জন্য বহুলোক মৃত্যু বরণ করিতেছে। কতিপয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে ত্যাগ, কৃচ্ছ্রতা, উপবাস ও নানাভাবে শরীর-পীড়ন প্রভৃতি দ্বারা তিলে তিলে দেহ-বিসর্জ্জনকে ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সুসূক্ষ্ম আত্মবিচারে দেখিতে পাওয়া যায়—ঐ সকল চেষ্টার মূলে প্রচ্ছন্নভাবে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টাই লুক্কায়িত রহিয়াছে।

এইরূপে সকলেই প্রচ্ছন্নই হউক বা স্পষ্টভাবেই হউক, নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণেই ব্যস্ত। একমাত্র যে অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তুর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুসন্ধান করিলেই সকল ব্যষ্টি বা সমষ্টির ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রবল উন্মাদনা বিদূরিত হইয়া বাস্তব আনন্দ-লাভ হইবে, তাহার গ্রাহক আমরা কেহই নহি।

জগতের যাবতীয় চেষ্টা আজই হউক বা কালই হউক, অবসন্ন হইয়া পড়িবে। ঐ সকল চেষ্টা-দ্বারা আমরা কেবল আমাদিগকে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করি। যদি আমরা সত্য সত্য এমন কোন সার্ব্বজনীন বিষয়-বস্তুর সন্ধান পাই—যিনি সকলেরই মূল কারণ, সকল আশ্রয়ের মূল বিষয়, সকল আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির পূর্ণতম ভাণ্ডার, তাহা হইলেই আমাদের নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনামূলে যে-সকল শত সহস্র ধর্ম্ম-মতের উদয় হইয়াছে, সেই সকল মত ও পথ আমরা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সর্ব্বকারণ-কারণ সকল আশ্রয়ের মূল আশ্রয়ে আশ্রিত হইতে পারি। সেই মূল আশ্রয়কেই কোথায়ও "গড্", কোথায় বা "আল্লা", কোথায় বা "পরমাত্মা", "পরমেশ্বর" প্রভৃতি বলিয়া মানব-জাতি ধারণা করিবার চেষ্টা করেন। জাগতিক ব্যক্তিগণ যে ধর্ম্মের মহাসভা বা দার্শনিক মহাসভা প্রভৃতিতে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের প্রতিযোগিতা বা বিজয় আহ্বান করেন, তাহাতে প্রকৃত বাস্তব সত্য বা আত্ম-ধর্ম্ম নির্ণীত হয় না। কেন না, সভার সভাসদ্‌গণ বা সভাসদ্‌গণের নির্ব্বাচিত সভাপতি — সকলেই ন্যূনাধিক স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ধর্ম্মের বহুমাননকারী।

এজন্য বাস্তবসত্যের নিষ্কপট অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেই সর্ব্বকারণ-কারণ কে? কাঁহার জন্য আমাদের যাবতীয় চেষ্টা ও শক্তি নিযুক্ত হওয়া উচিৎ?

এ জগতে এক জনের সহিত আর এক জনের পাঁচপ্রকার সম্বন্ধের অন্যতম সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেখানেই একের অধিক সংখ্যা সেখানেই এরূপ পঞ্চ প্রকার সম্বন্ধের কোন না কোন একটী অবশ্যই থাকিবে। পতি ও পত্নী, মাতা-পিতা ও পুত্র, সখা ও সখা, প্রভু ও ভৃত্য এবং নিরপেক্ষ ভাব; জগতে যে এই পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সঙ্কীর্ণ ও বিকার-যুক্ত।

যখন আমরা দুই অথবা ততোধিক বক্তি এক স্বার্থে যুক্ত হই, তখন আমাদের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য উদিত হইতে পারে না। কিন্তু যদি পরস্পরের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন বা কমবেশী হয়, তাহা হইলেই সেখানে অনৈক্য বা বিবাদ উপস্থিত হয়। নিখিলচেতনজীবের এক স্বার্থ কি,—সেইটিই অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—সর্ব্বকারণ-কারণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-বিধানের চেষ্টাই সকলের এক-স্বার্থ।

সভ্য সমাজ সভ্যতার ক্রমিক উন্নতিক্রমে যে সকল তত্ত্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছেন, তাঁ'দের সেই সকল কথা শ্রবণ ক'র্‌তে পার্‌লে অর্থাৎ সভ্যতার ইতিহাস—সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাত—সভ্যতার সংঘর্ষে নানাপ্রকার সমস্যার সাময়িক সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে যে-সকল ব্যক্তি পারদর্শিতা লাভ ক'রেছেন, তাঁ'দের মুখে সে সকল কথা শ্রবণ ক'রে আমরা অল্পায়াসে সুদূর অতীতকালের সভ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিদ্যাবত্তা প্রভৃতিকে আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার দ্বারে অতিথিরূপে বরণ ক'র্‌তে পারি। যিনি ঐ সকল অভিজ্ঞতার কথা বলেন, তিনি শিক্ষক বা কীর্ত্তনকারী, আর যিনি অভিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি শিক্ষাকারী বা শ্রবণকারী। এইরূপ অভিজ্ঞতার কীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রণালীর মধ্য দিয়ে জাগতিক শিক্ষাস্রোত দিন দিন উন্নতির পথে প্রভাবিত হচ্ছে, আমরা মনে করি। ইহাতে উদাসীন হ'লে সমাজের শুভানুধ্যায়িগণ আমাদিগকে অলস ও জগতের অমঙ্গলকামী ব'লে মনে করেন; কিন্তু আমাদের এরূপ শিক্ষাধারা, এরূপ অভিজ্ঞানে কীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রণালী এবং অভিজ্ঞতা-বিদ্যাতুঙ্গে অধিরোহণই কি চরম কথা? কেবল অল্পকালের অভিজ্ঞানে সাময়িক শিক্ষায় শিক্ষিত হ'ব—তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ ক'রব, এরূপ বিচারে আবদ্ধ থাকাই কি মানবের দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক? মনুষ্যজাতি যা'র জন্য খুব ব্যস্ত, সেই বিদ্যা, আমাদের কোন একটি ইন্দ্রিয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'লেই নির্ব্বাপিত হ'য়ে পড়ে। এজন্য উপনিষৎ ব'লেছেন,—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। কালের গতি অন্য প্রকার। বর্ত্তমানকালের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে লক্ষিত হয় যে, পরা বিদ্যার প্রতি ঔদাসীন্যে পারদর্শিতালাভই যেন বিদ্যার সার্থকতা! এরূপ বিচার আধ্যক্ষিকতা মাত্র। বিষয় গ্রহণে অসম্পূর্ণতা হ'তেই এরূপ আধ্যক্ষিকতা-অমরা-পুরীর সোপান নির্ম্মিত হ'য়েছে।

কিছুকালের জন্য দরকার প'ড়েছে যে শিক্ষার, সাময়িক কাজ মাত্র চ'লে যেতে পারে যে শিক্ষায়, এরূপ শিক্ষার আলোচনায়ই আমরা মস্তক আলোড়ন ক'রে থাকি। সুদূর কার্য্যের প্রয়োজনসাধিকা শিক্ষার আলোচনা না ক'র্‌লেও চ'লবে—এরূপ একটা সংক্রামক আলস্য আমাদের সকলকে গ্রাস ক'রেছে। কিন্তু ইহা দেশহিতৈষিতা ও পরদুঃখদুঃখিতার অভাবজ্ঞাপক।

'ধর্ম্মে মতভেদ আছে ব'লে কোন ধর্ম্মই আলোচিত হ'বে না,' এরূপ বিচারস্রোতে তাঁ'রা গা' ভাসিয়ে দিতে পারেন! তবে এখানে সুদূরদর্শিগণ ব'ল্‌বেন—মানুষ মরীচিকা

দে'খে ঠকেছেন ব'লে 'কোথাও বা কখনও আর জলের অন্বেষণ কর্‌বেন না'—জোনাকী পোকার আলোতে আগুন পাওয়া যায় না ব'লে 'যেখানে যত আলোক আছে, কোথাও আগুন নেই, ব'লে স্থির সিদ্ধান্ত করা অত্যন্ত স্থূল ও অতিসাহসিক বিচার।

আমাদের পঠদ্দশায় আমরা স্যর ষ্টুয়ার্ট ব্ল্যাকির সেলফ্ কাল্‌চার (Self culture) নামক একখানা বই প'ড়েছিলাম। তা'তে প'ড়েছিলাম, "ঈশ্বরবিহীন যে বিদ্যা, তা' অবিদ্যা, তা'র কোন মূল্য নাই। সদ্‌ব্যবহার, জনহিতকর কার্য্য প্রভৃতি ক'রেও যদি রাজার প্রতি সৌজন্য না থাকে, তা' হ'লে যেরূপ সব বিফল হয়, সেরূপ ভগবানকে বাদ দিয়ে যে জনহিতকর বা পরোপকারের ছলনা, তারও কোন মূল্য নাই।" সে সময় আমাদের এ-সকল কথা প'ড়ে হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ ক'রেছে দেখে আমরা আনন্দ লাভ ক'রেছিলাম। Cultural Eduction (কৃষ্টিগত শিক্ষা) থেকে যদি ঈশ্বরের সেবাটী বাদ দেওয়া যায়, তা' হ'লে হিংসা বা মৎসরতা এসে উপস্থিত হয়। যেহেতু লৌকিক ধর্ম্মের আলোচনায় মতভেদ আছে, সুতরাং আত্মধর্ম্মকথার আলোচনাকে একেবারে নির্ব্বাসিত ক'র্‌তে হ'বে, এরূপ বিচারযুক্ত শিক্ষা পোষণ করা গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার বিচার। তা'তে মৎসরতা খুব বৃদ্ধি পেয়ে শেষে কেবল অসুবিধা হ'বে।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার পূর্ণ যৌবনকালে ১৯১৪ হ'তে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে বিষম মহাসমর পাশ্চাত্ত্য দেশের সভ্যতাকে আক্রমণ ক'রেছিল, তা'তে কত শিক্ষিত ব্যক্তির যূপকাষ্ঠে বলিদান হ'লো ! সভ্যতার অগ্রসর হওয়ার নামে সভ্যতা কত পেছিয়ে গেল! ভগবদ্-বিষয়িণী শিক্ষাকে—আত্মধর্ম্মের শিক্ষাকে নির্ব্বাসিত ক'রে লৌকিকী শিক্ষা ও সভ্যতার চরম ফল এইরূপই হ'য়ে দাঁড়ায়। নৈতিক ও পারমার্থিক-শিক্ষাকে বাদ দিয়ে যে বিচারস্রোত উপস্থিত হয়, তা' হ'তে রক্ষা পাওয়া দরকার। দাবা খেলে অদৃষ্ট-ফলে যে-সকল কথার মীমাংসা লাভ হয়, তজ্জন্য লোক জীবন-যৌবন উৎসর্গ করছে! তদানীন্তন পোপ যত্ন ক'রেছিলেন—এরূপ বিবাদ-বিসম্বাদের হাত হ'তে যাতে পাশ্চাত্ত্য দেশ রক্ষা পায়—মানুষগুলোকে বুঝাবার যত্ন ক'রেছিলেন। কিন্তু তাঁ'র যত্ন-সত্ত্বেও এ সকল কথা শুন্‌তে শুন্‌তেও তা'দের ৩।৪ বছর কেটে গেল। যখন বহু লোকের ক্ষয় হলো, তখন তা'দের উত্তেজনা-স্রোতে একটুকু ভাঁটা দেখা গেল বটে, কিন্তু আবার অন্যভাবে অন্য আকারে সেগুলি বৃদ্ধি পেতে থাক্‌ল।

নৈতিক ও পারমার্থিক শিক্ষাই ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। ভারত ধর্ম্ম-শিক্ষাবর্জ্জিত হ'য়ে কোন দিনই কোন কথা গ্রহণ করেন নাই। যদিও চার্ব্বাকাদি সম্প্রদায় সৃষ্ট হ'য়েছিল, তথাপি জনসাধারণ তা' গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে জনসাধারণেই পারমার্থিকতার অভাব লক্ষিত হচ্ছে। বর্ত্তমানে আধ্যক্ষিকতার চরমসীমায় উঠে—তর্ককে অস্ত্র ক'রে বিচারের যেরূপ অপব্যবহার করা হচ্ছে, পূর্ব্বে এতদূর অপব্যবহার লক্ষিত হয় নাই। নীতিশাস্ত্র-লঙ্ঘনকে একটুকু সামান্য বুদ্ধিমান ও বিচারপরায়ণ ব্যক্তিও কর্ত্তব্য ব'লে

মনে করেন না। চার্ব্বাকনীতি, এপিকিউরাসের নীতি, ইউটিলিটিরিয়্যানদের নীতি ব্যক্তি-বিশেষের প্রীতি উৎপাদন ক'রতে পারে, কিন্তু বিচারপরায়ণ মানুষ্য-সাধারণের শিক্ষার সহিত নীতির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্বীকার্য্য।

ভারতীয় নীতির মধ্যে 'অহিংসা' নাম্নী নীতিটি চিরকালই প্রচলিত র'য়েছে। বৈদিক নীতি হ'তে পৃথক্ হ'য়েও বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় অহিংসানীতির আদর ক'রেছেন। বেদ-বিরোধী হ'য়েও তাঁ'রা হিংসানীতির অনুমোদন করেন নাই – যা' বর্ত্তমানে খুব আদৃত হ'চ্ছে! মানুষ পশুগুলিকে খেয়ে ফেল্‌ছে। মানুষ খাওয়া বন্ধ হ'য়েছে, কিন্তু মানুষের মত জিনিষগুলিকে খাওয়া বন্ধ হয় নাই। বানর ধ'রে ধ'রে খাচ্ছে--পশু, পক্ষী, তির্য্যক্ জাতিকে খেয়ে ফেল্‌ছে। এরূপ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা আবার বর্ত্তমান যুগে মহা উদারতা ও দেশপ্রেম-নামে প্রচারিত হ'চ্ছে!

ঋষিনীতি, ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্যনীতি, শূদ্রনীতি, সাঙ্কর্য্যপ্রভাবজাত নীতিতে ভেদ হ'চ্ছে। কেউ ব'ল্‌ছেন--ঋষিনীতি প্রবর্ত্তিত হো'ক কেউ বল্‌ছেন,—নীতিশাস্ত্রে যখন বহু মত-ভেদ লক্ষ্য করা যায়, তখন তা' শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হ'লে শিক্ষা বিপদ্‌গ্রস্ত হ'বে। শিক্ষা ত' বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েছেই, নীতিকে কল্যাণকরী মনে না করায়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যেও ত' বি, ডি; ডি,ডি প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য ধর্ম্মশাস্ত্র পরীক্ষার প্রণালী গৃহীত হ'য়েছে, তাঁরা থিওলজিকে একেবারে বাদ দেন নাই। 'পলিটিক্যাল ইকনমি' বলে যে একটা জিনিষ আছে, তা' তথাকথিত ইউটিলিটেরিয়্যানদের বিচারে সাময়িক মঙ্গল বিধান কর্‌তে পারে; কিন্তু তা' দ্বারা সমাজের স্থায়ী মঙ্গল হতে পারে না। বর্ত্তমানে মিশনারী স্কুল ব্যতীত যেখানে যত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সকলেই ন্যূনাধিক Material basis-এর জড়ের (ভূমিকায়) উপর প্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে। তবে মিশনারী স্কুল প্রভৃতিও Material basis হতে কতটা পৃথক্ হতে পেরেছে, তাও বিচার্য্য। বর্ত্তমানে Legislative Assembly-তেও religious question-কে বাদ দেওয়া হচ্ছে! Mahomedan, Non-Mahomedan বিচারে Mahomedan যদি ধার্ম্মিক হন, Non-Mahomedan অধার্ম্মিক হয়ে যাচ্ছেন। Materialistic বিচারস্রোতে ভরপূর মস্তিষ্কসমূহের ভোটে Theistic education (ভগবদ্ভক্তিমূলা শিক্ষা)-কে চিরনির্ব্বাসিত করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। যাঁরা বাস্তবিক ধার্ম্মিক, তাঁরা এ সকল কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হন না; কারণ, যাঁরা অপস্বার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন, এরূপ জনমণ্ডলীর মতও কুশিক্ষারই পূর্ব্বফল।

মুণ্ডকোপনিষদে যে অপরা ও পরাবিদ্যার পার্থক্য আলোচিত হ'য়েছে, সেটা সবটুকু ঠাকুরদাদার আমলের গল্প বা 'তাতস্য কূপঃ'-ন্যায়ে সংশ্লিষ্ট নহে। বর্ত্তমান যে nationality বলে একটা কথা প্রচলিত হ'য়েছে, তা' ন্যূনাধিক ঐ 'তাতস্য কূপঃ' ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। বৃদ্ধ প্রপিতামহের কূপে বিশুদ্ধ নির্ম্মল জল ছিল ব'লে যদি কতকপুরুষ

পরেও কূপে সেইরূপ জলই আছে, মনে ক'রে নিয়ে সেই কূপের জল ব্যবহার করতে আরম্ভ করা হয়, তা' হ'লে কতকগুলি ব্যাঙ পাঁকসংশ্লিষ্ট অব্যবহার্য্য বস্তুই গ্রহণ করা হ'বে। এ' দ্বারা "যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ" প্রভৃতি উক্তিকে আদর করার নামে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হ'বে না। আমার বাপ-পিতামহ যদি মূর্খতাকে বহুমানন ক'রে থাকেন, সেজন্য আমি মূর্খতাকেই ভাল ব'ল্ব – আমার বাপ-পিতামহ গাঁজা খেতে খুব ওস্তাদ ছিলেন ব'লে, যেহেতু আমি সে বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, তখন আমাকেও গাঁজা খাওয়া শিখতেই হ'বে, এরূপ সেকেলে অসদ্ বিচারের আদর কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই করেন না। ইহা আধুনিক ন্যাশানেলিটির অঙ্গ হ'তে পারে।

অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাওয়া যায়—যাঁরা খুব বড় বড় University degree-holder—খুব ভাল লেখা পড়া শিখেছেন, কিন্তু শিক্ষিত বল্লে যে সকল বিষয় জানা উচিত, তাতে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। যেমন তেমন করে নিজের অপস্বার্থ সাধন করে নেব,—ইহাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

আপাত-মঙ্গল-দ্রষ্টা মনে করে,—"এখন যেমন তেমন ক'রে যথেচ্ছাচারিতা করা যা'ক, মরণের পরে যখন সবই নিবে যাবে, তখন আপাত সুখটুকু হ'তে বঞ্চিত কেন হই?" "পরজগতের কথা বিচার করা মূর্খতা ও সময়ের অপব্যবহার মাত্র"—এরূপ বিচার পাশ্চাত্য-শিক্ষার কুফল থেকে ভারতেও আধুনিক কালে আমদানি হ'য়েছে। আবার কেউ কেউ 'আইন বাঁচিয়ে কার্য্য কর্‌বার্' কৌশলশিক্ষার'ন্যায়াবলম্বনে যে-সকল কার্য্য দৈহিক সুখের বাধক হ'তে পারে, সেরূপ কার্য্য হ'তে বিরতিকেই নীতি ব'লে বিচার করেন। কিন্তু আইন বাঁচিয়ে কার্য্য করা' ব্যাপারটায় সরলতার যথেষ্ট অভাব র'য়েছে। এরূপ সরলতার অভাব বিদেশীয় বা ভারতীয় উন্নত জীবনে অভিলাষ করা উচিত নয়। পরমার্থ-নীতিতে এরূপ সরলতার অভাব বিন্দুমাত্রও নাই। এই ভারতে নৈতিক ও পারমার্থিকতায় রুচি উৎপাদন কর্‌বার চেষ্টারও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'য়েছে। আকুমারিকা-হিমাচল, অন্য দিকে আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ হ'তে দ্বারকা, বোম্বাই, গোয়া ভ্রমণ কর্‌লাম, সর্ব্বত্রই নৈতিক ও পারমার্থিক রুচির প্রচুর অভাব লক্ষ্য ক'রেছি। লোকে শিক্ষা-দীক্ষা কল-কৌশল অনেকেই আয়ত্ত করছেন, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি সকলেই উদাসীন। Different schools of thoughts হ'য়ে উঠেছে। যদি শিক্ষার প্রারম্ভ থেকে একটা নিরপেক্ষ comparative study থাকে, তা' হ'লে জেনে নিতে পারি, কোন্ জিনিষটায় প্রকৃত মঙ্গল, আর কোন্ জিনিষটায় অমঙ্গল হ'বে। এরূপ comparative study সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে পাশাপাশি হওয়া উচিত, নতুবা খুব বড় বড় University degree-holder এবং সাধারণ শিক্ষার শীর্ষস্থানের অধিকারী, বহু ভাষাবিৎ, কলাবিৎ হ'য়েও যখন দেখা যাচ্ছে যে,

তাঁ'রা অশিক্ষিত অপেক্ষাও কোটিগুণে অধিক কাম-ক্রোধাদির দাস হ'য়ে বিপথে পতিত হ'য়ে যাচ্ছেন, তখন সেইরূপ শিক্ষার ফলে পরোপকার ত' দূরের কথা, বর্ত্তমান সমাজের সমূহ অমঙ্গলই অবশ্যম্ভাবী।

মূলটা ঠিক ক'রে রাখলে সবই ঠিক থাক্‌বে। সকল নীতি ও অখিল সদ্‌গুণের আকর স্থানে কেন্দ্র ঠিক না রাখলে বিপথে চলে যেতেই হবে। মূল পদার্থ ঠিক থাকলে মাঝপথের সকল আলোচনা ঠিক হ'বে। ভগবদ্‌বিস্মৃতি হওয়ার দরুণই জীবেরঐসকল অসুবিধা, ভগবান কি জিনিষ, তাঁর অনুশীলনের অভাবে নানাপ্রকার চিন্তাস্রোত, এমন কি, অখিল সদ্‌গুণের আকরের অস্তিত্বের অস্বীকার পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়! মূল কেন্দ্র ঠিক্ হ'লে কেবল যে কোন শ্রেণীবিশেষ বা কোনও নীতি-বিশেষের উপকার হ'বে, তা' নয়, তদ্দ্বারা শিক্ষক-ছাত্র, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভারতীয় ও ভারতের বহির্ভূত সকল শ্রেণীর জীবেরই পূর্ণ মঙ্গল লাভ হ'বে।

গুণজাত জগতে প্রতি মুহূর্ত্তেই একটা আপাত সুবিধার সহিত শত সহস্র অসুবিধা এসে উপস্থিত হয়। এক ব্যাধির প্রতিকার করতে গিয়ে অন্যান্য ব্যাধিগুলি বেড়ে যায়, না হয়, নানাপ্রকার নূতন ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

শিক্ষালাভের প্রথম থেকেই যদি মনে করি যে, আমাদের কোনও নিয়ামক নাই— পরমেশ্বর নাই, তা' হ'লে নীতিশিক্ষা নিরর্থক ও উচ্ছৃঙ্খলতাতেই পরিণত হ'বে। কেবল নিজের সুবিধাবাদটুকু অর্জ্জনের জন্য কৃত্রিম ও আগন্তুক নীতি ও তাৎকালিক নিয়ামকের অস্তিত্ব স্বীকার করলে নীতিপালন কার্য্যটিই সাময়িক ও সুবিধাবাদ অর্জ্জনের শুল্কমাত্র হ'বে। এই নিরীশ্বর নীতি শিক্ষার বিষময় ফলই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বত্র মহামারীর ন্যায় সংক্রামিত হ'য়েছে। তাই স্কুল-কলেজের ছেলেরা মূল অতিমর্ত্ত্য নিয়ামকের প্রতি সন্দিহান হ'য়ে, মর্ত্ত্য নিয়ামক, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতি ব্যক্তিগণের প্রতিও শিষ্টাচার বর্জ্জিত হ'য়ে পড়্ ছে—নানাপ্রকার দুর্নীতি তাদের জীবনসঙ্গিনী হচ্ছে, বহুরূপিণী যথেচ্ছাচারিতা ও বিলাসিতা, সামাজিক উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতা নীতির নামে সুবিধাবাদের ধর্ম্ম গড়ে তুলে নাস্তিকতার মহামারীকে আরও ব্যাপক ও ভয়াবহ ক'রে তুল্‌ছে।

আমাদের সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সময় প্রিন্সিপাল মহাশয়ের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলাপ হয়েছিল। তিনি বলিলেন,—'ঈশ্বরের কথা আলোচনা না ক'রেও আমরা নৈতিক জীবন যাপন করতে পারি।'' আমি এ বিষয়ের প্রতিবাদ করেছিলাম। নিরীশ্বর নৈতিকতা সুবিধাবাদ বা ভোগবাদ মাত্র, তদ্দ্বারা কা'রোও ব্যক্তিগত বা সামাজিক মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না।

আমরা আর এক সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবনে তাঁর নিকট গিয়েছিলাম। তিনি আমাদিগকে বললেন,-—"দেখ, যখন আমার ঈশ্বরবিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা নাই, তখন প্রকৃত ঈশ্বর কিরূপ, তা' যদি অপর কারও নিকট বলি, আর যদি

প্রকৃত-প্রস্তাবে ঈশ্বর থাকিয়াই থাকেন ও যদি তিনি আমার বিশ্বাসমত না হইয়া অন্যরূপ হন, তা' হলে আমার মৃত্যুর পর সেই ঈশ্বরের নিকট বহু জুতা খেতে হ'বে। এজন্য আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে কারও নিকট কিছু আলোচনা করি না, বা কোনও লোকের কোন কথা শুনাও উচিত মনে করি না। আমি লোককে সাধারণ নৈতিক উপদেশই দিয়ে থাকি, যে কথা আমি প্রত্যক্ষ দেখি ও বুঝি।'' আমরা যে মহাপুরুষের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবনে গিয়েছিলাম, তিনি বলিলেন—''তা হ'লে আপনি আপনার 'বোধোদয়' পুস্তকে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ এ কথা লিখলেন কেন? আপনি কি পরমেশ্বর বস্তুকে সাক্ষাৎ ক'রে একথা লিখেছেন? না কোনও প্রচলিত মতে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে এরূপ উক্তি করেছেন?''

আধ্যাত্মিক-সম্প্রদায়ের অনেকের মধ্যে আজকাল এরূপ বিচার দেখতে পাওয়া যায়। তা'রা এদিকে বলেন,—ঈশ্বরের সম্বন্ধে যখন তাঁরা কিছু জানেন না, তখন ঈশ্বরের কথা শ্রবণ কীর্তনানুশীলন করবেন না। অথচ তাঁরা না জেনেও ঈশ্বরকে নির্ব্বিশেষ করবার জন্য ব্যস্ত! বলি, যে বিষয় আমরা জানি না, সে বিষয়ের কথাত' অভিজ্ঞগণের নিকট শ্রবণ ও অনুশীলন করব? কিন্তু শ্রবণ করব না, কোন প্রকার অনুশীলন ত' করবই না, অথচ 'সেই বস্তুর সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে প্রস্তুত নহি' ছল ক'রে আমার মনগড়া মত প্রচার করব।—এরূপ একটা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা বহির্মুখ মানবজাতিকে গ্রাস ক'রেছে। ঈশ্বরের কোনও অনুশীলন বা আলোচনা না ক'রেও পরম পণ্ডিত হ'তে মূর্খ পর্য্যায়ের মধ্যে ঈশ্বরকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ করবার চেষ্টা যেন সংক্রামক ব্যাধি দেখতে পাওয়া যায়। ভগবানকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ করতে পারলে কার্য্যতঃ আমরা নিয়ামকহীন হ'তে পারি! নির্ব্বিশেষ করা মানে—পরমেশ্বরের নিত্য নিয়ামকত্ব অস্বীকার করা। আমাদের চোখ, মুখ, কান প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই থাকবে, নাম, রূপ, গুণ থাকবে, কিন্তু পরমেশ্বরের উহা থাকবে না, তাঁর ঐ সকল থাকলেই আমাদের মত হ'য়ে যেতে হ'বে। ''মায়া মিশাইয়া তিনি এ জগতে আসেন, কিন্তু তাঁর নিত্য স্বরূপে তিনি নিরাকার নির্ব্বিশেষ, তাঁর অপ্রাকৃত নামরূপ-গুণ-লীলা নাই,''—এরূপ ধারণা প্রচ্ছন্ন ভাবে উপরওয়ালা বা নিয়ামককে অস্বীকার করা মাত্র।

কেহ উপরওয়ালা নাই, নিয়ামক নাই—এই বিচার হ'তেই উচ্ছৃঙ্খলতা এসে যায়। নিয়ামকহীন নীতি অর্থাৎ নিরীশ্বর নীতির কেনও মূল্যই নাই।

আমাদের পঠদ্দশায়, আমরা 'ব্লেকির' 'সেল্ফ্ কাল্চার' পড়েছিলাম। তা'তে এরূপ একটা কথা লিখিত আছে,—রাজাকে অবজ্ঞা ক'রে রাজ্যে বাস করা যেমন, ঈশ্বরকে অবজ্ঞা ক'রে নীতি পালনও তদ্রূপ।

মূল বস্তু পরিত্যাগ ক'রে ডালপালার সেবা বৃথা। মূলকে কেটে যদি গাছের ডালপালায় খুব করে জল সেচন করা যায়, তা' হলে কোন সুফল লাভ করা যায় না।

আর ঐরূপ পৃথক্ নীতিপালনের জন্য পৃথকভাবে চেষ্টান্বিত না হ'য়েও যদি ভগবৎসেবায় ঐকান্তিক হওয়া যায়, তা' হলে সমস্ত সৎনীতি ও সদ্‌গুণ আনুষঙ্গিক ভাবেই লাভ হয়।

আগে নীতি, পরে ভগবদ্ভক্তি---এরূপ ক্রম নয়। আগে ভগবদ্ভক্তি, তা'তেই আনুষঙ্গিকভাবে সব আছে। ভগবদ্ভক্তি পরমা নীতি। ভগবদ্ভক্ত স্বপ্নেও দুর্নীতি-পরায়ণ হন না।

জগতের লোক কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত বিচার করে রেখেছে। তারা পরমেশ্বরের সেবাকে সকলের শেষে--হ'লে হ'লো, না হ'লে না হ'লো, আর হ'লেও গৌণভাবে হউক,--এরূপ বিচার করে রেখেছে। অনেকে নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মুখে ভগবানকে স্বীকার করেন, ভগবান্ যেন তা'দের সুবিধাবাদ-জননী-নীতির সরবরাহকারী খানসামা! নীতির জন্য ভগবান্, ভগবানের সেবার জন্য ভগবান্ নহেন। নীতির জন্য ভগবান জিনিষটা আমার খিদ্‌মদ্‌গার। আমি সুনৈতিক হ'য়ে জগতে নীতি ভোগ করতে পারব, আমি সংযমী, পবিত্রাত্মা ব'লে প্রতিষ্ঠা নিতে পারব বা ঐ পবিত্রতাকে ভোগ করতে পারব, এই জন্যই আমার মাঝপথে সাময়িক ও মৌখিক ভগবান স্বীকার; চরমে কিন্তু আমি তাঁকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ ক'রেই রেখেছি! আর ভগবদ্ভক্তের ভগবান---নিত্য অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান---ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্যই ভগবান্। যা'রা ভগবানের ইন্দ্রিয় তর্পণ করেন, তাদের মধ্যে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণকে কেন্দ্র ক'রে যত প্রকার দুর্নীতি বা নিরীশ্বর নীতি জগতে প্রকাশিত হয়, সেগুলি তাঁদের মধ্যে নাই; নিখিল সৎনীতি, পবিত্রতা, সংযম, সমাচার, তিতিক্ষা, অমানি-মানদত্ব ও সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ গুণ তাঁদের সেবা কর্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব।

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ।।

(স্কন্দপুরাণ)

হে ব্যাধ, তোমার যে অহিংসাদি গুণ হ'য়েছে, তা অদ্ভুত নয়, কেন না, যারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তাঁ'রা অন্যের ক্লেশদ হয় না।

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্‌ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।।

(ভাঃ ১১।৫।৪২)

(যিনি অন্যভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বয়ং হরির পাদমূল ভজন করেন সেই কৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তির যদি কখনও বিকর্ম্ম (পাপ) কোন প্রকারে উৎপত্তি হয়, পরমেশ্বর হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সেই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন)।

এইরূপ একটা দিক নয়, অসংখ্য দিক থেকে দেখান যেতে পারে যে নিরীশ্বর নীতি বা নীতির অধীন ঈশ্বর কল্পনা নাস্তিকতা মাত্র। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণের দ্বারা

তাড়িত ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, তাঁদের তিনজনের তিন প্রকার গুণের উপযুক্ত ভাগ পাওয়া দরকার। ভাল বা সৎ ব'লে যে জিনিষটা বলা হয় অর্থাৎ যা' সত্ত্বগুণের ক্রিয়া তা'কে রজঃ ও তমোগুণের সংখ্যাগরিষ্ঠ-দল ব'লে থাকেন, ২/৩ ভাগকে বঞ্চনা ক'রে ১/৩ ভাগ প্রভুত্ব স্থাপন করবে, ইহা কিছুতেই সহ্য করা যাবে না। তখন সংখ্যালঘিষ্ঠ এক তৃতীয়াংশের প্রতি কা'রো কা'রো করুণার উদ্রেক হয়। এঁরা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। তখনই শাক্যসিংহ, কপিল তা'দের সেই মতবাদ নিয়ে উপস্থিত হন।

পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজত্বকালে সব ভাল হ'য়ে যা'বে যখন ইহা কলি শুনতে পেল, তখন সেও তা'র কিছু ভাগ আদায় করবার জন্য পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট কাতর প্রার্থী হ'লো,—

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ং সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ।।
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোহনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্।।
অমূনি পঞ্চ স্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ।।
(ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪০)

দ্যূত, পান প্রভৃতির Exchange value আছে জাতরূপে। সেই জাতরূপ পাঁচটি সন্তান প্রসব কর্‌লে—(১) মিথ্যা, (২) মত্ততা, (৩) কাম, (৪) ক্রোধ, ও (৫) শত্রুতা।

যদি আলাদা ক'রে দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা প্রভৃতি পরিত্যাগ করবার চেষ্টা হয় তা' হলে সুবিধা হ'বে না। এদের মূল কোথায়? মূল মালিকের সঙ্গে পরিচয়ের দরকার। All-pervading (বিষ্ণু) মূল মালিক ভুল হয়ে গেলেই যত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তখনই আমরা ন্যূনাধিক নাস্তিকতার চিন্তাস্রোতের কৃষ্টি সাধন করি এবং মনে করি যে, আস্তিকতার কথা ত' একঘেয়ে কথা। যে-কাল পর্য্যন্ত "যত বা ইমানি ভূতানি"—এই শ্রুতিমন্ত্র স্বীকৃত না হয়, সেকাল-পর্য্যন্ত সুবিধা হয় না।

এক শ্রেণীর লোক এক প্রকার গুণ-তাড়িত হ'য়েছে, আর এক শ্রেণীর লোক অন্যপ্রকার গুণ-তাড়িত হ'য়ে কাজ করছে, যেখানে পাঁচজন মিলে পঞ্চায়িতী কাজ হচ্ছে, সেখানে লোকপ্রিয়তাই পরমেশ্বর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পাঁচজনে পঞ্চদেবতা সৃষ্টি করেছে। এই সকল বারোয়ারী মতবাদ আধ্যক্ষিকতা—রাবণের সিঁড়ি বাঁধার প্রণালী।

অনেকে বলেন,—নীতিশাস্ত্র প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের মূল কোথায়? নীতি কোথা হ'তে এসেছে? নীতির ডগমা (dogma) ডিকটেট্‌স্‌গুলি (dictates)

অসুবিধা করবে—যদি নীতির মূল মালিকের অনুসন্ধান না করার দরুণ জগৎসর্ব্বস্ববাদীর বড়ই অসুবিধা হচ্ছে।

হাজার লোক হাজার ধরণের প্রস্তাব এনে ফেলেছে। মূল আকর বস্তুর প্রতি প্রীতির আভাষ থাকলে হাজার লোকের হাজার প্রস্তাবের প্রতি বেশী আদর হয়। মূল আকর বস্তুর প্রীতি সাধন কর্ত্তব্য হ'লে অসংখ্য জীবের অসংখ্য কামনা-পরিতৃপ্তি অধিক ব'লে মনে হয় না এবং ভগবৎপ্রীতি সাধনের দ্বারাই সমস্ত জীবের প্রকৃত কামনার তৃপ্তি হয়, —একথা বুঝতে পারা যায়।

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা মনোরথং পুরয়িতুং সমর্থঃ।
অন্যেন দত্তং ক্ষিতিপেন কিঞ্চিৎ শাকায় বা স্যাৎ লবণায় বা স্যাৎ।।

আধুনিক বহির্মুখ জগৎ এতদূর তমোগুণাশ্রিত হইয়াছে যে সেখানে রজোগুণের দাম্ভিকতাই "পরমধর্ম্ম" বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এইরূপ রজোধর্ম্মের দুই একজন বক্তা বর্ত্তমানযুগে জনপ্রিয়ধর্ম্মের নায়ক ও প্রামাণিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা পাশ্চাত্যদেশের রজোগুণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং ভারতীয় মনোধর্ম্মের সহিত পাশ্চাত্যদেশীয় রজোগুণের আদর্শকে মিশ্রিত করিয়া জনপ্রিয় মতবাদ প্রচার করিয়াছে।

রজোগুণোন্মত্ত প্রবৃত্ত-ধর্ম্ম-প্রচারকগণ পরার্থিতা বা altruism-এর প্রচারক হইয়া মানবজাতির খেয়ালের অনুবর্তী হইয়াছে। কিন্তু মানবজাতির পায়ে জুতা পরাইতে গিয়া তথাকথিত পরার্থিসম্প্রদায়কে 'গরু মারিয়া জুতা দান' করিতে হইয়াছে। জগতে যাঁহারা দারিদ্র্য, মূর্খতা, কিম্বা অস্বাস্থ্যপীড়িত হন, তাঁহাদের ঐ সকল সাময়িক ক্লেশ শান্তির জন্য পরার্থিসম্প্রদায় নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠান উন্মোচন করিয়াছেন। পরার্থিগণ এই প্রবৃত্তধর্ম্মে প্রণোদিত হইয়া হয়ত 'পাস্তুর চিকিৎসালয়' (Pasteur Institute) উন্মোচন করিলেন। এই কার্য্য প্রশংসাকর সন্দেহ নাই। কিন্তু গবেষণাগারে কোন একটি ঔষধের সাফল্য নিরূপণ করিতে গিয়া হয়ত অনেকগুলি প্রাণীকে হত্যা করিতে হইল। রুগ্ন ব্যক্তির জন্য chiken broth-এর ব্যবস্থা করিতে গিয়া অনেকগুলি প্রাণীকে হত্যা করিতে হয়। মানুষের উপকারের জন্য monkey gland লইতে গিয়া বানরের প্রতি অত্যাচার করা হয়। আবার ইহাদের বিচারের প্রতিযোগী অপর এক বিচারে কোন কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ইতর প্রাণীর প্রতি অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া মনুষ্যজাতির প্রতি নির্দ্দয় হইয়া থাকেন। তাঁহারা ছারপোকাকে খাদ্য জোগাইবার জন্য 'খাটমল খিলাই'বার ব্যবস্থাকে 'পরোপকার ধর্ম্ম' বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ utility বা প্রয়োজনীয়তার তারতম্য-বিচার প্রদর্শন করিয়া বলিতে পারেন যে, একটি গরুকে মারিয়া যদি অনেকগুলি লোকের জুতা প্রস্তুত করা যায় এবং তাহাতে অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ জীবের উপকার বা ভোগ হয়, তাহা হইলে সেরূপ গোহত্যা কিছু অসমীচীন নহে। এজন্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের মতবাদ-বিশেষে ইতর প্রাণীর আত্মা স্বীকৃত হয় নাই।

মানবজাতি অপস্বার্থপর হইয়া পশুজাতির প্রতি এবং পশুজাতি অপস্বার্থপর হইয়া মানবজাতির প্রতি যদি এরূপ খাদ্যখাদক ও ভোগ্যভোক্তা-সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং সেই পরস্পর অপস্বার্থপরতাকে পরার্থিতার প্রলেপ দ্বারা মহীয়ান্ করিয়া তুলিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে সেরূপ পরার্থিতা অন্যদিকে নিরীক্ষর শিক্ষা বা নীতিরই পক্ষ সমর্থন করিল। যাঁহারা পরমেশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে সন্তুষ্ট নহেন, যাঁহারা ন্যূনাধিক ভোগবাদে প্রমত্ত, তাঁহাদের মধ্যে পরার্থিতার নামে ঐরূপ নাস্তিক্যনীতি 'ধর্ম্ম' নামে স্বীকৃত হয়। বস্তুতঃ এই পরার্থিতা পরস্পর দফারফা করিয়া সুবিধাবাদের অনুসন্ধান মাত্র।

তথাকথিত পরার্থিতার আর একটি অসুবিধা এই যে, তাহা স্ব-স্ব স্থায়ী মঙ্গলের জন্য আমাদিগকে চেষ্টান্বিত হইতে বাধা প্রদান করে। পরার্থিগণ theistic education-এর উপর আক্রমণ করিয়া থাকে। যদিও তাহারা মনে করে যে তাহারা খুব আস্তিক, তথাপি তাহাদের সেই আস্তিকতার মুখোস কেবল অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য। বহির্ম্মুখ জীবের ভোগবর্দ্ধন বা ভোগের অভাবপূরণই তাহাদের মতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক ও পরমধর্ম্ম। কিন্তু বহির্ম্মুখতার এই অভাব-পূরণের দ্বারা নিজের ও পরের কতটা মঙ্গল হইতে পারে?

কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি হয়ত মনে করিলেন যে, কোন ব্যক্তি বিশেষের একশ মণ সোনা আছে। তাহার বাড়ীর কাছে ৫০০ ফিট একটি গর্ত্ত হইয়াছে। সেই ব্যক্তি কিরূপ মূর্খ যে তাহার একশ মণ সোনা সেই গর্ত্তের মধ্যে ঢালিয়া উহা ভরাট করিতেছে না। আমরা সোনা দিয়া গর্ত্ত-পূরণের প্রণালী গ্রহণ না করিয়া সোনার অতি সামান্য অংশ-দ্বারা তামার পয়সা কিনিয়া তদ্দ্বারা মাটি কিনিয়া ঐ গর্ত্ত ভর্ত্তি করিব। আমরা আমাদের হরি-ভজনের সময় কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে নষ্ট করিতে পারি না। পাপ ও পুণ্যকার্য্য করিবার সময় আমাদের নাই।

জগন্নাথ দর্শন করিয়া রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলেন যে, তাঁহাদেরও সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি বিশিষ্টের ন্যায় প্রত্যেকের এক তৃতীয়াংশে অধিকার আছে। কেবল সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির প্রাবল্য হইতে পারে না। তথাকথিত সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি যে অবিমিশ্র, তাহা নহে। রজোগুণের দ্বারা তমোগুণকে নিরাস করিয়া আবার সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণকে নিরাস করিতে হইবে। সত্ত্ব-অর্থে অধিষ্ঠান বুঝায়। সত্ত্বের অবস্থান পরিবর্ত্তনশীল নহে। আর রজস্তমোগুণ পরিবর্ত্তনশীল। যাহারা রজস্তমোগুণ-তাড়িত, তাহাদের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন,—

নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা।।
(ভাঃ ১০।৬৮।৩১)

(২)

আমরা মানুষ। 'মানুষ' ব'ল্‌লে আমরা যা' বুঝি, তা'তে একদিকে মানুষের অভাব যে-সকল প্রাণীতে আছে, তদপেক্ষা উন্নত জাতিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষ ব'লে মনে করি। অপরদিকে 'মানুষ' ব'ললে 'দেবতা' প্রভৃতি বুঝায় না। আমরা তাঁ'দের চেয়ে কমশক্তিবিশিষ্ট শ্রেণীবিশেষ মনে করি।

এই মানুষের কৃত্য-বিচারে আমরা লক্ষ্য করি যে, তাঁ'রা স্থান, কাল ও পাত্রের বিষয়ে আলোচনা অধিক করেন। জাগতিক অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের তুলনামূলক আলোচনায় দেখতে পাই যে, ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা অধিক। আবার দেবতাগণের সহিত মানুষের তুলনামূলক আলোচনায় দেখ্‌তে পাই, দেবতাগণ মানুষ অপেক্ষা অধিক সুখস্বচ্ছন্দে বাস করেন, তাঁরা অধিক দিন ভোগ ক'রতে পারেন; কিন্তু সেই দেবতাগণের যে-সমস্ত অসুবিধা আছে, তা' অপেক্ষাও মানুষের আবার বিশেষ সুবিধা আছে। দেবতারা জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী-দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে সেই সকলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যত্ন করেন; তাঁরা মানুষ অপেক্ষা অধিক ভোগ সমৃদ্ধ করেন ব'লে আমরা তাঁ'দিগকে বড় মনে করি; কিন্তু মানুষের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, তাঁ'রা দেবতার ন্যায় অতি বড় না হওয়ার দরুণ তারতম্যগত মঙ্গল-চিন্তা করবার অধিকার লাভ ক'রেছেন। মানুষও দেবতার অনুকরণে জন্ম, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাকলে নিজের মঙ্গলের চিন্তা ক'রতে পারেন না।

তা' হ'লে কি ঐসকল অর্থাৎ জন্মৈশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগের দ্বারাই সুবিধা হ'বে? ধীর প্রকৃতির ব্যক্তিগণ এমন একটা পরম মঙ্গলজনক লাভে লাভবান্ হ'তে পারেন—যে লাভ একমাত্র মনুষ্যজীবনেই বিশেষরূপে সম্ভব।

মনুষ্যজীবনে নানাপ্রকার অসুবিধা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে জাগতিক লাভের ক্ষণ-ভঙ্গুরতার কথা জানিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু দেবতাদের অপেক্ষাকৃত নিরবচ্ছিন্ন ভোগময় জীবনে এই সকল ক্ষণভঙ্গুরতা সহজে উপলব্ধি হয় না। এরূপ মনুষ্যজীবন লাভ ক'রে আমাদের যথেষ্ট অবকাশ হ'য়েছে, যা'তে ক'রে আমরা নিজের মঙ্গল বিধান ক'রতে পারি—কোন্‌টি মঙ্গল, কোন্‌টি অমঙ্গল, তা' জান্‌তে পারি।

ঐকান্তিক মঙ্গলের স্বরূপ না জানার দরুণই মতভেদ উপস্থিত হয়। যাঁরা আগন্তুক ও সাময়িক মঙ্গলের জন্যই রুচিবিশিষ্ট, তাঁ'রা ঐসকল সাময়িক মঙ্গলকে কখনও ঐকান্তিক মঙ্গল মনে ক'রে বাস্তব পরমমঙ্গল হ'তে দূরে থাকেন, কখনও বা ঐকান্তিক মঙ্গলের সন্ধানকে সঙ্কীর্ণতা মনে ক'রে ভ্রান্ত হন।

এস্থান অভাবের রাজ্য। এখানে অভাব-পূরণের জন্য যত্ন স্বাভাবিক। যখন অভাব-পূরণের সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা ব্যস্ত হই, তখন নানাস্থান হ'তে বহু প্রস্তাব

এসে উপস্থিত হয়। নিজ নিজ বহির্ম্মুখ রুচির নিকট সেই সকল প্রস্তাবের যেগুলি পছন্দসই হয়, আমরা সেইরূপ কোন একটি প্রস্তাবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করি। কিন্তু বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান মানবজাতির একথা জানা দরকার, যে কেবল অভাব-পূরণের দ্বারাই অভাবের প্রকৃত পূরণ হয় না। অভাব পূরণের পরও আরও কিছু প্রয়োজন আছে। সেই অভাবটি পরিপূরিত না হ'লে অভাবের প্রকৃত পূরণ হ'তে পারে না। ত্রিতাপের ক্লেশ, জগতের নানাপ্রকার অসুবিধা, শারীরিক ও মানসিক শান্তির অভাব পূর্ণ হ'লেই সব শেষ হ'ল না—ত্রিতাপমুক্তি হ'লেই সব কথা শেষ হ'য়ে গেল না, ঐসকল অভাবমুক্তির পরে যে পরম প্রয়োজন আছে, সেই বাস্তব প্রয়োজনের অনুসন্ধান আবশ্যক।

ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে আধ্যক্ষিকগণ নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যে-সকল অনুষ্ঠান বা চেষ্টার কল্পনা ক'রেছেন তা'দিগকে বলা যায়—বুভুক্ষা বা ভোগানুসন্ধিৎসা। কর্ম্মের কর্ত্তা যদি ভাল কাজ করেন, তবে তিনি সুবিধা পাবেন। সেই কর্ত্তা আমি, আমরা, তুমি, তোমরা বা সে, তাহারা হ'তে পারে। একজনের বিচারের সহিত আর একজনের বিচারের মিল নাই। বুভুক্ষা হ'তে যে-সকল প্রস্তাবিত মত র'য়েছে তা'তে মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও তা' হ'তে হিংসা, মৎসরতা নিয়তই প্রসূত হ'চ্ছে।

যাঁ'রা এই হিংসার রাজ্য প্রবর্দ্ধন ক'রে কর্ম্মবীরত্বের চাপরাস গ্রহণ কর্‌তে প্রস্তুত হ'য়েছেন, তাঁ'দের ও তদনুগামীগণের ভোগের ইচ্ছা দিন দিন বর্দ্ধিত হ'তে থাকে। যখন তাঁ'রা সেই ভোগে অকৃতকার্য্য হন, তখনই তা'দের মনে হয় নিজেন্দ্রিয়তর্পণ আর ক'রব না। তখন তাঁ'রা পরার্থিতার আবশ্যকতা অনুভব করেন। সেই পরার্থিতা অপর জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণের সজ্জায় নিজেন্দ্রিয়তর্পণ পিপাসু আমিত্বের বিস্তার মাত্র। তা' অপরের ইন্দ্রিয়তর্পণের মুখোসে প্রচ্ছন্ন নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির কর্ম্মবীরত্ব মাত্র।

আমরা অপর বক্তির নিকট পর বা অপর। এজন্য পরার্থিতার প্রেরণা আমাদের হৃদয়ে উদ্ভূত হয়। আমি যখন অপরের নিকট পর, তখন অপরের অর্থী হ'লে অর্থাৎ অপরের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ক'রলে অপরেও আমাকে পর জেনে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ক'রবে। আমিও স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে অপরের পরার্থিতা দ্বারা সেবিত হ'তে পারব। এই পরার্থিতার মুখমণ্ডলের অবগুণ্ঠণ সরিয়ে দেখলে পরস্পরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভোগের বাটোয়ারা বন্দোবস্ত বা চুক্তি দেখতে পাওয়া যায়।

অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের তাৎপর্য্য ও মূলমন্ত্র—মানুষের শারীরিক ও মানসিক হিতসাধন। কিন্তু ইহা দ্বারা দু'টি অসুবিধা বা স্বার্থপরতা উপস্থিত হ'তে পারে। কেবল মানুষের হিতসাধন ক'রতে গিয়ে আমরা পশুকুল বা অন্যান্য প্রাণীর অমঙ্গল করি। আবার কেবল অন্যান্য প্রাণীর শারীরিক মঙ্গল ক'রতে গিয়ে মানুষের শারীরিক ও

মানসিক অমঙ্গল ক'রে থাকি। যেমন মানুষের শরীর পুষ্টির জন্য ছাগলাদ্য ঘৃত প্রস্তুত ক'রতে গিয়ে ছাগলের শারীরিক অমঙ্গল বিধান করি; আবার জৈনগণের ন্যায় 'খাটমল খিলা'তে গিয়ে অর্থাৎ মানুষের রক্তের দ্বারা ছারপোকার শারীরিক পুষ্টি সাধন ক'রতে গিয়ে মানুষের শারীরিক অমঙ্গল বিধান ক'রে থাকি। যদিও কর্ম্মের রফাদফার মধ্যে খাটমল খিলা'বার জন্য মানুষকে তা'র প্রাপ্য বেতন বা ভাড়া দিয়ে পন্থানীতি অবলম্বন করি, তথাপি উহা দ্বারা মানুষের বা ইতরপ্রাণীর কা'রও কোন প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয় না।

জাগতিক পরার্থিতার দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে, অপর মানুষের দৈহিক ও মানসিক উপকার ক'রতে গিয়ে আমরা নিজের ও অপরের চেতন বা আত্মার নিত্যমঙ্গলের প্রতি উদাসীন হই। নিজের বা অপরের কিরূপে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল হ'বে, তার আলোচনা করি না। দেহ ও মনের স্থূল আবরণই আমাদের চিন্তারাজ্যের উপর রাক্ষসের ন্যায় চেপে বসে। ঐ দুই আবরণে আবৃত হ'য়ে ও সেই মাদকতায় মত্ত হ'য়ে আত্ম-মঙ্গলের পথকে রুদ্ধ করি। সময় সময় মুখে আত্মমঙ্গলের বুলি আওড়া'লেও সাধারণ নৈতিককর্ম্ম এবং খুব জোর নির্ব্বিশেষ-গতি পর্য্যন্ত বিচার আমরা বুদ্ধিবলে ভেবে উঠতে পারি। কিন্তু এই নির্ব্বিশেষ-গতি যে আত্মহত্যা ও অপর জীবহত্যাস্বরূপ হিংসার কার্য্য, তা' বুঝতে পারি না। অপরের নিকট হ'তে পরার্থিতা প্রাপ্তির প্রচ্ছন্ন আশায় আমরা পরার্থী হই বটে, কিন্তু এরূপ পরার্থী হ'য়ে পরঘাতক ও আত্মঘাতক হ'য়ে থাকি। বুভুক্ষার প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি কিরূপভাবে আমাদিগকে বঞ্চনা ক'রে আমাদিগকে নি'য়ে ছিনিমিনি খেলছে তা' মায়াদেবী বুঝতে দেয় না।

জাগতিক ক্ষণভঙ্গুরতা-ধর্ম্মে প্রণোদিত হয়ে পরার্থিতা, সৎকর্ম্ম, জগতের উপকার প্রভৃতির আবাহন অপেক্ষাও অনেক উন্নততর কার্য্য হ'তে পারে। কোন কোন সময় কিছু কিছু লাভজনক বা আলোকময় ব্যাপার উপস্থিত হ'লেও বহির্ম্মুখতা নিত্য ও অনিত্য বিচারের মধ্যে বিষাক্ত বিচার-ভ্রান্তির বীজ সঞ্চারিত করে দেয়। তখন বিচিত্রতা স্তব্ধ করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বিষয় মনে করি, যত কিছু জ্ঞেয় বিচার আছে, তা'র পরিসমাপ্তি প্রয়োজনীয় মনে হয়। যেরূপ ঢাকের বাদ্য থামলেই মঙ্গল, অথচ মাঝপথে কিছুটা ঢাক বাজাইয়া লই। অতএব পূর্ণতা ও কালের নিত্যতার কথা যখন হৃদয়ে এসে উপস্থিত হয়, তখন অখণ্ডকালের দ্বারা মঙ্গললাভ হ'বে মনে করি। এই অখণ্ডকালের ধারণা ক'রতে গিয়ে নিজের অস্তিত্বকে মহাকালের মধ্যে বিলীন ক'রতে চাই, ইহাই আমাদের ন্যায় আধ্যক্ষিকগণের বিচার।

শাক্যসিংহ বা নিরীশ্বর কপিল যেখানে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বা যেখানে প্রকৃতিতে লীন হ'য়ে যাওয়ার ভূমিকা, সেই স্থানই প্রাপ্য ভূমিকা হউক ও তথায় চেতনধর্ম্মের অভাব সমস্ত সুখ-দুঃখের অনুভূতিকে স্তব্ধ ক'রে দি'ক — এরূপ বিচার অবলম্বন ক'রে

থাকেন। কর্ম্ম ক'র্তে যখন ক্লান্তি উপস্থিত হয়, তখন বোধরাহিত্য অবস্থাকেই আমরা কাম্য মনে করি।

ব্যবহারিক জগতে যেমন বিভিন্ন দোকানের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেরূপ ধর্ম্ম জগতেও বিভিন্ন বিচারযুক্ত দোকান আছে। কারো যদি হোগলার দরকার হয়, তা'কে যদি চূণ-সুরকির দোকানে নিয়ে যাওয়া যায়, তা' হ'লে তা'র প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। গরীব লোক হোগলা দিয়ে কুটির তৈরী ক'রছে, বড়লোকের অট্টালিকার মাল-মশলা দিয়ে তা'র কোন প্রয়োজন নাই।

মানুষের প্রয়োজন বিভিন্ন। কারো আমের দরকার, কারো উচ্ছের দরকার। আবার. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জিনিষের দরকার। কখনও মশারী টানার পেরেকের দরকার, কখনও দুগ্ধের দরকার।

রথ চাইল্ড ব'লে একজন খুব ধনী ব্যক্তি তা'র অর্থ ভাণ্ডারের চাবি তা'র নিজের কাছে রাখতেন, কাউকে বিশ্বাস ক'র্তেন না। অর্থ ভাণ্ডারে ঢুকে একদিন ঘটনাচক্রে চাবিটি হারিয়ে ফেলেন। সেখানে অনেক Coins ছিল, Currency note ছিল; কিন্তু ক্ষুধা-নিবৃত্তি বা পিপাসার জল ছিল না। রথ চাইল্ড অর্থ ভাণ্ডারের মধ্যে একবিন্দু জল পান ক'রতে না পেয়ে মারা যান।

এই পৃথিবীতে বহু লোকের বহু প্রকার দরকার। একান্ত পরমার্থের দরকার সকলের নাই। সকলেই মনে ক'রছেন, আপাততঃ যে অভাব, যে অসুবিধা, যে প্রয়োজন প'ড়েছে আগে সেই দরকারের দিকে দৃষ্টিপাত কর। কেউ আবার মনে ক'রছেন, রাতদিন কেন কেবল জিনিষের অনুসন্ধানে বেড়াব? এজন্য কেউ পঞ্চতপা হ'চ্ছেন, হঠযোগী হ'চ্ছেন, কেউ বায়ু ভক্ষণ ক'রে থাকছেন। সুতরাং এজগতে যা ধর্ম্ম নামে চ'লছে; তা ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচির সরবরাহকারী দোকান মাত্র।

ধর্ম্ম হচ্ছে ধারণা। নিত্য ধারণা ও অনিত্য ধারণা—দু'রকমের ধারণা। 'গোলে হরিবোল দেওয়া' দলে মিশে সব দোকানেই জিনিষ পাওয়া পাওয়া যায় ব'লে চীৎকার করলেই সে কথা সত্য হ'য়ে যাবে না। ধর্ম্মের যিনি মূল প্রস্রবণ (Fountain head), যিনি মূল মালিক, তার মনোঽভীষ্ট কি, তাঁর ধর্ম্ম কি, তা' যদি না জেনে আমরা মনগড়া মত বা রুচির সামগ্রীকে 'ধর্ম্ম' মনে করি, আর সেরূপ বহির্ম্মুখ ধারণাকে সমষ্টির বহির্ম্মুখ ধারণার সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে নিয়ে ধর্ম্মমত ব'লে চালাই, আর বলি সকল ধর্ম্মই সমান এবং আমার বা আমাদের মনগড়া ধর্ম্মই ঠিক্ তা' হ'লে প্রকৃত-ধর্ম্মের ধারণা হ'লো না।

বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বিভিন্ন স্থানের টিকেট কিনেছে। দিল্লীতে পাহাড়ের উপরে ৪ প্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কিংবা সমতলভূমির উপর আরও ২০ প্রকার সম্প্রদায় বা প্রাচ্য পাশ্চাত্য দার্শনিক বা মনীষিগণের পুস্তকে আরও ২০০ প্রকার ধর্ম্মের কথা আছে

কিংবা Parliament of Religion (ধর্ম্ম মহাসভায়) বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মতামতের তুলনাও আলোচনা হ'চ্ছে ব'লে সকল ধর্ম্মই এক বা ঐ সকল মনোধর্ম্মের কোন বিশেষ ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম বিচার ক'রলে প্রকৃত ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যাবে না।

কতকগুলি লোক নির্জ্জন-বাদী, কতকগুলি লোক স্বজনবাদী, কতকগুলি লোক সর্ব্বজনবাদী, কতকগুলি লোক সাধুজন-পক্ষপাতী। নির্জ্জনবাদ, স্বজনবাদ ও সর্বজনবাদের মধ্যে যদি সাধুজন বাদ প'ড়ে যায়, তা'হলে সে সকলই দুঃসঙ্গ। কেউ পরমান্ন প্রস্তুত ক'রেছেন; যদি কোনও শুভানুধ্যায়ী এসে বলেন,—"আপনার গৃহে চূণ, সুর্‌কি, কাঁকর আরও কত জিনিষ র'য়েছে, সেগুলিকে বর্জ্জন ক'রে আপনি কেন কেবলমাত্র দুগ্ধ, অন্ন ও মিশ্রিকে উপকরণ রূপে গ্রহণ ক'রছেন? এতে আপনার অনুদারতা প্রকাশিত হয়েছে।" তা' হ'লে যাকে ঐ প্রশ্ন করা হ'চ্ছে তিনি বুদ্ধিমান্ হ'লে উত্তর দিবেন,—"আমি চূণ, সুরকি, কাঁকর এনেছি বাড়ী গাঁথ্‌বার উদ্দেশ্যে, আর পায়স প্রস্তুত ক'রেছি ভোজনের উদ্দেশ্যে, উভয় প্রয়োজনই ত' ভিন্ন।"

যা'দের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষকামনার প্রয়োজন প'ড়ে গিয়েছে, তা'দের কৃষ্ণ-প্রেমার প্রয়োজন ত' পড়ে নাই। অধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বাসনা—এই চার প্রকার কামনার দলের লোক অনেক—পৃথিবীর প্রায় সকলেই। এরা পঞ্চায়েতের দল। কিন্তু প্রেম একাকী অসমোর্দ্ধা। পঞ্চায়েতের দলের প্রয়োজন আর প্রেমার জন্য সচেষ্ট লোকের প্রয়োজন সম্পূর্ণ পৃথক্। পঞ্চায়েতের সঙ্গে প্রেমার যাবতীয় ব্যক্তিগণের একাকার বা সমন্বয় কি ক'রে হ'তে পারে? অনর্থ ও অর্থে সমন্বয়, জড়ে ও চেতনে সমন্বয় কি ক'রে হতে পারে? অনর্থে ও অর্থে সমন্বয়, জড়ে ও চেতনে সমন্বয়, গোলে হরিবোল দেওয়া চলতে পারে কি? যে যে জিনিষের যে যে ব্যবহার, তা' ক'রতে আমরা প্রস্তুত আছি। যে জিনিষ যে জিনিষের সঙ্গে Perfectly dovetailed ক'রবে (সম্পূর্ণভাবে খাপ্ খাবে) তা'কে গ্রহণ ক'রতে প্রস্তুত আছি। এজন্য ভগবান্ ব'লেছেন,—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।"

স্বীয় স্বভাব হইতে সঙ্গের কারকতায় রুচির উৎপত্তি হয়। অনাদি-বাসনা হইতে স্বভাব গঠিত হয় এবং সঞ্চিত অজ্ঞাত বাসনার দ্বারা পুষ্ট হইয়া সেই জীবস্বভাব অজ্ঞাতভাবে স্বীয় উপযোগী সঙ্গ লাভ করে। প্রাকৃত-বাসনা প্রকাশমান জগতে নবীন-কর্ম্ম-প্রারম্ভকে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস পায়; কিন্তু অজ্ঞাত বাসনা তাহার অনুকূল হইলে প্রাকৃত-জগতে অভিলাষমত সিদ্ধি প্রদান করে। প্রাক্তন-বাসনা অনেক সময়ে প্রকাশমান-বাসনাকে প্রতিহত করে। এই পরস্পর সঙ্ঘাতেই ভেদ-জগতে অপ্রীতির উদয় করায়। বাসনাই যে ভবরোগের মূল, তাহা জগতের সকল শ্রেণীর প্রবুদ্ধগণের বিশ্বাস। বাসনা-বিনাশই জীবমাত্রের বৃত্তি। মানবের যাবতীয় ক্রিয়াই বাসনা-তৃপ্তির জন্য। বাসনা-মাত্রই বিনাশ প্রাপ্ত না হইলে তৃপ্ত হয় না। পারমার্থিকগণ স্বীয় বাসনাকে

যে যেরূপভাবে খর্ব্ব করিতে পারিয়াছেন, তিনি তাঁহার চরিত্রে বাসনা-বিনাশের ততই সুখকর বর্ত্ম দেখাইতে পারিয়াছেন।

লৌকিক বিবেক সম্বল করিয়া এই বাসনা লইয়া খেলা করিতে গিয়া জগতে মনুষ্যের ত্রিবিধ আচার পরিলক্ষিত হয়। লৌকিক আচারিগণের মধ্যে অভিলাষসেবকের সংখ্যাই অতি বহুল। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বাসনাকে সুবৃহৎ করিয়া বাসনা-তৃপ্তিকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। আমার অস্তিত্ব-জ্ঞানই আমার প্রীতির উদ্দেশক। যাহাতে আমার মুখ্য বা গৌণভাবে স্বার্থ-লাভজনিত প্রীতি নাই, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। নরের প্রকাশের প্রথম দিন হইতে অন্তকাল পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই এই বাসনা-জাত প্রীতির অনুসন্ধান সকল প্রাণীতেই লক্ষিত হয়। যে-ক্ষণেই মানব স্বীয় অস্তিত্ব অনুভব করেন, সেই ক্ষণেই অনুভবই তাহাকে অনুভূত আনন্দের দিকে লইয়া যায়। ক্রমে-ক্রমে অভিলাযজাত বৃত্তি-সমূহ সঙ্গগুণে সমৃদ্ধ হইতে থাকে। দৃশ্যপদার্থের অনুশীলনে চক্ষু ব্যস্ত হইয়া উঠে, শ্রোতব্য পদার্থের উদ্দেশে কর্ণের ক্রিয়া দেখা যায়, গন্ধ-সংগ্রহের জন্য নাসিকার বৃত্তি উন্মুখ হয়, রস-গ্রহণের জন্য জিহ্বার চেষ্টা বুঝা যায় এবং স্পর্শানুভূতির জন্য ত্বকের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বাক্, পাণি, পাদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহ চক্ষু-কর্ণাদি বৃত্তির সহায়ে স্ব-স্ব উপযোগী কর্ম্ম-সমূহের অভিব্যক্তি করে। অস্তিত্বানুভূতির সমৃদ্ধি-বলে উদ্দেশ্যের স্বরূপানুভূতি প্রাণীমাত্রেরই সেই একমাত্র স্বীয় আনন্দেই পর্য্যবসিত হয়। মানব তখন সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। প্রাকৃত-জগতের ভোক্তৃস্বরূপ অহঙ্কারে প্রণোদিত হইয়া কর্ম্মারম্ভ করেন। প্রাক্তন-বাসনা-দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া প্রতি-পদেই তাঁহাকে এক অভিলাষ হইতে অপর অভিলাষের আশ্রয়ে ভ্রমণ করাইতে থাকে।

প্রকাশমান বাসনা যে-স্থলে প্রাক্তন বাসনা দ্বারা প্রতিরুদ্ধ না হয়, তৎকালাবধি জীব বাসনা-দ্বয়ের প্রীতিতে প্রীতি লাভ করেন। যে-স্থলে বাসনাদ্বয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাব, তথায় অপ্রীতি লাভ করতঃ প্রীত্যনু-সন্ধিৎসু-জীব সেই বিফল-নাম বাসনা-পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া অপর পুত্রোৎপত্তির চেষ্টায় ব্যস্ত হন। কোথায়ও বা বাসনানুকূল পুত্রফল লাভ করিয়া প্রাকৃত-বিষয়ে প্রোৎসাহিত হইয়া বহু ফল-লাভে যত্ন করেন। অভিলাষ-সহকারে প্রবৃত্ত-মানব স্বীয় প্রাক্তনবাসনার বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত-বাসনার বল-সমূহ প্রয়োগ করিতে থাকেন। এই যুদ্ধই অভিলাষিতাযুক্ত প্রীতির অনুসন্ধান। লৌকিক-বুদ্ধি হইতে অপ্রাকৃত-বুদ্ধি এই স্থলে বিরোধ করে। যে-কাল-পর্য্যন্ত অভিলাষ-দূষিত-বুদ্ধি প্রবল থাকে, তৎকালে উহা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য অপ্রাকৃত-বৃত্তিকে থাকিতে দেয় না। লৌকিক-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া মানব বাসনাজাত জড়ীয় সরলতার আশ্রয়ে অপ্রাকৃত-বুদ্ধির সংজ্ঞা করিবার জন্য চঞ্চলতা প্রকাশ করেন। সেই চাঞ্চল্য-বশে তাঁহার জড়ীয় সরলতারূপ মূর্খতা তাঁহাকে বঞ্চিত-দলে স্থাপন করে। দুর্ভাগা প্রীতির দাস প্রীতির জন্য

অপ্রাকৃত নির্ণয় করিতে গিয়া বাসনাজাত অভিলাষিতা-শূন্য-অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া জড়ীয় অপ্রীতির ঘোরতর অন্ধকারে পড়িয়া যান। অভিলাষিতা-শূন্য-অবস্থা তাঁহার সরল-বুদ্ধিতে যাহা কল্পনা করিয়া উদ্ভব করিল, তাহাও অভিলাষ-সাগরের একটি মাত্র উর্ম্মিতে পরিণত হইল। প্রাক্তন-দুর্ব্বাসনা তাঁহাকে এরূপভাবে বঞ্চিত করিল যে, তিনি সেই বঞ্চনার হাত হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে না পারিয়া সেই অভিলাষপঙ্কেই হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। অভিলাষিতা-শূন্যাভিমানী বঞ্চিত সরল বিবেকী অভিলাষ-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া যেরূপ সরলভাবে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-বিচার-ভেদ স্থাপন করেন, সেই বঞ্চিত বিশ্বাসক্রমে তাঁহার নিকট জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত হয়—প্রবৃত্ত জগৎ ও নিবৃত্ত-জীবন। অভিলাষযুক্ত ব্যক্তি প্রবৃত্ত-জগৎকে প্রাকৃত আখ্যা দিয়া নিবৃত্ত-অবস্থাকে অপ্রাকৃত-ভূষণে ভূষিত করেন।

মানবের প্রবৃত্তি-সমূহের বিকাশ-স্থল প্রবৃত্ত-জগৎ। তথায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা—এই ছয়জন মন্ত্রী নিষ্কপটে প্রবৃত্ত-রাজ্য-শাসনের সহায়তা করেন। প্রবৃত্ত-মানব মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত হইয়া বস্তু-বিশেষের অনুশীলন আরম্ভ করিলেই প্রধান মন্ত্রী কামের মূল সাহায্য লাভ করেন, তখন অবশিষ্ট পাঁচ জনও কার্য্যকারিতা দেখান।

প্রবৃত্ত-মানবের মুখ্যাশ্রয় প্রাকৃত-শরীর। শরীরের বৃত্তি—প্রতিগ্রহ ও দান। বাহ্য-পঞ্চভূত-জাত শরীরে যেরূপ স্থূল-বস্তুর গ্রহণ ও বিসর্জ্জন আছে, সেই প্রকার অন্তঃশরীরেও সূক্ষ্ম-দান ও প্রতিগ্রহ আছে। বাহ্য-শরীর রক্ষার জন্য যেরূপ বাহ্যদ্রব্যের প্রতিগ্রহ করিতে হয়, তদ্রূপ বাহ্য-বিসর্জ্জনেরও উপযোগিতা আছে। নিবৃত্ত-জীবনে বাহ্যিক বা আন্তরিক গ্রহণ বা প্রতিগ্রহণের ব্যবস্থা নাই। প্রবৃত্তপুরুষ স্বীয় বৃত্তি-লোভে বিমুগ্ধ হইয়া বৃত্তির বিকাশের সম্মুখীন। নিবৃত্ত-জীব বৃত্তিসঙ্কোচকে 'পাপ' বলেন। কিন্তু নিবৃত্ত-পুরুষ তাহাকেই 'পুণ্য' বলেন। পক্ষান্তরে নিবৃত্ত-ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে বহুমানন করেন না ও প্রবৃত্তিই অপ্রীতির আধার বলিয়া প্রবৃত্তির বিপরীত-ধর্ম্মই উপাসনা করেন। বাস্তবিক উভয়ের চেষ্টাই প্রাকৃতবুদ্ধি-প্রসূত। ব্যবায়, মদ্য ও মাংস-ভক্ষণ প্রভৃতি প্রবৃত্ত-পুরুষের স্বাভাবিকবৃত্তিনিচয় নিবৃত্ত-চক্ষে দোষের বিষয়। এজন্য ঐগুলি পরিহার করার ব্যবস্থা নিবৃত্ত-পুরুষগণের কণ্ঠে গীত হয়। বৈষ্ণবপ্রবর মনু এবং শ্রীমদ্ভাগবত নিরপেক্ষভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রুচিভেদজনিত বিবাদের মীমাংসা লিখিয়াছেন। এই প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিলেই যে শুভফল পাওয়া যাইবে, এরূপ বিশ্বাস নিবৃত্ত সরল বিশ্বাসিগণেরই শোভা পায়। আবার প্রবৃত্তি-দ্বারা অভিলাষের উদ্দণ্ড-নৃত্য করাইলেই যে বাসনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এরূপ নয়। অভিলাষের সদ্ব্যবহার করিতে গিয়া কতকগুলি ব্যক্তি স্বীয় রুচিক্রমে নিবৃত্তিকেই পরম উচ্চ করিয়া পরম-জড়ীভূত হইলেন। কেহ বা প্রবৃত্তি-তরঙ্গে ভুবন-সকলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-ঘাত-প্রতিঘাতে

দোদুল্যমান হইয়া পরস্পর বিবাদ-সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গ-মালায় পাপ-পুণ্যের সৃষ্টি করিয়া কি প্রকারের প্রীতি পাইলেন, তাঁহারাই জানেন।

প্রবৃত্ত-পুরুষ কিছুকাল কল্পিত-বিশ্বাসানুসারে কর্ম্ম-তরঙ্গে ভাসমান হইয়া তাঁহার প্রবৃত্তিকে প্রতিহত দেখিয়া নিবৃত্তিকে প্রবৃত্তির পরিণাম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্বার্থ ও পরার্থ নামক প্রবৃত্তিগত ভেদদ্বয় তাঁহার নয়ন-পথে আসিল। তিনি পরার্থ-সাধনে স্বার্থোপার্জ্জনকে স্বার্থ-সাধনে স্বার্থোপার্জ্জন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে স্থান দিলেন। এক্ষণে তাঁহার আনন্দে স্বার্থ ও পরার্থ-ভেদ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিল। শরীর রক্ষা করিতে হইলে গ্রহণ, বিসর্জ্জন প্রভৃতি ক্রিয়া-সমূহে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণে যত্ন প্রকাশ করিলেন। তাহার ফলে তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার বিষয়-গ্রহণ-তালিকার মধ্যেও দুই শ্রেণীর দ্রব্য অভিনিবেশ আছে। এক শ্রেণীর দ্রব্য তাঁহার প্রীতির কারণ হইলেও অপরের অপ্রীতির কারণ হয়। অপরের প্রীতির দ্বারা তাঁহার অপ্রীতি বর্দ্ধিত হয় দেখিয়া উভয়ে উভয়ের সহিত প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এক্ষণে এই প্রীতি-সূত্র বিচ্ছিন্ন না হইবার উপায়-স্বরূপ পুণ্য ও পাপ ভেদ করতঃ পুণ্যারাধনে নিযুক্ত হইলেন। এখন হইতে তিনি আর প্রবৃত্তির নামে যে-কোন উপায়ে ব্যবায় বৃদ্ধি করেন না, মত্ততার উৎপাদনকারী মদ্যসেবা ও শরীর-বল-বিধানকারী আমিষসেবন-দ্বারা যথেচ্ছাচার-অভিলাষের সেবা করিতে প্রস্তুত নহেন। যে-কোন উপায়ে বিষয়-গ্রহণের মূর্ত্তি-স্বরূপ ধন-সংগ্রহ তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। পুণ্যকর্ম্মের জন্য ধন-সংগ্রহের পিপাসা প্রবল থাকে বলিয়া তিনি অর্থ-সংগ্রহে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু মুখ্যতঃ সেই চেষ্টাকে পাপ-পথে প্রধাবিত করিয়া কাহারও ক্ষতি করেন না; বিদ্যা-সংগ্রহ-পিপাসা প্রবল থাকে বলিয়া তিনি বিদ্যার সংগ্রহে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সেই উদ্যমকে পাপ-পথে চালাইয়া কাহারও উপর আধিপত্য করেন না। স্বাদু-ভোজনে প্রবল চেষ্টা থাকিলেও তিনি দুর্ব্বল প্রাণী বধ করিয়া আত্ম-শরীর পুষ্ট করেন না। ভোগের বিষয় তৎকালে অনেক খর্ব্ব হইয়া পড়ে। নিবৃত্ত-জীবনের সম্পত্তি-সমূহ অলক্ষিতভাবে তাঁহার হৃদ্দেশ অধিকার করে। জগতের সকলের সুখোদয় হউক, এরূপ বিশ্বজনীন উদার ভাব আসিয়া তাঁহার পুণ্যাগ্রহ বৃদ্ধি করে। তিনি নিবৃত্ত-পুরুষকে আদর করিতে থাকেন। নিবৃত্তচিহ্ন তাঁহার নিকট ক্রমে ভাল বলিয়া বোধ হয়। অভিলাষের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় 'নিবৃত্তি' বলিয়াই স্থির করেন। কিন্তু এরূপ সরল জড়ীয় বিশ্বাস অভিলাষের মূর্ত্তিভেদ ব্যতীত আর অধিক দেখাইতে সমর্থ নয়।

চেতন জগতে আমাদের সকলেরই স্বরূপ উদ্বুদ্ধ। সেখানে জাগতিক শান্তি বা অশান্তির কথা নাই। যা'কে আমরা শান্তি বা অশান্তি মনে করি, এই দু'টোই আমাদের ভোগপিপাসাজনিত উপলব্ধি। ভোগের সাময়িক অভাবের নাম অশান্তি; আর সাময়িক ভোগলাভকে আমরা 'শান্তি' ব'লে থাকি।

'এ জগতে মৎসরতা আছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই পাঁচটি একত্রিত হ'য়ে মৎসরতার উদয় করায়। চেতনজগতে প্রত্যেক ব্যক্তি এক অদ্বয়জ্ঞানের স্বার্থের জন্য তা'র সেবা ক'রছেন। সেখানে মৎসরতাপূর্ণ সাপত্ন্যভাব নাই।

মানুষ যেরূপ কার্য্য ক'রেছে, সেরূপ ফল পাবে। এক মানবের কর্ত্তৃত্বের ফল অপরে পায় না। আমি আমার স্বতন্ত্রতা পরিচালনা ক'রে তা'র ফল আমি নিজেই পাই।

অনেক সময় ধর্ম্মজীবন গ্রহণ ক'র্‌তে পিপাসান্বিত হই; গ্রহণ ক'রেছি ব'লে মনেও ক'রে থাকি; কিন্তু কার্য্যত আমরা অধর্ম্ম-জীবনকেই বরণ করি। আমাদের কৃপণতা-দোষ এসে উপস্থিত হয়—ব্রাহ্মণ স্বভাবটা বিনষ্ট হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি এই সমস্ত সংসারের হাঙ্গামা বা ধর্ম্মজগতের বহুরূপী ধর্ম্মধ্বজিতা পরিত্যাগ ক'রে মানুষকে সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন। শুধু বাঙ্গালা দেশের লোকের জন্য নয়—দু'চার জনের জন্য নয়, সব দেশের সব লোকের চিরস্থায়ী মঙ্গলের বাণী তিনি ব'লেছেন।

অনেক সময় মনে করি, আমি কি এমন অন্যায় কার্য্য ক'রেছি, যা'তে আমার এ অসুবিধা এসে উপস্থিত হ'ল? কিন্তু আমরা অনেকেই এ অসুবিধার মূল অনুসন্ধান করি না। কখনও ভগবান্‌কে দোষারোপ করি? কখনও বা অপরকে দায়ী করি; কখনও কর্ম্মফল ও অদৃষ্টের গতানুগতিক দোহাই দিয়ে আবার কর্ম্মের ফাঁদে প'ড়ে যাই। কিন্তু ঐ অসুবিধার মূল অনুসন্ধান ক'রলে জানতে পারি, একমাত্র হরিবিস্মৃতির জন্যই আমাদের এই অসুবিধা।

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় চিন্তয়েৎ আত্মনো হিতম্" প্রভৃতি স্মৃতিবাক্যে যে আত্মহিতের কথা শুনতে পাই, সেই আত্মহিতচিন্তার অভিনয় ক'রেও যদি অসহিষ্ণু হই, তবে আত্মহিতের পরিবর্ত্তে অহিত হ'বে। স্বরূপের জ্ঞানের অভাবে অনাত্মজ্ঞান আমাদের অমঙ্গল ও অশান্তি ঘটায়। অনাত্মজ্ঞানই হ'চ্ছে প্রত্যক্ষজ্ঞান, পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান। অপরোক্ষজ্ঞানে কেবল অনাত্মজ্ঞানের ব্যতিরেকজ্ঞান থাকায় অর্থাৎ আত্মানুশীলনের জ্ঞানের অভাব তা'কে অনাত্মজ্ঞানই বলা যায়। ভগবৎ-সেবার জ্ঞানই জীবের প্রকৃত মঙ্গলদায়ক। যদিও আমরা মুখে বলি যে, আমরা ভগবৎ-সেবক; কিন্তু কার্য্যতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানেই মেতে আছি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক কিম্বা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের রাজা মন—এদের প্রদত্তজ্ঞানেই আবদ্ধ হ'য়ে এদের মুখে ঝাল খেয়ে আমরা বাস্তব সত্যকে অনাদর ক'রছি। পরোক্ষজ্ঞানে আবদ্ধ হ'য়ে স্বর্গসুখ, পারলৌকিক অভ্যুদয় প্রভৃতির জন্য যত্নবান্ হ'চ্ছি। অপরোক্ষজ্ঞানে আকৃষ্ট হ'য়ে আত্মার অনুশীলনের স্তব্ধভাব বা আত্মহত্যাকেই শান্তিরাজ্যের শেষ সোপান বিচার ক'র্‌ছি। কিন্তু এগুলি সকলই আমার আত্মহিতের প্রতিবন্ধক—এগুলি সকলই আমাকে ভোগা দিচ্ছে। এজন্য

শ্রীমদ্ভাগত ব'লেছেন,—

লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।।

যে কোন জন্ম, যে কোন অবস্থাই পাই না কেন, সেখানে সেখানে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ প্রভৃতি বিষয়ের সন্ধান পা'ব। যে কোনরূপ অভাবগ্রস্ত হই না কেন, সে সকল অভাবের পূরণ বা অভাবের অপূর্ত্তি থাকবেই। বর্ত্তমান সময়ে ঘটনাচক্রে মানুষ হ'য়েছি — পুরুষ বা স্ত্রী, বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ বা অতিবৃদ্ধ হ'য়েছি; এসকল অবস্থাও আবার দু'দিন পরে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যাবে। শান্তি ও অশান্তি, সুখ ও দুঃখ—দু'টোই পরিবর্ত্তনশীল ব্যাপার। দুঃখের অনুভূতি ক'মে যাওয়ায় সুখের উপলব্ধি, আবার সুখের অনুভূতি ক'মে যায়ায় দুঃখের অনুভব। অনেকে এই সুখ ও দুঃখের ক্রীড়নক হ'য়েও, সুখের অন্তরালে দুঃখ আছে জেনেও ''তাৎকালিক সুখ-স্বাচ্ছন্দটা ত' ভোগ ক'রে নিই''—এইরূপ কামনাপ্রেরিত হ'য়ে দুঃখ বা অশান্তির যূপকাষ্ঠে আপনাকে বলি দিয়ে থাকি। যেমন রাস্তায় যেতে যেতে একটা মদের দোকান পাওয়া গেল। অমনি মদের দোকানে কিম্বা খুব ধনবান দেখে বা ধনীর ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে ধনবান হওয়ার জন্য আকাশপাতাল আলোড়ন, রূপ দেখে রূপভোগের প্রতি ধাবিত হওয়া, পাণ্ডিত্য দেখে পণ্ডিত হওয়ার জন্য অমানুষী উৎসাহ-উদ্যম প্রভৃতি দেখাইয়া থাকি।

জগতে লোকপ্রিয় অসংখ্য অসংখ্য প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'য়েছে। কিন্তু এঁরা কেহই ভগবানের সেবার কথা ব'লেছেন না---কপটতার কথাই ব'লছেন---ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ কামনার কথাই ব'লছেন। সংসৃতির উন্নতির জন্য লোভ দেখাচ্ছেন। দেবতারাই পতিত হ'য়ে ঋষি হন, আর ঋষিগণ পতিত হ'য়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হ'য়ে থাকেন। তাঁরা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাসনার কথা বলেন, অধোক্ষজ কৃষ্ণের অহৈতুকী সেবার কথা কা'রও মুখে নাই। ইঁহারা ভগবৎপ্রসঙ্গবিমুখ।

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি।।

(ভাঃ ৩।৯।১০)

ভগবৎপ্রসঙ্গবিমুখ ব্যক্তিই বিশ্বে নানাপ্রকার occupation বা engagement পায়। ঐ কার্য্যেই তাহারা বড় ব্যস্ত। ভগবানের প্রকৃষ্ট সঙ্গ যেখানে হয়, সেখানে যাহারা apathetic তাহাদের জন্য বিশ্ব। বিশ্বের engagement-এ লক্ষ্য করি—ভোগী, সাক্ষী, দ্রষ্টা, দৃশ্য জগৎ প্রভৃতি কথা আছে। 'এ-জগৎ বিষয়, আমরা বিষয়ী',—এই প্রকার অভিমানে আমরা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানদ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদি বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকি। ভগবানের কথায় যখন বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তখনই আমাদিগের

সংসাররূপ occupation আসিয়া উপস্থিত হয়। 'কি করিয়া সময় কাটিবে, কোন জিনিষ লইয়া দিন কাটাইব'—এই চিন্তায়ই দিবারাত্র ব্যস্ত হইয়া পড়ি। 'অহ্নি'—সপ্তমীর পদ, 'করণ'--vehicle যদ্দ্বারা object-এর সঙ্গে associated হওয়া যায়। 'আপৃত'—ব্যাপৃত, আৰ্ত্ত—ক্লিষ্ট অর্থাৎ দিবাভাগে ইন্দ্রিয়সকল কৃষ্ণেতর বিষয় গ্রহণ করিতে করিতে ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। চক্ষুর বেশী engagement হইয়া পড়িলে চক্ষু বিরাম লাভের জন্য যত্ন করে; কর্ণ যখন বেশী শুনিতে থাকে, নাসিকার ঘ্রাণ-গ্রহণ-কাৰ্য্য বাড়িয়া যায়, জিহ্বা অধিক আস্বাদন-কাৰ্য্য পায়, ত্বক্ স্পর্শ-কার্য্যে অধিক ব্যস্ত থাকে, তখন উহাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। আমাদের দিবাভাগ করণগুলিকে কষ্ট দিতেই চলিয়া যাইতেছে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ঐরূপ busily engaged থাকায় উহাদের একটি reciprocal relation হইয়াছে। 'নিশি'—রাত্রিকালে; ইন্দ্রিয়সকল দিবাভাগে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিয়া রাত্রিকালে তাহাদের কার্য্য হইতে অবসর প্রার্থনা করে; কিন্তু কি দুর্ভাগ্য যে রাত্রিতেও তাহাদের অবসর নাই—'নানামনোরথোধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ'—বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া মানুষ নিদ্রাগত হয় বটে কিন্তু নানা অসৎবিষয়ে ধাবিত মনোধৰ্ম্মস্বরূপ স্বপ্নদর্শন দ্বারা তাহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হয়। বদ্ধজীবের নানা মনোরথ। মনরূপ রথে চালিত হইয়া মানুষ নানা বিষয়-চিন্তার আবাহন করে—প্রাতে কি করিব—তাহার চিন্তায় তাহার বুদ্ধি আচ্ছন্ন হওয়ায় রাত্রে বিশ্রামকালেও সে ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠে। পূর্ব্বদিবস, পরদিবস এবং ভবিষ্যৎ দিবসের কার্য্যের চিন্তার সঙ্গে পরস্পরের যে ধাক্কা লাগে, তাহা সামলাইবার দরকার হয়। 'দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেবাঃ'—ঋষিগণ, দেবতাগণ ইঁহারা ভাল জীব। ঋষি—Intellectual আর দেবতা সর্ব্বক্ষণ আনন্দে মসগুল। তাঁহাদের অর্থের 'রচনা' contemplation অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু প্রতিপাদন দৈব কর্তৃক 'আহত' অর্থাৎ প্রতিহত হয়। যাহা ভোগ করিব বলিয়া মনে করা যায় তাহা হইয়া উঠে না। একজন town civic life lead করিতেছেন, আর একজন village-এ নানা কষ্ট ভোগ করিতেছেন। জগতের অবস্থাই এই প্রকার। আমরা inadequacy পরিপূর্ণ—Surcharged atmosphere-এ আছি, ভগবদ্বস্তুর আলোচনার আত্যন্তিক অভাব হইয়া পড়িয়াছে; তাই অভাবের তাড়নায় আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ অস্থির হইয়া পড়িতে হইতেছে। ভগবদ্বস্তু পরিপূর্ণ; তাঁহার আলোচনায় অভাবের কোন কথা নাই। অখণ্ডবস্তুর আলোচনা যত বেশী বৃদ্ধি পাইবে, অভাবও তত অধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। দধি—খণ্ডবস্তু, উহার নিকট sword বা gold প্রভৃতি পাওয়া যায় না; কিন্তু ভগবদ্বস্তু—emporium of everything; সেই জিনিষটিই আমরা চাহি না। নিজেদের অকিঞ্চিৎকর চেষ্টা দ্বারা অভাব-পূরণের জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়ি। পূর্ণ supply যাঁহাতে আছে, তাঁহাকে না চাহিয়া এই ভাবরাজ্যে অভাবপূরণের engagement-এ ব্যস্ত হইয়া পড়ি—সংসার লাভ করি—এই হরিবিমুখ

জগতে সম্যক্‌রূপে চলিতে থাকি। সম্যক্‌রূপে চলার নামই সংসার। ['সংসার'—সং—সৃ (গমন করা) + অ (অধিকরণ বাচ্য)—অর্থাৎ যেখানে প্রাণিগণ গমনাগমন করে] ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিমুখতাই তাহাদিগকে বর্হিন্মুখ সংসার লাভ করাইয়া থাকে। আমাদের এখানকার activities all tend to limited objects—ইহা Natural appetite। একটু বুদ্ধি থাকিলে পূর্ণবস্তু কাহাকে বলে, খণ্ডবস্তু কি, কোনটি আমাদের প্রার্থনীয় তাহা বুঝিবার সামর্থ্য হয়। যাহাতে অভাব আছে তাহাই খণ্ডিত। নিত্যানিত্য-বিবেকহীনতাই পূর্ণতার হানি। অতি শিশুকাল হইতেই শিক্ষা হইতেছে—পূর্ণবস্তু-নিত্যবস্তু—Absolute-এর সম্বন্ধে ভবরাজ্যের কোন কথা নাই। তাঁহার আরাধনাতেই একমাত্র নিত্যমঙ্গল অবস্থিত; অপূর্ণ, অনিত্য অবাস্তব বস্তুজ্ঞানেই যত অভাব সৃষ্টি করে—অমঙ্গল আনিয়া দেয়। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই ঐসকল অমঙ্গলপ্রসূ time-killing engagement-এ ব্যস্ত হওয়া উচিত নহে।

হে ভগবন্! we are kibblly interested in you, কিন্তু তোমার কথা শুনিলাম না। তোমার কথা শুনিতে গেলেই আমাদের গায়ে জ্বর আসে। আমাদের brain-এর ক্ষুদ্র cavity-র মধ্যে তোমার কথা accomodate করিতে পারি না। আমরা অপূর্ণ, অনিত্যবস্তু সংগ্রহে বড় ব্যস্ত হইয়া পড়ি। ঐ সকল জিনিষ পাইয়া গেলে তৃপ্ত হই, তখন উহার জন্য পিপাসা থামিয়া যায়, উহাকে stale মনে করিয়া আবার veiled future-এর জন্য কৌতূহলবিশিষ্ট হই। কিন্তু ভগবদ্বস্তুটি ঐরূপ নহে। তাহাতে নব নব চমৎকারিতা এত বেশী আছে যে, উহার সামান্য একটু সন্ধান পাইলেও প্রচুর সময় কাটাইবার সময় থাকিবে—প্রাপঞ্চিক কালক্ষোভ্য যাবতীয় নব নব বস্তু সংগ্রহের পিপাসা থামিয়া গিয়া সেই অপ্রাকৃত বস্তুর (ভগবদ্বস্তুর) সেবার চমৎকারিতা আস্বাদনের জন্য নিত্য নবনবায়মান ব্যাকুলতার উদয় হইবে। সেই বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান-কার্য্যে অন্য কোন লোকের সহিতই Rupture নাই, আছে কেবল harmony।

দেবতার জন্ম থেকেও মনুষ্যজন্ম ভাল। দেবতারা এত সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকেন যে, ভবিষ্যতে যে তাঁ'দের জন্য দুঃখভাণ্ডার পরিপূর্ণ হ'য়ে র'য়েছে, তা' তাঁ'রা বিশেষ চিন্তাই ক'রতে পারেন না। সাময়িক সুখের নেশায়ই তাঁ'রা মস্‌গুল থাকেন। দেবতা ত' কিছু সময়ের জন্য। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

মনুষ্যজন্মের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সদ্ব্যবহার কি? কেহ ব'লছেন—এ জগতের রাজা হওয়াই সবচেয়ে বড় কাম্য বিষয়। কেহ ব'লছেন—সবচেয়ে বড় তপস্বী হওয়াই বড় কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এসকল কোন দিন মানব-জন্মের সদ্ব্যবহার ও আদর্শ হ'তে পারে না। শতবর্ষ এ জগতে বাস ক'রেও কোনপ্রকার মঙ্গল হয় না। কেবল ধাক্কাই খেতে হয়—কখনও সুখের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে ধাক্কা কখনও দুঃখের ধাক্কা।

যা'রা আধোক্ষজ হরির কীর্ত্তন করে না, তা'রা যতই ধর্ম্মজীবন যাপন করবার

অভিনয় করুক না কেন, তা'র সঙ্গে অধর্ম্মজীবনের একটা মিশ্রণ ক'রে নেবে। ব্রহ্মচারীগণ সংসারে প্রবিষ্ট হন না। সংসারে প্রবিষ্ট ব্যক্তির ক্লেশ দেখে তা'রা পূর্ব্ব হ'তেই সতর্ক হ'য়ে যান। আবার আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি মনে করে—"আমাকে রেঁধে দেবে কে? যা'হোক্ সংসারে প্রবিষ্ট হ'য়ে পড়ি, সুখ ও দুঃখের মধ্যে জীবনটা একরূপ কেটে যাবে।" এইরূপ বিচার ক'রে এরা সংসারে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু ঐরূপ সংসারে প্রবিষ্ট না হ'য়ে বা সংসারে প্রবেশ ক'রেও কোন সুবিধা হবে না। যে পর্য্যন্ত না আমরা কৃষ্ণ-সংসারে প্রবিষ্ট হ'ব, সে পর্য্যন্ত বাহ্যতঃ সংসারে প্রবেশ না ক'রলেও সংসার আমাদিগকে ছাড়্‌বে না। আমি ত' ভালুকরূপী কম্বলকে ছাড়্‌তে চাই, কিন্তু কম্বল যে আমায় ছাড়ে না।

দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি, তিনি পরামর্শ দেন যা'তে ক'রে দেবতাদের বেশ ভোগ বৃদ্ধি হয়। বৃহস্পতির বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও ধর্ম্মের উপদেশ—ভোগ বৃদ্ধির জন্যই। মনুষ্যজাতির মধ্যেও অনেক ভাল ভাল লোক পরামর্শদাতা আছেন। কুলপুরোহিত, সমাজপতি, দেশপতি প্রভৃতি যে সকল পরামর্শ দেন, তা' কেবল মানবজাতির ভোগবর্দ্ধনের জন্য। আবার বশিষ্ঠের ন্যায় কুলগুরুও আছেন, তিনি নিবৃত্ত জীবনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণব-সদ্‌গুরু পরামর্শ দেন একমাত্র হরিভজনের জন্য। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি মাত্র তাঁ'র উপদেশের শেষ সীমা নয়। তিনি প্রত্যেক জীবের চিরস্থায়ী মঙ্গলের উপদেষ্টা। একটা ছেলে খুব মিষ্টি খেতে ভালবাসে, কিন্তু তা'র শুভানুধ্যায়ী অভিভাবক চিরতার জল, শিউলি পাতা, পল্‌তা পাতার জল প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য দিয়েও বালকের মঙ্গল-কামনা করেন। এগুলি বালকের প্রতি হিংসা নয়। কিন্তু যে বালককে অধিক মিষ্টি খাওয়ার সহায়তা করে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বালকের হিংসা ক'রে থাকে। শ্রুতিতে এজন্য শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পথের কথা আছে। প্রেয়ঃপথটা অনেকে বা সকলেই গ্রহণ করে, কিন্তু শ্রেয়ঃপথের গ্রাহক জগতে একরূপ নাই ব'ললেই হয়।

জগতের লোকের পরামর্শ হ'চ্ছে—এখানকার যে সকল প্রয়োজন প'ড়েছে, আগে সে সকলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দাও। কিন্তু তা'তে হিতে বিপরীত ফল হয়। প্রয়োজনের মাত্রা পৌনঃপুনিক দশমিকের মত কেবল বেড়ে যেতে থাকে। কেউ স্নান ক'রতে গেল, সিদ্ধ হয়ে ফি'রবে ব'লে; কিন্তু পা পিছলে প'ড়ে গেল—জলে ডুবে গেল। সাময়িক প্রয়োজন মিটা'তে গিয়ে অনেক কিছু প্রয়োজনের মধ্যে—অনেক কিছু অভাব অসুবিধার মধ্যে ডুবে যেতে হয়।

যাঁরা সংসারে বড় হ'য়েছেন, তাঁ'রাই ভগবান্‌কে একেবারে ভুলে গেছেন। তাঁ'রা নিজেরা ভগবানের সেবার কথা আলোচনা করা দূরে থাকুক, অপরে ভগবৎসেবায় কিছুমাত্র শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হ'চ্ছে দেখ্‌লে তা'তে নানাপ্রকারে বাধা দিচ্ছেন; যাঁ'রা খুব বড় বড় চাকুরী করেন, বড় বড় রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী, বড় উকিল, বড়

অধ্যাপক,বড় ডাক্তার,সাহিত্যের ডক্টরেট্ পেয়েছেন, খুব বড় দার্শনিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, বহু ভাষাবিৎ; কিন্তু অত্যন্ত বহির্ম্মুখ। তথা-কথিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কথায় তাঁদের আদর আছে। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ তাঁ'দের 'নাস্তিক' সংজ্ঞা হ'তে রক্ষা ক'রে 'ধার্ম্মিক' সংজ্ঞায়ও ভূষিত ক'রেছেন; কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি অধোক্ষজ হরিসেবা-বিমুখ এবং তৎপ্রতি বাধা প্রদানকারী। এঁরা জানেন না যে, শেষ নিঃশ্বাসের সময় তাঁ'দের ঐরূপ দাম্ভিকতা, আত্মনির্ভরতা, 'ধার্ম্মিক' বা 'পরার্থী' নামের প্রতিষ্ঠা কোন কাজে আসবে না। মনুষ্যজাতির সাময়িক মঙ্গলকামনা যা'রা ক'রছেন, তাঁ'রা পরার্থী ব'লে পরিচিত। কিন্তু তাঁ'রাও মৎসর, অধীর। তাঁরা ন্যূনাধিক অভ্যুদয়বাদী, না হয় নিবৃত্তির উপদেশকের নামে প্রচ্ছন্ন-ভোগবাদী ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিক; অধোক্ষজ হরিসেবার উপদেশকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশক।

কোন কোন উপদেষ্টা অমঙ্গলের মধ্যে মানবজাতি যা'তে কিছুতেই প্রবেশ না করে, তজ্জন্য অহৈতুকভাবে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, আর কতগুলি অপস্বার্থপর লোক মনে করে—আমি যা'তেই ঢুকেছি, অপরেও তা'তে ঢুকুক। ওল খেতে গিয়ে আমার মুখ লেগেছে, চুপ ক'রে থাকি, অপরেরও মুখ লাগুক ও কষ্ট পা'ক। কেবল আমিই একা কষ্টের ভাগী হ'ব কেন?

আত্মহত্যা করা বা সংসারের মধ্যে ডুবে যাওয়ার দরকার নাই। আসক্তির সহিত বাস বা আসক্তিরহিত হ'য়ে অতি-বৈরাগ্য-প্রদর্শন কোনটিই মঙ্গল আনায়ন ক'রবে না। জগতে যে সকল ঠক সাধুর সজ্জায় আছে, যারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামনায় জীবকে প্ররোচিত ক'রে ধার্ম্মিক করবার জন্য ব্যস্ত, সে সকল ঠকের হাত হ'তে নিষ্কৃতিলাভ ক'রে চতুর হওয়ার কথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন। নেড়া ক'বার বেল তলায় যায়? যাদের আত্মীয়-স্বজন ব'লে মনে হচ্ছে, তা'দের মাঝে মাঝে এজগৎ হ'তে তু'লে নিয়ে ভগবান আমাদিগকে মায়ার কুহক বুঝবার জন্য একটু সময় দেন। আমাদের সমস্ত আসক্তি, আমাদের সমগ্র চিত্তবৃত্তি যা'দের প্রতি কেন্দ্রীভূত ক'রেছিলাম, যে সকল বহু অনিত্যকে নিত্যজ্ঞান ক'রেছিলাম, কিন্তু এক পরমাত্মীয়—এক নিত্য অদ্বয় বস্তু হ'তে বঞ্চিত হ'চ্ছিলাম, ভগবান সে সকল কথা জগতে অভাব অসুবিধা প্রভৃতি পাঠিয়ে জানিয়ে দেন।

পথ-প্রদর্শক হ'লেই যে তিনি অকৃত্রিম হ'বেন, তা'র কিছু কথা নাই। ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষকামী সম্প্রদায়ের উপদেশকগণ পথ-প্রদর্শকের উপদেষ্টার কার্য্য ক'রেও জীব-জগৎকে বিপথে চালিত ক'রছে।

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকামের উপদেশকগণও খুব গলাবাজী ক'রে ব'লছে যে, তা'রা ধর্ম্মের উপদেশক। অথচ তা'রা মানুষকে কতটা misguide ক'রছে! ঐ চারিটি পুরুষার্থ কেবল ভোগাদেওয়ার কথা। যদিও এগুলি হিন্দুদের মধ্যে—কেবল হিন্দুদেরই

বা বলি কেন, জগতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপে পুরুষার্থ ব'লে স্বীকৃত হ'য়েছে তথাপি শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবতের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব জানিয়ে দিয়েছেন —ঐগুলি ঠকামির কথা, কপটতার কথা। ঐসকল জীবের নিত্য প্রয়োজন নয়। হিন্দুগণের মধ্যে বা অন্যান্য জাতির মধ্যে অনেক ধর্ম্ম-অর্থ-কামকে কতকটা অনিত্য ধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্মের সোপান মনে ক'রলেও মোক্ষ-কামনাকেই তাঁ'রা সব চেয়ে বড় কথা মনে করেন। কিন্তু ধর্ম্ম অর্থ-কাম যে কখনও নিত্য ধর্ম্মের সোপান নয়, মোক্ষ-কামনার প্ররোচনা যে সব চেয়ে বড় ঠকামী, একথা শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যদেব ব্যতীত আর কেহ জগজ্জীবের নিকট উচ্চকণ্ঠে ব'লে জীবের শ্রেষ্ঠ উপকার করবার জন্য ব্যস্ত হন নাই।

আমি বৃদ্ধকালে এই সকল কথা আলোচনা ক'রব,—তা' নয়। প্রহ্লাদ অতি অল্প বয়সে এই সকল কথার আলোচনা ক'রেছিলেন—মোক্ষ-কামনা যে সব চেয়ে বড় কপটতা, এই কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং দৈত্যপুত্রগণকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আমি আমাকে রক্ষা ক'রব, এই বিচার আসলেই আমি আমার নিজের পন্থা গ্রহণ ক'রলাম, তাঁ'র উপদেশ হ'তে পৃথক্ হ'য়ে গেলাম। ভগবানের কথায় উদাসীন হ'লেই সংসার-প্রবৃত্তি।

সুখে বা জাগতিক সাময়িক শান্তিতে তাঁ'কে ভুলে যাওয়া, আর দুঃখে বা অশান্তিতে তাঁ'র কাছে কিছু চাওয়া—উভয়ই প্রকৃত মঙ্গলের প্রতিবন্ধক। তাঁ'র কাছে কি চাইতে হ'বে, আমি কি জানি? আমি ত' ছাই পাঁশ চাইব। যা চাইলে ভাল হয়, সে ত' তিনিই জানিয়ে দেন। কেহ কেহ ঈশ্বর বিষয়ের আলোচনা করাই জাতির অধঃপতনের কারণ মনে করেন। এই সকল চিন্তাস্রোত ভারতবর্ষেও এসে প'ড়েছে। পাশ্চাত্যদেশের জাতিসমূহ নিজদিগকে যতটা অধিক বুদ্ধিমান্ ও বড় মনে ক'রছেন, জড়বিজ্ঞানের উন্নতি প্রদর্শন ক'রে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নিকট যতটা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রছেন, তা' অপেক্ষাও অনেক বেশী বুদ্ধিমত্তা তৃণকুটীরে বাস ক'রে—এমন কি, অনিকেত থেকে মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ ক'রে ভগবৎসেবকগণ প্রদর্শন ক'রেছেন। শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপের বুদ্ধিমত্তা, তাঁ'দের অতিমর্ত্ত্য-বিজ্ঞানে নিত্যসিদ্ধ-নৈপুণ্য সমগ্র-মানবজাতির পরা-শান্তির পথ আবিষ্কার ক'রেছেন। বিষ্ণুভক্তি-দ্বারাই ভারতের সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে—এই সকল বিচার ঘোরা প্রকৃতির পরিচয়। এইরূপ রজঃপ্রবৃত্তির অনুকরণ ক'রে ভারতে কিছুদিন পূর্ব্বে কএকজন ব্যক্তি রজোগুণের প্ররোচনাকেই ধর্ম্মের জাগরণ এবং উপনিষদুক্ত—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" উপদেশের আদর্শ, এমন কি 'বেদান্তের ধর্ম্ম' ব'লে প্রচার ক'রেছেন। বস্তুতঃ ইহা 'প্রেয়ঃপন্থা', অবৈদিক পথমাত্র। বিষ্ণুসেবার পথই 'শ্রেয়ঃপন্থা' বা বৈদিক পথ।

(৩)

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।। (মনু ২।১৬৮)

মৌঞ্জীবন্ধনের পরে বেদশাস্ত্র আলোচনা না করিয়া যদি দ্বিজ ব্যক্তি অন্য ইতরশাস্ত্র আলোচনা করেন, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শিক্ষা করেন, অর্থের বিনিময়ে অধ্যাপনা করেন, যদি বেতন গ্রহণ করিয়া ভাগবত পাঠ করেন, অথবা চাকরী প্রভৃতি করার লোভে পতিত হইয়া শাস্ত্রের লক্ষণ ও উদ্দেশ্যরহিত কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তি জীবদ্দশায়ই বংশানুক্রমে অধঃপতিত হন। ভৃতক পাঠক, সেবক ও পূজারী 'পতিত' বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছেন।

আচার্য্যের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিলে, ''এক বস্তুতে অন্য বস্তু-জ্ঞান'' হয়। শ্যামা ঘাসকে যদি ধান গাছের সমান মনে করিয়া শ্যাম্য-ঘাসকে রাখিয়া ধান গাছকে উঠাইয়া ফেলি, তাহা হইলে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হইবে। শ্রুতি ও স্মৃতি পারমার্থিকগণের দুইটি চক্ষুঃ। শাস্ত্রালোচনার অভাবে আমাদের দেশে যত অসুবিধা ঘটিয়াছে। শ্রুতিশাস্ত্রে পারদর্শিগণ দেবসেবা করুন। শাস্ত্রবিদ্‌গণের দ্বারাই ভগবান্ ও ভগবদ্-ভক্তগণ সর্ব্বদা পূজিত হন।

কিন্তু গতানুগতিক ন্যায়কে বহুমানন করিতে গিয়া কোন কোন পণ্ডিতন্মন্য ব্যক্তি ''সূত্রে পিণ্ডং দদ্যাৎ'' এর পরিবর্ত্তে—'মূত্রে পিণ্ডং দদ্যাৎ'', এরূপ বলিতেও দ্বিধা করিতেন না। আজকাল যথার্থ পণ্ডিতের আদর নাই। মূর্খ ও ভাবুক ব্যক্তি বর্ত্তমান পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হইতেছেন।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।। (গীতা ৩।২১)

মহদ্‌ব্যক্তিগণ যাহা করেন, ইতর ব্যক্তিগণ তাঁহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। বহির্ম্মুখ লোকের Ontology-র প্রতি দৃষ্টি নাই, Morphology-র প্রতি দৃষ্টি থাকে। ঠাকুর দেখাইয়া পয়সা নেওয়া ভীষণ অপরাধ, জীবিকার্জ্জনের জন্য মুটেগিরিও করা যাইতে পারে, ইহাতে অপমান ও অপরাধ নাই।

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেশোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরোহ্যোত্তমাসনম্।।

ব্রাহ্মণকে শূদ্রগণ সেবা করিবেন, কিন্তু কলির প্রভাবে শূদ্রগণও ব্রাহ্মণগণেরও সেবা গ্রহণ করিতেছে। আবার কেহ কেহ বা প্রকৃত প্রস্তাবে শূদ্র থাকিয়াই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান করিতেছেন। এ সমস্তই মেয়েলী বিচার। সাধারণ বহির্ম্মুখ লোক বলিতেছে, —''যেখানে যত মূর্খ লোক আছে, তাহাদের দ্বারা বিগ্রহপূজা করাইতে হইবে।''

আচার্য্যের নিকট আসিয়া যথার্থভাবে এরূপ সংস্কৃত হইতে হইবে, যাহাতে মানুষকে সত্য সত্যই নূতন করিয়া আর জগতে জন্মগ্রহণ করিতে না হয়। এমনভাবে নূতন জীবনের সূত্রপাত হইবে, যাহাতে যথার্থ মঙ্গল লাভ হয়।

ধ্রুব প্রথমে রাজ্য লাভের আশায় শ্রীহরির ভজনা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আর রাজ্য প্রার্থনা করেন নাই। ধ্রুবের প্রার্থনা এরূপ শোনা যায়—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে।।

(হরিভক্তি সুধোদয়)

বালির সহিত অন্যদ্রব্যের সংমিশ্রণে কাচ গঠিত হয়। উহা অনুকরণ দ্বারা নিজে স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়। আমাদের ধ্রুবের ন্যায় বিচারাবলম্বনে বিষয়রূপ কাচসংগ্রহের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া দেবতাগণের প্রাপ্য বিষ্ণুর পরমপদরূপ মহারত্নের সংগ্রহের যত্ন করা আবশ্যক। বিষ্ণুর পরমপদই দিব্যসূরিগণের প্রাপ্য বস্তু। "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"। সাধারণ বহির্ম্মুখ মনুষ্যগণের বাহিরের জিনিষের প্রতি লক্ষ্য থাকে; ভিতরের জিনিষের দিকে মোটেই দৃষ্টি নাই। কিন্তু বিষ্ণুভক্ত দেবগণের সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুর পরমপদলাভের জন্যই যাবতীয় চেষ্টা।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।"

(গীতা ২।৬৯)

কতকগুলি লোক বাহিরের কথা লইয়া ব্যস্ত থাকে। মূর্খ বহির্ম্মুখ লোকেরা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া স্বর্গাদির লোভে কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অবোধ শিশু ১০ টাকা, কি ১০০ টাকার নোটের মর্ম্ম জানেনা বলিয়া উহাকে সামান্য কাগজ মনে করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হয়। তখন পিতামাতা কাগজ দিয়া কৃত্রিম খেলনা তৈয়ারী করার পর উহা দেখাইয়া উক্ত নোটটি রক্ষা করেন; অথবা শিশুপুত্র কোন কিছুর জন্য আবদার করিয়া অধিক কাঁদিতে থাকিলে মিষ্ট দ্রব্য প্রদান করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া থাকেন। ভোগা দেওয়া কথা বাহিরের কথা মাত্র। বাস্তব ভক্তির রাজ্যে কোন ভোগা দেওয়ার কথা নাই। কর্ম্মকাণ্ড বাহিরের কথা। লোকপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিরাও ভ্রমে চালিত হইতেছেন, যত মূর্খ ও অন্যাভিলাষী ব্যক্তিকে অর্চ্চনমার্গে প্রবেশ করান হইতেছে।

"যত ছিল নাড়া-বুনে, সবাই হ'লো কীর্ত্তনে,
কাস্তে ভেঙ্গে গড়িল করতাল।"

বর্তমানে বামুনেরা ও বোষ্টমেরা খাদ্যদ্রব্য লইয়া পুতুল-খেলা খেলিতেছেন। কিন্তু তাহাতে ভগবানের সেবা হয় না। যে উদ্দেশ্যে ঠাকুরসেবা, তাহা এখন পরিবর্ত্তিত হইয়া উদরপূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইতেছে। লোকেরা আনুকরণিক পাঠকীর্ত্তনের অভিনয় করিতেছে। অনেক স্থানে রাইকানুর গান বেশ চলিতেছে। সাধারণ লোক আবার বঞ্চকদের পাল্লায় পড়িয়া ঐগুলি কান দিয়া শুনিতেছে। বর্ত্তমানে ঠাকুর-সেবা হইতেছে না এবং পাঞ্চরাত্রিকী ঠাকুর-সেবার আনুকরণিক আড়ম্বরদ্বারা ভাগবতের কীর্ত্তনপথ বিপর্য্যস্ত হইতেছে।

আজকাল ঠাকুর-সেবা ও ভাগবত-পাঠ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। ভৃতক পাঠক ঘণ্টায় ১০৲ টাকা ফুরণে টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, কারণ উহাদ্বারা ছেলের জন্য পাখী মারিবার বন্দুক কিনিবে অথবা উহা অসৎকার্য্যে ব্যয় করিবে। বৈষ্ণব-নামধারী ভক্ত ব্যক্তি বিড়ালের জন্য মৎস্যক্রয়ের ছলে নিজেই মৎস্য ভোজন করে। এইরূপ সহজিয়া কৌপীনধারিগণের কত কি কাণ্ড চলিতেছে। ঠাকুরসেবা ছেলেখেলা নয়, উহা উপাসনার একটি অঙ্গ। সেব্যের প্রতি ভোগ্যবুদ্ধি আসিলে Dog ও God উল্টারূপে ব্যবহৃত হয়। আমরা যেন God-এর পরিবর্ত্তে Dog-এর পূজা না করি। Chemical God এর Seeming View কিছু real বস্তু নহে, উহা মেকী। আমরা জগতের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া পড়ি। Mirage (মায়া-মরীচিকা) এর প্রতি প্রধাবিত হইলে আত্মবিনাশ লাভ হইয়া থাকে। এ জগতে অনেক trap ওৎপাতিয়া রহিয়াছে। জগৎকে ভোগ করিতে গেলেই উহা আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে। বাহিরের দ্রব্যের ভোগে আকৃষ্ট হইলে আগুনের রূপে আকৃষ্ট পতঙ্গ, ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট ভৃঙ্গ, খাদ্যের লোভে আকৃষ্ট মৎস্য, ব্যাধের গানে আকৃষ্ট কুরঙ্গ ও স্পর্শ-লোভে আকৃষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। এই সংসারেও বহির্ম্মুখ লোকের জন্য ফাঁদ পাতা রহিয়াছে। এই সংসারে যাহারা ভোগের জন্য জন্মান্তর লাভ করিবে, তাহাদের জন্যই সংসার-খেদা। হস্তিনীর পশ্চাতে যেমন হস্তী প্রধাবিত হয়, তেমন বিষয়ের পশ্চাতে বিষয়ী ছুটিয়া বেড়ায়। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন না তাঁহারা বিষয়ের দুর্গতিতে পড়েন। আমরা যেরূপ বহির্ম্মুখ চিন্তাস্রোতে পড়িয়া এক একজন হিট্‌লার অথবা মুসোলিনী হইবার অদম্য স্পৃহা পোষণ করি, ধ্রুব ও প্রহ্লাদের বিচার ও উপদেশ সেরূপ ছিল না।

আমরা অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া আছি,—এই বিবেক অনেক সময়ে আমাদিগকে হরিকাথায় রুচি উৎপন্ন করায়। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতেই কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। যখন যখনই আমরা হরিকীর্ত্তন করি, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হরিস্মৃতি আসে। স্বাভাবিক রুচি উৎপন্ন হওয়ার নামই আত্মসমর্পণ। যখন আমরা বুঝিব —

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি, তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।।"

অর্থাৎ সকল engagement হইতেও বিষ্ণুর সেবা best engagement, আর যাঁহারা বিষ্ণুকে সেবা করেন, তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবা আরও শ্রেষ্ঠ engagement, তখন আমাদের জীবন সমর্পিতজীবন হইবে। জগতে বহুপ্রকার লোকের দুঃসঙ্গ করিতেছি, অধোক্ষজ কৃষ্ণের service বাদ দিয়া যে public service প্রভৃতি, তাহাতে অস্থায়ী ফলমাত্র পাওয়া যাইবে। ভগবান্ যদি অনুগ্রহ করেন, তবেই কেবল অনাবিল হরিকথা-কীর্ত্তনকারী সাধুর সঙ্গ ঘটে।

উৎক্রান্ত দশার পরে আমাদের কি জীবন হইবে, তাহা আমাদের ভাবা উচিত। পরমেশ্বর বস্তু ও আমাদের মধ্যে একটা মস্ত খানা-ডোবা আছে; সেই gulf-টাকে bridge over করা দরকার, যাহাতে খানায় না পড়িয়া সেতুর উপর দিয়া তাঁহার সম্মুখে যাইতে পারি।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় সর্ব্বদা আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। ভগবানের সঙ্গে কিরূপে Associated হওয়া যায় তাহা শ্রবণ করিতে হয়। আমরা কেহ চাকুরী করিতেছি, কেহ ব্যবসায় করিতেছি, কেহ অন্য কিছু করিতেছি; কিন্তু ইহা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরও সেই সকল স্মৃতিরই আমরা জাবর কাটিতে থাকিব।

Public service ত' জন্ম জন্মান্তর করিয়াছি, পশুরাও তাহাদের স্বজাতির জন্য নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু মানুষ হইয়া কি আমরা higher promotion পাইব না? এখানে সব সাময়িক ও নশ্বর বস্তু; যাহা চিরদিন থাকে তৎসম্বন্ধে কি আলোচনা করিলাম? এই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা এই যে, ইহাতে পর-জীবন ও নিত্য-জীবনের কথা আলোচনা করা যায়। কৃষ্ণ দয়াময়। তিনি পূর্ণবস্তু। তাঁহার দয়াও পূর্ণতা-প্রদানরূপ দয়া। পূর্ণবস্তু প্রদত্ত হইয়া যায় অপূর্ণের নিকটে। তাহাতে অপূর্ণ পূর্ণকে অনায়াসে পাইতে পারেন। পূর্ণের নিকটে না গেলে পূর্ণমঙ্গললাভ ঘটে না। খণ্ডানন্দ বা পরিমিত আনন্দ লাভ করিলে আমাদের আশা পূর্ণ হয় না।

মানুষ অত্যন্ত অহংমমাভিমানগ্রস্ত। যখন জড়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে যায় তখন 'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা', এইপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কৃষ্ণকৃপা হারাইয়া ফেলে, ত্রিগুণের উপর প্রভুত্ব করিতে গিয়া সেই গুণত্রয়েরই ভৃত্য হইয়া পড়ে, জড়ীয় বিচারে অভিভূত হয়। ইহারা বহির্ব্বিষয়কে বহুমানন করিতে গিয়া প্রকৃত-স্বার্থ-বিষয়ে অন্ধ হইয়া যায়—

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।"

(ভা ৭।৫।৩১)

আমাদের স্বার্থ-সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা-বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। অনূচানমানী পণ্ডিতব্রুব, ধন-জনাদির অভিমানমত্ত জনগণ—ভগবৎপাদপদ্ম-সেবাই যে আমাদের সকলেরই একমাত্র স্বার্থগতি, তাহা বুঝিতে পারে না। ভগবৎ-সেবা হইতে মানুষ তাহার

নিজ আধ্যক্ষিকতা-চালিত হইয়া যতই দূরে অবস্থান করিতে চাহিবে, ততই তাহার নিত্যমঙ্গলের পথ সুদূরপরাহত হইবে।

রাবণের বুদ্ধি কম ছিল না, সে এক সময় ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ সকলকে দিয়া তাহার সেবা করাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহার আধ্যক্ষিকতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া সাক্ষাৎ শ্রীরামভোগ্যা লক্ষ্মীকে কাড়িয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি বরণ করিল তখনই তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। মানুষ রাজসিক, তামসিক লোকের কুপরামর্শ-চালিত হইয়া নানা অনর্থে পতিত হয়। কুক্কুর-শৃগালভক্ষ্য দেহে 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখনই দুস্তরা দেবমায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে না। ভগবানের দয়া কেবল তাঁহাদের মধ্যেই প্রকাশিত হয়, যাঁহারা নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে—সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হন। গীতার ''দৈবী হ্যেষা গুণময়ী'' (৭।১৪) শ্লোকেও ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা ভগবানের সেবার পরিবর্ত্তে কুকুর, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, গরু প্রভৃতি পশু বা পক্ষী-সরীসৃপাদির উপর প্রভুত্ব করিতে গিয়া বস্তুতঃ তাহাদের ভৃত্য হইয়া পড়েন, ভগবদ্ভক্তিগন্ধশূন্য অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির নিকট 'ভাল লোক' বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য তাহাদের স্তাবক হন অথবা নিরপেক্ষ থাকিবার ছলনায় 'ভক্ত' নামধারী প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়েন, তাঁহাদের বিচার জগন্মঙ্গল-বিরোধী বলিয়া তাহা আদৌ প্রশংসার্হ নহে।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

''তৎপদং দর্শিতং যেন'', অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করেন। 'আমি কোথায় যাইব? কেন যাইব? যাইবার পথে কোন কিছু ব্যাঘাত আছে কিনা?'—ইত্যাদি যিনি দেখাইয়া দেন এবং যিনি মহান্তগুরুর সন্ধান বলিয়া দেন, তাঁহাকে 'বর্ত্ম প্রদর্শক গুরু' বলা হয়। মহান্ত গুরু বা জগদ্গুরু ও এক গুরুবাদের মধ্যে কি পার্থক্য আছে, তাহা আলোচিত হওয়া দরকার। একমাত্র গুরুর নির্দ্দেশ যিনি দেন, তিনিই বর্ত্মপ্রদর্শক। যেমন বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন—

চিন্তামণির্জ্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রী।।

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু তাঁহাকে বলিয়া দিলেন—''আপনি একটি ঘৃণ্যজীবের ভালবাসা পাইবার জন্য যখন এত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, সামান্য ক্ষণিক সুখের জন্য যখন এত প্রবল উদ্যমবিশিষ্ট হইয়াছেন এবং নিজের জীবনের প্রতিও লক্ষ্য করিতেছেন না, তখন এরূপ উদ্যম ও আসক্তিকে একমাত্র আশ্রয়দাতা ও

নিত্যসুখবোধতনু পরমবস্তু শ্রীহরির পাদপদ্মের জন্য যদি আংশিক চেষ্টাও করিতেন, তাহা হইলে আপনার এমন তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি আর দৃক্‌পাত হইত না। আপনি ক্ষুদ্র বস্তুর জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট না হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম আশ্রয় করুন। আপনার প্রচুর উদ্যম রহিয়াছে।''

শক্তি ও উদ্যমকে বাস্তব পরমার্থ-তত্ত্বের সন্ধানলাভের জন্যই নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। বহির্ম্মুখবিচারে হরিভজনে জীবের পক্ষে লাভের মাত্রা অল্প বলিয়া মনে হয়। সেই জন্যই জাগতিক বিষয়ী লোকেরা অনিত্যসুখকর-বস্তু-লাভের জন্য চেষ্টা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করে। যদি তাহাদের বুদ্ধি লাভ হইত, তবে এত ক্ষুদ্র বস্তুর জন্য ব্যস্ত না হইয়া তাহারা পরমবস্তু-লাভের জন্য যত্ন করিত। সেই হেতু আমাদের ভিক্ষা এই যে, মানুষ সাধুমুখে হরিকথা শুনুক। শ্রবণদ্বারা সকল প্রকারেই মঙ্গল হইবে। তখন লোক বুঝিতে পারিবে যে, ইহজগতের কথার মূল্য কত অল্প এবং উহা কত তুচ্ছ। কিন্তু মানুষেরা যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজেদের পরমমঙ্গলের কথা—পরমোচ্চ কথা শ্রবণ না করে, তাহা হইলে তাহাদের সুবিধা হইল না।

ভাগ্যবশতঃ বিল্বমঙ্গল এই কথা চিন্তামণির নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের অসৎসঙ্গে কি প্রকার মোহ উপস্থিত হইয়াছিল! প্রবাদ—পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া ভোজ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া একাকী গভীর রাত্রিতে ভীষণ ঝড় ও জলের মধ্যে তিনি বেশ্যালয়ে গমন করিয়াছিলেন। বেশ্যার বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ বলিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিবার কালে সর্পকে রজ্জুভ্রমে উহাকে ধরিয়াছিলেন। তারপর ক্লান্তদেহে সেই বেশ্যার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। মোহের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার কি অদ্ভুত তন্ময়তা আসিয়াছিল।

পথ দ্বিবিধ—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃকথা অনেক সময়ে প্রেয়ের ন্যায় প্রাকৃত-হৃৎকর্ণরসায়ন নাও হইতে পারে। কিন্তু প্রেয়ঃকথা সকল সময়েই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর। শ্রোতা অধিকাংশস্থলেই মনে করেন, আমি যাহা ভালবাসি, বক্তার মুখ হইতে তাহাই বহির্গত হউক্; কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থী মনে করেন যে, 'আপাততঃ আমার অরুচিকর হইলেও নিরপেক্ষ সত্য কথাই আমি শ্রবণ করিব'। মানুষের রুচি রকম রকম—কতকগুলি ব্যক্তি ভাবুকশ্রেণীর, কতকগুলি বিচারক, কতকগুলি সংশয়াত্মা বা সন্দেহবাদী ইত্যাদি। আমরা যে-রকম সমাজ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বর্ধিত হইয়াছি, তজ্জাতীয় চিন্তাস্রোতে বা রুচিতেই আমাদের অনেকটা ঝোঁক দেখা যায়। অন্য কথা আমাদের নিকটে বড়ই বিরুদ্ধ (revolutionary), অশ্রুতপূর্ব ও আশ্চর্যজনক বোধ হয়। কিন্তু আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে ধৈর্যের সহিত শ্রবণ করিব এবং শ্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করাই কর্তব্য, কিম্বা আপাতরমণীয় প্রেয়ঃপন্থা-গ্রহণই মানবজীবনের কর্তব্য, তাহাও নিষ্কপটভাবে বিচার করিব। যদি শ্রেয়ঃপন্থা চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও 'শ্রৌতবাণীই' শ্রবণ করিব। শ্রুতি বলেন,—''তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভি-গচ্ছেৎ।

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রীয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।।" শ্রীমদ্ভাগবতও (১১।৩।২১) সেই কথা সমস্বরে কীর্তন করিয়া বলেন, —

"তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।।"

আমরা তাদৃশ গুরুর আশ্রয় করিব, যিনি শতকরা শতভাগই (১০০%) ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। নতুবা আমি ত' তাঁহার আদর্শে শতকরা শতভাগ (১০০%) হরিসেবায় রত হইব না। শ্রীচরিতামৃতও বলিয়াছেন,—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।।"

'Platfrom speaker of 'Professional Priest' গুরু হইতে পারেন না। আমি বিজ্ঞাপন পড়িলাম, ঝাডুদারের কার্যে আমার ভাগবতপাঠ অপেক্ষা বেশী টাকা পাওয়া যায়, অমনি আমি ভাগবতপাঠকের কার্য ছাড়িয়া ঝাডুদারের কার্যের জন্য আবেদন-পত্র পেশ করিব। মানুষ সর্ব্বক্ষণ যদি হরিভজন না করেন, তাহা হইলে ত' তিনি ভগবানের নাম-বলে ইতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার যত্ন করিবেন। এই 'নাম-বলে পাপবুদ্ধি' একটি মহাপরাধ। তাঁহার যেমন দশটা কাজ আছে, দশ মিনিট বেড়াইতে হয়, পনের মিনিট খাইতে হয়, বিশ মিনিট লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার করিতে হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানটী দশটা কাজের ভিতরে একটা কাজ।

গুরু কখনও 'প্রেয়ঃপন্থা' স্বীকার করেন না, তিনি—'শ্রেয়ঃপন্থী'। তাঁহারা গুরুর নিকট হইতে তিনি যেরূপ সত্যপথে বিচরণ করিবার শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাই তিনি অপরকে বলেন। গুরুকে কেহ যদি বলেন,—'গুরুদেব! আমি মদ খাইতে চাই।' গুরু যদি শিষ্যকে প্রশ্রয় না দেন, তবেই ত' আমরা "আমার মনের রুচির অনুকূল বস্তু দিলেন না" বলিয়া তাঁহাকে গুরুপদ হইতে খারিজ করি। আর যিনি আমার ঐরূপ ইন্দ্রিয়যজ্ঞে ইন্ধন প্রদান করিতে পারেন, আমরা তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া থাকি। আমরা অনেক সময়ে 'গুরু' করি—মঙ্গল বা শ্রেয়ের জন্য নহে, পরন্তু আমাদের প্রেয়োলাভের জন্য। গুরুকরণ কার্য্যটা বর্ত্তমানকালে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে নাপিত ধোপা রাখার ন্যায় একটা লৌকিক বা কৌলিক ধারা, আর এক শ্রেণীর মধ্যে একটা 'ফ্যাসন'।

সত্য জানিবামাত্রই আমার তাহাতে নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় যার যতটুকু আছে উহার এক মুহূর্ত্তও বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত। খট্টাঙ্গ রাজা জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্তকাল, অজামিল মাত্র মৃত্যুকালটি হরিভজনে নিযুক্ত করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। আমরা বলিতে পারি, আমাদের কর্তব্য কার্য্য বাকী আছে; কিন্তু "বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ"। অন্যান্য কর্তব্যগুলি সব

জন্মেই করা যাইবে, কিন্তু জীবের একমাত্র কর্তব্য হরিভজন এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া আর অন্য সময়ে সম্পন্ন হইবে না। শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক শক্তি-উপাসক ব্রাহ্মণের রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামে একটি পুত্র ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুর্গোৎসব আগতপ্রায় দেখিয়া পুত্র রামকৃষ্ণকে কতকগুলি ছাগ-মহিষাদি শক্তি-পূজার আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের ছাগ-মহিষগুলি লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তনকালে পথে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুর মহাশয় রামকৃষ্ণকে ছাগ-মহিষগুলির বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, রামকৃষ্ণ নিষ্কপটে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পিত্রাদেশের কথা ব্যক্ত করেন। ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশে রামকৃষ্ণের চিত্ত ফিরিয়া যায়। তিনি ছাগ ও মহিষগুলি ছাড়িয়া দেন এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে কৃপা লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্রব্যসম্ভার, বিশেষতঃ পূজার মহিষ-ছাগগুলির জন্য পথপানে চাহিয়া রহিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন, আত্মজ এবার মায়ের পূজার জন্য উৎকৃষ্ট ছাগ-মহিষ ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিবে; কিন্তু পুত্রকে রিক্তহস্তে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামকৃষ্ণ, তুমি মায়ের পূজার জন্য ছাগ আনিয়াছ কি?" রামকৃষ্ণ উত্তর করিল—"পিতঃ! আমি ছাগমহিষগুলি ক্রয় করিয়াছিলাম বটে কিন্তু পথে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি। আর আমি আজ একজন পরমবৈষ্ণবের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।" এইরূপ কথায় বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যের কিরূপ ক্রোধের উদয় হইতে পারে, তাহা আপনারা সকলে অনুমান করিতে পারিতেছেন। ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"রামকৃষ্ণ! আজ তুমি পিত্রাদেশ লঙ্ঘন করিলে, মায়ের পূজার বিঘ্ন জন্মাইলে, আবার অর্থগুলি পর্য্যন্ত জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিলে! তারপর তুমি ব্রাহ্মণপুত্র হইয়া বৈষ্ণবের শিষ্য হইতে গেলে! আমাদের যে আর সমাজে মুখ দেখাইবার জো থাকিল না। না হয় তুমি কোন শাক্ত ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণব বিচার করিয়া তাহার শিষ্য হইতে। তুমি আজ অবিপ্রকে গুরুপদে বরণ করিলে! ইহা অপেক্ষা অধিক অপমানের কথা আর কি আছে? আমাদের মুখে তুমি আজ চূণকালী দিতে অগ্রসর হইয়াছ। তুমি কুলের অঙ্গার হইয়াছ। মায়ের কোপে যে সর্বনাশ হইবে।"

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সত্যকথা শুনিবার কারণ হইয়াছিল; তাই তিনি ঠাকুর মহাশয়ের মুখে সত্যকথা শুনিয়া তন্মুহূর্তেই জাগতিক কর্তব্যগুলি অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্যজ্ঞানে পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র হরিভজনে নিযুক্ত হইলেন।

আমাদের নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। আমার মঙ্গল এই দণ্ডেই গ্রহণ করা কর্তব্য। যদি আমি প্রকৃত মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমার মঙ্গলের প্রতিকূলে জগতে কাহারও কথা শুনিব না।

বর্ত্মপ্রদর্শক বা পথপ্রদর্শক গুরুর নিকট আমাদের চরম গন্তব্যপথের সন্ধান লইতে হইবে। শিষ্যের পক্ষে যোগ্যতানুসারে সেবা করা ও সেবা-বিষয়ে শ্রবণ করা দরকার। অত্যন্ত আগ্রহকারীর উপার্জ্জন অধিক হওয়া দরকার। দুষ্প্রাপ্য-বস্তু-লাভের জন্য অধিক মূল্য দিতে হয়। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুর নিকট বাস্তব-মঙ্গলের কথা আমাদের জানা নাই, সে জগতের কথা সেই জগতের লোকের নিকট হইতে জানা দরকার। সে-সকল কথা যদি এ জগতের হইত, তাহা হইলে না হয় উহা আমরা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতাম। কিন্তু মানুষের চিন্তার সীমা আর কতটুকু? মানুষ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষচতুষ্টয়ে দুষ্ট। ভ্রম—এক বুঝিতে অন্য বুঝা; প্রমাদ—অনবধানতা; বিপ্রলিপ্সা অপরকে বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা, করণাপাটব—চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। দৃষ্টান্ত—যেমন আমাদের দৃষ্টিশক্তি থাকিলেও আমাদের অতি সূক্ষ্ম ও অতি বৃহবস্তুর দর্শন হয় না। আমরা শৈশব কালে প্রাপ্তবয়সের সুবিধা ও অসুবিধা বুঝি না। বদ্ধাবস্থায় আমাদের ব্যক্তিগত অধিকার অতি অল্প। মঙ্গলার্থী ব্যক্তির পক্ষে হিতকামী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করা আবশ্যক। কোথায়, কি প্রকারে মহান্ত গুরুকে পাওয়া যাইবে, তাহা বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুর নিকট শ্রবণ করা আবশ্যক। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা লাভবান্ হইবে। পথের কোথায় কি বাধা ও গর্ত্তাদি আছে, তাহা পথের অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জানিতে হইবে। Expert-এর অভিজ্ঞতা গ্রহণ না করিয়া নিজের বিচারে কার্য্য করিলে অসুবিধা অনিবার্য্য। আবার নিজের বিচারে অনভিজ্ঞকে অভিজ্ঞ মনে করিলে কোনও সুবিধা হইবে না।

কেহ যদি আমাকে উদ্ধার করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি সদ্‌গুরু হইলেন না। যে ব্যক্তি শিষ্যকে উদ্ধার করিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া মধ্যপথে তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করে, সে গুরু-ব্রুব।

শিষ্যের পক্ষে আচার্য্যের কৃপা-লাভের জন্য eligible হওয়া দরকার, 'সমিধ্ পাণিঃ' হওয়া দরকার। সমিধ্ সংগ্রহ করিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইতে পারিলে তিনি উপনয়ন দিবেন। 'ত্বামহং উপনেষ্যে', 'উপ' অর্থাৎ বেদসমীপে। ব্রাহ্মণ বটুর intelligence ও ingredients-এর অভাব হইলে উপনয়ন দেওয়া হইবে না। শিষ্যের পক্ষে সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিবার ঐকান্তিক চেষ্টাকে যোগ্যতা বলা যাইবে। 'তদ্বিজ্ঞানার্থং—অর্থাৎ 'তৎ' যে পূর্ণবস্তু, তাঁহার বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য। অভিগচ্ছেৎ—অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের নিকট সর্ব্বতোভাবে গমন করিবে। শাস্ত্র-চৈত্ত্যগুরু হইলেন Pure unalloyed conscience. আমরা বর্ত্ম-প্রদর্শকগুরু হইতে যে পরামর্শ পাই, চৈত্ত্যগুরু তাহা approve না করিলে আমরা উহা reject করি। চৈত্ত্যগুরু কৃপা না করিলে মঙ্গল হয় না। ভগবান্ কৃপা করিলেই মনুষ্য গুরু

নির্ণয় করিতে পারে, নতুবা নিজের চেষ্টায় বঞ্চিত হয়।

যে জ্ঞান বর্ত্তমান আমাদের মধ্যে নাই আমাদের সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। জগতের বিদ্যায় প্রাপ্তজ্ঞান ইহজগতের বিষয়েরই আলোচনার ফলমাত্র। 'শ্রৌতপথেই দিব্যজ্ঞান অথবা আমাদের বিচারের উন্নত জ্ঞানলাভ হইবে', এইরূপ মনে করিলেই মঙ্গল হইবে। কর্ম্মীরা বলেন—বিদ্যা, ধন ও শারীরিক শক্তি লাভ করিলে আমাদের সুবিধা হইবে। চার্ব্বাক্ বলেন—'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' কাহারও মতে, আপাততঃ তাহার নামের বিশ্লেষণে 'চারুবাক্'; এরূপ কতকটা বুঝাইলেও তাহার মতবাদ সম্পূর্ণ ভাবে নাস্তিকতাপূর্ণ। Epicurus-এর মতেও অনেকটা এইরূপ—Eat, drink and be merry, for to-morrow you may die.

আমরা যতই জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করি না কেন, আমরা ভূত ও ভবিষ্যৎ জানি না। আমাদের উন্নতির বিচারে ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে। পার্থিব উন্নতির বিচারে অসদ্গুরু লাভ হয়। শিষ্যকে জাগতিক উন্নতির পরামর্শ দিলে পরামর্শদাতা 'শূদ্র' হইয়া যান। পিতামাতা, পুরোহিত প্রভৃতি জাগতিক গুরুগণ আমাদের আর্থিক উন্নতি ও তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির কথা বলিয়া থাকেন। আমরা ইহজগতে কতদিন থাকিব? নিত্যকাল নিত্যজীবনের সুবিধালাভের পরামর্শ কে দিবেন? ভাবিকালের বিষয় আলোচিত হওয়া দরকার।

মৃত্যুকালে আমাদের কি চিন্তা হইবে? 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' আমরা যেরূপ চিন্তাস্রোত লইয়া মরিয়া যাইব, জন্মগ্রহণকালে তদনুরূপ জীবন লাভ হইবে। Materialist-দিগের ধারণা মৃত্যুর পর কিছুই নাই। জড়বস্তু হইতে জীবের জন্ম। Altruism-এর মূল কথা এই যে, 'অপরের যত বেশি উপকার করিব আমি তত বেশি উপকার পাইব।' শ্রীগুরুদেব বলেন—আমরা 'designing enterprise' অর্থাৎ বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা, বিদ্যৈষণা প্রভৃতি এষণা ও বাসনার বশবর্ত্তী হইলে আমাদের আত্মকল্যাণ-লাভ হইবে না। পুণ্য করিয়া মরিলে ধনী, পণ্ডিত অথবা স্বাস্থ্যবান্ লোকের গৃহে জন্মিতে পারি। মানুষ হইয়া পুনরায় মানুষের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু প্রকৃত মঙ্গললাভ নাও হইতে পারে। জাগতিক পুরোহিত ও গুরু ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের উপদেশক মাত্র। বদ্ধজীবের বাসনা ইহজগতের উন্নতি ও মঙ্গলের দিকে প্রধাবিত হয়।

পাঠশালার গুরু, আমার বিভিন্ন জাগতিক বিদ্যাশিক্ষার গুরু প্রভৃতি সকলেই জাগতিক গুরু। পিতামাতার পরামর্শ গ্রহণ করিলেও মৃত্যুলাভ করিতে হইবে। হরিভজনকারী ব্যতীত অন্যলোককে পরামর্শদাতা মনে করিলে খুবই অসুবিধা হইবে। আমরা যে

কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিব না। পিতামাতা যদি হরিভজন করেন, তবে গুরু হইতে পারেন । যিনি আমাদের নিত্যমঙ্গল দিতে পারেন না, তিনি গুরু নহেন।

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্।।
(ভাঃ ৫।৫।১৮)

(৫)

দেবীধামের সকল জন্ম অপেক্ষা মনুষ্যজন্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, একমাত্র এই জন্মেই ভগবদ্‌ভজন দ্বারা গুণময় জগৎসমূহ হইতে উদ্ধার পাইবার (Transcend করিবার) সুবর্ণ সুযোগ লাভ হইয়াছে; অন্য জন্মে তাহার সম্ভাবনা নাই। পশ্বাদি-জন্মে বিবেকের অভাব এবং দেবজন্মাদিতে ভোগের প্রাচুর্য্য আমাদিগকে বিপথে আবদ্ধ করিয়া রাখে। মনুষ্যজন্মটি চিরদিন থাকিবে না, কখন শেষ হইবে কেহ বলিতে পারে না। পরীক্ষিৎ মহারাজ সাত দিনের নোটিশ পাইয়াছিলেন। আমরা এক মুহূর্ত্তের নোটিশও না পাইতে পারি। বহুলক্ষ জন্মের পর মনুষ্যজন্ম—ভগবানের কথা শুনিবার মত জন্ম পাইয়াছি। মনুষ্যগণের মধ্যেও কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি পশু প্রকৃতির লোক আছে, যাহারা পশুবৎ জীবন যাপনই ভালবাসে। কিন্তু ভগবনের বিশেষ করুণায় আমরা বহুভাগ্যে সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সভ্যতার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে—ভগবানের ভজনের দ্বারা। ভগবানের সেবা না করিলে আমরা অসভ্যগণের নিকৃষ্ট। সাধুর নিকট নিরন্তর শ্রীহরিপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে হইবে, নতুবা সভ্যতার কোনও মূল্য নাই। ভোগের বা ত্যাগের পূতিগন্ধে যদি সভ্যতাকে দুর্গন্ধপূর্ণ করিয়া বসি, তাহা হইলে মনুষ্যজীবনের সদ্ব্যবহার হইল না। শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে উপদেশ করিতেছেন—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।।
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

পুনরায় বলিতেছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।।
(ভাঃ ১১।২০।।১৭)

এই নৃদেহটি হরিভজনের মূল বলিয়া আদ্য। ইহা দুর্ল্লভ হইলেও আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ এখন আমাদের নিকট সুলভ, কারণ আমরা ইহা পাইয়াছি। ভব-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র পটুতর নৌকা এই মনুয্যদেহ। শ্রীগুরুপাদপদ্মই ইহার কর্ণধার। এই কর্ণধারের সুকৌশলে কৃষ্ণ-কৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা পরিচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসারসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী। এই শুদ্ধভক্তির আচার্য্যই দেহতরীর উপযুক্ত কাণ্ডারী। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অজ্ঞ মাঝিকে যদি কর্ণধারপদে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে নৌকা ভবসাগরেই ডুবিয়া থাকিবে, উদ্ধারের আর উপায় নেই। শ্রীমদ্ভাগবতের "ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্", "যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ" প্রভৃতি শ্লোক ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মনুয্যজাতি যখন শোক, মোহ ও ভয় হইতে নিষ্কৃতি চাহে তখন তাহাদের পক্ষে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করাই একমাত্র কৃত্য। ইহার আর alternative (পন্থান্তর) নাই।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা।।

(ভাঃ ১।৭।৬৭)

জীবাত্মার চেতনের ধর্ম্ম যখন আবরণ-শূন্য হয়, তখন তাহার সেবা ভগবানের ইচ্ছায় খাপে খাপে মিলিয়া যায়। যাহাতে ভগবানের আনন্দ হয়, ঠিক সেই ভাবেই তিনি কার্য্য করিয়া থাকেন।

আত্মার নিত্যা বৃত্তি জাগ্রত করিয়া ভগবানের সেবালাভের জন্য নিরন্তর যত্ন করিতে হইবে? কিন্তু পথে চোরা-বালিতে (treacherous soil-এ) পা বসিয়া না যায়, তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, যোগকাণ্ড, পঞ্চোপাসনা প্রণালী প্রভৃতির চিন্তাস্রোত চোরাবালিরূপে সর্ব্বনাশ করিতে পারে। তজ্জন্য সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে। কৃষ্ণ কি, কৃষ্ণপ্রেমা কি প্রভৃতি বিষয় শ্রবণ করিতে হইবে। অকালপক্ক নির্জ্জন-ভজনানন্দিব্রুবদলের রসের ভজনের নামে কুরসে মগ্ন থাকায় যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে সতর্ক হইতে হইবে। 'তত্ত্ববিবেক' বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। বুদ্ধিমান্ যাঁহারা-তাঁহারা ক্ষীর ভক্ষণ করেন—কাদা ভোজন করেন না। অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্মে বা শুদ্ধভক্তিতে 'কৃষ্ণপ্রেম'-ক্ষীর লাভ হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে প্রাকৃত-সহজিয়া-বৃত্তিতে জড় ভাবুকতার পঙ্ক লাভ হয় মাত্র।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণচন্দ্রের আলোকের নিকট অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, প্রকৃতির আলোক বিন্দুমাত্রও স্থান পায় না। সূর্য্য প্রভৃতি তাঁহার নিকট হইতেই রশ্মিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিসম্বন্ধে শ্রুতি (কঠ ২।২।১৫, মুণ্ডক ২।২।১০, শ্বেতাশ্বতর ৬।১৪) বলিতেছেন,—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।।

অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবালাভের জন্যই যত্নপর হইতে হইবে। তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন, সেই ব্যক্তির তিনি ব্যতীত আর কোনও সম্পত্তি থাকে না--- "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" কৃপাময় তিনি, এই হরণকার্য্যে দক্ষ বলিয়াই তিনি শ্রীহরি। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত বা শ্রীর গর্ব্বে গর্ব্বিত থাকিলে আর তাঁহার কৃপা পাওয়া যাইবে না, বদ্ধ ত্রিতাপের ভূমিকায়ই অবস্থান হইবে।

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধ মানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।।

(ভাঃ ১।৮।২৬)

প্রেয়ঃ-পন্থায় চালিত হইলে শ্রেয়ঃপন্থা ভাল লাগে না। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রেয়ঃপন্থা গ্রহণপূর্ব্বক মৃত্যুকালপর্য্যন্ত ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবরণ সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হইলে স্বরূপ-সিদ্ধির অবস্থা। তৎপরে ভগবদিচ্ছায় বস্তুসিদ্ধি। স্বরূপসিদ্ধি হইতে শুদ্ধভাবে ভজন হইতে থাকে। বস্তুসিদ্ধিতে নিত্যলীলায় প্রবেশপূর্ব্বক ভজন। যে কোনও মুহূর্ত্তে যখন এই জীবনপাত হইতে পারে, তখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও বলেন না যে, বৃদ্ধকালে ভজন করিব – এখন গৃহসুখ ভোগ করিয়া লই।

একটি কথা আছে যে, "পরের সোনা দিও না কানে। প্রাণ যাবে তোমার হেঁচ্ কা টানে।।" জগতের সমস্ত জিনিষই ভগবানের। তাহাতে লোভ করিলেই অসুবিধায় পতিত হইবে।
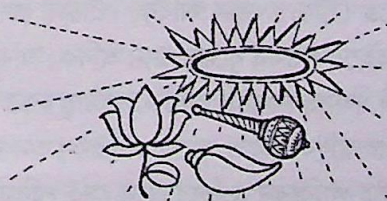
# দ্বিতীয় অধ্যায়

## সত্যং পরং ধীমহি

### (১)

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।"

কোনও বস্তুবিষয়ের জ্ঞানলাভ দুইপ্রকারে সাধিত হয়। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়জ ধারণায় বা সমষ্টিগত ইন্দ্রিয়জ-ধারণায় আরোহবাদাশ্রয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে বস্তুর যে কল্পিত প্রতিফলন, তাহা একপ্রকার জ্ঞান বটে, কিন্তু উহা-দ্বারা বাস্তবসত্য বস্তু নির্ণীত হয় না। কিন্তু বাস্তবজ্ঞান সাক্ষাৎ সেই নিত্য-সত্তাবান্ বস্তু হইতে নির্গত হইয়া আমাদের প্রাক্তন জ্ঞান বা ধারণার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। উদারহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—যেমন, সূর্য্যের নিকট হইতে আলোক আগমন করিয়া যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকে পতিত হয়, তখন তাহা-দ্বারা সূর্য্যের যে দর্শন-লাভ হয়, তাহাই সূর্য্যসম্বন্ধে বাস্তবজ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—বাস্তব-জ্ঞানই বেদ্য।

ইন্দ্রিয়-দ্বারা যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা বস্তুবিষয়ক জ্ঞান নহে; —যেমন কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' যদি কাব্যরসে অনধিকারী অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরিপক্কবুদ্ধি কোন বালকের হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে সে ঐ কবির কাব্যের কোন মধুরতাই উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু তাহাই যদি আবার কোন পরিণতবয়স্ক পরিপক্কবুদ্ধি কাব্যবিষয়ে অধিকারি-ব্যক্তির আলোচনার বিষয় হয়, তাহা হইলে কবির কাব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধ হইয়া থাকে। বহির্জ্জগতের জ্ঞান—পরিবর্ত্তনশীল বা কালক্ষোভ্য; উহা অভিজ্ঞতা ও সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। বালকের জ্ঞান হইতে যুবার জ্ঞান অধিক, যুবার জ্ঞান হইতে প্রৌঢ়ের জ্ঞান অধিক, প্রৌঢ়ের জ্ঞান হইতে বৃদ্ধের জ্ঞান অধিক, অশীতি-বর্ষ বৃদ্ধ হইতে শতবর্ষ বৃদ্ধের জ্ঞান অধিক; আবার, শতবৎসর পরমায়ু এবং তদপেক্ষা কেহ যদি দশসহস্রবৎসর অধিক পরমায়ু লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান আরও অধিক হইতে পারে। এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া যিনি যত অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাঁহার জ্ঞান সেই পরিমাণে তত অধিক হইতে থাকিবে এবং পূর্ব্বপূর্ব্বজ্ঞান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, পরিমেয়, অসম্পূর্ণ বা নানা-প্রকারে অধিকতর দোষযুক্ত বলিয়া উপলব্ধ হইবে; সুতরাং যে জ্ঞান এরূপ পরিবর্ত্তনশীল,

পরিমেয়, অসম্পূর্ণ ও কালক্ষোভ্য, সেইরূপ জ্ঞান কখনও আমাদিগকে বাস্তবজ্ঞান বা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া দিতে পারে না। এইরূপ জ্ঞানের নামই অধিরোহ বা অক্ষজ জ্ঞান।

অধিরোহ-বাদীর ধারণা এই যে, উপায়ের দ্বারা লভ্য উপেয়বস্তুর লাভ হইয়া গেলে উপায় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের উপায় ও উপেয় ভেদ আছে; এমন কি, তাঁহাদের ধারণা,---উপায় এতদূর অনিত্য ক্রিয়াবিশেষ যে, উপায়ের হাত হইতে কোনপ্রকারে পরিত্রাণ পাইলেই 'রক্ষা পাইয়াছি' বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন। নীচ হইতে উপরে উঠিবার চেষ্টার নাম অর্থাৎ জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহপূর্ব্বক জাগতিক অভিজ্ঞান ও ইন্দ্রিয় সম্পত্তি লইয়া উপরের বস্তু দেখিবার প্রয়াসের নাম--- 'আরোহবাদ'; উহা-দ্বারা বাস্তব-বস্তুর জ্ঞান-লাভ হয় না। বাস্তব-বস্তু অনেকসময়ে কল্পনার ছাঁচে কাল্পনিক বস্তুরূপে গঠিত হইয়া কাল্পনিক জ্ঞান উদয় করায়।

সূর্য্য হইতে আলোক নির্গত হইয়া যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকে পতিত হয়, তখন ইহাতে কোন বাধা নাই; ইহা—নির্ব্বাধ-জ্ঞান। যেমন পৃথিবী হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইয়াও সূর্য্য যেস্থানে আছে, সেইস্থান হইতেই সূর্য্যালোক নির্গত হওয়ায়, সত্যিকার আলোকের অপলাপ বা পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, তদ্রূপ বাস্তব-বস্তুর জ্ঞানটী আমার নিকটে অবতরণ করিয়া আমাকে বাস্তব-বস্তু দর্শন করাইতেছে; ইহারই নাম--- 'অবতারবাদ'। স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট বাস্তববস্তু যখন নিজেই তাঁহার স্বরূপ প্রপঞ্চে নির্ব্বাধ ও অবিকৃতরূপে দর্শন করাইয়া থাকেন, তখনই বস্তু-বিষয়ে বাস্তবজ্ঞান-লাভ হয়; ইহারই নাম অবরোহবাদ বা অধোক্ষজ-সেবা-পথ।

''আত্মার নিত্যবৃত্তি''-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগের সর্ব্বপ্রথমে 'আত্মা' কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে সুষ্ঠু অভিজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। 'আত্মা'-শব্দের অর্থ 'আমি'। এই 'আত্মার' বা 'আমি'র বিচার করিতে গিয়া প্রথম-মুখে বহির্জ্জগতের জীবের বিচার এই হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম-নির্ম্মিত স্থূলদেহ-ই 'আমি'। 'স্থূলদেহ-ই আমি' এইরূপ অনুভূতি আসিলে আমরা স্থূলশরীরকেই নানা-প্রকারে সাজাইয়া থাকি; ভাল খাওয়া-দাওয়া, ভাল থাকার জন্য ব্যস্ত হই;—শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্'' এই মন্ত্র-সাধনই তখন আমাদের অনুশীলনীয় ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

যখন আমরা কেবলমাত্র স্থূলশরীরকেই 'আমি' মনে না করিয়া স্থূলশরীরের মধ্যস্থিত চেতনের বৃত্তিটুকুকে অর্থাৎ স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীরের মিশ্রভাবকে বা চিদাভাসকে 'আত্মা' বলিয়া মনে করি, তখন আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে সূক্ষ্মশরীরকেই 'আমি' বলিয়া বিচার করি, এবং নানা-প্রকার বাহ্যক্রিয়া-কলাপাদি-দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি বিধান-কল্পে যত্ন করিয়া থাকি। তখন আমাদের বিচার উপস্থিত হয়,—'কেবল নিজ স্থূলশরীরেই

'আমিত্ব' আবদ্ধ না রাখিয়া ঐ 'আমিত্ব'-কে কিছু বিস্তার করা যাউক'; তখন আমরা ভাবি,—'হৃদয় বিশাল করা কর্ত্তব্য, পরোপকারব্রত পালন এবং জগদ্বাসীর স্থূলশরীরের উপকার করা কর্ত্তব্য, স্থূলশরীরের সেবা-শুশ্রূষা ও রক্ষার জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয় ও সেবাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন করা আবশ্যক, সমাজের সংস্কার করা কর্ত্তব্য, দেশের স্বাধীনতা লাভ করা দরকার, সত্যকথা বলা কর্ত্তব্য, পাঁচটা লোককে খাওয়ান-দাওয়ান—একটা ভাল কার্য, সামাজিক-বিধি বিধান করা কর্ত্তব্য, অশান্তি নিরাকারণ করা আবশ্যক, নীতিপরায়ণ হওয়া উচিত, সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি, পরিপুষ্টি ও তোষণের জন্য বিদ্যাভ্যাস, কাব্য, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার বা দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনা আবশ্যক'; —এইরূপ নানা-প্রকার চিন্তা-স্রোত ও ক্রিয়া-কলাপ তখন আমাদের বৃত্তি বা স্বভাব হইয়া পড়ে। যখন আমরা স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরকেই 'আত্মা' বলিয়া মনে করি, তখন ঐসকল বিচারচিন্তা ও ক্রিয়া-কলাপই আমাদের নিত্য-বৃত্তি বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু শ্রুতি ও তদনুগ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর 'আত্মা' বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই, (গীতা ২।২০,২২)—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।"
"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।"

স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর---এই দুইটী উপাধি বা অনাত্মবস্তু। আত্মা---অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনশীল; দেহ ও মন—পরিবর্ত্তনশীল। মনের ধর্ম্মে পরস্পর প্রণয় ও বিবাদ-বিসম্বাদ বা রাগ ও দ্বেষ বিরাজমান। স্বার্থসিদ্ধির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত হইলেই 'বিবাদ' এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত না হইলেই 'প্রণয়'। প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা দেহ ও মনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি,—প্রতিমুহূর্ত্তে দেহপরমাণুসমূহ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নবপ্রসূত শিশুর দেহ, বালকের দেহ, কিশোরের দেহ, যুবার দেহ, প্রৌঢ়ের দেহ ও বৃদ্ধের দেহে রূপগঠন—পরস্পর পৃথক্। আমাদের মনের অবস্থাও প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, —প্রাতঃকালের মন, মধ্যাহ্নের মন, প্রদোষের মন, রাত্রিকালের মন ও নিশীথের মনের অবস্থায় পরস্পর ভেদ। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় "আমি" বস্তুকে আবরণ করিয়া ইতর কিছু প্রদর্শন করিতেছে। আমরা যদি ধান্যক্ষেত্রে ধান্যের সহিত সমবর্দ্ধিত শ্যামাঘাস ও মুস্তক প্রভৃতি আগছাগুলিকে দূর হইতে 'ধান্যক্ষেত্র" বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে উহা-দ্বারা বস্তুর যাথার্থ্য নিরূপিত হইল না। ধান্যক্ষেত্র হইতে আগাছা উৎপাটন করিলে তবে উহাকে 'ধান্যক্ষেত্র' বলিবার সার্থকতা হইবে। অচেতন ও চেতনের বৃত্তির একত্র সমাবেশ হইয়া বর্ত্তমানে মিশ্রচেতনভাবকে আমরা অনেক-সময় "আমি" বলিয়া মনে করি। কিন্তু চেতন—স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। যদি মনই 'আমি' হইত, তাহা হইলে

মন 'আমি যাহা নই, তাহা আমাকে মনে করাইতেছে কেন? মন ত' চেতনের আলোচনা করে না, মন ত' সর্ব্বদা অচেতনবস্তুর দর্শনে নিজকে নিযুক্ত করিয়া রাখে। মন কেবল-চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট নহে,---অচেতন-ধর্ম্মের সহিত সম্যক্ সংমিশ্রণ-ফলে কেবল চেতনধর্ম্মযুক্ত বস্তুর দর্শনে অসমর্থ। আত্মা কখনও অনাত্মার অনুশীলন করে না। আত্মবস্তু—নিত্যবস্তু, অপরিণামি বস্তু। মনই যদি 'আত্মা' বা 'নিত্যবস্তু' হইত, তাহা হইলে আমি একসময়ে মূর্খ, একসময়ে পণ্ডিত, একসময়ে নিদ্রিত ও একসময়ে জাগরূক থাকিই বা কেন? আত্মার ত' কখনও অচেতন-বৃত্তি নাই।

আত্মার বৃত্তি—একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন; আত্মবৃত্তিতে অন্য কোনপ্রকার ব্যাপার নাই। চেতনের বৃত্তির বা ধর্ম্মের অপব্যবহার-ফলে পরমাত্মা ব্যতীত খণ্ডবস্তুতে মমতা-নিবন্ধন আমাদের আত্মার বৃত্তি লুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 'আত্মার বৃত্তি লুপ্ত' -- এ'কথাও ঠিক নয়; কারণ চেতনের বৃত্তি কখনও লুপ্ত থাকে না; চেতনের বৃত্তি—সর্ব্বদা ক্রিয়াশীলা; তবে আত্মার বৃত্তির দ্বারা যখন পরমাত্মার অনুশীলন হয়, তখনই আত্মার বৃত্তির যথার্থ ব্যবহার।

যখন আত্মবৃত্তির দ্বারা আত্মানুশীলন হইতেছে না, তখনই আত্মার বৃত্তি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, জানিতে হইবে; তখনও আত্মবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু অনিত্য-বস্তুতে ধাবিত হইতেছে—এইমাত্র; যেমন, 'আমরা যদি কাশীতে যাইব' মনে করিয়া হাওড়া-ষ্টেশনে উপস্থিত না হইয়া শিয়ালদহ-ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দার্জ্জিলিং-এর গাড়ীতে চড়িয়া বসি, তাহা হইলে আমাদের ষ্টেশনে যাওয়া হইল, গাড়ীতে চড়া হইল, শারীরিক চেষ্টা-মাত্র করা হইল; কিন্তু আমাদের গন্তব্যপথে পৌঁছান হইল না। আমাদের আত্মার বৃত্তিটী ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, কিন্তু অনাত্মবস্তুতে নিযুক্ত করার ফলে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, —আত্মার বৃত্তিটী আছে, কিন্তু তাহার অপব্যবহার হইতেছে মাত্র। বর্ত্তমান-কালে চেতনের বৃত্তিদ্বারা দর্শন-স্পর্শনাদি ব্যাপার নশ্বর জড়বিষয়ে নিবিষ্ট রহিয়াছে। 'আমি'র বা আমার অনুশীলনীয়—একমাত্র 'পরম'+'আত্মা'; কিন্তু বর্ত্তমানকালে পরমবস্তুর অনুশীলন না হইয়া অ-পরম (অবম) বস্তুর অনুশীলন হইতেছে; নাসিকা এখন দুর্গন্ধ গ্রহণ করিতেছে, চক্ষু এখন কুরূপ দর্শন করিতেছে,—ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রয়োগে এখন ভুল হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানকালে ''আমার সুখ' ও 'আমি'—এই উভয়ের মধ্যে যে মিত্রতা, তাহা কাল্পনিক-মাত্র। আমি যদি প্রকৃতপক্ষে সুখের অধিকারী হই, তাহা হইলে আমাকে সুখভোগাধিকার হইতে কে বঞ্চিত করে? কিন্তু স্পষ্টই দেখিতে পাই,—সুন্দর দন্ত, প্রখরদৃষ্টি চক্ষু, সকলই নষ্ট হইয়া যায়; বার্দ্ধক্যে স্পর্শশক্তিও কম হইয়া পড়ে। আসব অর্থাৎ মদ্য একক্ষণের জন্য আনন্দ প্রদান করিয়া পরমুহূর্ত্তেই আনন্দের অভাব আনিয়া দেয় কেন?

যাহারা দেহ ও মনের দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের সেবা করে, তাহাদের জন্য সমুচিত দণ্ড অপেক্ষা করিতেছে; —তাহারা পুনঃ পুনঃ দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হইবে। নিত্য-

বৃত্তির অপব্যবহার-ফলেই এইরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশার মধ্যে যখন কোন মহাজন কৃপা করিয়া আমাদের দুর্দ্দশার কথাগুলি জানাইয়া দেন, যখন আমরা কায়মনোবাক্যে সেই মহানুভবের চরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার আনুগত্যে ভগবৎসেবায় উন্মুখ হই, তখনই আমাদের মঙ্গলোদয়ের কাল উপস্থিত হয়; (ভাঃ ১০।১৪।৮)—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।।"

অনাত্মবৃত্তিতে সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়া-সমূহ যদি আত্মার বৃত্তি হইত, তাহা হইলে সমস্তই আমাদের দেহের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিত। কিন্তু আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম ধারণা এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এখানেই পড়িয়া থাকে।

তবে 'আত্মার বৃত্তি কি?'—এই বিষয়ের অনুসন্ধান-স্পৃহা আমাদের চিত্তে উপস্থিত হয়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন,—কেবল চেতনভাব বা চিন্মাত্রই আত্মার বৃত্তি। অবশ্য যে চিন্মাত্রোপলব্ধিতে জড়ত্ব নিরাসপূর্ব্বক অপ্রাকৃতত্ব স্থাপিত হইয়াছে, সেই চিন্মাত্রে দোষ নাই। কিন্তু যে চিন্মাত্রে চিৎএর বিলাস নাই, তাহাকে 'নাস্তিকতা' ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। পরমাত্মার সহিত আত্মার বিলীন হইয়া যাওয়ার বিচারে আত্মার কোন ক্রিয়া থাকে না। আত্মা—চেতনধর্ম্মযুক্ত; চেতনের ক্রিয়া অর্থাৎ চিদ্বিলাস না থাকিলে আত্মার বিনাশমাত্র সাধিত হয়। ঐরূপ কাল্পনিক চিন্মাত্রের সহিত প্রস্তরতার ভেদ কোথায়? রূপদর্শন, ঘ্রাণগ্রহণ, রসাস্বাদন, ত্বক্‌স্পর্শ ও শব্দশ্রবণাদির ফলে আনন্দের উদয় হয়। যেস্থলে চেতনের ক্রিয়া থাকে না, যেস্থলে 'আস্বাদ্য' 'আস্বাদক' ও 'আস্বাদন'-ক্রিয়ার নিত্য অবস্থান নাই, সেইস্থলে আনন্দের উপলব্ধিই বা কোথায়? ত্রিগুণাত্মক আমি দোষযুক্ত বটে, কিন্তু ত্রিগুণাতীত আমি—নিত্য সত্য ও উপাদেয় বস্তু। উপাদেয়ের সহিত অনুপাদেয়ের, সাম্যবিচারে যদি উপাদেয় বস্তুই পরিত্যক্ত হইল, তাহা হইলে সেইরূপ নিষ্ক্রিয়াবস্থা ত'—প্রস্তরাদি অচেতন বস্তুতেও রহিয়াছে! জড়দোষ নিরাকরণ করিতে গিয়া সদ্‌গুণেরও নিরাকরণ করিতে হইবে,—এইরূপ যুক্তি বা চেষ্টা মূর্খতা বা আত্মবঞ্চনামাত্র,—যেমন, আমার একটী ফোঁড়া হইয়াছে; আমি কোন বৈদ্যের নিকট গমন করিয়া আমার ফোঁড়ার যন্ত্রণা হইতে নিরাময় করিবার জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন,—"তুমি গলায় ছুরি দাও, তাহা হইলেই ফোঁড়ার যন্ত্রণা হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।" ফোঁড়া আরোগ্য করাই আমার দরকার, আত্মবিনাশ আবশ্যক নহে। মায়াবাদিগণ ফোঁড়া নিরাময় করিতে গিয়া আত্মবিনাশ করিয়া ফেলেন। এই অচিদ্বৈচিত্র্যযুক্ত পৃথিবীর অসুবিধারই চিকিৎসা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া চিদ্বৈচিত্র্যও নাশ বা অস্বীকার করিতে হইবে—এইরূপ কুবিচার

মূর্খতা-মাত্র। ভক্তগণ এই পরামর্শ গ্রহণ করেন না। 'আমি'র বৃত্তি—চেতনের বৃত্তি নাশ করা কখনও বিধেয় নহে; 'আমি' নয় যে বস্তু, তাহার বিনাশ হউক। চেতনের নিত্যসত্য বৃত্তি আত্মবিনাশকে সর্ব্বপ্রকারে নিষেধ ও ধিক্কার করিয়া থাকে। আত্ম-বিনাশরূপ কাল্পনিক শান্তি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি চাহেন না। পরমাত্মার অনুশীলনই আত্মার নিত্যবৃত্তি। আরোহবাদ-দ্বারা-লব্ধ নির্ব্বিশিষ্ট-ভাব—নাস্তিকতা-মাত্র, উহা 'ধর্ম্ম'-শব্দ-বাচ্য নহে; উহা ধর্ম্ম-চাপা-দেওয়া কথা মাত্র। আমি আর যাইতে পারি না বলিয়া যাইতে যাইতে যাওয়ার কথা চাপা দিয়া নির্ব্বিশেষ-ভাবকে বরণ করা—একটা জাগতিক অনুমান-প্রসূত কষ্টকল্পনা-মাত্র অনাত্মবস্তুর দোষসমূহকেও আত্মবস্তু-মধ্যে গণনা করা, অচিদ্বিলাসের হেয়তা-সমূহকেও চিদ্বিলাসমধ্যে কল্পনা করা—অতিরিক্ত বাক্যবিন্যাস বা প্রজল্প-মাত্র। দেহ ও মনের অনুশীলন কখনও "নিত্য-বৃত্তি"-শব্দ-বাচ্য নহে। 'আমি' জিনিষটী 'পরম আমার' অনুসন্ধান করে—'আত্মা' 'পরমাত্মার' অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

জগতের বিচারপ্রণালী লইয়া আমরা অনেকক্ষণ-পর্য্যন্ত 'দাবা' খেলিতে পারি, কিন্তু তাহা-দ্বারা বাস্তব-সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। আত্মার কথা দ্বারা আত্মার অনুশীলন হয়। ছান্দোগ্যের 'কেন কং বিজানীয়াৎ' মন্ত্রে অনাত্মনিরাস সূচিত হইয়াছে। অনাত্ম-বস্তুতে যাহাদের 'আত্মা' বলিয়া বিচার উপস্থিত হয়, তাহাদের অক্ষজ-জ্ঞানোত্থ বিচার নিরসন করিবার জন্যই শ্রুতির উক্ত মন্ত্র; কারণ, বৃহদারণ্যকশ্রুতি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" মন্ত্রে আত্মার দ্বারাই আত্মার অনুশীলন-কর্ত্তব্যতার কথা বলিয়াছেন। মুণ্ডকের "দ্বা সুপর্ণা", শ্বেতাশ্বতরের "অপাণিপাদঃ" মন্ত্রসমূহ জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য সেব্যসেবক-সম্বন্ধ এবং ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিমত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

জড়জগতে একটী মাটীর জিনিষ অপর একটী মাটীর জিনিষের সহিত আলাপ করিতে পারে না এবং দুইটী মাটীর জিনিষ একসঙ্গে পরস্পর মারামারি করিয়া ভগ্ন হইয়া গেলেও কিছু হয় না। পরমাত্মা—প্রযোজক কর্ত্তা, জীবের তাৎকালিক বদ্ধাভিমানের যোগ্যতানুসারে তাহাকে সুখদুঃখরূপ ফল ভোগ করা'ন। তখন বদ্ধজীবের দর্শনে জগদ্রূপি-ভগবান্ ভোগ্য হইয়া পড়ে। 'ঈশাবাস্য'-শ্রুতি তাহার হৃদয়ে জাগরূক থাকে না। সে মনে করে,—'জিহ্বা হইয়াছে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার জন্য, 'কুক্কুর-দন্ত' হইয়াছে মৎস্য-মাংসাদি বস্তু গ্রহণ করিবার জন্য, উপস্থ হইয়াছে আমার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য।' অনাত্মবৃত্তিতে 'আমি'—বহু স্ত্রীর ভর্ত্তা, বহু আশ্রয়ের 'বিষয়' ও বহু বিষয়ের 'আশ্রয়' এবং বহুস্থানের মালিক। এইরূপ অসদ্-বুদ্ধিতে জীবগণ নিজদিগকে 'কর্ম্মফলের ভোক্তা' কল্পনা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়। এই দুঃসঙ্গের প্রবলতা-বশতঃ ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছার নিমিত্ত সমগ্রজগৎ লালায়িত। যেখানে যত বক্তা, যেখানে যত ধর্ম্মের শ্রোতা, সকলেই প্রথমেই জানিতে চা'ন,—তাঁহাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণের কি কথা

আছে। তাঁহারা অনাত্মবৃত্তির কথার জন্য লালায়িত। 'আমার ভোগ' 'আমার সুখ' 'আমার শান্তি' 'দেহি'-'দেহি'-রবে জগৎ পরিপূরিত; —কেহই কৃষ্ণের কথা, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা একবারও ভুলক্রমেও কীর্ত্তন করে না। যে-দিন ভোগের 'হৃষীকেশের সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য' বলিয়া আমাদের মনে হইবে, সেইদিনই আমাদের মঙ্গল উপস্থিত হইবে।

দেবতা হউক, মানুষই হউক, ভগবদনুশীলনই সকলের একমাত্র নিত্যকৃত্য। 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং' শ্রুতি-মন্ত্রে পুণ্য ও পাপময় কর্ম্মকাণ্ডকে নিরাস করা হইয়াছে এবং 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' এই গীতোপনিষদ্‌বাক্যে 'পরম সমতা' উপদিষ্ট হইয়াছে।

যেখানে যত অস্তিত্ব বা অস্মিতা আছে, সেই সমস্ত অস্মিতার দ্বারা পরমপুরুষেরই সেবা হওয়া উচিত; আমরা যে যেখানে অবস্থিত আছি, সেখান হইতে হরিসেবাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহজগতে ও পরজগতে দেব, মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যতপ্রকার অস্তিত্ব, তাহাদের সকলেরই ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোনই কৃত্য নাই। অন্য সমস্ত ক্রিয়া 'আত্মবৃত্তি' শব্দ-বাচ্য নহে; কেন না, অন্য বস্তু বা অন্য বৃত্তি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

মানবের মধ্যে যাঁ'রা নিজদিগকে 'সভ্য' ব'লে পরিচয় প্রদান কর্‌তে বিশেষ আগ্রহযুক্ত, তাঁ'রা বলেন,—যদি আমরা Civic rule (পৌরজনগণের পালনীয় নিয়ম)-গুলি পালন করি, তা' হ'লে পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হ'বে না, আমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে এই সংসারে বহির্ম্মুখতা অবলম্বন ক'রে বাস কর্‌তে পার্‌ব।' এ-সকল বিচার কর্ম্মপন্থী ব্যক্তিগণের পরম আদরের বিষয়। আবার কেউ কেউ বিচার করেন, —'এজগৎ কষ্টের স্থান, এ'-স্থান হ'তে নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক, বস্তুর নির্ব্বিশেষত্বই একমাত্র প্রয়োজনীয়, তা'ই মুক্তি, সেই মুক্তিই বাঞ্ছনীয়া।' ভগবদ্ভক্তগণ এই দুইপ্রকার ব্যক্তির ন্যায় সহসা কোন মত প্রকাশ করেন না। যাঁ'রা ভোগের দ্বারা অভাব নিবৃত্তি কর্‌তে চা'ন, তাঁ'রা—'ভুক্তিকামী', আর যাঁ'রা ত্যাগের দ্বারা অভাব নিবৃত্তি কর্‌তে চা'ন তাঁ'রা—'মুক্তিকামী'। ভগবদ্ভক্তগণ ভুক্তি বা মুক্তি কিছুই ইচ্ছা করেন না। পরিপূর্ণ বাস্তবজ্ঞানের অভাবে আপেক্ষিক-জ্ঞানে আমরা মনোনিবেশ করি, তাই আমাদের অভাব নিবৃত্ত হয় না। আমরা যে-সকল কর্ম্ম করি, তাহা কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়। অভাব থাক্‌বে না, অথচ ঐরূপভাবে নির্ব্বিশিষ্ট হ'য়ে যাওয়া যা'বে না, সেটা-ই চিদ্বিলাসের পথ। মুক্ত হ'বার নামে, মুক্ত হওয়ার সমস্ত সুবিধাটি যদি নষ্ট হ'য়ে গেল, তা' হ'লে ঐরূপ মুক্তিকে—'মুক্তি' বলা যায় না, উহা 'আত্মবিনাশ' মাত্র। রোগ ও রোগীকে একসঙ্গে ঠাণ্ডা ক'রে দেওয়ার প্রণালী বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। কা'রও গলদেশে স্ফোটক হ'য়েছে, যথা-বিহিত অস্ত্রোপচার-দ্বারা স্ফোটকের চিকিৎসা ক'রে রোগীকে নিরাময় ও সুস্থ করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু রোগীকে চিরতরে স্ফোটকের ক্লেশ

হ'তে অব্যাহতি দেবার জন্য স্ফোটক অস্ত্রোপচার কর্‌বার পরিবর্ত্তে রোগীর গলদেশে ছুরিকা প্রদান করা কখনই উচিত নয়!

অনেকে সাংসারিক ক্লেশে বিপন্ন হ'য়ে মনে করেন যে, সংসার হ'তে মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বহুকষ্টে নিজ-গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ কর্‌ত, বৃদ্ধবয়সে অসমর্থা-অবস্থায় বনে গিয়ে তা'র কাষ্ঠ সংগ্রহ কর্‌তে হ'ত এবং তা' বিক্রয় ক'রে সে কোন-প্রকারে তা'র প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ কর্‌ত। সাংসারিক ক্লেশ ও অভাবে নিপীড়িত হ'য়ে বৃদ্ধা সর্ব্বদাই বল্‌ত,—কে'ন যম এসে' আমায় অনুগ্রহ কর্‌ছে না।' একদিন সত্য সত্যই যম এসে' উপস্থিত হ'ল; কিন্তু বৃদ্ধা এ-সময় যমের নিকট কিছুতেই যেতে' চাইল না, তা'র এই ক্লেশময় সংসারে বহু অভাব-অসুবিধার মধ্যেও বাস কর্‌বার প্রবল ইচ্ছা দেখা গেল। যা'রা সাংসারিক ক্লেশে বিপন্ন হ'য়ে মুক্তিপ্রার্থী হয়, তা'দিগের অন্তরেও ভোগ-পিপাসা এরূপভাবেই ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবহমানা থাকে। ফলাকাঙ্ক্ষী ভোগী বা ফলবিরাগী ত্যাগীর বিচারাবলম্বনে জীবের কখনও নিত্যমঙ্গল-লাভ হয় না; এ'রা সকলেই বঞ্চিত ও কপট। যথেষ্ট সৌভাগ্যের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত এ'দের কাপট্য সাধারণের গোচরীভূত হয় না।

আত্মবিদ্‌গণ ইহজগতে ভগবানের সেবা করেন,—তাঁ'রা ফলভোক্তা ভোগীর ন্যায় প্রপঞ্চ ভোগ কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'ন না, বা ফল্গুত্যাগীর ন্যায় ভগবৎসেবোপকরণকে প্রাপঞ্চিক বিষয়মাত্র জ্ঞান ক'রে নিজের মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হ'ন না। আত্মবিদ্‌গণ ইহজগতে ভগবানের সেবা করেন, পরজগতেও ভগবানের সেবা করেন। ভগবানের সেবা-ব্যতীত জীবের যে অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই,—ইহাই তাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করেন। আত্মবিৎ পুরুষগণ—জীবহিতাকাঙ্ক্ষী প্রবীণ পুরুষ। মানব-জাতি—পরমার্থ-রাজ্যের শিশুসদৃশ; শিশুগণ যেরূপ নিজমঙ্গল বুঝে না, কখন অগ্নিশিখায় হস্ত প্রদান করতে উদ্যত হয়, কখন বা আকাশের চাঁদ গ্রহণ কর্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়, মানবমণ্ডলীও সেই-রূপ শিশুর ন্যায় বিবিধ অভিনয় ক'রে থাকেন। আত্মবিৎ প্রবীণ পুরুষগণের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সর্ব্বতোভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করেন, তবেই তাঁ'দের মঙ্গল। ভগবানের কথা—শ্রৌতবাণী আলোচনা কর্‌লে সকলের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল-লাভ হয়। ভগবানের কথার আলোচনা ব্যতীত মানবজাতির পরস্পরের মধ্যে আলোচ্য আর কিছুই নাই।

পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বমুনি বলেন,—"মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভম্"—সকলপ্রকার মুক্তিতে বিষ্ণুই একমাত্র আরাধ্য। বিষ্ণুর উপাসনায় কোন অভাব নাই। যে-স্থানে বৈকুণ্ঠপ্রতীতি, সে-স্থানে মায়িক প্রতীতি নাই। আবার যে-স্থানে মায়িক প্রতীতি, সেস্থানে ভগবৎপ্রতীতি নাই। ভগবদুপাসনায় চতুর্থ অর্থ অর্থাৎ মোক্ষ প্রয়োজনীয় প্রাপ্য বস্তু না হ'য়ে স্বয়ংই আমাদের সেবক-বস্তু হয়। ভগবদুপাসনাই একমাত্র আত্মার বৃত্তি, ভগবদনুশীলন ব্যতীত

অন্য কোন উপায়ের দ্বারা অভাব দূরীকৃত হয় না।

যখন জীব ভগবান্ বাসুদেবের সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞানে জ্ঞানী হ'ন তখন সমগ্রজগতের প্রতি তাঁহার ভোগপ্রবৃত্তি নিরস্ত হওয়ায় নিত্য-ভোক্তা ভগবানের সেবোপকরণরূপে তিনি স্বীয় অস্তিত্বের উপলব্ধি করেন।

আবার রজস্তমো-গুণে গুণী হইয়া সত্ত্বের ন্যূনাধিক বিলোপ-সাধনফলে তাঁহার ভগবৎসেবা-বিমুখী বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; তখনই খণ্ডিত নশ্বর বস্তুসমূহের সেবা তাঁহাকে ভগবৎসেবা হইতে বিক্ষিপ্ত ও আবৃত করে। অণুচেতন জীব স্বীয় স্বতঃকর্ত্তৃত্ব, অনুভবিতৃত্ব ও ইচ্ছার সদ্ব্যবহারে বঞ্চিত হইয়া মিশ্র-গুণজাত আধারের ক্রীড়নক হইয়া পড়েন। এইরূপ অবস্থাতেই তাঁহার কর্ম্মপথে বিচরণ-প্রচেষ্টা। জড়-ভোক্তার অভিমানে তিনি আপনাকে 'দেহী' না জানিয়া 'স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়'কেই 'দেহী' বলিয়া ধারণা করেন। যাঁহারা এরূপ বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত, তাঁহারাই ফলভোগ-বাদের প্রচারক পূর্ব্বমীমাংসকের কর্ম্মাগ্নিপ্রজ্বালনের ইন্ধনস্বরূপ হইয়া পড়েন এবং স্বীয় ভগবৎ-সেবোপকরণত্বের-বিচার বিস্মৃত হন। ফলভোগবাদী কর্ম্মিসম্প্রদায়—ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে প্রাকৃত নশ্বরবস্তুর সেবায় নিরত।

যে-কালে জীব বিশুদ্ধসত্ত্বের আধারে প্রতিষ্ঠিত হন, তখনই তিনি কর্ম্মপথের অকর্ম্মণ্যতা, অপ্রয়োজনীয়তা, অসম্পূর্ণতা বা ক্ষণভঙ্গুরতা প্রভৃতি অবর-ধর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই সময়ে তিনি অচিচ্ছক্তির অনুপাদেয় করাল দংষ্ট্রাপিষ্ট হইবার যোগ্যতাকে আদর করেন না; অণুচেতন জীব বাহ্যজগতে অচিদ্‌বস্তুর সেবনপ্রবৃত্তি পরিহার করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে করিতে যখন সবিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধান-কার্য্যকে আদর করেন, তখন উহাই তাহার অবিদ্যা-রহিত স্বরূপোদ্বোধিকা বুদ্ধিবৃত্তি। এই বুদ্ধিবৃত্তি হইতেই জীব ক্রমশঃ অণুচেতনের 'ভোক্তৃ-ভোগ্য'-ভাব হইতে পৃথক্ হইবার আয়োজন করেন।

অণুচিৎ জীব গুণত্রয়ের রাজ্যের অবরতা লক্ষ্য করিয়া কখনও অখণ্ডকালের করাল-কবলে বিলীন হইবার ইচ্ছা পোষণ করেন। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনা-ক্রমে চেতনের অনুভূতি-রাহিত্যই তখন তাঁহার মৃগ্য হইয়া উঠে। আবার, কেহ কেহ অনুভূতিরাহিত্যে অচিন্মাত্রাবস্থিতিকে 'চিন্মাত্রাবস্থিতি' বলিয়া বিবর্ত্তান্তর গ্রহণ করেন। স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মনে আত্মবুদ্ধিরূপ 'বিবর্ত্ত' হইতেই অণুচিৎ জীবের মুক্তি-পিপাসা। সুতরাং কর্ম্মপন্থী ও নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু, উভয়েই আরোহবাদী। একজন 'ভোগী' ও অপরজন 'ত্যাগী'-নামে সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করেন। উভয়েরই অণুচিদ্ধর্ম্মের অপব্যবহার লক্ষ্য করিতে না পারিলে অবিদ্যা-গ্রস্ত জীব কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডকে বিষভাণ্ড বলিয়া বুঝিতে পারেন না। সম্বিচ্ছক্তির অপব্যবহার-ক্রমেই ঐ ভোগী ও ত্যাগী কর্ম্ম ও ফল্গু-বৈরাগ্যকেই বহুমানন করিতে থাকেন। যে-কাল পর্য্যন্ত

তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরম-মাধুর্য্যময় ঔদার্য্যবিগ্রহের সৌন্দর্য্য-দর্শনে আকৃষ্ট না হন, তৎকালাবধি বিষয়বিষ্ঠার ভোক্তা, অথবা, ভোগ-ত্যাগ-রূপ নিরস্তেন্দ্রিয়তর্পণকেই 'আদর্শ' বলিয়া মনে করেন! কালক্ষোভ্য 'বুভুক্ষা' ও 'মুমুক্ষা'—'ভোগ' ও 'ভোগত্যাগ' বিষ্ণুভক্তিতে পর্য্যবসিত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মী ও জ্ঞানী, উভয়েরই অনিত্য চেষ্টা থাকে। ভুক্তিপিশাচী ও মুক্তি-পিশাচী অণুচিৎ জীবের শিশুপ্রতীতিকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে জীবের প্রকৃত স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয় না। নিদ্রার প্রাগবস্থায় যেরূপ সম্পূর্ণ শান্তির লক্ষণ দেখা যায় না, সুষুপ্তিতেই নিবৃত্তিলক্ষণ পরিস্ফুট হয়, তদ্রূপ ভোগনিবৃত্তিমূলক 'স্বরূপে অবস্থিতি রূপ প্রকৃত-মুক্তি না হইলে জীবের আত্মবৃত্তিস্বরূপা নিত্যা হরিসেবার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হয় না। যে-কাল পর্য্যন্ত জীবের ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা না হয়, তাহার পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে 'অস্মিতা' জ্ঞাপন করিয়া কর্ম্মফলভোগ ও নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান অথবা অচিন্মাত্রাবস্থিতিতেই উৎকট আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ মুক্তিকেও ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রকারভেদ বলিয়া বুঝিবার সামর্থ্য বদ্ধজীবের নাই। ভোগমুক্ত জীবের কাল্পনিক শান্তির ধারণা নানা-প্রকার বাধা প্রাপ্ত হয়। সুকৃতির অভাব হইতেই জীবের চিদ্ধর্ম্মের এরূপ অসদ্ব্যবহার।

স্বতন্ত্রেচ্ছ জীব ভোগৈষণা ও ত্যাগৈষণার পাদতাড়িত হইয়া কখনও আরোহবাদকেই স্বীয় কল্যাণের একমাত্র 'সেতু' বলিয়া মনে করেন। বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত সুকৃতিমান্ জীবের বাসুদেব-দর্শনে উপাধিগত ভোগ বা ত্যাগ-প্রবৃত্তির তাড়না ভোগ করিতে হয় না। তিনি আত্মবৃত্তিতে নিত্যকাল অবস্থিত হইয়া স্বীয় ভগবৎসেবোপকরণরূপ অস্মিতায় স্বতন্ত্রেচ্ছ হইয়া নিত্যকাল ঈশ-সেবা-পর থাকেন। তাঁহাকে 'আরোহ' বাদিগণ 'অবরোহ' বা 'অবতার'-বাদী বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করেন। কিন্তু আরোহবাদী স্বীয় অভিজ্ঞতার ফলে তর্কপথে যাহা স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা তাঁহার কখনই যে নিত্য স্থাপ্য, নহে, একথাও তিনি বুঝিতে পারেন। 'কালে যে তাঁহার স্থাপ্য নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে',—এই নশ্বরজগতের রীতি নিত্য-অপরিবর্ত্তনীয় শ্রৌত-বাদ-দ্বারা সুষ্ঠুভাবে খণ্ডিত হইয়াছে। অপটু করণের সাহায্যে জীবে 'বিপ্রলিপ্সা'-প্রবৃত্তি হইতে যে 'ভ্রান্তি' অথবা 'প্রমাদ' উপস্থিত হয়, তাহার অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিতে গিয়া "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব" (ভাঃ ১০।১৪।৩) শ্লোকটী আরোহবাদের অনৈপুণ্যই প্রকাশ করিতেছে এবং "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" (ভাঃ ১০।২।৩২) "শ্রেয়ঃসৃতিম্" (ভাঃ ১০।১৪।৪) এবং "তত্তেঽনুকম্পাম্" (ভাঃ ১০।১৪।৮) শ্লোকগুলি আরোহবাদীর বক্ষে অমোঘ শেল বিদ্ধ করিতেছে এবং তৎপ্রতিকারার্থ "যমাদিভিঃ" (ভাঃ ১।৬।৩৬) ও "তথা ন তে মাধব" (ভাঃ ১০।২।৩৩) প্রভৃতি শ্লোক ভোগী ও মায়াবাদীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বস্তুতঃ জড়ীয় অবকাশের ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণরূপ কার্য্যকে 'অবতারবাদ'

বলা---সেবা-বিমুখের ভাগ্যহীনতারই পরিচয়-মাত্র। মায়িক রাজ্যে ত্রিগুণাতীত ভগবদ্-বস্তুর অবতরণ বা অবরোহণ ঐ প্রকার নহে। অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত অভিজ্ঞতা-বাদী যে সকল ক্ষণভঙ্গুর বৃত্তি-সাহায্যে বাস্তবসত্যে তর্ক উপস্থিত করিবার নিষ্ফল প্রয়াস করেন, তাহাকে বাস্তব-সত্যবাদী বা অবরোহবাদী আদর করিতে পারেন না, পক্ষান্তরে তাদৃশ সবলাভিমানিগণের দুর্ব্বলতাকে হাস্যাস্পদ বলিয়াই মনে করেন।

ভক্তিপথের পথিকগণ বাস্তব-সত্যের আশ্রয় ব্যতীত অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবার নীতির প্রশয় দিতে প্রস্তুত নহে; তাঁহারা শ্রৌতপন্থী,---তার্কিক নহেন। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীকে তাঁহারা সম্মান প্রদান করিলেও তাহাদিগের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে অসমর্থ। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ যাহাদিগকে বাস্তব-সত্য হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত করাইয়াছে, সত্যস্বরূপ পরতত্ত্বের সন্ধানবিমুখ সেই জনগণকে অণুচিৎ ও বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত ভক্তগণ, জড়ের সেবক বা 'মায়াবাদী' জানিয়া, তাঁহাদিগের সঙ্গপ্রার্থী বা অনুগত হইতে পারেন না। ভগবৎসেবা-পর অবরোহবাদ বা শ্রৌতপথে না চলিলে আরোহবাদী-জীব অশুদ্ধবুদ্ধি-বশতঃ অচিন্ত্যভাবময় অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তুর নিকট অপরাধী হইয়া সংসার-বাসনা-সাগরে নিমজ্জিত হন।

এইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রূপ-গোস্বামীপ্রভুকে উপদেশ-প্রদান-লীলার অভিনয়-সূত্রে নিম্নলিখিত ভাগবত-কথার অবতারণা করিয়াছেন, (চৈঃ চঃ মধ্য ২৯শ পঃ)—

"এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ।।
কেশাগ্র-শতেক-ভাগ, পুনঃ শতাংশ করি।
তা'র সম সূক্ষ্মজীবের স্বরূপ বিচারি।।
তা'র মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থল-চর বিভেদ।।
তা'র মধ্যে মনুষ্যজাতি—অতি অল্পতর।
তা'র মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর।।
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে'।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে'।।
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।।
কোটিজ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটিমুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।।
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী, সকলেই অশান্ত।।"

এই কথাগুলি-দ্বারা ভক্ত ও ভক্তির সুদুর্ল্লভত্ব প্রদর্শন করিয়া চিদচিৎ-সমন্বয়বাদের অকর্ম্মণ্যতা দেখাইয়াছেন।

পুনরায় (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ)—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।।
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন।।
উপজিয়া বাড়ে' লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মালোক ভেদি' পরব্যোম পায়।।
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।।
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে' প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে' নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি-জল।।
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে' বা ছিণ্ডে' তার শুকি' যায় পাতা।।
তা'তে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্‌গম।।
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত, অসংখ্য তার লেখা।।
নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীব-হিংসন।
লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশাদি উপশাখাগণ।।
সেক-জল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়।।
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন।।
প্রেমফল পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায়।।
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেম-ফল-রস করে' আস্বাদন।।
এই ত' পরম-ফল—পরম-পুরুষার্থ।
যা'র আগে তৃণতুল্য—চারি পুরুষার্থ।।

(২)

"কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমি' মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়।।"

যদি অধঃপতিত হ'তে ইচ্ছা করি, তা'হ'লে অপথ কুপথ অবলম্বন ক'রে, কৃষ্ণলীলা অনিত্য মনে ক'রে, সন্দিগ্ধ হ'য়ে কর্ম্মকাণ্ডে জ্ঞানকাণ্ডে ধাবিত হই। মহাপ্রভু আমাদিগকে নানা-প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। যা'রা নাক টিপ্‌তে পারে, বুজরুগী দেখা'তে পারে, Athletic feat দেখা'তে পারে, তা'রা ছলপাণ্ডিত্য বা ছলাভিজাত্য জাহির কর্‌তে পারে। কিন্তু ভক্ত ব্যতীত অপরে 'গুরু' হ'তে পারে না।

অনেকে আবার ভক্তের সেবা না ক'রেই ভক্ত হ'য়ে যেতে' চায়। আমরা অনেক অভক্ত হ'য়ে নিজদিগকে 'ভক্ত' মনে করি—রাসলীলা শ্রবণ কর্‌বার অধিকারী মনে করি। কিন্তু আমি কোথায়? আমি ত' ভক্ত নই—অনুক্ষণ ভগবানের সেবা-রত নই! কোন-সময়ে 'পুরুষ' অভিমান ক'রে স্ত্রী-রূপে প্রলুব্ধ হই, কোন-সময়ে স্ত্রী অভিমান ক'রে পুরুষে মুগ্ধ হই;—আমার ন্যায় পাষণ্ডী, পাপিষ্ঠ, নরাধম আবার 'ভক্ত'-শব্দবাচ্য হ'তে পারে?

মৃত্যুঞ্জয়ের শুন্‌বার উপযোগী রাইকানুর গান শুন্‌বার অধিকার আমাদের নাই। যতকাল আমরা বাহ্যজগতে আকৃষ্ট হ'য়ে র'য়েছি, ততকাল আমরা মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিতে অভিভূত হ'য়ে ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই ধাবিত হই। এই হাড়মাংসের থলে নিয়ে কৃষ্ণ-বক্ষে আরোহণ করা যায় না। যে ঐরূপ ধৃষ্টতা ক'র্‌তে যা'য়, তা'র অধঃপতন অবশ্যম্ভাবি। যা'রা বিদ্যার মহিমা, আভিজাত্যের মহিমা, সৌন্দর্য্যের মহিমা, ঐশ্বর্য্যের মহিমাকে, 'থুথু' ফেল্‌বার মত ক'র্‌তে পেরেছেন, তাঁদের কাণেই কৃষ্ণকথা প্রবেশ ক'র্‌তে পারে।

'আমরা চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি ভোগ্যের উপভোক্তা, আর কৃষ্ণ বেচারা হাত-পা-কাটা হ'য়ে গিয়ে নির্ব্বিশেষ নিরাকার হ'য়ে থাক্‌বে—একটুমাত্র খেতে পার্‌বে না, দেখতে পার্‌বে না, চল্‌তে পার্‌বে না—এরূপ বিচার যুক্তিপুষ্ট নহে।

জড়ের হাত-পা ভগবানের না থাকার দরুণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্‌কে তাঁহার নিত্যচিন্ময় হস্তপদ হইতেও যে চ্যুত কর্‌তে হ'বে,—এরূপ ধৃষ্টতা বিশুদ্ধ নাস্তিকতা বা কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভোক্তৃ-অভিমানী আমরা কখন বুভুক্ষু, প্রচ্ছন্নভাবে ভোক্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক আমরা কখনও ছল-ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মবিশিষ্ট মুমুক্ষু।

সূর্য্য দর্শন ক'রে যেমন আমরা বুঝ্তে পারি,—সমস্ত আলোর মালিক সূর্য্য, তদ্রূপ যাঁ'রা ভগবদ্দর্শন করেছেন, তাঁ'রা অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ জানেন যে, সকল-শক্তির শক্তিমান্ প্রভুই কৃষ্ণ। তিনি স্বেচ্ছাচারী, তাঁ'র ইচ্ছাশক্তি কেহ প্রতিরোধ করতে পারে না। 'ভগবান্—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এবং আমরা তাঁহার আশ্রিত অণুচিৎ'—যখন আমি ইহা বুঝ্তে পারি, তখন বৃহৎ সচ্চিদানন্দের সেবাই আমাদের কার্য্য হয়।

যোগের দ্বারাও ভগবানের ভজন হয় না,—উহাতে 'অণিমা', 'লঘিমা' প্রভৃতি সিদ্ধি-লাভ হয়। মোক্ষকামীর (Salvationist-এর) কথা ছেড়ে' দিতে হ'বে। সে কেবল সংসারের সুখ-দুঃখের হাত হ'তে ছুটী চায়, সুতরাং সেও নিজেই ভোক্তা (recipient)।

যিনি কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগমার্গ গ্রহণ ক'রেছেন, ভাগবত বলেন,—তিনি ভুল পথ অবলম্বন ক'রেছেন। ভক্তি হ'লেই সহজে মুক্তি হ'তে পারে, প্রেয়ো-বস্তুলাভ হ'লে শ্রেয়ো-বস্তু-লাভ নাও হ'তে পারে; কিন্তু শ্রেয়ো-বস্তুই প্রেয়ঃ হওয়া উচিত। ভক্ত বলেন,—আমি আমার ভগবানের সেবাই কর্‌বো।

কর্ম্মিগণ এ-জীবনে ও পর-জীবনে নিজের ভোগ চায়। *Bhakti* is the eternal function of pure souls. If we regain our real position, then we have the change of dissociating ourselves from the world. ভক্তি—নির্ম্মল আত্মারই বৃত্তি। যদি আমরা আমাদের প্রকৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কর্‌তে পারি, তবেই অনায়াসে এই পৃথিবী হ'তে পৃথক্ হ'তে পার্‌ব।

পৃথিবীর কোন বিষয় আমার চিন্তনীয় নয়। স্বরূপ-লক্ষণে ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্ব। সপরিকর সেই নিত্য বাস্তব শুদ্ধসত্ত্বই আমাদের চিন্তনীয় বিষয়। তটস্থ-লক্ষণেই মায়িক জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ লক্ষিত হয়।

ভগবানের আমার ন্যায় হাত, পা, মুখ, চোখ, কাণ, নাক নাই। আমার ইন্দ্রিয়গুলির পরস্পরে ভেদ আছে। ভগবানের দেহ ও দেহীর (Proprietor and properties-এর) ভেদ নাই (identical)—তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা 'এক'। পৃথিবীর প্রাকৃত বস্তু হ'তে সংজ্ঞা ভিন্ন, রূপী হ'তে রূপ ভিন্ন, গুণী হ'তে গুণ স্বতন্ত্র। 'কম্বল-শব্দ' ও 'কম্বল-বস্তু' এক নহে। পৃথিবীতে রূপীর রূপ পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু ভগবান্—স্বরাট্। He does not require any other help. He may come down upon the scene of anybody and everybody as He pleases. ভগবান্ কাহারও সাহায্য অপেক্ষা করেন না,—তিনি পূর্ণ নিরপেক্ষ, পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বপ্রকাশ।

তাঁহার কর্ণ-চক্ষু ইত্যাদি অচিন্ময় নয়—সকলই চিন্ময় ও পূর্ণ। Electron theory

বা পরমাণু-বাদে ভ্রান্ত জীব ইহা ধারণা কর্‌তে অসমর্থ। Electron theory ও theism এক নহে।

ভগবান্ নারায়ণ আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রথমে শুদ্ধসত্য প্রকাশ করেন। সূরিগণেরও বাস্তব সত্য (Absolute Truth) ধারণা কর্‌তে ভুল হয়। মানবের বিচারে ভুল আছে, কিন্তু Absolute Truth-এর ভুল নাই। "সত্যং পরং ধীমহি।"

প্রীতির ধর্ম্ম ও অপ্রীতির ধর্ম্মের মধ্যে কিছু ভেদ আছে। যাঁহারা মনে করেন যে, প্রেমধর্ম্মের মধ্যেও কিছু অপ্রীতিকর কথা আছে, বুঝিতে হইবে,—তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যেই কিছু অপ্রীতিকর ধর্ম্ম বর্ত্তমান। আত্মধর্ম্মই প্রেমধর্ম্ম বা প্রীতির ধর্ম্ম, আর মনোধর্ম্মই অপ্রীতির ধর্ম্ম। বিষয়ের প্রতি আশ্রয়ের নিত্যা শুদ্ধা অহৈতুকী প্রীতি ও আশ্রয়ের প্রতি বিষয়ের শুদ্ধা প্রীতিই—প্রেমধর্ম্ম। প্রেমধর্ম্মের মধ্যে চির-ঐক্যতান (Harmony) বিরাজমান। অদ্বয়জ্ঞানের সেবনজনিত প্রেমধর্ম্মের যাজন হইতে বিচ্যুত থাকিলেই আমরা পরস্পরের প্রতি ভোগবুদ্ধি করিয়া থাকি। কৃষ্ণই একমাত্র মূল এবং যাবতীয় কার্ষ্ণই একমাত্র সেই মূলবিষয়ের আশ্রয়। সাপত্ন্য-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট মানবগণ, সকলে—শ্রীকৃষ্ণেরই সেবক,—ইহা জানিতে পারিলে মনুষ্যের আর কোনও অসুবিধা থাকে না। তখন মানবগণ স্ব-স্ব-নিত্যসিদ্ধস্বরূপ অর্থাৎ নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন বৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবের স্বাভাবিক প্রীতিধর্ম্ম উদিত হয়।

ভোগ্য-জগতে প্রীতিধর্ম্মের কথা নাই,—সর্ব্বত্রই বিরোধময় সঙ্ঘর্ষ-ধর্ম্ম। এস্থলে একজনের প্রীতিতে অপরের অপ্রীতি উৎপন্ন হয়, একজনের লাভে অপরের ক্ষতি হয়; যেমন,—কেহ ছাগ, কুক্কুট বা মৎস্যাদির মাংস প্রীতির সহিত ভোজন করেন, তাহাতে ভোজনকারীর সাময়িক প্রীতি উৎপন্ন হইলেও ছাগ, কুক্কুট বা মৎস্যের প্রীতির উদয় হয় না। এক মানুষ অন্য মানুষের সহিত প্রতিযোগিতা ও হিংসা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে, কিন্তু তাহাতে অপর মনুষ্যের প্রীতি হয় না। গৌরসুন্দরের জনগণ কখনও অপরকে উদ্বেগ দেন না। কিন্তু প্রাকৃতব্যক্তিগণ অখণ্ড ভগবদ্বস্তুর সহিত বিরোধ করিয়া খণ্ডবস্তুর প্রতি ভোগ্যবুদ্ধি করেন। আমরা অনেক-সময় 'বরং দেহি', 'ধনং দেহি', 'দ্বিষো জহি' প্রভৃতি প্রীতিকর কথা বলিয়া নিজকে ও অপরকে বঞ্চনা করি।

যাঁহারা জগতের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ বা যাঁহারা মনোধর্ম্মী, তাঁহারা নিষ্কপট হইতে বলিতে পারেন না। 'সেবার বিনিময়ে আমি কিছু চাই'—এরূপ কথা অভক্তের বা অবৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা; কিন্তু বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে এইরূপ অবৈষ্ণবধর্ম্মই চলিতেছে, ভক্তির নামে অভক্তিরই চেষ্টা সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। আমরা যদি কপটতা করিয়া কোটি-জন্ম অর্চ্চন করিতে থাকি, কোটি-জন্ম খোল বাজাই, কোটি জন্ম কীর্ত্তন করি এবং কপটতাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চাই, তাহা হইলে আমরা ঐরূপ অর্চ্চন করিতে করিতে, খোল বাজাইতে বাজাইতে, কীর্ত্তন করিতে করিতে কর্ম্মমার্গের

পথিক হইয়া পড়িব, আমাদের ভক্তিলাভ হইবে না। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের নিষ্কপট সেবা ব্যতীত আমাদের কোন মঙ্গলই হইতে পারে না। অর্চ্চার ও হরিনামের আরাধনার নাম করিয়া জগতে কি ভীষণ কপটতাই না চলিতেছে! ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে বঞ্চনা করাকেই কেহ কেহ ভগবদ্ভক্তি বলিয়া বিচার করেন।

আমরা শ্রীআনন্দতীর্থ মধ্বমুনির চরিত্রে একটী আখ্যায়িকা দেখিতে পাই যে, তিনি একদা শিষ্যসঙ্গে বদরিকা-ক্ষেত্রে যাইতেছেন। মহারাষ্ট্র-প্রদেশের মহাদেবনামক জনৈক রাজা সাধারণের উপকারার্থ একটী পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। তিনি শ্রীআনন্দ-তীর্থকে সেইপথ দিয়া যাইতে দেখিয়া পুষ্করিণী খনন করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ভগবদ্ভজনচতুর শ্রীমধ্ব কর্ম্মবীর রাজাকেই ঐ পুষ্করিণী-খনন-কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া স্বকার্য্যে অগ্রসর হইলেন। কর্ম্মী রাজা জানিতেন না যে, সাধারণের উপকারের কার্য্য সাধারণ শ্রমিক লোকের দ্বারাও সম্পাদিত হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা আত্মবিৎ, তাঁহাদের হাতে যদি কোদাল দেওয়া যায়, তাহা হইলে জগৎকে পরম হিত-লাভে কেবল বঞ্চিত করা হয় মাত্র। জগতে শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি প্রভৃতির যত কিছু উন্নতি হইতেছে, তৎসমস্ত বৈষ্ণবসেবায় নিয়োজিত হইলেই উহাদের সার্থকতা। কিন্তু ঐসকল বস্তু ভোগীর সেবায় লাগিলে পণ্ডশ্রম ও জগদবিনাশের হেতুমাত্র হইয়া থাকে। যেকাল-পর্য্যন্ত বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া দৃঢ়-প্রত্যয় না হইবে, তাবৎকালপর্য্যন্ত আমাদের কোনই মঙ্গললাভ হইবে না।

সংশয়াত্মা হইয়া মানুষ প্রকৃত শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে বঞ্চিত হয়; 'ইনি এক কথা, তিনি এক কথা বলিতেছেন, কাহার কথা শুনিতে যাইব?'' এইরূপে বিরক্ত হইয়া শেষে যে তাহার আপাত ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহায়তা করে, তাহারই কথা শুনিয়া বঞ্চিত হয়। একপক্ষ বলিতেছেন বিষ্ণু-উপাসনা ব্যতীত কর্তব্য নাই; অন্যদেবতারা তাঁহার শক্তি পাইয়াই শক্তিমান্ হইয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদী পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় অন্য দেবতার পূজাদ্বারা দেবতা হইয়া যাওয়ার বিচারই গ্রহণ করেন। দেবতার উপাসনা না করিয়া দেবতাকে প্রতারণাপূর্ব্বক নিজেই সেই দেবতার আসন গ্রহণ করা বা দেবতাকে দিয়া নিজের চাকুরী করাইয়া লওয়া প্রভৃতি বিচার সম্পূর্ণ ভক্তি বিরোধী। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সু মন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।।

দাস গোস্বামী প্রভু দৈন্যভরে বলিতেছেন—একসময়ে নানাপ্রকার পাণ্ডিত্যের মধ্যে ছিলেন; কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতিকে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিচার ছিল; একমাত্র শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুই Veterinary surgeon-এর পশুর মুখে জোর করিয়া ঔষধ প্রদানের ন্যায় আমার মুখ বলপূর্ব্বক ব্যাদন করিয়া আমার গলায় ভক্তিরস

ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এমন দয়াল গুরুদেব। আমি অন্ধ, দেখিবার চক্ষু ছিল না, তিনি আমাকে বলপূর্ব্বক অভক্তিপথ হইতে টানিয়া আনিয়া ভক্তিপথ গ্রহণ করাইয়াছিলেন। আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছিলেন বলিয়াই আমাকে ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর করাইয়া দিয়াছিলেন। এমন দয়ার্দ্র আমার প্রভু সনাতন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।।"

শ্রীরাধাগোবিন্দের গানের সহিত গ্রাম্যবার্ত্তা এক নহে। নগ্নশ্যামামাতার গান, শনির পাঁচালী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, ঘেটু-মা-কাল-চণ্ডী-বিষহরি গ্রাম্য দেবতার গান, কালীঘাটে বৈষ্ণব সভা (?), সাংসারিক মঙ্গল অমঙ্গলের জন্য—নিজের ভোগ বা ভোগ-ত্যাগের জন্য যে-সকল কথা, তাহাই গ্রাম্যবার্ত্তা।

"কলে দর্শ সহস্রাণি বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি ভূতলে।
তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং গ্রাম্য দেবতা।।"

গ্রাম্যবার্ত্তা বেশী কাহারা বলেন?—archeologist, epigraphist প্রভৃতি হইয়া পড়িয়াছেন যাঁহারা।

জিহ্বোপস্থকে জয় করার নাম 'ধৃতি'। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা কায়, মন ও বাক্যদণ্ডিত করিয়াছেন। খবরের কাগজগুলি সব গ্রাম্যবার্ত্তা। মায়ার কথার যত কাগজ-পত্র আছে, তাহা পড়িতে নাই। ঐ সকল পড়িলেই তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য চিত্ত ধাবিত হয়—'Rai Sahib' হইতে হইবে, 'Rai Bahadur' হইতে হইবে, এজন্য প্রতিযোগিতা ও প্রয়াস আরম্ভ হয়। ইহা স্বপ্নে খুব বড় বড় ধনী হইবার অভিলাষের উদ্দেশ্যে জগতের ধন-মানাদির জন্য আকাঙ্ক্ষা; চার্ব্বাক, বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিত; আকবর, জাহাঙ্গীরের ন্যায় রাজ্য ভোগ, নেপোলিয়ানের ন্যায় বীরত্ব, ম্যালথাসের (Malthus) ন্যায় মানবজাতির উপচিকীর্ষা প্রভৃতির জন্য যাহারা লালায়িত তাহাদের চেষ্টা স্বপ্নে রাজা হওয়ার ন্যায়। এইজন্য ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট।" বহির্ম্মুখের চিত্তবৃত্তি—"কোনক্রমে ভগবৎ সেবা করিব না, গ্রাম্যকথা, গ্রাম্যচিন্তা, গ্রাম্য ব্যবহার, গ্রাম্য আচারেই সর্ব্বক্ষণ ভরপুর থাকিব!" পাছে কোনরূপে মঙ্গল হয়, এজন্য তাহারা ঐ সকল পরিখাযুক্ত দুর্গ নির্মাণ করিয়া রাখে। তাহারা বিচার করে, তুলসী গাছে জল দিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা বেগুনগাছে জল দেওয়া,—সময়ের ও অর্থের অধিক সদ্ব্যবহার; কারণ তাহাতে অধিক বেগুন খাওয়া যাইবে। কিন্তু বেগুন খাইবে কে? যদি বানরে নিয়া যায়, তবে খাইতে পারা যাইবে না, আর যদি বানরকে বঞ্চিত করা হয়, তাহা হইলে বানরের সহিত প্রতিযোগিতা হইয়া যাইবে। ভোগের বিঘ্ন বিনাশ করেন, ভোগের পথ অনর্গল করিয়া দেন। গণেশ-

—ভোগসাধক অর্থের বিঘ্ন বিনাশ করেন, সূর্য্য—ধর্ম্মের (পুণ্যের) বিঘ্ন বিনাশ করেন। অন্ধকার মূর্খতার স্বরূপ; সূর্য্য অন্ধকার-বিনাশক, আলোক প্রদাতা, শক্তি—কামনার সিদ্ধি-প্রদাত্রী। শক্তির পূজা করিয়াছিল রাবণ সীতাহরণের জন্য। জড়শক্তি-পূজক শক্তির নিকট হইতে শক্তিলাভ করিয়া শক্তির শক্তিকে হরণ করিবার চেষ্টা করে! রুদ্রের উপাসকগণ সকল বিচিত্রতাকে ধ্বংস করে। গণেশ, সূর্য্য, শক্তি ও রুদ্রের উপাসকগণ সকলেই অহংগ্রহোপাসক—চরমে মূর্ত্তিভঙ্গকারী (Iconographer ও Iconoclastic)।

বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুর নিকট হইতে কিছু চাহেন না। বিষ্ণু জীবের সর্ব্বস্ব হরণ করেন। যে-সকল পুষ্পে গন্ধ নাই, তাহা বিষ্ণু ভক্তগণ প্রদান করেন না। 'সুগন্ধি পুষ্প প্রদান করা' অর্থ—নিজে সৌগন্ধ ভোগ না করা। রুদ্রকে গন্ধহীন পুষ্প দেওয়া হয়, ধুতুরা ফুলে রুদ্রের পূজা হয়। রক্তজবার দ্বারা শক্তির পূজা হয়। বিষ্ণুকে যাঁহারা অনিত্য দেবতা মনে করেন, কৃষ্ণকে মারিয়া (?) ফেলিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইল কল্পনা করেন, তাঁহারা বিষ্ণুকে পঞ্চদেবতার অন্যতম অনিত্যবস্তু জ্ঞান করেন। ইঁহারা ব্যাসের সিদ্ধান্তের বিরোধী, বেদের সিদ্ধান্তের বিরোধী। ব্যাস বলেন—

"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদীতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।"

বেদ বলেন,—

"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং"

যাঁহারা বিষ্ণুর সহিত অন্যদেবতাকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী। তাঁহারা সর্ব্বদেবতা—সংহারক সূত্রে "শিবোঽহং" "শিবোঽহং" (শিব—সর্ব্বসংহারক) বলিতে থাকেন। কর্ম্মকাণ্ড সংহার করা বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু যে কর্ম্ম কৃষ্ণকর্ম্ম—ভগবৎসেবা, তাহা পর্যন্ত তাঁহারা সংহার (?) করিব বলিয়া দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন।

একমাত্র বিষ্ণুর উপাসনা ব্যতীত অন্য উপাসনার কল্পিত উপায়-সমূহ সেব্যের পরিবর্ত্তে 'চাকর' মাত্র। কৃষ্ণ একাই লক্ষ, সেই একের পূজায় সকলের পূজা হয়। "মনুষ্যজাতি! তোমরা গৃহস্থ থাক, ব্রহ্মচারীই থাক, বানপ্রস্থই থাক, সন্ন্যাসীই থাক, তোমরা সকলেই ব্রাহ্মণ। "সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাশ্চ", শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—তোমাদের সকলেরই আমার উপাসনাই একমাত্র কৃত্য; আমাকে লইয়াই তোমাদের কাজ— "তোমাদের অন্য কোনপ্রকার কার্য্য নাই। তোমাদের চোখ, কান, মুখ, নাক,—সব দিয়া আমাকে লইয়াই কাজ।"

"মুগের ডাল পাইনা, তাই খাইনা"—এইজন্য সাধু সাজার নাম—প্রকৃত সাধু হওয়া নহে। কেহ কেহ বলেন, "ভারতের ৪৪ লক্ষ সাধু বিবাহের পয়সা যোগাড় করিতে পারেন না বলিয়া সাধু হন; কাপড় ধোয়াইবার পয়সা নাই বলিয়া তাঁহারা গেরুয়া গ্রহণ করেন।"

জাগতিক বৈরাগ্য, ত্যাগ, তপস্যা প্রভৃতি সাধুত্বের লক্ষণ নহে। পিপীলিকা বলিতেছে,—"হাতী অনেক খাইয়া ফেলে, আমি অত খাইনা, সামান্য খাই!" তাহা হইলে হাতী অপেক্ষা পিপীলিকাই বড় সাধু হইয়া পড়িল! কিন্তু হাতী স্বমন্তপঞ্চকে কৃষ্ণকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যায় আর পিপীলিকা হয়ত' সেই কৃষ্ণকে কামড়াইয়া দেয়। হাতীটা বেশী খাইয়াও কৃষ্ণকে বহন করিয়া আনিল, কৃষ্ণ সেবা করিল, আর পিঁপড়ে কম খাইয়া কৃষ্ণকেই হয়ত' কামড়াইয়া দিল।

ভক্তদিগের সহিত এবং ভক্ত নহেন বলেন যাঁহারা, তাঁহাদিগের সহিত পার্থক্য এই যে, ভক্তগণ সবিশেষ অর্থাৎ পুরুষোত্তম ভগবানের সত্তা স্বীকার করেন, ভক্ত নহেন বলেন যাঁহারা, তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী (Impersonalist); তাঁহারা Personality of Godhead স্বীকার করেন না, আমরা স্বতন্ত্র থাকিলে পরম আশ্রয় যিনি, তাঁহার আশ্রয়ের অভাবে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটে।

আনন্দের প্রার্থী সমগ্র চেতন জগৎ। অচেতনের কি প্রার্থনা, তাহা অবশ্য জানি না—তাঁহাদের আনন্দও জানি না, নিরানন্দও জানি না। পার্থিব আনন্দের মধ্যে নিরানন্দ অনুস্যূত, ঐ প্রকার আনন্দ অতি অল্পকালস্থায়ী, উহার প্রার্থী হইবার বিচার আনন্দের স্বরূপ-জ্ঞানের পরিচায়ক নহে। নিত্য চেতনাধিষ্ঠিত কেবল-চেতনময় বস্তুর সহিত আনন্দ সমাশ্লিষ্ট। আনন্দকে বিচ্ছিন্ন করিলে সচ্চিদানন্দ বস্তুর সম্যক্ পরিচয়াভাবে নিত্য-আনন্দ থাকে না। নিত্যচেতনাধিষ্ঠানে কেবল-জ্ঞানে আনন্দানুভূতিই জীবচৈতন্যের স্বাভাবিকী বৃত্তি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান দ্বারা যখন সেই আনন্দলাভের চেষ্টা করি, তখন হয় জড়ানন্দ, না হয় নিরানন্দ আমাদের প্রাপ্যরূপে বিবেচিত হইয়া আমরা নানা অনর্থসাগরে নিমজ্জিত হই। আমাদের মূল প্রয়োজন আনন্দ। যাহা কিছু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে আমরা প্রবৃত্ত হই, সকলের মধ্যেই সেই আনন্দের অনুসন্ধান হয়; কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ ফলকালে দেখি, খানিকটা আনন্দের পরে নিরানন্দ আসিয়া আমাদের চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। সচ্চিদানন্দ-বস্তু নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়-বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ফলেই খণ্ডকালের অধীনে আসিয়া আমাদিগকে নানাপ্রকার দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে; নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ না পাইয়া ক্ষণিক আনন্দ ও নিরানন্দের ঘাত-প্রতিঘাতে দ্বন্দ্বময় জীবনযাপন করিতে হইতেছে। সেইজন্য আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, যে চেতনের বৃত্তিতে পূর্ণ আনন্দধর্ম্ম অনুস্যূত, সেই পূর্ণানন্দ সচ্চিদানন্দ-বস্তুর সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন হওয়া।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবস্তু পরজগতে—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়-জগতে—কেবল চেতনময়-জগতে পূর্ণভাবে অবস্থান করিতেছে। দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া পরিবর্ত্তনশীল অভিজ্ঞতার বিচার হইতে বিচারান্তরে অবস্থিত হইয়া সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন জ্ঞানাভাবে নিজে স্বরূপতঃ পূর্ণবস্তুর জ্ঞানময় হইয়াও অপূর্ণ

ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিজানন্দ-প্রার্থনার বিচারে নানাপ্রকার ভ্রমাদি দোষ উপস্থিত হয়। তাহাতে অপ্রাকৃত রস-পঞ্চকের হেয় প্রতিফলন-স্বরূপ বিকৃত রসপঞ্চকে অবস্থিত ইহজগতের সঙ্গক্রমে নানাবিধ অরিষ্ট লক্ষ্য করি। কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণাদিতে যে পাঁচটি রস-বিভাগ দৃষ্ট হয়; উক্ত রসপঞ্চকের মূল উপাস্য রসময় রসিকশেখরের সহিত সম্বন্ধ সংশ্লিষ্ট হইয়া যদি সেই রসপঞ্চকোপাস্য বস্তুর আনন্দ বিধানোদ্দেশ্যে আমাদের সমস্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কলাপে রত থাকি, পূর্ণবস্তুতে পূর্ণভাবে রসপঞ্চককে নিবেদন করি, তাহা হইলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভে আমাদের কোনও ব্যাঘাত ঘটিবে না।

সকল সদ্‌গুণ-সম্পন্ন শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণই কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আমাদিগকে আর ত্রিগুণ-তাড়িত হইয়া গুণ-ভোগ বা গুণ-ত্যাগ-বিচারে অশান্ত জীবন যাপন করিতে হইবে না। আমাদের যাবতীয় বিচার-প্রণালী পূর্ণের প্রতি ধাবিত হউক। তাহা হইলে আর কোনও অপূর্ণতা থাকিবে না। পরমাত্মার সেবা ব্যতীত আত্মার অন্য কোনও কৃত্য নাই; তদ্ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ নাই।

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দয়োঃ ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্।।"

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে যে ভগবৎসেবার বিচার বর্ত্তমান, আমাদের সমস্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে যখন এই বিচার নিযুক্ত করিতে পারিব, তখন এই রস ছাড়িয়া আর অন্য কোন জড় রসে আমাদের রুচি থাকিবে না। আমাদের বাস্তবমঙ্গল আনন্দ--ব্যক্তিগত আনন্দ, তাহার পূর্ণাধিকারীর সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইলেই পূর্ণানন্দ ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়।

আমরা আপেক্ষিক ধর্ম্মের বশীভূত না হওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখিনা। চক্ষুদ্বারা রূপদর্শন বা কর্ণদ্বারা শব্দশ্রবণ ব্যতীত চক্ষু বা কর্ণের অন্যপ্রকার ক্রিয়া দেখি না। কিন্তু সেই চক্ষু কর্ণাদিকে সচ্চিদানন্দ-বস্তুর অনুশীলন ব্যতীত যখন 'মেপে নেওয়া' বস্তুর অনুশীলনে নিযুক্ত করি—মায়িক চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ হই, তখন "কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতিঃ--কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বিচার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নানা অনর্থের দ্বারা উৎপীড়িত হই।

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—ইহাই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা। হরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ হইতেই আমাদের যাবতীয় অসুবিধা উপস্থিত হয়। অবশ্য জাগতিক ক্রিয়াকলাপের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা তত্তদধিকারীর পক্ষে স্বীকৃত হইলেও ভবিষ্যতফল-বিচার প্রত্যেক বুদ্ধিমানেরই কর্ত্তব্য। বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ—বৈকুণ্ঠ নামের শ্রবণ-কীর্ত্তন হইলেই সমস্ত অঘ বিদূরিত হয়—সমস্ত শুভের উদয় হয়।

অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণে সমস্ত রসের সমাবেশ, তাঁহার জন্য সমস্ত চেষ্টাকে পূর্ণরূপে নিযুক্ত করিলে আমরা আংশিক চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি। আর রাবণ-

প্রকৃতির ব্যক্তিগণ ত্রিদণ্ড গ্রহণ ক'রে সীতাহরণ ক'রে থাকে। এরা স্বয়ংই হৃষীকেশ হয়ে পড়েছে। বাউল বা সহজিয়ার মুখে কখনই হরিনাম হয় না। এই সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত হরিনামের স্বরূপও বুঝা যায় না। সাধুগণের মধ্যে ভোগ ও ত্যাগের প্রবৃত্তি নাই। ভোগ ও ত্যাগ উভয়েই জড়-প্রকৃতির স্থল। সাধু ভোগ ও ত্যাগের স্থলবল নহেন। হরিকে শয়তানের প্রতিমা করে সেইরূপ শয়তান হরির (?) নাম ক'রলে সুবিধা হবে না। বৈকুণ্ঠনাম ও বৈকুণ্ঠনামী অভিন্ন। নামের দ্বারা নিজের সেবা করিয়ে নেওয়ার চেষ্টাই নামাপরাধ। 'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈযত্রিক এককালঃ'।

তিনটা টিউব থেকে যদি জল বেরিয়ে একটা ট্যাঙ্কে পড়ে তাহলে জলের level (উপরিস্তর) যেমন তিন রকম থাকে না, একই হয়ে যায়, সেরূপ ভক্ত্যন্মুখী যাবতীয় চেষ্টা, পরেশানুভব ও বিরক্তি পরস্পর পৃথক্ থাকে না, সকলেই ভক্তিপরতা লাভ করে।

ভোগবাসনা হ'তে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা একটা জিনিষ, আর ভোগবাসনা হতে প্রকৃত মুক্তি আর একটা জিনিষ। মুমুক্ষু ও মুক্ত এক বস্তু নয়।

তাই তিন ভাই জগন্নাথ দর্শনে গেল। তামসিক ভাই ও রাজসিক ভাই সাত্ত্বিক ভাইকে বললে "তুমি এক তৃতীয়াংশের ভাগীদার। তোমার সাত্ত্বিক-দর্শন আমাদের রাজসিক ও তামসিক-দর্শনের অংশ অপেক্ষা কম।" সাত্ত্বিক ভাই বললে—"আমি তোমাদের অংশ কেন, নিজের অংশটুকুও ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। আমি নির্গুণ দর্শনের অভিলাষী।" সব ভগবান্ ভোগ করুন এই নির্গুণ সেবাময় ইচ্ছাই 'ভক্তি'।

ভগবান্‌কে ঘোড়া করব এরূপ বিচারে অশ্ব-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ প্রভৃতির বিচার মানবের বহির্ম্মুখ চিত্ত বৃত্তিতে উদিত হয়। এই সকল মায়াবাদ-মিশ্রিত বিচার। ভগবান্ ঠুটো রাম, আর আমার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই ঠিক—এই বিচারে লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে দরিদ্র করবার ইচ্ছা হয়। খোসাটা নারায়ণ নয়, জীবও নারায়ণ নয়। জীবত্ব বা পরমেশ্বর-তত্ত্ব কোনটির ভিতরেই দারিদ্র্য নাই। জীবের খোসা দর্শনেই দরিদ্রতা। শিব মুক্ত পুরুষ, শিবত্বে দরিদ্রতা নাই। জীবের সেবা ব'লে কোন কথা হ'তে পারে না। জীবের ভোগ বা জীবের প্রতি করুণা, আর বৈষ্ণব ও বিষ্ণুর সেবা—এক নয়।

"প্রাক্তন কর্ম্ম ও বাসনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্তস্থির হতে পারে না। আরোহবাদিগণ কৃত্রিম যোগ তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য-বিধানের চেষ্টা করে; তাতে চিত্তের আত্যন্তিক স্থৈর্য্য লাভ হয় না। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে ও হরিলীলা-আলোচনার দ্বারা যে স্বাভাবিক স্মরণের উদয় হয়, তদ্দ্বারাই চিত্ত বশীভূত হ'তে পারে। অন্য কৃত্রিম ভাবে চিত্ত স্থির করবার পক্ষপাত শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারে নাই। হোক্ না কেন চিত্ত শত ভাবে অস্থির, যদি হরিপাদপদ্ম-সেবার জন্য চিত্তের সেই গতি থাকে, তাহলে চিত্ত

কোথায় যাবে? হরিসেবার জন্য সহস্র কামনা অনুক্ষণ হরিসেবার জন্য লৌল্যই চিত্তের প্রকৃত স্থৈর্য্য।

"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি, কেমনে 'হিত' হয়।।
'সাধ্য' সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত' আপনি।।"

এই মায়িক-লোকে প্রাণিগণ ত্রিতাপে জর্জরিত। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপ। আধ্যাত্মিক তাপ দুই প্রকার—জরাদিরোগজনিত শারীরিক, প্রিয় ব্যক্তির বিয়োগ-জনিত মানসিক। জরায়ুজপ্রাণী হইতে তাপ, অণ্ডজপ্রাণী হইতে তাপ, স্বেদজপ্রাণী হইতে তাপ, উদ্ভিজ্জপ্রাণী হইতে তাপ—এই প্রকার আধিভৌতিক তাপ। আধিদৈবিক—দেবতা হইতে যে তাপ উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রাদি বরদেবতা হইতে উৎপন্ন তাপ—শীত, বজ্রপতন ইত্যাদি। হিংস্রস্বভাব যক্ষ-পিশাচাদি অপদেবতা হইতে অশুভজনক আপদ-বিপদ-তাপাদি হইয়া থাকে। কি জন্য এই সকল তাপ আসে; কি করিলেই বা তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়; কি উপায়েই হিত হয় তাহার উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ।।

"কে আমি" এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন, তুমি জীব। জীব স্বরূপে নিত্যকাল বৈষ্ণব। যিনি ভগবানের সেবা করেন তিনি বৈষ্ণব। ভগবানের সেবাই প্রত্যেক জীবের নিত্য স্বাস্থ্য।

আমরা মানুষের দেহ পাইয়াছি। পিতামাতা এই দেহ পালন করিয়াছেন। আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন ইত্যাদি। মৃত্যুর পর মনুষ্য দেহ নাও পাইতে পারি। কর্ম্মানুসারে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, প্রস্তর বিভিন্ন ভূচর, খেচর ও জলচরসমূহের যে কোনও জন্মলাভ হইতে পারে। এখন যেমন আমরা প্রবাসে দুই চারিদিন বাসকরি সেইপ্রকার দেবীধামের এক এক জন্ম প্রবাস তুল্য। পাকস্থলী আছে খাইতে হয়। পাকমান-যন্ত্র—পাকস্থলী অন্ন ইত্যাদি খাদ্য হজম করে এবং যাহা হজম না হয়, তাহা বাহির করিয়া দেয়। জড়জগতের এই সকল খাদ্যের সহিতও আমাদের প্রবাসতুল্যই ক্ষণিক-সম্বন্ধ।

যে কয়দিন ইহজগতে জীবন সেই কয়দিন খাদ্যের প্রয়োজন। জীবন চলিয়া গেলে পাঞ্চভৌতিকদেহ পড়িয়া থাকে কিন্তু তাহা আর খাদ্য গ্রহণ বা হজম করিতে পারে না। ইহ জগতে আমরা কি ভাবে সেবা করি? চারিপ্রকার সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া সেবার কার্য্য। পত্নী পতির, জনক-জননী সন্তানের, বন্ধু বন্ধুর এবং ভৃত্য সমূহ প্রভুর সেবা করিয়া থাকে। স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবেই ইহজগতে অনিত্য সম্বন্ধে কার্য্য। স্বরূপে এই সকল সম্বন্ধই কৃষ্ণের সহিত। কৃষ্ণ আমাদের নিত্যসেব্য। আমরা কৃষ্ণ নহি — কৃষ্ণের সেবক। কে 'আমি' প্রশ্নের উত্তর--তুমি কৃষ্ণের, তুমি তদীয়। কৃষ্ণ প্রভু--নিত্য প্রভু আমরা তাঁহার eternal slaves নিত্য কেনা গোলাম। তাঁহার সেবার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াই আমাদের এই দুর্দ্দশা--ত্রিতাপ তপ্ত আমরা । তাঁহার সেবার বিরুদ্ধে অভিযান-জন্যই আমাদিগকে এই সাময়িক সম্বন্ধ-যুক্ত মায়িক-জগতে আসিতে হইয়াছে।

কৃষ্ণের শক্তি তিন প্রকার—(১) অন্তরঙ্গা, (২) বহিরঙ্গা, (৩) তটস্থা। অঙ্গ বলিয়া একটি ব্যাপার আছে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি--External aspect of potency, অন্তরঙ্গা শক্তি--Internal potency which is now covered to us (অন্তরঙ্গা শক্তি এখন আমাদের নিকট আবৃত)। External manifastation is this world--এই জগৎ বাহিরের দিকের খোসা। ইহার ভিতরের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে অন্তর্যামীরূপে ভগবান্ আছেন।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।।

(শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬)

সর্ব্বদা সংযুক্ত, সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী একটি দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে; অন্যজন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে পরিদর্শন করেন।

জীব অণুচিৎ চিৎকণ। কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহার শত-শতাংশ-সদৃশ স্বরূপই জীবের সূক্ষ্ম-স্বরূপ। জীব সংখ্যাতীত।

"কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশ-সদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ।।"

জীবের স্বরূপ--Smallest quantity (যত ক্ষুদ্র হইতে পারে)। আর ভগবান্ —Infinity (সীমারহিত)। ভগবান্ও চেতন, জীবও স্বরূপতঃ চেতন। আমরা বদ্ধদশায় পড়িয়া চেতনের অপব্যবহার করিতেছি। ভগবান্ এক পদার্থ—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"। দুইটা দশটা—দুই লক্ষ দশ লক্ষ—দুই কোটি দশ কোটি নহেন—তিনি এক। আমরা সূক্ষ্ম বলিয়া বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা overpowered (অভিভূত) হই।

ভগবানের দ্বিবিধ অঙ্গের অন্তরালে তট-প্রদেশে যে শক্তি বিরাজমানা, তাহাতে জীবত্বের উপাদান নিহিত আছে। জীবগণ--পরিমিত ও অসংখ্য, আবার তাহারাই একতাৎপর্য্যপর ও চিন্ময়। জীবের সহিত অচিচ্ছক্তির বৃত্তিত্রয় ত্রিগুণ এবং ত্রিগুণোত্থ সংখ্যা-গত বহুত্ব ও বস্তুবিশেষের চতুষ্পার্শ্ব--তাহাদের বৈশিষ্ট্যসাধনের সহায়। অচিচ্ছক্তির পরিণামের পরিচয়-সাম্যে আমরা জীবের অসংখ্যত্ব ও অণুচিদ্ধর্ম্ম লক্ষ্য করি। বহিরঙ্গা-শক্তি-ধর্ম্ম তটস্থা-শক্তি-ধর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিলেও অন্তরঙ্গা-চিচ্ছক্তি-ধর্ম্ম যে জীবত্বে নাই,---এরূপ নহে। চিচ্ছক্তিবৃত্তি--জ্ঞাতৃত্ব, স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ও অনুভবিতৃত্ব--তটস্থা শক্তিতেও বর্ত্তমান।

জীব স্বরূপতঃ অণুচিৎ হইলেও সংখ্যায় অনন্ত এবং ত্রিগুণের সহিত ন্যূনাধিক মিলন-প্রয়াসী। জীব অণুচিৎ-স্বরূপ বলিয়া তাঁহাতে অন্তরঙ্গা শক্তির বৃত্তিত্রয়---অসংযতভাবে ও অবৈধভাবে বহির্জগতের গুণত্রয়ের সহিত মিলন-ফলে বিকারযোগ্য। বহিরঙ্গা-শক্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইবার যোগ্যতায় অণুচিদ্ধর্ম্ম আশ্রিত, এজন্য অণুচেতন জীব--গুণ-মায়া ও ভক্তিযোগ-মায়ার ভূমিকাদ্বয়ে বিচরণশীল। অণুচেতন জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি--সম্বিদাশ্রিতা; তাঁহার জ্ঞাতৃত্বের অস্মিতায় তিনি অচিচ্ছক্তি-পরিণত নশ্বর প্রপঞ্চে সম্বিদ্‌বৃত্তির পরিচালনে বা জ্ঞাতৃত্বধর্ম্মে নিত্য অবস্থিত। যে-সময়ে তাঁহার নিজ-জ্ঞাতৃত্বের অস্তিত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না, তখনই তিনি নিশ্চেষ্ট ও তটস্থধর্ম্মে অবস্থান করেন। ভগবানের অচিচ্ছক্তির আধার জড়াকাশে স্বীয় স্থূল অস্তিত্বের জ্ঞাতৃত্ব পরিচালন করিয়া জীবের ইন্দ্রিয়সাহায্যে বহির্ব্বস্তুর ভোগরূপ নৈসর্গিক ধর্ম্ম সময়বিশেষে পরিলক্ষিত হয়। তৎকালে তিনি যে-সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে 'কর্ম্ম' বলে। কর্ম্ম--অণুচিৎএর অনাদি-ধর্ম্ম, এবং নশ্বর ভূমিকায় পরিচালিত হইবার যোগ্যতা-হেতু বিনাশ-যোগ্য। কর্ম্মপ্রবৃত্ত কর্ত্তা বৈদেশিক-গুণত্রয়ের অভিমানে স্বীয় চিদ্ধর্ম্মের অপব্যবহার করিয়া ফেলেন। সত্ত্বগুণাবলম্বনে তিনি স্বরূপের কিছু পরিচয় পাইলেও নশ্বর রজস্তমো-গুণ-মিশ্রভাবের অনুভূতিক্রমে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম করেন। সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইয়া কর্ত্তা যখন রজস্তমোবৃত্তিদ্বয়ের সমন্বয়তার জন্য ব্যস্ত হন না, তখনই তিনি সৎকর্ম্মনিপুণ সাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।"

(গীতা ৭।১৪)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন---"সত্ত্বাদি-গুণবিকারাত্মিকা আমার এক অলৌকিকী মায়া আছে। উহা দুর্ব্বল জীবের পক্ষে দুরতিক্রম্যা। যাঁহারা কেবলমাত্র আমাতে শরণাগত হন, তাঁহারাই মাত্র ঐ মায়াসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।"

বহিরঙ্গা শক্তিতে তিনটি গুণ—সত্ত্বগুণ, রাজোগুণ ও তমোগুণ। রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে সংরক্ষণ ও তমোগুণে ধ্বংস। বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়ায় পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ লাভপূর্ব্বক দেবীধামে জন্ম; শিশু, বালক, কিশোর, বালক, কিশোর, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ প্রভৃতির অবস্থাপ্রাপ্তি; আবার মৃত্যু। বৈকুণ্ঠ জগতে অবরতা বা হেয়তা নাই, তথায় নিত্যরূপ-নিত্যসেবা। তথায় সেবক সেবাদ্বারা সেব্যকে আনন্দ দেয়, আবার তাহাতেই আনন্দ পায়। এখানে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হয়—না করিলে অসুস্থ হইয়া পড়ি; তথায় এই শ্রেণীর পরিত্যাগ বলিয়া কোন কথা নাই। সেখানে জরা মরণ নাই। সেখানেও হানি-বৃদ্ধিতেও সুখের উদয়। এখানে পাথরও ধ্বংস হয়--লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে হইতে পারে, কিন্তু হয়ত। কিন্তু বৈকুণ্ঠে ক্ষয় বলিয়া কোন কথা নাই। সেথা বৃক্ষাদি সকলই নিত্যধর্ম্মে বিরাজিত। এখানে পরিণামশীলতা; একটি ফুল ফুটিল আবার শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল। সেখানে (বৈকুণ্ঠে) তাহা নাই। নিত্য ফুল নিত্য-সৌরভ দেয়। এখানে সকলই কালাধীন—সেখানে অখণ্ড কাল। এখানে অনিত্যই প্রধান ধর্ম্ম, বৈকুণ্ঠ নিত্যরাজ্য। এখানে অনিত্যের পরিণামশীলতা, সেখানে তাহা নাই।

বর্ত্তমানে আমরা অচেতন পদার্থ ভোগ করিতেছি। চেতনধর্ম্মের যে সকল কথা বলা যাইতেছে, তাহার সাদৃশ্য এখানে আছে। এই জড়জগৎ হইতে বৈকুণ্ঠলোকে যাওয়া যায় ভগবানের সেবা আরম্ভ করিলে। আর ভগবানের ন্যায় সেবা গ্রহণ করিতে হইলে এখানে আসক্ত থাকিয়া ত্রিতাপ ভোগ করিতে হয়।

জাগিয়া থাকিলে দৃশ্য জগতের সাক্ষাৎকার। এখন দৃশ্য পদার্থ রহিয়াছে। স্বপ্নে দৃশ্য পদার্থ নাই--অথচ দর্শন-প্রতীতি। স্বপ্নে দেখিতেছি—বাঘ আসিয়া আমাকে খাইতেছে, কিন্তু তথায় বাঘ নাই। নিদ্রাকালে স্বপ্নে, আর জাগ্রত অবস্থায় মনোরথে বিভিন্ন অলীক দর্শন। যখন ইতিহাস পড়ি, তখন মনে হয়, যেন চক্ষুর সম্মুখেই রাজন্যবর্গকে stage-এ দেখা যায়। অথচ আমাদের পাঠের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে। মনোরথ ও স্বপ্নে যাহাকে দেখিতে পাইতেছি, তাহার সম্মুখে থাকিবার দরকার নাই। দৃশ্য পদার্থ স্থূলভাবে আসিতেছে না, স্মৃতিতে কার্য্য চলিতেছে। এই স্মৃতিতে জড়তা আছে, কিন্তু অপ্রাকৃত স্মৃতি তাহা নহে।

"অহ্ন্যাপৃতর্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা নানা মনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি।।"

(ভাঃ ৩।৯।১০)

ভগবানের কথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। বৈকুণ্ঠনাম নিরন্তর গ্রহণ করিতে হইবে। জড়-ধারণার কৃষ্ণানুভূতি ও অপ্রাকৃত কৃষ্ণানুভূতি এক নহে। জড় ধারণায় অধোক্ষজ কৃষ্ণানুভূতি নাই—জড় জগতে তৎস্থান অধিকার করিয়াছে বহিরঙ্গা মায়া।

চিচ্ছক্তিতে সচ্চিদানন্দ বর্ত্তমান। অচিচ্ছক্তিতে সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য। এই গুণত্রয়ের পরস্পরের সহিত সঙ্ঘর্ষ রহিয়াছে; কিন্তু গোলোকের সৎ, চিৎ ও আনন্দের মধ্যে harmon-(মৈত্রী) বর্তমান। নাস্তিকেরা অচেতনের সংযোগে চেতনের আধিপত্য করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে, তাহা কখনই সম্ভব নহে। নিত্য-জগতে নিত্য-বিলাস বিরাজিত, তাহা নাস্তিকের অক্ষজ-জ্ঞানের অন্তর্গত নহে। চিজ্জগতের গুণ ও অচিজ্জগতের গুণের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। নিত্যজগতের দ্বাদশরসের হেয় বিকৃত প্রতিফলন এই জগতে।

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ। কৃষ্ণ—শক্তিমান, জীব তাঁহার তটস্থা শক্তি। কৃষ্ণ সেব্য, জীব—সেবক; কৃষ্ণ—বিভুচিৎ, জীব—চিৎকণ। জীবও স্বরূপতঃ চিৎ। "শক্তি-শক্তিমতয়োরভেদঃ"। মহাভাগবত হইলে সেবার সুদর্শনে সর্ব্বজ্ঞতা আসে। তখনই অপ্রাকৃতানুভূতি পূর্ণরূপে হয়। বৈকুণ্ঠে নিত্য-রূপ-বৈভব দর্শন। ইহজগতে রূপাদি বিকারযুক্ত। ইহজগৎ ও পরজগতের মধ্যে সাদৃশ্য আছে; কিন্তু উভয়ে এক নহে।

ইংরাজীতে 'adjustment' বলিয়া একটি কথা আছে। অর্থাৎ অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের কথা। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষগুণ বৃহৎ; কিরণ সেই সূর্য্য হইতে আগত। যদি আমরা সূর্য্যের সান্নিধ্য লাভ করি, তাহা হইলে—এত গরম হইবে যে, পুড়িয়া যাইব; কিন্তু properly adjusted হইলে—এখন যেমন আছে সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষগুণ বৃহৎ বলিয়া তাহা হইতে কিরণ আসিতে আট মিনিট সময় লাগে; তজ্জন্য সূর্য্যের দূরে অবস্থান-হেতু আমাদের চক্ষু সূর্য্য দর্শনে সমর্থ হয়। Telescope-এ আলো কম করিয়া দিলে, আলোকযুক্ত দিবাভাগেও অদৃশ্য গ্রহ-তারাগুলি দৃশ্য হয়। সব দেখা না গেলেও Mercury বা বুধগ্রহকে কালেভদ্রে দেখা যায়, Vulcan-কে আদৌ দেখা যায় না। তাই ভগবানের সঙ্গে আমাদের adjustment-এর প্রয়োজন হইয়াছে। Theory of adjustment গ্রহণ করিলে বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। ভগবদ্ভক্তিই true adjustment। তাহাতেই কেন ভগবান্ মাধ্যমিক হইয়া গ্রাহ্য হন, আবার কেনই বা অতিসূক্ষ্ম বা অতি বৃহৎ বিচারে গ্রহণীয় নহেন? এই সকল বিচার বুঝা যাইবে। আমরা microscopic particles গ্রহণ করিতে পারি না বটে; কিন্তু adjustment-এর দ্বারা এই সকল পদার্থের অভিজ্ঞান লাভ করি।

কৃষ্ণ যদি অনুকূল হন, আমরা যদি প্রতিকূলতাকে বর্জ্জন করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনের বিচার বরণ করিতে পারি, তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তাহা হইলেই কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাদের সেবা গ্রহণ করিবেন; আর যদি প্রতিকূল-বিচার বরণ করি, যেমন চক্ষু-কর্ণ-নাসিকাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়েরই তিনি অগ্রাহ্য—(তিনি একটি নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব), তাহা হইলেই সব ছুটি হইয়া গেল।

সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।

আধ্যক্ষিকগণ অধোক্ষজ বস্তুকে দর্শন করিতে পারেনা। ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত পদার্থ খণ্ডিত হইয়া যাইবে। ভগবান্ খণ্ডিত বস্তু নহেন বলিয়া প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগাদিদ্বারা তাঁহার অনুশীলন সম্ভব হয়না—এই চক্ষুর দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না। এই হস্ত সেই পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে না। এ বিষয়ে একটি গল্প আছে। কতকগুলি গুলিখোর নদীর এক পারে বসিয়াছিল। তাহাদের টিকা ধরাইবার দরকার পড়িয়া গেল। তখন তন্মধ্যে একজন নদীর পরপারস্থিত নৌকায় প্রদীপ জ্বলিতেছে দেখিয়া এপার হইতেই টিকা ধরাইবার অভিপ্রায়ে তদভিমুখে হাত বাড়াইয়া বসিয়া থাকিল; কিন্তু কত সময় চলিয়া গেল টিকা আর কিছুতেই ধরে না দেখিয়া আর এক বুদ্ধিমান তাহাকে এক চপেটাঘাত করিয়া টিকাখানি কাড়িয়া লইল এবং তাহার অকর্ম্মণ্যতা জানাইয়া নিজের বুদ্ধিমত্তা দেখাইবার জন্য হাতখানি আর একটু বাড়াইয়া ধরিল। বলা বাহুল্য, 'টিকা ধরান' আর হইল না! এই রকমই গুলিখোরের বিচারবিশিষ্ট অনেকেই আছেন। ভগবান্ যে কাদা মাটি পাথর নন, আবার এইগুলিকে ছাড়িয়া ছুড়িয়া যে 'অপরিচ্ছিন্ন' বলিয়া একটি বাহাদুরী কথা আছে, সেরূপ কোন বাহাদুরীর বিষয়ও তিনি নহেন, বাস্তব সত্য এবং এগুলির মধ্যে যে বিশেষ ব্যবধান আছে ব্যবহিতরহিত হইলেই যে বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয় তাহা ঐ সকল বাহাদুরীওয়ালা লোকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না।

সংসার ভোগের জন্য যে ঈশ্বরের কল্পনা, তাহাতে আধ্যক্ষিকতাই ঈশ্বরসেবা বলিয়া মনে হয়। স্ত্রী, পুত্র, গৃহ প্রভৃতিতে 'আমার' বুদ্ধি এবং এই বুদ্ধিতে জলকাদা-মাটি প্রভৃতি সংগ্রহের চেষ্টা মৎসরতা। জল বুদ্ধিতে তীর্থ বুদ্ধি কপটতা মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮৪।১৩) ঐরূপ বুদ্ধিতে গর্দ্দভ-সুলভ বুদ্ধি বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন।

জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা।।

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎ কৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।

মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে জীব জড়াতীত—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত হইয়াও আপনাকে জড় দেহ ও মন বলিয়া বিচার করে এবং তমোগুণের অতীত হইয়াও আপনাকে জড় দেহ ও মন বলিয়া বিচার করে এবং তাদৃশ

ত্রিগুণাত্মক অভিমান-জাত কর্ত্তৃত্বাদির মূলে সংসার ব্যসন লাভ করে। সংসারে আসক্তি জীবকে গাধা করিয়া থাকে।

ভোগোন্মুখচিত্তে জগন্নাথ-দর্শন--কাষ্ঠ দর্শন। কাষ্ঠ দর্শন হইলেই অধঃপতন হইয়া গেল। বৈভব অবতারের বিচারে আমাদের মনে হইবে; যদি ভগবানের পিতামাতা থাকে, তাহা হইলে তিনি সাধারণ মানুষ মাত্র। তাহাতে বরাহ অবতারকে সাধারণ শূকর জ্ঞান হইবে। কিন্তু সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অন্য দেবতা কিংবা মানুষের সঙ্গে সমপর্য্যায়ে গণনা করিলে আমরা নরকে যাইব।

এই জড় বিশ্ব, জড় বিদ্যা জড়ের অনুসন্ধানের জন্য জ্ঞান-প্রবৃত্তি মাপিয়া লইবার বিভুতা। মাটিয়া বুদ্ধি (Mterialistic idea) হইলে ভুতপূজা বা ব্যুৎপরস্ত হইয়া যায়। ভূতপূজা অসুবিধা উৎপন্ন করিয়াছে। নায়ক পূজায় নায়ক আমার অপেক্ষা একটু বড়। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ঐ শ্রেণীর নায়ক মনে করিলে চলিবে না। ভগবানে জড়তা আছে ধরিয়া লইয়া তাহাতে কতটা পরিমাণ জড় তাহার অনুসন্ধানার্থ প্রধাবিত হইলে নরকের দিকেই গতি হইল মাত্র। এই সকল ভক্তির প্রতিকূলা চেষ্টা। ভগবানে জড়ত্ব থাকিতে পারে না। মায়াদেবী মাপিয়া লইবার বৃত্তিকে বহির্ম্মুখ বুদ্ধির মধ্যে injection করে, তাহার ফলেই অভক্তির দিকে চিত্ত-বৃত্তি চলিয়া যায় এবং মনে হয় আমি প্রভু, ভগবান্ আমার আরদালী, যাহা চাইব, তাহাই আমাকে আনিয়া দিবেন। যদি ভগবানের কৃপা কাহারো প্রতি হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি জানিতে পারে, মাপিয়া লইবার অবস্থায় পতন কি সর্ব্বনাশ কর। জড়জগতেই সাধারণ ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যে পালাক্রমে ভোগের অভিনয়। কোন ব্যক্তি যাহাকে খাইতেছে সেই পশু আবার তাহাকে খাইবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মৃত্যুর সময় ঘাতকের চিন্তা করিতে করিতে সেই পশু হইয়া যাইবে ঘাতক, আর ঘাতক হইয়া যাইবে পশু। এইভাবে প্রভু ভৃত্য হইয়া যাইবে; আবার ভৃত্য প্রভু হইয়া যাইবে; পুরুষ স্ত্রী হইয়া যাইবে, স্ত্রী পুরুষ হইয়া যাইবে, রাজা প্রজা হইয়া যাইবে, প্রজা রাজা হইবে। যাহারা হরি ভজন করে না, তাহাদের ঐ গতি ঐ বর্ণন--একবার উত্তমর্ণ একবার অধমর্ণ। যখন জ্ঞান থাকে না, তখন বুঝিতে পারি না--হয় ত' বাবার কোলেই প্রস্রাব করিলাম, লাথি মারিলাম, জ্ঞান হইলে আর তাহা পারি না। তখন বাবাকে সম্ভ্রম জ্ঞানে--পূজ্যজ্ঞানেই দেখি। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে দিব্যদৃষ্টি লাভ হইলে বিষ্ণুকে আর কাঠ-পাথর জ্ঞান হয় না; সেব্য সচ্চিদানন্দবস্তু রূপেই দেখি। তখন তাঁহার প্রতি প্রাকৃত-বুদ্ধি আরোপ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছি, তজ্জন্য অনুশোচনা আসে। যে বস্তু সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলকর, তা' কা'রও পক্ষে অমঙ্গলের কথা নয়। যে কথা বিস্মৃত হ'য়ে আমাদের এই দুর্গতি ঘটেছে, যদি সেই কথার মধ্য দিয়ে আবার যেতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল। সেই কথার মধ্যে বাদ-

বিসম্বাদ নাই; যেখানে সেই কথাকে আমাদের অহমিকা দ্বারা—আমাদের মনোধর্ম্মের দ্বারা আবরণ ক'রতে চেষ্টা করি, সেইখানেই আমরা বাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করে বঞ্চিত হই। সেই ভগবৎ কথা 'শান্তি' নামে অভিহিত হয় বটে, কিন্তু মানবের প্রস্তাবিত শান্তি শব্দের দ্বারা তা প্রকাশ করতে গেলে প্রাকৃত বস্তুর সর্ব্বদাই সাধন করা হয়। জগতে শত্রু-মিত্র শব্দরূপে যা প্রচারিত, তাও যদি একমাত্র ভগবৎ সেবায় সার্থকতামণ্ডিত হয়, তবেই তদ্দ্বারা সুফল লাভ করা যায়। শান্ত-দাস্য-সখ্যাদি পঞ্চ মুখ্যরস, হাস্য-করুণাদি সপ্ত গৌণরস সমস্তই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবানের পাদপদ্মসেবা ক'রে কৃতার্থ হতে পারে।

কোন ব্যক্তি বিশেষের---কোন জাতীয়তা, প্রাদেশিকতা-বিশেষের বা কোন সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আমরা ক্ষুণ্ণ না হ'য়ে যদি ভগবানের বাণীর সেবা করতে পারি, শ্রীচৈতন্যবাণীকে কেন্দ্র করে পরস্পরের চেতনের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন করতে পারি, তাহলে আমরা যতই ক্ষুদ্র হই না কেন, সমগ্র মানবজাতি সকল কালের মানবজাতি সেই প্রেম বন্ধনের দ্বারা আমাদের আত্মীয় হবে এবং মঙ্গল লাভ করবে।

আমরা জাগতিক মতভেদ নিয়ে সময় নষ্ট করবো না। আগমপায়ী বিষয়ে মতভেদের দ্বারা কোন স্থায়ী মঙ্গল লাভ হয় না। 'সকলেই ভগবানের আশ্রিত' এই বিচার ক'রে 'বড়' ছোট' ভেদ হতে নির্ম্মুক্ত হব। সর্ব্বতোভাবে শান্তিপ্রদ পথের অনুসরণ করে যে মঙ্গল লাভ হয়, সেই মঙ্গল আর কিছুই নয়, কেবল ভগবৎসেবা।

আমরা অনেক সময় কর্ম্মপথের পথিক হ'য়ে civic rule সমূহ প্রবর্ত্তন ও পালন ক'রে থাকি। তাতে কখনও কখনও পরার্থিতা, আবার কখনও প্রচ্ছন্ন পরশ্রীকাতরতা পরার্থিতার ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়। আমার সুবিধাটুকু হ'ক বা আমার শ্রেণীর সুবিধা হ'ক, অন্য শ্রেণীর হ'ক আর না হ'ক—এরূপ চিত্তবৃত্তিও আমাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

এ থেকে ছুটি পাবার জন্য ত্যাগিসম্প্রদায় salvationist হ'য়ে জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও জ্ঞাতার ত্রিপুটি বিনাশ করতে ধাবিত হয়।

এই দুই প্রকার বিচার-প্রণালী যাঁরা অবলম্বন করেন, তাঁরা মূল বস্তুর—আকর বস্তুর সেবার প্রতি উদাসীন। আমরা detachable element হয়ে যদি মতভেদ স্থাপন করি, তবে আমাদের মঙ্গল হ'বে না। যাবতীয় সুবিধার পথ একমাত্র পরমেশ্বরই দেখিয়ে দিতে পারেন, মানবের কল্পিত সুবিধাবাদ যত উদারতা ও নিরপেক্ষতার সজ্জায় সজ্জিত হয়ে আসুক না কেন, তা' সমূহ অসুবিধা ও অমঙ্গলের বীজ বহন করে নিয়ে আসে।

বর্ত্তমানে আমাদের সাময়িক ও নশ্বর ইন্দ্রিয়-সুখ-সুবিধাবাদের অনুসন্ধানে ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করে বিভিন্ন engagement হ'য়ে পড়েছে। আমাদের চিত্তবৃত্তিকে Pantheistic idea আক্রমণ করে ফেলেছে। আমরা বাস্তব শান্তির কথা শুনতে

চাই না। আমাদের নিজ নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকে কেন্দ্র ক'রে যে সকল ভেদবাদ উৎপন্ন হয়েছে, সেই সকল ভেদ হ'তে মুক্ত হওয়া আবশ্যক। ভগবানের কথা অনুশীলন করা প্রত্যেকের প্রয়োজন। আমরা ভগবানের অনুশীলন করতে গিয়ে আবার কল্পিত সগুণ উপাসনা, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণবাদ, কখনও বা স্পষ্ট নাস্তিক্যবাদ বরণ করি। অনেক সময় sacrificing mood দেখাতে গিয়ে ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাকে পর্য্যন্ত বিসর্জন ক'রতে প্রস্তুত হই। সেজন্য শ্রীচৈতন্যদেব তৃণাদপি সুনীচ হয়ে, অমানী মানদ হয়ে সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করবার আদেশ দিয়েছেন।

হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই humanity-র প্রকৃত সেবা হয়। Humanity-র যাবতীয় ব্যাধির নিদান হরিকীর্ত্তনই অনায়াসে অবহেলায় আবিষ্কার ক'রতে পারেন।

আমি নিজে নিজে আমাকে 'বড়' বল্‌লে লোকে শুন্‌বে না। আমাকে চপেটাঘাতে নামিয়ে দেবে। আমাতে অপরকে সম্মান দেওয়ার অভাব থাক্‌লে অপরকে ভগবানের কথা শুনান খাটে না; ভগবানের সেবা করা একমাত্র উদ্দেশ্য হ'লে জগতের কোনও ব্যক্তিকে অসম্মানিত করা উচিত নয়। হরির যখন জগৎ, তখন জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটি কি, তাও ঠিক ক'রে নেওয়া উচিত। হরির আলোচনা ক'রতে হ'লে আমাদের সমস্ত activity, whole integers-এর সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক— অর্থাৎ আমাদের সমস্ত কার্য্য ভগবৎসেবায় পর্য্যবসিত হওয়া উচিত। প্রত্যেক মানব, প্রত্যেক প্রাণী এমনকি প্রত্যেক জড়পদার্থ যাঁর কাছ থেকে শক্তি লাভ ক'রেছে, তাঁর কথা আলোচনা ক'রলে মঙ্গল লাভ হবে।

সকলের একমাত্র ঐকান্তিকী ও অহৈতুকী ভগবৎসেবা উদ্দিষ্ট হ'লে—সকলেই ভগবৎসেবায় একতাৎপর্যপর হ'লে সেখানে কোন মতভেদ থাকতে পারে না। আমাদের ব্যক্তিগত প্রাধান্য স্থাপন ক'রে আমরা কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের মতবাদকে নির্য্যাতিত ও নিষ্পেষিত ক'রব এরূপ অকিঞ্চিৎকর অনর্থক চেষ্টায় সময় নষ্ট ক'রবার সময় আমাদের নাই। আমরা সকলেই মৃত্যুপথের পথিক, তাই সকলেরই একতাৎপর্য্যপর হ'য়ে শোকমোহভয়াপহা ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী ভগবদ্‌ভক্তির আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

আমরা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের গানে শুনিতে পাই—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

ভগবান্ বলিতেছেন—'আমাতে আত্মনির্ভর কর, ইহাতে তোমাকে অনুতপ্ত হইতে হইবে না। তুমি এ যাবৎ পর্য্যন্ত (বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা বহির্বিষয়) যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছ, সব পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট এস। আমি তোমাকে কোন্ পথ লইতে হইবে বলিয়া দিব।" কিন্তু ভগবানের এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া তিনি

তাঁহার সাঙ্কেতিক উপদেশে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন মনে করিয়া পাছে আমরা অন্য কোন উপদেশ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করি, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ ইতঃপূর্ব্বেই গাহিয়াছেন —

"যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।।"

"যদি তুমি নিজেই নিজের মঙ্গলোপায়ের ব্যবস্থাপক হইয়া পড়, তাহা হইলে তুমি এমন কতকগুলি পন্থাকে উপায় মনে করিয়া বসিবে, যাহা পরিণামে নিরর্থক হইবে, কেননা আমি সমগ্র বিশ্বের অন্তর্য্যামী—সর্ব্বব্যাপক, আমাকে ছাড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমি সর্ব্বসত্তার মূল কারণ, পরিপূর্ণ জ্ঞানময়, অখণ্ড ও অনন্ত আনন্দময়।" আমরা তাহা অপেক্ষা অন্য কুত্রাপি আর কাহারও নিকট ইহা অপেক্ষা সম্যক্ প্রকারে নির্ভরযোগ্য বস্তুর সমগ্র-ধারণা-দান সমর্থ উৎকৃষ্ট উপদেশ আশা করিতে পারি না। সমগ্র বস্তু পরিপূর্ণ সত্তা আমরা কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও পাইব না, কৃষ্ণই সমস্ত শক্তির মূলাধার, অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সর্ব্বশক্তির মূল কারণ তিনি।

তিনি "অখিলরসামৃতমূর্ত্তি।" আমরা তাঁহার গানে শুনিতে পাই---

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।।"

আনন্দানুভূতি আমাদের সকলেরই প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহাতে যদি বাস্তব বস্তুর সৌখ্যোৎপাদন ব্যতীত অন্য কোন অভিপ্রায় আসিয়া পড়ে তাহা হইলে আমরা অনর্থাক্রান্ত হইব। "ভূমিরাপোহনলো বায়ু" ইত্যাদি শ্লোকে দেখিতে পাই যে, পরা ও অপরা---দুইটি প্রকৃতি। জীব ভগবানের পরা প্রকৃতি। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্রত্ব ও অণুত্ব-প্রযুক্ত তাহা অপরা প্রকৃতির--শ্রীভগবানের বহিরঙ্গামায়া শক্তি বা বঞ্চনাশক্তির অধীন হইয়া পড়ে। কিন্তু ভগবানের ---

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।"

এই গানে আমরা একটি বড় আশ্বাসের বাণী—মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণলাভের উপায় সম্বন্ধে একটি বড় সুন্দর মীমাংসা পাইয়াছি। 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে' বাক্যে 'মাম্' এই object (কর্ম্ম)-টি এক বচন, সুতরাং বস্তুর সবিশেষত্ব নির্দ্ধারিত। ভগবান্ গাহিতেছেন—তোমার বর্ত্তমানে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান দ্বারা বাস্তববস্তুকে পরিমাপ করিবার যে ভ্রান্তি বিচার উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা হইতে তোমাকে মুক্তি প্রদান করিতে পারি। যখন তোমার নিজেন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা আমাকে বুঝিয়া লইবার বিচার থামিয়া গিয়া আমাতে সম্পূর্ণভাবে প্রপন্ন হইবে, তখনই আমি তোমাকে আমার স্বরূপপ্রদর্শন করিতে পারি। অল্পবুদ্ধি লোকসকলকে শৃঙ্খলিত করিবার জন্য আমি আমার গুণত্রয়ের ইঞ্জিনকে নিযুক্ত

করিয়াছি; কিন্তু যখন তাহারা আমার উপদেশ শ্রবণ করে, তাহারা দেখিবে যে, আমাতে (অন্য কাহাতেও নহে) শরণাপত্তি-প্রভাবে তাহারা অনায়াসেই আমার অপাশ্রিতা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। "মাপিয়া লওয়ার বুদ্ধি"-রূপ মায়া হইতে মুক্তিলাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। আমরা বর্ত্তমানে যে সকল ইন্দ্রিয় এবং তদুথ যে সকল জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা কখনই আমাদিগকে বাস্তব সত্যের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। আমরা মায়ার কবলে কবলিত হইতে বাধ্য হইব; মায়া একটি ফাঁদ (বন্ধন) ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি আমরা সেই বন্ধন হইতে নিস্তার চাই, তাহা হইলে আমাদিগের সম্পূর্ণভাবে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং প্রপত্তিই সর্ব্বপ্রধান কথা; সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদনের নামই প্রপত্তি।

আমরা বহিরিন্দ্রিয় ও তচ্চেষ্টালব্ধ জ্ঞানকে বহুমানন করিয়া পরিণামে কিছু মাত্র উপকার পাইব না। যতক্ষণ না এযাবৎ পর্যন্ত বঞ্চিত যাবতীয় জ্ঞানকে নির্হেতুকরূপে ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পণ করি ততক্ষণ পর্যন্ত মায়ার হস্ত হইতে আমাদের নিস্তার নাই। তাহাতে আত্মসমর্পণই আমাদের একমাত্র কৃত্য, যখন আমরা সম্পূর্ণ তাঁহার উপর নির্ভর করিব, তিনি আমাদের ভজনোন্নতিলাভের সর্ব্ববিধ সুযোগ প্রদান করিবেন। আধ্যক্ষিকগণের অনুসৃত প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অশ্রৌত পথ অনুসরণ করিলে কখনই নিত্যমঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। যদিও বদ্ধজীবমাত্রেরই নিজ নিজ ইন্দ্রিয়দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞান সংগ্রহের অভিরুচি অত্যন্ত প্রবল, তথাপি ঐ জ্ঞান পদে পদে প্রতিহত দেখিতে পাওয়া যায়। কেননা আমরা ইহা সততই লক্ষ্য করিতে পারি যে, কালচক্রের আবর্ত্তনে আমাদের অক্ষজ-জ্ঞানের উত্থান ও পতন হইয়া থাকে। কোটি কোটি কল্পকাল-সঞ্চিত অক্ষজ-জ্ঞান দ্বারা অধোক্ষজ বাস্তববস্তু-বিজ্ঞান লভ্য হইবার নহে। সুতরাং আমাদিগকে সেই বস্তুর নিকট 'প্রপন্ন' হইতে হইবে।

নিজ নিজ অক্ষজ-জ্ঞানের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়া প্রপত্তি প্রদর্শনের যে অভিনয়, তাহাতে সরলতার সম্পূর্ণ অভাব বিদ্যমান। আদি কবি ব্রহ্মা "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।"—এই বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্—"শ্রুতেক্ষিত পথঃ" অর্থাৎ "শ্রুতেন শ্রবণেন ঈক্ষিত পন্থা যস্য সঃ"। শ্রীব্রহ্মা শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে (৯ম অঃ ১১শ শ্লো) গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—

ত্বং ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃৎসরোজে
আস্সে শ্রুতেক্ষিত পথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়।।

[অর্থাৎ হে নাথ! (গুরু মুখে) ভবদীয় কথা শ্রবণানন্তর লোকে আপনার সেবা প্রাপ্তির পথের সন্ধান পান। আপনি আপনার নিজজনের ভক্তিযোগপূত হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন। হে উত্তমঃ শ্লোক, ভক্তবৃন্দ স্ব স্ব (সিদ্ধদেহ ভাগবত) ভাবনানুযায়ী যে সকল নিত্যস্বরূপ বিভাবনা করেন, আপনি তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন।] ভক্তিযোগদ্বারা সম্যক্ প্রণিহিত অমলচিত্তেই সেই অধোক্ষজ পাদপদ্মের উদয় হইয়া থাকে। তিনি "অসদলভ্য" (ভাঃ ৩।৯।১২)। "অসৎ" বলিতে স্বামিপাদ অভক্তকেই লক্ষ্য করিয়াছেন,---"অসদলভ্যয়া"---অসতামভক্তানাম্ অলভ্যয়া।" আরোহ বা অশ্রৌতপন্থা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া অবরোহ বা শ্রৌতপন্থা গ্রহণীয়। আমাদের এতাবৎকালের সঞ্চিত যাবতীয় বিষয় তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হেতুরহিতভাবে সমর্পণ করিতে হইবে, চাহিয়া থাকিতে হইবে তাঁহারই অহৈতুকী কৃপার দিকে তাঁহার প্রসাদলেশ-দ্বারা অনুগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার কথা কিছুই জানিতে পারা যাইবে না। তাঁহার নিত্য মঙ্গল—দাতৃত্বে পরিপূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলেও আবার আমরা আমাদের সংগৃহীত বিষয়কে নিঃসংশয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। আমরা যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এই ভ্রমে পতিত হই যে, "আমার যাহা আছে, তাহাও ছাড়িতে গিয়া শেষে কি বিপদে পতিত হইব? যদি তাঁহার আমাকে কিছুই দিবার না থাকে তবে কি আমার এ কুল ও কুল দুকুলই যাইবে? এ প্রকার সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এইপ্রকার সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এই বেদ বাক্যের "তৃণাদপি সুনীচেন" তাৎপর্য্য বুঝিবার পরিবর্ত্তেইত বার্থাধবারণে সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হয়।

আমরা ভুলিয়া যাই যে, তিনি অখণ্ড পরিপূর্ণ অধোক্ষজ সর্ব্বশক্তিমান্ পরাৎপর পরমেশ্বর সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম বাস্তববস্তু। তাঁহাতে 'অভাব' বলিয়া কোন বিচার নাই। তাহার পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলে তিনি যে আমাদিগকে অপূর্ণ মনোরথ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেন আমাদের অভাব পরিপূরণের—সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়দানের ক্ষমতা তাঁহার নাই এ প্রকার সন্দেহ নিতান্ত অমূলক। তিনি আমাদিগকে তাঁহার অমন্দোদয়া দয়া-বিতরণে একপ্রকার সমৃদ্ধ করিতে পারেন, যাহাতে আমাদের একপ্রকার অভাব বোধের কারণ পর্য্যন্ত নিত্যকালের জন্য অস্তমিত হইতে পারে এবং তাঁহার সেবা করিয়াও 'কিছু করিতে পারিলাম না—তাঁহাতে আমার বিন্দুমাত্রও প্রেমোদয় হইল না'—এইপ্রকার একটি অমূল্য অপ্রাকৃত অভাব বা অতৃপ্তিনামক সম্পদ লাভ হইবে। তখন তাঁহার নাম-রূপ-গুণাদির অনুশীলন 'এক ঘেয়ে, ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যরূপ অন্ধকারময়—তাঁহার কাছে আসিয়া ঠকিয়াই গেলাম'—ইত্যাকার অনুশোচনার কারণ থাকিবে না। তখন "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্" বিচার আসিয়া যাইবে—সর্ব্বাত্মস্বপন সাধিত হইবে—শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তী সর্ব্বোপরি

বিরাজ করিতে থাকিবেন। 'কৃতজ্ঞ'—'সমর্থ'—'মহাবদান্য' প্রভু আমাদের কখনও নিরাশার সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন না।

আমাদের 'স্বতন্ত্রতা' বলিয়া একটি মহামূল্য রত্ন আছে বটে; কিন্তু তাহা ভগবৎ পরতন্ত্র। যে মুহূর্ত্তে আমরা এই বিচারের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে যাইব, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আমরা এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের বস্তু হইতে বস্ত্বন্তরের নিকট ক্রমাগত যুগ যুগান্তর ধরিয়া আমাদের সকল অভাবপূরণের--সকল সমস্যা সমাধানের বিচার প্রার্থনা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। আধ্যক্ষিকতা আমাদিগকে পদে পদেই বঞ্চনা করিতে থাকিবে। এইজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আমাদিগকে তারস্বরে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবদ্‌বস্তুর পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবের শরণাপন্ন হইবার বিচার বলিয়া দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণই সেই ভগবদ্‌বস্তু--স্বয়ং ভগবান্ তাহাতে প্রপত্তিই জীব মাত্রের একমাত্র লক্ষ্মীভূত বিষয়। তাঁহাতে সমর্পিতাত্ম হইলেই আমাদের জীবনের সকল উদ্দেশ্য--সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারের সম্পূর্ণতা সাধিত হইবে।

④

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসিতৈস্ত্রিলোক্যাম্।
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

যিনি যেখানে আছেন, সেখান থেকেই কান দিয়ে শুনতে পারেন। নমস্কার করবার তিনটে (medium) অবলম্বন--কায়, মন, বাক্য। আনুগত্যধর্ম্ম শুন্‌বার কান নিয়ে নিরহঙ্কার হ'য়ে শুনতে হ'বে। জগতে বিভিন্ন কথা আছে, সে সব কথা হ'তে ভিন্ন ভগবৎসম্বন্ধীয় কথা শুন্‌তে হ'বে। নিত্যকাল স্থায়ী কথা শ্রবণ কর্‌তে হ'বে--যাহা একমাত্র সাধুই বলেন। সাধু নিত্যকথা অবলম্বন ক'রে বাস করেন--যে কথা অপরিবর্ত্তনশীল। যে কথার দ্বারা পার্থিব জ্ঞান লাভ ক'রেছি, পরে উহার (inadequacy fill up) অসম্পূর্ণতা সমাধান করি। উত্তরোত্তর বেশী অভিজ্ঞান লাভ করবো, বরাবরই মনে করি। কিন্তু সকল সময়েই মনে করি যে, পরেও যা' শুনবো, তাও (inadequate) অসম্পূর্ণ হ'বে—পরে আবার তা, (unsettle) ওলটপালট্ কর্‌বো—তদ্দ্বারা আশা পূর্ণ হ'বে না—অভিজ্ঞানের পরিবর্ত্তন হ'য়েও কিন্তু কখনই পূর্ণতা সাধিত হ'বে না।

যে সমুদয় কথাতে মানবজাতি উন্নত হ'বেন আশা করছেন, সেগুলো পূর্ণতার দিকে যাচ্ছে, Empiricism ইন্দ্রিয়জজ্ঞান জ্ঞান অবলম্বনে সত্যের দিকে (Truth-

এর দিকে march) দ্রুত অগ্রসর হওয়ার বুদ্ধি অবলম্বন ক'রে (shaky position) অব্যবহিত অবস্থা থেকে অব্যাহতি পা'ব না। (Sensuous effort) ইন্দ্রিয়ানুশীলন-চেষ্টা-দ্বারা যে জ্ঞানের উদয় হয়, তা' ফুটো হাঁড়িতে জল রাখার মতন, (Absolute) অদ্বয় বস্তুর কথা--যা সাধুগণ বলেন, তা সেরূপ নয়। ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞানের কথা গ্রহণের চেষ্টা-দ্বারা সুবিধা হয় না। এইরূপ যে জ্ঞান--প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি শব্দ সাহায্যে যে জ্ঞানের উদয় হয়, সেইরূপ জ্ঞান সম্বন্ধে যে যে-রকম মূর্খই থাকি না কেন, যদি (attention) মনোযোগের সহিত Absolute Truth একমাত্র সত্যের কথা শুনবার সুযোগ হয়; তা হ'লে (ascending effort) আরোহ-চেষ্টা পরিত্যাগ করতে পারি---রাবণের সিঁড়ি বাঁধার চেষ্টা ছাড়তে পারি।

হে ভগবান্! তোমাকে জয় করা যায় না। সমগ্র জ্ঞান আমাদের লাভ হয় না। (Ascending effort) আরোহ-চেষ্টা-দ্বারা (partial) আংশিক জ্ঞান লাভ করি। তোমাকে জয় ক'রে--(Absolute Truth) অদ্বয় জ্ঞান তাঁর করায়ত্ত হয়--যে ব্যক্তি সাধুদিগের মুখে (attention) মনোযোগের সহিত তোমার সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ করেন। (By this methods we can cross over all speculative imperfections) এই পদ্ধতি-দ্বারা আমরা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞানের সমুদয় অসম্পূর্ণতা অতিক্রম ক'রতে পারি। ব্রহ্মা এই কথা বলেছিলেন।

এই পৃথিবীতে জ্ঞান সংগ্রহ করার স্পৃহা থাকা-কাল পর্য্যন্ত সেই পূর্ণ বস্তু--"যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমেব বিজ্ঞাতং ভবতি"---তাঁকে পাওয়া যায় না। (Empiricism) ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞান দোষজনক কিসের জন্য? এই সব জ্ঞানের অন্যপক্ষ থাক্‌বেই। (Absolute Truth) একমাত্র সত্য (Challenge) করবার আবশ্যক হয় না। (It is not shaky) উহাকে নড়াইতে পারা যায় না। (If it is found to be shaky it is not Absolute) যা'কে স্থানচ্যুত করা যায়, তা একমাত্র সত্য নয়, অন্যটা তর্কপথ। (In which we reserve the right of exposing the falsity of the things by the method of contradiction) যে-পন্থায় আমরা বিরুদ্ধ যুক্তি-দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের অসত্যতা উদ্‌ঘাটন করবার অধিকার পোষণ করি (the sound must be criticised), তা'তে সেই শক্তিগুলির দোষ নির্দ্ধারিত হউক, এইরূপ অবসরের (opportunity) সুবিধা আমরা দেই। (Absolute Truth) একমাত্র সত্য---এরূপ (empheric truth) ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাজাত সত্য নয়। (Emphiric uphill work) ইন্দ্রিয়জ চেষ্টারূপ পর্ব্বত আরোহণ-কার্য্য-দ্বারা কোথায় পৌঁছবো, তা' কেহ জানে না। উহা (mathematical) গণিত-বিচারের (to infinity) অসীম বিচারের মতন ধরে নেওয়া জিনিষ। সিঁড়ি তৈরী করতে হ'লে একটা arch খিলান করতে হয় না হ'লে পড়ে যায়।

(Emperic arch) ইন্দ্রিয়জ খিলানের এদিককার (foundation) ভিত্তি আমরা (phromenal world) বহির্জ্জগৎ থেকে (Start) আরম্ভ ক'রে—যা'র সম্বন্ধে কিছু জানি না, সেদিকে এই (Experience) অভিজ্ঞান দিয়ে অগ্রসর (progress) হ'বার চেষ্টাক'রে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করি। এরূপ জ্ঞান-সংগ্রহ-দ্বারা অদ্বয়জ্ঞানের পথে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করলে সুবিধা হ'বে না।

বৈদিক পন্থায় শ্রবণ করতে হ'বে। তজ্জন্য (Submissive temper) আনুগত্য স্বভাবের আবশ্যক, সে জানাটা সেদিক থেকে আসবে,—

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।'

সেটার নিকটবর্ত্তী হ'তে পারছি না; সেটার (approach) নিকটবর্ত্তী হ'তে হ'বে তা'র (Submissive) অনুগত হ'য়ে। যদি অহঙ্কারী হই, তা হ'লে নিত্যমঙ্গলের কথা শুনতে অবকাশ দেবে না। যিনি জানেন, তাঁর কাছ থেকে জানতে হ'বে। যদি আমি জানি, এরূপ অভিমান হয়, তা' হ'লে জানতে পারবো না। যেখানে সন্দেহ হ'বে ব'লতে হ'বে এবং জবাবটা ধৈর্য্যের (Patiently) সহিত শুনতে হবে। Inattentive (অমনোযোগী) হ'লে শুনা হ'বে না। (Interrogatives) পরিপ্রশ্ন হোক্। কিন্তু প্রশ্নটা করে জবাবটা শুনবো না—এরূপ impatient অধৈর্য্য হ'য়ে পড়তে হ'বে না—শুনবো। প্রশ্নের উদয়ে প্রত্যুত্তর পা'বার চিত্তবৃত্তি থাকার দরকার। অন্য বিষয়ের চিন্তা কর্‌লে--পুরাণো কথা মনে হ'লে প্রশ্নের উত্তরের সময় (inattentive) অমনোযোগী থাক্‌বো। জবাবটাকে utilize (কার্য্যে) পরিণত ক'রবো। নইলে প্রশ্ন করি কেন? ঘড়িতে দম্ দিয়ে আবার সমস্তটা খুলে দেবো না। ঘড়ির সময় দেখাটার পরে একটা কাজ থাকা উচিত। যদি কেবলই ঘড়ি দেখ্‌তে থাকি তা'হলে কাজ হবে না। পরে একটা কৃত্য আছে, তার নাম--অভিধেয়।

জ্ঞানটা পাবার পরে সেই কার্য (অভিধেয়) করি। জ্ঞানটা পাবার পরে Devotion সেবা। সেবার কথাটা জানতে হ'বে (attention) মনোযোগ দিয়ে। নিজের (Satisfaction) সন্তুষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রশ্ন করবো—attentively মনোযোগের সহিত জবাব শু'নে সেবায় লাগিয়ে দেবো। তর্কের পথ ও শুনার পথ বিভিন্ন। শুনার পথে শব্দ ব'লে একটা জিনিষ আছে—যা' দূরস্থিত বস্তুর (Signify) অভিজ্ঞান প্রদান করে। আমরা চতুর্থ (dimension) মানের—তুরীয়ের সংবাদ জানি না। সেটা এসে উপস্থিত হচ্ছে। (cubical Content present sense equipment-এ Comprehensible) তৃতীয় মানের শব্দ বর্তমান ইন্দ্রিয়গম্য। বেশী মানের (dimension) কথা—পঞ্চম মানের কথা মধুর মুরলী পঞ্চমজুষে—যমুনার ধারের পঞ্চম মানের কথা, তৃতীয় মানে থাকা কালে—(observation) দর্শন (observed) দৃশ্য (observed), দ্রষ্টা থাকা কালে শুনতে পাওয়া যায় না। তুরীয় রাজ্যে চারটে

(quadrant) বৃত্ত চতুর্থাংশ (Fully) সম্পূর্ণরূপে দেখতে পাওয়া যায়। একটা quadrant বৃত্ত চতুর্থাংশ দেখে এখন (information) সংবাদ পাচ্ছি। চার্‌টে দেখলে সমস্ত (information) সংবাদ পাওয়া যায়। একপাদ বিভূতি এই জগৎ তিনটে বিষয়ে দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শনে আবদ্ধ রয়েছে। গোলোকবস্তুর—সমস্ত বস্তুটার পূর্ণতা দর্শন হচ্ছে না।

অর্দ্ধাংশ আমাদের Visible দর্শনীয় হয়। ($180^0$ degrees) ১৮০° ডিগ্রী দেখি আমাদের চোখের দ্বারা। আর দুটো quadrant অপরার্দ্ধ দেখতে পাই না। বৈকুণ্ঠবর্ণনে এরূপভাবে অর্দ্ধাংশ (half) দেখতে পাচ্ছি। কেবল নীচে থেকেই দেখব বিচারটা ছেড়ে দিয়ে যদি (more confidence) অধিকতর বিশ্রম্ভের সহিত অগ্রসর হই, তাহ'লে দেখতে পাব যে, সে বস্তুটা কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এখানে যে রকম (relation) সম্বন্ধ পাই, তাতে mental position নির্ব্বিশেষ অবস্থা চরম লক্ষ্য হয়। পঞ্চম মানের পূর্ণতা লাভ করতে হ'লে কৃষ্ণতত্ত্ব (quinfessence) পঞ্চতত্ত্ব বিচার প্রবল হয়। "মনো মে কালিন্দীপুলিনে বিপিনায় স্পৃহয়তি।" Consorthood কৃষ্ণ যোষিৎসম্বন্ধ (ordinary literature) সাধারণ সাহিত্যে নাই—চতুর্থ (dimension) মানে নাই—সাধারণ দর্শনে নাই। সম্ভ্রম-পূর্ব্বক আড়াই প্রকার রস (reverentially avoid) বাদ দেওয়া হয়। Consorthood কৃষ্ণ-যোষিৎ-সম্বন্ধ তো চতুর্থমানেও বুঝতে পারা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব এ কথাটা ব'লে দিয়েছেন। চতুর্থ আর পঞ্চম (dimesion) মানের কথা এদেশে এসেছে। অল্প সময়ের মত এদেশে এলে ধ'রে নিতে পারা যায়। যা'রা (fortunate) ভাগ্যবান্, তাঁরা ধ'রে নিতে পারেন।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা এই পৃথিবীতে অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগতে বাস করি; এখানে আমরা আমাদের দৃশ্যবস্তুরূপে বহুপ্রকার ভেদ দেখিতে পাই। যে সব বাহ্য রূপ আমরা দেখি, সেই সব বস্তু হ'তে আমাদের নিজের নিজত্ব যে স্বতন্ত্রভাবে অধিষ্ঠিত, তাহাও বুঝিতে পারি। আমরা সময়-সময় বহির্দৃশ্য বস্তু ব্যতীত অন্তর্জগতের সূক্ষ্মবস্তুসমূহের আলোচনাকল্পে আমাদের অন্তর্বৃত্তিসমূহ পরিচালনা করি। চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা বাহ্যজগতের জ্ঞান সঞ্চয় করি। বাহ্যজগতের সঞ্চিত জ্ঞান গ্রহণ করিয়া যে জ্ঞান-পরিচালনের ফল লাভ করি, তা'র দ্বারাই পরিচালিত হই। কিন্তু যে ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্তর্জ্জগতের কথা আলোচনা করি, সেটা নানাপ্রকারে প্রতিমুহূর্ত্তে বিকল হ'তে পারে। বাহ্যজগতের সঞ্চিতজ্ঞানের আলোচনা-ফলে আমাদের চিত্তে বস্তুর দুইটীভাব এ'সে উপস্থিত হয়। সেই বস্তুভাবের মধ্যে যেটী ভাল লাগে, সেটী গ্রহণ করি; যেটী ভাল লাগে না সেটী ছে'ড়ে দেই। আমাদের যা' কিছু ভাল লাগে, সেরূপ আপাতমধুর

জিনিষগুলি পরিবর্ত্তনশীল। ‘‘আমাদের ভাবিমঙ্গল সত্য সত্য কিসে হ’তে পারে’’— এ-বিচার আস্‌লেই ‘ভাল লাগে না যেটা’—সেটা ছে’ড়ে দিতে পারি। কিন্তু প্রেয়োবস্তু-গ্রহণ-পিপাসাটাই আমাদের প্রবল। যাহাতে আমাদের বাস্তবিক মঙ্গল হয়, সেরূপ বস্তুর গ্রহণে কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাদের নাই। মানুষ অনেক-সময়েই প্রেয়োবস্তু গ্রহণরূপ অসুবিধার মধ্যেই প’ড়ে যান।

বেদশাস্ত্র দু’টি কথা ব’লেছেন—‘প্রেয়ঃপথ’ ও শ্রেয়ঃপথ’; যেমন হরিতকী প্রথমমুখে খেতে কষায় বোধ হয়, পরে উপকার দেয়; তেমনি মিষ্ট বস্তু প্রথমে খেতে ভাল লাগে, কিন্তু পরিণামে আময় উৎপাদন করে। আমরা কেহই আমাদের অপ্রিয় ব্যাপারে নিযুক্ত হ’তে চাই না। কিন্তু শ্রেয়ো-লাভের জন্য প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করাই উচিত—ইহাই শাস্ত্র বলেন।

প্রেয়ঃপথ বাদ দিয়ে শ্রেয়ঃপথ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা আমাদের সব সময় হয় না। যে পর্য্যন্ত তা’ না হয়, সে পর্য্যন্ত আত্মধর্ম্ম-গ্রহণের প্রবৃত্তিও হয় না। উপনিষদ্ বলেন (কঠ ২।২৩।; মুণ্ডক ৩।২।৩), —

‘‘নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।’’

শ্রেয়ঃপন্থিদের একটী কথা—শ্রৌত পন্থা। সত্যবস্তু যদি কীর্ত্তিত হয় আর সত্যবস্তু যদি কর্ণে প্রবেশ করে, তবেই আমরা শ্রৌত পন্থা গ্রহণ কর্‌তে পারি। শ্রবণ-বিষয়ে যদি অন্যমনস্ক থাকি, তা’ হ’লে আমাদিগের সত্যবস্তুর অভিজ্ঞান হয় না।

শ্রৌতপথ-গ্রহণের কালেও আমাদের দুইপ্রকারে প্রতারিত হ’বার সম্ভাবনা আছে। অনুগমন করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। অনেকে ‘অনুকরণ’ কার্য্যকে ‘অনুসরণ’ ব’লে ভ্রম করেন। দু’টী কথা—‘‘অনুকরণ’’ ও ‘‘অনুরসণ।’’ যাত্রাদলের ‘নারদ’ সাজা— ‘অনুকরণ’; আর শ্রীনারদের প্রদর্শিত ভক্তিপথে গমন—‘অনুসরণ’। কৃত্রিমভাবে নকল করার নাম—‘অনুকরণ’, আর সত্য-সত্য মহাজনের পথে গমন—‘অনুসরণ’।

আমরা মনে করি—আমি অনুসরণ কর্‌ছি, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আমি অনুকরণই ক’রে বস্‌ছি। ‘অনুসরণ’—নিজের আচরণ। কেবল ‘অনুকরণ’ কার্য্যের দ্বারা ‘অনুসরণ’ কার্য্যটা হ’বে না। ‘অনুকরণ’ (imitation)—বিকৃতপ্রতিফলন নামক একটা ব্যাপার। ‘অনুকরণ’ ও ‘অনুসরণ’ কার্য্যদ্বয় বাহিরের দিকে দেখ্‌তে একই প্রকার। মেকি সোনা (chemical gold) ও খাঁটিসোনা (pure gold) বাহিরের দিকে দেখ্‌তে অনেকটা একপ্রকার। ‘অনুকরণকে’ অপর ভাষায় ‘‘ঢং’’ বলে। আমাদের হৃদয়ে ‘বিপ্রলিপ্সা’ নামে যে একটা বৃত্তি আছে, তার দ্বারা আমরা অপরকে বঞ্চনা ক’রে নিজেদের প্রতিষ্ঠাদিসংগ্রহের জন্য ঐরূপ ‘ঢং’ বা ‘অনুকরণ’ ক’রে থাকি। শ্রৌতপথের ‘অনুকরণ’

মাত্র হ'লে 'অনুসরণ' হয় না। অনুকরণ-কার্য্য-দ্বারা যদি অনুসরণ না হয়, তা' হ'লে সে কার্য্যের কোন মূল্যই নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে অনুসরণই করতে হ'বে, 'অনুকরণ' হউক্ বা না-ই হউক।

সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু, 'মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়?' বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, হরিতোষণেই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার ও যোগ্যতা রহিয়াছে। যদি বল, মানুষ বিচারশক্তিসম্পন্ন বলিয়া শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এই বিচারশক্তি অনেক-সময়ে অনেকানেক পশু-পক্ষীতেও লক্ষিত হয়। কিন্তু পশুপক্ষিগণের বিচারশক্তি থাকিলেও উহাদের দূরদর্শন নাই। এই দূরদর্শন হরিতোষণে পর্য্যবসিত হইলেই সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। আহার, নিদ্রা, ভয়াদি ব্যাপার—পশুতে ও মানুষে সমান। পশুকে চাবুক দেখাইলে পশু ভীত হয়, গায়ে হাত বুলাইলে পশু সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু পশুরা পূর্ব্বের কথা জানে না, পরের কথাও জানে না। অক্ষরাত্মক বা শব্দাত্মক বস্তুর সাহায্যে পূর্ব্বে অভিজ্ঞতার কথায় পশুদের অধিকার নাই।

মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ 'ঋক্সংহিতা'য় আমরা পূজ্য, পূজক ও পূজা-বিষয়ক নিদর্শন পাই। ঐ সংহিতার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার স্তব গ্রথিত রহিয়াছে। স্তবকারিগণ তাৎকালিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আমরা ঐ আদিম সভ্যতার গ্রন্থ হইতে 'পূজন' কথাটী জানিতে পারি। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠের পূজন করা কর্ত্তব্য, আনুগত্য-ধর্ম্মই 'পূজন', শ্রেষ্ঠ বস্তুই পূজ্য। পূজক যে পূজ্যের অধীন এবং পূজন-ক্রিয়া যে আনুগত্য-সূচক, এইসকল কথা উক্ত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে।

পরবর্ত্তি-কালের বিচারে বহ্বীশ্বরবাদ (polytheism) বা পঞ্চোপাসনা (Henotheism) ক্রমশঃ সমৃদ্ধি লাভ করিয়া 'অহংগ্রহোপাসনা' (pantheism)-রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রথমে বহু বৃহৎ, শ্রেষ্ঠ বা পূজ্য-বস্তুর দর্শনে বহু-দেবতা-পূজার সূচনা। এই বহ্বীশ্বরবাদ হইতেই ক্রমশঃ নশ্বর-বৈচিত্র্যে অবস্থিতিকালে 'অব্যক্তা প্রকৃতিতে লয়' বা 'মায়াবাদ' অর্থাৎ বহু হইতে চরমে কোন-একটী চিদারোপিত জড়-নির্ব্বিশিষ্ট অবস্থায় আরোহণ-চেষ্টা জীবহৃদয়ে উৎপন্ন হয়।

আবার, বহু শ্রেষ্ঠ বস্তু বা দেবতাকে পূজ্য-জ্ঞান হইলেও ঐ বহু শ্রেষ্ঠ দেবতা যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজ্য জ্ঞান করিয়া পূজা বিধান করেন, এবং যিনি অসমোর্দ্ধ, ঋঙ্মন্ত্র তাঁহাকেই এই বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন (১।২২।২০)—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম্।" অর্থাৎ সূরিগণই সেই বিষ্ণুর নিত্যপদ নিত্যকাল দর্শন বা সেবা করিয়া থাকেন।

ঋক্সংহিতায় এরূপ কোন দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় না, যাহা—বিষ্ণুর পরম পদ হইতে শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন দেবতার পূজা, শ্রেষ্ঠ, ধনী, বলবান্, পণ্ডিত, কুলীনের সম্মান অর্থাৎ আমা-হইতে শ্রেষ্ঠ-বস্তুর প্রাপ্য সম্মান-প্রদান—কিছু দোষাবহ কার্য্য নহে; কিন্তু

স্বতন্ত্রোপাসনা অর্থাৎ ঐ দেবগণের ভগবদ্দাস্যের বা বৈষ্ণবতার অভাবকে পূজ্য-জ্ঞানে পূজা করাই দূষণীয়। উহা-দ্বারা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।' মন্ত্র-প্রতিপাদ্য অদ্বয়-বস্তুর সেবা হয় না, পরন্তু বেদান্তবিরোধী বহ্বীশ্বরবাদ স্বীকৃত হইয়া থাকে মাত্র।

তত্ত্ব-বস্তু—এক ও অদ্বিতীয়; উহাই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। সর্ব্বশ্রেষ্ঠতত্ত্ব-বস্তুটী কি, তাহা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর 'ব্রহ্মসংহিতা'-গ্রন্থ হইতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।।"

শ্রীব্যাসদেবও পদ্মপুরাণে সেই কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।"

যাঁহারা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর সহিত তদধীন তত্ত্বকে সমপর্য্যায়ে দর্শন করেন, তাঁহাদের বাস্তবজ্ঞানের অভাব হইয়াছে; কিন্তু বাস্তব-অদ্বয়-পূজ্যবস্তুর শক্তিমত্তার অভাব হয় নাই। —(গীতা ৯।২৩)

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।।"

মূল বিষ্ণুব্যতীত অন্যান্য দেবতা সেই অদ্বয়তত্ত্ববস্তুর অধীনতত্ত্ব হওয়ায় তাঁহাদিগের প্রতি যে সন্মান দেখান হয়, তাহা ফলতঃ অদ্বয়বস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু পূজকের উক্ত কার্য্যটী অবৈধ। সেইরূপ অবৈধ-কার্য্যের দ্বারা পূজক কখনও মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। সকল বস্তু যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, সেই তত্ত্বই অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবান্। 'গৃহপতির দ্বারদেশে অবস্থিত ভৃত্যই গৃহপতি'—এইরূপ মনে করিলে গৃহপতির সন্ধান সুষ্ঠুরূপে হয় না। ঐরূপ মনে-করা-রূপ ভ্রান্তিটী 'অবিধি'; কিন্তু বস্তন্তরের ধারণার পরিবর্ত্তে পূজ্যবোধে বাস্তব-বস্তুর পূজা-কার্য্যটী কিছু অবিধি নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে মানদ-ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। যদি আমাদের মানবধর্ম্মের অভাব থাকে, তাহা হইলে বাহ্যজগতের বস্তুর কামনা-হেতু হৃদয় মৎসর থাকায় শ্রীহরিকীর্ত্তন জিহ্বাগ্রে উদিত হন না। বৈষ্ণবগণ—নির্ম্মৎসর, তাঁহারা—মানদ; সুতরাং অন্যান্য দেবতা বা জাগতিক শ্রেষ্ঠ বস্তুসমূহের যথোপযুক্ত সন্মান দিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না; তাঁহারা কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া সকল দেবতা ও জীবকেই সন্মান দিয়া থাকেন। তবে তাঁহারা কৃষ্ণসম্বন্ধ বাদ দিয়া কাহাকেও সন্মান দিবার পক্ষপাতী নহেন। বাহ্য-জগতের কর্ম্মিগণ এরূপ তাৎকালিক সন্মান প্রদান করিলেও, উহা তাহাদের মৎসর হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস ও কপটতা-মাত্র।

ঋকের স্তব যদি আমরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করি, তবে দেখি যে, "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" কথাটী ঋকের মূলকথা। যদিও অন্যান্য দেবগণ বিষ্ণুর সহিত দেব-পর্য্যায়ে গণিত হইয়াছেন, তথাপি বিষ্ণুর তুরীয় পদই 'পরম পদ'; তাহাই সূরিগণের

নিত্যসেবা। আবার, ঐসকল দেবতা পরতত্ত্ব অদ্বয়-বিষ্ণুরই বিভিন্ন শক্তি বলিয়া তাঁহাদিগকে দেব-পর্য্যায়ে গণনা করা কিছু অযৌক্তিকও নহে। কিন্তু তাঁহারা কেহই স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহেন। আমরা অনেক-সময় মাতাপিতাকে "প্রত্যক্ষ দেবতা" বলিয়া থাকি; অধিকতর শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে 'দেবতা'-নামে অভিহিত করি, কিন্তু তাঁহারাই কি পরমেশ্বর? তাঁহাদের উপর আর কি কেহ ঈশ্বর নাই?—এইরূপ বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা পরমেশ্বর নহেন। তাঁহারা বিষ্ণুর অণ্বংশ-তত্ত্ব; ভগবানের কোন-কোন গুণ বা বিভূতি বিন্দুবিন্দু-পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু অসমোর্দ্ধ পরমতত্ত্ব-বস্তুর ন্যায় একচ্ছত্র-শ্রেষ্ঠতা ও স্বাতন্ত্র্য অন্য কাহারও নাই। এইজন্যই বিভিন্ন দেবতা-গণ প্রাকৃত-লোকসমূহের দ্বারা তাহাদের জ্ঞানের দৌড় (পরিমাণ) ও যোগ্যতানুসারে 'পরমতত্ত্ব' বলিয়া বিবেচিত হইলেও সূরিগণ অর্থাৎ পূর্ণ-প্রজ্ঞ-ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক বিষ্ণুর তুরীয়-পদই 'পরম পদ' বলিয়া সেবিত । তাই পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ প্রাচীনতম বেদমন্ত্ররূপ শব্দপ্রমাণ-দ্বারা বিষ্ণুকেই 'পরতত্ত্ব' নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অন্যান্য অবিকুণ্ঠ ও অব্যাপক বস্তুকে ইন্দ্রিয়সমূহ-দ্বারা দর্শন করিতে করিতে আমাদের এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি সঞ্চিত হইয়াছে যে, সেইরূপ ধারণা ও সেইরূপ বুদ্ধি আমরা বৈকুণ্ঠ বা ব্যাপক-বস্তু অর্থাৎ আমাদের অক্ষজ-ধারণার অগম্য অধোক্ষজ বিষ্ণুবস্তুর উপরও প্রয়োগ করিতে ধাবিত হই।

মানুষের শ্রেষ্ঠতা কোথায়? মানুষ শ্রৌতপথ অর্থাৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-মহাজনগণের প্রদর্শিত আচরণের বিষয় শ্রবণ করিতে পারে এবং তদনুসারে জীবন গঠন করিতে সমর্থ হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর জীব সুদুর্লভ অনিত্য অথচ পরমার্থপ্রদ মানব-জন্ম লাভ করেন। সুতরাং ভগবৎসেবাই যে মানব-জন্মের একমাত্র কৃত্য, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভগবজ্জ্ঞান-লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের চরম ফল। এই গমনশীল জগতে মানুষ হয় দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইবেন, নতুবা পশুত্বের দিকে অধোগতিই হইবেন। ভগবানের সেবার কথা বাদ দিয়া যে 'আমি',—যে 'আমি' নিত্য-ভগবানের নিত্য-দাস নহে, সেই নশ্বর 'আমি'র কখনও সুবিধা বা মঙ্গল-লাভ হয় না।

হরিকথার দুর্ভিক্ষ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন,—এমন বান্ধব কে আছেন? মানুষ-জাতি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এতদূর দুর্ব্বিবেকী যে, কুসিদ্ধান্তবাক্যগুলিকে 'সিদ্ধান্ত' বলিয়া প্রচার করিবার দাম্ভিকতা করেন এবং হিতাহিতবিবেচনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আপাতমধুর ইন্দ্রিয়-তর্পণপর কথাকেই বরণ করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারঘাত করেন। সৎসঙ্গ-প্রভাবে যদি আমরা পশু-স্বভাব-ব্যক্তিগণের সঙ্গ হইতে পৃথক্ থাকিবার সুবিধা পাই, তবেই আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা। মানুষ ঐরূপ অসৎসঙ্গে পতিত হইলে কখনও খুব প্রাকৃত বাহাদুর (!), কখনও বা প্রাকৃত পাগল

হইয়া যান, 'যিনি সর্ব্বদা হরিসেবা-তৎপর, তাঁহার সঙ্গ ছাড়া আর অন্য কিছু করিব না, হরিভজনেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, এবং কাল-বিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই হরিভজন করিতে থাকিব'—এইরূপ দৃঢ় উৎসাহ ও নিশ্চয়তা লইয়া আমাদিগের মনুষ্যজীবনের চরম-কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। আমরা যদি কাল-বিলম্ব করি, তবে অন্য বহির্ম্মুখ অসৎলোক আমাদের নিকট আসিয়া আমাদিগকে দুষ্ট পরামর্শ দিবার সুযোগ ও সময় পাইবে। কখনও তাহারা বলিবে,—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্' কখনও তাহারা বলিবে,—'স্বদেশের-সেবা করাই পরম-ধর্ম্ম', কখনও বা তাহারা বলিবে,—'যে গ্রামে বাস করিতেছি সেই গ্রামের, সেই গ্রাম্য-দেবতার বা সমাজের মহত্ত্ববিবর্দ্ধন করাই তোমার ধর্ম্ম।' এইরূপ নানা দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া তাহারা আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। তাহাদের মনোহর বাক্য শুনিয়া আমরাও তখন বলিব,—'যখন ঈশ্বর আমাদিগকে কুক্কুর-দন্ত (canine teeth) প্রদান করিয়াছেন, যখন এত পশু-পক্ষি-মৎস্যাদি জন্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেইগুলিকে আমাদের খাদ্য ও শরীর-পুষ্টির উপযোগী করিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন আমরা ঐগুলি ভক্ষণ করিয়া আমাদের দেহের পুষ্টি ও আমাদের দেহের সম্পর্কযুক্ত যাবতীয় লোকের দেহের পুষ্টি-বিধান করিব ও করাইব এবং ঐসকলকেই ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করিব।' তখন আমাদের বিচার হইবে,—'যেহেতু আমরা যুবক, সেহেতু আমরা যুবার ধর্ম্ম অবশ্য প্রতিপালন করিব; যেহেতু ঈশ্বর আমাদিগকে একাদশ ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, সেহেতু আমরা তত্তৎ ইন্দ্রিয়-দ্বারা ইন্দ্রিয়ভোগ্য যাবতীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ভোগ করিব, আর আমাদেরই ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালন-দ্বারা সুখ-সুবিধা-ভোগের জন্য—ঈশ্বরের হাত নাই, পা নাই, চক্ষু নাই, নাসিকা নাই, সুতরাং তাঁহাকে 'নিরাকার', 'নির্ব্বিশেষ', 'নির্ব্বিলাস', 'নিরঞ্জন' প্রভৃতি বলিব এবং যত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও সমগ্র বাহ্যজগতের বিষয়সমূহ, সমস্তই আমাদের ভোগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে! —ইত্যাদি অপরাধময়-বিচার জগতে প্রচার করিব।' তখন আমাদের নিত্য-মঙ্গলের পরিপন্থি-ব্যক্তিদিগকেই আমরা 'বন্ধু' বলিয়া বরণ করিব; কারণ, তাঁহারা আমাদিগের ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল কথাগুলি বলিয়া আমাদিগের আপাতমধুর সুখের পথ দেখাইয়া দেন। কিন্তু এই-সকল বন্ধু কতদিন পর্য্যন্ত যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করিবেন? তাঁহাদের কতদূর ক্ষমতা বা সামর্থ্য আছে? আমরা কি ঐসকল বন্ধুর স্বরূপ-বিচার করিবার বা তলাইয়া দেখিবার একটুও সময় পাই না?

যে-ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা আমরা বাহ্যজগৎ দেখিতেছি, সেই ইন্দ্রিয়সমষ্টিই কি 'আমি'? শ্রীভগবান্ থাকুন বা না থাকুন, তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, আমরা কিন্তু নিত্যধর্ম্মের আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান-কালে দেশ বা সমাজ শাসন (civic administration) লইয়া ব্যস্ত! আমরা অনেকে ধর্ম্মের নাম করিয়া অধর্ম্মকেই

'ধর্ম্ম' বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছি—অত্যন্ত নাস্তিক ব্যক্তিকেই 'ধার্ম্মিক' ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী মনে করিতেছি—অত্যন্ত বিষ্ণু-বিরোধী ও 'বৈষ্ণবাপরাধী' ব্যক্তিকেই 'পরম-বৈষ্ণব' বলিয়া কল্পনা করিতেছি, 'ভোগা—দেওয়া' কথাকেই 'ধর্ম্মোপদেশ' বলিয়া মনে করিয়াছি—পুণ্য ও পাপের অর্জ্জনের জন্যই নানাবিধ চেষ্টা করিতেছি—কখনও বা পুণ্য ও পাপ ত্যাগ করিবার চেষ্টার ছল দেখাইয়া নাস্তিক হইয়া পড়িতেছি।

বহির্দ্দর্শন ও বাস্তব-দর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বহির্জ্জগতের মোহে ও অভিজ্ঞতায় মত্ত জীব দিব্যজ্ঞান ও জড়জ্ঞানের পার্থক্য বুঝিতে পারে না। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন—গৃহব্রত-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ কোনদিন বিষ্ণুকে জানিতে পারে না।

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্।।

গৃহ—ভোগের আগার মাত্র; কিন্তু শুধু গৃহকে গৃহ বলে না।

নগৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণীগৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।।

শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মের সেবা ব্যতীত যে দর্শন তাহা আমাদের ভোগপর-দর্শন, তাহাই 'গৃহ'। এইরূপ গৃহে বাহ্যদৃষ্টিতে না থাকিয়াও ভোগচিন্তাযুক্ত হইলে মানবের গৃহব্রত-ধর্ম্মই লাভ হয়; তাহাকে 'গৃহমেধী' বলে। বিশ্বের রূপরসাদি ভোগ যেখানে আছে, সেখানেই গৃহব্রত-ধর্ম বর্ত্তমান। ভোগিকুল বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ হইয়া বিশ্বব্রতী বা গৃহব্রতী। গৃহব্রতধর্মে অবস্থিত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সাধুমুখে হরিকথা-শ্রবণের ছলনা করিলে মঙ্গললাভ হয় না। এক সময়ে হিরণ্যকশিপুও প্রহ্লাদ মহারাজের নিকট শ্রৌতবাণী-শ্রবণের আগ্রহ দেখাইয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি ছিল না। কেবলমাত্র প্রহ্লাদের স্বীয় ভোগ্য বালক-পুত্রজ্ঞানে ভোক্তৃবুদ্ধিতে ঐসকল শ্রৌতবাণী শুনিয়াছিল। তাহাতে তাহার মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই ঘটিল। বৈষ্ণবাপরাধ থাকাকালে মহাভাগবতের মুখে উপদেশ শুনিয়াও মঙ্গললাভ হয় না।

গীতা বলিয়াছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।

বিশেষতঃ গৃহমেধিগণের বুদ্ধি কৃষ্ণসেবার প্রতি কোন ক্রমেই প্রধাবিত হয় না।

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্।।

কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণপর না হইলে চর্ব্বিতচর্ব্বণ-কার্য্য বা বান্তাশীর ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে। পুনঃপুনঃ চর্ব্বিতচর্ব্বণ করা গৃহব্রতের লক্ষণ। চল্‌তি কথায় উহাদের

সম্বন্ধে বলা যায়—"নেড়া কয়বার বেলতলায় যাবি? উত্তর—বার বার!" তাহারা দুই-একবার সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত খাইলে চেতন হয় না। ভগবানের বা ভাগবতের সেবাকেই একমাত্র ও সর্ব্বোত্তম কৃত্য বলিয়া যাহারা জানে না, তাহারাই গৃহব্রত। তাহারা জড়-ইন্দ্রিয়দ্বারা বিশ্বের ভোগে ব্যস্ত থাকে। জীবসকল কৃষ্ণ-বিস্মৃত হইয়া ভোগী হয়। জড়ের প্রভু হওয়ার দরুণ উহাদের দিব্যজ্ঞান লাভ হয় না। গৃহব্রতবুদ্ধি থাকিলে ভোক্তার অভিমানে জীব আচ্ছন্ন হয়। কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, আর বাদবাকী সকলেই তাঁহার ভোগ্য।

তামাকখোর বাজার যাইতে যাইতে যখন কোনও ব্যক্তিকে হুক্কাটানিতে দেখে তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে বসিয়া যায়। শত প্রয়োজনীয় কার্য্য নষ্ট হউক তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই—হুক্কায় কয়েকটি টান দিয়া যাইতেই হইবে। যে ব্যক্তি তামাক খাইতেছে, সে জাতিতে যাহাই হউক, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, তাহার লালা হুক্কায় লাগিয়া আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই—হুক্কায় একটি টান দেওয়া চাই। যাঁহার নিজের জাতি-রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা তিনি কল্কিটা চাহেন। তামাকসেবনকারী হুক্কা মুছিতে যাইয়া হাতে যে লালা লাগান, সেই হাতেই কল্কিটা দিবেন, তাহাতে কোনও দোষ নাই। ইহা সংসারাসক্তিরই একটি চিত্র। সংসারের ব্যক্তিমাত্রই ভোগ-তামাকের নেশায় ঐপ্রকার আসক্ত। নিত্যকল্যাণের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে, আত্মবৃত্তিতে যে ক্রমশঃই সংসারাসক্তির আবর্জনা ঘন হইয়া পড়িতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই—এমনই ভ্রান্ত আমরা। 'গীতার সংসার' করিতে গিয়া যে কি অবস্থায় পড়িতেছি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। সকলেই কর্মঠ। কেন কর্ম করিতেছি, কর্ম্মের পরিণাম কি, আবার কর্ম ছাড়িয়া দিলেই বা লাভ কি, তদ্বিষয় চিন্তা করিবার অবসর আমাদের নাই।

আপনারা অনেকেই মহাভারতের এই উপাখ্যানটি জানেন,—মানস সরোবরে শাপগ্রস্ত ইন্দ্র একদা শূকর-যোনি প্রাপ্ত হইয়া বহুশাবকাদি পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিলেন। ব্রহ্মা আসিয়া শূকররূপী ইন্দ্রকে বলিলেন,—'ওহে, তুমি অমরাবতীতে যাইয়া ইন্দ্রের আসনে উপবেশন কর, তথায় বহু দাসদাসী তোমার সেবা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।' এই কথা শুনিয়া শূকররূপী ইন্দ্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিতে গেল। ব্রহ্মা একে একে ঐ শূকরের শাবকগুলিকে হত্যা করিতে থাকিলে ঐ শূকর চীৎকারে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া তুলিল,—ব্রহ্মাকে মহাশত্রুজ্ঞানে ক্রোধে ও শোকে অধীর হইয়া পড়িল। চতুর্মুখ শূকররূপী ইন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নীকেও বধ করিলেন। তখন ঐ শূকররূপী ইন্দ্র সমস্ত আত্মীয়-স্বজন-বিহীন হইয়া ব্রহ্মার উপদেশ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার নিজের স্বরূপ ধীরে ধীরে স্মরণপথে উদিত হইতে থাকিল। শূকররূপী ইন্দ্র বুঝিলেন—'আমি ত' ইন্দ্র, আমিত' শুকর নহি, শূকররূপটী আমার বিরূপ, আমি স্বরূপতঃ ইন্দ্ররূপি-ভগবদ্দাস।' সাধুমুখে জীব

স্বরূপতত্ত্বের কথা-শ্রবণ-ফলে নিজতত্ত্ব অবগত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়েও যদি মহাপ্রভু-প্রচারিত স্বরূপধর্ম্মের কথা ঘরপাগ্‌লা লোকদিগের নিকট বলা যায় যে, তোমরা সমস্ত ইতরচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন কর, তখন তাহারাও ঐ শূকররূপী ইন্দ্রের মত বলিয়া উঠে—'বিষয়-ভোগরূপ-বিষ্ঠা-ভোজন করাই আমাদের 'সনাতন (?) ধর্ম্ম'; তাহাতেই আমাদের সুখ, আমরা চাই না ঐ সকল হরিকথা শুনিতে; আমাদের অন্যান্য বহু কার্য্য আছে,--বিষ্ঠা-ভোজন-কার্য্য আছে, শাবক সংখ্যা বর্দ্ধন-কার্য্য আছে।' তাহারা সাধুকে শত্রু মনে করে। তাহারা জানে না যে—

"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ"

অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন—'যাহার প্রতি আমি অনুগ্রহ প্রকাশ করি, শীঘ্র শীঘ্র তাহর ধন অপহরণ করিয়া থাকি।'

জাগতিক গুরুগণ আমাদিগকে মায়িকবস্তুর সন্ধান দান করে, স্বর্গ ও মোক্ষের সন্ধান দিতে পারে, কিন্তু ভগবৎপ্রেষ্ঠ ব্যতীত ভগবানের সন্ধান কেহই দিতে পারেন না। পূর্ণতম গুরুপাদপদ্মের সন্ধান না পাইলে ছায়াস্বরূপ মায়িকগুরুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম—ভগবানের প্রেষ্ঠ সেবক, ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র। ভগবান্‌ও তাঁহার সেবা করেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসিদ্ধ কৃপায় ভগবান্ কি বস্তু, তাহা শ্রৌতপথে জানিতে পারি। অপ্রাকৃত-শব্দের শ্রবণের ফলেই অপ্রাকৃতবস্তুর অনুসন্ধানস্পৃহার উদয় হয়। মানবের শ্রবণ করিবার জন্যই শব্দের আবির্ভাব হয়। আবার কর্ণের আবশ্যকতা শব্দের শ্রবণের জন্য। শব্দ না থাকিলে আমরা বর্ণমালার ব্যবহার করিতে পারি না। বিষয়ের অভাবে ইন্দ্রিয়চালনা করিতে পারি না। অমনোযোগীকে মনোযোগী, বহির্ম্মুখকে উন্মুখ করিবার জন্যই—বিপথগামীকে সুপথে চালিত করিবার জন্যই গুরুবর্গ অপ্রাকৃত-শব্দের ব্যবহার ও অনুশীলন করেন। পাঠশালার বালকছাত্র যখন উপদেশ-শ্রবণে অমনোযোগী হয়, তখন পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে কান টানিয়া মনোযোগী করেন। অপ্রাকৃত-শব্দবিৎ শ্রীগুরুদেবও বহির্ম্মুখ ও কৃষ্ণভজনে অমনোযোগী শিষ্যকে কর্ণে আঘাত প্রদান করিয়া আকর্ষণ করেন অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের জড়বিপ্লবাত্মিকা বাণী শ্রবণ করিতে প্রথম প্রথম শিষ্যের বড়ই কষ্টবোধ হয়, কিন্তু শিষ্যকে বেদ শ্রবণ করাইবার পূর্ব্বে আচার্য্যকে মানবকের কর্ণবেধসংস্কার প্রদান করিতে হইবে। শিষ্যের প্রতি উহাই আচার্য্যের প্রথম কার্য্য। Attention is drawn by pulling in the ear. Here through mundane objects we import mundane words. কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে শ্রেষ্ঠনাম প্রদান করেন। সেই বৈকুণ্ঠনামই আমাদিগকে অপ্রাকৃতচিন্তার রাজ্যে লইয়া যায়।

হরি—নির্গুণ; আমরা গুণজাত জগতের মানুষ, আমাদের সকল ইন্দ্রিয় গুণজাত

বস্তুর সহিত সম্মিলিত হ'বার যোগ্যতাবিশিষ্ট। এই সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা আমাদের সঙ্গে গুণজাত বস্তুরই সাক্ষাৎ হয়। গুণজাত বস্তুর হাত অতিক্রম ক'রে নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য কোন রাস্তা নাই—একমাত্র 'কাণ' ছাড়া। ছ'টা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-কলাপ যে বস্তুর প্রতি নিযুক্ত হ'তে পারে, সেটা হচ্ছে গুণজাত বস্তু। গুণ ত্রিবিধ,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক—মর্ত্ত্যমঙ্গল প্রসব করে, রজোগুণের দ্বারা চালিত হ'য়ে আমরা ক্ষণিক মঙ্গল বা অমঙ্গলে ধাবিত হ'তে পারি, তমোগুণের দ্বারা অমঙ্গলের পথে প্রধাবিত হই। যতদিন আমরা জীবিত থাকি, ততদিন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সার্থকতা মাত্র, মরে গেলে উহাদের কোন সার্থকতা নেই। তখন এই গুণজাত জগৎ আমাদের কাছে স্তব্ধ হ'য়ে যায়। গুণজাত জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে যায় ব'লে নির্গুণ জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে যায় না।

আমরা গুণাতীত জগতের আদর করবার প্রয়োজন মনে করি না, কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি গুণজাত জগতের বস্তু গ্রহণের উপযোগী হ'য়ে পড়েছে। যে সকল কার্য্যে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ঘটে, আমরা সেই সকল কার্য্যেই চেষ্টাবিশিষ্ট হই। এই পৃথিবীতে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বস্তুতে আমরা প্রলুব্ধ হ'য়ে পড়ি। প্রয়োজনবোধে মক্ষিকার গুড় খাবার চেষ্টার ন্যায় আমরা তা'তে ডুবে যাই। যে সকল কথা আমাদের পূর্ব্বে পূর্ব্বে শোনা আছে, তা'তেই আমাদের রুচি হয়; যে সকল কথা আমাদের শোনা নেই, তা'তে আমাদের রুচি হয় না। জড়-জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে আমাদিগকে বিষয়ে নিযুক্ত করায়।

আমরা চাই—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। যে যত পরিমাণে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দিতে পারে, সে আমাদের নিকট তত প্রিয়। আমরা আশু-প্রয়োজনীয় বা আপাতরমণীয় বিষয়কে আদর ক'রে সংসারে চিরদিন ঐরূপভাবে জীবন-যাপন কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হই। আমাদিগের বুদ্ধি মনুষ্যত্বের দিকে যাওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে উহা নেমে যাচ্ছে। জড়-জগতে যা'তে জড়তা উৎপন্ন কর্‌তে পারে, তাই আমাদের আশুপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। পরিবর্ত্তিত রুচিতে জীবের চেষ্টা হচ্ছে—বিমুখতার দিকে যাওয়া।

নির্গুণবস্তু স্বেচ্ছায় গুণজাত জগতে আস্‌তে পারেন, তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তা'তে নির্গুণ বস্তুর নির্গুণত্বের কোন অপলাপ হয় না। আমার ন্যায় গুণজাত জড়পিণ্ড যে কথা বলে, সে সকল গুণজাত। কিন্তু শ্রৌত-পথাবলম্বনে আমাদের কর্ণে যে সকল কথা প্রবিষ্ট হয়,—এমন অলৌকিকী শক্তি সেই শব্দের ভেতরে আছে—যে-শব্দ শ্রুতিপথে গেলে মানবের চেতনতা প্রস্ফুটিত করিয়ে দেয়। যে-শব্দ বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদ ক'রে বৈকুণ্ঠে পৌঁছাতে পারে, যে শব্দ বৈকুণ্ঠ হ'তে ব্রহ্মলোক-বিরজা ভেদ ক'রে চতুর্দ্দশ ভুবনে অবতীর্ণ হয়, সেই শব্দই আমাদিগকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়; আর যে শব্দ জড়াকাশ হ'তে উৎপন্ন হ'য়ে কিছুক্ষণ জড়াকাশে থেকে জড়াকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়,

সেই শব্দ আমাদিগকে নরকের পথে লয়ে যায়। এ সকল শব্দ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য—আমাদিগকে মূর্খ কর্‌বার জন্য জগতে প্রচারিত হ'য়েছে—ভূতাকাশে ব্যাপ্ত রয়েছে। খাওয়া, দাওয়া, থাকা, মিথুন-ধর্ম্মে রত হওয়া, মরে যাওয়া যে শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়, তা'ই এই জগতের শব্দ। জড়বস্তুতে অধিক জড়তা লাভ হ'তে পারে এই শব্দের দ্বারা। প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যচন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হয়ে'ছিলেন জগতে পরব্যোমের শব্দ বিস্তার কর্‌তে।

মহাপ্রভু বাগানের মালী-হিসাবে আমার ভোগের ফুলের তোড়া আমাকে যোগা'বেন, এই বুদ্ধি—ভোগবুদ্ধি; ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর বস্তু। যাঁ'রা ইতর ব্যোমের শব্দের বাহাদুরী ল'য়ে 'ভবানীভর্ত্তা' হবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ কর্‌ছেন, তাঁ'দের 'বিরুদ্ধমতিকৃতদোষ' মহাপ্রভু দেখিয়েছেন। যে সকল ব্যক্তির সৌভাগ্য হয়, তাঁ'রাই এ সকল কথা বুঝতে পারেন; যা'রা ভাগ্যহীন, 'তা'রা কথা শ্রবণ করছে' মনে করলে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শুন্‌লে না—বঞ্চিত হোলো। আমরা আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যদি ভজনীয় বস্তুর সেবা কর্‌বার জন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই তা' হলেই আমাদের কাণে কথা যা'বে—আমরা কথা শুন্‌তে পার্‌ব—ধর্‌তে পার্‌ব। যা'র যে অবস্থা, সে অবস্থা হ'তে উন্নত হ'তে হবে—ভাল হ'তে হবে—যমে ছাড়বে না গায়ে বিষ্ঠা মাখলে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে দৈবীমায়া ভগবদ্বিমুখতার রাজ্যে উপস্থিত করাচ্ছে। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাক্‌বে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ কর্‌বে। যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রকৃত সাধুর কাছে হরিকথা না শুন্‌ব—নিষ্কপটে সাধুর সেবা না কর্‌ব, সেই সেই মুহূর্ত্তটুকুর সুযোগ পেয়েই মায়া আমাদিগকে গ্রাস কর্‌বে।

পশুর যে বৃত্তি, তা'র সঙ্গে যা'রা মানুষের বৃত্তিকে সমান মনে ক'রে চেতনতার বৃত্তিকে হারিয়ে ফেলেছে, তা'রা নির্গুণ হরিকথা শুন্‌তে পারে না। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য—কোথায় হরিকথা হচ্ছে—সত্যি সত্যি চেতন থেকে চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হচ্ছে, সেইদিকে মনোযোগ রাখা। জগতে অনুস্বার-বিসর্গ নিয়ে মাথা ও জিহ্বার কসরৎ করার লক্ষ লক্ষ দল আছে; পরব্যোম হ'তে আবির্ভূত চেতনময়-শব্দের তাৎপর্য্য তা'দের উপলব্ধি হ'বে না, তা'রা হরিকথা বল্‌তে পারে না, তা'দের কথা গ্রামোফোনের গানের মত। তারা বিষয়েই ডুবে যা'বে—সত্যের উপলব্ধি হ'বে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিচার করেন, আমাদের যেন বাস্তবিক মঙ্গল হয় এবং সে মঙ্গল হ'তে যেন কোনদিন বঞ্চিত হ'তে না হয়। জড়জগতে যত কিছু বস্তু আছে, সেই সকল বস্তু তা'দের বিপরীত ধর্ম্ম উদয় করাবে—পাণ্ডিত্য, 'মূর্খতা' আন্‌বে—সুখ 'দুঃখ' আন্‌বে—দুঃখ 'সুখ' আন্‌বে ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তির পূর্ব্বে সদুদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে তা'র আবার অসদুদ্দেশ্য হলো কেন? সে নির্গুণ হরিকথায় সময় দেয় নাই, কিম্বা শুন্‌বার ছল ক'রে অন্যমনস্ক হয়েছে; সে আপাত-প্রয়োজনীয় সুখের চেষ্টা হ'তে বিরত হ'তে আদৌ চেষ্টা করেনি,

অসৎলোকের পরামর্শ গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য ব্যস্ত হয়েছে। ভগবানের পাদপদ্ম যদি আশ্রয় করি, তা'তে লেখাপড়া শিখি বা না শিখি, বল থাকুক্ আর না-ই থাকুক্, কিছুতেই অসুবিধা নাই। জীব যে নির্গুণ বস্তু; জীব যখন নিজকে গুণবদ্ধবস্তু মনে করে, তখনই তার সগুণ জগতের প্রতি আসক্তি হয়।

ভগবানের দাস-সমূহ মানবগণের উপকারের জন্য ইহজগতে আগমন করেন। তাঁদের জগতের কোন কর্ত্তব্য নেই—এ জগতে আস্বার কোন আবশ্যকতা নেই—জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়দের একমাত্র কর্ত্তব্য। ক্ষুধিতকে অন্নদান প্রভৃতি পণ্ডশ্রম হ'য়ে যায়, যদি মূল বিষয় হ'তে আমরা তফাৎ হই।

ভোগরাজ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে জীবকে আকর্ষণ কর্ছে, মায়া টোপ দেখিয়ে আমাদিগকে সর্ব্বদা বিদ্ধ কর্ছে, স্ত্রী-হাতী দ্বারা বনের পুরুষ হাতী বশ ক'রে শৃঙ্খলিত কর্বার মত মায়া যোষিৎসঙ্গাদির লোভ দেখিয়ে জীবকে সংসারে আবদ্ধ কর্ছে। অসদ্‌বস্তুকে সত্য জ্ঞান ক'রে তা'তে উপকার হ'বে মনে ক'রে জীব দৌড়াচ্ছে। মায়া সুখটাকে রেখেছে মানুষকে বঞ্চনা কর্বার জন্য। জগতে যা কিছু আমার ভোগের চক্ষে সুন্দর—ভালো, সেগুলি সব বঁড়শী। যে ভোগী হ'বে, সে বঞ্চিত হ'বে—বিদ্ধ হ'বে। খাবে দাবে নরকে যাবে—এই বুদ্ধি, বিচারসম্পন্ন মানবজাতিকে গ্রাস ক'রেছে—এর চেয়ে আর লজ্জার কথা কি।

এই বুদ্ধির হাত হ'তে রক্ষা কর্বার জন্য Sugar coating দিয়ে Quinine খাওয়াবার ন্যায় গৌরসুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। ইতর ব্যোমের অসৎশব্দ মানুষকে সর্ব্বদা ইতর বিষয়ে টেনে নিচ্ছে—এই শব্দটাই যত গোলমাল কর্ছে। মানুষ এই শব্দে আকৃষ্ট হ'য়ে মৃগের ন্যায় মায়াবী ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হচ্ছে। তাই গৌরসুন্দর হরিকথার সঙ্গে তাল-মান-লয় সংযোগ ক'রে 'জিলেটিং' দিয়ে কুইনাইন খাওয়াবার ব্যবস্থা কর্ছেন। তৌর্য্যত্রিক—যাহা পাপের আকর—মহাপাপিষ্ঠদের কার্য্য; তাহা কামদেবের সেবায় নিযুক্ত না হ'লে বিষ উদগীরণ কর্বেই কর্বে।

যে সকল সাধু জীবগণকে বিপথগামী না করেন, সেই সকল সাধুর আদর নাই। হরিকথার নামে বর্ত্তমানকালে যাঁরা লোককে বিপথগামী কর্ছেন, তাঁদের নিকট হতে বঞ্চিত হওয়াই বর্ত্তমানকালের একটা যুগধর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা প্রকৃত সাধু—যাঁরা অসাধুকে ধোরে দিতে চাচ্ছেন,—অসাধুগণ, কপটগণ, চোরগণ তা'দিগকে আবার উল্টো' "ঐ চোর"—"ঐ অসাধু"—"ঐ ভণ্ড" বলে লোককে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের পালাবার একটু ফাঁক খুঁজে নিচ্ছে। মায়া কিছুতেই মানুষকে নিষ্কপট হতে দেবে না—কতরকম করে খাঁটি সাধুর কাছ থেকে দূরে রেখে দেবার কল-কৌশল সৃষ্টি কর্ছে।

※ ※ রাসলীলার গান-হচ্ছে—কত শ্রোতা! আর কীর্ত্তনীয়ারই বা কত তালমান ভাঁজার কসরৎ; কিন্তু বিদ্যাসুন্দর শুন্‌লে যে নরকের পথে ধাবিত হতে হয়, রাইকানুর

গান (?) শুনেও তাই হচ্ছে। এতে অদ্বিতীয় কামদেবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হচ্ছে না, সেখানে নিজেরাই কামদেব সাজবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। রাইকানুর গান এদের মুখ হতে বের হতে পারে না। কৃমি যেমন মানুষের সব রক্ত খেয়ে ফেলে—মানুষকে পুষ্ট হতে দেয় না, তেম্‌নি এদের যত চেষ্টা, সব অমঙ্গলের পথে যাওয়ার সোপান মাত্র। যাদের ইন্দ্রিয় জয় হয়নি, তারা কি করে রাই-কানুর গান গাইতে বা শুন্‌তে পারে? মহাদেবের জন্য যে ব্যবস্থা, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর জন্যও কি সে ব্যবস্থা হতে পারে? এত লোক যে কালকূট-বিষ পান কর্‌তে ধাবিত হচ্ছে—'সুধা' মনে করে গরলের ভাণ্ড বরণ করে নিচ্ছে, তখন আচার্য্যের চীৎকার কি একবারও এদের কাণে যাবে না? সদ্‌বৈদ্য রোগীর মঙ্গলের জন্য বিনা দর্শনীতে প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌ছেন, আর রোগিগণ সেই বৈদ্যবিনাশ-কার্য্যে উঠে পড়ে লেগেছে! নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার্‌ছে! যে-শাখায় বসেছে, সেই শাখাই কাট্‌ছে!

কপটতা একটা আলাদা জিনিষ, আর দুর্ব্বলতা স্বতন্ত্র জিনিষ। কপটাতারহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়। আচার্য্যকে ঠকাব—বৈদ্যের চোখে ধূলি দেবো—আমার অসৎপ্রবৃত্তি-কালসাপকে কপটতার কোটরে লুকিয়ে রেখে দুধ কলা দিয়ে পুষ্‌ব—লোককে জান্‌তে দেবো না—লোকের কাছে 'সাধু' বলে প্রতিষ্ঠা নেবো—এ সকল বুদ্ধি দুর্ব্বলতা মাত্র নহে, কিন্তু ভীষণ কপটতা; এদের কোনকালেই মঙ্গল হয় না। মঙ্গলের পথটাকে যারা প্রথম মুখেই রুদ্ধ করেছে, তাদের মঙ্গল হবে না। সাধুদের প্রকৃষ্টসঙ্গ হ'তে—নিষ্কপট হওয়ার প্রবৃত্তি নিয়ে, বিনীতভাবে সাধুদের মুখ-বিগলিত কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ক্রমপথে মঙ্গল হয়। যদি আমরা লোক-দেখান সাধুসঙ্গ করি, তাহলে আমাদের নরক-প্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাক্‌বে। গৌরসুন্দর যে আদর্শ দেখিয়েছেন, তাতে কপটতার স্থান নাই। ছোট হরিদাসের আদর্শে কপটতা ছিল। আমার মত সাধুর বেশ ধারণ ক'রে যদি কেহ অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হয়ে যায়—'ত্রিদণ্ড' নিয়ে রাবণের ন্যায় সীতাহরণের দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে, তাহলে সে নিজের গলায় নিজে ছুরি দিলে—হরিভজনের নামে আর কিছু কর্‌লে! লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে তাতে বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি—সাধুর বেশ, সাধুর নাম নিয়ে সীতাহরণের প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তাহলে অসুবিধা-সর্পীকে চিরতরে গলায় জড়িয়ে ফেললাম। পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, কিন্তু তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটের প্রতি কখনও গৌরসুন্দরের কৃপা হয় না—

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে।।

(ভাঃ ২।৭।৪২)

(ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাঁহারা যদি কপটতা-রহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ঐ সকল কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে "আমি" ও "আমার" বলিয়া শরণাগত ভক্তের অভিমান থাকে না।)

'আমি কে'—এই কথা আলোচনা না হ'লেই আমাদের দুর্গতি ঘটে—সংসারের নানাপ্রকার প্রলোভনে আমাদিগকে ডুবিয়ে দেয়। যে মহূর্ত্তে আমরা একটুকুও অসতর্ক হই, মুহূর্ত্তেই মায়া-রাক্ষসী আমাদের গলা টিপে আমাদিগকে গ্রাস ক'রে ফেলে। পারমহংসী-কথা নিয়ত শ্রবণ না কর্‌লে এই মায়ার কবল হ'তে উদ্ধার পাওয়ার আর উপায় নেই—

"তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকূলৈরসঙ্গৈর্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্।।"

(ভাঃ ৬।৩।২৮)

[মুকুন্দপদারবিন্দের যে মকরন্দরস অসৎসঙ্গবর্জ্জিত, নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল নিরন্তর পান করিয়া থাকেন, তাহাতে বিমুখ হইয়া যে সকল অসদ্‌ব্যক্তি নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহেই একান্ত আসক্ত, (হে দূতগণ!) তাহাদিগকেই তোমরা আমার সমীপে আনয়ন করিবে।]

আমি ভোক্তৃত্বসূত্রে আমার ভোগের বস্তু—আমার ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বস্তুসকল দেখ্‌তে বসেছি। বিষ্ণুই যে সমস্ত-জগতের একমাত্র মূলকারণ-তাহা বুঝ্‌তে না পেরে 'পরমাণুপুঞ্জগঠিত জগৎ, পিতামাতা হ'তে জীব উদ্ভুত হয়েছে'—আমি এরূপ প্রলাপ বলছি। বর্ত্তমানে আমার চেতন আচ্ছাদিত রয়েছে—যে কাল পর্য্যন্ত না আমি কোন বিষ্ণুভক্তের নিকট উপস্থিত হয়ে সর্ব্বক্ষণ শ্রৌতবাণী না শুনি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম' আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

পিতামাতার থেকে যে জিনিসটা পাওয়া গিয়েছে, সে জিনিষটা "আমি" নহে। জীবের উপাদান-কারণ পিতামাতা নহেন। "সংক্লেশনিকরাকরঃ"—সুখভোগ বা দুঃখাপ্তির মূলকারণ পিতামাতা হ'তে পারেন। "কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ"।। (শ্বেতাশ্বঃ ১।১); "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি; তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম (তৈঃ উঃ ৩।১)।

বাহ্যজগতের বস্তু চেতনকে প্রসব করেছে, এরূপ নহে। পরিবারবিশিষ্ট, রূপবান্, লীলাময়, রূপ-লীলা-বিভাবিত কৃষ্ণ যেখানে বাহ্যানুভূতির নিকট আচ্ছাদিত রয়েছে, সেখানেই ক্ষুদ্রজ্ঞান; আমাদের চেতন যে-স্থানে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে, সে-স্থানেই খণ্ড ও বিকৃত জ্ঞান। আমরা হাতী, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি অজ্ঞানানুভূতির দ্বারা প্রতারিত হয়ে

অদ্বয়জ্ঞানের অভাব বোধ কর্‌ছি। মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়-দ্বারা চালিত হয়ে জীব অদ্বয়জ্ঞান হতে বিচ্যুত হয়েছে। (ভাঃ ২।৯।৩২) —

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।।"

(১) ভগবানের বিষয় যেখানে আমাদের নিকট প্রতীত হয় না, (২) ভগবানের প্রতীতিতে যাহার প্রতীতি নাই, এবং (৩) ভগবানের অনুভূতি ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয় না, সেই জিনিসটাই 'মায়া'—'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'।

'আমার ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে অদ্বয়জ্ঞানকে মেপে নে'ব!' 'আমার অস্তিত্ব যেখানে নাই, সেখানকার বস্তু আমি মেপে নে'ব!'—এ কথাটা কিরূপ? যেখানে অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত এসে' উপস্থিত হ'য়েছে, সেখানেই মাপামাপি-ধর্ম্ম।

অনেকে বিচার করেন,—ত্রিপুটীবিনাশের নামই 'অদ্বয়জ্ঞান'! 'কেন—কং বিজানীয়াৎ' (বৃহদাঃ ২।৪।১৪।৪।৫।১৫) জড়-নির্ব্বিশিষ্টবাদকে লক্ষ্য ক'রে মায়াবাদীর এরূপ বিচার শ্লাঘনীয় হ'তে পারে, কিন্তু উহা বিশুদ্ধ নাস্তিকতা-মাত্র। দৃশ্য, দ্রষ্টা দর্শনের নিত্যত্বের ব্যাঘাত ক'রবার জন্য যে নাস্তিকতা উপস্থিত হ'য়েছে, বিষ্ণুভক্তের নিকট গমন ক'র্‌লে এরূপ নাস্তিকতা মনোধর্ম্ম বা বিক্রম প্রকাশ কর্‌তে পারে না।

চিদ্বিলাসের বিভিন্ন প্রতিফলন এই জগতে প্রকাশিত। বাহ্যজগতের বস্তু পরিবর্ত্তন-শীল; বিষ্ণু পরিবর্ত্তনশীন নহেন। মায়াবাদী বলেন,—সৎ ও অসৎ হ'তে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানসমষ্টির (?) নাম 'ঈশ্বর'। ভগবদ্ভক্ত বলেন,—কল্যাণগুণবারিধি ঈশ্বর।

যাহাদের বিচারে উপাসনার নিত্যত্ব নাই, তাহাদের বিচারকে নাস্তিক্যবিচার জেনে' দূর হ'তে তা'দের সঙ্গ পরিত্যাগ করুন। কৃত্রিমভাবে মন নিগৃহীত হ'তে পারে না। ভগবদ্ভক্ত বলেন,—হাজার যম-নিয়ম-প্রাণায়াম-দ্বারা মন নিগৃহীত হ'তে পারে না।

ভগবদ্বিমুখগণ বেদ-বেদান্তের প্রকৃত বিচার—ভগবদ্ভক্তের বিদ্বদনুভূতি প্রভৃতি হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে অপরজীবগণকে ভগবদ্বিমুখ ক'র্‌বার জন্য ব'লে থাকেন,—'মুমুক্ষুদের কথাও ত' শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে র'য়েছে।'

কৃষ্ণের কীর্ত্তন—সাতশত শ্লোকে শ্রীগীতায় শুন্‌তে পাওয়া যায় (গীঃ ৭।১৪),—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।"

যিনি কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁ'রই মায়া হ'তে উদ্ধার-লাভ হয়। জীবের অন্য কোনও কৃত্য নাই—কৃষ্ণারাধনা ব্যতীত; অন্য কোনও উপাস্য-বস্তু নাই—কৃষ্ণনাম ব্যতীত।

"আন কথা না কহিবে, আন কথা না শুনিবে।"

'কর্ম্মফলভোগী'-নামে এক সম্প্রদায় আছেন। কর্ম্মসকল—ত্রৈবর্গিক ও কুঞ্জর-স্নানের মত। হাতী কাদা ঘাঁটে, আবার স্নান করে, আবার কাদা ঘাঁটে। 'কৃষ্ণপাদ-পরিচর্য্যা ব্যতীত অন্য কোন ও কৃত্য নাই',—আত্মার যখন ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়, 'ভগবানের পাদপদ্ম সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম—সর্ব্বজীবের ধর্ম্ম—সর্ব্বকালের ধর্ম্ম—ইহা যখন উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন দুষ্ট মন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে তাণ্ডব নৃত্য দেখায় না।

প্রত্যক্ষ ও অনুমানেই আমরা সময় কাটা'চ্ছি। যিনি বুঝ্তে পারেন,—'কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ, পঞ্চরসের একমাত্র ভোক্তা, কৃষ্ণই কামদেব, আমরা তাঁ'র কামের ইন্ধনমাত্র', তাঁহার নিকট অক্ষজজ্ঞানে প্রত্যক্ষবাদ, অক্ষজজ্ঞানে অনুমান-বাদ, তথা-কথিত শ্রৌত-পথ—যাহা প্রত্যক্ষ-বাদ ও অনুমান-বাদেরই অন্তর্ভুক্ত—ইত্যাদির স্পৃহা কমে' যায়।

আমরা যখন বলি, – আমি ভগবদ্ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তখন আমি 'আউলসম্প্রদায়ে'র অন্তর্ভুক্ত হই। 'আউওল'শব্দে—আদি, প্রথম। 'আউওল', 'দোয়েম' 'সোহেম' 'চাহারম্' প্রভৃতি ফার্সি-ভাষার সংখ্যা-বাচক শব্দ—শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত।

"বাহিরের দিকে খোসা সবসময়েই জীবকে টানিতেছে। "We are to serve the Lord of the universe, and not to get service from the universe". কিন্তু মানুষ জাতির প্রকৃতি ঠিক উল্টা, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত; কোথায় মানুষের সমগ্র চেষ্টা ভগবানের দিকে যা'বে, তা' না হ'য়ে অন্যদিকে যাচ্ছে। মানুষ এত ঈশ্বরের সেবা-বিরোধী হ'য়েছে যে, কি ক'রে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হ'বে সেজন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু যেদিন বোধ হবে এ জগতটা একটা টোপ বা বঁড়শী, সেদিন নিজে এই টোপ গিলবার বা অপরকে গিলাবার জন্য চেষ্টা থাকবে না, পরমেশ্বরের সেবাই একমাত্র কাম্য হবে। এক শ্রেণীর লোক ব'লছেন আমার ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকে লোকের নিকট গৌণরূপে দেখিয়ে বা প্রচ্ছন্নভাবে রেখে অপর লোকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা ভোগ হ'ক—এইরূপ ইচ্ছাই পরার্থিতা, কিন্তু অপরকে টোপ গিলিয়েই বা কি লাভ হবে? পরম আস্তিকগণ ব'লছেন—একমাত্র অধোক্ষজ স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হ'ক। এই দুইটি ভিন্ন বিচার নিয়েই আস্তিক সম্প্রদায় ও তথাকথিত পরার্থী প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'Tug of war' চ'লছে।

আমাদের কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা ক'রতে হ'বে। বিশ্বের ভোগ বা ত্যাগের জন্য একপয়সাও দেওয়া হ'বে না। বিশ্ব কেবল আমাকে অমঙ্গলের কার্য্যে অধিকতর প্রেরণা দিয়ে আমাকে মঙ্গলের পথ ভুলিয়ে দিবে। যে পয়সা আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা অন্য বহুলোকের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ক'রবে তাহা বিশ্বাসঘাতক। জগতের তথাকথিত charity ব'লে জিনিষটা কতকগুলি কষাই সৃষ্টি ক'রে দেয়।

জগতে আমাদের বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রকার কৌতূহল চরিতার্থ, ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার আগ্রহ, অভিলাষ ও প্রবণতা আছে সত্য, কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সকলেই Vitally interested, তাহা অকপট হরিভজন। অন্যান্য বিষয়গুলি আমাদের আপাত প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারে; কিন্তু হরিভজনই আমাদের নিত্য সত্ত্বা, নিত্য জ্ঞান ও আনন্দের পরিপূর্ণ প্রয়োজন নিঃসংশয়িতরূপে সিদ্ধ করিয়া থাকে। কতকগুলি আগন্তুক ও আপাত প্রয়োজনের ছলনাময় চিন্তাস্রোত আমাদিগকে নিত্যপ্রয়োজনের বিচার হইতে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। যদি কেবল বর্ত্তমান প্রয়োজনের বিভীষিকাই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহা হইলে অনেক প্রকৃত নিত্য প্রয়োজনের বিষয়ের প্রতি আমাদের উদাসীনতা এবং তজ্জনিত দুঃখ ও সুখভোগ। আমরা সর্ব্বদা অপেক্ষাযুক্ত, অপরের সাহায্যে আমরা মুহূর্ত্তও অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারি না—আমাদের ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি স্বৈরিণীর ন্যায় রূপ-রসাদি বিষয়ের অপেক্ষায় চক্ষু-কর্ণাদির দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। যখন ঐসকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিষয় বরণ করিয়া বারংবার বঞ্চিত হইতে থাকে, তখন উহারা বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনীর ন্যায় বৈরাগ্য ভিখারিনী হয়, মোক্ষকামিনী হয়। কিন্তু ভোগ-কামিনী ও মোক্ষকামিনী ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। মোক্ষ কামনা জিনিষটা কপটতা বা চতুরন্মন্যতার সহিত ভোগ কামনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভক্তির পথে অপেক্ষা না করিলে—একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণকে বিষয় বা কান্তরূপে বরণ না করিলে ইন্দ্রিয়বৃত্তির সার্থকতা ও পূর্ণ পিপাসা সিদ্ধ হইতে পারে না।

কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথ জড় ভোগ-মিশ্র-বিচারে সংশ্লিষ্ট বলিয়া অপস্বার্থপরতা পরিবর্দ্ধনের পথ। সৌভাগ্যক্রমে ঐ দুইটি বিপথে বিপথগামী না হইলেই আমরা প্রকৃত সাধুর কৃপায় ভক্তির পথের পথিক হই। অকৈতব শ্রীগুরুদেবই আমাদিগকে সেই প্রাণনাশক কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পথ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। কর্ম্ম ও জ্ঞানের বার্ত্তা অপস্বার্থপরতা অভিযান। ভক্ত বলেন, আমাদের প্রকৃত স্বার্থ কোনটি, আমরা তাহা চিনিয়া লইব। ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবত আমাদের প্রকৃত স্বার্থ, ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থ, যে স্বার্থ নিঃস্বার্থ ও পরার্থকে ক্রোড়ীভূত করিয়াছে, এইরূপ বিমল স্বার্থ প্রচার করেন।

মজঃফরনগর জিলার মধ্যেই চারটী মহকুমার অন্যতম জনমৎ মহকুমায় একদিন শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। যে স্থানে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহার রাজ্য-সিংহাসন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, যে স্থানে জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা, অবশ্যম্ভাবী অনিত্যতার বিষয় জানিয়া মহাভাগবতমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণে জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্ত যাপনই মানবজীবনের সর্ব্বোত্তম স্বার্থকতা—এই আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, যে স্থানে পঞ্চমমানের কথা পরমবাস্তব-সত্যের কথা উদঘাটিত

হইয়াছিল, সেখানে কত মুনি, ঋষি, ধর্ম্মবক্তা, শাস্ত্রকর্ত্তা, ব্রহ্মজ্ঞ, পণ্ডিত, যোগী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, তপস্বী, ব্রতী উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্যাসশিষ্য মহাভাগবত বরেণ্য শুকদেবই একমাত্র মহামহোপদেশক কীর্ত্তনকারিরূপে বৃত হইয়াছিলেন। কারণ তিনি শ্রৌতপারম্পর্য্যে ভগবদ্ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন--ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। সেই ভাগবতে অপ্রাকৃত--অধোক্ষজরাজ্যের সন্দেশ আছে। শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছিলেন--ভোগ ও মোক্ষ কখনই প্রাণিজগতের সমস্যা সমাধানের মূলমন্ত্র হইতে পারে না। ভোগ মোক্ষাভিসন্ধি রহিত প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতধর্ম্মেই--ভক্তিপথেই আমরা আত্মার পরম লাভ অর্জন করিতে পারি--সকল সমস্যা সমাধানের রহস্য প্রাপ্ত হইতে পারি। আত্মহত্যার প্রণালীর পথ নির্ভেদজ্ঞানের কথা পরিত্যাগ করিয়া আমরা ভক্তির কথা শ্রবণে কর্ণ নিযুক্ত করিব। কর্ম্ম ও জ্ঞানের যূপকাষ্ঠে অস্মৎসেবা-প্রবৃত্তি হরিভক্তিকে (?) বলি (?) দিবার চেষ্টা বহির্ম্মুখিনী চিন্তাধারার একটা নৈসর্গিকী প্রবণতারূপে জগতে পরিলক্ষিত হয়।

আমরা চাই বাস্তব সত্য শতকরা শত অংশ—অংশ নয় পূর্ণতম সমগ্র বাস্তব সত্য। আমরা বাস্তববস্তুর পূর্ণতম প্রাকট্য চাই, কর্ম্ম ও জ্ঞানরাহুর দ্বারা গ্রস্ত কোনও সত্যাভাস বা সত্যবাধকে আমরা চাই না।

সর্বপ্রথমে স্বরূপ নির্ণয় আবশ্যক; নতুবা মনোধর্ম্মিগণের শত-সহস্র কল্পনা ও মতবাদ কোনও মঙ্গলের সীমায় উপনীত করিতে পারিবে না। যখন ঐ সকল মনোধর্ম্মের অলাতচক্র স্তব্ধ হইবে, তখনই প্রশ্ন উদিত হইবে। আমি কে? মনোধর্ম্মি-সমাজ যে 'আমি কে?' প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইবে, তাহাতে নাস্তিক্য-সংশয়, সগুণ-নির্গুণ প্রভৃতি পরস্পর বিবদমান মতসমূহ সৃষ্ট হইবে মাত্র। অভিজ্ঞতাবাদের শেষ সীমা এবং চরম মীমাংসা—নির্ব্বিশেষ গতি বা মায়াবাদ পর্য্যন্ত। কিন্তু চিজ্জগতের Sexological questions উত্থাপিত হইলে ক্লীব ব্রহ্মবাদের ধারণা পূর্ণতা সাধন করিতে পারে না, জানা যায়। বিষয় ও আশ্রয়ের বিচার ব্যতীত বস্তুর পূর্ণত্ব সাধিত হইতে পারে না। Old testament-এ ও It god-এর ধারণার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। New testament-এ সবিশেষ বিচারের আংশিক ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র He god এবং শ্রীমহাভারতে বা শ্রীগীতায় সবিশেষ পুরুষোত্তমবাদের বিচার দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে পুরুষোত্তমবাদের পূর্ণতম বিচার অর্থাৎ স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের বিষয় গীত হইয়াছে। বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভকৌস্তুভের মধ্যে শ্রীগৌরজনানুকম্পিত কেশব কাশ্মিরী ত্রিবিধ লিঙ্গ-পর্য্যায়ে আলোচনা করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত-শব্দব্রহ্মই এই সকল বিচার পূর্ণভাবে প্রকট করেন; অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মই He god, she god এবং it god-এর পূর্ণ মীমাংসা চিৎসমন্বয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

অধোক্ষজ শব্দব্রহ্ম ব্রাহ্মী, খরৌষ্ঠী, সান্‌কী, পুষ্করাসাদি প্রভৃতি লেখপ্রণালীজাত আভিধানিক শব্দ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অপ্রাকৃত শব্দের বিশেষ নাম-রূপ-গুণ-লীলাপরিকর-বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। অপ্রাকৃত শব্দ কর্ণ ব্যতীত ও অন্যান্য ৪টী ইন্দ্রিয়কে (চক্ষু, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্‌কে) নিয়মিত করিয়া থাকে। প্রাকৃত শব্দকে চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বগিন্দ্রিয় মাপিয়া লইতে পারে—পরীক্ষা করিতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত শব্দে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের পরীক্ষার বিষয় হওয়া দূরে থাকুক, ঐ শব্দব্রহ্মের দ্বারা নিয়মিত ও সংযমিত হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত শব্দ কোনও প্রকার প্রতিদ্বন্দিতার পাত্র নহে—তাহা অপ্রতিদ্বন্দী—অসমোর্দ্ধবৈশিষ্ট্যযুক্ত—সর্ব্বশক্তিমান্—যুগপৎ সকল বৃত্তির আধার—সর্ব্বকল্যাণ-নিকেতন—সর্ব্বনিয়ামক ও সর্ব্বপ্রভু। ইহা আমাদের মস্তিষ্ককে, বুদ্ধি-বৃত্তিকে—আমাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাকে—ভ্রান্ত বিচারকে—ভ্রমপূর্ণ নৈসর্গিক চিন্তা-ধারাকে—মনোধর্ম্মোত্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতাকে নিয়মিত করিবে। শব্দাস্ত্র জাগতিক অভিমানের যাবতীয় বিভীষিকাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া সেখানে নিখিলকল্যাণলক্ষ্মীর স্বরাজ্য স্থাপন করিবে—অপ্রাকৃত বাস্তব নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্যযুক্ত শব্দাবতারের আসন প্রতিষ্ঠা করিবে।

অভিজ্ঞতাবাদের অকর্ম্মণ্যতার অভিজ্ঞতা মানব সমাজ পুনঃ পুনঃ লাভ করিয়াও অভিজ্ঞতাবাদের যূপকাষ্ঠেই তাহাদের প্রাণবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি? ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতার নিকট পরাজিত। পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা শত বৎসরের অভিজ্ঞতার নিকট সঙ্কীর্ণ ও দোষপূর্ণ, শত বৎসরের অভিজ্ঞতা সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতার সম্মুখে সম্পূর্ণ বিপরীত ও ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন। সুতরাং অভিজ্ঞতার স্বর্গের সোপান বা রাবণের বিচার-পথ পরিত্যাগ করিয়া শব্দাবতারের পথে আত্মসমর্পণই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম—তাহাই শ্রৌতপথ।

আত্মার নিত্য ধর্ম্ম কি? কর্ম্মজড়স্মার্ত্তধর্ম্ম—পূর্ব্বমীমাংসার প্রতিপাদ্য ক্ষয়িষ্ণু ধর্ম্ম, কিংবা ঘটাকাশে, পটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতির বিচারে অভিজ্ঞতাবাদের যে সকল পৃষ্ঠপোষণ দৃষ্ট হয়, তাহা আত্মার নিত্য ধর্ম্ম নহে। জীবাত্মা কখনও জড় সাম্য বস্তু নহে, জীবাত্মা কখনও অনিত্য নহে, জীবাত্মা কখনও মিথ্যা নহে, জীবাত্মা কখনও পরমাত্মা নহে। জীব সর্ব্বদাই আশ্রয়ের ভিখারী। জীবাত্মার পরমাশ্রয় পরমাত্মা।

জগতের আশ্রয়, বিষয়—সমস্তই অনিত্য—নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া, পরিকর—সকলই অনিত্য বলিয়া অনুমান-প্রমাণের বলে আমরা যদি তুরীয় মান, পঞ্চমমানের কথাগুলিকেও তৃতীয় মানের ভূমিকায় টানিয়া আনিতে যাই, কিংবা সম্পত্তিশালী হইবার পরেও মাঝির নদীর পাড়ে লেপ বিছাইয়া গুণ টানিবার সঙ্কল্পের ন্যায় তৃতীয়মানের প্রত্যক্ষ, অনুমানসমূহ তুরীয়মানের রাজ্যে লইয়া যাইতে চাই, তাহা হইলে অভিজ্ঞব্রুব আমাদের মত আর অনভিজ্ঞ কে?

আমি চাই আমাকে নিত্য পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত করিতে, নিত্যবিচিত্রতার পূর্ণতম বিকাশে প্রস্ফুটিত করিতে। শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র গ্রন্থ সম্রাট। যাহা নিত্যবিচিত্রতার বিকাশ-সম্বন্ধে পরিস্ফুটভাবে কীর্ত্তন করেন এবং বলেন যে এই জগৎ সেই নিত্য বিচিত্রতা দর্শনের প্রতিবন্ধক ও বিকৃত প্রতিবিম্ব। যদি আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতের বাণীতে আমাদের শুশ্রূষু কর্ণ নিয়োগ করি, তাহা হইলেই সমস্ত প্রকার জটিল ও অমীমাংস্য প্রশ্নের গোলক ধাঁধা হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিব। পরস্পর বিবদমান মতবাদসমূহ শ্রীমদ্ভাগবতে অতি সুন্দরভাবে মীমাংসিত ও সমন্বিত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বতোভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের শরণাগত হইব। অপ্রাকৃত সরহস্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান একমাত্র অপ্রাকৃত শব্দাবতারের মধ্য দিয়াই অবতীর্ণ হয়।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি।।
(ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গলকথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অতি শীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীর অন্য চেষ্টা-দ্বারা অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে লীলাস্মরণাদির প্রয়োজন হয় না।

দেহের ক্ষণভঙ্গুর হস্ত-পদাদি আছে, কিন্তু আত্মার নিত্য হস্ত, নিত্য পদ, নিত্য আকার বর্ত্তমান। ভগবানের পূর্ণচেতনময় হস্ত-পদাদি, রূপ-গুণাদি ভগবৎকৃপায়ই চেতনের বিজ্ঞানে সম্প্রকাশিত হয়,—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ গুণ-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্ বলিতেছেন, আমার রূপ জীবের কোনও প্রকার কল্পনার বস্তু নহে, জীব তাহার মনোধর্ম্মের কারখানায় যেন আমার আকার সৃষ্টি করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন না করে। আমি স্বয়ংই আমার নিত্যরূপ জীবের চেতনময়ী সেবোন্মুখী বিশুদ্ধা বৃত্তিতে প্রকাশ করিব। শব্দাবতারেই সমস্ত শক্তি আছে, আমাদের কোনও প্রকার কল্পনার হেয়ত্ব বা মিশ্রব্যাপার পূর্ণচেতনের স্বতঃসিদ্ধ প্রাকট্যের পথে অর্গলরূপে ধারণ করিবার আবশ্যকতা নাই। আমরা আশ্রিত। আশ্রয়ভিক্ষার নামই ভক্তি, তাহা ব্যক্তিগত অপস্বার্থ নহে, পরন্তু পরম শ্রেয়োলালসা। আমরা শ্রেয়ঃপথের পথিক হইব। আমরা সর্ব্বদাই অধোক্ষজ বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধিৎসু হইব। ভগবদ্ভক্তের ভজনীয় বস্তু ও ভজনবৃত্তি নিত্য বর্ত্তমান; তাহা প্রকৃতিজাত কোনও বস্তু নহে। ভজনীয় বৃত্তির নিষ্কপটতায় পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, ক্লীবত্ব, পুত্রত্ব-বিচারের যথাযোগ্য স্থান—সকলই পরিস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। ভক্তিই আত্মার বৃত্তি। কর্ম্ম এবং জ্ঞান-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান আপাত-প্রয়োজনোচিত ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট আবৃতআত্মারই বৃত্তিদ্বয়।

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।।

অর্থাৎ, এই শ্রেয়ের কথা শুনিবার লোক বহু পাওয়া যায় না, দুই চার জন পাওয়া গেলেও তাহা শুনিয়াও অনেকেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। আর শ্রেয়ো বিষয়ের তত্ত্ববিৎ ও নিপুণ বক্তা অতীব দুর্ল্লভ। আবার যদিও এইরূপ সুদুর্ল্লভ উপদেষ্টা কদাচিৎ অবতীর্ণ হন, কিন্তু আচার্য্যের অনুগত শ্রোতা আরও সুদুর্ল্লভ।

জগতের লোকগুলি অবিদ্যার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে আপনাদিগকে পণ্ডিত 'সব বুঝ্দার' মনে কর্ছে। কপটতায় আচ্ছন্ন হ'য়ে কেবল সংসারে ওঠা-নামা কর্ছে। এই সকল অন্ধের দ্বারা চালিত হ'য়ে জগতের সমস্ত অন্ধসমাজ খানায় ডোবায় প'ড়ে মর্ছে,—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতন্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।।"

'গৌড়ীয়ে'র শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর যে দুইটী Motto (ন্যায়বাক্য) আছে—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।"
"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।"

—এ'র মানে সংস্কৃতপাঠীর লাখ্-করা একজনও বুঝ্তে পারে না—বাংলা ক'রে দিলেও তা'র মানে বোঝে না। যে দিন মানে বুঝ্বে, সে দিন বুঝতে পার্বে যে, তা'রা এতকাল যা'কে 'ধর্ম্ম' ব'লে মনে করেছে—যা'কে 'ত্যাগ', 'তপস্যা' ব'লে মনে করেছে,—তা'রা এতকাল যত চেষ্টা করেছে—দুনিয়ার কাছে যত বাহাদুরী দেখিয়েছে, সব ভুল করেছে—বৃথা সময় নষ্ট ক'রেছে মাত্র।

যে নিরপেক্ষ নয়, সেরূপ অনন্তকোটী বক্তা নরকে চ'লে যাবে; কিন্তু নির্ভীক হ'য়ে যে নিরপেক্ষ সত্য বলা হচ্ছে, শত শত জন্ম পরেও—শত শত যুগ পরেও কেউ না কেউ উহার নিগূঢ় সত্য বুঝ্তে পারবে। কষ্টার্জ্জিত শত শত গ্যালন রক্ত ব্যয়িত না হওয়া পর্য্যন্ত একটী লোককে সত্যকথা বোঝান যায় না—'সাধুত্ব' কাহাকে বলে, শিক্ষকগণ তা' শেখাতে পারেন না।

কতকগুলি লোক নির্জ্জনে বসে' বসে' বাজাচ্ছে—কেউ বা পিত্তি বৃদ্ধি কর্ছে। ওরূপ মুষার পলায়নে বা ছুঁচোর কীর্ত্তনে কোন মঙ্গল হ'বে না। আর একটা ভাষায় বল্তে গেলে, ওসব চেষ্টা—ধর্ম্ম নয়, 'দালালী বা বদ্মায়েশীর প্রলোভন'। 'দয়া'র নাম ক'রে অপস্বার্থপর মানুষ যে কাজ কর্ছে, যদি স্পষ্টভাষায় বলা যায়, তবে তা' ছাড়া আর কিছুই নয়। মাছ যেমন বঁড়শীর লোভে, পশু যেমন ব্যাধের বাঁশী শুনে' নিহত

হয়, আপাত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আশায় মনুষ্যজাতিও সেরূপ নরকের পথে যাচ্ছে।

আমরা একজনের জন্য দু'শ গ্যালন রক্ত ব্যয় কর্‌তে প্রস্তুত আছি—যদি একটী লোকেরও সত্যিকথা শুন্‌বার কাণ হয়। গৌড়ীয়মঠের নিঃস্বার্থ দয়াশীল প্রত্যেক লোক এই মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির চিৎশরীরপুষ্টির জন্যে দু'শ গ্যালন রক্তপান করাইয়া ব্যয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত থাকুক। লাখ্ লাখ্ বদ্‌মায়েশ লোক সরল-প্রকৃত হিতাহিত-বোধহীন ধনীর নিকট গিয়ে ধনীদের নরকপথে পাতিত কর্‌ছে; গৌড়ীয় মঠ সেরূপ হিংসার কার্য্য কখনও করেন না, বা প্রশয় দেন না।

সত্য বস্তুর প্রকৃত আলোচনাকে আমরা অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক মনে করি—আমরা ধর্‌তে পারি না ব'লে। আমি অন্যমনস্ক ব'লে — আমি মৎলবী ব'লে—আমি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব'লে আচার্য্যের সত্য কথা কখনও অপ্রাসঙ্গিক নহে।

গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ Mental speculationists নহেন, তাঁ'রা মনের ধর্ম্মে চালিত ন'ন। এই পাজি মন—এই বদ্‌মাইশ মনের কাম-ক্রোধাদির দাস্য কর্‌বার খুব রুচি; জগৎকে কাম-ক্রোধাদির দাস্যে নিযুক্ত কর্‌বার জন্যে পাজি মনের উপদেষ্টার বেয-গ্রহণ।

অনন্তকোটী জীব আনখ-কেশাগ্র বিষ্ণু-বিমুখ হ'য়ে অনন্তকোটি-ভাবে ঈশ্বর বিদ্বেষ কর্‌বার জন্যে এই কয়েদখানায়—এই মহামায়ার দুর্গে এসে পড়েছে; এদের মধ্যে থেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার, তা'হলে অনন্তকোটী হাসপাতাল করা অপেক্ষা তাহাতে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হ'বে। বাস্তবিক সত্যি সত্যি দয়া—অমন্দোদয়-দয়া দু' পাঁচ দিনের দয়া নহে,—একদিনের জন্যে ক্ষুধা-নিবারণের দয়া নহে, প্রকৃত নিত্য, পরম চরম সত্যিকার দয়া—দান শ্রীচৈতন্যদেব বিতরণ করেছেন।

আমি অজীর্ণ-রোগী; একটা ডাক্তারকে ডেকে আন্‌লুম, এনেই বল্‌ছি—'আমার জন্যে পোলাও-কালিয়া ব্যবস্থা করুন'; ডাক্তার আমার রুচি অনুসারে আমার 'প্রেয়ঃ' ব্যবস্থা করে দর্শনী নিয়ে চ'লে গেলেন, এরূপ লোককে ডাক্তার বলা যায় না। flat-terer (তোষামোদকারী) গুরু নহে—প্রচারক নহে। যা'রা popular হ'বার জন্য—যা'রা কার্য্য ফতে কর্‌বার জন্য জনমত অর্থাৎ জগতের অনন্তকোটি রোগীকুলের রুচি বা প্রেয়ের মতে মত দিয়ে চল্‌ছেন, সে সকল লোক শুভানুধ্যায়ী নহেন—শুভানুধ্যায়ীর বিরুদ্ধমতাবলম্বী; সে-সকল লোকের কথা শুন্‌বো না। ডাক্তারকে ডাক্‌লাম—আমার ব্যাধির চিকিৎসা কর্‌তে তাঁকে যদি আমি dictate (হুকুম তামিল করবার আদেশ) করি তা'হলে ডাক্তার ডাকা হলো না,—তাঁবেদার ডেকে নিজের পায়েই নিজে কুড়ল মারা হলো মাত্র। লোক-দেখানো ডাক্তার ডেকে ডাক্তারকে দিয়ে রোগের কুপথ্য ব্যবস্থা করার চেষ্টা হলো। যাঁ'রা সত্যি সত্যি ডাক্তার, তাঁ'রা রোগীর dictate (অনুজ্ঞা) অনুসারে চলেন না, আর যা'রা চতুর, লোক-ঠকান ডাক্তার—দর্শনীই যা'দের কাম্যবস্তু,

তা'রা রোগীর ভবিষ্যৎ ভা'লর দিকে না চেয়ে নিজের পকেট-টাই দেখে। আমাদের মনের মত না হ'লে যা'কে বরখাস্ত কর্‌তে পারি কিম্বা যা'কে দিয়ে আমার বদ্‌মাইশী দুষ্টুমী বুদ্ধির সমর্থন করিয়ে নিতে পারি, তা'কে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলা যায় না। একজন চারবছরের শিশু যদি দাম্পত্য-রসের কথা বুঝ্‌তে চায়, কিম্বা সাত-বছরের বালক যদি সেক্‌সপিয়ারের কবিতার কাব্যরস বুঝ্‌তে চায়, আমরা তা'র কথা শুনে' অধিক লাভবান্ হই না। জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে' নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার্‌তে পারে--নিজের ছাগলকে মুখের দিকটা বাদ দিয়ে পেছনের দিকটাও কাট্‌তে পারে।

আমি ভারতবর্ষের অধিবাসী, কাজেই অনিত্য অভিমানে ভারতবর্ষের interest দেখা আমার কর্ত্তব্য; আবার আমি যদি বিদেশে জন্মগ্রহণ করি, তা'হলে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধ হ'লেও বৈদেশিক interest দেখাটাই আমার কর্ত্তব্য হয়। শ্রীচৈতন্য বা শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত লব্ধ-চেতন ভক্তগণের ঐরূপ দেশগত, কালগত, পাত্রগত-অচৈতন্য-প্রসূত ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা নাই; তাঁ'রা দেশের যে উপকার করেন—তাঁ'রা দেশ ভক্তির যে আদর্শ দেখান, তা'তে একজনের পরিণামে মন্দ-প্রসবকারী সাময়িক উপকার, আর একজনের অপকার বা হিংসা হয় না। সেই উপকারের ফল—সেই দেশ-সেবার ফল—সমগ্র দেশ, সমগ্র পাত্র ও সমগ্র কাল প্রাপ্ত হ'তে পারে; এটা গল্পের কথা নহে—এটা সব চেয়ে বড় সত্যি কথা।

একটা বিস্তৃত নদীর পারে বসে' কয়েকজন গুলিখোর গুলি খাচ্ছিল। গুলিখোরদের টিকে ধরবার আবশ্যক হ'য়ে উঠ্‌ল। ওপারে একটা নৌকোয় আলো জ্বল্‌ছিল। গুলিখোরদের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে এপারে বসে'ই ওপারের নৌকোর প্রদীপের আগুনটিকে ধরা'তে যত্ন কর্‌লে। টিকে ধর্‌ছে না' দেখে' আর এক গুলিখোর প্রথম গুলিখোরের হাত হ'তে টিকেটা কেড়ে নিয়ে আর একটু দূরে হাত এগিয়ে ধর্‌ল। জগতের অভিজ্ঞতাবাদি-দলেরও ঠিক এইরূপ গুলিখোরের মত প্রয়াস। মাঝে এক মাইল, দেড় মাইল নদী, কিন্তু এপারে বসে' ওপারের আলোয় টিকে ধরাতে চায়! জগতের বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে বিরজানদীর পরপারের আলোককে স্পর্শ করতে চায়! আর এক অভিজ্ঞতাবাদী এসে বল্লে,—তোমার অভিজ্ঞতার হাতটা আর একটু এগিয়ে ধর, অভিজ্ঞতার হাত বৈকুণ্ঠের আলোক ছুঁতে পারে না; অভিজ্ঞতার হাত অতদূর প্রসারিত হ'তে পারে না; তাই অনেক সময় এই অভিজ্ঞতাবাদীদের খুবই পরিশ্রান্ত হ'য়ে নির্ব্বিশেষবাদী হয়ে পড়্‌তে হয়—series expand কর্‌তে গিয়ে 'to infinity' বলে' হাঁফ ছাড়্‌তে হয়।

নশ্বর কর্ম্ম-চেষ্টাপরায়ণগণের মত এইজগতে নির্ব্বোধ নেই, তা'দিগকে 'নেতা' মনে করে যা'রা দৌড়চ্ছে তা'রা মরীচিকায় কোনদিনই জল পাবে না। কর্ম্মবীরদের

প্রস্তাবিত উপকারটা লোকে কতদিন পাবে? কে পাবে? কোন্ স্থানে পাবে—এসব কথা একবারও চিন্তা না ক'রে শতকরা প্রায় শতজনই ভুল পথে ধাবিত হচ্ছে! একমাত্র শ্রীচৈতন্যপদরেণুর সেবা যাঁদের চেতনে কিঞ্চিন্মাত্রও উন্মেষিত হয়েছে, তাঁ'রাই ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ইন্দ্রাদি দেবতার আধিকারিক পদবী তুচ্ছ জ্ঞান করেন—মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করেন। ভুক্তি ও মুক্তিকে প্রতিরোধ করার নামই ভক্তি। চৈতনদাসগণ ভুক্তি-মুক্তির ভিখারী নহেন—তাঁ'রা কপট নহেন।

অহো! অচৈতন্য-দাসগণই আজ জগতে 'চৈতন্যদাস' বলে গণিত হচ্ছে! তা'দিগকে যদি 'ভক্ত' বলে' আমরা মনে করি, তা'হলে আমাদের মত নির্ব্বোধ লোক আর কে আছে? চৈতন্যচন্দ্রের চরণে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানের নামে কুঠারাঘাত কর্‌ছে জগতের ৯৯.৯ লোক। জগতের শতকরা প্রায় একশতজনই ঐরূপ। ঐরূপ লোকের ভ্রম অপনোদন করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়ার কার্য্য। সেটা শ্রেয়ঃপথ, প্রেয়ঃপথ নহে—সেটা Flattery নয়—মূর্খ লোককে 'পণ্ডিত' বলে সার্টিফিকেট্ দেওয়া নয়। চৈতন্যদেবের প্রত্যেক ক্রিয়ায় বর্ত্তমান ভোগপর নির্ব্বুদ্ধিতার কোন সমর্থন নাই।

মানুষের কানে চৈতন্যদেবের একটী কথাও যাচ্ছে না; চৈতন্যদেবকে নিজের মনগড়া মত এঁকে—অখণ্ড-চৈতন্যকে—অদ্বয়জ্ঞানকে 'আমার গৌরাঙ্গ', 'তোমার গৌরাঙ্গ', 'ভূত-প্রেতবাদীর গৌরাঙ্গ', 'ইন্দ্রিয়তর্পণকারীর গৌরাঙ্গ', 'আউল-বাউল-কর্ত্তাভজা-কিশোরী-ভজা-নেড়া-নেড়ী-সখীভেকী-নবরসিকের গৌরাঙ্গ', 'প্রাকৃত সহজিয়ার গৌরাঙ্গ', 'নাগরীর গৌরাঙ্গ', 'অন্যাভিলাষীর গৌরাঙ্গ', 'কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগীর গৌরাঙ্গ', 'স্মার্ত্তের গৌরাঙ্গ' প্রভৃতি কত কি ক'রে ফেল্‌ছে। এগুলোসবই ব্যক্তি-বিশেষের মনগড়া পৌত্তালিকতা।

সাধুগণের বিশুদ্ধচিত্তে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনে যে অধোক্ষজসচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয়, তাহাই কৃষ্ণের বাস্তবস্বরূপ। তা পরিত্যাগ ক'রে মানুষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকামনার জড়-কল্পনায় যেসকল কৃষ্ণের (?) মূর্ত্তি আঁকা হয়, যেমন,—'রবিবর্ম্মার কৃষ্ণ', 'কলিকাতার আর্ট স্কুলের কৃষ্ণ', 'বাঙ্গালার কৃষ্ণ', 'বোম্বাইর অঙ্কিত কৃষ্ণ', 'জার্ম্মেণীর চিত্রিত কৃষ্ণ', সেগুলি যেমন সবই মনগড়া পুতুল, সেরূপ 'আমার গৌরাঙ্গ', 'তোমার গৌরাঙ্গ', 'সহজিয়াদের গৌরাঙ্গ', 'স্মার্ত্তের গৌরাঙ্গ', 'নাগরীর গৌরাঙ্গ',—সবই পুতুল; সবই মায়া—সব অচৈতন্য। গৌরাঙ্গ 'পুতুল' নহেন, তিনি পূর্ণচেতন—স্বয়ং ভগবান্, বদ্ধজীবের মনগড়া পুতুল না হওয়াতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি বিশ্বের কোন অচৈতন্য জীবের দ্বারা নিয়মিত হন না। অচৈতন্য জীব শ্রীচৈতন্যকে অচেতন-মনোধর্ম্মের কারখানায় অচেতনের ছাঁচে ঢালিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পুতুলরূপে ইচ্ছামত পিটিয়া গড়িয়া লইতে পারে না।

চৈতন্যদেবকে লোকে এমন করে এঁকেছে যে, চৈতন্যদেবের চরণানুচর বলতে

গিয়ে আমাদিগকেও লজ্জার পাত্র ক'রে ফেলেছে! আমাদের এমনই পোড়া কপাল যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর আমাদের দেশে আবার নানা-বিরুদ্ধ-মতবাদ প্রচারিত হোল। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের সনাতনী কথা শুনবার কাণ করিনি ব'লে আমাদের দেশে নবীন-মতের সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে। শ্রীচৈতন্য বাংলার দ্বারে-দ্বারে অযাচকে সকলকে চেতনোন্মুখ কর্‌বার জন্য হরিদাস ও নিত্যানন্দকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা যে নিত্য হরিদাস--চেতনের নিত্য সহজ-ধর্ম্ম যে হরিদাস্য--হরিদাস্যই যে নিত্যানন্দ দান করতে পারে--যাতে খণ্ড, অনিত্য আনন্দের তৃষ্ণা আর থাকে না--যাতে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হয়, আমরা চৈতন্যদেবের সেই কথায় উদাসীন হ'য়ে--আমাদের ঘরের অমূল্যনিধি ছেড়ে বাইরে কাঁচ অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছি।

আমরা বেঙের আধুলি-সম্বল কর্ম্মকাণ্ড নিয়ে ভগবদ্ভক্তের কার্য্য-কলাপের সমালোচনা কর্‌তে যাই! আমরা মনে করি,--'আয় চাঁদ, আয় চাঁদ, আমার যাদুমণির কপালে টিপ্ দিয়ে যারে চাঁদ'--এইরূপ ছেলে-ভুলানো ছড়ার ন্যায় বুঝি ভগবদ্ভক্তির কথা! বহু নিষ্কপট ও সমর্থ লোকের সঞ্চিত বহু গ্যালন রক্ত---'গৌড়ীয়'পত্র ও 'গৌড়ীয়মঠ'। বাহ্যদর্শনে অন্য লোক হতে Suck-up করা--ভগবানের সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত রক্ত। তথাপি লোকে শ্রীচৈতন্যের কথা একান্তভাবে শুনুক্--বুঝুক--আর নিজেদের সত্যিকার মঙ্গল গ্রহণ করুক্।

মানবজাতি বল্‌ছে,---প্রত্যক্ষবাদের কথার দ্বারা যদি সময় নষ্ট কর্‌তে পারেন--সে নকল কথার যদি ইন্ধন দিতে পারেন--রোগি-সমাজের যদি dictation শুন্‌তে পারেন, তা'হলে আপনাদিগকে 'সাধু' বল্‌ব। আমাদের জনসমাজের নিকট ঐরূপ 'সাধু হওয়ার প্রতিষ্ঠা'কে মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করে প্রকৃত চৈতন্য চরণানুচর সাধুগণের পথ অনুসরণ কর্‌ব।

কেউ বললেন,---Maternity home করাই মহাপ্রভুর দয়ার উদাহরণ। পাশ্চাত্ত্য দেশের Maternity home-এর অনুসরণে লোক-দেখানো গলায় মালা দেওয়া লোক দু'পয়সা পকেটস্থ করবার জন্যে, আর দয়া কর্‌বার নাম ক'রে নিজের ব্যভিচারটা গোপনে চালাবার জন্য ঐ সকল কারখানা খুলে লোকগুলিকে অমন্দোদয়-দয়ানিধি চৈতন্যের দয়া বুঝতে বাধা দিল। সে রকম ধরণের কার্য্যে লোকপ্রিয়তা কেনা হতে পারে, কিন্তু সেরূপ আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মহাপ্রভুর অকৈতব দয়া-ধর্ম্মের কাছ থেকে বহুযোজন দূরে। আচারহীনা নারীগণকে প্রসব করিয়ে রক্ষা করা---নীতিশাস্ত্রের নামে দুর্নীতির প্রশয় দেওয়া, অনেক স্থানে মহাপ্রভুর দয়ার উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গৌড়ীয়মঠ বলছেন, এ সকল ভণ্ডগুলিকে Indian Penal Code যে শাস্তি দিতে পারে না, তা' অপেক্ষাও অধিক শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের দণ্ডলীলায় এ শিক্ষা দিয়েছিলেন। হরিদাস ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে মহাপ্রভুর সেবার

নাম করে মাধবীমাতার নিকট হতে তণ্ডুল ভিক্ষা করেছিল। সেই ছোট হরিদাসের ওপর বিধাতার death sentence ব্যবস্থাপিত হয়েছিল। ত্যাগীর বেশ নিয়ে পরদার হরণ করবার প্রবৃত্তি—কৌপীন নেবার প্রতিষ্ঠার সহিত গোপনে কপটতা-ধর্ম্মবশে পরদার হরণ করবার প্রবৃত্তি—যার, চৈতন্যদেবের দুয়ারে তার দ্বার-মানা—চৈতন্যদেব বা তাঁর দাসগণ তার মুখ-দর্শন করেন না—তার শাস্তি নদীতে ডুবে মরা,—

"প্রকৃতি দর্শন কৈলে ঐছে প্রায়শ্চিত্ত।"

প্রপঞ্চকের কপটতা-লাম্পট্য নষ্ট করবার জন্য কামদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলা ইহজগতে প্রকাশিত। শ্রীনিবাস, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর নাম দিয়ে যে রাইকানুর গান হচ্ছে, গৌড়ীয়মঠ তার বিরুদ্ধ-প্রচারক, কিন্তু রাইকানুর শুদ্ধ-গীতিতে নিজ মঙ্গল-সাধনাই মঠের প্রচার। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালুব্ধ বদ্ধ-জীবকে কখনই পাশমুক্ত সদাশিবের পানযোগ্য কালকূট পান করতে যেতে দিবেন না। এটা দেখতে আপাততঃ বড় নির্দ্দয়তার কার্য্য, কিন্তু গৌড়ীয়মঠ জীবকে ওরূপভাবে বঞ্চনা করে বদ্ধ-জীবের রুচির অনুকূল প্রেয়ো জিনিষগুলি যুগিয়ে দিয়ে তাদের ভীষণ হিংসা করবার পক্ষপাতী নন। রোগীর কটূক্তি সহ্য ক'রে—রোগি-সমাজের কাছে অপ্রিয় হয়েও গৌড়ীয়মঠ রোগীকূলের পরিণামে মঙ্গল দেখছেন। এটা কত বড় প্রতিষ্ঠাত্যাগ—এখানে কত-বড় পরোপকার-প্রবৃত্তি—বঞ্চিত মনুষ্য-সমাজ তা' বুঝবে না।

গৌড়ীয়মঠের প্রচারের মত জগতের পারমার্থিক ইতিহাসে এমন মহা-বিপ্লবের ইতিহাস আর ক'টা হয়েছে, পারমার্থিকগণ বিচার করবেন। গৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক লোক আত্মোৎসর্গ করেছেন মানুষের কাছে যেটা প্রথম-মুখে সম্পূর্ণ অভিনব—কত বড় একটা বিপ্লব, সেইরূপ কথা প্রচার করছেন। তাঁরা জগতের লাখ লাখ পণ্ডিতন্মন্য ব্যক্তিগণের ভয়ে ভীত নহেন—তাঁরা লম্পটগণের কাপট্য লাম্পট্য প্রশ্রয় দেবার জন্য প্রস্তুত নহেন। জগতের অসংখ্য অসংখ্য কৃষ্ণবহির্ম্মুখজীবনের দুর্ব্বুদ্ধি একচ্ছত্র অপ্রাকৃত—রাজরাজেশ্বর বিশ্বম্ভরের রাজস্ব অপহরণ করবার জন্যে যে সকল Policy devise (মতলব আঁট্ছে) করেছে, সেই দুর্ব্বুদ্ধিকে গৌড়ীয়মঠ যূপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত, তাঁরা জগতের কাছে এক পয়সা চান না, তাঁরা জগৎকে পূর্ণবস্তু—চেতনবস্তু চৈতন্যদেবকে সম্পূর্ণভাবে প্রদান করতে চান। তাঁরা বলেন,—যার কাছে যা কিছু সম্পত্তি গচ্ছিত আছে, সব সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণের চরণে ডালি দাও। যাঁরা যাঁরা সর্ব্বস্ব ভগবানের চরণে দিতে প্রস্তুত, গৌড়ীয়মঠ তাঁহাদিগকে ভগবৎপাদপদ্মের পূর্ণসন্ধান দিয়ে থাকেন।

গৌড়ীয়মঠ খাওয়া-দাওয়ার জন্য একটা আড্ডা নহে—মলমূত্রের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য খাওয়া দাওয়া বা ধূমপানের দোকান খোলা গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য নহে। ধূম-ধামপ্রিয়, কৃষ্ণভক্তি বিনা ইতরকার্য্যতৎপর ব্যক্তিগণকে সত্যকথা শুনবার অবসর দিবার

জন্যে—তাদের মঙ্গল করবার জন্যে গৌড়ীয়মঠের উৎসবাদি।

কৃষ্ণের উৎকট প্রেমাকে নাকচ ক'রে নিজের ঘৃণিত লাম্পট্য বৃদ্ধি কর্‌বার জন্য আমরা ভগবান্‌কে "নিরাকার" শব্দে অভিহিত কর্‌তে চাই। ভগবানের নিত্যরূপ নেই—ভগবান্ হস্তপদাদি-রহিত হ'লেই আমরা রূপবান্ ও হস্ত-পদাদি-সহিত হ'য়ে বেশ দুনিয়া লুটতে পারি। আর ভগবানের যদি রূপ না থাক্‌ল—চক্ষু না থাক্‌ল তা' হ'লে আমরা গোপনে ব্যভিচার করি—আর যা'ই করি না কেন, ভগবান্ ত' আর তা' দেখতে পাবেন না! আমরা মনে করি, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাগুলি কিম্বা এই দুনিয়াটা আমাদের ভোগ্য; ভগবানের ভোগ্য নহে। এই জন্য ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ কর্‌বার জন্য আমাদের আন্তরিক চেষ্টা। এক শুদ্ধভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী সকলেই ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ করতে চা'ন। জগতের সকল মনোধর্ম্মি লোকেরই ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ কর্‌বার জন্য আন্তরিক চেষ্টা। তাঁরা মনে করেন, ভোগ আমরা কর্‌বো—প্রতিষ্ঠা আমরা পাবো—ভগবান্ পাবেন কেন?

কিন্তু গৌড়ীয়মঠ শ্রুতির অনুসরণ ক'রে বলেন,—ভগবান্‌ই সব ভোগ কর্‌বেন—ভগবানেই উৎকট আসক্তি থাক্‌বে। একটা বিচারে ও ভাষায় যা'কে 'লাম্পট্য' বলা যায়, আবার আর একটা বিচারে ও ভাষায় স্থানান্তরে তা'কেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতি বলা যেতে পারে। যখন পরা ও অপরা সকল সম্পদের মালিকই কৃষ্ণ, তখন তাঁ'র সম্পত্তি তিনি ভোগ কর্‌বেন। এতে অনৈতিকতা বা কিছু আপত্তিজনক লাম্পট্য থাক্‌তে পারে না। আবার এ জগতের জীবের পক্ষে যে লাম্পট্যটা অত্যন্ত হেয়, ঘৃণিত, সেইটাই কৃষ্ণের পক্ষে অনিন্দ্য চিদ্ধামে পরমোপাদেয় ও নিত্যরসের চমৎকারিতাবর্দ্ধনকারী।

আত্মবঞ্চক লুব্ধ-ভোগিসম্প্রদায় ও ত্যাগিসম্প্রদায় মনে করে, নরকে যা'বার জন্য ভোগ কর্‌বো ত' আমরা—দোলা ঘোড়া চড়্‌বো—অট্টালিকায় বাস কর্‌বো—ভাল ভাল রূপ দেখ্‌বো—সুন্দর গন্ধ শুঁক্‌বো—চর্ব্ব্যচূষ্য-লেহ্য-পেয় আস্বাদন কর্‌বো—মধুর স্বর শুন্‌বো—কোমল জিনিষ স্পর্শ কর্‌বো। আর ত্যাগী ও-গুলিকে বেশী দিন ভোগ কর্‌তে পারে না ব'লে, স্ত্রৈণের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করার ন্যায় ভোগ্য বস্তুগুলির ওপর ক্রোধ ক'রে একটা ফল্গুত্যাগের পোষাক নিয়ে থাকে। ত্যাগী—অতৃপ্ত-আসক্ত ক্রোধী ও ভোগী মাত্র। ঐরূপ ত্যাগ ও ভোগের কথা গৌড়ীয়মঠ বলেন না। গৌড়ীয়মঠ বলেন,—কৃষ্ণই অদ্বিতীয় ভোক্তা, কৃষ্ণই দোলা-ঘোড়া চড়্‌বেন—কৃষ্ণই অট্টালিকায় বাস কর্‌বেন—কৃষ্ণের নয়নোৎসবের জন্য যাবতীয় রূপ—কৃষ্ণের জিহ্বার লাম্পট্য-বর্দ্ধনের জন্যই যাবতীয় সুকোমল বস্তু। ইহ জগতে যা'রা পরমভোক্তা কৃষ্ণের সেবা-বিস্মৃত হ'য়ে এক একটা ছোট খাট কৃষ্ণ' সেজে ব'সেছে তা'দিগকে বিদ্ধ কর্‌বার জন্য মায়া রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের এক একটা টোপ ফেলেছে।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের ত্যাগ—গৌড়ীয়মঠের ত্যাগ—ফল্গুত্যাগীর ভূয়ো ত্যাগের মত নহে। কেউ বললেন, ইনি দশহাত কাপড় ত্যাগ করে পাঁচ হাত কাপড় পরছেন—কেউ বললেন, তিনি জুতো ত্যাগ করেছেন—কেউ বললেন তিনি খাওয়া পরিত্যাগ করেছেন, এসব ত্যাগের চেহারা ভোগীর কাছে বাহাদুরী নিতে পারে, কিন্তু মহাপ্রভুর ভক্তগণের কাছে এগুলির কপটতা ধরা পড়ে।

গৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত ধন-প্রাণ ভগবানের উপলব্ধি করিয়ে দিচ্ছে। যাঁহার যে পরিমাণে উপলব্ধি, তিনি তাতে সেই পরিমাণে সহায়তা করেছেন। Stipend-holder—পুরুৎশ্রেণী—গুরু শ্রেণীর মত নিজে খাবো দাবো আর কতকগুলি মরণশীল আত্মীয়স্বজন নামধারীর ব্যভিচার, লাম্পট্য, ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রশ্রয় দেবো, এইজন্য গৌড়ীয়মঠ এক কাণা-কড়ি কখনও সংগ্রহ করেন না। গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার শেষ 'পাই'ও পর্য্যন্ত জগতের (ভ্রান্তিজন্য ক্লেশপর) ইন্দ্রিয়তর্পণের কথায় ব্যয়িত হয় না। গৌড়ীয়মঠের লোকেরা বেশী মোহনভোগ খেতে পারেন না—চা, পান, ডিম্ব, কর্কট, রক্তমাংস, তামাক, নস্য, চুরুট, সিল্কের গেরুয়া, ডিম্ব প্রভৃতি পান-ভোজনে রত হতে পারেন না—সকল প্রকার বোগ্‌ড়া মোটা চাল, বিশ্বম্ভর যাহা প্রসাদরূপে প্রদান করেন, তাহাও অত্যুত্তম প্রসাদসহ গ্রহণ করেন—উদয়াস্ত ভগবৎসেবার জন্য নিযুক্ত থাকেন।

চৈতন্যচন্দ্র প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বের লোক—তিনি মরে গেছেন এরূপ নহে—তিনি নিত্যকাল আছেন—তিনি গৌড়ীয়মঠকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করেছেন। শ্রীগৌরহরি জগতের অতি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ জনগণের দ্বারা মঠবাসীকে দণ্ডিত জীবের ন্যায় কেবল ব্যবহারিক দুঃখও প্রদান করেন না। তজ্জন্য বৈষ্ণবে গুরুবুদ্ধিবিচার নষ্ট না করে মঠসেবকের সেবকগণ তাঁদের সেবা করেন। মূঢ়গণেরও হিংসা করতে দেন না।

প্রকৃতি রচিত বিশ্বে গুণের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। যিনি সেই গুণের ক্রিয়ার আবাহন করেন, তিনি পুরুষাভিমানী—নিজেই কর্ম্মকর্ত্তা প্রভৃতি বিচার করেন। "বিশ্বং একাত্মনাপশ্যেৎ" এক অদ্বিতীয় বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়া সকলের চেষ্টা একই বস্তুর তাৎপর্যে পর্য্যবসিত না হওয়ার দরুণ বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" শ্লোকের দ্বারা জানা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলেই সেই কর্ম্ম প্রাকৃত হয়। কিন্তু কৃষ্ণই সর্ব্বকারণকারণ। জীব নিজ-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াই আপনাকে কর্ম্ম-কর্ত্তা মনে করে। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, আদি, গোবিন্দ, সর্ব্বকারণ-কারণ ও পরমেশ্বর। তাঁহার ত্রিশক্তি বিষম-ধর্ম্মে অবস্থিত না হইয়া সমতাৎপর্য্যপর। পরমেশ্বর একজন, কিন্তু প্রাকৃত জগতে কর্ত্তৃত্বকামী জীব অসংখ্য। যেখানে প্রেমের ধর্ম্ম, প্রীতির ধর্ম্ম, নির্ব্বিবাদধর্ম্ম বা পরমা শান্তির ধর্ম্ম সেখানে কর্ত্তৃত্ব

একজনের। বদ্ধজীবসমূহ—গুণজাত; কিন্তু পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। মুক্তপুরুষগণের ক্রিয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহের উদ্দেশ্যে হওয়ায় তাহাও একতাৎপর্য্যপর। 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ' পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। এখানে সত্ত্বের সঙ্গে রজের মিল নাই, রজের সঙ্গে তমের মিল নাই—এইরূপ পরস্পর বৈষম্য।

জীব সর্ব্বদা আনন্দ ধর্ম্মের প্রার্থী। জীব নিজ-সত্তার বিনাশ আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং কখনও অচিৎ ধর্ম্মেরও অভিলাষী নহেন। বিশ্রাম বা নিদ্রার পর পুনরায় নবজীবনই জীব আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। গৌণজগতের প্রভু হইবার চেষ্টাই অভক্তি। এখানে প্রভুত্ব বা স্বাধীনতা কামনা ভৃত্যত্ব বা অধীনতা কামনা ছাড়া আর কিছু নহে। এই জগতের স্বাধীনতা অধীনতারই প্রচ্ছন্নস্বরূপ। কিন্তু সাচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বরের অধীনতা বা ভৃত্যত্ব কামনায়ই পূর্ণতমা স্বাধীনতা লাভ হয়। কারণ ভগবান্ স্বরাট্ পুরুষোত্তম, সর্ব্বতন্ত্র—স্বতন্ত্র। "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" ও "তথা ন তে মাধবতাবকাঃ"। জীব ভগবানের অনুগ্রহ রজ্জু যেকাল পর্য্যন্ত ধরিয়া থাকেন, সেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নাম হয় 'সেবক'। যাঁহারা মনে করেন, আমরা জড়জগতে স্বাবলম্বী, নিরপেক্ষ, তাঁহারাই বস্তুতঃ পরাপেক্ষাযুক্ত। আর পরমেশ্বরের অধীন ব্যক্তিগণই নিত্য-স্বাধীন।

বাস্তবিক স্বাধীনতা লাভ হইলে "আমরা শ্রীহরির নিত্য-অধীন"—এই বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাদের ইন্দ্রিয় প্রতি পদে পদে পরাপেক্ষাযুক্ত, এমনকি আমরা যাহাকে 'অদৃষ্ট' বলি, তাহা পর্য্যন্ত পরাপেক্ষাযুক্ত। সেই 'পর' বস্তুটি কি? তাহাই পরাৎপর বস্তু। যে বস্তুর পরিপূর্ণতা আছে, তাহাই 'পর'।

আর ইহার বাহিরে যাহা আছে, তাহাতে মিশ্র তত্ত্ব, রজঃ ও তমোধর্ম্মের অনুশীলন হইয়া থাকে। জাগতিক সত্ত্ব-গুণান্বিত ব্যক্তি রজঃ ও তমের Share-holder.

জগতে সাত্ত্বিক-কর্ম্মবীর, ও তামসিক-কর্ম্মবীরগণ আছেন। সাত্ত্বিক-কর্ম্মবীরগণ সৎকর্ম্ম করেন; কিন্তু তাঁহারা বিশুদ্ধ-সত্ত্বের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, যেমন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বাসুদেবকে অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞের আবাহন করিয়াছেন। রাজসিক-কর্ম্মবীরগণ অপরের right-এর উপর encroach করেন। তাঁহারা অনেক সময় অতি বিরাগ-বিশিষ্ট হন। আর তামসিক-কর্ম্মবীরগণ অন্যায় বা পাপ করিতে নিজের অস্তিত্বের ধ্বংস করিয়া থাকে। ভক্ত-সম্প্রদায় হরিকথা শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হন। কপট-সম্প্রদায় হরিকথা শ্রবণ করিতে ক্লেশ বোধ করেন। কপটতা ত্যাগ করা বা শুদ্ধ হরিসেবায় প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। জগতে হরিভক্তি প্রচারিত হওয়া অপেক্ষা হরিবৈমুখ্য প্রচার হউক, ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। যাঁহারা রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী, তাঁহারা কৃষ্ণাশ্রিত-জনকেও তাঁহাদের ন্যায় জ্ঞান করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদৃশ নহেন। মহাজনবর্গের পথের অনুগমনই পরমধর্ম্ম। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী বলিয়াছেন, —'কালঃ কলি' অর্থাৎ মহাজনের পথকেও হরিবিমুখগণ বিপদ্সঙ্কুল করেন। তাঁহাদের

বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার কারণ এই যে, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রবৃত্ত লোকসংগ্রহের জন্য বা প্রাকৃতইন্দ্রিয়তর্পণমূলে প্রতিষ্ঠিত।

অবান্তর লক্ষ্যসমূহ অন্তরে প্রবেশ করিলে কখনই শুদ্ধভক্তির স্বরূপোপলব্ধি ঘটে না। ভক্তির নামে অভক্তিমিশ্র-ব্যাপারসমূহ পাঠকের ভক্তিবৃত্তির ন্যূনতা সাধন করে। আমরা বিষয়মিশ্রা চেষ্টাকে কখনই শুদ্ধভক্তি-প্রচারিণী চেষ্টা বলি না। অন্যাভিলাষিতা অন্তরে প্রবাহিত হইলে কখনই অবিমিশ্রা ভক্তির সম্ভাবনা নাই। যাহারা সকল কথা বুঝিতে পারে না, অথবা জড়ভোগময় স্বার্থে আবৃত্ত হইয়া অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না, তাহারা ভক্তির নামে অন্য গৌণ চেষ্টার অবতারণা করিয়া ফেলে। যেখানে বিষয়-ব্যাপার সেখানেই হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি ধর্ম্ম। কৃষ্ণের বিষয়ের স্বভাব এই যে, যাঁহারা কৃষ্ণেতর অসদ্বস্তুসেবাকে কৃষ্ণসেবাসহ সাম্য-জ্ঞান করিয়া অসাম্প্রদায়িক বা নিরপেক্ষ মনে করেন, তাঁহারা যতই কেননা আপনাকে ভক্তিতে অবস্থিত জানুন, স্বকর্ম্মবিপাকে কেবল বিষয়েই অবস্থিত হন।

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভব-বন্ধ।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্য, ৬ষ্ঠ ১৯৯ সংখ্যা)

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই মূল বস্তু। যাহারা কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য ছাড়িয়া নিজে উন্নতিবাদী হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষফলোদ্দেশ্যে কৃষ্ণেতর বিষয়কে স্বীয় চেষ্টার উদ্দিষ্ট বস্তু জ্ঞান করে, তাহাদের ঐ প্রাকৃত-অর্থ-লাভ, ইন্দ্রিয়সুখেপ্সা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি শুদ্ধ কৃষ্ণসেবার ফল নহে—এই কথা সাধুগিদের মুখে, লেখনীতে উপদেশ-সমূহে অসংখ্য স্থলে কথিত হইয়াছে। আমরা তাহা ছাড়িয়া যদি ভববন্ধকারক প্রাকৃত-দ্রবিণ, জাতরূপ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া হরিভজন সম্পাদিত হইল মনে করি, তাহা হইলে আমরা অন্ধশব্দবাচ্য বিষয়ী হইব।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী—এই তিন প্রকার কৃষ্ণাভক্ত। যিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণভজন-ভাবমাত্র প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে শুদ্ধভক্তগণ মিছাভক্ত বলেন। মিছাভক্তগণের আচার, বৈষ্ণব-সদাচারের সহিত বহির্দ্দর্শনে এক হইলেও ভক্ত—আসল, মিছাভক্ত—মেকী। নকল বা মিছাভক্ত কৃষ্ণেতর সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত; কেবল লোক-বঞ্চনার জন্য কপটতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদাচার প্রকাশ করিতে ব্যগ্র। মুমুক্ষুর উদাহরণস্বরূপ রামদাস বিশ্বাস, বুভুক্ষু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার, অন্যাভিলাষী কালাকৃষ্ণদাস ও বল্লভভট্ট; শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় সত্য-ভজন পথাশ্রিত বলিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত কমলাকান্ত বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈত প্রভুপাদের সেবা করিতে গিয়া, দুর্ভাগা সেবক-প্রায় ব্যক্তিগণ কিরূপ বিপৎসঙ্কুল, তাহার আদর্শ জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন। শঙ্কর, মাধব, মায়াবাদী, নাগর প্রভৃতি

শ্রীঅদ্বৈত পূর্ব্বানুচরগণ, রূপ কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুচরগণ; অতিবাড়ী জগন্নাথদাস প্রভৃতি গৌরপূর্ব্বদাসগণ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি কবিরাজ গোস্বামীর অনুগাভিমানিগণ শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া তদিতর কোনও বস্তু স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা শ্রীনাম-ভজনের ব্যাজে নামাপরাধ করিয়া থাকেন। যাহাতে অপ্রাকৃতচিত্ত কৃষ্ণোন্মুখগণের নিঃশ্রেয়স লাভ ঘটে, সেই শুদ্ধভক্তিকে কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্ত মিছাভক্তগণ নিজ নিজ বিষয়ের নিন্দা বলিয়া জানিয়া ব্যথিত হইয়া শ্রীভগবানের চরণে অপরাধ করেন। শুদ্ধভক্তগণের প্রদত্ত কল্যাণমালাকে নিজ ক্ষুদ্র বিষয়-সমূহের সর্ব্বনাশের হেতু অপ্রাকৃত বিষয় হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হন।

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকং" শ্লোক "কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত কপট-বৈষ্ণববেশে" প্রভৃতি পদ্য; "বাহ্যভ্যন্তরয়োঃ সমং বত কদা বীক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্"—এই মহাপ্রভুবাক্য অবশ্যই কপটিগণের বজ্রসদৃশ, কিন্তু অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে সাধুগণের হৃদয় কুসুম হইতে কোমল এবং ভক্তি-প্রতিকূলচেষ্টা নিরসনে বজ্র হইতেও কঠিন।

ততো দুঃশঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।<br>সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীআচার্য্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামীকে উত্তমা ভক্তি বলিতে গিয়া যে প্রতিকূল-অনুশীলন এবং কৃষ্ণেতরাভিলাষ, অনুকূলজ্ঞানে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের আবরণ বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন, তাহা বর্জ্জন না করিলে হরিভক্তি হয় না।

# তৃতীয় অধ্যায়

## বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্

(১)

"হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া শমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।"

বস্তুজ্ঞানের অভাবে বস্তুসম্বন্ধে কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিকৃত ধারণা এবং আমাদের প্রয়োজনতত্ত্বের নির্ণয়ে অসমর্থতা-হেতু আমরা অনেক সময় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্বয়ং হিতাহিত বিবেচনা করিতে অসমর্থ হই। সেই বিপৎকালে আমাদের উপদেশকসূত্রে যিনি স্বীয় আদর্শচরিত্র প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে তদনুগমনে আহ্বান করেন, সেই অভাবমোচন বিপদুদ্ধারণের অনুসরণই আমাদের একমাত্র কৃত্য হয়।

ভালমন্দে পরিপূর্ণ ধরায় অবস্থিতি-কালে আমাদের প্রার্থনীয় বিষয়ে উত্তমের অনুসন্ধান, অধমের পরিহার, প্রকৃত প্রিয়ের অনুগমন, অপ্রিয়ের ত্যাগ, শ্রেয়ের প্রার্থনা, অমঙ্গলের বর্জ্জন প্রভৃতি তাৎকালিক মতির চিহ্ন সঙ্কুচিত-চেতনপশুজ্ঞানেও পরিলক্ষিত হয়। দাতার দানের ভিক্ষু-সূত্রে আমরা ভাল, 'উত্তম', 'শ্রেয়'-'মঙ্গল' প্রার্থনা করি। যে দয়া আমাদের অনন্তকাল অমন্দ বা অমঙ্গল প্রসব করেনা, সেই দয়ার দাতাকে আমরা অমুক্তহস্ত 'কৃপণ' স্বল্পবদান্য বলিয়া মনে করিতে পারি না। তাঁহাকে 'দানসাগর'—স্বভাবসম্পন্ন জানিয়া অপ্রীতিকরফলোদয়কারক দানের প্রার্থী হইনা। কোন অজ্ঞ উপদেশকব্রুবের নিকট আমাদের দানপ্রার্থনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে তাহাতে অজ্ঞানজন্য বিপৎপাত অবশ্যম্ভামী জানিয়া অভিজ্ঞ সত্যমূর্ত্তি স্বরাট্ পদার্থের বিবর্ত-মণ্ডিত গৌণী ভিক্ষার পরিবর্ত্তে মুখ্যা ভিক্ষাই আমাদের প্রার্থনীয় হইয়া পড়ে।

আমাদের বর্ত্তমান অস্তিত্বে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংগ্রহসমষ্টি মানস-ভৈক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। বাচনিক ও কায়িক, সূক্ষ্ম ও স্থূল ভৈক্ষ্যদ্বয় মানস-ভৈক্ষ্যের অনুমোদন অপেক্ষা করে। মানস-ভৈক্ষ্য নিয়ন্তৃরূপে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়োভাবদ্বয়ের বিচার করে। তজ্জন্য অমন্দোদয়া দয়াই দয়ানিধির নিকট প্রার্থনীয়া। ত্রিতাপক্লিষ্ট মানবের হৃদয় খেদে অভিভূত;

উহা অপ্রার্থনীয় রজোরাশি-সদৃশ। যাঁহার অমন্দোদয়া দয়া হেলায় ঐ ত্রিতাপাবর্জ্জনাকে ধূলির ন্যায় অনায়াসে উড়াইয়া দেয়, সেই দয়ানিধির দয়াই আমাদের প্রার্থনীয়। ধূলিরাশি উড়িয়া গেলে হৃদয়াকাশ নির্ম্মলতা লাভ করে; তখন বায়ু সৌগন্ধ বহন করিয়া আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করে। নিরানন্দের অভাব কেবল প্রার্থনীয় হইলেও মুখ্য আত্মানন্দই আমাদের আনন্দ বিধান করে।

আমাদের অশিক্ষিত ভাণ্ডার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সাহায্যে সম্বর্দ্ধিত হইলেও পরস্পর বিরোধী শিক্ষা-প্রণালী আমাদের অশান্তি বর্দ্ধন করে। বিরুদ্ধপক্ষের কোন্ কোন্ বাক্যে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া কোন্ কোন্ বাক্য পরিহার করিতে হইবে—এই মীমাংসার সমাধান করিতে গেলেও আমাদের অশান্তি বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। যাঁহার দয়া আমাদের শিক্ষক-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রণালীতে পরস্পর বিবদমান-ভাবসমূহের মধ্যে প্রীতিসম্বর্দ্ধন করে, সেই দয়ানিধি অমন্দোদয়কারিণী দয়ার বিতরণে আমাদিগকে কৃতার্থ করুন্।

অদ্বয়জ্ঞানে কোন বিরোধ নাই। তাহা ভগবন্নিষ্ঠ করিয়া বাস্তব সত্যের প্রকাশে আমাদের অশান্তচিত্তে কেবলমাত্র শান্তি বিধান করে না, পরন্তু মুখ্য আনন্দে অশান্ত হৃদয়কে পরিপ্লুত করায়। সচ্চিদানন্দের পরিবর্ত্তে রজঃসত্ত্বতমোগুণত্রয়ের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিভাবের অস্তিত্বে যে সকল পদ্ধতি সুচারু ও সুষ্ঠু বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা অপর গুণজাত ভাবের সহিত বিরোধ আচরণ করিয়া অন্যাভিলাষের সৃষ্টি করায়। তাহাতে আমাদের যথেষ্ট আচরণ বিভিন্নদিকে গমনশীল হইয়া হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলে। কখনও বা প্রবৃত্তির বিপরীত ধারণায় জাড্য আসিয়া শান্তির আদর্শ লাভ করিবার প্রতারণা বিস্তার করে। সেই তাৎকালিকী ক্ষিপ্রতায় অসহিষ্ণুতা দেখা যায়, তাহা অনধিকারীর অসংযত উচ্চাধিকারলাভের পিপাসা তাহাতে অবস্থান প্রভৃতি বিচার যাবতীয় চেষ্টাকে স্তব্ধ করিয়া জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার একত্র সমাধির জন্য চেষ্টিত হয়। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের হস্ত হইতে চিরমুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে নির্ব্বেদ-বিচারের আবাহন করিয়া থাকি। যখন সেই প্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষা-লাভের প্রস্তাবে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরাহিত্যরূপ নিষ্ফলতা আহূত হয়, তখনই আমাদিগকে অহংগ্রহোপাসনার প্রবল বিক্রম বাস্তব-সত্যের সেবা-বিচারকে ঢাকিয়া ফেলে। কখনও বা উদ্দাম প্রচণ্ড বাসনা মানসরাজ্যে প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া আলেয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়। কখনও মিশ্রাধিকারে হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির কল্পিত আকাশ-কুসুমের গন্ধে আমরা আপ্লুত হইয়া আত্মার নিত্যাবৃত্তি ভগবদ্ভক্তিকে অনাদর করিতে শিখি।

এই তিন প্রকার বিচারের হস্ত হইতে নিত্যকালের জন্য মুক্ত হইতে হইলে নিত্যাবৃত্তিতে অবস্থানই আমাদের সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ-পথের পথিক করাইতে সমর্থ হয়। যে কালে প্রেয়োবিচারে আমাদের বুদ্ধি জড়তা লাভ করে, তৎকালেই আমরা আমাদের নিজ

নিত্যাবৃত্তিকে অনিত্য বিচারসমূহের দ্বারা অবৈধভাবে সংমিশ্রিত করিয়া আত্মার নিত্যা বৃত্তি হইতে অর্থাৎ নিজস্বরূপজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া ন্যূনাধিক বিরূপের আশ্রয় গ্রহণ করি। ফলভোগ হইতে মুক্তি হইলে আমরা ফলত্যাগী হই সত্য; কিন্তু সেই ফলত্যাগ পুনরায় আমাদিগকে উচ্চশিখরদেশ হইতে নিম্নে অধঃপাতিত করায়। আমরা আশ্রয়রহিত হইয়া নিজ কর্ত্তৃত্ব-পোষণমূলে আত্মম্ভরিতার আবাহন করি, এবং তদ্দ্বারা বাস্তবসত্যের নিত্যকৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া অনিত্য নশ্বর জগতের জাগতিক বস্তুগুলিকে আমাদের 'তারক' বলিয়া মনে করি।

যখন দেখি, উহারা আমাদিগকে আমাদের নিত্যাভিলাষ পূরণ করিতে অসমর্থ, তখনই পন্থান্তর গ্রহণের পদ্ধতি আমাদের কৌতূহল আকর্ষণ করে। যখন নিত্যানিত্য-বিবেকবশে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান এবং তত্তৎমিশ্রাবরণসমূহ আমাদিগের পক্ষে দুরাশাজনক হয়, তখনই আমরা আশান্বিত হইয়া আশ্রয়ের আশ্রিত হইবার যত্ন করিয়া থাকি। আমাদের প্রিয়প্রাপ্তির অভিলাষ যখন চিদচিদ্‌বিবেক, নিত্যানিত্যবিবেক ও আনন্দানন্দাভাব-বিবেকের সুষ্ঠু মীমাংসা করিতে সমর্থ হয়, তখনই প্রেয়োবিচার শ্রেয়ের সহিত কৈবল্য লাভ করে--ইহাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। এই অন্যাভিলাষিতা-শূন্য, জ্ঞান কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত আত্মার বৃত্তি মূল-আকর্ষক, নিত্যপূর্ণজ্ঞানময় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়বস্তুর অনুকূলসেবায় নিযুক্ত হইলে ভেদজগতের পরস্পর বৈষম্যবিশিষ্ট গুণত্রয় আমাদের উপর প্রভুতা করিতে অসমর্থ হয়। সেই কালেই আমাদের আত্মার নিত্যসেবা-প্রবৃত্তি বা আরাধনা আরাধ্যের উদ্দেশ্যে বিহিত হয়। তখন আমরা বলি, প্রবৃত্তির অধিষ্ঠাতৃদেব ব্রহ্মার ভজন করিয়া কর্ম্মরাজ্যে প্রবৃত্তজনগণ 'লাভ উঠাইতে' থাকুন অথবা নিবৃত্তাকাঙ্ক্ষিজনগণের আরাধ্য রুদ্রদেবের আরাধনাদ্বারা অনিত্য-বাসনাসমূহ ধ্বংস করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম অনিত্য-গঠনদ্বয়ের সংহারপূর্ব্বক ত্যাগিগণ নিত্যকালে জড়নির্ব্বিশেষভাবের উদয় করাইয়া জাড্যজনিত নিরানন্দের বিলুপ্তি সাধন করুন্। তখন তাঁহাদের ভজনদ্বারা আমাদের অভীষ্টলাভের সাফল্য কি পরিমাণ হইল, তাহার বিচার আসিয়া আমাদিগের সেই পথে অভিযান পরিবর্ত্তন করায় এবং নিঃশক্তিক ব্যাপারকেই বাস্তব বস্তু কল্পনা করিয়া সচ্চিদানন্দ নিত্যধর্ম্মত্রয়ের উন্মূলনমুখে তাহাদের অবস্থিতির সাপেক্ষধর্ম্ম বিনাশ করিয়া থাকে। কিন্তু আকর্ষক অদ্বয়জ্ঞান একমাত্র বাস্তব যাঁহাতে নিত্যানন্দ সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত হইয়া স্বয়ংরূপের অভিব্যক্তি করান, তাহার বিচিত্রবিলাসভূমির জ্ঞানাভাবরহিত ও আনন্দহীন গগনকে নির্জ্জিত করিয়া নিত্যকাল নিরবচ্ছিন্ন-আনন্দপূর্ণ পরব্যোমপ্রদেশের অত্যুন্নতার্দ্ধ-সমন্বিত বৈকুণ্ঠ দর্শন করায়। সেই সচ্চিদানন্দাধারের আধার ও আধেয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব জড়বিজ্ঞান হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-রূপ যুগপৎ প্রকটাপ্রকট বৃন্দাটবী সচ্চিদানন্দবিগ্রহের নিত্য উপকরণাবলীর সমাবেশ-বৈচিত্র্য আমাদিগকে কৈবল্য-লব্ধ চেতনাধিষ্ঠানে চিন্ময়রসযুক্ত

করে। আর সেই নিত্যাভক্তির অত্যুন্নতাবৃত্তিবৈশিষ্ট্য আমাদের ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হইতে মধুরিমার শ্রেয়স্ত্ব, উপাদেয়ত্ব ও মর্য্যাদা উৎপাদন করাইবার বুদ্ধিযোগ প্রদান করে। তখন আমরা শ্রীকৃষ্ণের গান গাহিতে থাকি—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।"

অযোগীর যোগসাধন-প্রবৃত্তি অনিত্যা এবং কুযোগীর অবৈধ যোগসাধনপ্রবৃত্তি অনিত্যা এবং বিধিসঙ্গত নহে—"যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তাঃ" এই কৃষ্ণগান শ্রবণের পরও যেন আমাদের কল্পনা রাজযোগের বা হঠযোগের যোগ্যতারূপ যুক্তিতে আবদ্ধ না হয়। আত্মার নিত্যাবৃত্তি উন্মেষিত হইলে আত্মার সুষুপ্তিতে জড় গগনান্তর্গত মনোবুদ্ধি অহঙ্কার এবং ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম, উহাদের মাত্রাও স্পর্শসমূহ লইয়া বাধা দিতে পারেনা। অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদির যোগও তাদৃশ যোগের যোগ্যতা আমাদের প্রেয়োবিচারকে বিতাড়িত না করিলে আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রবিবাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ এবং ত্রিতাপ ক্লেশলাভরূপ কর্ম্মভূমিকার বিচার হইতেও অবসর লাভ করিতে পারিনা। অন্যাভিলাষ আসিয়া আমাদের নিত্যচিদানন্দময় অধিষ্ঠানকেই ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে, আমরা বিরূপকে স্বরূপের বিবর্ত্ত বলিয়া জানিতে পারিনা।

জীবের চরমকল্যাণ-প্রকটনকার্য্যই দয়ার অমন্দোদয়কারিণীমূর্ত্তি। আমরা যেকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তির স্বরূপবিচারে অসমর্থ থাকি তৎকালাবধি জ্ঞানের তিক্তবিচারে আমাদের বিরক্তি ঘটেনা এবং ত্রিদণ্ডি-সরস্বতীপাদ কথিত—

"তাবদ্‌ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিক্তীভবে-
ত্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোকবেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানাবহির্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ।।"

শ্লোকের বিচার আমাদের হৃদয়ে উদিত হয়না। দুর্ভাগ্যকেই আমরা আমাদের সৌভাগ্যলক্ষ্মী বলিয়া বরণ করি। মীনাদি জলজন্তুর বঁড়িশলগ্ন ভোজ্যজ্ঞানের বিবর্ত্ত হইতেই তাহাদের বিপৎপাত উপস্থিত হয়। তাহা পরিত্যাগ করিয়া বাস্তবসত্যের চেষ্টায় জড়তা-প্রদর্শনমুখে মায়াবাদতমিস্রে প্রবেশরূপ প্রবল অবিচারব্যাঘ্র আসিয়া গ্রাস করে। সেই মুক্তি ব্যাঘ্রীর কবল হইতে পরিত্রাণ না পাইতে পারিলে অঘ-বকাদির দ্বারা বাস্তব আকর্ষকবস্তু বিনষ্ট হইয়াছে—এরূপ আশঙ্কার উদয় হয়।

ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবেই অভক্তির হিংসা-প্রসূত বিচারসমূহ আমাদের উন্মেষিত চেতনবৃত্তিকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় না। মানবজাতির নিকট আবৃত সুষ্ঠু বিচার উন্মুক্ত করিলেই মনুষ্যজীবনের সফলতা হয় এবং শ্রেয়োলাভ ঘটে। মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বনে ভাষার সাহায্যে তাঁহার মনোঽভীষ্ট প্রচারকার্য্যে

সর্ব্বতোভাবে অগ্রণী শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রবর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বারিকণপিপাসুজনগণের নিকট 'উজ্জ্বলনীলমণি'র কিরণ বিস্তার করিয়াছেন। নিত্য শ্রীরূপানুগগণের আত্মবৃত্তি শ্রীরূপসেবা ও তৎসহ স্বয়ংরূপ-সেবা, স্বয়ংপ্রকাশ-সেবা, নিত্য চিদ্‌গুণানন্দসেবা, চিৎপরিকরবৈশিষ্ট্য-সেবা, চিন্ময়ীলীলা-সেবা করিতে গিয়া ওষ্ঠস্পন্দনমুখে জিহ্বা-সঞ্চালনরূপ এক প্রকার ভক্তি। অপরপ্রকার ভক্তি পঞ্চরাত্রকথিত শ্রীগুরুকৃপাপূর্ণ দিব্য-জ্ঞানশলাকার দ্বারা জড়চক্ষুর আবরণ বা ছানির উন্মোচনমুখে যে অর্চ্চা-নির্দ্দেশ—তাহাই পরমার্থলাভের অমোঘ পথ। কৃষ্ণপ্রেমদাতা মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ভগবৎপ্রকাশপরাকাষ্ঠা-প্রদর্শনকল্পে পাঞ্চরাত্রিক-বিচার ও ভাগবতবিচারের ভেদাভেদ-প্রকাশ-রূপা চিন্ময়ী প্রতীতির অচিন্ত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। উহা আত্মবৃত্তিরই গম্য; জড়োপাধিসংশ্লিষ্ট মনোভাবের অন্তর্ভুক্ত পদার্থের আসক্তিক্রমে লভ্য নহে। তজ্জন্য আমাদের বিনীত প্রার্থনা, সৎশিক্ষিত পারমার্থিক গৌড়ীয়ের প্রারম্ভিক কএকটি কথা শুনিবার পর চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বয়ংরূপ বৈচিত্র্যরূপ গোলোক বৈকুণ্ঠের যে পরব্যোমস্থশব্দ ও পরব্যোমস্থ চিৎ-পরমাণু চিদ্‌বৈচিত্র্যের বিচার, বিকাররাজ্যের সহিত সাদৃশ্যমুখে মাত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ভেদজগতের প্রকাশগত ধারণা যেরূপ দেহদেহীর ভেদ বিচার করে, বৈকুণ্ঠ গোলোকে তাদৃশ ধর্ম্ম না থাকায় বদ্ধজৈবচিন্তার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য মুক্তজৈবপ্রতীতিকে আবদ্ধ করিবেন না; অর্থাৎ যাহাতে বাস্তবসত্যের সেবকগণের সেবানুকুলা চেষ্টা বদ্ধজীবের সঙ্কীর্ণ জড়তার বিকশিত চিন্তারদ্বারা আপ্লুত, আবৃত ও বিনষ্ট না হয়, সেইরূপ অবহিতচিত্তে দর্শন কর্ত্তব্য। শ্রুতির চিন্ময়ীব্যাখ্যা ও ভক্তিপ্রতীতিমূলে দর্শন করিলে বৈকুণ্ঠবস্তুর নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাসমূহকে বদ্ধপ্রতীতি আর তৃতীয় মানের ভূতাকাশসংস্থিত চিদচিন্মিশ্রবিচারের অজ্ঞতায় জড়িত এবং তাহার সহিত সমজ্ঞান করিতে ধাবিত হইবে না।

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সকল কথা গ্রহণ করিতে না শিখিলে ভেদাভেদপ্রকাশতত্ত্বের সুষ্ঠু প্রতীতির সম্ভাবনা নাই। যাঁহাদের নিকট এই অচিৎ শক্তিপরিণত জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই স্বরূপতঃ অমায়াবাদী জীবগণ মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তির অবলম্বনে দৃশ্যজগৎ দেখিতে গিয়া বস্তুর স্বরূপ দর্শন করিবার সেবাচেষ্টা করিলেই পরমার্থ সত্যসমূহের প্রকাশগুলি দেখিতে পাইবেন।

অচিৎসাহিত্যের জড়ীয় ভাষার বা তদনুকূলজনগণের নিকট অচিৎরাহিত্যের বর্ণন করিতে যাওয়া কেবল চিৎসাহিত্যের দিঙ্‌নির্ণয় করা মাত্র। নির্ণীতদিকে গমনকারী কেবল চিদনুভবে সমর্থ হইবেন। যেখানে তাঁহার গতিরুদ্ধ হইবে, সেই স্থানকেই তিনি অসীমপ্রদেশ জ্ঞানে অগ্রসর হইবার বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইবেন। তখন জীব মায়া-রচিত জগতের কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া চিদ্‌বৈচিত্রবিলাসরাজ্যে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইবেন। তাঁহার বাসনাজনিত অভীষ্ট ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বাধকস্বরূপ ভোগ্যবস্তুরূপে

সমাহৃত হইবে। মোক্ষাভিলাষী প্রাকৃতজন প্রকৃতির প্রান্তভাগে অবস্থিত চিদ্‌বিলাসের প্রান্ত তটরেখা পর্যন্ত গমনকেই যদি অভীষ্ট সিদ্ধি জ্ঞান করেন, তবে পারমার্থিক বিচিত্রতা তাহাদের প্রাপ্য বিষয় হইবে না। সেখানে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত তটস্থাখ্য শক্তিতে আত্মপ্রতীতি স্বীয় কেবল-চিৎকণ অনুভবনীয়ের অনুভূতি দেখাইতে পারেনা। কিন্তু প্রকৃত নিত্যশান্তরসে অবস্থিত হইয়া শ্রুত্যর্থের সকল মন্ত্রের বিবদমানভাবের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া যে চারিটি মাত্র শ্রুতিবাক্যকে জড়স্বার্থপরতায় মুক্তিপ্রদ জানিয়া মহাবাক্যরূপে সংস্থান, মুণ্ডকের "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ের প্রতি অনাদর এবং উহাকে জড়বদ্ধবিচারে উচ্চাবচশ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার মন্দ জড় অপস্বার্থপর বাসনা পোষণ করে, তাহাতে জীবকে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎরূপা নিত্যা চিচ্ছক্তিপ্রকটিত শক্তিদ্বারা যে—স্বরূপাভিজ্ঞান লাভ হয় তাহার ব্যাঘাত করাইবে। তখন বিষয়বোধে অদ্বয়জ্ঞান অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া,—

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ—এই সব ভ্রম।।"

—এই ন্যায়ের বিষয়ীভূত করিবে এবং অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবের যুগপৎ বিচার হইতে পৃথক্ করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যকে জড়ভেদজগতে আনয়নপূর্ব্বক জড়াভেদ-কল্পনে তাঁহাদিগকে নির্ব্বিশেষবিচারে পারদর্শী জানিবেন। চিদ্‌রাজ্যের বিষয় ও তদাশ্রয়-সমূহের আলোকে আলোকিত না হইলে 'জাড্য' নামক তিমিরে আবদ্ধ থাকিবার ঔলূক্য-ধর্ম্ম অবসর লাভ করিবে।

দয়ানিধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সকলদাতা অপেক্ষা মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী নিত্যনির্ম্মলনাম-নিত্যরূপবিশিষ্ট অভিন্ন নাম-নামী। তিনি নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত—বৈকুণ্ঠনাম শব্দ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বপ্রাণীর নিকট বিভিন্নভাবে দিবার প্রযত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সেবায় উন্মুখতা-লাভের জন্য তাঁহার আজ্ঞাপালনই আত্মার একমাত্র বৃত্তি।

সৎশব্দ পরিবর্ত্তনশীল জগতে কতপ্রকার স্থিরমন অচঞ্চলা বুদ্ধিতে ধারণা করিয়াছে, তাহাতে কাহার কতটুকু অসদ্‌ভাব দেদীপ্যমান—ইহার একটি তারতম্যমূলে তালিকা প্রস্তুত করিলে দেখা যায় যে, রজস্তমোগুণমিশ্র অধিষ্ঠানে বিশুদ্ধসত্ত্বের অবকাশ নাই। সাত্বত বিষ্ণু-সেবা-পরায়ণ জনগণই 'সৎ' শব্দের সহিত জড়বদ্ধজীবগণের নিকট আপেক্ষিক বিচারোৎপন্ন শব্দের যে ভেদকাষ্ঠা সংশ্লিষ্ট—একথা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। ব্রাহ্মী, খরৌষ্টি ও সান্‌কি প্রভৃতি লেখপ্রণালী হইতে ভাষান্তর্গত শব্দসমূহ যেপ্রকার শিক্ষায় আমাদিগকে শিক্ষিত করে, সেই সকল শিক্ষা আমাদিগকে চেতনরাজ্যের কৈবল্যলাভের পরিবর্ত্তে অচিৎশব্দে ও ভাষায় আবদ্ধ করে মাত্র। উহা নিত্য চিদানন্দময়

সাধুগণের শিক্ষণীয় বিষয় নহে। এই কথা জানাইবার জন্যই নরজাতির মধ্যে ভক্তির স্বরূপের উপলব্ধির আবাহন প্রয়োজনীয়।

সমভাব ও সমতাৎপর্য্যবিশিষ্ট বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একের অনিত্যসংসারে ভোগ প্রবৃত্তি ও অপরের সেই সংসারে ভোগের ইন্ধন-সরবরাহ-প্রবৃত্তি দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত-ভোগী, ত্যাগী হইবার যে কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করেন তাহাতেও তাঁহাকে মূঢ়তা ও প্রাপ্তবস্তু হারাইবার অপ্রার্থনীয়া বৃত্তিতে অভিভূত হইতে হয়। যখন তিনি দেখেন যে, বন্ধুসৎকৃতিই তাঁহার ধর্ম্ম, তখন বন্ধুর সেবকসূত্রে আপনাকে নিয়োগ করেন। বন্ধুকে ভৃত্যসূত্রে নিযুক্ত করিয়া নিজে ভোগী সাজিবার অভিপ্রায় সৎশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নহে জানিতে পারেন। তখন বিবেচক ও দর্শকসূত্রে বন্ধুসেবাই পরম প্রয়োজনীয় বিচার করেন। বন্ধু যাঁহাকে ও যাঁহাদিগকে বিবিধ উপকরণের সহিত বিবিধভাবে সেবা করেন সেই বন্ধুর সেবা করা যখন সেব্যভোগী বন্ধুর সদসদ্‌বিচার স্পর্শ করে তখনই তিনি অপর বন্ধুর মহিমা অবগত হন। তাঁহাকে সকল আলোকের অধিষ্ঠান জানিয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্যই তিনি বন্ধুরূপে প্রতিষ্ঠিত, তখন সেই নিত্য ধর্ম্মের পালনমুখে যাহাতে ক্ষুৎপিপাসা, জরা, মোহ, ভয় ও শোকের বিধানকারী কর্ত্তা জানিয়া তাঁহার সেবা ব্যতীত পুরুষকারের নিরর্থক চেষ্টা শোক-মোহ-ভয়োৎপাদনকারিণী বলিয়া জানিতে পারেন। নিত্য পরমধর্ম্ম যাহা ব্যতীত অন্যান্য ইতর ধর্ম্মের বিভিন্ন আকার ভোগী ও ত্যাগী জীবের এক বুঝিতে অন্য বিচার আনিয়া উপস্থিত করায় এবং উহার অমঙ্গল হইতে অবসর লাভ করিতে হইলে যাহা জীবগণের অনাত্মসেব্যভাব পরিত্যাগ করাইয়া সেবকের বৃত্তির নিত্যতা উপলব্ধি করায়, তাহারই নাম 'ভক্তি'। ইহার বিপরীত কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ঈশ্বরাভিমান জীবকে কর্ম্মপথে ও জ্ঞানপথে 'ভবঘুরে' করাইয়া একমাত্র ভগবচ্চরণে ঐকান্তিকী সেবাপ্রবৃত্তি করিতে দেয় না।

জীবের পক্ষে নিত্যারাধ্য ভগবানের প্রভু সাজিয়া তাঁহাকে ভৃত্যরূপজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করা জীবাত্মার অভদ্র-আনয়ন মাত্র। পরম মঙ্গল লাভ করিতে হইলে তাঁহার সেবা-কৈবল্যই একমাত্র বৃত্তি হইয়া পড়ে। বালচাপল্যের বশবর্ত্তী বিচারকের বুদ্ধি ভক্তি-তাৎপর্য্যপর নহে বলিয়াই ভগবান্ উপদেশকসূত্রে উপদিষ্টজনগণের সেবা করিয়া থাকেন। যেকালে জীব নিজের অপবিত্রতা উপলব্ধি করিয়া পবিত্রতা-লাভের জন্য ধাবমান হন, সেইকালে অপবিত্রাবস্থায় তাঁহাকে দেখিবার যোগ্যতা নাই বলিয়া নিজেই অপবিত্র থাকেন। কখনও আপনাকে পবিত্রজ্ঞানে বাস্তবসত্য বুঝিতে অগ্রসর না হইয়া নিজের যাহা ভাল লাগে, তাহাকেই পবিত্রতা জ্ঞানে তদনুশীলনে ব্যস্ত থাকেন। নিজের অপবিত্রতার আরোপ করিতে গিয়া ভগবানের মঙ্গলময়ী পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতার সহিত উহার সমজ্ঞান করেন। নিজকে ক্লেশদায়ক পুরুষকারের অধিষ্ঠান জানিয়া মায়া-

প্রতারিতনেত্রে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া মৎসরভাবাপন্ন হন। যখন তিনি পদ্মপলাশ-লোচন ভগবানের কথা ও তাঁহার কারুণ্যদৃষ্টির বিচার করেন, তখন তিনি তাঁহার নিত্যশুদ্ধপূর্ণ-মুক্ত সাক্ষী ভগবানের চক্ষু দেখিতে পান এবং নিজের ভ্রম, প্রমাদ, করণা-পাটব, বিপ্রলিপ্সাদুষ্ট-দর্শনে দোষ আছে জানিতে পারেন। প্রাকৃতরাজ্যে দর্শকের বিচারে ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার বিচার যদি তাহারই ন্যায় দেশকালের অন্তর্ভুক্ত-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে পুরুষোত্তমবস্তুর প্রাকৃতজগতে অবতরণকালে গুণাবৃতদর্শনরূপ অপবিত্রতা আসিয়া তাঁহাকে পুণ্ডরীকের চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনের স্মৃতি উদিত না হইয়া তাহাও আত্মসদৃশ দোষযুক্ত বলিয়া ছোটমুখে বড়কথা আসিয়া পড়ে। তখনই "কপ্যাস" শ্রুতিব্যাখ্যায় ভগবদ্‌বিদ্বেষ আরম্ভ হয় এবং পুরুষোত্তমবস্তুকে জড়ান্তর্গত মনে হয়।

জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কেবল চতুর্দ্দশভুবনাত্মক বিশ্বের মঙ্গলকারী নহেন, তদতিক্রান্ত জগতের, বিরজা নদী ও তৎপরপারের তাঁহার নিজালোকে বশ্যগণের চক্ষুঃ ঝল্‌সাইয়া দিয়া তাঁহাদেরও অমঙ্গল করেন না। তিনি স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" শ্রুতির উদ্দেশমত স্বয়ং কৃপাবতারী হইয়া প্রাকৃতরাজ্যে অবতরণ করেন। কিন্তু প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট সঙ্কীর্ণচেতা বন্ধুগণের ন্যায় অবৈকুণ্ঠভাবে বন্ধুগণের অমঙ্গল সাধন করেন না। এমন কি, যে সকল বন্ধু তাঁহার প্রতিকূল অনুশীলন করিয়া ব্রহ্মসুখাভিলাষে সিদ্ধহস্ত হন, সেই বৈকুণ্ঠবিদ্বেষী দৈত্যগণকে ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠ উভয়ের অভাবরাজ্যে স্থানদানরূপা মুক্তি প্রদান করেন। প্রহ্লাদের প্রতি কৃপাবতার শ্রীনৃসিংহদেবের ন্যায় স্বীয় ক্রোড়ে স্থান দান করেন না।

অনেকের নিকট প্রশ্ন হইতে পারে যে, বন্ধুগণের মধ্যে এরূপ একই বস্তুর দর্শনবৈষম্য কিপ্রকারে উদিত হইল? তদুত্তরে জানা যায় যে, বদ্ধজীব-স্বরূপে কেবল জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাধর্ম্ম নিত্য অবস্থিত। তজ্জন্যই তিনি শক্তিমান্ অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞানে গঠিতবস্তু হইলেও অজ্ঞানের দ্বারা অভিভাব্য। তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছাই স্বীয় চেতনের পরিচয়। বস্তুবৈচিত্র্যের ছায়া-গ্রহণ-পিপাসা তাঁহাকে বস্তুর চন্দ্রিকালোক আবরণ করিয়া স্বদর্শনের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত কারায় এবং তিনি তাঁহার সমজাতীয় নিত্যবন্ধুবর্গকে বন্ধু মনে না করিয়া শোক-মোহ ও ভয়ের কারাগারে আপনাকে নিক্ষিপ্ত করেন। এইরূপ চেতনধর্ম্মরহিত করিবার বিচার করুণাময় ভগবানের নাই; তবে করুণাময় ভগবানের দ্বারা বর্ষিত করুণা নিহত করিবার পূর্ণ বাসনাই তাঁহাকে তটস্থভাবে নীত করায়। ইহাই নির্ব্বিশেষ বিচার—যাহা বৈকুণ্ঠ ও মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে অবস্থিত ভগবত্তটস্থাশক্তি-পরিণতি। এখানে জীবের মধ্যে নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত ভাবদ্বয়ের অভাব-ভূমিকা। তাহাতে কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, সেই স্থান হইতে ভক্তিবিদ্বেষিগণের পতনের ও উর্দ্ধগমনের যোগ্যতা থাকে না। যদি অণুচেতন জীবধর্ম্ম স্বতন্ত্রতা-রহিত হয়, তাহা

হইলে অচিৎ বা জড়পিণ্ডমাত্রেই জীবের অধিষ্ঠান স্থিরীকৃত হয়। উহা ঐরূপ করুণাময়ের কারুণ্যবিচার নহে; উহা নিষ্ঠুরের আত্মচেতনবিনাশরূপ সংহার মাত্র। জীবের নিত্যগঠনে অণুচিৎএর অধিষ্ঠান; সেই অণুচিৎ কখনও বিভুচিৎ বলিয়া আপনাকে কল্পনা করিতে পারেনা। তাদৃশী কল্পনা উন্মত্তের লক্ষণ ও অযৌক্তিক।

এইজন্যই ধর্ম্মার্থকামরূপা গতি ব্যতিক্রম করিতে না পারিলে হরিপ্রেমার সৌন্দর্য্য ও পুরুষোত্তমের মহিমা অধম ব্যক্তি অবগত হইতে পারেন না। তখন তিনি বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহার উপদেশক মায়াবাদের মহিমাতেই তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া অথবা ফলভোগাস্বাদের আলেয়ার পশ্চাতে তাঁহাকে ধাবমান হইবার পরামর্শ দিয়া ডাকপুরুষের শব্দ "ভাল কর্ত্তে পারিনা, মন্দ কর্ত্তে পারি, কি দিবি ত' দে"—এই কথার সার্থকতা করেন।

ভ্রান্ত বদ্ধজীবকুলের কোন পরামর্শ শ্রবণ করিলে আমরাও ভ্রান্ত অন্ধের অনুগমনে জড়কার্য্য-কারণ-বাদে আবদ্ধ হইয়া প্রাকৃতরাজ্যের ভোক্তা হইয়া যাইব। নিষ্কপট বেদবাণী প্রতিপক্ষরহিত হইয়া আমাদিগকে নিরপেক্ষতা শিক্ষা দেয়। মানোধর্ম্মী প্রাকৃতরাজ্যে বাসকালে তাঁহার বিপৎসমূহ স্মরণপথে লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলে বাসনা প্রতিরুদ্ধ হইয়া বিরুদ্ধফল লাভ করে। কিন্তু তর্কপথে বিরোধিগণের সহিত বিরোধ করিতে গেলে বাস্তবশব্দশ্রবণের ব্যাঘাত হয়। তজ্জন্য পরদুঃখদুঃখী নিরপেক্ষ শ্রৌতবাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই আমাদের নিত্যমঙ্গল হয়। প্রকৃতিস্থ হইয়া গুণের দ্বারা অভিভূত না হইয়া যিনি সংযত থাকিয়া সমঙ্গলশ্রুতি শ্রবণ করেন, এবং তাহাতেই জড়কর্ণ-মল-সংস্কার-ফলে তাঁহার চিৎকর্ণ শ্রৌত-বিচারগ্রহণে কৃতার্থ হয়।

ভগবদ্বস্তু প্রাকৃত অচিৎজাতীয় বস্তু নহে, অথবা চিদচিন্মিশ্রজাতীয় তটস্থা শক্তিতে শক্তিমান্ মাত্র নহেন। তিনি অন্তরঙ্গা অপ্রাকৃতশক্তি, তটস্থা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি—এই ত্রিশক্তির একমাত্র শক্তিমান্ বলিয়া তাঁহাকে কেবল তটস্থাশক্তির শক্তিমান্ বলিতে গেলে আংশিকতা পূর্ণবিচারকে বিমর্দ্দিত করে।

পূর্ণপুরুষের সম্যক্কীর্ত্তনই মলিনচিত্ত দর্পণের মার্জ্জন করায়, ভবসংসারসমুদ্রের উত্তালতরঙ্গোত্থ মায়াবাদ ও ভোগবাদাদি ক্লেশাগ্নির নির্ব্বাপণ করায়; প্রকৃতমঙ্গল উৎপাদন করাইয়া সকল অমঙ্গল হইতে মুক্ত করায়, অপরা বিদ্যার অবিদ্বদ্রূঢ়ি হইতে মুক্ত করিয়া পরবিদ্যাবধূজীবন শ্রীনামের বিদ্বদ্রূঢ়িতে দীক্ষিত করায় এবং প্রতিপদেই আনন্দোৎসব বর্দ্ধন করাইয়া চিন্ময়ী সেবোন্মুখতা বৃদ্ধি করে।

শ্রৌতবিষয়ের উদাহরণমুখে পঞ্চরাত্র শাস্ত্র যে অর্চ্চার বিধান করিয়াছেন, তাহাতে চিদ্দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য চিদ্রূপদর্শন এবং আবৃত অচিদ্রূপদর্শনকে সমজাতীয় মনে করিতে নাই এবং তাদৃশ বিচার হইতে মুক্ত হইবার কীর্ত্তনমুখে সেই অর্চ্চা দর্শন করিলে সেবোন্মুখ-দর্শনের সিদ্ধিলাভ ঘটে। তখন চিদুদ্দীপনপ্রভাবে সেব্যের স্মরণে সুষ্ঠুতা লাভ করে

এবং সেবা-বৃত্তিতে কোন বিক্ষেপ বা আবরণ ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় না।

আমাদের গৃহব্রতধর্ম্ম কৃষ্ণ-সেবোন্মুখতাকে আবদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান, জড়সাদৃশ্য ও জড়োদাহরণে বাস্তবস্মৃতির ব্যাঘাত করায়, কিন্তু অবিকৃত চিদ্‌বৃত্তিদ্বারা নিত্য অবিকৃত বিভুচিৎএর স্মরণ করিতে হইলে চিদুদ্দীপন আবশ্যক। সেই উদ্দীপনই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের শোধক ঔষধ ও পথ্য। চিৎ বা অচিৎ বস্তু কীর্ত্তিত হইলে উহা শ্রুত হয়। শ্রুত হইলেই কীর্ত্তিত বা প্রকাশিত বৈচিত্র্য স্মৃতির উদ্দীপন করায়। তখন আলম্বনের বিষয়ে ও আশ্রয়ে কোন অপ্রার্থিত বস্তু প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। চিদ্‌ভূমিকায় প্রবেশই গীতোক্ত "বিশতে তদনন্তরম্" শ্লোকের ব্যাখ্যা; উহা বৈকুণ্ঠের দ্বারা মায়াতীত বিরজা ও নির্ব্বিশেষ বিচার অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠ অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক কেবল চেতনবিচিত্রতায় প্রবেশাধিকার লাভ ঘটায়।

জাগতিক নশ্বর আপেক্ষিকতা---নিত্যরাজ্যের, কেবল চেতনরাজ্যের, নির্ব্বাধ আনন্দময় রাজ্যের বাধক মাত্র, সুতরাং মায়িক রাজ্যের অপ্রার্থিত ভাবসমূহ স্তব্ধ করিয়া সেবোন্মুখতা-বলেই আমাদের বাস্তববস্তু-বিষয়ক জ্ঞানলাভ, তৎসান্নিধ্য ও তাঁহার কেবলা অব্যভিচারিণী সেবাপ্রবৃত্তি আত্মস্বরূপে উপস্থিত হইয়া বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর বিচার-স্রোত হইতে মুক্তি প্রদান করিবে। তজ্জন্যই আমার কাতরপ্রার্থনা এই যে, আপনারা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়া এইগুলির তাৎপর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক জড়জগতের প্রভু হইবার বাসনার পরিবর্ত্তে চিজ্জগতের সেবাকেই বহুমানন করিবেন। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবত্তার সর্ব্বোত্তম প্রকাশভেদের মূল আকর স্বয়ংরূপ স্বয়ংপ্রকাশসেবিত অদ্বয়জ্ঞান-অধোক্ষজ ব্রজেন্দ্রনন্দনই সেব্য হউন্। ব্রজেন্দ্রনন্দনের অনুকূল, আবরণরহিত, স্বকর্ত্তৃত্বানুগত্য-বাসনা-বর্জ্জিত-দর্শনোত্থ অনুশীলনই আমাদের অভিধেয় এবং সর্ব্বাশ্রয়ের প্রেয়ে আত্মনিয়োগ-বৃত্তি-প্রকটিত, অকালক্ষোভ্য, নিত্য, পূর্ণ, চিন্ময় ও নির্ব্বাধ আনন্দের মধ্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাই আমাদের পরমপুরুষার্থ হউক্।

(২)

'ধর্ম্ম' অর্থে ধারণা—যাহা দ্বারা বস্তুর সম্যক্ ধারণা হয়, সেই 'ধারণা'-বিষয়ে চেতন ও অচেতন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বা ভেদ আছে। আমরা চেতনময় জীব—দ্রষ্টৃ সূত্রে দৃশ্য জগৎ দর্শন করি। আমরা স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্মের পরিচালন বা initiative লইতে পারি, কিন্তু অচেতন বস্তু তাহা পারে না। Knowing (জ্ঞান), willing (ইচ্ছা) ও feeling (অনুভবঃ),—এই তিনটি চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা বৃত্তি; অচেতনে এগুলি পরিদৃষ্ট হয় না। বাস্তব বস্তু সত্য, চেতন ও আনন্দময়। তিনিই একমাত্র বেদ্য। তিনিই অদ্বয়জ্ঞান। তাঁহার অভিজ্ঞান দুইপ্রকারে লভ্য হয়,—অন্বয়ভাবে বা শ্রৌতপথে অর্থাৎ অধোক্ষজবস্তুর অবতরণ বা অবরোহপথের (Deductive method) দ্বারা এবং

ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ empiricism বা ইন্দ্রিয়সমষ্টি-দ্বারা বহির্বিষয়ের অভিজ্ঞানমূলে অতন্নিরসনপূর্ব্বক আরোহপথের (Inductive method) দ্বারা। অনাদিকাল হইতে এই দুই উপায়েই বেদ্য বাস্তব সত্য-বস্তুর অভিজ্ঞান-চেষ্টা চলিতেছে।

ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (২।৯।৩৫),—

"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।।"

এস্থলে অন্বয়ভাবে অর্থাৎ শ্রৌতপথে ধর্ম্ম জানা যায় অর্থাৎ সেই তত্ত্ববস্তুবিষয়িণী ধারণা আম্নায় পরম্পরা কীর্ত্তনমুখে অখণ্ডরূপে শ্রবণগোচর হইবার পর কীর্ত্তিত হইয়া পুনরায় শ্রুতিপথে অবতীর্ণ হইয়া আসিতেছেন। ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ ক্রমশঃ অক্ষজ-চেষ্টা-দ্বারা বা ইন্দ্রিয়গোচর বাহ্যবস্তুর তদ্‌বিপরীতাভিজ্ঞানমূলে কল্পনায় তত্ত্ববস্তুর জিজ্ঞাসা হইতে কিন্তু বাস্তব-সত্য-বস্তুকে সম্যক জানা যায় না। এইজন্যই সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন (১০।১৪।৩),—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।"

অর্থাৎ হে অবাঙ্মনোগোচর অজিত বিষ্ণো, যাঁহারা নশ্বর ইন্দ্রিয়দ্বারা ব্যহ্য অসদ্‌বিষয়ের অভিজ্ঞান-সম্বল তর্কপথ দূরে পরিত্যাগ করিয়া, 'আমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-যোগ্য অধোক্ষজ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিব'—এইরূপ বুদ্ধি লইয়া এবং কায়মনোবাক্যে অহঙ্কারবিহীন হইয়া ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষচতুষ্টয়-রহিত, বস্তু-বিচারে সম্যক্ অভিজ্ঞ সাধুর শ্রীমুখে তোমার কলি-কলুষনাশিনী কথায় কালযাপন করেন, ত্রিভুবনে তাঁহারা যে-কোন্ অবস্থায় থাকুন না কেন, অধোক্ষজ তোমাকে জ্ঞাত হইয়া তোমাকে প্রেমভক্তি দ্বারা বশীভূত করিতে সমর্থ হন।' এই শ্লোকে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, নিরস্তকুহক সত্যবস্তু তর্কপথে লভ্য হইবার নহে—কেবল গুরু-শিষ্য-পরম্পরা বা কীর্ত্তন-শ্রুতির পথেই লভ্য হয়। শাস্ত্র ও সদাচার এই পথকেই শ্রৌত, অবরোহ বা অবতার-পথ অথবা সহজ ভাষায় 'ভক্তিমার্গ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। সেই শ্রৌতপথ বা বেদানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর বিবদমান, পদে পদে প্রতারণাকারী করণসমূহের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান বা ঐতিহ্য প্রভৃতি প্রমাণ অর্থাৎ আপ্ত বা শব্দপ্রমাণ ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণকে মুখ্য-বোধে গ্রহণ করিয়া আমরা যে বিচার অবলম্বন করি, তাহা আবার আমাদের অপেক্ষা অধিকতর বিচক্ষণ তার্কিক কর্ত্তৃক আক্রমণযোগ্য। তদ্দ্বারা আমরা কখনও Absolute Knowledge বা অদ্বয়জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইব না। প্রতীচ্যদেশে

Comte (কোঁমত)-নামক একজন বিখ্যাত জড়বাস্তব-বাদী জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের জড়ীয় অভিজ্ঞতামূলে আরোহপথে প্রচুর ব্যতিরেক-বিচার দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বাস্তববাদী হইলেও জড়বস্তু অভিজ্ঞানের উপরই তাঁহার বিচার-প্রণালী, সুতরাং চিদ্‌বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি আদৌ প্রবেশ বা সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে নাই। তাদৃশ বহু দার্শনিক বা ধার্ম্মিক-সম্প্রদায় নিজ-নিজ নশ্বর জড়েন্দ্রিয়প্রসূত অভিজ্ঞতা লইয়া বাস্তবসত্য বস্তুকে জড়-বৈচিত্র্যের বিপরীত নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব বলিয়া ধারণা করিয়া তৎসান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে, তর্কাশ্রয়ে বিবাদ-বিতণ্ডা-দ্বারা তাঁহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতবাদবিশেষকে ন্যূনাধিক উজ্জ্বলতর করিলেও গণ্ডী, দল বা সাম্প্রদায়িকতাই বর্দ্ধিত বা দৃঢ় করিয়াছেন। এইজন্য সমস্ত ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতগুলি এক অদ্বয়জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া এক মহাসমন্বয় বা মহান্ ঐক্য সংসাধিত না হওয়ায় অসংখ্য সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব প্রসার লাভ করিয়াছে। ঐসকল সাম্প্রদায়িক মতগুলি ক্রমশঃ মূল আদর্শ অদ্বয় বাস্তবসত্যবস্তুর জ্ঞান হইতে দূর হইতে দূরতর প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়া মহা-চিৎসমন্বয়ের পরিবর্ত্তে সমন্বয়ের নামে ক্রমশঃ অনৈক্যের বিরাট্ ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছে।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মনোধর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ বিভিন্ন রুচিক্রমেই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি। তাদৃশী বিভিন্ন-রুচি অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে নৈসর্গিক, সন্দেহ নাই। বহিরিন্দ্রিয়পরিচালনাদ্বারা লব্ধ জাগতিক অভিজ্ঞানের তারতম্যক্রমে নানা রুচির অনুকূলে নানা মতবাদের উৎপত্তি, সুতরাং সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি হওয়ায় ক্রমশঃ পরস্পরের প্রতি বৈষম্যভাব ও পরস্পর বাদবিসম্বাদ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। এইজন্য বিভিন্ন ধর্ম্ম বা দার্শনিক মতগুলিকে সাম্প্রদায়িক 'বাদ' নামে অভিহিত করা হয়। একটু লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই পুরুষার্থচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন না কোন একটীই ঐসকল মতবাদের চরম প্রাপ্য বস্তু।

ইন্দ্রিয়দ্বারা দৃশ্য বস্তুর বাহ্য অচিৎপ্রতীতিমূলে ঐসকল পুরুষার্থপ্রাপ্তির চেষ্টা। নিজ-জড়েন্দ্রিয়তর্পণ-কামনাই উহাদের সাধন। বস্তুর অচিৎ-প্রতীতিকে চিৎপ্রতীতি বলিয়া ধারণা করিয়া যে বাস্তব-সত্যবস্তুর বিচারে অনভিজ্ঞতা, তাহাই চিৎ ও অচিৎএর মধ্যে সমন্বয়-প্রয়াসের কারণ। তাহা হইতেই পুরুষার্থচতুষ্টয়ের সাধনসমূহ বিভিন্ন মতবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ ভাবগুলি বৃদ্ধি করিয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্কর পঞ্চোপাসনাকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে সমন্বয় করিয়াছেন। 'পুষ্করসংহিতা'-নামক পঞ্চরাত্রগ্রন্থে লিখিত আছে,—মানবগণ ধর্ম্মকামী হইয়া সূর্য্যের, অর্থকামী হইয়া গণেশের, কামকামী হইয়া শক্তির এবং মোক্ষকামী হইয়া রুদ্রের বা শিবের উপাসনা করেন। ইঁহাদের মতে,—উপাস্যকে প্রকৃতপক্ষে অনিত্য ও আনন্দবিলাস-

বিহীন জ্ঞান করিয়া সাধকের অনিত্য-সাধন বা উপাসনা-দ্বারা সিদ্ধিলাভের পথে উপাস্য ও উপাসকের ভেদ বা বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ লোপ পাইয়া তাহার 'অদ্বৈতসিদ্ধি' বা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রাপ্তিই চরম কাম্য অবস্থা। এজন্য কামনা-মূলক বিদ্ধ বিষ্ণুপাসনাও ( যেমন, কোথাও রোগ, শোক, ভয় দূর করিবার জন্য, 'দধিবামনে'র সেবা ছলনা দেখা যায়, তাহাও) তাদৃশ পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত—উহারও চরমপ্রাপ্য চিদ্‌বিলাস-ধ্বংস বা আত্মবিলোপরূপ নির্ব্বিলাস-ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্তি। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, এইসমুদয় মতবাদমূলক পঞ্চোপাসনা কখনও জীবের পরম শাশ্বত, সনাতন ও নিত্য শুদ্ধধর্ম্ম হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন (১।২।৬),—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।"

যাহা হইতে অধোক্ষজে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই মানবগণের পরম ধর্ম্ম। সেই ভক্তির দুইটী লক্ষণ,—(১) অহৈতুকী, (২) অপ্রতিহতা; তাহা দ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হন। এই শ্লোকে 'অধোক্ষজ' বলিয়া যে শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ—"অধঃকৃতম্ অতিক্রান্তম্ অক্ষজম্ ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ"—অর্থাৎ যিনি জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পশ্বাদি স্থাবরান্ত তির্য্যক্, মানব ও দেবতাদির ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞানের অতীত হইয়া নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাক্রমে বিলাস করিবার অধিকার স্বায়ত্তভূত (right reserved) করিয়াছেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণই পরম ধর্ম্ম। সেই পরম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানফলে অধোক্ষজবস্তুর যে প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম 'ভক্তি' বা সেবা ('ভজ্' সেবায়াম্)। তাহা কোন নিমিত্তমূলা নহে এবং কিছুতেই বাধা প্রাপ্ত হয় না। আর ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা-মূলে উপাস্যের যে উপাসনার অভিনয় দেখা যায়, তাহা শুদ্ধভক্তি নহে এবং দেশকালপাত্রের বৈশিষ্ট্যক্রমে যে ভক্তির সাময়িকী উদ্দীপনা দেখা যায়, তাহা বাধা-প্রাপ্ত, বা কালক্ষোভ্য হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাও শুদ্ধভক্তি নহে। তাদৃশী নিত্যারাধ্য আধোক্ষজ-বস্তুর প্রতি অহৈতুকী বা কেবলপ্রীতিবাঞ্ছা-মূলক এবং বাধাহীন বা ব্যবধানরহিত যে ভক্তি, কেবল তদ্দ্বারাই আত্মার প্রসাদ লাভ করা যায়। এস্থলে 'আত্মা' অর্থে দশটী করণবিশিষ্ট পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহমাত্র নহে বা করণসমষ্টির চালক ও অধিপতি একাদশেন্দ্রিয় 'মনকে' বুঝায় না। জীবের দেহ বা মনের দ্বারা যে কিছু চেষ্টা, তাহা তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণমাত্র, অধোক্ষজের প্রীতি-প্রযত্ন নহে। অধোক্ষজের সেবা বা ভক্তি প্রকৃতপক্ষে জড়েন্দ্রিয়তর্পণ নহে।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলেন,— (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ ১।১০ সংখ্যা-ধৃত—)

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।"

অর্থাৎ, সমগ্র হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের অধিপতি যে বিষ্ণু, তাঁহার

প্রীতিবাঞ্ছাই 'ভক্তি'। সেই ভক্তি স্থূল ও সূক্ষ্ম-উপাধিদ্বয়ের দ্বারা আবৃতা নহে এবং কেবল বিষ্ণুসেবা-তাৎপর্য্যে পর্য্যবসানহেতু শুদ্ধা বা নির্ম্মলা। বিষ্ণুবিমুখ জীবের অক্ষজজ্ঞানের প্রাবল্য ও অধোক্ষজসেবা-বৈমুখ্যহেতু বদ্ধাবস্থায় তাহার স্থূল ও সূক্ষ্ম, এই দুইটী উপাধিদ্বারা আত্মা এবং আত্মবৃত্তি শুদ্ধভক্তি আবৃত হইয়াছে। ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ—এই ব্যাহৃতিত্রয়ে এবং তদূর্দ্ধদেশ মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই লোকচতুষ্টয়ে এবং অতলাদি অবর লোকসপ্তকে ইন্দ্রিয়দ্বারা যে অনুশীলন সাধিত হয়, তাহার ভোক্তা আত্মা নহে—আত্মোপাধি বা অনাত্মা, উহা অধোক্ষজের আনুগত্য বা ভক্তি নহে—নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণমাত্র। তাদৃশ মনোধর্ম্মদ্বারাই সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা কল্পিত হয়। কিন্তু যদি কেহ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা সেই অধোক্ষজ বাস্তব-বস্তুর শরণাগত হইয়া তাঁহার প্রীতির অনুকূলে নিরন্তর অনুশীলন করেন, তাহা হইলেই তাঁহার বিজ্ঞান-লাভ বা উপলব্ধি ঘটে। শ্রীগীতার বচন (৪।৩৪) এবিষয়ে প্রমাণ—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।

অতএব দেখিতে পাওয়া যায় যে, চিদাভাস-মনও শুদ্ধ-জীবাত্মা বা 'আমি'-শব্দবাচ্য নহে, সুতরাং তাদৃশ মনোধর্ম্মদ্বারা বেদের সুষ্ঠু অর্থ বা তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারা যায় না; কেননা, মনোধর্ম্ম চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল ও প্রতিপদেই ব্যবহিত ও প্রতিহত হইবার যোগ্য, অতএব অনাত্মবস্তু বা বৃত্তি-দ্বারা আত্মবস্তুর অনুশীলন হয় না। এই অনাত্মবৃত্তি বা মনোধর্ম্ম-দ্বারা চালিত হইয়া বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হওয়ায় প্রকৃত চিৎসমন্বয়-সাধন নিতান্ত দুর্ঘট হইয়া পড়ে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য সগুণোপাসনা-দ্বারা বাহিরে সমন্বয় সাধন করিবার প্রয়াস করিলেও প্রকৃতপক্ষে চরমে জড়-নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদ স্থাপন করায় তদ্দ্বারা প্রকৃত চিৎসমন্বয় সাধিত হয় নাই।

'সুফী' সম্প্রদায়েও 'অনল্ হক্' বা "অহংগ্রহোপাসনা" দেখা যায়। বস্তুতঃ তাদৃশ বিচার মনোধর্ম্মমূলে সৃষ্ট। তাদৃশ মনোধর্ম্ম কালক্ষোভ্য ও খণ্ডজ্ঞানসঞ্চয়শীল বলিয়া ঐসকল জড়াভিজ্ঞানবাদী (empiricists এবং intuitionists) কখনও অধোক্ষজ-বস্তুর সেবা-জ্ঞান সুষ্ঠুভাবে লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা জড়েন্দ্রিয়দ্বারা—বিশ্বদর্শনোত্থ অভিজ্ঞানদ্বারা চালিত এবং বিশ্বান্তর্গত খণ্ড প্রাকৃত সহজ-প্রতীতির বাধ্য; সুতরাং উপাস্য-তত্ত্ববস্তু নিরূপণ করিতে গিয়া আত্মার সহজ প্রতীতিতেও অভিজ্ঞানজাত প্রতীতির আরোপদ্বারা বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ তত্ত্ববস্তুকে ব্যতিরেক-বিচারে অচিন্মিশ্রাতীত অর্থাৎ জড়বিপরীত-মাত্র জ্ঞান করিলেও সেই অধোক্ষজ তত্ত্ববস্তু নিরঙ্কুশ পরমস্বতন্ত্র পরমেশ্বর বলিয়া কেবল চিন্মাত্র ও নির্ব্বিশেষমাত্র নাও হইতে পারেন; কেননা, তাঁহাদের দর্শন অতদ্বস্তু অচিৎএর পরিমাণ ও নিরসন-চেষ্টা-মূলে এবং প্রাকৃত 'ইদং' বিশ্বের সহজপ্রতীতিমূলে

উৎপন্ন হওয়ায়, উহার পরিবর্ত্তনশীলতা-হেতু ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ হইতে বহুদূরে অবস্থিতি-নিবন্ধন তাহা বস্তুর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইতে না পারায়, তৎকৃত বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়—বিবাদ ও সংশয়ের যোগ্য। তিনি মনঃকল্পনাপ্রভাবে সেই তত্ত্ববস্তুকে 'নির্ব্বিশেষ' মাত্র বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তত্ত্ববস্তুর স্বরূপের কিছু আসে যায় না—তাঁহার Subjective existence-এর (কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানের) কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি জড়-বৈচিত্র্যের বিপরীত কেবল জড়-নির্ব্বিশেষ রূপকে 'চিন্মাত্র' বলিয়া আরোপ করায় বিবর্ত্তবাদী হইয়া পড়িয়াছেন; যেমন, 'রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি' হইলেও অর্থাৎ রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিলেও রজ্জু কিছু সর্পত্ব প্রাপ্ত হয় না, উভয়ের নিত্য পৃথক্ অধিষ্ঠান বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ। অতএব বস্তুর স্বরূপদর্শনের ব্যাঘাতকারক এই বিবর্ত্তবাদ দূর করিতে হইলে আদৌ বস্তুবিষয়ক সম্বন্ধজ্ঞান আবশ্যক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অধোক্ষজ বস্তুকে অস্বীকার করিলেও তাঁহার অধোক্ষজত্বহেতু তিনি চিদ্‌বৈভবময়ই থাকেন। পাশ্চাত্য মনোধর্ম্মি-দার্শনিকগণের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, অজ্ঞেয়বাদী বা সন্দেহবাদিগণ (যেমন, Huxley ও Spencer প্রভৃতি) নিজেদের রুচিক্রমে বা অভিজ্ঞতা-বলে বাস্তববস্তুর অস্তিত্বকে দুর্জ্ঞেয় বলিয়া বোধ ও সন্দেহ করিলেও বস্তুতঃ তাঁহার অস্তিত্ব যে নাই, এরূপ নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—যেমন, সাহিত্যিক Robert Buchanan (রবার্ট বুকানন্ সাহেব) যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মমতকে মনঃকল্পিত বলিয়া উপহাস করিয়া তাহার আদৌ কোন উপকারিতা ও বাস্তব মহত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; অথবা, যেমন তুরীয়-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারা লভ্য হয় না—চতুর্থ হইতে অনন্ত মান (Dimension) যে কি বস্তু, তাহা আমরা জড়ীয় অঙ্কশাস্ত্রদ্বারা কথঞ্চিৎ কল্পনা করিলেও গৌণী খণ্ডজ্ঞানানুভূতি-দ্বারা সম্যক্ ধারণা করিতে পারি না,—পারিবার উপায়ও নাই; কেননা, তুরীয় বস্তু প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বস্তুসমূহ সমস্ত ত্রিগুণ-জাত জড়ীয় অভিজ্ঞানের অতীত ও বহির্ভূত ব্যাপারবিশেষ।

এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম শ্লোকেই সেই বাস্তব বস্তুকে "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" এই বলিয়া বন্দন করিয়াছেন। 'স্বেন ধাম্না' শব্দে চিদ্‌বিলাসবৈভব-সমন্বিত (with all His paraphernalia) এবং 'নিরস্তকুহক' শব্দে যে বাস্তব-সত্যবস্তু স্বীয় প্রতীতির পার্থক্য বা বৈষম্য উৎপাদন না করিয়া উপাসককে স্বীয় সান্নিধ্য প্রাপ্তি করান,–তাহাকে বঞ্চনা বা ছলনা করেন না সেই বস্তু। বিষ্ণুই সেই অধোক্ষজ বস্তু, তিনিই নিরস্তকুহক সত্য। আধিকারিক দেবতাবিশেষের ন্যায় তাঁহাকেও সত্ত্বগুণযুক্ত দেববিশেষ বলিয়া মনে করিলে আমরা স্বীয় মনঃকল্পনা ও কল্পনার স্বৈরাচার পরিতৃপ্ত করিতে পারি বটে, কিন্তু বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব বা বৈকুণ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। তিনি বৈকুণ্ঠ–'বিগতা কুণ্ঠা যস্মাৎ সঃ' অর্থাৎ তিনি সীমাবিশিষ্ট বা প্রকৃতির অন্তর্গত

কোন পরিচ্ছন্ন বস্তুবিশেষ নহেন। তিনি সকল-সত্তার একমাত্র আধার এবং অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে সমগ্র চিদচিদ্‌বস্তুর সত্যপ্রতীতির একমাত্র মূল-কারণ অর্থাৎ তাঁহার অধিষ্ঠানহেতুই নিখিল বস্তু সত্তাবান্। তিনি সকল দেবতার শক্তি-প্রদাতা।

যাবতীয় বস্তুর কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানের মূল ঈশ্বরই বিষ্ণু। তাঁহার পূজা বিহিত ও বিধেয়; আর বিষ্ণুব্যতীত বহিঃপ্রতীতি নশ্বর বলিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুসম্বন্ধহীন বলিয়া শাস্ত্রে তাহার অনাদর দেখা যায়; যথা শ্রীগীতায় (৯।২৩)—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।।"

অর্থাৎ বহুদেবতাকে বহির্ম্মুখী প্রতীতিতে বিভিন্ন দেবতা বা ঈশ্বর বলিয়া যে উপাসনার অভিনয় জগতে দেখা যায়, তাহা বিষ্ণুসম্বন্ধহীন; সুতরাং ভক্তিগন্ধশূন্য বলিয়া উহা অবিধি অর্থাৎ অবৈধ বা অভক্তি, সুতরাং তাহা নিষিদ্ধ।

বস্তুর বহিঃপ্রতীতিমূলেই প্রকৃতিজাত প্রাকৃত বস্তুর উপাসনা। এই প্রাকৃত বস্তু ও তজ্জননী প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন উপাসনাই 'মায়াবাদ' নামে খ্যাত। এই প্রকৃতিবাদের বা মায়াবাদের চরম প্রাপ্য যে মোক্ষ, তাহা প্রকৃতিবাদিগণের মতে, জড়দর্শনের ক্রমশঃ সঙ্কোচ ফলে অব্যক্ত প্রকৃতিতে লয়াবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কিন্তু আমরা "ঈক্ষতের্নাশব্দম্"—এই ব্রহ্মসূত্র (১।১।৫) হইতে জানিতে পারি যে, প্রকৃতি স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থা নহে, ভগবান্ বিষ্ণুর ঈক্ষণ-প্রভাবেই মায়াদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয়। সাংখ্যস্মৃতিমতে, 'খঞ্জান্ধন্যায়'-ক্রমে (সাংখ্যকারিকা, ২১) পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে জগৎ সৃষ্ট। সুতরাং প্রকৃতিবাদী "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব, তদেব ব্রহ্ম" (তৈঃ তে, ১ অনু) এই বেদবাণী স্বীকার করেন না অর্থাৎ পরব্রহ্ম বিষ্ণুকে জগতের 'নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ' বলেন না।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, জগতে এপর্য্যন্ত যত 'বাদ' উত্থিত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে যত 'বাদ' উত্থিত হইবে, সমস্ত দর্শন বা ধর্ম্মমতের ভিত্তি তিনটী কথা—চিদ্‌রাহিত্যবাদ, চিন্মাত্রবাদ এবং চিদ্বিলাসবাদ। প্রথমটীতে অনুভূতিরাহিত্যই চরমপ্রাপ্য;—যেমন, নিরীশ্বর বৌদ্ধ বা কাপিল সাংখ্য মত, দ্বিতীয়টীতে চিদ্বিশেষরাহিত্য অর্থাৎ উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের ভেদরাহিত্য অথবা, দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য—এই তিনের অস্তিত্বলোপাত্মক একীভূত অবস্থানই চরমপ্রাপ্য। তৃতীয়টীতে উপাস্যের নিত্যত্ব, উপাসনার নিত্যত্ব ও বহু উপাসকের নিত্যত্ব বর্ত্তমান। প্রথম দুইটী মতে নিবৃত্তির উপদেশ থাকিলেও উহারা প্রবৃত্তিমিশ্র। জগতের যাবতীয় প্রবৃত্তিমূলক দর্শনই এই দুইটী দর্শনের অনুগত।

কিন্তু কেবল প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইলে বা ইন্দ্রিয়চেষ্টা-দ্বারা বহির্ভোগ্যবিষয়-গ্রহণে চালিত হইলে স্বার্থগতি অধোক্ষজ-বস্তু-বিষয়ক অভিজ্ঞানলাভ হয় না—অসৎ বহিরর্থই অধিগত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছেন (৭।৫।৩০-৩১)—

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্।।
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।।"

এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই যে, যাহারা গৃহব্রত অর্থাৎ দ্রষ্টার অভিমানে বহিরিন্দ্রিয়-দ্বারা জড় দর্শন করিতে ব্যস্ত বা নশ্বর জাগতিক বস্তুসমূহ ভোক্তৃঅভিমানে ভোগ করিতে ব্যস্ত, তাহারা 'অদান্তগো' অর্থাৎ তাহাদের ইন্দ্রিয় বশীকৃত হয় নাই, তাহারা নিজেরাই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত। সুতরাং সকলজীবের একমাত্র সেব্য, একমাত্র পরম-প্রয়োজন শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে তাহাদের কখনও মতি হয় না,—তাহারা বাহ্য নশ্বর অর্থলাভের প্রয়াসী--তাহাদের ইন্দ্রিয়বর্গ ভোগ্য জড়বস্তুর অন্বেষণে ব্যস্ত, সুতরাং সংসারান্ধকারে পুনঃ পুনঃ মায়া-নিগড়-বদ্ধ হইয়া পতিত হয়।

কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়বর্গ সর্ব্বদা ভগবান্ শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত করেন--তাঁহাদের পক্ষেই "হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং" সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। তাঁহাদের ত্রিবিধ অধিকার দৃষ্ট হয়; —

(১) কনিষ্ঠাধিকারে (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ-ধৃত)—

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ।।"

কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তগণের যাবতীয় ক্রিয়া ভগবান্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া অনুষ্ঠিত, উহাই তাঁহাদের সাধন। তাহা কর্ম্মীর অনুষ্ঠেয় ফলভোগমূলক 'কর্ম্ম'-শব্দবাচ্য নহে।

(২) মধ্যমাধিকারে (ঐ-ধৃত পঞ্চরাত্র-বাক্য)—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।"

প্রেমভক্তিলাভ ইচ্ছুক মধ্যমাধিকারি-ভক্তগণ লৌকিকী ও বৈদিকী সমস্ত ক্রিয়াই স্বীয় আরাধ্য শ্রীহরির শুদ্ধ-সেবার অনুকূলে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

(৩) উত্তমাধিকারে (ভঃ রঃ সিঃ—পূঃ বিঃ ২য় লঃ-ধৃত নারদীয়-বাক্য)—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।।"

কায়মনোবাক্যে সর্ব্বাবস্থাতেই উত্তমাধিকারী শ্রীহরির সেবায় অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট। পূর্ব্ব-কথিত "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোকে "স্থানে স্থিতাঃ" পদে সর্ব্বাবস্থাতেই যে হরিভজন করা যায়, তাহা বুঝা গেল।

অতএব কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি,—এই ত্রিবিধপথের মধ্যে শেষোক্ত কেবল ভক্তিপথের দ্বারাই তত্ত্ববস্তুর স্বরূপ—অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণের প্রেমসান্নিধ্য লাভ করা যায়, অপর পথদ্বয়ের দ্বারা তাহা লাভ করা যায় না।

ভগবানের নিজাবরণী শক্তির নামই মায়া অর্থাৎ বিমুখ-জীবাত্মাকে মায়া স্থূল ও সূক্ষ্মোপাধিদ্বয়ের দ্বারা আবরণ করিয়া ভগবান্‌কে জীবচক্ষুর অদৃশ্য ও অগোচর রাখিতে সমর্থা। ভোগবুদ্ধির প্রাবল্যে ও কৃষ্ণদাস্যের অভাবে জীব মায়িকসর্গের সেব্যরূপে আপনাকে জ্ঞান করেন; তখন ঐ বৃত্তি তাঁহাকে অবিদ্যাশ্রিত অভক্তরূপে স্থাপন করায়। আবার হরিসেবাই একমাত্র নিত্যধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারিলে তাঁহার প্রতি মায়ার বিক্রম শ্লথ হইয়া পড়ে। মায়া এই জড়ব্রহ্মাণ্ডের 'উপাদান' কারণরূপে কথিত হইলেও ভগবানের উপাদান-শক্তি মায়ায় আহিত হয় মাত্র। অগ্নিতপ্ত জ্বলন্ত লৌহ যেরূপ অগ্নির নিকট দাহিকা-শক্তি লাভ করিয়া অপর বস্তুর দহনে সমর্থ হয়, মায়াও সেরূপ ভগবানের নিকট হইতে উপাদান লাভ করিয়া জগতের মাতা বা 'উপাদান-কারণ'রূপে বর্ণিত হয়।

'বাস্তব-বস্তু নিঃশক্তিক এবং যাবতীয় বিচিত্রতা মায়া হইতে নিঃসৃত'—একথা অবৈষ্ণব মায়াবাদীই বলিয়া থাকেন। মায়িক-বৈচিত্র্যে অপ্রাকৃত-ভ্রম—মায়াবাদীর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী; বৈষ্ণবগণ তাদৃশ বিশ্বাসকে প্রাকৃত বা 'সহজিয়া বিশ্বাস' বলেন। যাহার ত্রিধাতুক মৃতক-দেহে আত্মভ্রান্তি, পুত্রকলত্রাদিতে মমত্ব-বুদ্ধি, জড়ে অপ্রাকৃত চিদ্‌বুদ্ধি এবং সলিলে তীর্থবুদ্ধি, তিনি—প্রাকৃত বা অবৈষ্ণব। আবার, অনাসক্ত হইয়া কৃষ্ণসুখের অনুকূল যথাযোগ্য বিষয় স্বীকারপূর্ব্বক বিষয়সমূহে নিজ-ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণসম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট প্রতীতি হইলে ভক্ত প্রাকৃতবিশ্বাস হইতে বিমুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত হরিসেবনোন্মুখ হন। তখন তিনি মুমুক্ষু মায়াবাদীর ন্যায় হরিসম্বন্ধি-বস্তুসমূহকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ জানিয়া তাহাদিগকে নিজভোগপর অপর প্রাপঞ্চিক বিষয়ের সহিত সমজ্ঞানে ত্যাগ করিবার পরামর্শ করেন না।

সংসারে জীবগণ কৃষ্ণবিমুখ হইয়া কৃষ্ণসেবার বিস্মৃতিবশতঃ প্রাকৃত অভিমান মত্ত হইয়া অন্যান্য ভোগ্য জড়বস্তু বা বদ্ধজীবগণের সহিত হেয় অনিত্য শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর জড়রস স্থাপনপূর্ব্বক জড়রসের রসিক হইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, জড়রসের বিষয় ও আশ্রয়গুলি অল্পকালস্থায়ী ও অনুপাদেয়, সুতরাং কৃষ্ণ ব্যতীত ইতর বিষয়গুলির সহিত আপনাদের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ ও স্থাপন করিয়া তাঁহারা বিষম-ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। জীবগণ ও ভগবানের মধ্যে বিকৃত রস ও

আশ্রয়গুলিই তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকস্বরূপ।

কখন বিদ্বেষ-বশে বিষয়-জ্ঞানে মায়িক-বস্তুসমূহের সঙ্গত্যাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে গিয়া কেহ কেহ নির্ব্বিশেষ-বাদকেই আবাহন করিয়া পুনরায় হরিবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন; ধর্ম্ম, অর্থ ও কামফলের পরিবর্ত্তে মুক্তি-ফলই তাঁহাদের আরাধ্য বিষয় হয় এবং চিন্ময়রস-রাহিত্যকেই শ্রেয়স্কর জানিয়া ভগবান্‌কে রসময় বলিতে শঙ্কিত হন। পরলোকে নিত্যকাল তমিস্রময় বিচিত্রতা-হীন অবস্থার নিত্যাস্তিত্ববিশ্বাসই তাঁহাকে কংস-শিশুপালাদির আরাধ্যলোকে লইয়া গিয়া তাঁহার আত্মবিনাশ সাধন করায়। প্রাকৃত-বিশ্বাসবশে কৃষ্ণসেবা-বিমুখ বিচারকগণ পূতনাদি কপটচারিণীর ন্যায় কৃষ্ণসেবা প্রদর্শন করিয়া মায়াবাদী হন, আবার জীবনান্তে চিদ্‌বিশেষ-রহিত হইয়া নির্ব্বিশেষত্বে লীন হন। রসের বিপর্য্যয়ফলে প্রাকৃত ভোগময় জগতে বদ্ধজীবগণ যে অনিত্য অসম্পূর্ণ নিরানন্দে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইতে রসকে সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া নীরস মায়াবাদের অবতারণা-দ্বারা নিজেদের অশুভ আনয়নপূর্ব্বক রসময়ের নিত্যরস হইতে নিত্যবিদায় গ্রহণ করাকে বিশেষবিচার-পুষ্ট বলিয়া বৈষ্ণবদার্শনিকগণ মনে করেন না।

তাঁহারা দেখেন যে, নিত্যরসময় বস্তুর বিকৃত-প্রতিফলন-ক্রমেই এই ভোগময় অনিত্য অনুপাদেয় জগতে রসের বিকারসমূহ নানাপ্রকার অনর্থ ও বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করিয়াছে। সেই অনর্থসমূহ অতিক্রম করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে অপ্রাকৃত নিত্যরসময় হরিলীলায় অনুপ্রবেশ করিতে পারিলেই শ্রদ্ধালু জীবের নিত্যমঙ্গল হইবে।

৩

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।।"[১]

জগতে যত প্রকার পূজ্য বস্তুর পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম; আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্যের পূজকের পূজা আরও অধিক বড়। সেই পূজককে ভগবান্ পূজা ক'রে থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত, সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁর পূজা ক'রে থাকেন, তাঁ'র পূজা নিশ্চয়ই সব চেয়ে বড়।

'তদীয়' ব'ল্‌তে গেলে তিনি এবং তাঁ'র দাসবর্গ। একগুরু বা জগদ্‌গুরুবাদ ও মহান্তগুরুবাদের বিচার আপনারা শুনেছেন। আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। তিনি

(১) শিব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন,—সকল দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। হে দেবি! তদপেক্ষা তদীয়গণের অর্থাৎ বৈষ্ণববৃন্দের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ।

গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব; আমার গুরুবিদ্বেষী—জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রের বিদ্বেষী। নিষ্কপটে এই বিচারটা না আস্‌লে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভৃত্য হ'তে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে পারি না--আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—আমি 'তৃণাদপি সুনীচ', 'অমানী'-'মানদ' হ'য়ে হরিকীর্ত্তন কর্‌তে পারি না। সমগ্র জগদ্‌বাসী আমার মানদ বা নমস্য—এই বিচার না আস্‌লে আমি গুরুপাদপদ্মে নমস্কার ক'রতে পারি না। গুরুপাদপদ্মে ঐরূপ অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা থাক্‌লেই সমগ্র জগৎকে মান দেওয়া যেতে পারে—নিজে অমানী হওয়া যেতে পারে—সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করা যেতে পারে।

সেতার শিখা'বার গুরু, পাঠশালার গুরু, আধ্যক্ষিক জ্ঞানদাতা গুরু, আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা'বার গুরু বা ইহজগতে যাঁ'দের নিকট হ'তে এই শরীর লাভ ক'রেছি, সেই জনক-জননী গুরু—এঁরা সকলেই আংশিক গুরু। কিন্তু যিনি জন্মে জন্মে—নিত্যকাল আমার গুরু—যে গুরুর প্রতিবিম্ব জগতের প্রত্যেক লঘু বস্তু—প্রত্যেক বস্তু যাঁ'র সেব্যের সেবোপকরণ, সেই গুরুপাদপদ্মই গুরুত্বের পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব ধারণ করেন। সমগ্র জগৎ সেই গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক রেণ-পরমাণুতে—গুরুর সম্বন্ধ পরিস্ফুট। তাঁ'দের অসম্মান বা অনাদর করা গুরুসেবকের কর্ত্তব্য নহে।

গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়, এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। যখন আমরা মনে করি, অন্য প্রকার আকর হ'তে আমাদের মনোঽভীষ্ট পূরণ হ'বে, তখন আমরা মহান্ত-পুরুষবিশেষে গুরুতত্ত্ব দর্শন করি না। কতকগুলি ব্যক্তি বলেন,—জগদ্‌গুরু একজন, তিনি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকট হ'য়েছিলেন; কিন্তু আমার যোগ্যতানুসারে, আমার লঘুত্বের পরিমাণানুসারে যদি জগদ্‌গুরুতত্ত্ব মহান্তগুরুরূপে সাক্ষাদ্ভাবে আমার নিকট প্রকাশিত হ'য়ে আমাকে কৃপা বিতরণ না করেন, তা' হ'লে আমি বহু দিন পূর্ব্বের ব্যক্তির আদর্শ, আচার-প্রচার ধর্‌তে পারি না—'সর্ব্বস্বং গুরুবে দদ্যাৎ'—এই শ্রৌতবাণী অনুসারে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হ'তে উদ্ধার পে'তে পারি না—আমার ভয়, শোক, মোহ অপগত হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ ক'রলে আমি নির্ম্মোহ, নির্ভয় ও অশোক হ'তে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদপ্রার্থী হই, তা' হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করেন।

শ্রীগুরুদেব—মর্ত্ত্য নহেন, তিনি—অমর বস্তু, নিত্য বস্তু। গুরুপাদপদ্ম—নিত্য, তাঁ'র সেবক নিত্য—তাঁ'র সেবা নিত্য; সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের মরণ ব'লে কোন জিনিষ আমাদের নেই।

সাধারণ গুরুগণ আমাদিগকে মরণ থেকে বাঁচাতে পারেন না—নিত্য জীবন দিতে পারেন না; এজন্য তাঁ'দের আংশিক গুরুত্ব। কিন্তু যিনি আমাদিগকে মরণ-ধর্ম্ম হ'তে রক্ষা ক'রেছেন—আমাদিগকে নিত্যত্বের উপলব্ধি দি'য়েছেন, তিনিই পূর্ণ ও নিত্য গুরু। তিনি আমাদের সংশয়-নিবৃত্তির জন্য কৃপা ক'রে জগতে উপনীত হ'য়ে আমাদের যাবতীয় সংশয়ের নিবৃত্তি করেন।

আমরা—বশ্যতত্ত্ব, তিনি—ঈশ্বরতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং ভগবান হ'য়েও ভগবানের সেবক-সূত্রে আমাদের অহংগ্রহোপাসনা-প্রবৃত্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষারূপ সম্ভোগবাদ নিরাস করেন। স্বয়ং আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবান্ বিষয় হ'য়েও আশ্রয়বিগ্রহ গুরুতত্ত্বরূপে বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর হ'য়েও আমাদিগকে শিক্ষা দেন; —"আমার এক মাত্র পরমেশ্বর ভগবদ্‌বস্তু, আমি তাঁ'র সেবক। হে জীব! তুমিও তাঁ'রই সেবক, তুমিও আমারই মত, আমার ভাষা তুমি বুঝতে পারবে, তোমার যে সকল সন্দেহ আছে, আমি সকলই নিরাকরণ কর্‌ব।" এই ব'লে তিনি জীবের ভগবদ্ ভজনের যাবতীয় অনর্থ-গ্রন্থি বাক্যের দ্বারা ছেদন ক'রে জীবকুলকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। তখন,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।। [২]

শ্রীগুরুপাদপদ্ম—আত্মতত্ত্ব, তিনি অনাত্মতত্ত্ব নহেন। অনাত্মতত্ত্বে নানাবিধ ভোগবাদ—ভোগ্য-বিচার আশ্রিত। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে আমাদের অনুভবনীয় বিষয়মাত্রই আমাদের প্রভুত্বের পরিচায়ক। দর্শক-সূত্রে, শ্রোতৃ-সূত্রে, আস্বাদকসূত্রে, ঘ্রাণগ্রহণকারি-সূত্রে, স্পর্শকারি-সূত্রে, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শরূপ বিষয়কে আমরা আমাদের অধীন জ্ঞান করি; সুতরাং আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়। এইরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান হ'তে মুক্ত কর্‌বার জন্য ইহজগতে আমার কে সহায়-সম্বল হ'বেন? অনেকে বল্‌তে পারেন, হৃদয়ের অন্তঃস্থিত বিবেকই ত' সহায়ক হ'তে পারে; কিন্তু আমি যে নিতান্ত দুর্ব্বল প্রাণী, আমি যে মনোধর্ম্মে প্রপীড়িত, হৃদ্‌রোগে জর্জ্জরিত জীব, আমার প্রেয়ঃকে, আমার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ভাল-মন্দের বিচারকে 'বিবেকের বাণী' ব'লে গ্রহণ ক'রে আমার প্রতি মুহূর্ত্তে যে বঞ্চিত হ'বার সম্ভাবনা র'য়েছে, তা' হতে আমায় কে উদ্ধার ক'রতে পারে—যদি মহান্তগুরু আমার নিকট উপস্থিত হ'য়ে সাক্ষাদ্ভাবে আমাকে উপদেশ না দেন। যখনই আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়—আমি যখন মনে করি,—আমি শ্রোতা, দ্রষ্টা, ভোক্তা—আমি যখন মনে করি, বাগানের মালী যেমন আমাকে ফুল দিয়ে যায়, আমার উপাস্য বস্তুও তেমনি আমাকে ফুল দিয়ে যাবেন, তখন আমার সেই কর্ত্তৃত্বাভিমান হ'তে মহান্তগুরুদেব আমাকে রক্ষা করেন।

---

(২) সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মরূপী আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে জীবের হৃদয়গ্রন্থি (অহঙ্কার) বিনষ্ট, সর্ব্ব-সংশয় ছিন্ন এবং কর্ম্মরাশি ক্ষীণ হইয়া থাকে।

উপাস্য বস্তুকে বাগানের মালী বা আমার ইচ্ছার ইন্ধন-সরবরাহকারী বিচারে গুরুর বিচার হয় না, তা'তে লঘুর বিচার হয়। এহেন পাযণ্ড আমি--পামর, অধম, নারকী আমি, আমাকে বুঝা'বার জন্য যিনি মনুষ্যাকৃতিতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, তাঁ'কে না চিনে--সেই গুরুপাদপদ্ম দর্শন না ক'রে যদি আমি মনে করি--'আমি গুরু দে'খে ফেলেছি', তা' হ'লে তা'র মত ধৃষ্টতা আর কি আছে? যদি আমার নিষ্কপটতা থাকে, তা' হ'লে আমার পক্ষে যে ধৃষ্টতা হ'চ্ছে, একথা আমার অন্তর্য্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে আমাকে বুঝিয়ে দেন; বিবেক দেন--'শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্ত্যজ্ঞান করো না। তিনি তোমার অনন্ত জীবনদাতা, তোমার ভবরোগের সদ্‌বৈদ্য, সর্ব্বতোভাবে তোমার একমাত্র উপকারক।' চৈত্ত্যগুরুর এই উপদেশ শ্রবণ ক'র্‌লে আমরা মহান্তগুরু শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট উপনীত হই। আমি তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট নিজ প্রাক্তন দুষ্কৃতিজাত নানাপ্রকার সন্দেহের কথা নিবেদন ক'রে বলি,—"আপনি কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি, আপনাতে আকর্ষণ-ধর্ম্ম আছে, আমাকে আপনি আকর্ষণ করুন, আপনার নিকট সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর্‌বার জন্য আমার যাবতীয় অনর্থের প্রতিবন্ধক দূরীভূত হউক।"

আমরা যদি এই প্রকার বিচার অবলম্বন না ক'রে লোক-দেখান' বিচার গ্রহণ ক'রে মনে করি,—আমরা গুরুর নিকট হ'তে মন্ত্র নিয়েছি—মনোধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ পেয়েছি, কিন্তু যদি প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণভাবে আমরা গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত না হই, তা' হ'লে যে পরিমাণ কপটতা ক'রলাম, সেই পরিমাণে ঠকে গেলাম।

আমার যে-সময় অবিবেচনা প্রবল ছিল, শ্রীগুরুপাদপদ্ম তখন দেখি'য়েছেন,—তুমি যে পণ্ডিতম্মন্যতা, পবিত্রতা, সংযম, জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী প্রভৃতিকে বড় মনে কর, সেইগুলিকে যে-পর্য্যন্ত ত্যাগ না ক'রতে পার্‌বে, সেই পর্য্যন্ত তুমি আত্ম-সমর্পণ কর্‌তে পার্‌বেনা—আমাকে আশ্রয় ক'র্‌তে পার্‌বে না। যদি তুমি ঐগুলি ত্যাগ ক'রতে পার, তা হ'লেই আমাকে আশ্রয় ক'র্‌তে পার্‌বে—আমার গুরু হ'তে পারবে। এই বিচার যখন গুরুপাদপদ্ম হ'তে জান্‌তে পেরেছিলাম, তখন তাঁ'কে জীববিশেষ ব'লে জান্‌তে পারি নাই। তখন জেনেছিলাম,—সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বস্তু আমাকে কৃপা করবার জন্য যখন জগতে এসে উপস্থিত হন, তখন আমার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়। আমার চেষ্টাক্রমে—আমার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের চাঞ্চল্যক্রমে গুরু-নির্দ্দেশের যে পদ্ধতি আছে, তা' আমার কর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত—আমাব ভোগবাসনায় পূর্ণ। এই জগতের ভোগ বাসনা-চালিত কর্ত্তৃত্ব হ'তে পরিত্রাণ ক'র্‌তে যিনি সমর্থ, সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই অতিমর্ত্ত্য শিক্ষার নিকট, মনুষ্যজাতির নিকট যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, যুগ-যুগান্তরের সভ্যসমাজ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হ'তে যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, সে-সকল একীভূত ক'রলেও অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, নগণ্য, নিতান্ত ব্যর্থ। আমার নিজের আত্মম্ভরিতা ও অবিবেচনাকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত ক'র্‌তে পারে যে শক্তি, সেই

(গুরুপাদপদ্ম) শক্তি যদি আমাতে সঞ্চারিত না হয়,—দুর্ব্বল আমি, সেই বলে যদি বলীয়ান্ না হই, তাহ'লে সেই বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ হয় না—তাঁ'কে গ্রহণ ক'র্তে পারি না। দিব্যজ্ঞানের প্রদাতাকে 'গুরু' বলা যায়,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।। [৩]

দিব্যজ্ঞানের প্রদাতা কোন মর্ত্ত্যবস্তু ন'ন। যিনি দিব্যজ্ঞানের কথা শুনেন, তিনিও কখনও ম'রে যান না। যিনি সমুপেত মৃত্যু হ'তে রক্ষা ক'রতে পারেন না, তিনি গুরু নন। যিনি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবল হ'তে রক্ষা ক'রে থাকেন, তিনিই গুরুদেব (ভাঃ ৫।৫।১৮)—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্।। [৪]

আমরা জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-রাজ্যে অবস্থিত। আমরা ম'রে যাব সকলেই—এ অবস্থায় কেহ থাকতে পার্‌ব না। কিন্তু 'মরে যাব' এই ভীতি—এই আশঙ্কা হ'তে যিনি উদ্ধার ক'রতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমরা যে নানাপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধি সঞ্চয় ক'রেছি, সেই দুর্ব্বুদ্ধি হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য আমার প্রতি যিনি অনন্ত শক্তি সঞ্চার করেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণত হই।

মানব যে-কাল পর্য্যন্ত তর্কপথ গ্রহণ করে, সে-কাল পর্য্যন্ত গুরুর দর্শন-লাভ ঘটে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী বা সত্য হ'তে পার্থক্য লাভ ক'রে অন্য কোন সত্য হ'তে পারে না—এরূপ বাস্তব সত্যের প্রতি নিষ্ঠা পরীক্ষা কর্‌বার জন্য যে বিপরীত মত, সন্দেহ উপস্থিত হয়, তা'ই তর্কপথ। গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কথা থাকতে পারে, গুরুপাদপদ্ম যে-কথা ব'লেছেন, তা'তে সম্পূর্ণ সত্য নেই, কিঞ্চিৎ অসত্যও মিশ্রিত

---

(৩) যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবৎতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করেন।

(৪) ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন'-শব্দ-বাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে, সেই জননী জননী নহেন অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ কর্ত্তব্য নহে, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন, অর্থাৎ যে সকল দেবতা জীবের সংসার মোচনে অসমর্থ, তাঁহাদিগের মানবের নিকট পূজা গ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই পতি 'পতি' নহেন, অর্থাৎ তাঁহার পাণি গ্রহণ করা উচিত নহে।

থাক্‌তে পারে, আমি সেগুলি বাজিয়ে নেবো—এরূপ বিচারের নাম তর্ক পথ। যাঁ'রা তর্কপন্থী, তাঁ'রা গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করেন। একমাত্র গুরুপাদপদ্মই সকল সন্দেহ ও বাদ নিরসন ক'র্‌তে সমর্থ। তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। আম্নায়-পথে—শ্রৌতপথে—বেদপথে--বিশুদ্ধপথে যে সত্য আগত হয়, তা' পরিবর্ত্তনীয় নয়। সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের--শব্দের প্রদাতাকে আমরা 'গুরুপাদপদ্ম' ব'লে থাকি। গুরুদ্রোহীর তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে যে বিচারপ্রণালী, তা'তে গুর্ব্ববজ্ঞা, শাস্ত্রাবজ্ঞা থাকে। সুতরাং ভগবানের ভজনে প্রবৃত্ত হ'বার জন্য আমাদের বিশেষভাবে বিচার্য্য বিষয়,—

* সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্।।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলম্।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।।
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ।
ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃন্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।।
শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ।।

---

* দশটি নামাপরাধ—(১) সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে; যে সকল নামপরায়ণ সাধুগণ হইতেই জগতে কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ হন, শ্রীনাম সেই সকল সাধুগণের নিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন? (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—নামি-শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন এইরূপ মনে করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা সমান জ্ঞান করে, তাহার সেই হরিনাম (নামাপরাধ) নিশ্চয়ই অহিতকর; (৩) যে ব্যক্তি নামতত্ত্ববিদ্ গুরুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি, (৪) বেদ ও সাত্বত পুরাণাদির নিন্দা (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি, (৬) ভগবন্নামসকলকে কল্পিত মনে করে, সে নামাপরাধী এবং (৭) যাহার নাম-বলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, বহু যম, নিয়ম, ধ্যানধারণাদি কৃত্রিম যোগ প্রক্রিয়া-দ্বারাও তাহার নিশ্চয়ই শুদ্ধি ঘটে না; (৮) ধর্ম্ম, ব্রত, হোমাদি—এই সকল প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নামকে সমান জ্ঞান করাও অনবধানতা; (৯) শ্রদ্ধাহীন, নাম-শ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ প্রদান—তাহাও মঙ্গলপ্রদ নামের নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য; (১০) যে ব্যক্তি নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবোধযুক্ত হইয়া তাহাতে প্রীতি বা অনুরাগ প্রদর্শন করে না, সে ব্যক্তি ও নামাপরাধী।

শ্রুতি শাস্ত্রের নিন্দা অর্থাৎ গুরু-কথিত বাক্য শ্রবণ কর্‌বার পর সেই শ্রৌতবাণীর নিন্দা। ঐরূপ নিন্দা-প্রবৃত্তি গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্ছিন্ন করি'য়ে তর্কপন্থায় পাতিত করে। বাস্তবরাজ্যে ঐরূপ ধরণের বিপত্তি বা আশঙ্কা থাক্‌তে পারে না। যেখানে নিত্যানিত্য বিবেকের পূর্ণস্থান, সেখানে অজ্ঞান বা নিরানন্দের প্রবেশাধিকার নাই। সেই সচ্চিদানন্দরাজ্যে যে-সকল বাণী আছে, সেই বাণী ভূতাকাশ ভেদ ক'রে, জীবের কর্ণবেধ ক'রে কর্ণের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং আমাদের পূর্ব্ব বোধ বা প্রমার দ্বারা সঞ্চিত শব্দ-রাশিকে বিপর্য্যস্ত ক'রে সেখানে শুদ্ধ চেতনের রাজ্য আবিষ্কার করে। এইরূপ শ্রৌতবাণী যিনি কর্ণে প্রদান করেন, সেই শ্রুতির কীর্ত্তনকারীই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি নিরন্তর আমাদের কর্ণে শ্রৌতবাণীর অভিষেক ক'রে আমাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ করিয়ে দেন এবং সর্ব্বদা আমাদের মুখে বৈকুণ্ঠকীর্ত্তন প্রকাশিত হ'বার শক্তি সঞ্চার করেন; এমন যে পরমা শক্তি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। যে বহিরঙ্গা শক্তি জগতে নানাবিধ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি কর্‌ছে, সেই শক্তির কবল হ'তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে মুক্ত ক'রে দেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসদ্‌বিচার-প্রণালী, অস্থির সিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। কাজেই আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। যাঁ'র নিকট উপস্থিত হ'লে অন্য কা'রো কথা শুন্‌বার আবশ্যক বোধ হয় না—অন্য কা'রো কাছে যেতে হয় না, তিনিই সদ্‌গুরু। সকলের মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ ভগবান্ আমার জন্য সকল মঙ্গল যাঁ'র করে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁ'র নিকট শতকরা শত পরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তা' হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। আর যদি কপটতা, দ্বিহৃদয়তা, 'লোক-দেখান' মিছাভক্তি বা ভণ্ডামি করি, তা' হ'লে তিনিও বঞ্চনা ক'রে থাকেন। তিনি বলেন,—"তুমি শিষ্য হও নাই, তুমি শাসন নিবে না, তোমার হৃদয়ে পাপ আছে, কপট লোকের বিচারের কথা শোনার দরুণ বর্ত্তমানে আমার কথা শুন্‌বার মত কাণ তোমার প্রস্তুত হয় নি, সুতরাং তুমি বঞ্চিত হ'লে।" তিনি আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তা' নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য,—এটা হচ্ছে শরণাগতের লক্ষণ।

শ্রীগুরুদেব বলেন,—সর্ব্বক্ষণ, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবৎসেবা কর, হরিকীর্ত্তন কর, তা' হলেই তৃণাদপি সুনীচ হ'তে পার্‌বে। যদি অহঙ্কারীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর, তা' হ'লে 'প্রকৃতেঃ* ক্রিয়মাণানি' শ্লোকানুসারে তোমার সর্ব্বনাশ হ'বে।

* প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।। (গীঃ ৩।২৭)

দেহাদিতে অহং-বুদ্ধিবিশিষ্ট বিমূঢ় চিত্ত ব্যক্তি প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা সর্ব্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহকে আমিই করি এইরূপ মনে করে।

অনেকে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানে সদ্‌গুরুপাদপদ্ম বাজিয়ে নিতে চান। এ-সকল কর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি সদ্‌গুরুর সন্ধান পান না। সদ্‌গুরু পাদপদ্ম—স্বপ্রকাশবস্তু।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।।
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।।

—যখন এরূপ বিচার উপস্থিত হয়, তখনই বাস্তব সত্য, শ্রেষ্ঠ কল্যাণের আকর গুরুপাদপদ্ম আমাদের আর্ত্ত আত্মার নিকট এসে উপস্থিত হন, আমরা তখনই সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌তে পারি। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা—যা' আমাদের নিজের কাজে লাগে, সেই অপস্বার্থপরতা যদি আমাদের অন্তরের আরাধ্য ব্যাপার হয়, তা' হ'লে আমরা গুরুপাদপদ্মের নিকট যে'তে পার্‌ব না—যিনি গুরু ন'ন তাঁকে গুরু মনে ক'রে কেবল নিজের অনর্থ সংবর্দ্ধন করবো।

মনন ধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ কর্‌তে পারে যে বস্তু, সেইরূপ মন্ত্রই গ্রহণ করতে হ'বে। কাণ থাকলেও যদি হরিকীর্ত্তন শ্রবণ না হয়, যদি মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম প্রবল হয়, যদি আমরা চক্ষুকে নিযুক্ত করি—দৃশ্যবস্তু মেপে নেবার জন্য, কর্ণকে নিযুক্ত করি—শব্দের যাথার্থ্য নিরূপণের জন্য, নাসিকাকে নিযুক্ত করি—গন্ধকে ভোগ কর্‌বার জন্য, জিহ্বাকে নিযুক্ত করি—আস্বাদনীয় বস্তুর উপর প্রভুত্ব করবার জন্য, ত্বক্‌কে নিযুক্ত করি—স্পর্শের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য, তা' হ'লে গুরুসেবার উপকরণে আমাদের ভোগবুদ্ধির উদয় হলো, সেব্য-বস্তুতে—গুরুতে লঘুজ্ঞান হলো, আমরা মঙ্গল পেলাম না।

আমাদের গুরুপাদপদ্ম—ইহ-জগতের কোন ভোগ্য বিষয়ের উপদেশক ন'ন। আবার ইহ জগতের সকল কথার একমাত্র অভ্রান্ত মীমাংসক তিনিই। কিন্তু আমি বঞ্চিত, পতিত; আমার দুর্ব্বলতা-ক্রমে গুরুপাদপদ্মের সকল কথা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না। গুরুপাদপদ্মের কৃপায় যে-সকল কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হ'য়েছে, সে-সকল কথা বল্‌বার জন্য আমার কোটি কোটি জিহ্বা হউক—কোটি কোটি মুণ্ড হউক—কোটি কোটি বৎসর পরমায়ু হউক—আমি যেন সেই কোটি কোটি জিহ্বায়, কোটি কোটি মস্তকে, কোটি কোটি বৎসরে অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমার গুরুপাদপদ্মের অতুলনীয়া অমন্দোদয়দয়ার কথা কীর্ত্তন ক'র্‌তে পারি; তা' হ'লে আমার গুরুপূজা হ'বে—তিনি সন্তুষ্ট হ'বেন—প্রসন্ন হ'য়ে আমার প্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ ক'র্‌বেন, যাঁ'তে ক'রে আমি তাঁ'র দয়ার কথা আরও কোটি জিহ্বায় কীর্ত্তন ক'র্‌তে পার্‌ব। সেইদিন আমার সকল নশ্বর মায়ার কথা-কীর্ত্তন হ'তে ছুটি হ'বে—জগতের সকল লৌকিক-শিক্ষা হ'তে ছুটি হ'বে।

জগতের প্রিয় কথাকে আমরা গুরু-কথা বলে গ্রহণ করি—আমরা অচৈতন্য কথায় সর্ব্বদা প্রমত্ত; কিন্তু আমার গুরুদেব,—

"শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।"

শ্রীচৈতন্যদেবের হৃদ্‌গত অভিলাষ যিনি জগতে বিস্তার ও স্থাপন ক'রেছেন, সেই রূপ-প্রভু স্বয়ং কবে আমাকে তাঁর নিজ-পাদপদ্ম দান ক'র্‌বেন ? কবে আমি গুরুপাদপদ্মের অসামান্য, অতিমর্ত্ত্য সৌন্দর্য্য দর্শন ক'রে তাঁ'র চরণ একান্ত ভাবে আশ্রয় কর্‌ব ? এমন দিন আমার কবে হ'বে ?

যাঁ'রা এইরূপ বিচার অবলম্বন করেন, গুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রবণ ক'রেছি, তাঁ'রা রূপানুগ —তাঁ'রা শ্রীগৌরসুন্দরের অতিপ্রিয়। যাঁ'রা রূপানুগ হ'বার জন্য যত্ন করেন, তাঁ'দের মঙ্গলের কথা ব্রহ্মা তাঁ'র সমগ্র জীবনে ব'লেও শেষ ক'র্‌তে পারেন না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগের সকল সন্দেহ নিরাস ক'রে ভগবানের যে নামভজনের কথা ব'লেছেন, তা'তে জানি, গুরুর অবজ্ঞা করতে নাই—শ্রৌত-বাণীর নিন্দা ক'র্‌তে নাই—গুরুব্রুবগণকে পূজ্য-জ্ঞানে গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করতে নাই—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয় ব্যতীত জীবের অন্য মঙ্গল নাই।

কোথায় কত উচ্চে গুরুপদনখচন্দ্র, আর কোথায় আমি নিম্নতম স্তরে স্থিত বামন! আমি গুরুপাদপদ্মের সেবা কর্‌তে পারি কই ? আমি নিদ্রাকালে গুরুপাদপদ্মসেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে আত্মসুখে মগ্ন থাকি—আমি নিজের খাওয়া দাওয়া-ব্যাপারে নিযুক্ত থাকি। গুরুপাদপদ্মসেবা-বঞ্চিত এরূপ অযোগ্য আমি, পতিত আমি, দুর্ব্বল আমি, আমাকে প্রচুর পরিমাণে দয়া না ক'র্‌লে আমি তাঁ'র দয়ার প্রতি আরও অধিকতর আক্রমণ কর্‌তাম্। আমার গুরুপাদপদ্ম—দয়ার সাগর, তাঁ'র দয়া-সিন্ধুর এক বিন্দু আমাকে আনন্দসাগরে মগ্ন ক'র্‌তে পারে।

তিনি কতই না দয়া ক'রে আমাকে বল্‌তেন—তোমার পাণ্ডিত্য, তোমার পবিত্রতা, আভিজাত্য প্রভৃতি সব পরিত্যাগ ক'রে আমার কাছে এস, আর কোথাও যে'তে হ'বে না; তোমার যত ঘর, বাড়ী, প্রাসাদ, সৌধ দরকার আছে—যত পাণ্ডিত্য, প্রতিভার দরকার আছে—যত সংযম, সন্ন্যাসের দরকার আছে, সব পা'বে, তুমি কেবল আমার কাছে এস। 'ঘর হউক, দোর হউক, পাণ্ডিত্য হউক' এরূপ বুদ্ধিতে দৌড়িও না—সাধারণ লোক যা'কে 'প্রয়োজন' মনে ক'র্‌ছে, তা'কে 'প্রয়োজন' মনে করো না।

আমরা ভয়ানক তার্কিক ছিলাম। কিন্তু সেই তর্কের দর্পকে অতি দয়ার সহিত পদাঘাত ক'রে যিনি কৃপা ক'রেছিলেন, তাঁ'র দয়ার কথার সীমা ক'র্‌তে আমি অনন্ত কোটি জীবনেও পার্‌ব না, বা কেহ কোন দিন পার্‌বে না। তাঁ'র ভৃত্য ব'লে পরিচয় দিবার যোগ্যতা যদিও আমার নেই, তথাপি তিনি সেরূপ পরিচয় দিবার যে আশাবন্ধ করিয়ে দিয়েছেন, আমরা তা'তে নিত্যকাল জীবিত থাক্‌তে পারি। আমরা নিরানন্দের মধ্যে প্রবিষ্ট আছি—প্রচুর পরিমাণ অনিত্য কার্য্যে নিবিষ্ট আছি। আমরা দুর্ব্বল ব'লে মনে

হ'য়েছিল, গুরুদেবের অপ্রকটে বিপথগামী হ'য়ে যা'ব, তাঁ'র কথা শুন্তে পা'ব না; কিন্তু আজ গুরুপাদপদ্মের বহু বহু অবতার কৃপা ক'রে আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়েছেন। তাঁ'রা আমার নিকট কীর্ত্তন করেন, ভাগবত প'ড়ে অর্থ জানিয়ে দেন। তাঁ'রা যখন আমার গুরুপাদপদ্মের অভিমত নবনবায়মান ব্যাখ্যাসমূহের দ্বারা আমার মৃত শরীরকে সঞ্জীবিত করেন, তখন আমি সংজ্ঞা লাভ করি—আমার প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন কর্‌বার সৌভাগ্য হয়।

যে পরিমাণে হরিবিস্মৃতি হ'বে, সেই পরিমাণে এই চক্ষুর দ্বারা দেখ্‌বার চেষ্টা হ'বে, এই নাসা-দ্বারা জগতের গন্ধ গ্রহণ ক'র্‌বার স্পৃহা হ'বে, গ্রীষ্মকালে পাখার বাতাস খাব, শীতকালে লেপ মুড়ি দিয়ে স্পর্শসুখানুভব কর্‌বো—এরূপ লালসা হৃদয়ে স্থান পা'বে।

গীতায় যখন শ্রীভগবান্,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

—বাক্য ব'লেছিলেন, তখন অর্জ্জুন ভগবানের সেই বাণী শুনলেন, আর বাদ বাকী লোক মনে ক'র্‌ল সকল লোকই—স্বার্থপর, কৃষ্ণও তদ্রূপ; তিনি ত' ব'ল্‌বেনই—'সকল ছেড়ে আমার সেবা কর'। কিন্তু যে সেবা কর্‌বে, তা'র দুঃখের দিকে ত' তিনি আর দেখ্‌লেন না।

"My doxy is orthodoxy, yours is heterodoxy". আমি যা' বুঝি, এ'টাই খুব ঠিক,—এ'কথা না বল্‌লে আত্মপক্ষ সমর্থন হয় না; কৃষ্ণচন্দ্র সেই ভাবেরই উপদেশ দিয়েছিলেন।" জীবের এইরূপ কুতর্কের সমাধান ক'র্‌বে কে? কৃষ্ণের সেবার কথা কৃষ্ণ যখন বলেন, তখন কলিহত লোকের এরূপ তর্ক উপস্থিত হ'তে পারে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র যখন সেবকমূর্ত্তিতে বলেন,—আমার আচরণ এই, তোমার যদি এই আচরণ ভাল বোধ হয়, তা'হলে এরূপ আচরণ কর। নিজে আচরণ ক'রে যিনি অগ্রসর হন, অপরের পক্ষে তাঁ'র অনুসরণ কর্‌বার পরম সুযোগ হয়। যেমন একজন প্রধান গায়ক ও তাঁ'র অনেকগুলি দোহার। যিনি সর্ব্বপ্রধান গায়ক, তিনি আগে গানটা গেয়ে দেন, অন্যে যদি তাঁ'র দোহারগিরি করেন, তবে তাঁ'দেরও গান গাওয়া হয়। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূল গায়করূপে কৃষ্ণের গান গেয়ে দিয়েছিলেন; যাঁ'রা যাঁ'রা নিষ্কপটভাবে সেই গানের দোহারগিরি কর্‌বেন, তাঁ'দেরও গান গাওয়া হ'বে—মঙ্গল হ'বে।

'অমঙ্গল' আর 'মঙ্গল' যদি এক হ'য়ে যায়, তা'হ'লে অনুভূতি বলে জিনিষ থাকে

না। অনুভূতি-বিরহিত জিনিষ—পাথর। সুখের অনুভূতি যাঁ'রা পেয়েছেন, তাঁ'দের আর পাথর হ'বার ইচ্ছা হয় না। যাঁ'রা অজ্ঞানের অনুসরণ করাটাকেই 'জ্ঞান' ব'লে মনে করেন, আনন্দ পেতে গিয়ে নিরানন্দ-সাগরে ডুবে যান, তাঁ'দের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না।

শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে বটে, কিন্তু কি শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে? স্কুল-কলেজে ত' আমরা অনেক শ্রবণ ক'রে থাকি; কিন্তু যাঁ'রা আমাদের কাছে ঐসকল শ্রবণীয় বিষয় কীর্ত্তন করেন, তাঁ'রা কে? তাঁ'দের কি ব্যারামটা ভাল হ'য়েছে? ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—মানবের যেগুলি স্বাভাবিক দোষ আছে, সেই দোষ থাক্‌তে তাঁ'রা কিরূপে স্বতঃ বা পরতঃ আলোচনা ক'রবেন? যিনি এসকল দোষ হ'তে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, তাঁ'র আশ্রয় ব্যতীত কি প্রকারে আমরা ভ্রমাদি-নির্ম্মুক্ত সত্যকথা শ্রবণ ক'র্‌তে পারি? যিনি ভগবৎপাদপদ্মের সর্ব্বদা অনুশীলন করেন, তাঁ'র আনুগত্যময়ী সেবা-দ্বারা তিনি যাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যেতে পারে, অন্যভাবে পাওয়া যেতে পারে না,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।"

আমার ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা তর্কপথে জ্ঞানসংগ্রহের চেষ্টা বিপজ্জনক। সেইরূপ জ্ঞান-সংগ্রহের আশায় যতদিন আস্থা স্থাপন করি, ততদিন সমগ্র জ্ঞান পাই না, বিকৃতজ্ঞান—অসম্যগ্‌জ্ঞান বা কখনও কখনও আংশিক জ্ঞান লাভ ক'রে থাকি। আংশিক জ্ঞান সংগ্রহ ক'র্‌তে গিয়ে খানিক জান্‌তে জান্‌তেই আয়ু ফুরিয়ে যা'বে। নমস্কারের পন্থাই স্বীকার্য্য অর্থাৎ কাণটা পাতা। সাধুদিগের মুখকথিত বার্ত্তা যিনি কাণ পেতে শ্রবণ করেন, তাঁ'রই মঙ্গল হয়। ভবদীয় বার্ত্তা—কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা কৃষ্ণভক্ত-সম্বন্ধীয় কথা যিনি আলোচনা করেন, তিনিই সাধু। অন্য সব কথা বায়ুরাশিতে বিলীন হ'য়ে যায়। উহা শত শত বৎসর ধ'রে উচ্চারণ করলে কি ফল হবে?

"হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন।"

কাল চ'লে যাচ্ছে, তা'তে আয়ুহরণ হ'য়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে কে সিদ্ধিলাভ ক'র্‌বেন? শ্রৌতপন্থীই সিদ্ধিলাভ কর্‌বেন। বাদের প্রতিবাদ আছে, তর্কের কোনদিন প্রতিষ্ঠা নাই; কিন্তু শ্রৌতপথ নিত্য সম্প্রতিষ্ঠিত। যিনি সর্ব্বদা—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্ঠা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হরিকীর্ত্তন করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ ক'র্‌তে পারেন।

কীর্ত্তনীয় বিষয়টী কি? —নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা। যদি বাস্তব বস্তুর নাম কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর রূপ কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর গুণ কীর্ত্তিত হয়,

যদি বাস্তব-বস্তুর পরিকর-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর লীলা কীর্ত্তিত হয়, তা' হ'লেই আমাদের সমস্ত মঙ্গল হ'বে—আমাদের অহঙ্কার নষ্ট হ'য়ে যাবে—আমাদের অসহিষ্ণুতা নষ্ট হ'বে। জড় প্রতিষ্ঠার আশাকে বর্জ্জন ক'রে সমগ্র বহির্ম্মুখ জগতের নিকট পরম অসাধু ব'লে খ্যাতি লাভ ক'রেও আমরা পরমানন্দ লাভ ক'র্তে পার্ব। ভাগবতের ত্রিদণ্ডীর প্রতি বহির্ম্মুখ জগৎ হ'তে অনেক অত্যাচার হ'য়েছিল। সত্যের কীর্ত্তনকারী—হরিকথা-কীর্ত্তনকারীর প্রতি অত্যাচার কর্‌বার জন্য সমগ্র বহির্ম্মুখ জগৎ, এমন কি দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত। ত্রিদণ্ডী জগতের বহির্ম্মুখ সমাজের কথায় কর্ণপাত না ক'রে আপন মনে হরিকীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে ভূমণ্ডলে বিচরণ ক'রেছিলেন,—

"এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব।।"

কৃষ্ণ যখন "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ব'ল্লেন, তখন বহির্ম্মুখ লোক কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রকৃতি-প্রসূত প্রাণিবিশেষ মনে ক'রে বল্লেন, কৃষ্ণচন্দ্র নিজের পূজার কথা নিজে বল্‌ছেন, কৃষ্ণ কিরূপ আত্মসুখপর! সেইজন্য সেই কৃষ্ণচন্দ্রই জীবের মঙ্গলের জন্য গুরুর পোষাকে উপস্থিত হ'লেন। তাঁ'র উপদেশ ও আচরণ হ'লো—কৃষ্ণকে ভজন কর—কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর। বোকা লোকেরা মনে ক'র্‌লে, একজন সাধক জীব এসে উপস্থিত হ'য়েছেন; বুদ্ধিমানেরা উপলব্ধি ক'রলেন, কৃষ্ণ বড় চতুর, শঠ, তাই ভোল বদ্‌লেছেন, আশ্রয়জাতীয় আবরণ প'রেছেন; তাঁ'কে তাঁ'রা চিনে ফেল্লেন। আর আমার মত লোক মনে ক'র্‌লেন, একজন আচার্য্য, একজন ধর্ম্মপ্রচারক উপস্থিত হ'য়েছেন, তিনি সমাজবিপ্লব সাধন কর্‌ছেন। "হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই। কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়। সেই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়।।"

যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তা'হ'লে সেই সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁ'দের কপালের জোর আছে, তাঁ'রা এই সুবিধাটা পান। যিনি যেরূপভাবে শরণাগত হন, তাঁ'র নিকট তদুপযোগী গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হ'ন।

'ভগবান্' শব্দের অর্থ আলোচনা ক'র্‌তে গিয়ে গল্পের মত স্কুলে প'ড়েছিলাম,—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।।"

'বৈরাগ্য' ব'লে কথাটা গল্পের মত শুনেছিলাম, 'বৈরাগ্যশতক', 'শান্তিশতক', 'মোহমুদ্‌গর' প্রভৃতিতে বৈরাগ্যের উপদেশ পাঠ ক'রেছিলাম; কিন্তু আমরা তা' সাক্ষাদ্ভাবে দেখ্‌তে পেয়েছি যে বৈরাগ্যের আদর্শ-মূর্ত্তি দে'খেছি, তা' মোহমুদ্‌গরের বৈরাগ্যমাত্র নয়—ফল্গুবৈরাগ্য নয়, সে বৈরাগ্য—মহাভাবময়—কৃষ্ণসেবার পরাকাষ্ঠাময়।

কেবল কনক-কামিনীতে বৈরাগ্য নয়, প্রতিষ্ঠাশায় পর্য্যন্ত যাঁ'র বৈরাগ্য, এরূপ পুরুষ আমার আরাধ্য হউন—একটি শিষ্যও যিনি করেন না, এমন শ্রীপাদপদ্ম আকাঙ্ক্ষা ক'রে তাঁ'র নিকট গিয়ে উপস্থিত হ'লাম এবং তাঁ'র কাছে কৃপা ভিক্ষা ক'র্‌লাম। তিনি ব'ল্লেন, আমি শিষ্য ক'র্‌ব না। আমি ব্যথিত হ'লাম বটে, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লাম, দেখি, আমি কতবার প্রত্যাখ্যাত হ'তে পারি। আমি তাঁর কৃপা না নিয়ে জগতে বিচরণ কর্‌ব না।

সেই গুরুপাদপদ্মের নিকট যখন উপস্থিত হ'লাম, তখন তাঁ'র কৃপায় জান্‌তে পার্‌লাম, আমি যাঁ'কে সর্ব্বোত্তম আদর্শ ব'লে মনে করি—শ্রেষ্ঠ জীবন মনে করি, সেই আদর্শ তাঁ'র নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধম। জগতের সকলের সহিত আমার আদর্শের মিল ছিল না; কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম একটী অলৌকিক বিচার দেখিয়ে দিলেন। পূর্ব্বে 'নেতি নেতি' বিচারপর নির্ব্বিশেষবাদীর অনেক গ্রন্থ আলোচনা ক'রেছিলাম। তাঁর বাস্তব উদাহরণ পেয়ে গেলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে জানালেন, তুমি যে আদর্শের অনুসন্ধান ক'র্‌ছ, সেই আদর্শ তোমার নহে। আমি মনে ক'রছিলাম, আমার গুরুপাদপদ্মে অদ্বিতীয় বৈরাগ্য আছে বটে, কিন্তু তাঁ'র পাণ্ডিত্য কিছু কম আছে। তিনি পুঁথি-পত্রের বিচার অহঙ্কারকে চূর্ণ ক'রে দিয়েছিলেন—তাঁ'র কৃপা-মুদ্‌গরের দ্বারা। তিনি জানিয়েছিলেন, তোমার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ—প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যখন তাঁ'র এই বাণী কর্ণে প্রবেশ ক'রেছিল—যখন তাঁ'র কৃপা পেয়েছিলাম, তখন আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সেই দিব্যজ্ঞান ধারণ ক'র্‌বার ক্ষমতা ছিল না। এতবড় কথাটা তিনিই আমার মত বোকা সব-জান্তাকে শুনবার সুযোগ দিয়েছিলেন।

এক সময়ে বাঙ্গালা দেশের একজন প্রধান ভূম্যধিকারী, আমি কা'র আশ্রিত, অনুসন্ধান ক'রে, আমার গুরুপাদপদ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জেনে আমার প্রভুকে ভূম্যধিকারী মহাশয়ের প্রাসাদে তাঁ'র ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হ'য়েছিলেন। বৈষ্ণব-ভূপতির সদৈন্য কাতর প্রার্থনা শু'নে আমার গুরুপাদপদ্ম উক্ত ভূপতিকে বল্লেন যে, আমি যদি আপনার প্রাসাদে গমন করি, তা' হ'লে হয়ত' সেখানে আমার থেকে যাওয়ার ইচ্ছা হ'বে এবং আপনার লোকজন আমাকে আপনার সম্পত্তির ভাগীদার মনে ক'রে আমার প্রতি মামলা মোকর্দ্দমা জুড়ে দিবেন। আমার মামলা-মোকর্দ্দমা কর্‌বার সামর্থ্য নাই, সুতরাং আপনি এই শ্রীধামের গঙ্গাপুলিনে আমার নিকট বাস ক'রে নিশ্চিন্তে হরিভজন করুন। আমি আপনার জন্য একটি গাড়ীর ছই নির্ম্মাণ ক'রে দিব এবং ভিক্ষা ক'রে আপনার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করা'ব। আর আপনি আপনার সমস্ত বিষয়, সম্পত্তি গোমস্তাগণের হাতে অর্পণ ক'রে বিষয় হ'তে নিবৃত্ত হ'লে বৈষ্ণব হ'তে পার্‌বেন, তখন আমি বৈষ্ণবের প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আবদ্ধ থাক্‌ব। যদি আমি আজ আপনার নিমন্ত্রণ স্বীকার ক'রে এই অপ্রাকৃত গৌরধাম হ'তে আপনার প্রাসাদে

গিয়ে বাস করি, তা'হলে কিছুদিনের মধ্যেই রাজার স্বভাব লাভ ক'রে বিপুল ভূমি ও বিষয়-সংগ্রহের জন্য আমাকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে। তা'তে ফল হ'বে যে, কিছুদিনের মধ্যে আমার কৃষ্ণভজনের অভিলাষ বিষয়সংগ্রহের পিপাসায় পর্য্যবসিত হ'য়ে আমি রাজার হিংসার পাত্ররূপে পরিগণিত হ'ব। পক্ষান্তরে, যদি আপনি আমার কুটীরের পাশে অপর কুটীর স্থাপন ক'রে ভজন করেন, এবং মাধুকরী গ্রহণ ক'রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তা'হ'লে কোনদিন আমরা প্রণয়চ্যুত হ'য়ে হিংসায় প্রবৃত্ত হ'ব না। যদি আপনার ন্যায় বৈষ্ণব-বন্ধু মহারাজ আমার প্রতি কোন কৃপা-প্রদর্শন কর্‌তে ইচ্ছা করেন, তা'হ'লে আমার ন্যায় জীবন অবলম্বন ক'রে হরিভজন করুন, তা'হ'লেই আমাকে কৃপা করা হ'বে—আমার সঙ্গে আপনার আন্তরিক বন্ধুত্ব হ'বে।

আমার গুরুপাদপদ্মের এইরূপ পরামর্শ শ্রবণ ক'রে বৈষ্ণব-রাজেন্দ্র স্তম্ভিত হ'লেন। যাহাদিগকে তিনি বৈষ্ণব ব'লে পোষণ করেন, তাহাদিগের চরিত্র ও এই মহাত্মার চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি কর্‌লেন। রাজার আশ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁ'র রুচির অনুকূল বাক্য ব'লে কিছু জাগতিক লাভ অর্জ্জনে ব্যস্ত, আর আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম রাজার রুচির বিপরীত কথা ব'লেও ভূপতির প্রকৃত মঙ্গল বিধানে ব্যস্ত। আমার গুরুদেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জগতে কাহারও নিকট কোন কৃপাপ্রার্থী ন'ন। সকলে নিষ্কপটে হরিভজন করুন—এই তাঁ'র শুভেচ্ছা। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করাকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দয়ার কার্য্য জানেন। বিষয়ে রুচি বা কাহারও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞে বাতাস দেওয়াকে তিনি 'কৃপা' জান্‌বার পরিবর্ত্তে ভীষণ 'হিংসা' জ্ঞান করেন।

আমার শ্রীগুরুদেব নদীয়া সহরের গঙ্গার তটের বিভিন্ন স্থানে পাগলের ন্যায় প'ড়ে থাক্‌তেন। তিনি পাক ক'রে খাওয়া, কোন বিষয়ীর ভোজ্য-দ্রব্য গ্রহণ করা, বিষয়ীর ঠাকুর বাড়ীতে খাওয়া প্রভৃতিকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার ক'রেছিলেন। কখনও কাঁচা চা'ল জলে ভিজিয়ে খে'য়ে থাক্‌তেন, কখনও পাঁক খে'য়ে থাক্‌তেন; অধিকাংশ সময়েই নগ্ন থাক্‌তেন, কখনও কখনও শ্মশানে সৎকারার্থ আনীত মৃতের পরিত্যক্ত বসন সংগ্রহ ক'রে তা'দ্বারা অঙ্গ আবৃত কর্‌তেন। তাঁ'র কাছে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আসত; অনেক গৃহস্থবৈষ্ণব ধনাঢ্য ব্যক্তি আমার প্রভুকে অনেক টাকা, মূল্যবান্ শাল প্রভৃতি বস্ত্র দিতেন। টাকা পে'য়ে কাপড়ের দুই পাঁচটি গ্রন্থি দিয়ে নানা স্থানে রেখেও অর্থের জন্য ব্যতিব্যস্ততা দেখা'তেন। মূঢ় অর্থপ্রিয় ব্যক্তিগণ মনে করতেন যে, তাঁ'র অর্থে প্রচুর লোভ আছে। কেহ তাঁ'কে মূল্যবান্ বস্ত্র দিলে তিনি দাতাকে বিশেষ প্রশংসা কর্‌তেন এবং সেরূপ বস্ত্রের অকিঞ্চিৎকরতা জানিয়ে দিতেন। তিনি বল্‌তেন, আমি ত' বৈষ্ণব হ'তে পার্‌লাম না। যে-সকল লোক এ-সকল জিনিষ দিয়ে গেছেন, তাঁ'রা বৈষ্ণবের ব্যবহারের জন্যই দিয়েছেন; সুতরাং বৈষ্ণবেরই উহা গ্রহণ কর্‌বার যোগ্যতা—এ ব'লে তিনি ঐ সকল টাকা-পয়সা বৈষ্ণব-সেবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিতেন।

তাঁ'র শতাংশের একাংশের বৈরাগ্যের সহিত জগতের শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যবান্‌গণের বৈরাগ্যের তুলনা হ'তে পারে না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। আমার গুরুপাদপদ্ম শুধু কনক-কামিনী ছেড়ে দিতে বলছেন, এমন নহে, সাধুগিরি দেখান' পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে বল্‌ছেন; তিনি ভাগবত পরমহংস ছিলেন। পারমহংসী সংহিতা ভাগবতের আশ্রয় ব্যতীত কখনও পারমহংস্যধর্ম্ম থাক্‌তে পারে না।

একবার একটি কৌপীনধারী আমার গুরুপাদপদ্মের নিকট এসে বল্লেন যে, আমি কুলিয়া-নবদ্বীপে পাঁচকাঠা জমি কোন এষ্টেটের কর্ম্মচারীর নিকট হ'তে সংগ্রহ ক'রেছি। তা'শুনে আমার প্রভু বল্লেন, শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত, প্রাকৃত ভূম্যধিকারিগণ কি প্রকারে এখানে ভূমি প্রাপ্ত হ'লেন যে, তা' হ'তে সেই কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা জমি দিতে সমর্থ হ'য়েছেন! এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ধনরত্ন বিনিময়ে প্রদান কর্‌লেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটি বালুকণার মূল্যের তুল্য হয় না। সুতরাং উক্ত জমিদার অত মূল্য কোথায় পা'বেন যে তাঁ'র নবদ্বীপের ভূমি বিক্রয় কর্‌বার অধিকার আছে? আর কৌপীনধারীরই বা কত ভজন-বল—যা'তে তিনি ভজনমুদ্রার বিনিময়ে অত জমি সংগ্রহ কর্‌তে পেরেছেন। শ্রীনবদ্বীপধামের ভূমিতে প্রাকৃত-বুদ্ধি কর্‌লে ধামবাস হওয়া দূরে থাক্, ধামাপরাধ হ'য়ে থাকে। অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে 'প্রাকৃত' জ্ঞান কর্‌লে তাত্ত্বিক লোক তা'কে 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলেন।

এক সময় একজন ভাগবতের কথকতায় বিশেষ নিপুণ, 'গোস্বামী' নামে পরিচিত ব্যক্তির লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা সাধারণের মুখে শ্রবণ ক'রে তিনি সেই ভাগবত-কথক বহুশিষ্য-সংগ্রাহক গোস্বামী ম'শায়ের ভক্তি-প্রচারের সবিশেষ তথ্য অনুসন্ধান করেন। সেই গোস্বামী ম'শায় 'গৌর গৌর' বলান ও অসংখ্য শিষ্যসংগ্রহের চাতুরী জানেন শুনে আমার প্রভু বল্লেন, ঐ প্রতিষ্ঠাশালী পাঠক ভাগবতব্যাখ্যা বা 'গৌর গৌর' বলেন নাই, 'টাকা, টাকা', 'আমার টাকা' ব'লে চীৎকার ক'রেছেন, উহা কখনই ভজন নহে, সত্যধর্ম্মের আবরণ-মাত্র; তদ্দ্বারা জগতের অনিষ্ট ব্যতীত কোন উপকার সাধিত হ'বে না।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপটতা ও নিরপেক্ষতার আদর্শ-স্বরূপ অপার্থিব চরিত্রের সম্বন্ধে অসংখ্য কথা আমরা শুনেছি ও প্রত্যক্ষ ক'রেছি।

সকল শব্দই বিষ্ণুকে উদ্দেশ কর্‌ছে। যে শব্দ বিষ্ণু হ'তে পৃথক্ হ'য়ে অন্য কিছুর উদ্দেশ করে, তাহা শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি; তা'তে কৃষ্ণের অদ্বিতীয় ভোক্তৃত্ববিচারের পরিবর্ত্তে জীবের মায়া-ভোক্তৃত্বের বিচার আনয়ন করে। আমরা দর্শনের বড় বড় কথাগুলি—ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে অতি সরলভাবে আকারিত দেখ্‌তে পেয়েছি। যদি ভগবানের অনুগ্রহ হয়, তা' হ'লে তিনি অতি সোজা কথায়

মানবজাতিকে এ সকল কথা জানিয়ে দেন। তখনই তা'রা বুঝতে পারে, বাস্তব সত্য কি জিনিষ, আর কাল্পনিক ও আপাততঃ জগতের কাজ চালান সত্য বা আপেক্ষিক সত্য কি জিনিষ।

ব্যভিচার-বৃত্তি দ্বারা কখনও সেবা হয় না। সেবা জিনিষটা—অব্যভিচারিণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি। বেদান্ত-বোধই হ'তে পারে না—গুরুপাদপদ্মের অব্যভিচারিণী সেবা ব্যতীত। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কেহ গুরুই হ'তে পারেন না—এটা গোঁড়ামির কথা নয়, বাস্তব-সত্য,—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।।

পূর্ব্বকালে দক্ষিণ প্রদেশে কাঞ্চিপুর নামক একটি নগর ছিল। সেখানে যাদবপ্রকাশ নামে একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বাস ক'রতেন। সে সময় সে দেশে তাঁ'র সমকক্ষ কোন দ্বিতীয় অধ্যাপক ছিলেন না ব'লে জনশ্রুতি। লক্ষ্মণ দেশিক (আচার্য্য শ্রীরামানুজ) তাঁ'র নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য গমন ক'রেছিলেন এবং সেই গুরুর অন্তেবাসী হ'য়ে ঐকান্তিক শাস্ত্রানুশীলন ও অকৃত্রিম ব্যবহারের দ্বারা অল্প দিনের মধ্যেই যাদবপ্রকাশের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তে পেরেছিলেন। একদিন যাদবপ্রকাশ "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" ছান্দোগ্য শ্রুতির শঙ্করাচার্য্যমতানুসারিণী ব্যাখ্যা স্থলে "আস্যতে উপবিশ্যতে অনেন ইতি আসঃ পশ্চাদ্ভাগঃ কপেঃ আসঃ কপ্যাসঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের চক্ষুর্দ্বয় বানরের পশ্চাদ্ভাগের ন্যায় রক্তবর্ণ অর্থ করায় রামানুজ হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হন। রামানুজ তখন যাদবপ্রকাশের অভ্যঙ্গ-সেবায় রত ছিলেন। ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির নিন্দা শ্রবণে তাঁ'র হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হলো। তাঁ'র দুই চক্ষু হ'তে তপ্ত অশ্রুধারা দরদর ধারে নির্গত হ'য়ে যাদবপ্রকাশের পৃষ্ঠদেশে দু'এক বিন্দুরূপে পতিত হ'লে যাদবপ্রকাশ হঠাৎ চমকিত হ'য়ে রামানুজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন; রামানুজ তখন বল্‌লেন যে, 'কপ্যাসং' শ্রুতির সুন্দর অর্থ থাক্‌তে এরূপ জঘন্য অপরাধজনক অর্থ কর্‌বার প্রয়োজন কি? যিনি পরমারাধ্য পরমেশ্বর, তাঁ'র অপ্রাকৃত চক্ষের সহিত মর্কটের জঘন্য প্রদেশের তুলনা করা কি অত্যন্ত অপরাধের কার্য্য নয়? রামানুজের এই কথা শু'নে যাদবপ্রকাশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে বল্‌লেন,—কি এত বড় আস্পর্দ্ধা! সামান্য বালকের আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যার দোষ-দর্শন! শ্রুতির আচার্য্যের ব্যাখ্যা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা কি হ'তে পারে? রামানুজ তখন বিনয়-নম্রবচনে বললেন,—হাঁ, আচার্য্য অদৈবপ্রকৃতি ব্যক্তিগণকে বিমোহিত কর্‌বার জন্য যে ব্যাখ্যা ক'রেছেন, তা' ছাড়া শ্রুতির দিব্যসূরিগণের আনন্দবর্দ্ধিনী ব্যাখ্যা আছে। আমি বলছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। তখন রামানুজ 'কপ্যাসং' শ্রুতির এরূপ ব্যাখ্যা কর্‌লেন,—"কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ নালঃ তস্মিন্ আস্তে তিষ্ঠতি ইতি কপ্যাসং

নালস্থিতমিত্যর্থঃ" অর্থাৎ তাঁহার (পুরুষোত্তমের) চক্ষুর্দ্বয় নালস্থিত অম্লান পদ্মের ন্যায় রক্তিমাভ। যাদবপ্রকাশ এই ব্যাখ্যা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হ'লেন এবং শিষ্যের নিকট পরাজিত হ'য়ে গোপনে গোপনে রামানুজকে সংহার কর্‌বার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

নির্ভেদ-জ্ঞানিগুরু, কর্ম্মিগুরু, যোগিগুরু, ব্রতিগুরু, তপস্বিগুরু, ঐন্দ্রজালিকগুরু, কপটগুরু কখনই 'গুরু' পদবাচ্য হ'তে পারেন না, তাঁ'রা সকলেই—লঘু। তাঁ'রা জীবের উপকারক নন,—আত্মহিংসক ও পরহিংসক। কিন্তু একমাত্র মহাভাগবত বৈষ্ণব-গুরুই জীবে অহৈতুক দয়াময়, পরদুঃখ-দুঃখী; এজন্য আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু সেই পরদুঃখ-দুঃখী সম্বন্ধজ্ঞানদাতা সনাতন প্রভুকে আশ্রয় কর্‌বার উপদেশ প্রদান ক'রেছেন,—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।।

জ্ঞানলাভের আকর কেবল-চেতন, না মিশ্রিত-চেতন—কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্, না অন্য কিছু? কথাগুলি চিন্মাত্রবাদ থেকে এসেছে, না অচিন্মাত্রবাদ থেকে এসেছে, কিম্বা নিত্যানন্দময় চিদ্‌বিলাস থেকে এসেছে, সর্ব্বাগ্রে স্থির হওয়া আবশ্যক। জড়ে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার নাম—অচিন্মাত্রবাদ, চেতনে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার নাম—চিন্মাত্রবাদ, আর নিত্য আনন্দময় চেতনরাজ্যে নিত্যভগবৎসেবা করার নাম—পরম নিরপেক্ষ হইয়া নির্ব্বিবাদে চিদ্‌বিলাসে অবস্থান।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত মুক্তি—ত্রিপুটীবিনাশমাত্র নয়, তা' স্বরূপে অবস্থান। "মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" স্বরূপে অবস্থিত হ'লে অচেতনতা স্পর্শ করিতে পারে না, তখন চেতনের ক্রিয়া যে সেবা, তা' পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়—যাঁ'র চেতনে যেটী নিত্যসিদ্ধসেবা, সেই অপ্রতিহতা সেবাটী তখন বিকসিতা হ'য়ে উঠে,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।।

ভগবান্ বল্‌ছেন, আমাকে যে-ভাবে যে পূজা করেন, আমিও তাঁ'কে সেই ভাবে পূজা ক'রে থাকি। কান্তরসে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সেবা, কাজেই কৃষ্ণও সেখানে তাঁ'র সর্ব্বাঙ্গ কে বিলায়ে দেন—আপনাকে দিয়েও ঋণী জ্ঞান করেন। এখানে 'মাং' শব্দটী লক্ষ্য কর্‌তে হ'বে। 'মাং' শব্দ সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণকে লক্ষ্য কর্‌ছে। কৃষ্ণ বল্‌ছেন,—আমাকে যে পাঁচ প্রকারে পূজা করে, তাঁ'র যে কোন প্রকারের তটস্থগত বিচারের প্রপত্তির তারতম্যতা লক্ষিত হয়। কান্তরসে প্রপত্তির পরাকাষ্ঠা। 'আমাতে' যদি না হয়, আমার ছায়া বা বহিরঙ্গা মায়াতে হ'লে আমাতে প্রপত্তি হ'লো না। দধিকে যদি দুগ্ধ বলা যায়, তা' হ'লে হ'বে না। দধির আকর দুগ্ধ বটে, বিকৃত দুগ্ধ কখনই দধি নয়। যদি কেউ বিষ্ণুর বিকৃত কল্পনা দর্শন ক'রে সেই বিকৃত দর্শনের শরণাগত হন, তা' হ'লে হ'বে না। বিষ্ণুর

বিকার হয় না; কিন্তু যিনি দেখছেন, তাঁ'র যদি দর্শন বিকার-প্রসূত ব্যাপার হয়, তা' হ'লে বিষ্ণু-দর্শন হলো না, জান্‌তে হ'বে।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।।

কৃষ্ণ ব্যতীত ইতর বস্তু দর্শনই অবৈধ দর্শন। এ অবৈধ দর্শনেই আমাদের যত অমঙ্গল ও ভেদবুদ্ধি। এরূপ অবৈধ-দর্শনের অবস্থাটা কে'টে গেলে সত্যসত্যই কৃষ্ণকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ—অখিলরসামৃতসিন্ধু । তিনি দ্বাদশ রসের আশ্রয়। পাঁচটা মুখ্যরস ও তৎপরিপোষক সাতটি গৌণরস কৃষ্ণেই পূর্ণভাবে সমন্বিত হ'য়েছে।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বল্‌লেন—অখিলরসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী রসের পরিচয় প্রদান কর্‌ছি, শ্রবণ করুন। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হ'লেন, তখন যাঁ'র যেই রস, তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখতে লাগলেন। বীর-রসপ্রিয় মল্লগণ দেখ্‌ল, যেন কৃষ্ণ তা'দের নিকট সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপে উদিত হ'লেন এবং মধুর-রসপ্রিয় স্ত্রীগণ তাঁ'কে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান মন্মথরূপে দর্শন কর্‌লেন। নর-সমূহ জগতের একমাত্র নরপতি ও সখ্যবাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল তাঁ'কে স্বজনরূপে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। ভয়ার্ত্ত অসৎ রাজগণ শাসনকর্ত্তৃরূপে কৃষ্ণকে দর্শন কর্‌তে লাগ্‌লেন। পিতা-মাতা তাঁ'কে সুন্দর শিশুরূপে দর্শন কর্‌লেন। ভোজপতি কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্‌রূপে, শান্তরসের পরম যোগিসকল পরতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁ'কে প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন।

অন্য কথায় ঘুরে টুরে এসে সকলেই কৃষ্ণসেবা পা'বেন। কারণ কৃষ্ণই একমাত্র আকর্ষক, আর আমরা আকর্ষণীয়। সেই আকর্ষক ও আকর্ষণীয়ের মাঝখানে যে আগন্তুক আড়াল এসে প'ড়েছে, সেই আড়ালটা সরে গেলেই আকর্ষকের আকর্ষণের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হ'বে।

অচিৎএর সহিত যে সংশ্রব, তা'র নামই দুঃসঙ্গ। দেহ ও মনের দ্বারা সেই দুঃসঙ্গ হয়। এই দুঃসঙ্গ ছেড়ে দিলে আমাদের আকর্ষণীয় স্বরূপ আকর্ষক কৃষ্ণের সাক্ষাৎ আকর্ষণের সহিত মিলিত হয় । কৃষ্ণ কেবল চেতনকে আকর্ষণ করেন। কেবল চেতন হ'তে কৈবল্যভাব গৃহীত না হ'লে চেতন-রাজ্যের আরদালী সকল প্রবেশ-নিষেধ বল্‌বে। বহির্জগতের প্রমাণ থেকে সূক্ষ্ম আকারে যে সকল জিনিষ গৃহীত হয়, সেই সকল জিনিষের আকর্ষণও ঔপাধিক। কৃষ্ণজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান বা প্রাকৃতজ্ঞান

যে প্রমা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তা' জ্ঞানের স্তরবিশেষ। নির্ব্বিশেষবাদীর ধারণায় যে ব্রহ্ম, তা'তে ব্রহ্মদর্শন ব'লে কোন জিনিষ হ'তে পারে না। যোগিগণের বিচারে পরমাত্ম-দর্শন বা ঈশ্বর-সাযুজ্য ব্রহ্ম-সাযুজ্য অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধের কথা। ব্রহ্মসাযুজ্যে জীবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, ঈশ্বর-সাযুজ্যে জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে জীবাত্মাকে পরমাত্মার আসন অধিকার করা'বার চেষ্টা—আরও অধিকতর পরমেশ্বর-দ্রোহিতা। এজন্য মহাপ্রভু ব'লেছেন,—"ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার।"

এই সকল কথা আলোচনা কর্‌তে হ'লে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের জ্ঞানের আকরের আবশ্যক। এ সকল আলোচনার আকর কি মিশ্রিত চেতন? অথবা অবিমিশ্র চেতন? ইহা কি মনুষ্য-প্রণীত আকর হ'তে আগত? অথবা ভগবৎপ্রণীত আকর? মনুষ্য-প্রণীত আকর হ'লে ভ্রম-প্রমাদাদি থাক্‌বে।

"আমি' জিনিষটা কি? পিতা-মাতা হ'তে যে শরীরটা লাভ ক'রেছি, সেটা কি আমি? না যে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার দিয়ে সঙ্কল্প-বিকল্প, ভাঙ্গা-গড়া কর্‌ছি, সে জিনিষগুলি আমি? এ'তে প্রচুর কথা আছে। আমাদের জীবনের অতি প্রারম্ভ কাল হ'তে এসব আলোচনা শুন্‌বার অবসর হ'য়েছিল। ৫০ বৎসরকাল এসব কথাই আলোচনা কর্‌ছি—প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বক্ষণ আলোচনা কর্‌বার সময় পেয়েছি—২৪ ঘণ্টাকাল এসকল কথা আলোচনা ক'রেছি—ঘুমোবার সময়ও আলোচনা ক'রেছি, জাগ্রত থাক্‌বার সময়ও আলোচনা ক'রেছি। আর এ জিনিষটা আলোচনা কর্‌তে করতেই আমার শরীরও পতন হ'য়ে যা'বে।

'আমির' বিচারের অন্দরমহলে ঢুক্‌বার পূর্ব্বে দু'টো ফটকে দু'টো দ্বারোয়ান দাঁড়িয়ে র'য়েছে, তা'রা 'আমির' কাছে যেতে দিচ্ছে না। কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ কেন পাচ্ছি না? কৃষ্ণের পঞ্চমজুষ-মূরলী-নিনাদ কাণে আস্‌ছে না কেন? রাস্তার গোলমাল, জগতের কর্ম্মকোলাহল কাণে ঢুক্‌ছে কেন? বর্ত্তমান সময়ে আত্মা সুপ্ত থাকার জন্য এজেণ্ট-সূত্রে—ম্যানেজার-সূত্রে মাঝপথে মন ফাঁকি দিচ্ছে। মনোধর্ম্মজীবী আমাকে—আত্মাকে ফাঁকি-দেওয়া-মন কুপরামর্শ দিয়ে প্রেয়ঃপথে নিযুক্ত কর্‌ছে। মনের মনিব, দেহের মনিব—আত্মা, বাক্ হ'চ্ছে—ফোর্‌ম্যান, যেমন জুরীর ফোর্‌ম্যান থাকে। চেতনের বাক্ একপ্রকার, আর অচেতনের বাক্ অন্য প্রকার। মনটা হচ্ছে—অনাত্মা, তা'র প্রমাণ—গীতা,—

> ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
> অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরষ্টধা।।
> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাঃ প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।

পরা প্রকৃতি—জীব, তা' তটস্থধর্ম্মযুক্ত। জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের সহিত তা'র সম্বন্ধ র'য়েছে।

পরা প্রকৃতি—যা'কে অপ্রাকৃত ব্যাপার বলা হয়, তা'তেও জীবের স্থান আছে। পরাবিদ্যার অন্তর্গত—অক্ষর, অপরাবিদ্যার অন্তর্গত—ক্ষর। পরাবিদ্যার আশ্রয়—সুমতি। বেদে সুমতি ব'লে কথা আছে,—"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সৎ।" আমাদিগের সুমতি লাভ হউক, আমরা যেন সেই সুমতি ভজন কর্‌বার মত সুমতি লাভ কর্‌তে পারি।

(৪)

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।।

উপনয়ন ব'লে একটি কার্য্য আছে। মনু বলেন,—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ।।

শ্রুতির উক্তি হ'তে জানা যায়, মানুষের জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য। মাতৃকুক্ষি হ'তে প্রথম জন্মই শৌক্র-জন্ম, পরে সাবিত্র্য-সংস্কার-লাভে দ্বিতীয় জন্ম, তৎপরে যজ্ঞদীক্ষা লাভে তৃতীয় জন্ম। সর্ব্বাগ্রে আমরা পিতার ঔরসে মাতৃকুক্ষি হ'তে শরীর লাভ করি, এটা একপ্রকার শরীর; দ্বিতীয় প্রকার শরীর—যে সময় আচার্য-পিতা ও গায়ত্রী-মাতার সংযোগে মৌঞ্জিবন্ধনকালে লাভ হয়। "ত্বাং অহং বেদ-সমীপে নেষ্যে" প্রভৃতি মন্ত্রে যখন আচার্য্য-পিতা বেদ অধ্যয়ন, করা'বার জন্য মৌঞ্জিবন্ধন করেন, তখন আমাদের আচার্য্যের গৃহে যে জন্ম হয়, সে'টি দ্বিতীয় জন্ম। কেবল শরীরটা রক্ষা হ'ক, এমন নহে, বেদ অর্থাৎ জ্ঞান সংগ্রহ হ'ক—এই উপলক্ষ ক'রে মৌঞ্জিবন্ধন। তৃতীয় জন্ম হয় আমাদের যজ্ঞদীক্ষাকালে, এর নাম—দৈক্ষ্য-জন্ম। দৈক্ষ্য-জন্মের কার্য্য—যজ্ঞ—উপাসনা। 'উপাসনা' অর্থে—সমীপে বাস। 'উপ' পূর্ব্বক আস্ ধাতু ভাবে অনট্। ইহা দীক্ষা গ্রহণের পরবর্ত্তিকালের আনুষ্ঠানিক কার্য্য। বাস্তববেদমূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে আমরা যে কার্য্য করি, তা'রই নাম—উপাসনা। যাঁ'র নিকট উপনীত হ'য়ে বাস করি, তাঁ'কে উপাস্য বলে; তিনি বেদপুরুষ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু। যে জন্য বাস করি, সেটা উপাসনা, সেটাই হচ্ছে—যজ্ঞ।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।

১। ধ্যান-যজ্ঞ — সত্যযুগে, যখন চা'রপাদ ধর্ম্ম; ২। মখ-যজ্ঞ—ত্রেতাযুগে যখন তিনপাদ ধর্ম্ম; ৩। পরিচর্য্যা-যজ্ঞ—দ্বাপরযুগে, যখন দুইপাদ ধর্ম্ম; ৪। কীর্ত্তন-যজ্ঞ-

কলিযুগে, যখন তিনপাদ ধর্ম্ম বিনষ্ট হ'য়েছে, এক পাদে ধর্ম্ম কোনরূপে অবস্থান কর্‌ছেন।

বেদ-শাস্ত্র শ্রুতি বা কীর্ত্তনমুখে এখানে এসেছে। এখন কলিকাল—বিবাদযুগ; যে কোন কথা বলি না কেন, সঙ্গে-সঙ্গে তর্ক, প্রতিবাদ হ'য়ে থাকে। হরিকীর্ত্তনই একমাত্র শ্রৌতপথ। ঐকান্তিক শ্রৌতগুরু শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্যে নারায়ণ সংহিতার বাক্য উদ্ধার ক'রে বল্‌ছেন,—

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।।

উপাস্য-বস্তু-বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। যদি অচেতন পদার্থের নিকট বসে থাকি বা উপনীত হই, তা' হ'লে অচেতন পদার্থকে কাজে লাগিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়—আমাদের সেবা করিয়ে নিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে জিনিষটা চেতন, তা' স্বতন্ত্র, তা'র ঘাড়ে যদি উঠ্‌তে চেষ্টা করি, তা' হ'লে সে বাধা দেয়। পূর্ণ চেতন, পূর্ণ স্বতন্ত্রকে মোটেই আমাদের কাজে লাগা'তে পারি না, আমরা তাঁ'র কাজে লেগে যে'তে বাধ্য হই। আজকালকার 'ইউটিলিটেরিয়ান্ থিওরি' (Utilitarian theory) নদীর জল, বায়ু, নায়েগ্রা-প্রপাত—সকলকেই কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু আমরা চেতন বস্তুকে—পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তুকে সেরূপভাবে কাজে লাগিয়ে দিতে পারি না—তিনি আমাদের অধীনে আসেন না।

পৃথিবীতে থাকা কালে আমাদের বিচার প্রবল হ'য়েছে, অন্য বস্তু আমাদের সেবা করুক—আমরা উপাস্য হই। আমরা উপাসকের সজ্জায় অন্য বস্তুকে যে পূজা কর্‌বার অভিনয় দেখাই, এই উপাসনা কি মিশ্রভাবযুক্ত, না অমিশ্র? ঋষিবংশ যজ্ঞাদি কর্‌তেন, ধ্যানাদি কর্‌তেন, তাঁ'রা অপরের সেব্য—এ বুদ্ধি কর্‌তেন না; তাঁ'রা দেবতাগণের সেবা কর্‌তেন। উপাসনাকাণ্ডে দেখি, তাঁ'রা,—

অগ্নে (গ্রে) নয় সুপথা রায়ে অস্মান্,
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জু হুরাণমেনো, ভূয়িষ্ঠাং তে
নম-উক্তিং বিধেম।।

—প্রভৃতি মন্ত্রে দেবগণের স্তব কর্‌ছেন—স্তবগুলিকে উপাসনার অঙ্গ জ্ঞান কর্‌ছেন; এ সকল কথার প্রমাণ অতি প্রাচীনতম বৈদিক ইতিহাসে সুস্পষ্ট হ'য়েছে। তাঁ'রা নিজদিগকে উপাস্য বস্তু মনে করেন নাই, দেবতার উপাসনা ক'রেছেন। সুতরাং 'উপাসনা' ব'লে যে জিনিষ, তা' নূতন তৈরী হ'য়েছে, এরূপ কথা কেবলজ্ঞানাবলম্বী বা কেবলাদ্বৈতবাদী যেরূপ স্থির ক'রেছেন,—ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'য়ে যাওয়াই পুরুষার্থ, এরূপ বিচার জন্মগ্রহণ কর্‌বার বহু পূর্ব্বে জীবের সহজ সরল বৃত্তিতে সেবা কর্‌ব, উপাসনা কর্‌ব, এরূপ বিচারই ছিল। আজকাল কলিকালের বিচার হ'য়েছে,—

উপাসনা পরবর্ত্তিকালে তৈরী হ'য়েছে; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যেখানে চেতন ধর্ম্ম, সেখানেই উপাসনার কথা প্রচলিত ছিল। সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে ব্রহ্ম বা বেদ-বস্তু স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হ'য়েছিল—বাস্তব-সত্য ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হ'য়েছিল।

ব্রহ্মার সন্তানগণই ঋষি ও দেবতা। দেবতাগণ অশেষ দীপ্তিসম্পন্ন। এজন্য ঋষিগণ যত্নপূর্ব্বক দেবতাদের সেবা কর্‌তেন। এই সেব্য-সেবক ভাব দেবতা ও ঋষিগণের মধ্যে চিরকালই ছিল।

আমাদের চেতনের আদি বিকাশে লক্ষ্য করি—সভ্যতা বা বুদ্ধিমত্তার আলোচনার প্রাক্কালেও লক্ষ্য করি যে, সেবা বা উপাসনা আমাদের স্বাভাবিকী বৃত্তি। পরবর্ত্তী সময়ে যত ধর্ম্ম-প্রণালী লক্ষ্য করি, প্রাগ্ ইতিহাস-সমূহেও দেখি, আমাদের সেবা করবার বৃত্তিটী স্বাভাবিক।

কলিকালে এত বিবাদ এসে উপস্থিত হ'য়েছে, যেহেতু আমরা প্রভুত্ব কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছি। ইউটিলিটেরিয়ান্ থিওরি প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হ'য়েছে—যত বস্তু আমাদের কাজে লাগিয়ে দিতে পারা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি উপাস্য হ'বার জন্য কতই না উপাসনা করি। সভ্যতার প্রাক্কালে 'বিনিময়' বলে একটা ব্যাপার উদ্ভূত হ'য়েছিল। আমি যদি কারো সেবা ক'রে দেই, তখন তিনি আমাকে কিছু মূল্য দেন। মনুষ্য-জাতি সেব্য-সেবকভাবে পরস্পরের মধ্যে অবস্থিত আছে। ইহজগতে সেবা করার যন্ত্র আমাদের এগারটি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ ও মন। ঐ সকল করণের দ্বারা আমরা পরস্পরের মধ্যে বৃত্তির পরিবর্ত্তন ক'রে থাকি। একজন শ্রেষ্ঠ হ'য়ে থাকেন, আর একজন অধীন হয়ে থাকেন। একজনের নিম্ন ভূমিকা, আর একজনের উচ্চ ভূমিকা। একজন আর একজনের সেবা করছে।

মানবমাত্রেই—প্রাণীমাত্রেই–চিদচিৎ বস্তুমাত্রেই উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য–এই তিনপ্রকার সম্বন্ধে অবস্থিত–সেব্য-সেবকভাবে একবস্তু অপর বস্তুর সহিত অবস্থিত। যেখানে একের অধিক 'অনেক' ব'লে বস্তু উপস্থিত হ'য়েছে, সেখানে একটি অপরকে সেবা কর্‌ছে। চিদচিৎ জগতে আমরা এই উপাসনা ব'লে ব্যাপার লক্ষ্য করছি, অথচ আমরা বুদ্ধিমান্ ও যুক্তিপরায়ণ অভিমান ক'রে নির্ব্বিশেষবাদকে স্থাপন কর্‌তে চাই। নির্ব্বিশেষ জ্ঞান যদি আমার উপাস্য হয়, তা' হলে সেরূপ উপাস্যের উপাসনা কর্‌বার জন্য আমি যে চেষ্টা করি, তা'ই আমার উপাসনা-চেষ্টা মাত্র।

নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলেন,—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান–তিন রকম ধরণের বিচার যেখানে একীভূত হ'য়েছে, সেখানে বুদ্ধিমত্তার শেষ সীমা। বিচিত্রতা লোপ হ'ক–একজন দেখ্‌ছে আর একজন দেখাচ্ছে—এ'দের উভয়ের বৃত্তি রহিত হ'য়ে যা'ক্—এই ব্যাপারটীর নাম–জাড্য। আলোকের দ্রষ্টা, আলোক এবং আলোক-দর্শন-কার্য্য নষ্ট হয়ে গেল, উপাসনার হাত থেকে–ত্রিতত্ত্বের হাত থেকে এড়িয়ে যে'তে পার্‌লাম মনে

করি। আমরা কোন একটা কার্য্যের মধ্যে আছি—কর্ম্ম কর্‌তে বসেছি, তা' নষ্ট হ'য়ে গেলে কর্ম্ম নষ্ট হ'য়ে যায়, আমাদের এবিচার উপস্থিত হ'য়েছে।

অনশ্বর বৈকুণ্ঠ ও নশ্বর জগতের মধ্যে আমাদের তটস্থ অবস্থান। এখানকার প্রাকৃত সকল ধরণের কথা শেষ হ'বে—যদি আমরা তটভূমিতে গিয়ে পৌঁছি। অচিৎএর অনুসন্ধান যে-কাল পর্য্যন্ত কর্‌ছি, সেকাল পর্য্যন্ত মনে হচ্ছে, জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা বিনষ্ট হ'লে আমরা অমঙ্গলের হাত হ'তে উদ্ধার পা'ব। এরূপ প্রস্তাব যে স্থানে গিয়ে পৌঁছায়, সে-স্থানের দুই দিক নেই—ব্রহ্মাণ্ড নেই, বৈকুণ্ঠ নেই। তটস্থশক্তি থেকে পরিণত হ'চ্ছে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। এটা হচ্ছে, সত্যবস্তুর একটা নশ্বর বিভাগ। এখানে যে উপাসক, উপাস্য, উপাসনা প্রভৃতির অভিমান ও আচরণ ক'রে থাকি, তা' এক নহে,—বহু। কথায় বলে, একজন সেবক বহু বস্তুর সেবা কর্‌তে পারে না। এখানকার বস্তুর যখন সেবা কর্‌তে যাই, তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতির সেবা হ'য়ে যায়। উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা একীভূত হ'য়ে গেলে মহা হিংসা এসে উপস্থিত হয়।

বুদ্ধিমান্ লোকগণ বলেন যে, ইতিহাসে চিরদিন ভক্তির কথা র'য়েছে—ভক্তির বৃত্তিতে প্রত্যেক বস্তু সেব্য-সেবক-ভাবে আবদ্ধ র'য়েছে। তা'র মধ্যে সেব্য হ'য়ে যাওয়াটাই অভদ্র।

উপাস্য হ'ব, না উপাসক হ'ব? এক প্রকার সম্প্রদায় আছে, তা'দিগকে বলা হয়—বাউল। বাউল বলে—"আমি ভোক্তা, এই গৃহ আমার ভোগ্য, গৃহ আমার সেবা কর্‌বে।" বাউল দুই প্রকারের—গৃহি বাউল ও ত্যাগি বাউল। কতকগুলি ত্যাগি বাউল আছে, তারা ভোগই কর্‌বে মতলব ক'রে কৃষ্ণসজ্জায় সজ্জিত হয়—কৃষ্ণ হ'য়ে যাওয়াটাই ভাল মনে করে! 'আমার অধীন অন্যান্য লোক থাকুক', তা'দের এরূপ বিচার!

শ্রীগৌরসুন্দর এই মতবাদ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বেদান্ত বা বেদের তাৎপর্য্য কেবলাদ্বৈতবাদ হ'তে পারে না। তিনি বলেন, বেদে তিন প্রকার কথা আছে,—সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন। ইহারা বিপর্য্যস্ত হ'তে পারে না। মহাপ্রভু শক্তি-পরিণামবাদের কথা বলেন, বিবর্ত্তবাদের কথা বলেন না।

বৃদ্ধবৈষ্ণব মধ্বাচার্য্যপাদ বলেন, —বিষ্ণুই পুরুষোত্তম বস্তু, তিনি পরতত্ত্ব। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলেন, পরতত্ত্ব—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম; কিন্তু এটা বদ্ধাবস্থার কথা। মুক্ত অবস্থায় তা'র বিচার নিরস্ত হ'য়েছে। সকলের মূল বস্তু হ'লেন—বিষ্ণু; বিষ্ণুতেই তারতম্য আছে—তাঁতেই সব সৌন্দর্য্য আছে। আমাদের নিত্য আচমনীয় মন্ত্রেও আমরা দেখতে পাই,—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।।

সদাচার যাঁর যত বেশী আছে, তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু আচার্য্যের নিকট তিনি আচার শিক্ষা ক'রেছেন। ক্ষত্রিয় পৃথিবীর রক্ষাকর্ত্তা, তাঁ'রা রাজনীতি নিয়ে থাকেন। আর যাঁ'রা ব্রহ্মজ্ঞানাদি বা ভগবৎসেবায় অত্যন্ত ব্যস্ত, তাঁদের অন্যান্য কার্য্য কর্‌বার সময় বড় কম।

ব্রাহ্মণের জীবন--ভিক্ষুকের জীবন। ব্রহ্মজ্ঞানই যাঁদের বৃত্তি, সমাজের কর্ত্তব্য—তাঁ'দের সেবা করা—সাহায্য করা। ব্রাহ্মণ তাঁ'দের যা' ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা গ্রহণ কর্‌বেন; বেশী হ'লে বিতরণ করে দিবেন—রক্ষা করবেন না; রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য।

অনেকস্থলে যেমন আদমসুমারির মধ্যে যেখানে যত অভাবগ্রস্থ ভিক্ষুক, তা'দের সঙ্গে সাধুকে সমান মনে ক'রে ফেলা হ'য়েছে। সাধারণ অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুককে ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডী বা সাধু-ভিক্ষুকের সহিত একাকার ক'রে ফেল্‌লে জিনিষটা উল্‌টে গেল।

Vagrancy Act নিষ্কপট পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর উপর প্রযুক্ত নহে; যদি ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহে অধিক সময় সংগ্রহ কর্‌তে হয়, তা' হ'লে তা'র ব্রহ্মজ্ঞান সংগ্রহের সময় কম হ'য়ে যা'বে। এজন্য মনু ব'লেছেন, সমগ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণের। ঠিক কথা; যাঁ'রা ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁ'দের যখন যা' দরকার হ'বে, তাঁ'রা যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ-বৃত্তিতে গ্রহণ কর্‌বেন, তাঁ'দের সে জিনিষের জন্য ব্যস্ততা নেই। তাঁ'দের ব্রহ্মজ্ঞানালোচনার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু সমাজ দিতে বাধ্য। যে সমাজ ব্রাহ্মণাধীন নয়, সে সমাজ অসুবিধার অতল গর্ত্তে চ'লে যা'বে।

শূদ্রের উপাস্য বস্তু—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। ইহজগতে যদি কেহ শ্রেষ্ঠতার অভিমান করেন, তা' হ'লে এরূপ ক্রমে যা'বেন। যিনি ব্রাহ্মণের মৃগ্য—সেব্য ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন না, তাঁ'র এই জড়জগতের অন্যান্য কথা এসে উপস্থিত হয়,—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।।
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।

পুরুষের যেমন মুখ শ্রেষ্ঠ, বাহু তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, তদপেক্ষা ঊরু কনিষ্ঠ, তদপেক্ষা পদ কনিষ্ঠ অর্থাৎ উত্তমাঙ্গ হ'তে ক্রমে অধমাঙ্গে অবতরণ, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ উত্তম, ক্ষত্রিয় তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, বৈশ্য তদপেক্ষা কনিষ্ঠ, শূদ্র সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। মুখমণ্ডল---সর্ব্বোত্তমাঙ্গ, তা'তে মস্তিষ্ক বা বুদ্ধির স্থান, আর মুখ বা কীর্ত্তনের স্থানের সন্নিবেশ আছে। যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা তাঁ'র আকর পুরুষোত্তম বিষ্ণুর কীর্ত্তন করেন, সেই ব্রাহ্মণের নামই---বৈষ্ণব। বিচার-বিবেচনাটা মাথা ক'রে দিচ্ছে। সমাজের বাহু, সমাজের ঊরু যে-কার্য্য কর্‌ছে, সমাজের মস্তিষ্কস্বরূপ ব্রাহ্মণ তা' নিয়মিত কর্‌ছেন। সমাজের পা এরূপভাবে চলা উচিত কি না, সেটা মাথা ব'লে দিচ্ছেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব'লে দিচ্ছেন,

—এখানে বিচরণ করা যায়, এখানে বিচরণ করা যায় না। ব্রাহ্মণ ব'লে দিচ্ছেন, কৃষ্ণভূমিতে—নিত্যদেশে বিচরণ কর।

গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্। (ভাঃ ১১।১৮।৪৩)

যদি বাউল সম্প্রদায় বলে,—'আমি কৃষ্ণ সেজে ভোগ কর্‌ব'' বা গৃহি বাউল যদি মনে করে,—আমি গৃহ ভোগ কর্‌ব', তা' হ'লে বহির্জ্জগতের সেবক হ'য়ে কয়দিন সেবা কর্‌তে পারা যা'বে? ব্রাহ্মণ যদি আত্মপ্রভব পরমেশ্বরকে সেবা না করেন—তিনি যাঁ'র নিত্যসেবক, তাঁর সেবা যদি না করেন, তা' হ'লে তিনি ক্রমে ক্রমে পতিত হ'তে হ'তে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ হ'য়ে যান।

এক শ্রেণীর অর্ব্বাচীন ব্যক্তি ব'লে থাকেন,—এ জগতের দাসের বৃত্তি অত্যন্ত খারাপ; সুতরাং পরজগতে আর দাসের বৃত্তি কর্‌ব না, প্রভু হ'য়ে যা'ব—উপাস্য হ'য়ে যাব! —যেন পরজগৎ এই জগতের ন্যায়ই অসুবিধা-মিশ্রিত, ত্রিগুণতাড়িত জগৎ! 'বৈকুণ্ঠ' কথাটী না জানা থাক্‌লেই এরূপ বিচার এসে উপস্থিত হয়—অবিকৃত বিম্বে বিকৃত প্রতিবিম্বের হেয়তা অনুমান ও আরোপ করা হয়। যেখানে কুণ্ঠাধর্ম্ম নেই—অমঙ্গলের কোন কথা নাই—যেখানে কেবল 'শ'—মঙ্গল, সেখানে অমঙ্গলের জিনিষ এখান থেকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। সূর্য্য—স্বপ্রকাশ বস্তু, সেখানে আলো নিয়ে যেতে হয় না। একটা গল্প আছে। একজন মাঝি মনে করল যে, গুণ টান্‌তে তা'র বড় কষ্ট হয়, অত্যন্ত অসমান স্থান, কাঁটা-খোঁচা প্রভৃতির উপর দিয়ে তা'কে যে'তে হয়, তা'তে অনেক সময় তা'র পদ ক্ষত হ'য়ে থাকে। অতএব যদি সে কোন প্রকারে বড় লোক হ'তে পারে, তা' হ'লে নদীর পারগুলিতে লেপ, তোষক, গদি প্রভৃতি বিছিয়ে নিয়ে তা'র উপর দিয়ে অনায়াসে গুণ টাড়্‌তে পার্‌বে। ঐ মাঝি এমন নির্ব্বোধ ছিল যে, সে তা'র দরিদ্রাবস্থার অসুবিধাগুলি তা'র ধনলাভের অবস্থার মধ্যে নিয়ে ফেল্‌তে চে'য়েছিল। তা'র এটা মাথায় ঢুকছিল না, যদি টাকাই পাওয়া যায়, তা' হ'লে তা'কে গুণ টান্‌তে হ'বে কেন? যা'রা ইহজগতের কুসংস্কার, ইহজগতের বিচার-প্রণালী নিয়ে সেখানে যাচ্ছে—যা'রা আধ্যক্ষিকবিচার অধোক্ষজরাজ্যে চালান দিতে চাচ্ছে; মনে কর্‌ছে,—এখানকার ন্যায় দাস-মনোভাব সেখানেও আছে, এখানকার ন্যায় অসুবিধাপূর্ণ দাস্য সেখানেও থাক্‌বে, তা'রা এই মাঝির ন্যায়ই অজ্ঞ। সেখানে যে দাস্য—মুক্তাবস্থায় যে দাস্য, তা'ই জীবের স্বভাব বা চরম স্বাধীনতা। সেরূপ দাস্যের দ্বারা অজিত ভগবান্‌ও জিত হন—সকল প্রভুর প্রভুও বিক্রীত হ'য়ে থাকেন।

উপনিষদে একটা আখ্যায়িকা আছে। একবার দেবতাগণের পক্ষ হ'তে ইন্দ্র ও অসুরগণের পক্ষ হ'তে বিরোচন ব্রহ্মার নিকট আত্মতত্ত্ব শিক্ষা কর্‌বার জন্য গমন কর্‌লেন। বিরোচন তাঁ'র বাহ্য-স্থূল-দেহের প্রতিবিম্ব দর্শন ক'রে, তা'কেই আত্মা মনে কর্‌লেন, ইন্দ্র বিরোচনের ন্যায় তাড়াতাড়ি না ক'রে ব্রহ্মার বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য

উপলব্ধি কর্‌বার জন্য সহিষ্ণু হ'য়ে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান কর্‌তে লাগ্‌লেন এবং দেহ ও মনের অতিরিক্ত নিত্যবস্তুকে আত্মা ব'লে বুঝ্‌তে পার্‌লেন। বাইরের দিকে বিচারক-সম্প্রদায়ের যে বাউলগিরি কর্‌বার জন্য বুদ্ধি, সেটা হচ্ছে—অসুরবুদ্ধি। দেবাসুর-সংগ্রাম সকল সময়ই চল্‌ছে। এই যে উপাসনার পদ্ধতি—ভক্তির পদ্ধতি, যা'দ্বারা সূরিগণ বিষ্ণুকেই সর্ব্বোত্তম ব'লে দেখ্‌ছিলেন, তাঁ'কে যখন আক্রমণ কর্‌বার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হ'লো, তখন অদৈববিচার জীবের চেতন-বৃত্তিকে গ্রাস ক'রে ফেল্‌ল। মানুষ যখন অত্যন্ত অপস্বার্থপর হয়, তখনই বিষ্ণুপাসনাকে আক্রমণ করে। তখন তা'রা দেবতাগণের পদবী হ'তেও পতিত হ'য়ে যায়। দেবতারাও বাধা দেন; মনে করেন, তাঁ'রা বিষ্ণু হবার জন্য চেষ্টা কর্‌ছে, আর একজন প্রতিযোগী এসে উপস্থিত হ'য়েছে—এই বিচারে। সত্য, মহঃ, জন ও তপোলোকের পুরুষগণ স্বর্লোকের ভোগী দেবতাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেন-না, পূর্ব্বোক্ত লোকের ব্যক্তিগণ—ত্যাগি-সম্প্রদায়।

সাধারণ লোকের বিচারে বিষ্ণু একটি দেবতাবিশেষ, অন্যান্য দেবতা বিষ্ণুকর্ত্তৃক শক্তি-প্রাপ্ত দেবতা ন'ন! বিষ্ণু দেবতাবিশেষ হ'লে বহুদেবতাবাদ এসে যায়। সব দেবতাকে ভেঙ্গে দিয়ে ব্রহ্মের সহিত নির্ব্বিভিন্ন হ'য়ে যা'ব—ইহাই বহুদেবতাবাদ, পঞ্চোপাসনা বা তথাকথিত সমন্বয়বাদের প্রতিজ্ঞা। তাঁ'রা আগেই ঠিক দিয়ে রেখেছেন, উপাস্যবস্তু নির্ব্বিশেষ, তাঁ'র উপাসনা করার দরকার নেই। কেবল কপটতা বা ছলনা ক'রে সাময়িক উপাসনা এবং সেই সাময়িক উপাস্যের অনিত্য নাম, অনিত্য গুণ, অনিত্য ক্রিয়া স্বীকার করা যা'ক। জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁ'রা এরূপ বিচার ক'রে থাকেন। তা' হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত একটি শ্লোক বলেন,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চবিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্।।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যযুক্ত হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া—কৃষ্ণ-কার্ষ্ণবিরোধী হওয়াই অভদ্রগ্রস্ত হওয়া; কৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্য স্মরণ হ'লে এই অভদ্র হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। যদি একবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্মৃতিপথে কৃষ্ণস্মৃতি এসে যায় অর্থাৎ আমি যে নিত্যকৃষ্ণদাস,—এই অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হয়, তা' হ'লে সমস্ত অভদ্রে আগুন লেগে যায়—অভদ্রগুলির মূল পর্য্যন্ত পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায়,—

'কৃষ্ণ, তোমর হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার।।

সর্ব্বতোভাবে কেহ যদি হরিকীর্ত্তন করেন, তবেই তাঁ'র হরিস্মরণ হয়, তা' হ'লেই তিনি অমানী-মানদ-তৃণাদপি-সুনীচ হ'তে পারেন। "তৃণাদপি"-শ্লোকে 'সদা'-শব্দের অর্থ—কাম-ক্রোধাদির অবসর না দিয়ে অবিক্ষেপে হরিকীর্ত্তন। কাম-ক্রোধাদিযুক্ত ব্যক্তির

তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই—জড়সম্ভোগবাদে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই। নিরন্তর কৃষ্ণানুসন্ধান বা বিপ্রলম্ভরসে আসক্ত ব্যক্তিরই তৃণাদপি সুনীচত্ব।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি।।

জাগতিক সত্যের একটা আপেক্ষিকতা আছে। আপেক্ষিকধর্ম্মে যে সত্যের উদয় হয় তা' সত্যের শুদ্ধি নহে। পরমাত্ম-সেবা---জড়ের সেবা নয়। কৃষ্ণই হচ্ছেন পরমোপাস্য—সদুপাস্য। সর্ব্বদা কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর—কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের পরিকর-বৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন কর, যিনি অনুক্ষণ বলেন, তাঁর পাদপদ্মই সর্ব্বদা উপাস্য অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মই সর্ব্বতোভাবে নিত্য উপাস্য; তিনি নিত্য ভগবৎপার্ষদ, তাঁ'র সেবক বৈষ্ণবগণ—উপাস্য।

অনেকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতির একদেশদর্শী বিচার বলেন; শ্রুতি-মন্ত্রের সর্ব্বতোমুখী বিচার গ্রহণ কর্‌বার সহিষ্ণুতা স্বীকার করেন না। ভক্তিকে আশ্রয় কর্‌লেই মায়ার দুষ্পারা জলধি আমরা অনায়াসে উত্তীর্ণ হ'য়ে যে'তে পারি। পূর্ব্বতন মহাজনগণের বর্ত্মানুবর্ত্তনই আমাদের ধ্রুবতারা। পূর্ব্বমহাজনগণ সত্ত্বশুদ্ধি লাভ ক'রে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত হ'য়েছেন। বিশুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ের নামই—বসুদেব। সেই হৃদয়েই জ্ঞান অর্থাৎ সম্বিদ্‌বিগ্রহ বাসুদেব, বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রেমা, বৈরাগ্য অর্থাৎ অভিধেয়ভক্তি উদিত হয়। আমরা এরূপ বিচার অবলম্বন ক'রে অযৌক্তিক রাজ্য হ'তে পার পেতে পারি। 'তমঃ' অর্থে—মায়াবাদ, কর্ম্মবাদের ভোগ-প্রবৃত্তি। ত্রিদণ্ডিগণ এই বিচার অবলম্বন ক'রে সেইদিকে অগ্রসর হ'বেন। মানবজাতি সকলেই ত্রিদণ্ড গ্রহণ ক'রে অগ্রসর সেইদিকে অগ্রসর হ'বেন। মানবজাতি সকলেই ত্রিদণ্ড গ্রহণ ক'রে অগ্রসর হ'বেন,—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব।।

কৃষ্ণই মূল উপাস্য বস্তু। যেখানে যত অধিষ্ঠান হ'তে পারে বা হ'বে, সকলেরই উপাস্য বস্তু। কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য বস্তু। তিনি সেবকের সেবা কর্‌বার জন্য সেবককে আকর্ষণ করেন। পরমসেবকের সেবা ব্যতীত যদি অন্য বস্তুতে চিত্তবৃত্তি যায়, তা'হলে আর আমাদের ন্যায় বোকা খুঁজে পাওয়া যাবে না। যিনি সেবা কর্‌তে চান, তাঁর যিনি সেবা করেন, তিনিই অনন্তপরতম পরতম-তত্ত্ব—তিনিই সর্ব্বকারণ-কারণ—কারণ-তত্ত্ব। পরতত্ত্ব কৃষ্ণকে স্বয়ংরূপ বলা হ'য়েছে—যাঁ'র রূপের খানিক অংশ পেয়ে তাঁ'র ভৃত্যসমূহ মহারূপবান্ হ'য়েছেন! তাঁ'র ভৃত্য-সম্প্রদায় ভগবান্‌কে সেবা কর্‌বার জন্য রূপকে সেবোপকরণ মনে করেন—উপাদান মনে করেন। কৃষ্ণের রূপের কোটী অংশের এক অংশের সহিত কোন রূপের তুলনা হয় না। যখন আমরা কৃষ্ণের সেবা কর্‌তে যাই, তখন আমাদিগকে রূপবান্ হ'তে হয়, আমরা তখন আমাদিগকে সাজা'তে চাই,

তখন অভিসার ব'লে একটা কার্য্য হয়—"শুক্লাভিসার", 'আর কৃষ্ণাভিসার'—চাঁদ উঠ্‌লে গোপীগণ কৃষ্ণের জন্য যেরূপভাবে দৌড়োয়, আর চাঁদ না উঠ্‌লে যেরূপভাবে দৌড়োয়। রূপাভিসার, গুণাভিসার, পরিকরাভিসার, লীলাভিসার। আমি এসকল কথা এ ভাষাতে বল্‌তে চাই না—দুর্ব্বলা জিহ্বা ব'লে ফেলছে; কিন্তু আমি এখানে ক্ষান্ত হ'লাম।

স্বয়ংরূপ—কৃষ্ণ, আর স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব—শ্রীবলদেব প্রভু।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।।

নিতাই-পদ-কমল কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব'লেছেন যে, আমরা সকলে মিলে ভগবানের সেবা কর্‌বো। 'আমরা' এই শব্দে তিনি একজনকে লক্ষ্য ক'রে বলেন নাই। অনেকে স্বার্থপর হ'য়ে বলেন,—আমিই সেবা কর্‌বো, বা আমারই একার কার্য্য প'ড়েছে, অন্যের তা'তে অধিকার নেই। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের দয়ার্দ্রচিত্ত বলেন,—এসো, হিংসা পরিত্যাগ ক'রে সকলে মিলে ভগবানের পূজা করি। এটা সকলের চেয়েও বড় জিনিষ। সকলের চেয়ে বড় জিনিষ ব'লে সেটা অপরে কর্‌তে পার্‌বে না বা অপরকে কর্‌তে দোবো না, সেরূপ হিংসা আমার গুরুপাদপদ্মের নেই। সকলে মিলে যে কীর্ত্তন করা যায়, তা' সঙ্কীর্ত্তন। "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্।" সঙ্কীর্ত্তনের অন্তর্গত বন্দনা—স্তুতি।

বাহিরের দিকে দেখ্‌তে গেলে স্তাবকের স্থান—নিম্নে, স্তবনীয়ের স্থান উচ্চে; কথাটি তৃতীয় পক্ষ শ্রবণ ক'রে বেশ বুঝ্‌তে পারেন, স্তাবকের মহিমা স্তবনীয় বস্তু অপেক্ষা স্তবকার্য্যে কতদূর অধিক অগ্রসর হ'য়েছে ও অধিক আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী এই যে, ভগবান্‌কে ডাক্‌তে হ'লে 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'তে হ'বে। একজন নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি না কর্‌লে অপরকে ডাকেন না। যখন আমরা অন্যের সাহায্য প্রার্থী হই, তখন নিজেকে অসহায় মনে করি—আমার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হচ্ছে না, অতএব অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। পাঁচজন মিলে যে কার্য্যটি কর্‌তে হ'বে, তা' কেবল নিজের দ্বারা সম্ভবপর নয়। গৌরসুন্দর ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন, একথা গুরুপাদপদ্মের নিকট হ'তে পাই। ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন মানে ভগবানের সাহায্য গ্রহণ কর্‌তে ব'লেছেন; কিন্তু যখন ভগবান্‌কে

ডাকি তখন যদি তাঁ'কে ভৃত্যত্বে (?) পরিণত বা নিজের কোন কার্য্য উদ্ধার করিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁ'র সাহায্য গ্রহণ কর্‌তে চাই, তা' হ'লে 'তৃণাদপি সুনীচতা' থাকে না। বাহ্য দৈন্য 'তৃণাদপি সুনীচতা' নয়, সেটা কপটতা। যেভাবে ডাক্‌লে তাঁবেদার সকল উত্তর দেয়, সেভাবে ডাকা ভগবানের নিকট পৌঁছে না। কারণ তিনি পরম স্বতন্ত্র, পূর্ণ চেতন বস্তু, কা'রও বশ্য ন'ন। নিজের অস্মিতাকে নিষ্কপট দৈন্যে প্রতিষ্ঠিত না কর্‌লে পূর্ণ-স্বতন্ত্রের নিকট আবেদন পৌঁছে না।

আর একটি কথা হচ্ছে, 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'য়ে ডাকার সঙ্গে যদি সহ্যগুণসম্পন্ন না হই, তা' হ'লেও ডাকা হয় না। আমরা যদি কোন বস্তুর প্রতি লোভী হ'য়ে অসহিষ্ণুতা দেখাই, তবে 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাবের বিরুদ্ধ ভাবাবলম্বন কর্‌তে হয়। আমরা যদি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হই, ভগবান্ পূর্ণ বস্তু, তাঁ'কে ডাক্‌লে কিছু অভাব হ'বে না, তা' হ'লে সে সময় সহনশীলতার অভাব হয় না। আর যদি আমরা লোভী হ'য়ে—অসহিষ্ণু হ'য়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করি—আমার নিজের কিছু কৃতিত্ব-সামর্থ্য-অবলম্বন ক'রে কার্য্যোদ্ধার কর্‌ব, এরূপ মতলব এঁটে রাখি, তা' হ'লে ভগবান্‌কে ডাকা হয় না। আত্মম্ভরিতা অধিক থাক্‌লেও ভগবান্‌কে ডাকা হয় না। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমরা অনুগ্রহ ক'রে স্তবাদি করি—ভগবান্‌কে না ডেকেও অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে পারি, এরূপ বুদ্ধিও সহনশীলতার অভাবের পরিচায়ক। এই সকল মনোভাব হ'তে আমাদিগকে রক্ষা কর্‌বার জন্য—আমরা নিষ্কপট 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাব হ'তে যেটুকু বঞ্চিত হ'য়ে থাকি, তা' হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য রক্ষকের আবশ্যক—সেরূপ দুষ্প্রবৃত্তি হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন। ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন,—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তাঁ'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। জগতে কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষ লাভ কর্‌তে হ'লেও গুরুর আবশ্যক হয়; কিন্তু সেই সকল গুরুর প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেরূপ ক্ষুদ্র ফল-প্রদাতা ন'ন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তবমঙ্গলবিধাতা; আশ্রয়-জাতীয় ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হ'য়ে যা'বে, সেই মুহূর্ত্তে জগতে নানা অভিলাষ উপস্থিত হ'বে। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন,—কি ভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌তে হ'বে,—কিভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার কর্‌তে হ'বে—এ সকল শিক্ষা যদি না দেন, তবে প্রাপ্ত রত্নও হারিয়ে ফেল্‌তে হয়।

নামভজনই একমাত্র ভজন-প্রণালী। শ্রীগুরুদেব এই ভজন-প্রণালী প্রদান করেন; সুতরাং আমাদের গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্ত্তব্য। শ্রীরূপ প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে

ব'লেছেন,—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্মনম্।।"

নিজের শত শত পারদর্শিতার দ্বারা অজ্ঞেয় রাজ্যে, দুর্জ্ঞেয় রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না—যে-সকল ভবিষ্যৎ জগৎ দেখ্‌তে দেওয়া হচ্ছে না—ভবিষ্যৎকাল ব'লে যে জিনিষটা, তা'তে নিজের চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া যায় না। অতিলোকবিচার যেখানে, সেখানে ইহলোকের বিচার আমাদিগকে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না। যে-সকল কাল গত হ'য়েছে তা'তে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান লাভ ক'রেছি; কিন্তু আগামীকাল—যা' জানি না—যে চক্ষু দুই এক মাইল মাত্র দেখ্‌তে পারে—যে কর্ণ কিছু দূরের শব্দ মাত্র শুন্‌তে পারে, সে প্রকার ইন্দ্রিয়ের গম্যজ্ঞানে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কথা—পূর্ণ রাজ্যের কথা জান্‌তে পারি না। সেইরূপ রাজ্যে কেবল নিজের পারদর্শিতার দ্বারা অগ্রসর হ'তে চেষ্টা কর্‌লে কখনই আমরা শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'তে পারি না; রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধবার চেষ্টার ন্যায় সিঁড়ি কিছুদূর উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই আশ্রয়ের অভাবে—নিরালম্বভাবে শূন্যে বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারে না, চুরমার হ'য়ে নীচে পড়ে যায়। কেবল নিজের পারদর্শিতার পুঁজি নিয়ে অজ্ঞেয় রাজ্যে উঠ্‌তে চাইলেও আমরা অধঃপতিত হ'য়ে পড়ি, আর লঘুকে 'গুরু' কর্‌লেও আমরা অধঃপতিত হই।

কে গুরু, কে লঘু, আমরা তা' বিচার কর্‌বো। যিনি সকল গুরুর একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই পূর্ণ বস্তুর সেবা যিনি করেন, তিনিই গুরু। সেতার শেখানর গুরু বা কসরৎ শেখানর গুরুর কথা বল্‌ছি না, তা'রা মৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারে না। ভাগবতের একটা শ্লোকেও পাই—সে গুরু, গুরু নয়; সে পিতা, পিতা নয়; সে মাতা, মাতা নয়; সে দেবতা, দেবতা নয়; সে স্বজন, স্বজন নয়—যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর মুখ হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পারেন—আমাদিগের নিত্য জীবন দিতে না পারেন—এই জড়জগতের অভিনিবেশরূপ অজ্ঞানমৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পারেন।

অজ্ঞতা হ'তেই মৃত্যুমুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হ'তে মৃত্যুমুখে পতিত হই না। এখানে যে বিদ্যা অর্জ্জন করি, পাগল হ'য়ে গেলে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'লে, বা মরণের পরে আর সে বিদ্যার মূল্য থাকে না। বাস্তব-সত্যের যদি অনুসন্ধান না করি, তা' হ'লে আমরা অচেতন হ'য়ে যাই। যিনি মৃত্যুর মুখ হ'তে উদ্ধার কর্‌তে না পারেন, তিনি খানকতক দিনের জন্য ভোগা দেওয়ার লোক। যিনি বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় আমাদিগকে লুব্ধ ক'রে থাকেন, তিনি বঞ্চক। কিন্তু যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ সকল বঞ্চনা হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারেন, প্রত্যেক বর্ষ-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মাস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রারম্ভে সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্ত্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব বিরাজমান, তিনি যদি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ না করেন, তবে কে আমাকে রক্ষা কর্‌বেন? আমার গুরুদেব যাঁ'দিগকে নিজের ক'রে

নিয়েছেন, তাঁ'রা আমার উদ্ধারকারী; কিন্তু আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দাকারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোনরূপ প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অমঙ্গলকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে।

যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ করে রাখেন, আমি সে গুরুপাদপদ্ম হতে যে মুহূর্ত্তে ভ্রষ্ট হই—সে' গুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হই, সে মুহূর্ত্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি। গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অভাবরাশি আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান কর্‌তে দৌড়াই, শীত নিবারণের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি, গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অন্য কার্য্যে ধাবিত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল দ্বিতীয়-অভিনিবেশ হ'তে অনুক্ষণ রক্ষা করেন, বর্ষ-প্রবৃত্তি, মাস-প্রবৃত্তি, দিন-প্রবৃত্তি, মুহূর্ত্ত-প্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পতিত হ'ব। আমি তখন নিজে গুরু সাজ্‌তে চা'ব—আমাকে অপরে গুরু ব'লে পূজা করুক, আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি এসে উপস্থিত হ'বে—ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ। একদিনের জন্য 'গুরুপূজা', তা' নয়, নিত্য প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের গুরুপূজা।

গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু, তিনি জগদ্‌গুরুরূপে এখানে এসেছেন। তিনি যে 'শিক্ষাষ্টক' ব'লেছেন, সেই শিক্ষায় মহান্তগুরু এবং মহান্তগুরুপাদপদ্মে প্রণত মহান্ত বৈষ্ণবসকল সর্ব্বতোভাবে আমাকে শিক্ষিত করেন। মহান্তগুরুর পাদপদ্মে প্রণত মহান্ত বৈষ্ণবসকল আমাকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করেন।

আশ্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন আকারে—বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাকে দয়া কর্‌বার জন্য উপস্থিত। ইঁহারা দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশবিশেষ। বিভিন্ন আদর্শে জগদ্‌গুরুর বিম্ব প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে। প্রত্যেক বস্তুতে আমার গুরুপাদপদ্ম প্রতিফলিত। বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়-জাতীয় অর্দ্ধেকটা; এতদুভয় বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়-জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—কৃষ্ণ, আর আশ্রয়-জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম। চেতনের ভূমিকাসমূহে যে আশ্রয়-জাতীয় অপ্রাকৃত প্রতিবিম্ব পড়েছে, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব। জীবনব্যাপী ভগবানের সেবা কর্‌তে হ'বে, ইহা সর্ব্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। সেই গুরুপাদপদ্ম প্রতি জীবহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হ'য়েছেন,—আশ্রয়জাতীয়-রূপে প্রতিবস্তুতে তাঁর অবস্থান। তিনি প্রতি-বস্তুতেই বিরাজমান।

চূত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-জবম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যামুনোপকূলাঃশংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ।।

(হে চূত, হে পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ এবং অন্যান্য পরহিতকর যামুনতটবাসী তরুগণ, তোমরা আমাদের নিকট

শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথ দিয়া গিয়াছেন বলিয়া দেও, কৃষ্ণবিরহে আমাদের চিত্ত শূন্য বোধ হইতেছে।)

রাসস্থলী হ'তে কৃষ্ণ যখন চ'লে গেছেন, মুক্তপুরুষ গোপীগণ সকল বস্তুর কাছে গিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ অন্বেষণ কর্‌ছেন, গোপীগণের আধ্যক্ষিকতা কি তখন প্রবল? ইন্দ্রিয়জজ্ঞান কি তখন প্রবল? এই সকল কথা আমাদের গুরুপাদপদ্ম হ'তে শুন্‌বার অবসর হয়। নন্দ-গোবিন্দ, যশোদা-গোবিন্দ, শ্রীদাম-সুদাম-গোবিন্দ, চিত্রক-পত্রক-গোবিন্দ, বংশী-গোবিন্দ, গো-গোবিন্দ, কদম্ব-গোবিন্দ প্রভৃতি চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য রসময় শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস-ব্যাপার। যদি চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রমণ—পর্য্যটন দেখ্‌তে পাওয়া যায়, হৃদয়ে যদি গুরুপাদপদ্মের দর্শন হয়, তবেই এই সকল কথা স্ফূর্ত্তি লাভ করে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভগবৎসেবা কর্‌বার জন্য প্রবুদ্ধ করেন, তাঁ'র পূজা ব্যতীত পূর্ণ বস্তুর সেবা লাভ কর্‌বার আর উপায় নেই।

শ্রীগুরুদেব মধুররসে বার্ষভানবী। নিজের উদ্বুদ্ধ চেতন-ভাবের বিচারানুসারে যিনি যেভাবে তাঁ'কে দর্শন করেন, গুরুদেব সেই বাস্তব বস্তু। বাৎসল্যরসে তিনি—নন্দ-যশোদা, সখ্যরসে শ্রীদাম-সুদাম, দাস্যরসে গুরুপাদপদ্ম—চিত্রক—পত্রক। এই সকল বিষয়াশ্রয়ের আলোচনা গুরুসেবা করতে করতে হৃদয়ে উপস্থিত হবে। এ সকল কথা কৃত্রিমভাবে হৃদয়ে উদিত হয় না; সেবা-প্রবৃত্তি উদিত হ'লে আপনা থেকে ভাগ্যবান্ জনে উদিত হ'য়ে থাকেন। আমাদের গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্যই নেই; জড়জগতের মিশ্রভাব নিয়ে শেষ-শিব-ব্রহ্মাদির অগম্যা নিত্যলীলার কথা আলোচনা হয় না।

(৫)

প্রয়াগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন। তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে দশদিন ধ'রে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। প্রয়াগ—প্রকৃষ্ট যজ্ঞের স্থান। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এখানে প্রতিষ্ঠানপুর স্থাপন ক'রে দশটী অশ্ব অর্থাৎ দশটী ইন্দ্রিয়ের বিলোপসাধন দ্বারা মেধ বা যজ্ঞ ক'রেছিলেন। লোকে তিন ভাবে যজ্ঞ করে। পারলৌকিক লাভের বা স্বর্গ পাবার জন্য অথবা স্বর্গের রাজা ইন্দ্র হওয়ার জন্য। যে যজ্ঞে পশুহননাদির কথা আছে, সে যজ্ঞস্থল প্রয়াগ নহে—নিকৃষ্ট যজ্ঞ। আর এক প্রকার যজ্ঞ, সেও দশ ইন্দ্রিয় দ্বারে। সেটা হ'য়েছিল—কাশীতে। সে যজ্ঞে যাজ্ঞিকেরা নিজের সুবিধার জন্য যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সেবাসুখে উদাসীন হ'লো। নিজেদের ইন্দ্রিয়াদি বধ ক'রে, নিজেদের সবিশেষভাব নষ্ট ক'রে নির্ব্বিশিষ্ট হ'য়ে সবিশেষ বিষ্ণুর নির্ব্বিশেষভাব-প্রাপ্তি উদ্দেশ্য ক'রেছিল। সেই স্বরূপে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সম্বন্ধজ্ঞান দিবার জন্য কাশীর দশাশ্বমেধ-তীর্থ-সন্নিধানে মহাপ্রভু শ্রীসনাতন প্রভুকে সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা ব'লেছিলেন। আর প্রয়াগে ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়াদি বিনষ্ট না ক'রে অথবা ইন্দ্রিয়বর্গকে যথেচ্ছ বিহার ক'রতে না দিয়ে ইন্দ্রিয়পতি হৃষীকেশের

সেবায় নিযুক্ত ক'রেছিলেন। এই ইন্দ্রিয় যজ্ঞ দশাশ্বমেধের কথা আমরা মহারাজ অম্বরীষের চরিত্রে দেখ্‌তে পাই। মহাপ্রভু দশদিন ধ'রে দশ ইন্দ্রিয়ের যজ্ঞ শিক্ষা দিলেন। শুধু ইন্দ্রিয়-যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরের যাজন জানান নাই—আত্মার দ্বারা আত্মার পরমোচ্চ অবস্থায় পরমোচ্চ ভাবে ভগবানের পরমোচ্চ অবস্থার ভজনের কথা ব'লেছিলেন।

দশাশ্বমেধ ঘাট ত্রিবেণীর উপর ছিল। এখন যমুনা সরিয়া যাওয়ায় ত্রিবেণীও দূরে গিয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারা দশাশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি যেমন ব্রহ্মাকে বেদবাণী উপদেশ ক'রেছিলেন, আর সেই বেদপতি, বাণী-বিনোদ মহাপ্রভু, শ্রীরূপপ্রভুকে বেদ-গুহ্যাতিগুহ্য ভক্তির কথা ব'লে ভোগরাজ্যে—ভগবানের সেবাবিমুখ-রাজ্যে ভক্তিরস-সমুদ্র প্রবাহিত ক'রলেন। গোমুখীর দ্বারে গঙ্গা যেমন প্রবাহিত হ'য়ে সর্ব্বদেশ পবিত্র ক'রেছেন, শ্রীরূপপ্রভুর দ্বারে সেইরূপ প্রেমভক্তিরস-সমুদ্র বিষয়-মরুতে প্রবাহিত হ'য়ে অমর জগতের পরমামৃতের সন্ধান দিচ্ছেন।

"প্রভু কহে,—শুন রূপ, 'ভক্তিরসের লক্ষণ'।
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন।।
পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু।
তোমায় চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু।।"

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৩৬-৩৭)

ভক্তি-রসসিন্ধুর বিন্দু পানে প্রমত্ত হ'য়ে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' রচনা ক'রেছেন। সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর একবিন্দু পান ক'র্‌লে জীব—ধন্য, ধন্য-ধন্য, ধন্যাতি-ধন্য হ'য়ে যাবে।

আনন্দের পূর্ণ অভিজ্ঞানই আমাদের মৃগ্য। কেবল ক্লেশনিবৃত্তিটাই আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। Positive মুক্তিতে কিছু ধন-জাতীয় বস্তু পাওয়া আবশ্যক। এক বস্তু খুঁজতে গিয়ে আর এক বস্তু খুঁজে না বসি। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক। মরণের পূর্ব্বেই Preparatory কার্য্যগুলি করা দরকার। সকল বন্ধু-বান্ধবের আহৃত বুদ্ধি, বিজ্ঞান সকলের সাহায্য যদি ভগবানের সেবকগণের চাকুরী করতে পারে, তবেই আমরা তা' গ্রহণ কর্‌ব। কিন্তু ইহজগতের বোঝা ও মল পরজগতে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি দেখাব না।

ভগবদানুগত্যই আমাদের একমাত্র সুবিধার পথ। যদি আমরা ত্রৈরাশিক বা equation (সমীকরণ) কষ্‌তে জানি, তা' হ'লে বুঝ্‌তে পারব—একশ' বছরের আপাত প্রয়োজনের জন্য আমাদের যতটা যত্ন করা দরকার হয়েছে, অখণ্ড অনন্ত জীবনের জন্য, তদনুপাতে কতটা অধিক যত্ন করা আবশ্যক। সে যত্নটা ইহজীবনেই কর্‌তে হবে; কারণ এই মনুষ্য-জীবনই পরমার্থদ জীবন। মানবজাতি যদি এই সোজা অঙ্কপাতটী

বুঝ্তে পারে, তা' হ'লে এ-জীবনে তা'র কৃষ্ণানুসন্ধান-ব্যতীত আর কোনও কার্য্যই থাকে না। আমাদের প্রত্যেক পদবিক্ষেপ, প্রত্যেক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, প্রত্যেক কার্য্য কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করাই পরম প্রয়োজন।

আমার গুরুবর্গ অনেক কথা সুন্দর ভাষায় ব'লেছেন। আমি সে-সকল কথার পুনরাবৃত্তি করি না। তবে তা'দের জন্য কতকগুলি মূল কথা বলি। ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন কার্য্য নেই। আমারা ভগবান্‌কে বাগানের মালী জ্ঞান কর্‌ব না। Present day needs মাত্র attend করা আমাদের প্রয়োজন নয়। আমাদের মূল কার্য্য, মূল উদ্দেশ্য—হরিসেবা। শ্রীরূপগোস্বামীর "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা"—এই শ্লোক দুইটী অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে আমাদের জীবন-পথের ধ্রুবতারা হ'য়ে যে পথ নির্দ্দেশ কর্‌ছে, আমরা সর্ব্বদা সেই কৃষ্ণসেবাময় পথে চল্‌ব। আমরা যেন ভগবৎসেবকগণের সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে কোন কার্য্য না করি। ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, যুদ্ধ-বিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতি অপরাবিদ্যাসমূহকে যদি উহাদের প্রকৃত সার্থকতায় নিযুক্ত না করি অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিষটী যদি কৃষ্ণ-সম্বন্ধে বা ভগবানের ভক্তিতে পর্য্যবসিত না করি, তা' হ'লে 'ইহা ছাড়িয়া দিব', 'তাহা ছাড়িয়া দিব', 'ইহা নহে', 'তাহা নহে'—এরূপ তর্কপন্থার সৃষ্টি হ'বে।

আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের যোগ্যতায় কি করিয়া অপ্রাকৃত বস্তুর ধারণা হয় ? শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু প্রাকৃত সহজিয়া-মত নিবারণ ক'রে সেই কথার উত্তর অতি সুন্দর ভাবে জগৎকে জানিয়েছেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।"

ব্রহ্মসূত্রের সর্ব্বপ্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। যিনি অনন্তর হ'য়েছেন—কর্ম্ম, জ্ঞান বা প্রাকৃত ভূমিকাকে transcend করেছেন, তাঁ'র ক্ষুদ্রের জিজ্ঞাসা পরিত্যাগ ক'রে ব্রহ্মের জিজ্ঞাসার উদয় হয়। যাঁ'রা transcend করেন নাই, তাঁ'রা non-Vedantists, সাংখ্যবাদী প্রভৃতি সংখ্যার মধ্যে আবদ্ধ। একপাদ বিভূতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আমরা দৃষ্টিমাত্রে ত্রিপাদ বিভূতি দর্শন কর্‌তে পারি না। সঙ্কর্ষণ হতে জীবশক্তির উৎপত্তি—ইহা যদি বুঝ্‌তে না পারা যায়, তা' হ'লে কে কা'কে জিজ্ঞাসা কর্‌বে?

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্ন হ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।"

সেব্য ও সেবক, গুরু ও শিষ্য, সিদ্ধ ও সাধককে সমান মনে করলে, 'নিমগ্ন' হ'তে হয়। তখন শোক বা শূদ্রত্ব-প্রাপ্তি ঘটে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা ব্রাহ্মণত্ব আর থাকে না। সেব্য

ও সেবকের সমতা বাঞ্ছনীয় বটে। কিন্তু তা সমজ্ঞানের ব্যভিচার নহে। সেখানে গুণগত অভেদ থাক্‌লেও পরিমাণগত ভেদ আছে। ভেদে সমতার reference. আর অভেদে উচ্চাবচত্বের reference আছে।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।

—এই শ্লোকের তাৎপর্য্য না বুঝে হস্তী ও কুক্কুরের স্থূলগত সাম্যবিচার কর্‌লে কোন সমাধানই পাওয়া যায় না। আত্মদর্শনে সাম্যবিচার।

এক স্বার্থে সকলে একসূত্রে অনন্তকাল গ্রথিত থাকিলে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সমস্যার সমাধান এবং প্রকৃত ঐকতান (harmony) সাধিত হইতে পারে। ইহারই নাম ভগবৎপ্রেমা বা ভগবৎসেবা।

তারপর ভগবদ্‌বিষয়িণী ধারণার বিচার। সেই স্বর্ব্বকারণ-কারণ, অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত পরমেশ্বর-বস্তুতে যখন চেতনজীব আশ্রয়গ্রহণ করেন, তখন যদি অত্যন্ত দূর হইতে সম্ভ্রম বুদ্ধিতে (যেমন রাজা ও প্রজার মধ্যে সম্বন্ধ) আশ্রয়ণীয় বস্তুকে বহু ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং নিজদিগকে অতি ক্ষুদ্র-বিচারে ঐশ্বর্য্যবানের আশ্রিত জ্ঞান করা হয়, তাহা হইলে তাহা পূজ্যপদবাচ্য হইলেও সেখানে পূর্ণ আত্মীয়তা বা প্রেম সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত হইতে পারে না। প্রেমের স্বভাবই এই যে, তাহা প্রেমিকের সর্ব্বাঙ্গ উন্মুক্ত করিয়া প্রেমাস্পদের দ্বারা আত্মসাৎ করাইয়া থাকে; সেখানে কোনপ্রকার সম্ভ্রম-বুদ্ধি থাকে না।

আমাদের সকলপ্রকার সম্বন্ধ সর্ব্বকারণ-কারণের সহিতই সম্ভব। যাঁহারা সর্ব্বকারণ-কারণ পরাৎপর-তত্ত্বকে সম্বন্ধরহিত-রূপে কল্পনা করেন অর্থাৎ পরাৎপর তত্ত্বের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-অনুসন্ধানের পথ ছাড়িয়া ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগত প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পথে ধাবিত হন, তাঁহারা ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ-বস্তু বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে পরাৎপর-তত্ত্ব যে স্ব-স্বরূপে স্বেচ্ছায় নিত্য অবস্থিত, তাহা স্বকপোল-কল্পনায় বিকৃত না করিয়া তিনি যেরূপ সেই স্বরূপের নিকটই উপনীত হইবার চেষ্টা করা উচিত। যদি পাঁচটি সম্বন্ধ আমরা মূল বিষয়-বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা দ্বন্দ্বভাবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব।

ভগবানে পিতৃত্ব আরোপ করিলে আমরা কেবল তাঁহার নিকট হইতে সেবা দাবি করিয়া পরবর্ত্তিকালে কৃতজ্ঞতা মাত্র প্রদর্শন করিতে পারি। কৃতজ্ঞতা ঠিক সেবা বা প্রেমের লক্ষণ নহে। পিতার নিকট হইতে নিজের দরুণ সেবা দাবিরূপ এক অংশ এবং তৎপরিবর্ত্তে পিতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশরূপ আর এক অংশ আংশিক-বিচারে প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিষয়-বস্তুর কেবল-সুখানুসন্ধান বা সেবা নহে। সেবা আদায় ও কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন এই উভয় বৃত্তির মধ্যে যে দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ রহিয়াছে

তাহাতে সেবাবৃত্তি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতরূপে আত্মপ্রকাশ করে না। আস্তিকতার এই সঙ্কুচিত অবস্থা পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে পরাৎপর-তত্ত্বের পুত্রত্ব-বিচারে। কেবল পিতৃত্বে পুত্রত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় নাই, কিন্তু পুত্রত্বে পিতৃত্বের পরিচয় সংশ্লিষ্ট-ভাবেই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"। পুত্র প্রথম অবস্থা হইতেই পিতার সেবা আরম্ভ করিতে পারে না, কিন্তু পিতা প্রথম হইতেই পুত্রের সেবা আরম্ভ করিতে পারেন।

ভগবদ্-বস্তু যখন অদ্বয় পূর্ণবস্তু, তখন আমরা কিছু নিজের জন্য, বা ভগবানের জন্য নিয়োগ করিব—এইরূপ হিস্যাদারী হিসাবু 'সেবা' বা 'প্রেম'—পদবাচ্য হইতে পারে না। পূর্ণতম বস্তুতে আমাদের শতকরা একশত চেষ্টা নিযুক্ত হইবে।

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর অভিমান করিয়া আমরা কিছু সময় বা নির্দ্দিষ্ট কিয়ৎক্ষণ ধর্ম্ম-মন্দিরে গমনপূর্ব্বক উপাসনা ও প্রার্থনা প্রভৃতি করিবার অভিনয় দেখাই এবং বাকী সময় আমাদের নিজের কার্য্যের জন্য নিয়োগ করি। কিন্তু পূর্ণ বস্তুর উপাসনা এরূপ আংশিকভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ২৪ ঘণ্টার ভিতর ২৪ ঘণ্টাই শতকরা অনুশীলনের ভিতর শত পরিমাণই পূর্ণ বস্তুর জন্য অকপটভাবে উন্মুক্ত চেতনবৃত্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে তাহাই 'অস্তিকতা' বলিয়া কথিত হয়। সর্ব্বতোভাবে শরণাগতি-ব্যতীত অপ্রাকৃত ভগবৎপাদপদ্মের অনুশীলন হয় না।

এসকল কথা বুদ্ধিমান মানবজাতি বুঝুন—এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমাদের প্রচার-প্রচেষ্টা। আমি নিজে নির্ব্বোধ হইতে পারি, কিন্তু আমি যখন ঐ বাস্তব-সত্যের কথা শ্রুতি-পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া মানবজাতির নিকট কীর্ত্তন করি, তখন তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক বুদ্ধিমান লোক থাকিতে পারেন যাঁহারা হয়ত এসকল কথা সহজে ধরিতে পারিবেন। বাস্তব-সত্যের পসরা লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরি করাই আমাদের কার্য্য। আমরা শুনিয়াছি—যাঁহারা ভগবৎসেবা বিস্তারের জন্য পরার্থী, ভগবান্ তাঁহাদিগকে অধিকতর সাহায্য করেন। প্রকৃত পরার্থিতার বাণী সর্ব্বত্র বিস্তার—সমগ্রবিশ্বে নিত্যকালের জন্য ব্যাপ্ত করিবার ভার এই অকিঞ্চন ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছে। আমরা কাহারও প্রতিযোগী বিরোধী বা বিদ্বেষী নহি। কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত বা মনে উদ্বেগ-প্রদান আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু আমরা আমাদের বিশ্ব-বন্ধুবর্গের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারের বাণী তাঁহাদের গোচরীভূত করিবার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা বিশিষ্ট। প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল হইতে বিচ্যুত না হন। প্রত্যেকেরই প্রচারক বা কীর্ত্তনকারিরূপে পরিণত হওয়া একমাত্র কর্ত্তব্য। কীর্ত্তনকারী হইতে হইলে প্রথমে শ্রৌত-বাণী শ্রবণ করা আবশ্যক।

আমরা যদি আমাদের প্রত্যেক চেষ্টা প্রত্যেক অনুশীলন ভগবৎ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিতে পারি তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই আমরা ভগবৎসেবা-ব্যতীত অবশেষে অন্য কার্য্য করিব না। সাধারণ লোকের ধারণা—"যখন আমরা ধর্ম্মমন্দিরে

গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসি প্রার্থনা করি, ধ্যান করি, পূজা করি, সেই সময়টুকুই পরমেশ্বরের উপাসনা হইল এবং বাকী সময় আমাদের অন্যান্য কার্য্যে ব্যয় করিবার অধিকার আছে।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। যদি আমাদের নিত্য স্বরূপজ্ঞানের অভাব থাকে অর্থাৎ আমরা যে চেতন বস্তু, অনাবৃত ভাবে পরম চেতন ভগবানের অনুশীলন করাই যে আমাদের সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম, যদি ইহা আমাদের চেতনের বাস্তব অস্মিতায় অনুশীলনপর না থাকে তাহা হইলে আমরা যে সময়টুকু ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া পূজা, ধ্যান-ধারণা বা প্রার্থনাদি করি এবং যাহাকে ভগবদ্-উপাসনা বলিয়া মনে করি, তাহাও কার্য্যতঃ অনর্থের উপাসনাই হইয়া যায়। কিন্তু অনাবৃত চেতন-স্বরূপকে পরম চেতন পুরুষোত্তম বস্তুর সহিত নির্ব্বন্ধ করিলে আমাদের যাবতীয় কার্য্য বাহ্য-আকারে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় দেখিতে পাওয়া গেলেও তাহা পূর্ণ ভগবৎসেবা হইতে পারে। যাঁহারা ভগবৎ-সম্বন্ধে সমস্ত নির্ব্বন্ধিত করিয়াছেন—কায়-মন-বাক্যের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা করাই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত, তাঁহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া পর্য্যন্তও ভগবৎ-সেবার অঙ্গ।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁ'র শক্তি-বিচারে তিন প্রকার শক্তির কথা শুনি। তাঁ'র মধ্যে একটী সন্ধিনী শক্তি যা'তে এই বিশ্বজগৎ প্রকৃতির অস্তিত্ব সংরক্ষিত, আর একপ্রকার শক্তি হ্লাদিনী—আনন্দদায়িনী শক্তি আর একটী সম্বিৎ অর্থাৎ চেতনশক্তি। এই জগতে এই তিন প্রকার শক্তি এসে উপস্থিত হ'য়েছে। এই প্রকার শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইহজগতে বিরোধিনী শক্তি ক্রিয়াবিশিষ্ট হ'য়েছে। একপ্রকার শক্তি আনন্দ দেয়, অপর—আনন্দের অভাব ঘটায়। আমরা এ জগতে শক্তির অপব্যবহার কর্‌বার সুযোগ পাই। আবার সঙ্গে সঙ্গে তা'র প্রয়োজনীয়তাও বুঝি। যদি আমরা নিজেরা ভোগী হ'য়ে ভোগশক্তির পরিচালনা দ্বারা ভোগকে সংরক্ষণের যত্ন করি, তবে ভগবদ্-ভোগশক্তিকে বাধা না দিয়ে পারি না, বাধা না দিলে নিঃশক্তিক ব'লে পরিচয় প্রদান ক'রে থাকি। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি-পরিণাম এই জগৎ। এখানে প্রত্যেক কথার সঙ্গে সঙ্গেই একটী বিপরীত কথা আছে। যে কথা বলা যায়, তা'র একটা বিরুদ্ধ কথা আছে। সুতরাং অনেকে বলেন যে, ভগবদালোচনায়, যে ত্রিবিধ শক্তি আছে, সেই কথা বাধাপ্রাপ্ত হয় কেন? একথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে তা'তে দেখি, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যের অভাব ব'লে দুইপ্রকার কথা আছে! প্রত্যেক কথার অনুগমন করে আমরা স্থায়িভাবে থাকতে পারি না। সুখের সঙ্গে দুঃখ, আলোর সঙ্গে অন্ধকার, চেতনের সঙ্গে অচেতনের, ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই অভাবের বিচার এসে উপস্থিত হয়। মানুষের এই প্রকার শত-সহস্র বিভিন্ন রুচি আমরা লক্ষ্য করি।

অনেকে প্রশ্ন কর্‌তে পারেন,—ভগবানের অনুগত জনগণ ভগবৎ কথাই বলুন, অপরে বিপরীত বলুক অর্থাৎ সত্ত্বগুণ থাকুক, রজস্তমোগুণমত্ত থাকুক। (কিন্তু প্রকৃত

ব্যাপার তা' নয়) রজঃ হ'তে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, সত্ত্বে স্থিতি, তমঃ—সত্ত্ব ধ্বংসক; সুতরাং রজোদ্বারা তমোগুণ এবং সত্ত্বদ্বারা রজস্তমোগুণকে সংহার কর্তে হবে; আবার বিশুদ্ধ সত্ত্ব দিয়ে প্রাকৃত সত্ত্বগুণকেও নাশ করতে হবে। এ জগতে তিন প্রকার গুণ বর্ত্তমান নির্গুণ অবস্থায় গুণসাম্য লাভ হয়। ভক্ত গুণাতীত রাজ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত।

অনেকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোক ও উপনিষদের "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্য দু'টীতে পরস্পর বিরোধ বা অসামঞ্জস্য দেখেন, আমি দেখি—দুটীতে বেশ সুন্দর সামঞ্জস্য র'য়েছে। যদি উপনিষদ বিচার করি, তা'হলে ব'লব—জড়নির্ব্বিশেষ হ'য়ে যাওয়াই অর্থাৎ ভোগরাহিত্যই উপনিষদের শেষ কথা। কিন্তু রাস্তাটী বড় বেশী ও বিপৎ-সঙ্কুল। এই টেবিলটা গোলাকার ellipse-এর focus দুটো। একটা real focus, আর একটা blind focus বিচার রাজ্যে একটা জিনিষই দুই প্রকারে দেখান হয়। মহাপ্রভু সহজ রাস্তা দেখিয়ে গিয়েছেন। এদিককার focus হ'তে পরিধি পর্য্যন্ত রাস্তা সহজ ও শীঘ্র পৌঁছান যায়, ব্রহ্ম'র দিক দিয়ে রাস্তা দূর ও অতিক্রম করা বড়ই অসুবিধা। আমার এখন যা' আছে তা' ছেড়ে দেওয়া এটা সহজ, না যা' আছে তা'র চেয়ে আরও বেশী সংগ্রহ ক'রে শেষে তা' ছেড়ে দেওয়া সহজ? এখন যা' আছে, তা' ছেড়ে দেওয়া—এইটাই মহাপ্রভু-কথিত তৃণাদপি সুনীচতা। তৃণ—যা'র উপর দিয়ে গরু ঘোড়া গাধা চলে, তা'র চেয়েও ছোট হওয়া এইটাই সহজ রাস্তা। আর 'ব্রহ্ম' হ'তে চেষ্টা ক'র্লে অনেক প্রয়াস বিশিষ্ট হ'তে হয়, প্রচুর পরিমাণে জ্ঞানলাভ না কর'লে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায় না। আমাদের বুদ্ধির গণ্ডী ছোট, তাই তিন এর dimension—linear, superficial ও cubical-এর কথার মধ্যেই আমরা আছি, এ সকল কথা ছেড়ে দিয়ে 'চার'-এর dimension-এর কথা অতি অল্প লোকেই আলোচনা করে, তা' হ'তে আবার পাঁচ—এই প্রকারে অসংখ্য মানের (Infinite dimension) কথার মধ্যে যে আমরা প্রবেশই কর্তে পারি না, তা'র আর কথা কি। ডাঃ আইন স্টাইনের কথা কেউ বুঝতে পারেনি, তাই তাঁ'র পাছে ১৭ গণ্ডা ফেউ লেগেছে। এইতো আমাদের অবস্থা। এ'তে ব্রহ্মজ্ঞানের রাস্তা যে কতবড়, তা' বুঝি।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।।

গুণের দ্বারা চালিত হ'য়ে অনেক কথাই ব'লতে পারি। 'সত্ত্ব' ব'লে শব্দ উঠলেই সেই সঙ্গে-সঙ্গে 'রজস্তমঃ' শব্দ এ'সে উপস্থিত হয়। সত্ত্বগুণের কথা উঠলেই রজস্তমোগুণ এ'সে উপস্থিত হয়। সত্ত্বগুণের কথা উঠলেই রজস্তমোগুণতাড়িত হ'য়ে আমরা তা'র বিরুদ্ধ কথা বলি। অনেকে বলেন,—প্রচুর পরিমাণে বাহুবল, বিদ্যাবল, ধনবল বাড়াও, কর্ম্মী হও, যাগ কর, খুব লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ কর,—জড় জগতে এ'রকম ধরণের

ambitious life-টা খুব ফলা বাটীর রাস্তা,—

ত্র্যয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াম্
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ।।

নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ব'লে ওগুলোকে ছেড়ে দিতে হয়। ভক্তের ওটা প্রচার্য্য বিষয় নয়। সাধারণের বিচার আপাত দর্শনে যেটা ভাল ব'লে মনে হয়, সেইটে। মানুষের সেপ্রকার প্রেয়োবিচারকে প্রতারণা ক'রতে—ভোগা দিতে না পার্‌লে আমাদের ভজনে বাধা হইবে—জগতের কোন মঙ্গল হ'বে না। আপাত-দর্শন প্রবল থাক্‌লে বাস্তব-দর্শন ধরা কঠিন হ'বে। লোকের কাছে যদি সত্যি সত্যি ভাল ব'লে প্রচারিত হওয়া যায়, তা'হলে আর টেকা যা'বে না। লোকের মন যোগান'র পরিবর্ত্তে ভগবানের সেবার বিচার থাক্‌লে লোকঠকান'—লোককে ভোগা দেওয়া—কার্য্য আমাদের আবশ্যক হ'তে পারে। তা' না হ'লে অযথা আক্রমণ হ'বে। একদিকে কৌপীন-বর্হির্ব্বাস, আর একদিকে বিষয়। জনক রাজা, এদিকে রাজা ওদিকে ভক্ত, এদিকে ঐশ্বর্য্য ওদিকে লেংটি এ দেখবার চেষ্টা না থাকলে অসুবিধা হ'বে—বুঝতে পারলেই কল্যাণ। একটা গল্প মনে পড়ে। একটা নিঃস্ব বিধবা স্ত্রীলোক তাঁ'র ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ কর্‌লেন। কিছুদিন পরে ছেলে A. B. C. D. পড়তে আরম্ভ ক'রল। তা'র কিছুদিন পরে সে Geometry A. B. C. পড়ার সময় বিধবা মনে ক'রলেন সে ফিরে ফিরে আবার প্রথমের সেই A. B. C.-ই পড়ছে কিছু মাত্র Progress হয়নি, তখন তা'কে ঝাঁটা নিয়ে তাড়া ক'রলেন। আধ্যক্ষিকতাকে বহুমানন ক'রতে গেলে বাস্তব সত্য—বিচারে এই প্রকার দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হ'য়ে থাকে।

আপাতদর্শনে দোষ প্রবেশ করে। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" শ্লোকানুসারে। "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা" হ'য়ে 'আমি কর্ত্তা' 'আমি খুব বেশী বুঝি"—এই রকম আত্মম্ভরিতা প্রবেশ ক'রে, তা'তে এগুতে পারা যায় না। গুণজাত জগতে বিচরণ ক'রে নিজেকে 'বড়' মনে হ'লে জান্‌তে হ'বে—লেখা-পড়া শিখি নাই। যদি exoteric principle-এ আবদ্ধ হ'য়ে পড়ি তা' হ'লে এগুতে পারবো না অর্থাৎ বাহিরে আবদ্ধ হ'য়ে গেলে ভিতরে প্রবেশ কর্‌তে পারবো না। একদিন ব্রহ্মার ভুল হ'য়েছিল। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্ত্তা অভিমানে দ্বারকাকে তদ্‌ব্রহ্মাণ্ডগত স্থানবিশেষ বিবেচনায় ভেবেছিলেন—কৃষ্ণ তাঁ'র এলাকার মধ্যে এ'সে গিয়েছেন। তিনি দ্বারাকায় গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবার জন্যে card পাঠালে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠালেন—কোন্ ব্রহ্মা এসেছেন? ব্রহ্মা ত' শু'নে অবাক্ হ'য়ে গেলেন, ভাবলেন,—আমিই এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ক'রেছি, আমি ছাড়া আবার কোন ব্রহ্মা এজগতের সৃষ্টি কর্ত্তা? তিনি (ব্রহ্মা) তখন ব'লে পাঠালেন,—জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মা এসেছেন। কৃষ্ণ তখন অন্যান্য ব্রহ্মাদিগকে ডে'কে

পাঠালেন। এ ব্রহ্মা গিয়ে দেখেন তাঁ'র ত' মাত্র চা'রটি মুখ, কত আট মুখো, ষোলো মুখওয়ালা ব্রহ্মা এ'সে কৃষ্ণের পায়ে মাথা নোয়াচ্ছেন। ব্রহ্মা তখন নিজের ভুল বুঝলেন। বেশী বুঝবার বিচারটা একটুকু থেকে গেলে exoteric (বহিরঙ্গ) বিচরাগুলো থামবে, esoteric (অন্তরঙ্গ) বিচারে—ভিতরে প্রবেশের অধিক সুবিধা হ'বে।

ভদ্র ও অভদ্রের ভেদ হ'য়েছে আজকাল কেবল পোষাকের উপর। বারবনিতার বেশ অধিক ভাল ব'লে মলিন বসনা পতিব্রতা—সতীসাধ্বীর চেয়ে কি তা'কে অধিক ভাল বল্‌তে হ'বে? আপাতদর্শনে মনুষ্যের বিচার উপস্থিত হ'লে বিচারের বহুজ্ঞতার প্রশংসা করা যায় না। আপাতদর্শনের বিচার—"তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের বিচারক আবার কেন superior-এর attitude নেবেন--প্রচারক কেন platform speaker হ'বেন? জীব-বিমোহিনী মায়া এই প্রকারেই জীবকে বঞ্চনা ক'রছে। জগতের এই রকম যতপ্রকার (অক্ষজ) বিচার তা'দিগকে চূর্ণ-বিচুর্ণ ধ্বংস ক'রতে না পারলে ত' আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। মানুষ ঘুমুচ্ছে তা'দের চেতনকে জাগিয়ে দেওয়ার কার্য্য নিতে হ'য়েছে। মানুষের বুদ্ধি কম তাই তা'রা ভগবানের সেবার পরিবর্ত্তে কেউ ঘোড়ার, কেউ গাধার, কেউ গরুর, কেউ কুকুরের, কেউ মানুষের সেবায় লেগে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হ'য়েছে, লোহা পিটিয়ে লোহার হ'য়েছে। খণ্ডিত বস্তুর সেবকসূত্রে altruism-এর অহঙ্কার হ'য়েছে, তাই মনুষ্য-জীবনে তা'র সঙ্কীর্ণ-বিচারকে খুব বড় প্রয়োজনীয় বলে মনে হ'য়েছে। Monkey gland সংগ্রহ, serum culture প্রভৃতির জন্যে পশুক্লেশের দরকার হ'য়েছে; জীব হিংসা ক'রে অন্যকে কষ্ট দিয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয় তর্পণ করাটাকেই মানুষ altruism বুঝে নিয়েছে। এ সবই ভোগ-জগতের কথা। ভোগীরা আবার ত্যাগ-জগতের প্রশংসা করেন অর্থাৎ অন্যে যদি ত্যাগী হয়, তা' হ'লে তাঁ'দের ভোগের সুবিধা হ'বে। কিন্তু ভক্তের কথা সে রকম নয়। ভক্তের বিচার স্বতন্ত্র,—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্ব্বহি যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্ব্বহিযদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর বিরাগ ও অনুরাগের দুইটী বিচার ব'লেছেন। "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" শ্লোকগুলি আলোচনায় এ সকল কথা পরিস্ফূট হয়। কতকগুলি বোকা লোক মনে করে, ইহজগতের প্রত্যেক বস্তুই অমঙ্গল এনে দেয়, সুতরাং at random সমস্ত বস্তুর সঙ্গ পরিত্যাগ ক'র্‌তে গিয়ে ভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গও ত্যাগ ক'রে বসে। "বহির্জ্জগতের বস্তু অমঙ্গলপ্রদ"—এই বিচারে ভগবান্ ও ভগবৎ

বস্তু পরিত্যাগ করা মূর্খতা। তা'তে বৈরাগ্যের অপব্যবহার ক'রে আমরা ফল্গুবৈরাগী হ'য়ে যাই। ভাগবত বলেন,—

ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।

ভোগী ও ত্যাগী—ইহজগতের লোক, ভোগ ও ত্যাগ এ জগতের বিচার। ভগবদ্‌ভক্ত এ জগতের ন'ন তিনি ভোগীও ন'ন, ত্যাগীও ন'ন। ভোগী স্বর্গাদি ভোগাকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"—বিচারে ভোগীর দুর্দ্দশা দেখে ত্যাগী মনে করে,—স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ রহিত হ'লে দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শন এক হ'লেই বাস্তব-দর্শন-ত্রিপুটী বিনাশ-বিচার—ত্যাগীদের বিচার। ভোগী ও ত্যাগী ফুটবলের মত। একবার কেউ বিশ্বামিত্র সাজ্‌ছে, আবার মেনকা-দ্বারা অভিভূত হ'য়ে প'ড়ছে। ভগবদ্‌ভক্ত এরূপ বিচারকে অনাদর করেন। ভক্তিতে ঐপ্রকারের কোন তপস্যা নাই। ভক্তের তপস্যা প্রভৃতি নিজ-ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নয়, তিনি নিজের জন্য কোন কাজই করেন না, তাঁ'র যা' কিছু, সবই ভগবৎ-সেবার জন্য। ভগবান্‌ও ভক্তের সেবা ক'রলেই তপস্বীর তপস্যার সার্থকতা, নতুবা তা'র কোন মূল্যই নাই। অবিবেচক-সম্প্রদায় যাহাই মনে করুন না কেন, তা'কে তাঁ'রা কানাকড়ি ব'লেও গ্রাহ্য করেন না। "তৃণাদপি সুনীচে"'র বক্তা কেন ওরূপ আদর্শগ্রহণ ক'রেছেন, তা' আপাত-বিচার দ্বারা বুঝ্‌তে গেলে ভুল হ'বে। সে ভ্রান্তির জন্য বিচারে অগ্রসর হ'ব না। অহঙ্কার দেখানোর সময় আছে। প্রচারকের কার্য্য—যখনই কেউ কোন প্রকার অহঙ্কারের কথা ব'লবে, তখনই "তৃণাদপি সুনীচেন" বিচারানুসারে তা'র কাছে হরি-কীর্ত্তন ক'রতে হ'বে। যদি সে তা'তে উদাসীন থাকে তা' হ'লে তা'র আর মঙ্গল হ'বে না, মনোযোগ দিলেই সুবিধা। জগাই, মাধাই, নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে আক্রমণ ক'রে মহাপ্রভুর notice-এর বিষয় হ'য়েছিল—তাঁ'র দয়ার পাত্র হ'য়েছিল। দুইজন বাড়ী বাড়ী knock ক'রেছেন, কেউই তা'দের কথায় মনোযোগ দেয় নাই। যে মনোযোগ দিল, তা'র উপকার হ'ল। বেণ রাজা পরমার্থে উদাসীন ছিল ব'লে তা'র উপকার হয়নি। ঔদাসীন্য-দ্বারাও উপকার হয়—প্রকৃত ভক্তের এরূপ ধরণের বিচার নয়। আবার বিরুদ্ধ-বিচারাবলম্বনে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু,রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শিশুপাল-দন্তবক্রাদির প্রতিকূল-বিচার-গ্রহণেও সুবিধা হ'বে না, যেহেতু—"প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্'"ই বিধি। ভক্তের বিচার—বৈরাগী সাজতে হ'বে, যোগী হ'তে হবে, এরকম নয়। "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিশক্ত" শ্লোকবিচার করা উচিত। ভক্তির স্বরূপ শতকরা ৯৯ জনলোক না বুঝ্‌তে পেরেই এই সব অসুবিধায় প'ড়ছেন। "আমি সুখ ভোগ ক'রব, বেহেস্তায় যা'ব বা ভোগ-ত্যাগ ক'রব, ত্যাগী হ'ব"—এই উভয় বিচার থেকে নিরস্ত হ'তে হ'বে, দু'টীই অবিচার, এজন্য এই বিচারে ভগবদ্ভক্তকে বুঝতে পারা যায় না।

(৬)

আমরা সুখের বাসনায় চালিত হইয়া নানাকার্য্যের আবাহন করি এবং সেই সেই কার্য্যে নিপুণব্যক্তিগণকে বহুমানন করিয়াও প্রার্থিত ফল লাভকরি না। তখন মনে হয় যে, এ পথে না আসিয়া পন্থান্তর গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে ভাল ছিল। দুর্গম, কষ্টসাধ্য ও আপাতফলপ্রদ মনে করিয়া আমাদের শ্রেয়ঃপথ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সেইকালে আমরা সাধারণ ভোগী-শ্রেণীর মানবগণের চিত্তবৃত্তির অনুগমন না করিয়া আরও কোনো পথ আছে কি না বিচার করি। কর্ম্মফলবাদিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নৈষ্কর্ম্মবাদিগণের বিচারে দুই শ্রেণীর কথা আমাদের আলোচ্য-বিষয় হয়। আমরা জগতের বৈচিত্র্যধ্বংসকারী, আমাদের নিজত্বের বিলোপসাধনকারী নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণের চিত্তবৃত্তি অনুসরণ করিব কি না, ভাবিতে থাকি। এই সমস্যার মীমাংসাকালে প্রবল ঝটিকায় যখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির তরণী ডুবিতে থাকে, যখন ফলপ্রার্থনা ও ফলত্যাগের তরঙ্গমালার ঘাত-প্রতিঘাতে বুদ্ধিপ্লব বিঘূর্ণিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও নানাবিধ ক্লেশ উপস্থিত হয়, তখন আমাদের সেই মানস-তরণী আত্মরক্ষার জন্য যোগ্য কর্ণধারের সাহায্য প্রার্থনা করে। আমাদের নিজচেষ্টা বিফল হইলে আমাদের নিত্য পরতন্ত্রতা কি অবস্থায় নিত্যসিদ্ধ, তাহার আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হয়। যাঁহারা পরমাশ্রয় বস্তুর অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎকার হইবার ব্যাঘাত ঘটে না। এখানে আমাদের অভিজ্ঞতায় একটা সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি পরমাশ্রয় বা শেষ আশ্রয় অচেতন পদার্থ হন, তাহা হইলে আমাদের এই দুরবস্থার কথা কে বিবেচনা করিবেন? তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, যেসূত্রে আমরা বহু হইতে একে সমাশ্লিষ্ট, সেই এক হইতে বহুরূপে আমাদের বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই চেতন ধর্ম্মের বুদ্ধিমত্তা অবস্থিত। সুতরাং আশ্রয়িতব্য বস্তুর বিচারশক্তির অভাব থাকিবে—এই ধারণা প্রবল হইলে আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃত রাজ্যেরই অনভিজ্ঞতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ কর্ত্তৃত্বের বা পুরুষকারের অপব্যবহার প্রদর্শন করিতেছি মাত্র—এই বিচার আমাদিগকে পুনরায় প্রেয়ঃপন্থীই করিয়া তুলিবে। এই অমঙ্গলের মুহূর্ত্তে আমাদিগকে নির্ব্বিশিষ্ট বিচার গ্রাস না করে—এই জন্য চেতনময় রক্ষাকর্ত্তা স্বীয় 'অনুগ্রহ'-নামক বৃত্তিটি আমাদের উপর নির্দ্ধারিত করেন—ইহাই ভগবানের অহৈতুকী দয়া, আর আমাদের তদ্‌গ্রহণেচ্ছাই অহৈতুকী ভক্তি। সেই বৃত্তিতে অবস্থিত হইতে পারিলেই আমাদের নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি লাভ ঘটিবে, নতুবা নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধির নামে মায়াবাদ আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে। যাহাতে আমরা পরমাশ্রয়ের কৃপা-বঞ্চিত না হই, তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের উদাহৃত শ্লোকত্রয় আমাদের আলোচ্য বিষয়-রূপে উপস্থিত হন—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং তদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।
(ভাঃ ১০।২।৩২)

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্।।
(ভাঃ ১০।১৪।৪)

শ্রীমদ্ভাগবতের—

ধর্ম্মস্য হ্যপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ।।
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ।।

—এই শ্লোক যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন,—অভক্ত ভোগিগণ মনে করেন যে, ধর্ম্মের অর্থই ফল, অর্থের কামই ফল, কামের ইন্দ্রিয়প্রীতিই ফল, ইন্দ্রিয়-প্রীতির পুনরায় ধর্ম্মই ফল অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকাম-পরম্পরাই প্রয়োজনীয় ত্রিবর্গ; বস্তুতঃ এরূপ কখনও হইতে পারে না। অব্যভিচারী অর্থের কাম বা বিষয়ভোগ ফল নহে, কাম বা বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়-প্রীতি নহে। যে-কাল পর্য্যন্ত জীব বাঁচিয়া থাকে, তৎকালাবধিই ইন্দ্রিয়-প্রীতি লাভ করে। জীবের কর্ম্মানুষ্ঠানে যে প্রসিদ্ধ স্বর্গাদি লাভ কথিত হয়, তাহা কখনও উদ্দেশ্য নহে, তত্ত্বজিজ্ঞাসাই তাহার মুখ্য লাভ।

তত্ত্বজিজ্ঞাসায় 'প্রেমই' পরমার্থ বা পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া নির্ণীত হয়। কপট দুইপ্রকার—ভোগী বা Elevationist, ত্যাগী বা Salvationist, ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই অপরের আত্মোপকারের প্রতি উদাসীন। যে আত্মা অন্য আত্মার প্রতি উদাসীন, ভগবান্, তাঁহাকে দয়া করেন না। ভগবান্ বিভুচিৎ (Absolute Infinity), জীব-অনুচিৎ (Absolute infinitesimal), অনুর (Infinitesimal-এর) অংশের বা fragment-এর মধ্যে আবার যদি কেহ চুরি করিয়া কিছু রাখিয়া দেয়, ভগবানকে সেইটুকুও দিবে না মনে করে, তাহা হইলে বিভুচিৎ (Absolute) তাহার কাছে প্রকাশিত হ'ন না।

অপরকে বঞ্চনা করার নাম—কপটতা। আমার বন্ধু-বান্ধব সকলকেই বঞ্চনা করিয়া নিজের অপস্বার্থ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের জন্য ব্যস্ত হইব, এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি—কপটতা। সকল বাস্তব সত্তার বিলোপ সাধনের (Negativing all Positive assertious -এর) বিচার কপটতা হইতে জাত। বিভুকে (Absolute) বঞ্চনা (deprive) করিব, এরূপ বিচার মস্ত কপটতা।

"মায়া ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি" বাক্যে দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত ব্যাপার (occupation) যদি আমরা কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নিয়োজিত করি তাহা হইলে মায়াকে উৎক্ষিপ্ত করিতে পারিব। আত্মার অখিল রসামৃত-মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গীন-পূজা ব্যতীত অন্য কোন occupation থাকিতে পারে না।

আমাদের আত্মা এখন সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। মনও শরীরের প্রতি আত্মার ক্ষমতা প্রদত্ত (Power delegated) হইয়াছে। আমরা অলস (Indolent) হইয়া পড়িয়াছি—কৃষ্ণসেবা করিব না, আর বাদবাকী সব করিব এজন্য শ্রীগৌরহরি বলিয়াছেন, —'নাম্নাম কারি বহুধা নিজসর্ব্ব-শক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবান মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।" বিশ্বের সকল জীবের প্রতি শ্রীগৌরহরির একমাত্র ব্যবস্থা (Prescription)—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ"।

যে কোন শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিলেই সুবিধা হইবে।

অখিল রসামৃতমূর্ত্তির অণুত্ব আমাদের মধ্যে অনুস্যূত থাকায় বিশ্রম্ভ-সেবাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শংতনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্।।

কৃষ্ণের স্মৃতি কৃষ্ণের শ্রবণের দ্বারাই হইয়া থাকে। কৃষ্ণের শ্রবণের অভাবে কৃষ্ণের বিস্মৃতি ঘটে। কৃষ্ণ যে জিনিষ, সেই জিনিষটীর সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই। মানুষ যখন নিজকে নিজে বুঝিতে পারে তখন "ব্রহ্মযোনিং কর্ত্তারমীশং পুরুষং" বুঝিতে পারে । কৃষ্ণজ্ঞান লাভ না করিলে পরমাত্মাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। কৃষ্ণজ্ঞান পরমাত্ম-সান্নিধ্য-মাত্র নহে। পরমাত্মার 'সান্নিধ্য' মাত্র হইয়া থাকে। কৃষ্ণের সহিত আমার যে বৃত্তি (function) আছে, তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে--কৃষ্ণ-সম্বন্ধ জ্ঞান-লাভে নিকটবর্ত্তী হওয়ার পরে আমার ক্রিয়াটা কিছু আরম্ভ হইল না। এজন্য 'পরমাত্মভক্তি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'পরমাত্ম'-শব্দে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহাতে ভক্তি করা প্রয়োজন হয় না। সান্নিধ্যেই আংশিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় এজন্যই পরমাত্মপ্রাপ্তি বলে। কোন জিনিষকে ভোগের বস্তু না করিয়া all-Pervading বা সর্ব্বব্যাপকের মধ্যে কোন বস্তু পেছনে না রাখা অর্থাৎ সমস্তটাকেই গ্রহণ করা—পরমাত্ম

সান্নিধ্য। কিন্তু ভগবৎসেবা ভাগবতের নির্দ্দিষ্ট পরমাত্ম ভক্তিতে চেতনের বৃত্তির নিত্য স্বভাবের প্রগতি আরম্ভ হয়।

'ব্রহ্ম'-শব্দে কতকগুলি বিষয় বাদ দেওয়া হইয়াছে। পরমাত্মাতে ভুমাত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। 'জ্ঞান'-অর্থে ভগবজ্জ্ঞান। আর 'বিজ্ঞান'-অর্থে—পরিকর বৈশিষ্ট্যের সহিত ভগবানের জ্ঞান। কেবল-জ্ঞানে নির্ব্বিশেষভাব আসিতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান তাহা সংশোধন ও পরিপূরণ করিতে পারে।

ভজনীয় বস্তু, ভক্ত ও ভজন—এই তিনটিই নিত্য। means দিয়া—সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া গেলাম। তাঁরপরে সিঁড়িটাকে ফেলিয়া দিলাম তাহা নহে। সিঁড়িটাও দোতলার সঙ্গে সব সময় লাগান আছে। আমাদের রাশি রাশি যে-সকল বাজে কথা শোনা আছে, তাহা নির্ম্মল (dismantle) অনর্থ-নিবৃত্তি।

আমি কৃষ্ণ বিস্মৃত জীব। পুনরায় কৃষ্ণের স্মরণ কিরূপে হইবে, তাঁহারই ব্যবস্থা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।।

বৃহতে যাঁহার নিষ্ঠা, ক্ষুদ্রে যাঁহার নিষ্ঠা নহে, তিনিই ব্রহ্ম-নিষ্ঠ। বৃহতে নিষ্ঠা বলিয়াই তিনি গুরু। ক্ষুদ্রে নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তিগণই লঘু। ভগবদ্‌বিস্মৃতির কোন না কোনও বিচিত্রতায় অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান অষ্টাঙ্গযোগাদি কোন না কোনও ক্ষুদ্র ব্যাপারে যিনি আবদ্ধ হইয়াছেন তিনি ক্ষুদ্রনিষ্ঠ। যেটা কৃষ্ণের ভাল লাগে, তাহা বিচার করা উচিত। আমার ভাল লাগা জিনিষটা অন্যাভিলাষ, তাহা কৃষ্ণাভিলাষ নহে। ভোগী হইলে সুবিধা হইবে না, আবার অত্যন্ত বৈরাগী হইলেও সুবিধা হইবে না। "ন নির্ব্বিন্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগহস্য সিদ্ধিদঃ।" "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।"

গরু পবিত্র বস্তু, কিন্তু তাহার দুগ্ধকে পবিত্র জ্ঞান না করিয়া পবিত্র বলিতে বলিতে দুগ্ধপানের পরিবর্ত্তে যদি কেহ গরুকেই খাইয়া ফেলেন তাহা হইলে তাঁহার যেরূপ পবিত্রতা-জ্ঞানে কুবিচার উপস্থিত হয়, সেইরূপ 'কৃষ্ণ পবিত্র', ভগবান পবিত্র, মুখে বলিয়া ভগবানের নিত্য পবিত্র সেবা করিবার পরিবর্ত্তে যদি কেহ নিজেই ভগবান হইয়া যাইতে চাহেন, ভগবানকে গ্রাস করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানের অতিব্যাপ্তি হয়। তাহা মূর্খতা ও অপরাধমাত্র।

"শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল। বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।" "ভগবানের ভোগ না দিয়া কিছুই গ্রহণ করিব না"—এই প্রকার বুদ্ধি না থাকিলে আমার আহার-বিহার-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে। যাহা কিছু পান করিব, সব ভগবানের অবশেষ। রজস্তমোগুণজাত

বস্তু-সকল নৈবেদ্য নহে। বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ গ্রহণ করেন। তাঁহার উচ্ছিষ্টই আমাদের গ্রহণীয়। বিষ্ঠামূত্র আমাদের গ্রহণীয় নহে, উহা দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে বর্জ্জনীয়।

অর্ব্বাচীন সম্প্রদায় ভগবদ্ভক্তির আলোচনাকে অনেক সময় একঘেঁয়ে মনে করেন—বাস্তব সত্যের কথাকে একটি party-র কথা মনে করেন। খণ্ডন মণ্ডনাদি হরি কথার সঙ্গেই হয়। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় হইয়াছে বা হইবে, সমস্ত কথার তুলনামূলক বিচার শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর মধ্যেই আছে। চৈতন্যচন্দ্রের এই দয়ার কথা প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় আলোচনা করে না বলিয়া তাহারা emotional হইয়া পড়িয়াছে।

অপ্রাকৃত শব্দ (Transcendental sound)-এর কথা শুনিলেই জগতের মঙ্গল হইবে। তাহা পূর্ব্ব চিন্তা রাশিকে জাগতিক অভিজ্ঞতাপূর্ণ প্রাকৃত মস্তিষ্ককে নিয়মিত করিবে।

অপ্রাকৃত শব্দের নিকট অভিগমন করিতে হইবে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। অনেকে ভাগবত শুনিবার পর অন্য কার্য্যে চলিয়া যায়। কেহ কেহ বা ভোগবুদ্ধিতে ভাগবত-পাঠের অভিনয় করে, শুনা যায়। এই সকল—ভাগবত-পাঠ নহে, ইহা ভাষার অভিনয় মাত্র। ইহারা কেহই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠও করিতেছে না, শুনিতেছেও না। শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়া আসিলাম, আবার খাওয়া দাওয়া করিলাম, সংসারের কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম—এরূপ হইলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা বা শোনা হইল না। শ্রীমদ্ভাগবত না শোনার দরুণই লোকের অনর্থ যাইতেছে না—ভক্তিলাভ হইতেছে না। "লোকস্যাজানতো বিদ্বান্ চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্।। যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম পুরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং-শোকমোহভয়াপহা।।" শোক, মোহ, ভয়কে সম্বল করিয়া রাখিয়াছে যে সকল মনুষ্যজাতি, কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা রূপক বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে মনুষ্য জাতি, তাহাদের সে-সকল ধারণাকে নির্ম্মূল (dismantle) করাই ভাগবতের কার্য্য। নারদ যখন বলিলেন, কৃষ্ণের একটি কথাও মহাভারতে ব্যাস লিখিতে পারেন নাই, তখন নারদের কৃপাতেই ব্যাস পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। পূর্ণপুরুষের অভ্যন্তরে অপাশ্রিতভাবে একটি negativity বা অচিৎশক্তি বাস করিতেছে। ইহাই মায়া। ইহা লোকের চেতনের ধর্ম্মকে বিনাশ করিয়া দিতেছে। ভগবৎসেবায় বাস্তবতার দিক (positive phase) যাহা দেখাইতেছেনা,--ইহা সেই শক্তি। "ভগবানের নিত্য সেবক আমি"—ইহা বিস্মৃত হওয়ার দরুন ঐ শক্তি এই জগতে আমার উপর প্রভাব স্থাপন করিবার অবকাশ পাইয়াছে।

প্রত্যক্ষজ্ঞানটা কেবল ছেলে খেলা (childish freaks)। ভগবানের দুই প্রকার শক্তি—চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তি। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা মাপিয়া নিতে পারে যাহা বা অনুমান (Inference) করিয়া নিতে পারে যাহা, তাহাই অচিচ্ছক্তি।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত "অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ মায়ার দ্বারা অভিভূত হইতেই হইবে। ইহজগতে কোন একটি বস্তুর প্রতি বৃহৎ জ্ঞান বা জড়ের সম্বন্ধে জড়নিষেধক কোন ধারণাকে বৃহন্মাত্র বুদ্ধি যদি হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মাস্মি' হইলাম না। এজন্য মহাপ্রভু বলিলেন,—তৃণাদপি সুনীচতাই 'ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের প্রকৃত অর্থ। জড়ের ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া বা জড় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে যাওয়া প্রকৃত বৃহত্ত্ব নহে। তৃনাদপি সুনীচতাকে জড়ের সর্ব্বাপেক্ষা লঘু যে তৃণ, যাহাকে গো-গর্দ্দভাদি নীচ প্রাণীও পদ-দলিত করিয়া চলিয়া যায়, সেই প্রকার তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ অবস্থাই 'ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য। 'ব্রহ্মজ্ঞ' শব্দে ব্রাহ্মণ,—কৃপণ নহে।

"আমি স্বতন্ত্র জীব—ভগবানের সেবা করিব না।"—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি প্রত্যেক কৃষ্ণবিস্মৃত জীবেরই আছে এবং এই জন্যই তাহারা এই বহির্ম্মুখতার রাজ্যে এত বড় একটা field পাইয়াছে।

অসত্য বস্তুকে আমরা সত্য বস্তু বলিয়া অঙ্গীভূত (incorporate) করিতে যাইতেছি। আমরা মায়ার আদেশ পালন (dictation follow) করিতে চেষ্টা করিতেছি। যদি জীবের সুকৃতির পড়্‌তা পড়ে, তবেই মঙ্গল হইয়া যায়।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—ইহারা হাতে হেতেলে কাজ করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজের সকলের মস্তিষ্কস্বরূপ হইয়া বুদ্ধিদ্বারা ইহাদিগকে পরিচালনা করেন। ভূজবলদৃপ্তজাতি যখন ব্রাহ্মণের দ্বারা পরিচালিত (guided) হইবে না বিচার করিয়াছিল, তখন তাহারা ব্রাহ্মণের বিরোধি হইয়া পড়িয়াছিল—মস্তকের সহিত তখন হাতের ঝগড়া আরম্ভ হইয়াছিল—ব্রাহ্মণবিদ্বেষ আরম্ভ হইয়াছিল। তখন একুশ প্রকারের রাজনীতি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরোধ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে উদ্ভুত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ ঋষিনীতি পরিত্যাগ করিয়া সংসারনীতির অভ্যুদয়ের জন্য রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রুতি বিরোধী বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্ট হইল। বৈশ্যনীতি তখন জৈনধর্ম্মে প্রকাশিত হইল। উপনিষদের ধর্ম্ম বা বেদের ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে পুতুল প্রস্তুতকারী (Iconographer) বা পুতুল ভঙ্গকারী (Iconoclast) হইতে হইবে। ঠাকুর-ভাঙ্গা বা ঠাকুর তৈয়ারী করা, বীরপূজা, নায়ক পূজা প্রভৃতির নামে জড়ের মূর্ত্তি প্রস্তুত করা বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চিন্তাস্রোত বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব—এই আচার্য্য-চতুষ্টয় আবির্ভূত হইয়া ঐ সকল শ্রুতি বিরোধী মতবাদকে নিরাস করিয়াছিলেন। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে যাঁহাদের চিত্ত আবদ্ধ হইল তাঁহারা পরমার্থ-বঞ্চিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতই যে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য ইহা যাঁহারা না বুঝিয়া স্বকপোল কল্পিত মতকেই উদার মত এবং অকৃত্রিম সূত্রার্থকে সাম্প্রদায়িক একঘেঁয়ে মত-বিশেষ মনে করিলেন, তাঁহারা নিজেদের কপাল নিজেরাই খাইলেন।

Deductive or Inductive শব্দ-দ্বয়ের দ্বারা জড়জগতের লোক যাহা বুঝে, আমরা তাহা বুঝি না। আমরা জানি--যেটা সাক্ষাৎ ভগবৎ সেবা, সেটাই অবরোহ (deductive)। যে কোন প্রকার অভক্তি হউক, উহাকে নিরাস করিতেই হইবে। কিছুতেই উহাকে ভক্তির সহিত সমান আসন দেওয়া যাইবে না। যাহার এইরূপ বৃত্তি নাই অর্থাৎ অভক্তির প্রতি কোন না কোন প্রকার গুপ্ত বা ব্যাপ্ত আসক্তি কিংবা পক্ষপাতিত্ব রহিয়াছে সেইরূপ ব্যক্তিকে জগতের বঞ্চক ও হিংসুক জানিতে হইবে। মনুষ্যের মানস কল্পনা বা চেষ্টা (mental speculation) হইতে যত রকম ধর্ম্মমত হইয়াছে তাহা বদল করিয়া দিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করার কার্য্যের ভার লইয়াছেন,--শ্রীগৌড়ীয় মঠ। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব ইহা খুব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার পার্ষদগণ তাহাকে পল্লবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মূর্খের সংখ্যা অধিক হওয়ায় বৈষ্ণবধর্ম্ম উৎসাদিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম আবার ভাল লোকের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন্। প্রত্যক্ষবাদীর দুর্ব্বুদ্ধি বিনষ্ট হউক। ভগবদ্ভক্তগণ দিবা রাত্র উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন,--কিসে মানবজাতির মঙ্গল হইবে, কিরূপে তাহাদের কর্ণে অকপট সত্যের কথা পৌঁছিবে। ভগবদ্ভক্তগণের আর কোন কার্য্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়াছে—নির্ব্বোধ-শ্রেণী; শ্রীগৌড়ীয় মঠ ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালির মত তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার দ্বারাই জীবের একমাত্র মুক্তি হইবে। মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই অবিমৃষ্যকারিতায় (hasty conclusion) কোন প্রকার মঙ্গল লাভ হইবে না। দৌড়াইয়া পলাইয়া গেলে সত্যকথা শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। আমাদের মন্দির মাটির মন্দির,--পাথরের মন্দির নহে। আমরা পুতুলপ্রস্তুতকারী বা পুতুলভঙ্গকারী সম্প্রদায় বিশেষ নহি। আমরা ঐরূপ শ্রেণীকে কখনই প্রশ্রয় দেই না। নাস্তিক সম্প্রদায় বলিবে—অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগিগণ মনে করিতে পারে,—গৌড়ীয় মঠের মন্দিরও তাহাদেরই আড্ডার মত আর একটি, কিন্তু তাহা নহে। তাহারা কেহ পুতুলপ্রস্তুতকারী, কেহ বা পুতুলভঙ্গকারী। আমরা কোন কাল্পনিক বস্তুর উপাসক নহি, কিম্বা যে বস্তু এখন আছে চরমে থাকিবে না—সেই প্রকার কোন অনিত্য বস্তুরও সেবক আমরা নহি। কর্ম্মী, জ্ঞানী উভয়েরই উপাস্যবস্তু অনিত্য। কর্ম্মী যে স্বর্গাদি ফলের উপাসনা করে তাহা অনিত্য। জ্ঞানি যে ব্যবহারিকতার উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাও তাহাদেরই কথানুসারে অনিত্য।

বিচিত্রতা-পূর্ণ জগতে দর্শনকারিগণের মধ্যেও বহুবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। রুচির প্রভাবে নানাপ্রকার বিচার উদ্ভাবিত হইয়া সত্যের স্থানে বহুক্ষেত্রে নানাপ্রকার রূপান্তর লক্ষিত হয়। মানবের তিনপ্রকার চেষ্টার মধ্যে ইচ্ছা, জ্ঞান ও প্ররোচিত ক্রিয়া--এই বৃত্তিত্রয়

দেখা যায়। অপূর্ণবস্তু-লাভাশায় ইচ্ছার বহুত্ব—একেচ্ছা অপরেচ্ছার বিরোধী, কোথাও পোষক; পূর্ণবস্তু লাভেচ্ছায় জীবের রুচিভেদেও একমাত্র পূর্ণবস্তুই বিবিধ হৃদয়ে প্রতিভাত হন। পূর্ণতার অভাব হইলেই অপূর্ণতার সংখ্যাগত বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়। যেখানে পূর্ণতার বিভিন্ন মূর্ত্তি, সেখানে বস্তুবিষয়ে পৃথক্ না হইলেও অপূর্ণ দর্শকের বিভিন্ন কল্পনা বস্তুর অপূর্ণ প্রকাশ ভেদ দেখিয়া থাকে। সেইরূপ চিত্তবৃত্তির দ্বারা সেই শ্রেণীর অপূর্ণ দর্শকের অভিলাষ পুরুষার্থের বিচারে স্বীয় অপূর্ণতার বা অভাবের পরিপূরণ আশা করে। যেখানে অপরের অভাব-বৃদ্ধির জন্য সূচনা হয়, সেস্থলে সদসতের বিচার জগতের অমঙ্গল স্তব্ধ করিবার যত্ন করে। সেস্থলে ইচ্ছা কিরূপে সংযত হওয়া আবশ্যক, ঐ চিত্তবৃত্তি তাহার তারতম্যের বিচার করে। কর্ম্মের প্রবৃত্তি স্থানভেদে অপরের অমঙ্গল এবং কোথায়ও বা পরের মঙ্গল করায়; আবার কোথায় বা পরের মঙ্গলের ছলনার ফলরূপে নিজ-মঙ্গলের সহিত পরের অমঙ্গলও সংশ্লিষ্ট করায়। ঐহিক সুখ-বাসনা ও আমুষ্মিক সূক্ষ্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি একের সুবিধা করিয়া দিলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দুঃখের কারণ হয়। ইহলোকে চিত্রকরের পরিশ্রমলব্ধ ফল অনেকের নিকট সুখকর হইলেও চিত্রের অঙ্কনজন্য পরিশ্রমরূপ দুঃখভোগ চিত্রকরের ভাগ্যে অপরিহার্য্য; যেহেতু, পার্থিব রাজ্যে সুখও সুখাভাব অর্থাৎ 'দুঃখ' বলিয়া প্রতীতি থাকায় একে অপরের দুঃখের কারণ হন। বিশেষতঃ ঐহিক ও আমুষ্মিক রাজ্য ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া প্রবৃত্তিমূলে প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রধানের অংশে প্রাধান্য অপরের দুঃখের কারণ হয়। কামক্রোধাদি-রিপুসমন্বিত মৎসরতা একমাত্র প্রভুর সেবার অভাবে বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করে। বদ্ধজীবগণ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে অপরের অংশ দেখিতে পান না। অন্যের প্রাপ্যাংশ নিজায়ত্ত করিবার প্রচেষ্টাই কর্ম্মবীরের ইচ্ছা। শ্রেয়ঃপথের কিঞ্চিৎ আলোক যদিও কর্ম্মাগ্রহিগণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি নিজেচ্ছা ফলবতী করিবার অভিপ্রায় মৎসরতা-মূলে অপরকে তাহার প্রাপ্যাংশ হইতে বঞ্চিত করে।

জ্ঞানের আবরণ যেকালে কর্ম্মাগ্রহিতার বিনাশ বাসনা করে, তখনই পূর্ণতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। অপূর্ণ জগৎ হইতে উন্মুক্ত হইবার বাসনা তাঁহার বুভুক্ষুবেষ পরিত্যাগ করাইয়া মুমুক্ষুতায় স্থাপন করে। তখন তিনি অপূর্ণ-পরিহার-বাসনায় যাবতীয় অপূর্ণের সমষ্টিকেই পূর্ণ বলিয়া মনে করিতে থাকেন। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য তাঁহার দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন-ভেদের বিলোপ সাধন করিতে হয়। অপূর্ণ সত্তার পূর্ণতা সাধনোদ্দেশে তাঁহার যে চেষ্টা, সেখানেও নিজফললাভরূপ আংশিক-দর্শন ক্রিয়াবিশিষ্ট হয়। কখনও বা কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা ধারণা আসিয়া তাঁহার কেবল জ্ঞানের ব্যাঘাত করাইয়া যোগাদিপথের উদ্ভাবনা করায়। স্বাধ্যায় প্রভৃতি, যমাদি সাধনষট্‌ক এবং কৃত্রিম বৈরাগ্য মানবের ইচ্ছাকে রূপান্তরিত করে। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মাবৃত, জ্ঞানাবৃত ও মিশ্রভাবাশ্রিত

নানাবিধ অভিলাষবিশিষ্ট জনগণের যে কোন সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্তি নানাপ্রকারে তাহাদের নিজ নিজ অপস্বার্থে নিযুক্ত করে। এই সকল চেষ্টা অপূর্ণ বস্তুর সহযোগে অনুষ্ঠিত হওয়ায় জড় ভাবোন্মত্ততা জীবকে সঙ্কীর্ণতার গহ্বরে আবদ্ধ করে।

প্রবৃত্তজনগণের প্রয়োজন-নির্ণয়ে নানাবিধ ভাব আসিয়া নির্ণয়ের পরস্পর বৈষম্য উৎপাদন করে। সেইকালে পরস্পরের মধ্যে বিবদমান প্রবৃত্তি এতদূর প্রবলা হয় যে, তাহারা নিজ নিজ অবলম্বনীয় যন্ত্রগুলিকে প্রকৃত নির্ণায়ক বলিয়া মনে করিতে থাকেন। অদ্বয়জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ণয়কারীর অবস্থিতি প্রতিবাদযোগ্য নহে—এরূপ বলা যায় না। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয় আমাদের প্রকৃত নির্ণয়কার্য্যে নানাপ্রকার বাধা উপস্থিত করে। যেখানে বাদ প্রতিবাদ বা ভেদনীতির প্রাবল্যের সম্ভাবনা থাকে, উহাই প্রাকৃত জগৎ। এই জগতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রয়োজনরূপে নির্ণীত হইয়া থাকে; আবার এই জগৎ হইতে কৃত্রিম বিরাম লাভ করিবার জন্য যাঁহাদের শ্মশানবৈরাগ্যের উদয় হয়, তাঁহারাও বুভুক্ষা ত্যাগ করিয়া মুমুক্ষাকে আলিঙ্গন করেন। আমাদের আংশিক বস্তুর পারিপার্শ্বিকতার বিচার সকল দেশ-কাল-পাত্রের খণ্ড বিচার-সমূহের সর্ব্বতোভাবে অমঙ্গল সাধন করে। অখণ্ড দেশ-কাল-পাত্রের ধারণা একটি কাল্পনিক বিষয় হইয়া পড়ে। তজ্জন্য পুরুষার্থ-নির্ণয় সর্ব্বতোভাবে বিপন্ন হয়। ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বা চতুর্থ অপবর্গাখ্য বিচার পার্থিব আপেক্ষিক ধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া নিত্য নহে—অবিকৃত জ্ঞানময় নহে, অথবা নিরবচ্ছিন্ন-আনন্দকর নহে।

অদ্বয়জ্ঞানের অনুকূলতায় যে সকল চেষ্টা বিহিত হয়, সেই ইচ্ছাতে কোন ভ্রমাদি দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। যেখানে প্রতিকূলা চেষ্টা, সেখানেই বস্ত্বন্তর কল্পনা ও অদ্বয়-জ্ঞানের ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্যই প্রাকৃত রাজ্যে সম ও বিষম ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য অবস্থিত। যতই কেন না বৈষম্যনিরাকরণের যত্ন করা হউক, কাল্পনিক সহযোগিতা কোন দিনই প্রাকৃত রাজ্যে বহুনায়কের মনস্তুষ্টি করিতে সমর্থ হইবে না। যেখানে প্রতিকূলনায়কের অবস্থিতি সম্ভবপর, সেখানে অনুকূল নায়কের অনুগত জনগণ যে পুরুষার্থের মীমাংসা করিবেন, তাহা বহুল-দোষ-দুষ্ট হইবেই হইবে। সুতরাং পক্ষ বা পক্ষান্তরগ্রহণমূলে যাবতীয় বাক্যের যুগপৎ ভেদাভেদের চিন্ত্যত্ব নিরাকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রকার সুমীমাংসার সম্ভাবনা হইতে পারে না।

কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইয়া বহুত্বের অন্তরালে আমরা যে পরস্পরের কেবল ভেদের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হই এবং আপনাদের অনুকূলতার পোষণ করি, তাহাতে অদ্বয়জ্ঞানের আনুগত্যাভাবে যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তাহা প্রত্যহই ন্যূনাধিক সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই বৈষম্য নিরাকৃত হইবার একমাত্র উপায়ই—একমাত্র ভগবানের আশ্রয়-গ্রহণ। আশ্রয়-গ্রহণনীতি আমাদিগকে আমাদের কেবল-জ্ঞান অবলম্বন করাইয়া যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অদ্বয়জ্ঞানের নিঃশক্তিকত্ব বিচার করায়, উহাদ্বারা জ্ঞানাবরণ-

ক্রমে মুক্তির পঞ্চবিধ প্রকার ভেদ কখনও পুরুষার্থ-নামে পরিচিত হইতে পারে না। তজ্জন্যই ভগবদ্ভক্তগণ সালোক্যাদি মুক্তিমালাকে পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। ঐ সকল মুক্তিভেদ যাঁহাদের হৃদয়কে প্রলুব্ধ করিয়াছে, তাঁহাদের দুষ্পিপাসা বুভুক্ষা বা মুমুক্ষায় পরিণত হয়। যদবধি ভগবানের করুণা-কটাক্ষ বা ভগবৎকরুণা-কটাক্ষলব্ধ ভগবৎপার্ষদের স্মিতমুখভাষিত বৈকুণ্ঠধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়, তৎকালাবধি আমাদের পাপ-প্রবৃত্তি ও পাপোত্থ বিচারের বহুমানন-প্রবৃত্তি ধ্বংস হয় না। প্রাচীন পাশ্চাত্য-দার্শনিকগণের নিকট পুণ্যসংগ্রহ ও অপস্বার্থপর স্বসুখ সংগ্রহই অভীষ্ট বস্তু ছিল এবং এখনও ক্ষীণবিবেক-সম্প্রদায়ের নিকট উহাই প্রতিষ্ঠিত থাকায় জ্ঞানপ্রাধান্যে মুক্তিলাভেচ্ছার আগ্রহই দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদানের কথাই বলিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্মানুশীলনে চাপল্য প্রদর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সমীচীন বাচ্য-বাচক-নিরূপণে সমুৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই, উঁহারাই ভুক্তি-মুক্তিকে পুরুষার্থ জ্ঞান করেন। পরম পুরুষের অভিজ্ঞানের অভাবে অসংখ্য পুরুষসমূহ স্ব স্ব চেষ্টা-দ্বারা প্রকৃতিদাস্যে নিযুক্ত হইয়া আপনাদিগকে প্রাকৃত অভিমান করেন। কিন্তু যেকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের হৃদ্দেশে ভুক্তি ও মুক্তির ইচ্ছা প্রবল থাকে, সেইকালে তাঁহাদের চিদানন্দেচ্ছা সুপ্ত বলিতে হইবে। পূর্ণ পুরুষের পুরুষোত্তমতায় যে ইচ্ছা-শক্তি, ও যে ক্রিয়া-শক্তি অবস্থিত, তদনুকূলে বদ্ধজীবের অভিযানই পরম মঙ্গলের প্রধান পথ। ঐ পথটিকেই 'ভক্তিপথ' বলিয়া অভক্তিপথগুলিকে অন্যান্য ইতর পথ বলা হইয়াছে। দেহের ধর্ম্ম, মনের ধর্ম্ম, দেহের অর্থ, মনের অর্থ, দৈহিক কাম ও মানসিক কাম—এই সকল প্রকৃত পুরুষার্থ-নির্ণয়ের ব্যাঘাত-কারক বলিয়া পুরুষের ভোক্তৃ-অভিমান এবং পুরুষযোষা প্রকৃতির নারী-অভিমান পুরুষার্থ নির্ণয়ের প্রতিবন্ধক উপস্থিত করায়। অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের দ্বারা যেরূপ দৃশ্য বহুগুণিত হইয়া অধিকতর স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়, সেরূপ ভগবত্তার দর্শনে জীবের অপস্বার্থ-পরতায় যে পুরুষার্থ নির্ণীত হইয়াছে, পূর্ণের শক্তিসমূহ সেই নির্ণয় বিপর্য্যস্ত করিয়া পুরুষার্থ-বিনির্ণয়ের জন্য যত্ন করাইবে। সম্রাট্ কুলশেখরের মুকুন্দমালা-স্তোত্রে আমরা চতুর্ব্বিধ ভোগবাসনার দোষসমূহ লক্ষ্য করি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ইহাই সুষ্ঠুভাবে বর্ণন পূর্ব্বক অখিলরসামৃতমূর্ত্তি অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সকল কথা আমাদের পুরুষার্থের চরমসীমা বলিয়া জানাইয়াছেন।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিষয়িণী চিত্রিতকথায় শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, ত্রিবর্গলাভের যত্নে মানব ধর্ম্মবিষয়ে দিশাহারা হইয়াছেন এবং চতুর্থবর্গের জন্য লালায়িত মানব আরও অধিকতর বিপথগামী হইয়াছেন। পরন্তু ভগবদাশ্রিত জনগণ কেবলজ্ঞানগম্য নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মের জ্ঞানরহিত নহেন, আংশিক পরমাত্মবস্তুর ভূমাত্ব-বিষয়ে বিচার রহিত হইয়া তাঁহার

সান্নিধ্য ও সাযুজ্য প্রার্থী মাত্র নহেন। পরন্তু নিত্য নিজাধিষ্ঠানেও অধিষ্ঠিত হইয়া পূর্ণজ্ঞানের সেবা করিতে গিয়া নির্ব্বিশিষ্ট ভাব বা জড়াজড় প্রতীতির অন্তর্ভূত পরমাত্ম-সান্নিধ্যমাত্রে স্বীয় নিত্যাচেষ্টা আবদ্ধ করেন নাই। পরন্তু জীব অণুসচ্চিদানন্দ-স্বরূপের দ্বারা নিত্যকাল পূর্ণচিদানন্দরসাস্বাদনের প্রয়োজনীয়তাকেই পুরুষার্থ বলিয়া বিনির্ণয় করিয়াছেন। ইহা দৈহিক বা মানসিক কল্পনা-প্রসূত অনিত্য অনুভূতি নহে।

ভগবদনুশীলন-ক্রমেই জীবের নিত্যস্বরূপের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া নিত্যানুভূতির বিষয় হয়। তখন আর পুরুষার্থ-নিরূপণে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতির তাৎকালিকী চিন্তা অবাঞ্ছিত রাজ্যে লইয়া যায় না। তখন আর জীব অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানীর সজ্জায় অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের কোনপ্রকার প্রতিকূল আচরণ করিয়া কর্ম্ম-জ্ঞানাদির বহুমানন করিতে করিতে নিত্যা ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনঃ পুনঃ দেহ-মনের বশে পুরুষার্থ-নির্ণয়ে বিপথগামী হন না। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ প্রকরণগ্রন্থে প্রস্ফুটিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতগণের সৎসঙ্গে উহা লব্ধ হয়; উহাই সর্ব্বোত্তম পুরুষার্থ, আত্মসাফল্য বা ভগবৎপ্রেম।

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবৎ
নিঃশ্রেয়সায়ঃ বিষয়ং খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।।

এই শ্লোকে নিঃশ্রেয়স্-কথাটী আছে। 'নিঃশ্রেয়স্'-শব্দের অর্থ ভগবানের অনুগ্রহ, ভগবৎ-কৃপা। উহাই জীবের নিত্যমঙ্গলের প্রসূতি। বর্ত্তমানে আমরা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছি। এই নরতনুই ভদবদ্ভজনের মূল। মনুষ্যেতর দেহে হরিভজন হয় না। অচেতন বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়াভাবে বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না; সুতরাং তাহারা শব্দ শ্রবণ বা শব্দব্রহ্মের আবাহন করিতে অক্ষম। কিন্তু আমাদের চেতনতা আছে, আমরা চেতনের বৃত্তির দ্বারা শব্দব্রহ্ম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে পারি এবং সেই শব্দব্রহ্মের শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারাই আমাদের নিত্যমঙ্গল উদিত হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের এবং ইহ জন্মেরও আমাদের ইন্দ্রিয়জ বা অক্ষজ জ্ঞানের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিয়াছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইতেছে না বলিয়া আমরা আধ্যক্ষিক জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির অনিত্যতা ও পরিবর্ত্তনশীলতা উপলব্ধি করিতে পারি। যাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে সকল আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষটি পাইবার সৌভাগ্য একমাত্র মনুষ্যজন্মেই হইয়া থাকে। যখন আমরা মনে করি, আমরা বদ্ধজীব, তখনই আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটি দেহের কথা মনে পড়ে। এই দুইটী অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল দেহ-

মনকে আত্মার সহিত সামঞ্জস্য করা উচিত নহে। যখন আমাদের চেতনের বৃত্তি স্বাধীনতার অপব্যবহার করি, তখনই আমরা স্থূল-সূক্ষ্মদেহে আবৃত হই—যখন আমরা পরমাত্মা পরমেশ্বরের সেবা ভুলিয়া যাই, তখনই আমরা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা, প্রকৃতির ভোক্তা ও কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করি। কিন্তু এই সকল অভিমান—প্রাকৃত। যখন আমাদের চেতনের বৃত্তি বহির্জ্জগতের বিষয় ভোগ করিতে প্রমত্ত থাকে, তখনই ঐ বৃত্তিকে মন কহে; এই মন—আত্মস্বরূপের বিরূপাবস্থা—ভবানী-ভর্ত্তা—জড়ের ভোক্তা; এই মন আত্মার সুপ্তাবস্থায় জাগ্রত থাকিয়া গোমস্তা-স্বরূপে কর্ত্তৃত্বাভিমানে বিষয় ভোগ করে; এই মনই আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে; পুণ্য-পাপের বশবর্ত্তী হইয়া কখনও স্বর্গ কখনও নরক ভোগ করে; সুতরাং এই মনই আত্মার সর্ব্বপ্রধান শত্রু। এই মনকে নিগ্রহ করাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিপ্রায়।

কিন্তু যখন আমরা মনে করি যে, আমরা পরমাত্মা পরমেশ্বরের অংশীভূত জীব, পরমেশ্বরের সহিত ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে—চেতনাংশে অভিন্ন এবং তিনি বিভুচিৎ, আমরা অণুচিৎ—এই হিসাবে ভিন্ন, তখন আমরা স্বরূপে অবস্থিত শুদ্ধ জীবাত্মা, কিন্তু তাই বলিয়া ঘটাকাশ-মহাকাশ-ন্যায় অবলম্বন করিতে হইবেনা অর্থাৎ আমাদের পাঞ্চভৌতিক দেহভঙ্গে আমাদের আত্মা পরমাত্মার সহিত লীন হইয়া যাইবে এরূপ মায়াবাদ অবলম্বন করিতে হইবে না। আমরা অণুচিৎ জীব বিভুচিৎ পরমেশ্বরে পরিণত হইব না। সমীম বস্তু কখনও অসীম হইতে পারে না। জীব ও ঈশ্বরে নিত্য ভেদ বর্ত্তমান। আমাদের সীমাবদ্ধ আধ্যক্ষিকজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত করিতেছে যে, আমরা অর্থাৎ জীব কখনও 'ঈশ্বর' পদবাচ্য হইতে পারি না, ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, তিনি পরব্রহ্ম, অতি বৃহৎ; তাঁহার সমান বা তাঁহার চেয়ে বড় আর কেহই নাই, ওহে জীব, তোমার সেই ভগবত্তা কোথায়? তোমার সে বৃহত্ত্ব কোথায় তোমার অসীমত্ব কোথায়? তুমি যে সসীম, তুমি যে ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র, একবারও কি তাহা ভাবিয়া দেখ না? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়া জানাইয়াছেন যে, আমরা কার্ষ্ণ-বস্তু আমরা বৈষ্ণব অর্থাৎ আমরা কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তু; আমরা কৃষ্ণ নহি বা বিষ্ণু নই। কার্ষ্ণ-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই।

যখনই আমরা কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যাই, তখনই স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া মায়ার কবলে কবলিত হই। তখন মনের কার্য্যই প্রবল হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগে ব্যস্ত হই। আমাদের চেতনের বৃত্তি বর্ত্তমানে দেহ-মনে আবদ্ধ; সুতরাং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি হৃষীকেশ কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে নিযুক্ত না হইয়া বিষয়-ভোগে প্রমত্ত। কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া মন সহস্র বিষয়ে প্রধাবিত হইলে সহস্র দিক্ হইতে সহস্র সহস্র বিষয় বহু সপত্নীযুক্ত গৃহপতির ন্যায় মনকে নাস্তানাবুদ করে। কাজেই আমরা তখন কৃষ্ণসেবা বঞ্চিত হইয়া 'বিষয়ী'

বলিয়া অভিহিত হই। কিন্তু যখন সাধুগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা আত্মস্থ বা স্বরূপস্থ হই অর্থাৎ আমাদের সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই আমরা কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত হই, তখন আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহের প্রতীতি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায়। জাগতিক কর্ত্তব্যবুদ্ধিগুলি হইতে ছুটি পাইয়া বিষয়গুলিকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিবার সৌভাগ্য পাই, তখন আমরা বুঝিতে পারি, আমরা কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং' অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বস্তুই ভগবানের সেবার উপকরণ বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়।

আমরা সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে বুঝিতে পারি যে, বৈকুণ্ঠধামে পার্থিব মলিনতা নাই এবং নশ্বর মর্ত্ত্যজগতে বৈকুণ্ঠপ্রতীতি নাই। মর্ত্ত্যবুদ্ধিবশতঃ আমরা এই ভ্রমে পতিত হই যে, আমরা বদ্ধ জীব, জন্মমরণশীল বস্তু। আমরা স্থূল-সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত। এই ভ্রমবশতঃই আমরা দেহ-মনে আত্মবুদ্ধি করিয়া অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা জড়ভোক্তা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। কিন্তু সাধুসঙ্গ-প্রভাবে আমরা জড়াভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবানের পাদপদ্মে উপনীত হইতে পারি। আধ্যক্ষিক জ্ঞানই বর্ত্তমানে আমাদের সম্বল। এই ত্রিগুণতাড়িত আধ্যক্ষিক জ্ঞান আমাদিগকে জড়ীয় বিষয় গ্রহণ করিবার যোগ্যতা প্রদান করে। দেহ-মন জড়েন্দ্রিয়-সাহায্যে জড়ভোক্তা; আত্মার জড়েন্দ্রিয় নাই, উহা চিদিন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারী কৃষ্ণদাস।

তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ জীব চিৎ ও অচিৎ জগতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। চিচ্ছক্তির আশ্রয়ে উক্তাবস্থায় চিন্ময়ধামে কৃষ্ণসেবা-সুখ-লাভের যোগ্যতা জীবের আছে, আবার অচিচ্ছক্তি বা মায়াশক্তির ভোক্তাভিমানে বদ্ধাবস্থায় চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে শুভাশুভ কর্ম্মের নাগরদোলায় কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে ভ্রমণ করিবার অধিকারও তাহার আছে। মুক্ত অবস্থা আর কিছুই নহে, স্বরূপে অবস্থিত হ'য়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। যখন স্বরূপ-বিস্মৃত হই, তখনই আমরা মায়ার দাসত্বমূলে জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পাঁচটি অনিত্য বিষয়ভোগে প্রমত্ত হই; কিন্তু জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। এ প্রপঞ্চে যে সুখের আভাস দেখা যায়, তাহা দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। এই মোহগর্ত্তের আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা বুঝিতে পারি না, আমরা কেন এখানে এলাম, কোথায় আমাদের গন্তব্য স্থান এবং কে আমাদের নিত্যবান্ধব; স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই ইহার মূলীভূত কারণ, অর্থাৎ আমরা চেতন বস্তু, 'জগতের বিষয় ভোগ করিবার আমাদের অধিকার আছে' যখনই এরূপ অভিমানে আমরা অভিভূত হই, তখনই কর্ম্মালানে পড়িয়া কখনও সুখ কখনও দুঃখ ভোগ করিতে থাকি; কিন্তু যখন সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা দিব্যজ্ঞান লাভ করি, তখন বুঝিতে পারি, জড়বিষয়ের ভোক্তা আমাদের বাহ্য দেহ এবং সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন স্বয়ংরূপের সেবা হইতে বিচ্যুত করিয়া আমাদিগকে ভোক্তাভিমান করায়; আমাদের আত্মা বর্ত্তমানে সুপ্ত আছে বলিয়া আত্মার agent

অর্থাৎ গোমস্তাস্বরূপ মন ত্রিগুণতাড়িত হইয়া জড়ের ভোক্তাভিমানে আত্মাকে নিত্য চিদানন্দ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। কিন্তু যখন আত্মা জাগ্রত হয়, তখন পরমাত্মারূপী কৃষ্ণের নিত্যসেবাই তাঁহার স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারে, বদ্ধাবস্থায় আমাদের পঞ্চবিধ সম্বন্ধ দৃষ্ট  হয়। এই পঞ্চবিধ সম্বন্ধ আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে স্থাপন করি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা উদিত-বিবেক ও সারগ্রাহী, তাঁহারা এই জাগতিক পঞ্চবিধ সম্বন্ধের উপলব্ধি করিয়া শ্রীভগবানের সহিত এই পঞ্চবিধ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহারা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অধোক্ষজ বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিতে না পারিয়া জড়-সুখে প্রমত্ত হন, আমাদের মধ্যে যাঁহারা নির্ব্বিশেষজ্ঞানী, তাঁহারা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে কর্ম্মফল-বাধ্য না হইয়া ত্রিপুটীবিনাশ-সাধন-পূর্ব্বক নির্ব্বিশেষব্রহ্মে লীন হইতে চাহেন। আমরা এই কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডিগণের ফলভোগবাদের বা ফল্গুবৈরাগ্যের বহুমানন করিতে পারি না। অক্ষজজ্ঞানের বা অহংগ্রহোপাসনার ফল্গুত্ব যে পর্য্যন্ত আমরা উপলব্ধি করিতে না পারি, সে-কাল পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচী আমাদের হৃদয় প্রবলভাবে অধিকার করিয়া বসে, কিন্তু যখন হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি, তখন আমাদের 'কর্ম্মকাণ্ড' জ্ঞানকাণ্ড সকলি বিষের ভাণ্ড' বলিয়া জানিতে পারি, জীবের এই দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া পতিতপাবন জগদ্গুরুলীল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগের যুগধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তনের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্য; তিনি 'তৃণাদপি' শ্লোকে চারিটী বাক্যে সর্ব্বদা কৃষ্ণকীর্ত্তনই যে জীবের একমাত্র কৃত্য, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। তৃণাদপি সুনীচ হইয়া, তরুর ন্যায় সহ্যগুণ-সম্পন্ন হইয়া নিজে অমানী এবং সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করাই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিহত জীবগণকে ভবব্যাধিনাশক শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনরূপ মহৌষধি প্রদান করিয়া মহাবদান্য। যাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক, নিত্যানন্দ-ধনে ধনী হইতে অভিলাষী, তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিবেন। এই হরিনাম শ্রীহরি হইতে অভিন্ন; তিনি নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত চিন্তামণি কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহ। এই হরিনাম জাগতিক শব্দ-সামান্য নহেন। এই হরিনামকে আল্লা, গড়, ব্রহ্ম, পরমাত্মা কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন দেশের মনঃকল্পিত উপাস্য-বিগ্রহের সহিত সামঞ্জস্য করিতে হইবে না, আভিধানিক শব্দগুলি আমাদিগকে যে প্রত্যভিজ্ঞান প্রদান করে, তাহা খণ্ড ও অসম্পূর্ণ। সেই শব্দগুলি এবং তদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বস্তুগুলির মধ্যে মায়ার ব্যবধান আছে। শব্দগুলি কিছু বস্তু নহে; কিন্তু পরব্যোমে উদ্ভূত নাম-নামীর রূপ-গুণ-লীলা হইতে অভিন্ন।

জড় শব্দ আমাদিগকে জড়জ্ঞান ও জড়ানন্দ দিতে পারে, কৃষ্ণজ্ঞান বা কৃষ্ণানন্দ দিতে পারে না। কিন্তু শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণনাম আমাদিগকে কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারে।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগকে এই জড় কোলাহল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বিগলিত কৃষ্ণ-কোলাহল শ্রবণ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবই অহরহ শতকরা শতভাগ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত। তিনি 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-জ্ঞানের মূলোৎপাটনকারী তৃণাদপি সুনীচ। তিনি বহির্ম্মুখ জীবের বা জগতের নানাবিধ অত্যাচার, অবিচার, অসুবিধা ও নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু। তিনি জগতের প্রত্যেক জীবকে—প্রত্যেক বস্তুকে হরিকীর্ত্তন-প্রচাররূপ সেবাসৌভাগ্য প্রদান করিয়া অমানী ও মানদ; তিনি জাগতিক ঐশ্বর্য্যের মধ্যে , সমস্ত বিষয়ের মধ্যে বিষয়ী থাকিয়াও নির্ব্বিন্ন। তিনি ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং-মন্ত্রে নিত্য দীক্ষিত।

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, নিরন্তর বিষ্ণুপাসক আপনাকে 'চিৎকণ জীব, কৃষ্ণের নিত্যদাস জানিয়া জগতের প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণভোগ্য ও প্রত্যেক বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া জানেন। তিনি কর্ম্মীর ন্যায় জড়োন্নতিবাদী রাবণের সিঁড়ি বাঁধার ন্যায় নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানী নহেন। ভগবদ্ভক্ত গণগড্ডলিকার চিন্তাস্রোতে গা ভাসাইয়া দেন না। তিনি জাগতিক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লোলুপ নহেন বলিয়া লোকের প্রশংসা বা নিন্দাতে সমদৃক ও অদোষদর্শী—লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম সামাজিক তাড়ন, ভর্ৎসন, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতিতে উদাসীন থাকিয়া বিপ্রলম্ভ-ভাবে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে সর্ব্বদা ব্যস্ত। তিনি শ্রৌত পন্থায় জীবের নিত্য মঙ্গল বিধানার্থ কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রমত্ত; সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই, ইহাই তাঁহার প্রচার্য্য বিষয়, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তর্পণ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও ইতর অভিলাষ নাই। শ্রীকৃষ্ণের নাম, স্বরূপ ও শ্রীবিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। এই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীনামের স্বরূপ ও নিজের স্বরূপ অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উদ্দিষ্ট নাম-সংকীর্ত্তন। যে কাল পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র দেহ-মনের স্মৃতি থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ের পরিমাণে দেহ-মনঃ-স্মৃতির শৈথিল্যক্রমে শ্রীনামপ্রভু জীব-হৃদয়ে উদিত হন। তখন 'হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে (নাম) নাচে অনুক্ষণ'। শ্রীনামের স্বরূপ—সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় জীবের শুদ্ধসত্ত্বে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। সরলতাপূর্ণ হৃদয়ে, চিন্ময় নয়নে, সেবোন্মুখ জিহ্বায়, শ্রবণোন্মুখ কর্ণে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলা ইন্দ্রিয়গণে অখিল-রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তিলাভ করেন। সেবাবিমুখ বা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি জড়-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়, শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের আভাসে সর্ব্বপাপ ও সংসারবন্ধন শিথিল হয়, তখন নামাভাসে মুক্ত হইলে জীব শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে অধিকারী হন। ভগবদ্ভক্তগণ অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনমুখেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

জড় জগতে আমরা 'রস' বলিয়া একটা জিনিষ দেখিতে পাই, এ রস আস্বাদনের বস্তু হইলেও ইহা নশ্বর ও হেয়; কিন্তু অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণে এই রস উন্নতোজ্জ্বল, এই রস পঞ্চবিধ, জড় রসের সহিত এই চিদ্‌রসের নিত্য বৈশিষ্ট্য আছে। জড়রস খণ্ড ও অসম্পূর্ণ। চিদ্‌রসের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন, কৃষ্ণ—রসো বৈ সঃ; এই চিদ্‌রস আত্মার চিন্ময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; উহা জড়-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। জড়রস নিত্যকাল স্থায়ী নয়, কিন্তু চিদ্‌রস বা কৃষ্ণপ্রেমরস জড় রসের ন্যায় বিকৃত হয় না। যেকাল পর্য্যন্ত আমরা শ্রেষ্ঠতর কৃষ্ণরসের রসিক না হই, অথবা কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে জাতরুচি-বিশিষ্ট না হই, সে-কাল পর্য্যন্ত আমাদের জড়রস-সম্ভোগে অনাস্থা বা ঔদাসীন্য উদিত হয় না, রসময় শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য পর্য্যবসিত। আমাদের নিজ-সুখ-নিমিত্ত কৃষ্ণের সেবা করা উচিত নয়। হৃষীকেশের হৃষীক-তর্পণে আমাদের ইন্দ্রিয় নিযুক্ত থাকা উচিত। যত কিছু ভোগের সামগ্রী জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, সকলের ভোক্তা ও কর্ত্তা—গোবিন্দ, সেবোন্মুখ রসনায় ও ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গ্রাহ্য। বিদ্বদ্‌রূঢ়িবৃত্তিতে শব্দের তাৎপর্য্য কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নয়। পক্ষান্তরে যদি আমরা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়- তর্পণ বিস্মৃত হই, তাহা হইলে আমরা স্বার্থপূতিগন্ধময় বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তে পতিত হইব। তখন 'রসো বৈ সঃ' কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর কিছু বস্তুর সেবা হইয়া যাইবে; অখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণ আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি—হৃষীকেশ—গোবিন্দ, আমরা তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলে অচেতনের সেবায় নিযুক্ত হইয়া অচিৎ-এ পরিণত হইব, তখন চিন্ময়রস আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। জড় রসের বঞ্চনা দ্বারা আমাদের জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পরম দয়ালু। তিনি আমাদিগকে জড়রস হইতে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম-মধু পান করাইবার জন্য প্রমত্ত করান। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহার নাম-সংকীর্ত্তনে আমাদের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল বিদূরিত হয় এবং আমাদের চিত্ত নির্ম্মল হইলে পর তিনি তাহাতে উদিত হন।

ভোক্তার ভোগ্যজগতে ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিতে গিয়া যে সুখোদয় হয়, তাহা 'বিলাস' নামে পরিচিত। সুখান্বেষণ বা প্রীতিসংগ্রহই আত্মার একমাত্র বৃত্তি। সেই প্রীতির অভাব হইলে ইন্দ্রিয়-পরিচালনা করিতে উৎসাহ থাকে না; পরন্তু সঙ্কোচ করিবার বিচারই দেখা যায়, ইহাকেই "বৈরাগ্য" বলে। জাগতিক অভিজ্ঞতা অনেক স্থলে পরিণাম বিচার করিতে গিয়া বৈরাগ্যকেই পরম উপাদেয় জ্ঞান করে। সুখের উপলব্ধি যাঁহাতে আছে, তিনিই সুখের ক্ষীণধারা বা লুপ্তধারাকে আদর করেন না। সুখের উপলব্ধি যে বৃত্তির সাহায্যে লব্ধ হয়, উহা জ্ঞানবৃত্তি নামে কথিত; সুখের উপলব্ধি-কারকের নাম "জ্ঞাতা"। জ্ঞেয়স্থলীয় সুখ ক্ষীণ হইলে বা তাহার অভাব থাকিলে জ্ঞানের পরিমাণ ন্যূন বা অভাবগ্রস্ত হয়, সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞাতার যে অভাব-বৃত্তির সেবা করিতে হয়, উহা 'অজ্ঞান'

নামে পরিচিত। এই অজ্ঞানই দুঃখের কারণ বলিয়া জ্ঞাতৃবর্গ জ্ঞানের সাহায্যেই বিচার করিয়া থাকেন। জ্ঞাতার বহুত্ব জ্ঞানের বিবিধত্ব ও জ্ঞেয়ের অল্পত্ব, বৃহত্ত্ব বা অভাব বিলাসের ব্যাঘাত উৎপন্ন করিলে যে জড়তা প্রকাশিত হয়, উহারই অপর পরিচয় সাধনজন্য বিরাগ; তাহাই তৎকালে প্রয়োজনের স্থান অধিকার করে। বস্তুলাভে বিতৃষ্ণা আমাদের জ্ঞান-প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করাইয়া মানসীবৃত্তি ও তদধীন ইন্দ্রিয়-পরিচালনা হইতে অবসর গ্রহণ করায়। প্রবৃত্তপুরুষ ইন্দ্রিয়পরিচালনা হইতে বিমুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে কতিপয় কৃত্রিমপন্থা আবিষ্কার করেন। বহির্জগৎ হইতে চিত্তের বৃত্তি সংযত করিবার বাসনা প্রবল হওয়ায় বিরাগসাধনদ্বারা অভীষ্ট-সিদ্ধি অভিলাষ করেন। কিন্তু জড়জগতে সাপেক্ষধর্ম্মের বশবর্ত্তী হওয়ায় তাহার অভিলাষ পূরিত হইবার পূর্ব্বেই বাহির হইতে বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়।

সঙ্কল্প-বিকল্পের সংহার-বাসনায় যে-সকল মনোনিগ্রহাত্মক চিন্তা বা স্থূলশরীরনিগ্রহ-বিবেক অনুসৃত হয়, তাহারও অনেক সময় বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা অল্প হইয়া পড়ে। এজন্যই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা খণ্ড অভিজ্ঞানসংগ্রহের চেষ্টা বাস্তবজ্ঞান বা আনন্দসংগ্রহে কার্য্যকারী হয় না।

খণ্ডজ্ঞান, খণ্ডবস্তুর ধারণা বা খণ্ডিত জ্ঞাতা যে ভূমিকায় অবস্থিত, তাহার সাহায্যে, তাহার নানাপ্রকার উদ্ভাবন-শক্তিকে কার্য্যে পরিণত করিবার নানা ব্যাঘাত দেখা যায়। একারণ খণ্ডিত জ্ঞাতা আপনাকে অখণ্ড জ্ঞাতা করাইবার জন্য যে-সকল কাল্পনিক সাধনের অন্তরে প্রবেশ করেন, উহা অনেক স্থলেই ফলবৎ হয় না বলিয়াই জ্ঞানলাভের পন্থাকে এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্যক্ আশ্লেষণকে অনেকে "পুরুষার্থ" বলিয়া ধারণা করিতে পারেন না।

ভগবদিতর ধারণা যে জ্ঞেয়-ব্যাপারে অবস্থিত, তাহা আকৃষ্টশস্য তুষের পীড়নের ন্যায় কথিত হইয়াছে। মুক্তির সাযুজ্য-বিচারে জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সমাধির কথাই আমরা শুনিয়া থাকি। জাগতিক সান্নিধ্য-নীতি অবলম্বন করিয়া জড়াবকাশ-রহিত করিতে পারিলে বস্তুত্রয় মিশিয়া যায়, ইহা অভিজ্ঞানের পরিচয় বটে, কিন্তু এই জ্ঞানটী জড়াতীত বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে প্রযোজ্য কি না, সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে আমাদিগকে খণ্ডজ্ঞান-রাজ্য হইতে সংগৃহীত জ্ঞানাবলম্বনে অখণ্ডরাজ্যের গতি নিরূপণ করার ন্যায় নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়।

বৈকুণ্ঠরাজ্যে জড়াবকাশ না থাকায় সেখানে কোন জড়বস্তু বা জড়জ্ঞান স্থান পাইতে পারে না। স্থান-লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা থাকিলে উহা ভূতাকাশেরই অন্তর্ভুক্ত স্থানবিশেষে পরিণত হয়। বৈকুণ্ঠ চিরদিনই বাস্তববস্তুর প্রেমাকর্ষণে এরূপ ঘনসমাশ্লিষ্ট যে, তথায় ইতরবস্তুর প্রবেশের স্থান থাকিতে পারে না।

আমাদের অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয়-দ্বারা ভোগবিলাসে আবদ্ধ এবং আমাদের ভক্তি-বর্জ্জিত ত্যাগ-বিরাগ—ভোগভার-জনিত ধারণা-মাত্র। ভোগত্যাগের রাজ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মুকুন্দ-দেবের আশ্রয় লাভ করিতে হয়। আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিলে মুকুন্দের সেবোপযোগিসুপ্ত-অস্মিতার নিদ্রা-ভঙ্গ হয়। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের প্রিয়তম বিষয়ের সহিত প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ আশ্রয়-জাতীয় আমরা অনেক, সেই প্রেমরজ্জু জড়রজ্জুর ন্যায় ভূতাকাশের অপেক্ষা করে না, পরন্তু অবিমিশ্র কেবলচিদাকাশে ভজনীয় ও ভক্তের মধ্যে অবস্থিত। কেবলচিদাকাশে যেসকল বাস্তব শক্তিপরিণত অধিষ্ঠান নিত্যাবস্থিত, তাহাতে জড়জগতের কোনপ্রকার অবরতা নাই—জড়কালাধীনতা নাই; অখণ্ডকাল, অখণ্ড অবকাশ ও অখণ্ড চিন্ময় বাস্তব বস্তু তাঁহার অণুচিদ্‌বস্তুকে ক্রোড়ে ধারণ করায় কোন বিক্ষোভের কারণ হয় না। তথায় 'প্রেম' নামক আকষণী বৃত্তি, যাহা কৃষ্ণের নিজায়ত্ত বস্তু, উহারই ক্রিয়াকলাপ অণুসচ্চিদানন্দশক্তিকে জড়াকাশ ও জড়কালের দ্বারা বিদূরিত বা বিক্ষিপ্ত করে না। সেখানে বস্তুর অদ্বয়জ্ঞান প্রবল থাকায় জাগাতিক ভেদের অপকৃষ্টাংশ স্থান পায় না। সুখ-দুঃখ-ভেদের পরিমাণ, আলোক-অন্ধকারের ভেদপরিমাণ, ক্ষুদ্রত্ব-বৃহত্ত্ব-পরিমিতিগত ভেদবিষয়ক অবরতা বা দুঃখ চিৎসুখের ব্যাঘাত করিয়া আমাদের বর্ত্তমান প্রতীতিতে অচিদ্‌রাজ্যে অনুরাগের প্রতিকূল 'বিরাগ' আবাহন করে না। সেই 'প্রেমই'—আকর্ষক কৃষ্ণের আকৃষ্টের প্রতি অনুরাগ এবং আকৃষ্ট আশ্রয়ের কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ। সেইকালে কৃষ্ণেতর বৈরাগ্য প্রবল হওয়ায় উহাই তথাকার প্রকৃতি বা নিত্যস্বভাব। সেই প্রেমা পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া সংখ্যাগত অধিষ্ঠানসমূহে একতাৎপর্য্যপর আকর্ষকের সহিত প্রেমময় সম্বন্ধ স্থাপন-পূর্ব্বক নিত্য অবস্থিত। তথাকার প্রতিযোগিতা আকর্ষণশক্তির উত্তরোত্তর বর্দ্ধনকারিণী। উহার হ্রাস পাইবার যোগ্যতা নাই। প্রেমের বিচিত্র বিলাস ক্ষীণদৃষ্টিতে জগতে আলোচিত হইলেও যে সাহিত্য এবং সৌন্দর্য্য এখানে উপলব্ধির বিষয় হয়, উহা নিত্যধামের বিকারবিশেষের প্রতিফলন-মাত্র—বিকৃত প্রতিফলনে বাস্তব সত্য নাই বলিয়া উহা হেয়তা ও নশ্বরতাপূর্ণ।

কৃষ্ণের প্রেমবিবর্ত্তের যে পরিচয় এতদ্দেশে আনীত হয়, উহা আসুরবুদ্ধির বিমোহনের জন্য। প্রেমবিবর্ত্তের যে বিপ্রলম্ভের বা অভাবের বর্ণন আছে, উহা নিত্য সম্ভোগের উৎকর্ষের জন্যই জানিতে হইবে। যেরূপ ইহজগতে আমরা অতি লোভনীয় বস্তুকে দস্যু-কর্ত্তৃক পরিহৃত হইবার বিরুদ্ধে সযত্নে গোপন করিয়া থাকি, নিজ সৌভাগ্যের কথা হিংসকের কর্ণে যাহাতে প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্য উহাকে আবরণে আবৃত করি, সেইরূপ হরিলীলা-সমূহ পুণ্যপাপস্রোতে নিমগ্ন দুষ্কর্ম্ম-নিরত জনগণের বোধ্য নহে বলিয়া ভোগপরায়ণ জনগণের জন্য কর্ম্মকাণ্ডের প্রশস্তি বেদমন্ত্রে গীত হইয়া থাকে।

আবার বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্ প্রভৃতির মধ্যেও মূঢ়-মোহনের জন্য জড়নিরস্ত একায়নবিচারে জগন্মিথ্যাত্ব-বাদ, রসরাহিত্যবাদ, বিচিত্র-বিলাস-রাহিত্য-বিচার, জীবব্রহ্মৈক্যরূপ বিবর্ত্তবাদ প্রভৃতি নানাপ্রকার অজ্ঞজনমোহিনী বার্ত্তা বিঘোষিত আছে। যেরূপ সংসারে অনভিজ্ঞ শিশুর নিকট দাম্পত্যের কথা অনালোচ্য, সেই প্রকার অস্ফুটচিত্ত ভগবদ্‌বিমুখ কৈতবপূর্ণ ব্যক্তির নিকট চতুর্বর্গ আলোচনা ব্যতীত পঞ্চমপুরুষার্থের আলোচনা প্রয়োজনীয় নহে, তজ্জন্যই কতিপয় প্রসিদ্ধ শাস্ত্রাদিতে আত্মার একমাত্র বৃত্তি প্রেমার কথা উদ্ঘাটিত হয় নাই। পুরুষার্থ নিরূপণে কৃষ্ণ-প্রেমার সর্ব্বোত্তমতা প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায় না, এরূপ সিদ্ধান্ত অর্ব্বাচীনতার সুমেরু-শিখরে অবস্থিত। মূঢ় শিশুকে যেরূপ চাক্‌চিক্যযুক্ত দ্রব্য-প্রদানে তাহার তাৎকালিক দুঃখ অপসারিত করা হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাদৃশ চাকচিক্যের মূল্য অত্যল্প, আবার ইহা যেমন সেই সময় শিশুকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, তদ্রূপ প্রেম-মহিমা পুরুষার্থ-নিরূপণে কোন্ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, সে-সকল কথার সাধারণতঃ বিচার প্রদর্শিত হয় না।

প্রেমের অন্তরালে 'বিপ্রলম্ভে'র অবস্থিতি জানিয়া ভগবৎপ্রেমে জড়ত্বকল্পনাকারীর ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ভয় পাইবার ন্যায় আশঙ্কা অবশ্যম্ভাবী।

আশ্রয়ের বহুত্ব জড়জগতে অনেক স্থলে অমঙ্গল উৎপন্ন করিয়াছে বলিয়া আশ্রয়ের অবৈধ ভোগবিচারে এক বিষয়ত্বের বহু আশ্রয়ত্ব-বিচারকে দোষাবহজ্ঞানে যে ভ্রান্তিময়ী ধারণা এখানে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সচ্চিদানন্দরাজ্যে অধিষ্ঠান-সত্ত্বেও উহাকে গুণান্তর্গত বলিতে যাওয়া শিশুগণের কলভাষণ-মাত্র। সুতরাং জাগতিক পঞ্চবিধ বিষয়াশ্রয়গত সম্বন্ধে যে আলম্বন, উদ্দীপন এবং তাহাদের সমষ্টিতে যে বিভাব ও জাগতিক বিংশতি প্রকার অনুভাব, আটপ্রকার সত্ত্বাভাস ও তেত্রিশপ্রকার আগন্তুক অপ্রার্থিত পর্য্যায় জড়রসের অস্থায়ীভাবের সহিত সংযুক্ত হয়, উহার হেয়তা, অসম্পূর্ণতা ও বিবেকহীনতা কৃষ্ণপ্রেমতাৎপর্য্যপরতার সহিত সমজ্ঞান করিতে গেলে অজ্ঞান-জনিত অপরাধে আমাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিয়া কৃষ্ণপ্রীতির অভাবকেই প্রেমসংজ্ঞার অনুভবকারী বলিয়া দাঁড় করাইবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গোপীজনবল্লভের প্রতি প্রেমনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা গোপীর প্রেম জগতে সুলভ করিয়া দেখাইয়াছেন। চিন্ময়জ্ঞানে সম্পূর্ণ অপরিচিত অযোগ্য শিশু ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হইয়া জড়ার্থ কাম ও জড়রহিত মোক্ষ প্রভৃতি কুধারণায় যে প্রেমের জড়বিকার কামকে 'প্রেম' বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন, উহার দ্বারাই তাহার বিলাসগতিতে নানাপ্রকার কুসংস্কার আসিয়া প্রেমকে কামসদৃশ জ্ঞান করায়। তথাপি তিনি জানিতে পারেন যে, কামই ইহজগতে প্রধান আরাধ্য বিষয়—কাম-চরিতার্থতাই পুরুষার্থ। ধর্ম্মের সাহায্যে—প্রয়োজন জ্ঞানের সাহায্যে কামচরিতার্থতাই পরম প্রয়োজনীয় বিষয়।

ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবত্তায় যে ঐশ্বর্য্য ও তদ্বিরাগ, বীর্য্য ও তদ্বিরাগ, যশঃ ও তদ্বিরাগ, শ্রী ও তদ্বিরাগ, জ্ঞান ও তদ্বিরাগ প্রভৃতি যুগপৎ বিপরীত ধর্ম্ম একাধারে অবস্থিত, সেইগুলির অপূর্ব্ব সমাবেশ যে জ্ঞাতার সুখ-স্বরূপ জ্ঞেয় ব্যাপার, সেই চিন্মাত্র জ্ঞান সদানন্দযোগে 'ভক্তি' নামে কথিত হয়। আত্মবৃত্তির সহিত জড়ের দেহমনোরূপ মিশ্র-প্রতীতি পরিত্যক্ত হইলে কেবল চেতনধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ভাব ও প্রেমা আত্মায় প্রকাশিত হয়। সেইকালে জড়জগতের আপেক্ষিক হেয়তা সঙ্গে লইয়া যদি কোন যাত্রী প্রেমরাজ্যে অভিসরণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি জড়জগতেই আবদ্ধ থাকিয়া ক্লেশ পাইবেন। পুরুষার্থ-সন্ধানে নিত্য বিমুখ হইয়া আত্মার নিত্য কৃষ্ণসেবোন্মুখতাসরণীর পথিক হইতে পারিবেন না । চিরদিনই তাহার বোধ হইবে যে কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত আর সকলগুলিই তাহার আদরণীয়।

শ্রীনৃসিংহদেবের লীলাকথা যাঁহারা শ্রবণ করেন নাই, তাঁহাদের এই প্রকার ভ্রান্তি কদাচ অবসর গ্রহণ করিবে না। চিন্ময়জগতের অনুশীলনে বেদোদ্ধারক মৎস্য-বিষ্ণুর উপাসনা, জগদ্বাহক কূর্ম্ম-বিষ্ণুর উপাসনা, ভূগোলোদ্ধারক বরাহবিষ্ণুর উপাসনা, শ্রীদাশরথি রাম-সীতার উপাসনাদি অতিক্রম করিয়া যে-কালে শ্রীবার্ষভানবী ও তদীয় দয়িতের উপাসনার কথা এবং তাঁহাদের পরস্পর প্রেমসেবার কথা চিত্তবৃত্তিতে সর্ব্বোত্তম পরমচমৎকারিতা উৎপন্ন না করিবে, তৎকালাবধি প্রেমার সৌন্দর্য্য-দর্শনে আমরা চিরবিমুখ থাকিব। সালোক্যাদি মুক্তির অস্ফুটতা ও অপ্রয়োজনীয়তা দেখিবার জন্য ভগবদ্ভক্তের কৃপাই বরণীয়া।

ভগবদ্ভক্তের সেবা ভগবান্ করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। অভক্তগণ পঞ্চোপাসনার কোনও একটি উপাসনার প্রভাবে নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মে সাযুজ্যলাভ অথবা পতঞ্জলী-কথিত সেশ্বর সাংখ্যবাদে পর্য্যবসিত হইবার বাসনাবিমূঢ় হন। যেকালপর্য্যন্ত কর্ম্মাবরণ, জ্ঞানাবরণ, যোগাবরণ, আন্বিক্ষিকী ত্রয়ীবিদ্যাবরণ জাগতিক ভোগ-প্রবৃত্তি-বিমূঢ়তা এবং স্বকপোলকল্পিত চেষ্টা-দ্বারা তাহার ত্যাগের ইচ্ছা জীবকে আপাত -জ্ঞানবিমূঢ় করিয়া শ্রীভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের অসীম সেবা-সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে সমর্থ না করাইবে, তৎকালাবধি শ্রীরূপ-কথিত শ্রীবৈকুণ্ঠ-নামাশ্রয়ের সম্ভাবনা না থাকায় মুক্ত অবস্থায় স্বীয় চিন্ময় নাম, স্বীয় চিন্ময় রূপ, স্বীয় চিন্ময় গুণ, স্বীয় চিন্ময় সুহৃৎসমাজ ও তদাধার বৈকুণ্ঠ-ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমে কৃষ্ণসেবনোপযোগী প্রেমবিচিত্র ধারালোক চিন্ময় ইন্দ্রিয়গুলিকে চিন্ময় হৃষীকেশের সার্ব্বকালিকী সেবায় অবস্থিত না করায়, জীবের পঞ্চবিধ কৃষ্ণপ্রেমাকে তাঁহার পুরুষার্থ বলিয়া উপলব্ধির বিষয় হইবে না।

জড়জ্ঞান-প্রতারিত প্রতীতি কখনও আত্মশব্দবাচ্য হইতে পারে না—কৈতবহীন ভজনীয়-পদবাচ্য হইতে পারে না। চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের ধারণা-রহিত অকৈতব চরম

প্রাপ্যকেই প্রেমা কহে। জীবের মিশ্রবিচার কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্য যে-কালে প্রবল থাকে, তৎকালে কৃষ্ণপ্রেমা যে নিত্যপুরুষার্থ, ইহা বুঝিতে না পারিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণে অপরাধপুঞ্জ সংগ্রহ ও তৎফলে পুরুষার্থ-নির্ণয়ে বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়।

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ পুরুষার্থ-নির্ণয়ে ভ্রান্তজনগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ যে শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আলোচ্য বিষয় হইলেই জীবের পরম মঙ্গল হইবে,—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ।।
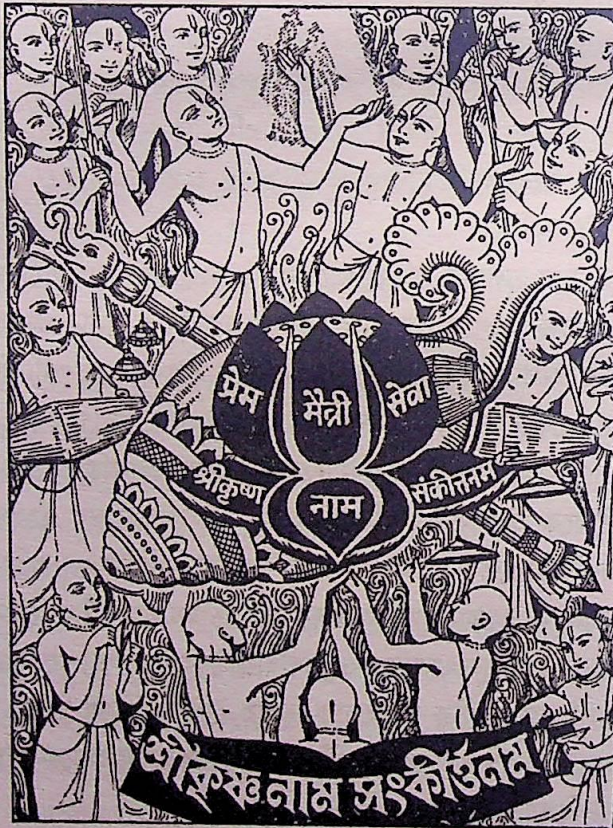
# চতুর্থ অধ্যায়

## শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া

### ১

"কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরূদ্ধঃ।
হাহা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি।।"

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত—৪৯)

যিনি সমগ্র জগতের কল্যাণ-বিধানে মুক্ত হস্ত, যিনি সকল বিবাদবিসম্বাদের একমাত্র মীমাংসক, যাঁর বাণীতে আশ্বস্ত হ'য়ে জগতে প্রকৃত শান্তির ধারা প্রবাহিত হ'য়েছে, সেই শ্রীচৈতন্যের বাণী মানব-জাতির মধ্যে প্রেম বিবর্দ্ধন ক'রবে। পরম প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের বাণী আমাদের অশান্তির অবস্থা দূর ক'রে জগতে প্রীতির কথা বিস্তার ক'রেছে। সেই শ্রীচৈতন্যের কথা জগতে অতি দুর্লভ। কোন কল্পনার মধ্যে—মনোধর্ম্মের সৃষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই নিত্য শুদ্ধ পরমমুক্ত শ্রীচৈতন্য-বাণী আবদ্ধ নয়, আমরা যেন সেই শ্রীচৈতন্য-বাণীর মুক্ত প্রগ্রহবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত থাক্‌তে পারি। জগতের বহুর সঙ্গে প্রণয় ক'রতে গিয়ে সর্ব্বজন-প্রিয়তা বা লোক-প্রিয়তার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হ'য়ে এক অদ্বিতীয় বহুবল্লভ গোপীজনবল্লভ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যেন ঔদাসীন্য প্রকাশ না করি। আমরা বালকের ন্যায় অনেক সময় বাইরের চাক্‌চিক্যযুক্ত বস্তুতে প্রলুব্ধ হই—স্বসুখে ব্যস্ত থেকে নিত্যসুখে বঞ্চিত হবার জন্যই অধিকতর যত্ন ক'রে থাকি, বস্তুতঃ ঐরূপ বৃত্তির দ্বারা জগতের কোনও মঙ্গল হয় না।

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পরতত্ত্বের (Absolute-র) নিকট হইতে আমরা সকলেই কৃপা প্রার্থনা করি। পরতত্ত্ব অনন্ত ব্যক্তিত্ব এবং অব্যক্তিত্বরূপ বিশিষ্ট। এই উভয়বিধ রূপবিশিষ্ট তত্ত্ব আমাদের উপাস্য। আমরা নিত্য-ব্যক্তিত্বসম্পন্নসত্তা। অতএব আমাদের নিত্য ও পূর্ণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পরতত্ত্বের উপাসনারই প্রয়োজন আছে। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধই স্বাভাবিক এবং সম্যক্ প্রয়োজনপ্রদ। পরতত্ত্বের সহিত আমাদের সম্বন্ধ প্রয়োজনীয় হইলে আমাদের সমুদয় কার্য্য পরতত্ত্বের উদ্দেশ্যে কৃত হওয়াই সঙ্গত।

আমাদের অনেক কার্য্য আছে। তন্মধ্যে কোন্‌টী একান্ত কর্ত্তব্য? পঞ্চরাত্র বলেন,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।।"

জীবের যত প্রকার কর্ত্তব্য-কৃত্য আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুর সেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তাহা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের সেবা অধিকতর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

তুলনামূলক আলোচনা-দ্বারা পরতত্ত্বের স্বরূপ-নিরূপণের চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। পরতত্ত্বের সন্ধান ইহজগতে পাওয়া যায় না। যে সত্তা পরতত্ত্বের একান্ত উপাসনার বৃত্তি প্রদর্শন করে, তাহার নিকটই পরতত্ত্বের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

উপাসকের পঞ্চবিধ অবস্থান। পঞ্চবিধ অবস্থানের মধ্যে যেখানে নিরপেক্ষ অবস্থানের কথা আছে, তাহাও কিছু প্রতিকূলভাবময় নহে, তাহাও অনুকূল ভাবযুক্ত।

গীতায় যেমন দেখিতে পাই—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।"

এইরূপ, যদি আমরা অন্যান্য যাবতীয় খণ্ড-সত্তার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যশূন্য, উদাসীন বা নিরপেক্ষ হই, তখন আমাদের পরতত্ত্বের সেবার যোগ্যতা উদিত হয়।

এখানে পরতত্ত্বের সাক্ষাৎলাভ হয়না, আমাদের বর্ত্তমান নশ্বর ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা পরতত্ত্বের নিকট পৌঁছান' যায় না। তাহা হইলে উপায় কি?

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।"

আমরা অকপট সেবোন্মুখ হইলে পরতত্ত্ব স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় বহির্ম্মুখ ভাব ঘুচাইয়া ইন্দ্রিয়গ্রামকে সেবা করিবার মত যোগ্যতার উদ্ঘাটন করিয়া দেন।

যদি আমরা পরতত্ত্বে সেবাবৃত্তি প্রদর্শন করি, তাহা হইলে অন্যবস্তুর সেবা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, সমুদয়-সত্তার সেবাসমর্থনকারী সাহিত্য (Altruistic literature) অপ্রয়োজনীয়—অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টিরহিত। আমাদের পূর্ব্ব-পশ্চাৎ (antecedents and consequents) বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, ভূত-ভবিষ্যৎজ্ঞান আমাদের নাই। প্রপঞ্চাগত অত্যন্ত স্থূল প্রত্যক্ষ ঘটনাই আমাদের বর্ত্তমান যোগ্যতায় একমাত্র দৃষ্টি-সম্মুখে উপস্থিত হয়, এজন্যই স্থূলে সমাধিগ্রস্ত মনীষিগণ বিচার করিয়াছেন যে, জাগতিক সম্বন্ধ অঙ্গীকার পূর্ব্বক আমাদের সমশীল মর্ত্ত্যজীবের সেবা করাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু প্রপঞ্চাতীত ঘটনা সমূহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিতে পারিলে আমরা

বাঁচিতে পারিনা। আমাদিগকে এই জগৎ ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। আত্মা প্রপঞ্চান্তর্গত দেহাদি নহে। দয়ার আদর্শ, জাগতিক সত্তায় সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত নহে। পাপ-পুণ্য-ধর্ম্ম-অধর্ম্ম-বিচার খর্ব্ব-দৃষ্টিসম্পন্ন বিচার, ইহাই জগতের তথাকথিত পরোপকারের মূলের কথা। জগতে পাপ-পুণ্য-আচরণ অপরিহার্য্য। আমরা জগতে বাধ্য হইয়া পাপপুণ্যে প্রবৃত্ত হই, তদ্দ্বারা আমাদের কোনও মঙ্গল হয়না, স্বয়ং স্বেচ্ছায় গাধার টুপি মাথায় দিয়া দর্পণে নিজের প্রতিফলিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলে দর্পণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা মূর্খতা মাত্র। দর্পণের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব মাত্র আমাদের সম্বল। পাপ-পুণ্যাদি ধর্ম্মাদর্ম্মের অনুশীলনে আবদ্ধ থাকা গর্হিত। প্রপঞ্চাতীত তত্ত্বের পাদমূলেই সর্ব্বরসের উৎস।

জগতের আপেক্ষিক বিচারে, আবৃত দর্শনে অজ্ঞানের বিচিত্রতার সৃষ্টি হয়। ভগবদ্বস্তু ভাগ্যহীনের নয়নে আবৃত হওয়ায় ভেদ কল্পিত হয়—যেমন একটা অশ্বের বাহ্যদর্শনের সহিত স্তম্ভের ভেদ কল্পিত হয়েছে। যখন জ্ঞান হয়, আবরণ খুলে যায়, তখন বাহ্যদর্শনের পরিবর্ত্তে সেবোপকরণ প্রতিভাত হ'য়ে বস্তু দেখ্‌তে পাই। ইহজগতের অনুপাদেয়তা সৃষ্টি করবার জন্য চেতনময় জগতের প্রতিবন্ধকস্বরূপ অচেতন-বৈচিত্র্য আমাদের অজ্ঞানচক্ষুর ভোগময়তা আকর্ষণ করে। চেতন জগতে এরূপ ধরণের অজ্ঞান মেঘের ন্যায় সূর্য্যকে লোকলোচনের নিকট আচ্ছাদন ক'রে বস্তুর দর্শনে বাধা দেয় না। অজ্ঞান বা তাপ এসে চেতনের আবরণ ক'রে ভোগময় দর্শনকে স্তম্ভ ও অশ্বের পার্থক্য স্থাপন ক'রেছে। সেখানে "মায়া মিশাইয়া এস ভগবান।" তিনি এসে আমার অনর্থ বৃদ্ধি কর্‌বেন। ভগবান্ সেরূপ জাতীয় বস্তু ন'ন–তিনি নিত্য অনর্থমুক্ত। "আমার বল যথেষ্ট আছে–অচেতন পদার্থের ন্যায় বা দুর্ব্বলের ন্যায় ভগবান্‌কে আমি যে কাতে শোয়াব, তিনি সে কাতেই শোবেন"—এরূপ হ'তে পারে না।

মনগড়া শক্তিহীন দরিদ্রতাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত নারায়ণ মনে কর্‌লে প্রভু ভগবানের পরিচয়ের বদলে ভোগ্যের পরিচয় দেওয়াই হ'বে। সুতরাং সাধু-গুরু-সঙ্গ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তা' কর্‌তে হ'লে—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।"

দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধু-সঙ্গে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ-দ্বারা মানস-অমঙ্গল বিদূরিত করাই আবশ্যক।

মানব যখন অজ্ঞান-পীড়িত হন—তিনি যে নিত্য ভগবৎসেবক, যখন একথা ভুলে যান, তখন অপর জিনিষ ভোগ্যরূপে সম্মুখে দাঁড়ায়; যে জিনিষটী ভুলে যান, সেই ভ্রান্ত বস্তুর ধারণার অভাবে তদভিন্ন-জ্ঞানে তখন সম্মুখস্থ মায়ার নিকট হ'তে সেবা চান। কিন্তু মায়া তাঁকে প্রতারণা করে—মায়ার নিকট হ'তে সেবা চে'তে গিয়ে তিনি মায়ারই সেবক হ'য়ে পড়েন।

আত্মা—নিত্য। আত্মবৃত্তি—নিত্যা। আত্মা সর্ব্বক্ষণ পরমাত্মার আশ্রিত। যখন জীব আত্মবিস্মৃত হন, তখন তাঁ'র বস্তু-বিষয়-বিজ্ঞানের অভাব হয়—আত্মধর্ম্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানের অভাবে জ্ঞান মাত্র থাকে, তদভাবে অজ্ঞান আসে। বিজ্ঞান লাভের সঙ্গে-সঙ্গে বিচিত্রতা প্রদানকারী যে-সকল উপাদান, তা'দের অস্তিত্বের অস্বীকার হয় না—পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিচার রহিত হয় না। অনেকে বিচার করেছেন, নির্ব্বিশিষ্ট হ'য়ে যাওয়াটাই চরম ও নিত্য ব্যাপার! অনিত্য জগতের বিচিত্রতা বিশেষভাবে অনিত্য। যাঁ'রা এই জগতের অভিজ্ঞতাকে সম্বল ক'রে অনুমান-প্রমাণ-বলে নির্ব্বিশিষ্ট ভাবকে চরম কর্‌তে চান, তাঁদের দর্শন অসম্পূর্ণ—উহা মুক্তপুরুষের দর্শন নহে। মুক্তপুরুষগণ নিত্য বাস্তব রাজ্য দর্শন করেন। তাঁ'রা ইহজগতের অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা হ'তে পরজগতের বাস্তবতার অনুমান বা সিদ্ধান্ত করেন না। নির্ব্বিশেষ-বিচারপরায়ণগণ শ্রৌতব্রুব হ'লেও শ্রুতির সার্ব্বদেশিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ ও উপলব্ধি করেন নাই। মুক্তপুরুষগণ সেরূপ মায়িক বিচারে আবদ্ধ না থেকে বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন—নিত্য চিদ্বিলাস দর্শন করেন।

জাগতিক বস্তু পরিবর্তনশীল ও পরিণামশীল। জাগতিক বস্তুতে কালক্ষোভ্য ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হ'য়েছে—চেতনকে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদন করেছে—মেঘাবৃত সূর্য্য যেরূপ লোকলোচনে আবৃত—জীবের ক্ষুদ্র উপযোগিতার নিকট আবৃত—সেই আবরণ চেতনজাতীয় নহে। 'প্রমা' বা জ্ঞানের যে অংশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেই বাধাটী 'জ্ঞান'-শব্দবাচ্য নহে। যে রাহু সূর্য্য ও চন্দ্রকে লোকলোচনের নিকট দর্শনের বাধাপ্রদান করে, সেই রাহুটী কিছু সূর্য্য ও চন্দ্র নয়। আমরা প্রায় শতকরা শতজন এইরূপ রাহুগ্রস্ত জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ অভিভূত থেকে গ্রস্তাবস্থায়ই সত্যের স্বরূপ দর্শন ক'রে ফেলেছি বা সত্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে মতামত প্রদানে অধিকার লাভ ক'রেছি কল্পনা করি!—গ্রস্তাবস্থাতে পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা বিচার করি! নিজের গ্রস্তাবস্থা, নিজের আবৃতাবস্থা আমরা বুঝতে পারি না ব'লে—অপসারিত করতে পারি না ব'লে ভগবানের শ্রেষ্ঠ পরিকর সেই অজ্ঞান সরিয়ে দেন—আবরণ উন্মুক্ত ক'রে দিব্যজ্ঞানের সম্মুখে নিয়ে যা'ন।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর অদ্বৈতবাদ গ্রহণ-লীলা খণ্ডন ক'রবার জন্য শ্রীমায়াপুর হ'তে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে ললিতপুর হ'য়ে শান্তিপুরে যাচ্ছিলেন, তখন ললিতপুরে একজন দারী সন্ন্যাসীর সহিত তাঁ'দের সাক্ষাৎ হয়। লীলাময় প্রভুদ্বয় কোন এক উদ্দেশ্যে সেই দারী সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ হ'লে উক্ত সন্ন্যাসী শ্রীমহাপ্রভুকে বালক বিচারে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলেন,—

'ধন, যশে, সুবিবাহ হউ বিদ্যা লাভ।'

মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর এই আশীর্ব্বাদ শ্রবণ ক'রে বলেন, ইহা আশীর্ব্বাদ নয়,—অভিশাপ। 'কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ হউক' এইরূপ আশীর্ব্বাদই প্রকৃত আশীর্ব্বাদ। দারী

সন্ন্যাসী এই কথা শু'নে মহাপ্রভুকে ব'ল্লেন—''আমি পূর্ব্বে যা' শু'নেছি, আজ প্রত্যক্ষ তা'র নিদর্শন পেলাম। আজকাল লোককে ভাল ব'ল্লে লোক তা'কে ঠেঙ্গা নিয়ে মার্তে যায়।' এই ব্রাহ্মণকুমারেরও সেরূপ আচরণ দেখ্ছি। কোথায় আমি পরম সন্তোষে একে ধনে জনে লক্ষ্মীলাভ হ'ক বর দিলাম—এর উপকার ক'রতে গেলাম, আর এই ব্যক্তি সেই উপকারকে অপকার ভে'বে আমাকে দোষারোপ ক'র্তে উদ্যত হ'লো! নিত্যানন্দ প্রভু তখন একটু প্রবীণ ও অভিভাবকের ন্যায় ভাব প্রদর্শন ক'রে দারী সন্ন্যাসীকে ব'ল্তে লাগলেন,—''আপনার এই বালকের সঙ্গে বিচার করা কার্য্য নয়, আমি আপনার মহিমা বুঝ্তে পেরেছি। আমার দিকে চে'য়ে এ'র কোন দোষ নেবেন না।'' নিত্যানন্দ প্রভুর কথায় সন্তুষ্ট হ'য়ে দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে কিছু ভোজন করা'তে চাইলেন। পতিতপাবন নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু গঙ্গায় স্নান ক'রে সন্ন্যাসীর গৃহে ফলাহার ক'র্তে লাগ্লেন। এমন সময় সেই দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে 'আনন্দ' গ্রহণের জন্য পুনঃপুনঃ ইঙ্গিত ক'র্তে লাগ্লেন। দারী সন্ন্যাসীর পত্নী ভোজনকালে অতিথিগণকে ঐরূপ বিরক্ত ক'র্তে নিষেধ ক'রলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা ক'র্লেন,—সন্ন্যাসী 'আনন্দ' শব্দে কি লক্ষ্য ক'র্ছে? নিত্যানন্দ প্রভু সকল প্রকার ব্যক্তির আচরণই অবগত ছিলেন। তিনি গৌরসুন্দরকে জানালেন,—'আনন্দ' শব্দ দ্বারা দারী সন্ন্যাসী 'সুরা' লক্ষ্য ক'র্ছে। এই কথা শুন্বামাত্র বিশ্বম্ভর ''বিষ্ণু বিষ্ণু'' স্মরণ ক'রে তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আচমন ক'র্লেন এবং অতি সত্বর নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিলেন। এই লীলা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের শিক্ষা দিলেন।

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।'

সাধুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য—জীবের যে সকল সঞ্চিত দুষ্টবুদ্ধি আছে, তা' ছেদন ক'রে দেওয়া; ইহাই সাধুদিগের অকৃত্রিম অহৈতুকী বাঞ্ছা। দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ ক'রে জগতের লোক বাহিরের দিকে একরকম কথা, ভিতরের দিকে অন্য রকম কথা পোষণ করে; আর এই দ্বিহৃদয়তাকেই উদারতা বা সমন্বয়ের ধর্ম্ম ব'লে প্রচার ক'রতে চায়! যাঁরা দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ না ক'রে সরল হ'তে চান—সরলভাবে আত্মার বৃত্তি যাজন ক'র্তে চান, তাঁ'দিকে ঐ সকল দ্বিজিহ্ব ব্যক্তি 'সাম্প্রদায়িক', 'গোঁড়া' প্রভৃতি ব'লে থাকেন। যাঁরা সরল, আমরা তাঁ'দেরই সঙ্গ ক'রব—অপরের সঙ্গ ক'রব না। দুঃসঙ্গকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন ক'রতে হবে, যেমন শৃঙ্গীর নিকট হ'তে শত হস্ত পরিমাণ দূরে থাকতে হয়।

এক সময়ে ঠাকুর মহাশয়—যিনি পূর্ব্ব পরিচয়ে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত হ'বার লীলা প্রকাশ ক'রেছিলেন, বহু বহু ভাল লোক—আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট

সত্য কথা ব'লেছিলেন, তাঁকেও অসদ্ব্যক্তিগণের আক্রমণের পাত্র হ'তে হ'য়েছিল। মৎসর-প্রকৃতির আধ্যক্ষিক কতকগুলি অবিচারক লোক ব'ল্‌তে লাগ্‌ল, নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে কেন ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে পারমার্থিক উপদেশ দিয়ে শিষ্য ক'র্‌ছেন ? এই কথা শুনে ঠাকুর মহাশয় ব'ল্লেন,—তা' হ'লে আমি সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হ'ব। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ব'ল্লেন,—তা'হলে জগৎ ত' রসাতলে যাবে—জগতে নাস্তিক, পাষণ্ডের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে! এই ব'লে তখন তাঁরা একজন সাজলেন—বারুই, আর একজন সাজ্‌লেন—কুমোর। যখন বিদ্বেষিসম্প্রদায়ের গর্ব্বিত পণ্ডিতমণ্ডলী ঠাকুর মহাশয়কে বিচারে পরাস্ত কর্‌বার মতলব নিয়ে খেতুরীতে এ'সে পৌঁছলেন, তখন তাঁরা তাঁ'দের আহারের বন্দোবস্তের জন্য বাজারে হাঁড়ী কিন্‌তে কুমোরের দোকানে গেলেন। তখন কুমোর তাঁদের সঙ্গে সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ ক'রে দিলেন। তারপর তাঁ'রা পান কিন্‌তে পানের দোকানে গেলেন, বারুইও পণ্ডিতের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কথা আরম্ভ ক'র্‌লেন। এ সকল দে'খে শুনে গর্ব্বিত পণ্ডিতগণ মনে মনে বিচার ক'র্‌লেন,—যে দেশের কুমোর বারুই পর্য্যন্ত সংস্কৃতে কথা ব'লতে পারেন, সে-দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ঠাকুর নরোত্তম যে কত বড় পণ্ডিত, তা' অনুমানও করা যে'তে পারে না, সুতরাং তাঁর কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে আমাদিগের সম্মান লাঘব কর্‌বার পরিবর্ত্তে আমাদের এখান থেকেই বিদায় নেওয়া শ্রেয়ঃ। এরূপ বিচার ক'রে তাঁ'রা সেখান থেকে স'রে প'ড়লেন। যাঁরা সত্য আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকে চিরকালই এরূপভাবে আক্রান্ত হ'তে হয়।

সাধারণ বিবেকরহিত বিচার বা সাধারণ বিবেকযুক্ত বিচার ও সত্য এক নয়। অনেকে সাধারণ বুদ্ধিকে (common sense-কে) 'সত্য' মনে করেন। যেটা common sense-এর সঙ্গে খাপ খায় না, তা'কে তাঁ'রা সত্যের পদ হ'তে বিচ্যুত ক'র্‌তে চান। কিন্তু এরূপ সাধারণ বুদ্ধি—কা'দের ? ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-বিনির্ম্মুক্ত, বিমুক্ত আত্মার সহজ বুদ্ধি অথবা ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত, পরিবর্ত্তনশীল মনের অভিজ্ঞতাবাদোত্থ সাধারণ বুদ্ধি? ভ্রম-প্রমাদযুক্ত গড্ডলিকার সাধারণ বুদ্ধি—মনোধর্ম্ম মাত্র, তা'তে আপেক্ষিক বা সাময়িক সত্যের একটা ছবি থাক্‌তে পারে, কিন্তু উহা বাস্তব সত্য নহে। লোকে রজস্তম-তাড়িত-বুদ্ধি অবিমিশ্র সত্ত্বগুণের কথা বুঝতে পারে না। একজন পায়স খাচ্ছে, আর একজন যদি সেখানে এ'সে বলে যে, আমার কিছু চূণ সুরকি আছে, আপনি সেগুলি পরমান্নের মধ্যে মিশিয়ে পায়সের পূর্ণতা সম্পাদন ক'রে নিন; তা' হ'লে যেমন মিষ্টান্ন খাওয়ার ফল পাওয়া যায় না, উহার আস্বাদন নষ্ট হ'য়ে যায়, মুখে কাঁকর চূণ প্রভৃতি লেগে গলা পুড়িয়ে দেয়, গলা বন্ধ ক'রে দেয়, তা'তে মানুষের মৃত্যু হয়, সেরূপ পরম-নিরপেক্ষা স্বতন্ত্রা, বিশুদ্ধা, নির্গুণা ভক্তির সহিত গুণজাত জগতের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি চেষ্টাকে যদি কেহ মিশিয়ে নিতে বলেন—ভক্তির

অসম্পূর্ণতা (?) সম্পূর্ণ কর্‌বার পরামর্শ দেন; তা'হ'লে ঐরূপ ব্যক্তির পরামর্শও মিষ্টান্নে বিজাতীয় চূণ সুর্‌কি মিশ্রিত কর্‌বার পরামর্শের ন্যায় হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ--বদ্ধ জীবের চেষ্টা, উহা দেহ ও মনোধর্ম্ম, আর ভক্তি—আত্মার বৃত্তি বা আত্মধর্ম্ম, উহা পরম মুক্তের চেষ্টা; সুতরাং কর্ম্মজ্ঞানাদি প্রাপঞ্চিক বিজাতীয় অনাত্ম-চেষ্টা-সম্পন্ন বস্তুর সহিত ভক্তির মিশ্রণ হ'তে পারে না। তবে কর্ম্ম জ্ঞানাদি যখন ভক্তির অধীনতা স্বীকার ক'রে চলে, তখন কথঞ্চিদ্‌ভাবে সেই কর্ম্ম-মিশ্রা ও জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি পরভক্তির পথের উপনীত হ'বার আনুকূল্য ক'র্‌তে পারে।

"শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ"

বালকের ন্যায় চাপল্যপ্রিয় না হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের যাবতীয় কৃত্য পরতত্ত্বের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। আত্মা-দ্বারা পরতত্ত্বের সেবা সম্ভব। সেবালাভের উপায়—শরণাগতি। গীতায় পাওয়া যায়—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।<br>অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

আমরা নিজের উপর নির্ভর করিয়া বিপন্ন হইব না। তাঁহার উপর নির্ভর করিব। অন্য কার্য্য না করিবার জন্য অর্থাৎ ইতর কার্য্য করিতে পারিলাম না বলিয়া শোক করিব না।

দক্ষিণ দেশে এক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাট কুলশেখর। তিনি বলিয়াছেন,—

"নাস্থাধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে<br>যদ্‌যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।<br>এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি<br>ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।<br>নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ<br>কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।<br>রম্যারামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাপিরন্তুং<br>ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্।।

আমাদের নিত্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও বলিয়াছেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।<br>মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।"

আত্মার উন্নত আকাঙ্ক্ষা শাস্ত্রবিধি পালন-মাত্র নহে। কিংবা বৈদান্তিকব্রুবের ন্যায় নির্ভেদ-জ্ঞানানুশীলনমাত্রও নহে। আত্মার একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র নিত্য আকাঙ্ক্ষা পরতত্ত্বের নিত্যসেবা। পরতত্ত্বের সেবা-বিহীন হইলে জাগতিক পরোপকারে নিযুক্ত

হওয়া 'কর্ত্তব্য' বলিয়া বিবেচিত হইবে। জাগতিক ব্যাপারে তুলনামূলক বিচার-দ্বারা এই সমূদয় লোকহিতকর কার্য্য প্রথম দৃষ্টিতে অত্যন্ত লোভনীয় সন্দেহ নাই। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে পরতত্ত্বের সেবা আচরণীয়।

কিন্তু পরতত্ত্বের অধিষ্ঠান কোথায়? পঞ্চোপাসনা-পদ্ধতি পাঁচটী অধিষ্ঠানের কথা বলে—(১) সূর্য্য, (২) গণেশ, (৩) শক্তি, (৪) শিব ও (৫) কর্ম্মফলবাধ্য বিষ্ণু (?)।

পঞ্চোপাসক বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন না। বিষ্ণু সকলের মূল বাস্তবতত্ত্ব—ভগবান্ পুরুষোত্তম। ভগবান্ পূর্ণব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন-সত্তা। অপর তত্ত্বগুলির ব্যক্তিত্ব অনর্থযুক্ত দ্রষ্টার বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী—তাহা ভগবানের বিকৃত দর্শন। যেরূপ, ধর্ম্মকামীর বাসনা বিষ্ণুকে বিকৃত (?) করিয়া সূর্য্যরূপে দর্শন-চেষ্টা, অর্থকামীর গণেশরূপে দর্শন-চেষ্টা, কাম-কামীর শক্তিরূপে দর্শন-চেষ্টা এবং মোক্ষকামীর রুদ্ররূপে দর্শন চেষ্টা। পয়স্বিনী-তটের আদিকেশবমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে গ্রন্থটী ("ব্রহ্ম-সংহিতা"র ৫ম অধ্যায়) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সকল অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের গীত ঐরূপ অনর্থময় দর্শনের গর্হণ করিয়াছেন। বাসনা-তাড়িত অবিধিপূর্ব্বক উপাসনায় কখনও গতাগতির নিবৃত্তি বা আত্যন্তিকমঙ্গল হইতে পারে না।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই চরম গানেও অপর অনর্থময় অধিকারের পুতুলখেলা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বাস্তব-সত্য অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার উপদেশই আছে।

ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে ব্যাসের মঙ্গলচরণের মধ্যে উক্ত হইয়াছে—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অপর ভাষায় বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলি 'অশান্ত'।।

বাস্তবিক Centre Absolute Person-এর পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত লোকে নানা দিকে ছুটাছুটি ক'রে আসল কথা থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে যায়। শ্রীভগবৎপাদপদ্মসেবা—সেব্য ভগবানের সৌখ্য-বিধানরূপ সেবাকে কেন্দ্র ক'রলে আর পথ ভ্রষ্ট হ'তে হয় না—কুপথে পরিচালিত হ'তে হয় না। যদি আমরা নিজের মনকে প্রতিনিয়ত সহস্র সহস্র শতমুখী দিয়া মার্জ্জনা ক'রতে পারি, তবেই শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণের যোগ্যতা অর্জ্জিত হ'তে পারে।

'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বিচার-ভ্রম-দুর্গতির হাত হ'তে জীবকে বাঁচা'বার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর

"তৃণাদপি সুনীচ" হ'বার উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ করলেন,—তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন হ'তে হ'বে। "বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুকাঞা মৈলেহ কারে পানি না মাগয়।।" বৃক্ষকে উৎপাটিত, উৎসাদিত কর্‌লেও সে কিছু বলে না—মার্‌তে আসে না। পরিশ্রান্তকে আশ্রয় দিচ্ছে, ফলদান কর্‌ছে। আশ্রয়-প্রদানকারী তিরস্কার লাভ করেন, তদ্রূপ উন্নত ব্যক্তি আক্রান্ত হন, জগতে উপকার ক'রেও অযথা নিন্দিত হন। স্থূল পরিচয়ে আমাদের প্রতি তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু হবার এ দুটো উপদেশ, আর সূক্ষ্ম পরিচয়ে অমানী ও মানদ হ'বার উপদেশ দিয়েছেন।

আমাদিগকে অমানী হতে হ'বে। জড়জগতের সম্মানের কথা, জড়জগতের পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, বিদ্যাবুদ্ধি, ধনগৌরব—এই সকল অভিমান ছে'ড়ে দিতে হ'বে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।<br>
অহংঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।।

আমি কর্ত্তা, কাজ করতে পারি, মনের দ্বারা চিন্তা করতে পারি, চক্ষু-দ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ ইত্যাদি কর্‌তে পারি, আমার বিদ্যাবুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্য আছে, আমি সব বু'ঝে নিতে পারি,—এই সকল প্রাকৃত কর্ত্তৃত্বাভিমান। বস্তুর প্রতি প্রভুত্ব কর্‌তে ব্যস্ত হ'য়েছি। এগুলি প্রাকৃত গুণের দ্বারা তাড়িত হওয়ার লক্ষণ। প্রকৃতিতে অবস্থানই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

কর্ত্তৃত্বকে পরিত্যাগ করাই শরণাগত জনের লক্ষণ। কর্ত্তৃত্বকে পরিত্যাগ ক'রে গোপ্তৃত্বে বরণ—শরণাগতির স্বরূপ-লক্ষণ। বস্তুর আশ্রিত ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বের দরকার থাকে না। বৃষভানু-নন্দিনীর পাল্য হ'বার বিচার উপস্থিত হ'লে জগতের কোন ক্ষুদ্র অভিমান আমাদের হৃদয় অধিকার কর্‌তে পারে না। আমরা বৃষভানুজার অনুগত সমাজ হ'তে জানতে পেরেছি,—তাঁ'র পাল্য-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরব, সেই গৌরবে গৌরবান্বিত হ'তে পার্‌লে "বিলাপকুসুমাঞ্জলি"র কথা শুনবার জন্য আমাদের চিত্ত ব্যগ্র হয়।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ<br>
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।<br>
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে<br>
প্রাণৈর্ব্রজে ন চ বরোরু বকারিণাপি।।

আমরা অনেক কথা শুনে থাকি, অভিমানের বশবর্ত্তী হ'য়ে ব'লে থাকি—আমরা শু'নেছি। ত্বকের দ্বারা শীতোষ্ণের পরিমাণ কর্‌ছি। আমাদের ক্ষুদ্র বিচারকে বহুমানন ক'রে আমাদের যে অনর্থ উপস্থিত হয়, তা'তে আমরা কপটতার উপদেশ পর্য্যন্ত লাভ করতে পারি। "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এই কথাটিকে অনর্থযুক্ত কর্ণে শ্রবণ করে বঞ্চিত হ'য়ে পড়ি। ভেক যেমন স্ফীত হ'তে হ'তে প্রাণত্যাগ করে, তেমনি অণুজীব

আমরা বৃহদ্ব্রহ্মের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে—"অহং ব্রহ্মাস্মি" বল্‌তে বল্‌তে আত্মহত্যা ক'রে বসি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"।।—শ্লোকের তাৎপর্য্য যাঁরা উপলব্ধি ক'রতে পেরেছেন, তাঁরাই হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে পারেন। নতুবা—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।।"—এই বাক্য অনুসারে মানুষ হরিকথ শুনবার বিচার ছেড়ে দেয়। "অহং ব্রহ্মাস্মি" বিচার একদিকে, আর "তরোরপি সহিষ্ণুনা" বিচার আর একদিকে। গরু-গাধা-ঘোড়া এমন কি তৃণ অপেক্ষাও ছোট হ'তে হ'বে, তৃণেরও বরং এজগতে একটা position-আছে, আমার তাও থাকবে না। এ জগতে কোন position-এর মূল্য নাই। মানুষ কখনও রাজা, কখনও প্রজা; কখনও ভোগী, কখনও ত্যাগী সাজে—এরকম দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে প'ড়ে তা'কে চিরকালই অস্থির থাকতে হয়। মহাপ্রভুর কথা শুন্‌বার বিচার হ'লে ওসকল দ্বন্দ্বময় অবস্থার অভিমান সম্পূর্ণরূপে ছাড়তে হ'বে, নিজে অমানী হ'য়ে ব্রহ্মা থেকে স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলকেই মান দিয়ে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের বিচার বরণ ক'রতে হ'বে, তবেই জীবের মঙ্গল হ'বে। চৈতন্য-বাণী না শুন্‌লে চৈতন্যোদয় হয় না, নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না।

Individual—ব্যষ্টি মানব linear, superficial ও cubical expansion বা তিন-এর dimension-এর কথা নিয়েই ব্যস্ত, তূরীয়বাস্তব রাজ্যের কোন কথার ধার ধারে না। সীমা-বিশিষ্ট বা কুণ্ঠাধর্ম্ম-বিশিষ্ট জগতের কথায়ই যেন আমরা চিরজীবন না কাটাই, বৈকুণ্ঠ-ভূমিকার আলোচনা হওয়া দরকার। মানুষ শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা করুক, তা'দের সমস্ত সংকীর্ণতা, সমস্ত দুর্ব্বুদ্ধি কেটে যাবে।

বিষ খেয়ে ম'রে যাওয়া ভাল, তথাপি কৃষ্ণেতর বিষয়ী ও বিষয়ের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়। হরিভজন আরম্ভ ক'রে যে ব্যক্তি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে, তা'র সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। ভরত—যিনি ভারতবর্ষের রাজা হ'য়েছিলেন, তিনি পূর্ব্বে অনেক সাধনা, তপস্যা ক'রেছিলেন—হরিভজনের পথে অগ্রসর হ'য়েছিলেন; কিন্তু তাঁরও সামান্য একটু কৃষ্ণেতর বিষয়ের অভিলাষ—একটু সৎকর্ম্মী হওয়ার ইচ্ছা—জীবে দয়ার পরিবর্ত্তে জীব সেবা (?) ক'রবার একটু সামান্য স্পৃহা উদিত হওয়ায় তাঁ'কে হরিণ-শিশু হ'য়ে জন্ম লাভ ক'র্‌তে হ'য়েছিল। তাই আমাদের গুরুপাদপদ্ম আদেশ করেন—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আমাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই—'কৃষ্ণে মতিরস্তু'ই একমাত্র আশীর্ব্বাদ।

হরিকীর্ত্তনের বড় দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে, তাঁর সুভিক্ষ হোক, জগতের অমঙ্গল কেটে যাক। শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের অভাব থেকেই জগতে নানা মতবাদ প্রবল হ'য়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা হ'লে অন্যান্য সব কথা থেমে যাবে জগতের এমন

শুভদিন অদূর ভবিষ্যতেই আস্‌ছে, জগদ্বাসী একদিন সকলে মিলে চৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা ক'রবে। সে শুভদিনের বোধ হয় আর বেশী দেরী নাই। চৈতন্যচরিতামৃতের আলোচনায় সকলের সবরকমের প্রশ্নের সুমীমাংসা হ'বে, কোন secular কথা থাকবে না। কিন্তু দেশের লোক অবিবেচক, সামান্য কথায় ব্যস্ত, এ সকল কথা ধরে নিতে পাচ্ছে না, তাই 'নানা মুনির নানা মত' প্রবল হ'য়ে জগতের অশান্তি বৃদ্ধি ক'রছে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনে ভারত যদি তার প্রকৃতমঙ্গল বুঝে নিবার সৌভাগ্য পায় তখন ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের লোক বুঝে নিবে—"এ দেশের লোক কত ভাল, কেউ কারও সঙ্গে বিবাদ করেনা—সকলেরই স্বার্থ-গতি এক। সুতরাং দেশে দেশে অপস্বার্থ নিয়ে কলহ—মনোমালিন্য-দ্বেষ-হিংসা-মাৎসর্য্য সব দূর হ'য়ে যাবে—এক শান্তির রাজ্য সংস্থাপিত হ'বে। প্রকৃত স্বার্থ বুঝ্‌বার গোলমালেই জগতে যত মারামারি, যত কাটাকাটি, যত অশান্তির সৃষ্টি। শ্রীচৈতন্যদেবই সেই প্রকৃত স্বার্থের সন্ধান দিয়েছেন, জগৎ কি তা'র অনুসন্ধান ক'রবে না।

জগতে "অক্ষজ" বিষয়ের আলোচনা অনেক হয়ে থাকে, কিন্তু 'অধোক্ষজ' বিষয়ের আলোচনা হয় না,—এইটাই দুঃখের বিষয়। যে বস্তু মানবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বিষয় নন—অধঃকৃতং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ, তিনিই অধোক্ষজ। জীবের ক্ষুদ্র—সীমাবদ্ধ জ্ঞান অধোক্ষজ বস্তুকে মেপে নিতে পারে না। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই অধোক্ষজ বস্তু।

বিষ্ণুভক্তির কথা আলোচনার অভাবে মানুষ 'বিষ্ণু' শব্দকে secular মনে ক'রছে। বিষ্ণু-বস্তু দর্শন ক'রবো না—এটা anti-vedantic বিচার। বিষ্ণু matter-এর কোন জিনিষ নন। হেগেল Transcendental-এর কথা ব'লেছেন। অবিদ্বদ্রূঢ়িতে গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি ব্রাহ্মী, খরৌষ্টি, পুষ্করা-সাদী, সান্‌কী ভাষায় যে সকল বিচার—যা' একায়ন বিচারের সঙ্গে দ্বৈধতা উপস্থাপিত ক'রছে, অধোক্ষজের আলোচনা হ'তে থাক্‌লে সে সব মতদ্বৈধতা আর থাক্‌বেনা, সবই অধোক্ষজের অনুগত হ'য়ে যা'বে। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ—এই কয়টি কথাই ব্রাহ্মী, খরৌষ্টি প্রভৃতির আলোচনার বিষয়; আধোক্ষজ বস্তুর আলোচনা হ'চ্ছে না। কেউ কৃষ্ণকে ইতিহাস-মূলক বস্তু মনে করেন, কেউ বা Allegory ব'লে মনে করেন, কিন্তু কৃষ্ণ-বস্তুটির সন্ধান কেউই পাচ্ছেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু-ও তাঁর অনুগত গোস্বামিগণ এই কৃষ্ণ-তত্ত্বের কথা ব'লেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের পরোপকার-রহস্য বুঝবার সৌভাগ্য হ'লে জগতের সমস্ত সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা—তর্ক-বিতর্ক থেমে যাবে। জগৎ একবার শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা করুক, তাঁর কথা একটু স্থির হয়ে শুনুক—সকলেরই মঙ্গল হবে।

আমরা আমাদের স্বীয় গৌরবে গর্ব্বিত; কখনও কোনও কার্য্যারম্ভে পাপপুণ্যের বিচার করি, কখনও বা মনে হয় 'বড় হ'লে অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার ক'র্‌বো'—এ

সমস্তই প্রতিষ্ঠা। গৌরভক্ত বলেন,--আ-ব্রহ্মস্তম্ব যত আকাঙ্ক্ষা, বস্তুলাভের যত চেষ্টা, ভোগের যে বাঞ্ছা, ভোগের পর যে বিরাগ তা' সমস্তই অসৎ বা পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ কালক্ষোভ্য। এরূপ প্রয়াসের লব্ধবস্তু হস্তান্তরিত হ'লে সকলই বিফল বলে মনে হয়। কুকুরের লাঙ্গুল সোজা করবার প্রয়াস যেমন ব্যর্থ, তদ্রূপ ভূর্ভুব আদি চতুর্দ্দশ ভুবনে ভোগের পরিণতিও ক্ষণস্থায়িনী। কর্ম্মফলবাধ্য ভোগ্যবস্তু-মাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল।

রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-গ্রহণোপযোগী ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানসমুহের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে অনেক সময় আমরা অহংগ্রহোপাসক হ'য়ে পড়ি। তখন আমাদের শুদ্ধ আত্ম-প্রয়াস সুপ্তপ্রায় থাকে। কখনও আমরা কর্ম্মফলের আশায় আকাশ-পুষ্প ত্রিদশপুরীকে বরণীয় বস্তু মনে করি। আবার এই ত্যাগ-চিন্তা যখন প্রবলা হয়, তখন মনকে 'আমি' ব'লে ভ্রান্ত হই। মনই ভোক্তৃরূপে কার্য্য করে। এই ভোগ-ত্যাগ-বৃত্তি—আত্মবৃত্তি-ধ্বংসকারিণী।

যখন স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত হওয়া প্রভৃতি কুতর্ক হৃদ্দেশ অধিকার করে, --তখন চেতনের বৃত্তি বিলুপ্ত হয়। আত্মা কখনও ভোগের জন্য ব্যস্ত হয় না। বদ্ধ মনই মনে করে কৃষ্ণপাদপদ্মে তাঁহার কিছু ভোগের বস্তু আছে। ভগবানের পাদপদ্ম—চিন্ময়, আমাদের ভোগের উপকরণ নয়। চেতনের ব্যাঘাত হ'লে চেতনের অস্মিতায় অচেতনকে চেতন ব'লে ভ্রম হয়।

কৃষ্ণই আনন্দ, তাঁতে পূর্ণানন্দ আছে; তিনি পূর্ণানন্দময়বিগ্রহ। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে জড়ানন্দে পূর্ণতা নাই; এখানে সমস্ত প্রার্থনার পূরণ হয় না। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে পরিচালিত হয়ে মনে করি--অহংগ্রহোপাসনায় বা পতঞ্জলির কৈবল্য লাভে অখণ্ড আনন্দ আছে। কিন্তু নিত্যানন্দ-প্রয়াসই আত্মার ধর্ম্ম।

মনে যখন নিত্যানন্দের প্রয়াস হয়, তখনই আমরা ভোগময় ব্যাপারে উপস্থিত হই।

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নানা বিচারে আবদ্ধ থেকে' ভোগ বাঞ্ছা করি, ততদিন মনে করি যে, জড়েন্দ্রিয় দ্বারা প্রপঞ্চ ভোগ করা যাক্। কিন্তু প্রপঞ্চ আমাদের ভোগ্যবস্তু নহে। যে-দিন নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় চিদানন্দ নিরন্তর উপস্থিত হ'বে সেদিন কৃষ্ণপাদপদ্মে সম্যক্ বন্ধন হবে।

আমাদের নিত্যত্ব, সত্যত্ব, চেতনতা তাঁহাতে পর্য্যবসিত হ'লে তাঁহাতে ভক্তি হয়। বর্ত্তমানে "ভক্তি" শব্দে নানা অসদ্ভাবে এসেছ; —যেমন, পিতৃভক্তি, রাজভক্তি বা পাঠশালার গুরুভক্তি। 'ভক্তি' অর্থে সেবা—"ভজ্ধাতুঃ সেবায়াম্"। কোন্ বস্তুর medium-এ ভক্তি সাধিত হ'বে, তাহার বিচার না হলে আমরা অসুবিধায় পড়্ব।

বর্ত্তমানকাল—কলি—বিবাদের যুগ। তাই পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ—বাগ্‌বিতণ্ডা, ছল, কুতর্ক প্রভৃতি কোটি-কোটি কণ্টকে অবরুদ্ধ। এমন অবস্থায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা ব্যতীত শুদ্ধভক্তির বিচার জানা অসম্ভব।

ভগবদ্বস্তুর নিত্য অধিষ্ঠান—আনন্দময় অধিষ্ঠানের উপলব্ধি না হ'লে সেই বস্তু

পাই না। মনোধর্ম্মজীবী নানা-প্রকারে ভগবদ্বস্তু না জেনে' অন্যবস্তুকে পূজ্য মনে করে এবং ইন্দ্রিয়জ-দর্শনে ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগের বিচার না জেনে' মনে করে—এইটাই ভোগের বস্তু। মনের দ্বারা ভোগ হয়। কৃষ্ণের সেবা হাড়মাংসে হয় না—চেতনের দ্বারা হয়। আত্মার নিত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সেবা কর্‌তে হ'বে। মনের কল্পনা-প্রভাবে কৃষ্ণসেবা হ'বে না। সম্বন্ধ বা দিব্যজ্ঞান চাই। 'কৃষ্ণই আরাধ্য' বলে যাঁদের বিচার, তাঁরা ব্যতীত আমাদের অন্য কেহ নাই। ''কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য'—এরূপ প্রতিষ্ঠাই বৈষ্ণবের; ইহাই প্রয়োজন। ভোগ-বাঞ্ছাময়ী জড়প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় নয়। আত্মবিদ্‌গণের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাসে'র অনুগ জনগণ বলেন,—তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহাকে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সমষ্টি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের অতীত নির্ব্বিশেষ উপনিষদ্ পরব্রহ্ম-শব্দে বাস্তববস্তু-ধর্ম্মের পরিচয় জ্ঞাপনোদ্দেশে নির্দ্দেশ করেন, সর্ব্বব্যাপক-ব্যাহ্যান্তর্য্যামিরূপে যাঁহার অখণ্ড ও খণ্ডিত ভাবদ্বয়-সংশ্লিষ্ট পূর্ণাপূর্ণভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী, বস্তুতঃ বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশক ভগবদ্ভাবের অংশবিশেষ 'পরমাত্মা' বলিয়া যিনি নির্দ্দিষ্ট, অনন্তসদ্‌গুণ-বৈচিত্রসমৃদ্ধ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহলীলা-পরিকর-মণ্ডিত নাম-রূপ-গুণোদ্ভাসিত সেই অদ্বয়জ্ঞান-পরিনিষ্ঠিত নৈর্গুণ্য-প্রকটিত-তনু চিচ্ছক্তিবিলসিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক ঔদার্য্যলীলাময়বিগ্রহ হৃদয়ান্তর্গত শ্রীবদনকমল-নিনাদিত কীর্ত্তনীয়স্বরূপ শ্রীনন্দনন্দনের সেবাই একমাত্র প্রয়োজন।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল।।

কৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ নিত্য এবং তজ্জনিত ক্রিয়াও নিত্য। সম্বন্ধ জ্ঞানোদয়ে কৃষ্ণপ্রতি জীবাত্মার যে স্বাভাবিকী ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহাই শুদ্ধভক্তি। সেব্যের সুখানুসন্ধান ব্যতীত নিষ্কপট সেবকের অন্য কিছু প্রার্থনা নাই। যেখানে এই সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানের অভাব বা তাৎকালিকতা, সেখানেই অভক্তিমার্গ। নাস্তিক, সন্দেহবাদী,অজ্ঞেয়তাবাদী, নির্ব্বিশেষবাদিগণ মনুষ্যজাতিকে সর্ব্বদাই কুপথে পরিচালিত করিবার জন্য ব্যস্ত। তাহাদের কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে—

''যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।''

''জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানেস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে
প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।''

ইত্যাদি শ্লোকসমূহ বিশেষভাবে আলোচ্য। 'নমস্কার' শব্দের অর্থ অহঙ্কারের নিবৃত্তি। সন্মুখরিত ভগবদ্‌বার্ত্তাকেই সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিতে হইবে। সাধুমুখামৃতদ্রব-সংযুক্ত শব্দই শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য ও স্মর্ত্তব্য। তাহা অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত শব্দ ও শব্দীতে ভেদ নাই। সেই শব্দ সদ্‌গুরুপরম্পরায় অদ্যাপি আসিতেছেন, শ্রৌত-পথাবলম্বনে সদ্‌-গুরুপাদাশ্রয়ে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিমূলে সেই শব্দের সম্যক্ আশ্রয় লইতে হইবে, সেবোন্মুখতা-দ্বারা কর্ণ প্রস্তুত হইলে সেই শব্দের শ্রবণ সুষ্ঠু হইতে পারিবে। প্রাকৃত শব্দের অনুশীলন যত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই আমরা অনর্থসাগরে নিমজ্জিত হইতে থাকিব।

শ্রীমদ্ভাগবত বস্তুনির্দ্দেশ-রূপ মঙ্গলাচরণমুখে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরণাং সতাম্" শ্লোকে যে বাস্তব-বস্তুর সন্ধান দিয়েছেন, তাহার সম্যক্ আলোচনা হইলেই মানুষের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল দূরীভূত হইবে। "কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্ন্নির্দেশা জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ। উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধিস্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্মদাস্যে।।"—এই বিচার আসিয়া গেলে, "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"—এই ভগবদ্‌বাণী-শ্রবণের সৌভাগ্যোদয় হইলে জীব ভগবৎপাদপদ্মে তাহার সর্ব্ববিধ স্বতন্ত্রতা সমর্পণ করিয়া নিষ্কপটে শরণাপন্ন হন, ভগবানও তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত শরণাগত ভক্তের সকল ভার গ্রহণ করেন।

আমাদের যতটা অযোগ্যতাই থাকুক্ না কেন, ভক্তিতে অধিকার আছে। ভক্তিতে অধিকারের অর্থ—সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি।

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদিস্যাদ্-দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।"

আবৃত কৃষ্ণের অনুশীলনে স্পৃহা উপস্থিত হইলে অন্যান্য দেবতাকে নিজেদের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনার পরিতৃপ্তির চাকর করিবার ইচ্ছা হয়। "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃত-জ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।" দেবতা—একমাত্র কৃষ্ণ। সেই দেবতা ঢাকা প'ড়ে যায় ধর্ম্মার্থ-কাম-কামনার কপটতা হৃদয়ে উপস্থিত হ'লে। ভগবদ্‌বস্তু আবৃত হ'য়ে যায়, অন্য দেবতার স্বতন্ত্রতা-কল্পনায়। যেমন সূর্য্য আবৃত হ'য়ে পড়ে আমাদের চোখের সাম্‌নে। ভোগীশ্রেণীর final station (শেষ গন্তব্য) হ'চ্ছে ধর্ম্মার্থকাম বা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি। তাহারা ইহজগতে ও পরজগতে নিজের ইন্দ্রিয়ের কৃষ্ণই চায়। আর ত্যাগ-শ্রেণীর final station হচ্ছে—সব tabular rasa হ'য়ে যাওয়া; নির্ব্বিশেষ ভাবই তাদের আরাধ্য, ভগবান আরধ্য নয়।

মনুষ্যজাতি যে-সকল ভোগলাভের জন্য মাথা খুঁড়ে ম'রছে, সেই সকল আকাঙ্ক্ষার বস্তুগুলি—ভুক্তি ও মুক্তি চাকর-চাকরাণীর মত হাত জোড় ক'রে থাকে ভগবদ্ভক্তের

নিকট। লোকে যে-সকল জিনিষ পে'লে ব'র্ত্তে যায়, ভগবদ্ভক্তগণের নিকট সে সকল বস্তু order-supply-র মত দূরে হাত জোড় ক'রে অপেক্ষা করে।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন,—''অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু''। যে অমঙ্গল, যে ছাই-পাঁশ ফেলে দেবার জিনিষ, মানবজাতি তারই গ্রাহক হ'বার জন্য ব্যস্ত!

গৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালী দুইটি গ্রন্থকে অবলম্বন ক'রে—ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত। ব্রহ্মসংহিতায় সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিচার, কৃষ্ণকর্ণামৃতে অভিধেয় বিচারের প্রাধান্য আছে। ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থটি পঞ্চোপাসনার অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করেছেন। তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী যে পঞ্চোপাসনায় ডুবে র'য়েছে শ্রীচৈতন্যদেব ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থ আবিষ্কার ক'রে সেই পঞ্চোপাসনা যে প্রকৃত সনাতনধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম নয়, তাহা জানিয়েছেন। কৃষ্ণকর্ণামৃতে ভগবদ্ভক্তির বিভিন্ন স্তরের কথা বর্ণিত আছে।

''পূর্ব্বদিক্ হ'তে সূর্য্য উদিত হ'য়ে পশ্চিমে অস্ত যায়। তদ্রূপ গৌড়ে পূর্ব্বশৈলে যে শ্রীচৈতন্যের উদয় হ'য়েছিল, সেই শ্রীচৈতন্যের কথা পশ্চিমের—পাশ্চাত্ত্যদেশের মঙ্গল ক'রবে না, পাশ্চাত্ত্যদেশে যে নারীপূজা প্রবর্ত্তিত র'য়েছে, আমরা তার অনুকরণ ক'রে ভোগ্যার অঞ্চলধৃক হ'য়ে থাক্‌ব'',—এরূপ বিচার ক'রে কেহ কেহ পাশ্চাত্ত্যের জড়বাদের আদর্শ-বরণকেই জাতীয়তা মনে ক'র্‌ছেন। পাশ্চাত্ত্য জাতি ভোগ নিয়ে কি কামড়া-কামড়িই না ক'রছে। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের অধিবাসী কি এতই বুদ্ধিহীন হ'য়ে গেল যে, সে দেশের চিন্তাস্রোত এদেশে আমদানী কর্‌বার জন্য এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে? ভারতের চিরন্তন পরমার্থের কথা লুপ্ত করে দিচ্ছে। এজন্য একমাত্র পরমার্থের প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয়মঠের কথা সর্ব্বত্র broadcast কর্‌বার আবশ্যক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

ভোগী ও ত্যাগী সম্প্রদায় চৈতন্যদেবকে বুঝতে পারে না। তা'দের ধারণার চৈতন্যদেব এজগতেরই কোন ভোগ্য সামগ্রী। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় 'ভক্তিচৈতন্য চন্দ্রিকা'য় ভক্তির চিত্র অঙ্কন করেছিলেন; শ্রীচৈতন্যদেবের বা ভাগবত-ধর্ম্মের ভক্তি সে-জাতীয় নহে। বাউল সহজিয়াগণের spurious literature ভক্তি ও প্রেম সম্বন্ধে কিরূপ বিকৃত ধারণাই না অঙ্কিত ক'রেছে! গ্রাম্য সাহিত্যিক সম্প্রদায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, রায় রামানন্দকে কিরূপ বিকৃতভাবে অঙ্কিত ক'রেছে! কেহ কেহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মকে মহাযান-সম্প্রদায়ের প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য বিচারের সমান করার চেষ্টাও দেখিয়েছেন! কিছুদিন পূর্ব্বে নব রসিক সম্প্রদায় জড় রসের সঙ্গে অপ্রাকৃতরসের একাকার কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত ভক্তগণ হ'তে তথাকথিত হিন্দুগণের ভাষা, চিন্তাস্রোত সম্পূর্ণ তফাৎ। Historic বা allegorical চৈতন্য মানবজ্ঞানের ভোগ্য বস্তুবিশেষ, বাঙ্গালীরাও চৈতন্যচরিতামৃত প'ড়ে তার অর্থ বুঝতে পারে না। বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের

সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত পাঠ্যরূপে বিহিত হ'য়েছে বটে; কিন্তু তার অধ্যাপকেরাও এই গ্রন্থদ্বয়ের তাৎপর্য্য বুঝতে পারে না। কেননা তাঁরা চৈতন্যদেবের একান্ত আশ্রিতগণের নিকট ঐসকল গ্রন্থ পাঠ করেন নি। প্রাকৃত ভাষাজ্ঞানের দ্বারা ও প্রাকৃত বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাকথা বোঝা যায় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের সর্ব্বপ্রথম কথাই হচ্ছে,—"অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।" গুরুপাদপদ্মাশ্রয়-রূপ সৎসঙ্গ গ্রহণ। যাঁরা অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও সৎসঙ্গ গ্রহণ না ক'রে চৈতন্যচরিতামৃতের অধ্যাপক বা অধ্যাপিত হওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁ'দের কাছে চৈতন্যচরিতামৃতের উদ্দিষ্ট বিষয় প্রকাশিত হয় না। তাঁরা চরিতামৃত বা ভাগবতের কোন কথাই বুঝ্তে পারেন না।

পূর্ণ চেতনের ধর্ম্ম—স্বতন্ত্রতা। পূর্ণচেতন স্বাধীনতার আধার। তিনি পাল্কীর বেহারাগিরি করেন না। "বরং দেহি দ্বিষো জহি" প্রভৃতি কামনা-মূলক প্রার্থনার যে পাল্কীর বেহারাগিরি করবার জন্য আহ্বান বা আবদার, সেরূপ পাল্কী বেহারাগিরি ভগবদ্‌বস্তুর দ্বারা করিয়ে নেওয়া যায় না। ভগবদ্‌বিস্মৃতি হওয়ার দরুণই জীবের ঐরূপ দুর্ব্বাসনার উদয় হয়। কেউ নির্ব্বিশেষকে বড় ক'রতে চাচ্ছে, কেউ বা জড়ের সবিশেষকে বড় ক'রতে ব'সেছে। কৃষ্ণ এমন জিনিষ নয় যে, তাতে খানিকটা accommodated হ'লো, খানিকটা হলো না।

ভবভীত যাঁরা, তাঁরা নানা পন্থা অবলম্বন করেন; কিন্তু যাঁরা স্বভাবতঃই ভবভয় হতে মুক্ত, তাঁ'রা পরমেশ্বর বস্তুর প্রপঞ্চে আত্মপ্রকাশের গোড়া থেকে সেবা করবার exclusive right পেয়েছেন। যদি পুত্ররূপে নির্ব্বাচন ক'রতে হয়, তা' হ'লে ভগবান্‌কে নন্দ-যাশোদার আনুগত্যে নিত্যপুত্ররূপে বরণ করাই শ্রেয়ঃ। বাঁচ্‌বো অতি অল্পদিন, কাজেই বৃথা বাগ্‌বৈখরীতে সময় নষ্ট কর্‌বার সময় নেই। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি ক'রে হরিভজনের সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়।

গুরুর নিকট সব সময়ই থাক্‌তে হ'বে। আর 'বকলমা' দিয়েছি মুখে ব'লে যথেচ্ছাচারী হওয়া কেবল কপটতা। অতি সোজা কথা হ'চ্ছে—কৃষ্ণের অনুশীলন ক'র্‌তে হবে,—অন্যাভিলাষের অনুশীলন নয়। "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ" গীতার এই শ্লোকটি প'ড়ে কেউ কেউ মনে ক'রছেন যে যেরূপ উপাসনা করুন না কেন, সেটাই কৃষ্ণের উপাসনা হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁ'রা কথাটা যেভাবে বুঝ্‌ছেন, প্রকৃত কথা তা নয়। সকল উপাসনা প্রাপ্তির মালিক একমাত্র কৃষ্ণ অর্থাৎ উপাস্য একমাত্র কৃষ্ণ, কিন্তু সেবকের যে অভিধেয় বা উপাসনা, তা' যখন অন্য দেবতাতে প্রযুক্ত হচ্ছে, তখন সেবকের দিক্ দিয়ে সে কাজটা হ'য়ে যাচ্ছে অবৈধ। কৃষ্ণ Conception ছাড়া অন্য Conception-eclipsed form of Conception—তাহাই অন্য দেবতা। দুধ বলে যদি পাঁক খাওয়া যায় বা দুধে যদি বিষ মিশায়ে থাকে, তা' হ'লে দুধের গুণ

তা'তে পাওয়া যা'বে অর্থাৎ তদ্দ্বারা পুষ্টি তুষ্টি হবে এরূপ মনে ক'রলে নিজেরই অসুবিধা হবে। ''সম্মুখে দরিদ্র, ব্যথিত, আর্ত্ত প্রভৃতিকে পরিত্যাগ ক'রে কোথায় ঈশ্বর অন্বেষণ ক'রছ''—আজকাল ঐরূপ যে-সকল প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যমত লোকে আদর ক'রে লুফে নিচ্ছে, তার মূলে আছে নির্ব্বিশেষবাদ বা পরমেশ্বর বস্তুকে আধ্যক্ষিকতার অন্তর্গত করা। যা'দের এ সকল বিচার, তা'দের কৃষ্ণ-সেবার ছলনা—কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্রাঘাত চেষ্টার ন্যায় বৃত্তি-বিশেষ,—

ধিক্ তার কৃষ্ণ-সেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্রহানে তাহার স্তবন।। (শরণাগতি)

ঐকান্তিকী ভগবদ্ভক্তিতে আগ্রহবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পদধূলীকে যাঁরা মস্তকের ভূষণ ক'র্তে পেরেছেন, তাঁদেরই মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। দরিদ্রকে 'নারায়ণ' মানুষের 'জয়ন্তী', কর্ম্মফল-বাধ্য বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে 'হরিজন' প্রভৃতি ব'লে ভগবদ্ভক্তির প্রতি কি আক্রমণই না করা হচ্ছে। অথচ লোকের বহির্ম্মুখতা কত প্রবল ও ঘনীভূত যে, ঐ সকল কথার কোথাও কোথাও যে দোষ প্রকাশ ক'রেছে তা তা'রা বুঝে উঠতে পারছে না। একশ্রেণীর লোক বুঝেও বুঝতে চাচ্ছে না। মানুষের দৈহিক উপকার কর, প্রত্যক্ষেরও আধ্যক্ষিকতার গোলামী কর, এদিকে পশুগুলিকে খেয়ে ফেল, বা পশুগুলির দেহের প্রতি অতি ভক্তি দেখা'তে গিয়ে মানুষের অপকার কর, ঈশ্বর-বিষয়ে উদাসীন থাক বা ঈশ্বরকে দিয়ে নিজের বাগানের মালিগিরি করিয়ে নেও,—এগুলি সব গৃহব্রতের বিচার। এ সকল গৃহব্রতের কখনও গুরুর উপদেশ বা নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি কিংবা পরস্পর গবেষণাদ্বারা মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না। উরুক্রমের অঙ্ঘ্রির সেবা না করা পর্য্যন্ত এ সকল অসুবিধা যাবে না। মনোধর্ম্মিগণ কখনই কৃষ্ণের অপ্রাকৃত পদকমলের প্রতি হস্ত বিস্তার করতে পারে না।

এক শ্রেণীর লোক মনে ক'র্ছেন,—'যখন নানাপ্রকার মতবাদ আছে তখন কোন্‌টি গ্রহণ ক'রব, বুঝ্‌তে পারি না, বা বুঝ্‌বার চেষ্টা করাও বৃথা। যে-কোন একটা গ্রহণ ক'রে নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করি এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সিদ্ধিকেই সিদ্ধি মনে ক'রে নিয়ে সকলই সমান'—এই মত প্রচার করি।

অনেকে বলেন, জনমতই গ্রহণ কর্ত্তব্য; Vox populi is not always vox Dei। জনমত গ্রহণ করিতে গিয়া মূর্খতাই বেশী হইয়া যায়। এক রাজা একটি পুষ্করিণী খনন করিতেছিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে সকল গোপ এই পুষ্করিণীকে দুগ্ধ দ্বারা পুরণ করিবে। এক গোপ মনে মনে স্থির করিল—সকলেই ত ' দুগ্ধ দেয়, আমি উহার মধ্যে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে যদি একটু জল দেই তাহা হইলে রাজা কিছুই ধরিতে পারিবেন না আমারও লোকসান হইবে না। ঘটনা ক্রমে ঐ গোপের স্বগত চিন্তা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে বাদ বাকী সব লোকই ঐ প্রকার বিচার স্থির করিল; সুতরাং তৎকালে

রাজার পুষ্করিণী দুগ্ধের পরিবর্ত্তে জলেই পূর্ণ হইল। বহির্ম্মুখ জনমত-গ্রহণে এইরূপই বিপত্তি! বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অত্যন্ত কম বলিয়া মূর্খ জনমতের বাহুল্যদর্শনে তাহার অনুবর্তন কখনই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। মাৎসর্য্য-বশে অনেকে মনে করেন, post graduate-এর সংখ্যা বেশী হইবার প্রয়োজন নাই, মূর্খেরই সংখ্যা বৃদ্ধি হউক; কিন্তু মূর্খদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কিছু একটা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। "তামাক-গাঁজাখোরের সংখ্যাই বেশী সুতরাং নেশা করা ভাল" এই বিচারে মাদক দ্রব্যের পক্ষে—মিথ্যার পক্ষে অনেক লোকবল বৃদ্ধি হইতে পারে। জনমতের সংখ্যাধিক্য লইয়া সত্য বিচার্য্য হইলে সত্যের পক্ষেরই বিশেষজ্ঞগণেরই হার হইবে, একথা ঠিক; তাই বলিয়া সত্যকে কখনও উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। মিথ্যাপক্ষ সত্যকে চাপা দিবার জন্য কত প্রযত্নই না করিয়া থাকে; কিন্তু পরিশেষে সত্যেরই জয় দেখা যায়। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ারহিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে-সকল উপদেশের কথা আছে তা' হতে মুক্তিমাত্রের কথা সাধারণ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপদেশে দেখতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনার দিল্লীর লাড্ডু শতকরা নিরানব্বই দশমিক নয় পৌনঃপুনিক লোকের ধর্ম্ম-জীবনকে বিপন্ন করেছে; তা' হ'তে মানুষজাতিকে মুক্ত কর্‌তে হবে—ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের যে সকল শিক্ষা-প্রণালী ও উপদেশ সঙ্কীর্ণতা-দোষে দুষ্ট, তা' হতে মুক্ত করতে হবে। ইহা সাধারণ লোকে বুঝবে না; কেননা, এ সকল কথা বল্‌বার লোকের অভাব-হেতু সাধারণ লোক এ-সকল কথা শুনে নাই—ঐ সকল কথায় তাদের কাণ অভ্যস্ত হয় নাই। মানবজাতি কেবল ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষাভিসন্ধি-আলেয়ার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়াচ্ছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর প্রকট লীলায় এবং তাঁর পার্ষদ গোস্বামী ও আচার্য্যগণ মানবজাতিকে অকৈতব পরম সত্যের উপদেশ শুনা'বার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মানব জাতি তা'তে সম্পূর্ণ উদাসীন। এজন্য প্রচুর পরিমাণে বহু লোকের নিকট এ সকল কথা আলোচনা করতে পারি না। বহু লোকের অনেক বাজে কথা নিরাস করতে গিয়ে আমরা উচ্চতম উপদেশের কথা সম্পূর্ণভাবে বলতে পারি না—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূর্ণ উপদেশের কথা মানবজাতির কাছে বলা যায় না। মনুষ্য জাতি সর্ব্বদা ব্যস্ত—কি ক'রে এখানে ভাল ক'রে থাকা যায়, দেহের স্বাস্থ্য লাভ হয়, মনের উন্নতি হয়; কিন্তু এ-সব ব্যাপারে তারা কতদিন থাকতে পারবে? ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষ-কামনা হ'তে মানবজাতির মুক্তিলাভ করা দরকার, বাস্তবিক স্বাধীনতা লাভ করা আবশ্যক। তা' আর কিছুই নহে, ভগবানের সেবা-রহিত অনর্থাবস্থা হতে মুক্ত হ'য়ে সর্ব্বদা ভগবানের সেবায় পরম উৎসাহ-বিশিষ্ট হওয়া—কেবলা ভক্তির কথায় প্রবিষ্ট হওয়া।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা আপনাদিগকে Sanatanist বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা পঞ্চোপাসনার নাম করিয়া ভগবানের নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইবার পক্ষপাতী, দেবতার সেবার নামে দেবতাকে চাকর করিয়া লইবার বিচার-বিশিষ্ট। এই

বিচারটাকে সম্পূর্ণভাবে উল্টাইয়া দেওয়া দরকার। সত্যকে চাপা দিবার জন্যই জগতের বহির্ম্মুখ লোক উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—"সকলে বৈকুণ্ঠের পথে গেল—থামাও থামাও" এই বলিয়া মানুষকে সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য ছুটিয়াছে। এই কার্য্যে তাহারা সাহায্য পাইতেছে কাহাদের? যাহারা অত্যন্ত মূর্খ—কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন না করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা সেবা-ধর্ম্মকে আচরণ করিতে চায়—তাহাদেরই সাহায্য পায়। Altruism-এর নামে তাহারা ভক্তির সুগম পথ হইতে মানব জাতিকে অন্য পথে চালিত করিতেছে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি একটু চেষ্টা করিলেই এই সকল কথা ধরিতে পারিবেন। কমবুদ্ধি ব্যক্তি সকলও বিষয়টি বুঝিবার অনুকূল চেষ্টাপর হইলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রতারকদলের সমস্ত প্রতারণাকে বাধা দিবার জন্যই বিষ্ণুভক্তির প্রচার। জগতে বিষ্ণুভক্তিরই বহুল প্রচার হইয়া প্রকৃত শান্তি প্রচারিত হউক, অশান্তি স্থাপনের সর্ব্ববিধ প্রয়াস প্রশমিত হউক।

শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগগণ সামাজিক সর্ব্বোচ্চ শিখায় অবস্থিত ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বনিম্ন ব্যক্তির চেতন-বৃত্তির সেবোন্মুখতার নিকট সত্যবাণী প্রচার করিয়াছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, প্রকাশানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বাহ্যদর্শনে সামাজিকস্তরের অত্যন্ত নীচ ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের নিকটও হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। আত্মধর্ম্মে ধনী দরিদ্র শিক্ষিত ও অশিক্ষিত—এই অনাত্মদর্শনের বিচার নাই, কারণ, আত্মধর্ম্মের গ্রাহক ধনীও নহেন, দরিদ্রও নহেন; শিক্ষিতও নহেন, অশিক্ষিতও নহেন, আত্মধর্ম্মের গ্রাহক আত্মা; আত্মা তাহা শ্রবণ করিতে পারিবে, অন্য কোন উপাধিক দ্রব্য বা বৃত্তি তাহা গ্রহণে অসমর্থ। শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদির ন্যায় পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট—প্রতাপরুদ্র, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, হুসেন শাহ, চাঁদকাজী প্রভৃতির ন্যায় রাজন্যবর্গের নিকট প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই শিক্ষা ও ধনাদিতে দৃপ্ত সম্প্রদায়ের অনেক ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের অভ্যন্তর না বুঝিয়াও তৎপ্রতি নত হইয়া থাকেন, আর যদি শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবল নীচ জাতি ও অত্যন্ত দরিদ্রের সংখ্যা অধিক বলিয়া তাহাদেরই নিকট কেবল নিজের প্রচার আবদ্ধ রাখিতেন, তবে গৌড়ীয়বৈষ্ণব ধর্ম্মকে "ছোটলোকের ধর্ম্ম, নীচ জাতির ধর্ম্ম" বলিয়া তৎপ্রতি কেহ আর আকৃষ্ট হইতেন না। প্রকাশানন্দকে স্বমতে আনিতে পারায় তদনুগত ষাট হাজার মায়াবাদিস্তাবক মহাপ্রভুর শরণাগত হইয়াছিলেন। অশিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের অকপটতার ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মে আসক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া এখনও অর্ব্বাচীন-সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত আত্মধর্ম্মকে "নীচজাতির ধর্ম্ম" বলিয়া ভ্রম ও উক্তি করিয়া থাকে। যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি বা উচ্চজাতি হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বাস্তবসত্য-প্রচারকগণকে কেবল অশিক্ষিত ও নীচ জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে বলেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের আন্তরিক কপটতা ধরিতে না

পারিলেও বাস্তব-সত্যের প্রচারকগণ তাহা ধরিতে পারেন। তাঁহারা ঐরূপ পরামর্শের ছলে নিজদিগকে 'সবজান্তা' মনে করিয়া বা তাঁহাদের নিজেদের পক্ষে আত্মধর্ম্মের আচরণের দরকার নাই, ভোগই তাঁহাদের দরকার,—এরূপ ভাবিয়া যাহারা ভোগবঞ্চিত, সেই সকল অশিক্ষিত নীচ সম্প্রদায়কে একটা কল্পিত ধর্ম্মের ভোগা দিয়া বা অপরের দ্বারা চুষিকাঠি প্রদান করাইয়া নিজেরা গা-ঢাকা দিয়া বাস্তব-ধর্ম্মের অনুশীলন হইতে সরিয়া পড়িতে চাহেন। বাহিরের দিকে কতকগুলি অশিক্ষিত ও অবিবেচক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া হিন্দুর জনবল বৃদ্ধির দ্বারা কোনই মঙ্গল হইবে না, বরং ঐরূপ সংখ্যাধিক্য 'পাষণ্ডী হিন্দু'র সংখ্যাই বৃদ্ধি করিয়া গণমতবাদে ও তৎফলস্বরূপ পরস্পর সংঘর্ষ, হিংসা দ্বেষ এবং আপনাদিগকে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার প্রতীকরূপে গড়িয়া তৎপ্রতিযোগী আর এক প্রবল প্রতিপক্ষের সৃষ্টি করাইয়া জগন্নাশ করিবে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেরূপ পরমেশ্বরকে নিরীশ্বর শিক্ষায় নির্ব্বাসিত করিয়া শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের ফলস্বরূপে লোকক্ষয়কর কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া অসংখ্য জীবের প্রাণ বিনাশের উন্নত কলাকৌশলের শিক্ষাই আবিষ্কার করিতেছেন, তদ্রূপ অশিক্ষিত সংখ্যাধিক্য প্রবল হইলে আর এক প্রকার আসুর মহাযুদ্ধের তাণ্ডব অচিরেই সমাজবক্ষে পরশুরামের রক্তগঙ্গাপ্রবাহের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিবে।

আর যদি ক্রম-পন্থায়, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মার সেবোন্মুখতার নিকট পরমেশ্বরের সেবার কথা প্রচার করা যায়, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্ততঃ একজনকেও সর্ব্বাগ্রে হরিকথায় অনুপ্রাণিত করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার স্তাবক-সম্প্রদায় ঐ আদর্শে অতি সত্বর হরিসেবায় প্রবৃত্ত হইবে। হরিসেবায় মৎসরতা-ধর্ম্মের লেশও না থাকায় স্তবনীয় উচ্চশিক্ষিত ও স্তাবক অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। উচ্চ ধনী ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি নিম্নতম দরিদ্র বা অশিক্ষিতকে জাগতিক ধনসম্পত্তি বা অর্থকরী শিক্ষা প্রদানে কৃপণতা করিতে পারেন। যদিও বিদ্যার সম্বন্ধে বলা হয় যে, উহা যতই দান করা যায় ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তথাপি প্রাকৃত বিদ্যার শিক্ষক ও শিষ্য উভয়েই স্ব-স্ব অপস্বার্থপরতা ও মৎসরতা-ধর্ম্মে পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাহাদের অর্থকরী বিদ্যার আদান-প্রদানে অনেক সময় কপটতা ও কৃপণতার সাক্ষ্যই পাওয়া যায়। শিক্ষক অপেক্ষা ছাত্র অধিক শিক্ষিত হইলে—গুরু অপেক্ষা শিষ্যের অধিক প্রতিষ্ঠা, প্রভাব বা বল বৃদ্ধি হইবে বিচার করিয়া শিক্ষক ছাত্রকে সকল কথা অকপটভাবে শিক্ষা দেন না কিন্তু পরমার্থরাজ্যে গুরু ও শিষ্যের নিত্যত্ব, শিক্ষণীয় বিষয়ের পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব এবং শিক্ষার পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব থাকায়, আর সেখানে স্ব স্ব অপস্বার্থপরতা, মৎসরতা ও কপটতার কোন স্থানই না থাকায় উচ্চশিক্ষিত সর্ব্বত্রই অশিক্ষিতের অধিকার বা যোগ্যতা উদ্বোধন-পূর্ব্বক তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে শিক্ষাপ্রদান করিবেন এবং ঐ শিক্ষা অনুলোম-পরম্পরায় ব্যবহারিক

অতি নিম্ন ব্যক্তি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া পরমেশ্বরের সেবার—ভগবৎসঙ্কীর্ত্তনের গোত্র বর্দ্ধন করিবে। ঐরূপ পরিবর্দ্ধিত আস্তিক সমাজের দ্বারাই বিশ্বের আত্যন্তিক কল্যাণ সম্ভব হইবে। বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে 'হিন্দু' বা 'অহিন্দু'র সংখ্যামাত্র বৃদ্ধি করিয়া পরস্পর সংঘর্ষ, প্রতিযোগিতা, মৎসরতা, জাতীয়তার নামে সংকীর্ণতা ও অসৎ সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির ফলস্বরূপে জগন্নাশের পথে মানবজাতিকে পরিচালনা করিবার পরিকল্পনা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে জগতের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, উহা অচিরেই ভীষণ কলি বা ঘোর বিবাদের ঘনঘটাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছে।

বহির্ম্মুখ বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণ গড্ডলিকার বহির্ম্মুখ রুচির অনুকূলে কথিত—'ঠাকুর তোমার মালাগাছটা ফিরাইয়া নাও, আর তৎপরিবর্ত্তে আমাকে এক মুঠো ছোলা দেও' বা "give us our daily bread" "ধনং দেহি বরং দেহি" প্রভৃতি বাক্য যিনিই বলুন না কেন, ঐ সকল কথা ভোগীদের বাল ভাষণ মাত্র; উহা 'প্রেয়ঃ' হইলেও শ্রেয়ঃ বা অহৈতুকী আত্মকল্যাণের কথা হইতে বহু দূরে।

শ্রুতি বলেন—

শ্রেয়ো হি ধীরোহভি প্রেথসো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে।

যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধবস্তুর সংরক্ষণ—এই প্রেয়ের প্রার্থনার পরামর্শদাতৃগণ প্রেয়ঃকামি-সমাজে যতই মহাপুরুষ ও 'সাধু' বলিয়া বিবেচিত হউন তাঁহারা বস্তুতঃ 'মন্দ', আর যাঁহারা আপাত-রুচির অনুকূলে ইন্ধন প্রদান করিবার পরিবর্ত্তে প্রকৃত আত্মমঙ্গল অহৈতুক ভগবৎসেবায় জীবদিগকে প্রণোদিত করেন, তহারাই ধীর।

ভগবান অহৈতুক ও অনন্য ভক্তের জন্য স্বয়ং যোগক্ষেম বহন করিলেও সেবক কখনও ভগবানকে দিয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ, চাকর বা গোমস্তার কাজ করান না, মহারাজ চক্রবর্ত্তীর নিকট গিয়া কোনও বুদ্ধিমানব্যক্তি কানাকড়ি ভিক্ষা করে না। বহির্ম্মুখতার নেশায় মশগুল ব্যক্তিগণ এ সকল কথা ধরিতে পারে না। তবে নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের পাদপদ্মধূলিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক preference (সমাদর) না দেওয়া পর্য্যন্ত মানুষের অসুবিধা কিছুতেই যাবে না। যে-কাল পর্য্যন্ত মহতের পাদপদ্মকে সর্ব্বোতোভাবে ভেলা না ক'রে নিতে পারে, সেকাল পর্য্যন্ত এ ভবসাগরে ডুবে যেতে হ'বে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তে ও আবর্ত্তে আট্‌কে যেতে হ'বে।

আধ্যক্ষিক মানবজাতি যে-সকল মুক্তির ধারণা বা ভুক্তির ধারণা ক'রে রেখেছেন, সেগুলিকে বিসজ্জর্নীয় বস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারলে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কথা বুঝতে পারা যা'বে। নতুবা সেই সকল আধ্যক্ষিক মনুষ্যজাতি গৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিরোধ ক'রবে। শুধু বর্ত্তমানে নয়, অতীতে ক'রেছে, অনন্ত ভবিষ্যতেও বিরোধ করতে থাকবে। কেন না, গৌড়ীয় মঠের প্রচার ভোগ ও মোক্ষকে থুৎকার করতে

বসেছে। কেবলমাত্র ভক্তবৎসল নৃসিংহদেব অনন্ত কাল শ্রীগৌড়ীয়মঠকে রক্ষা ক'র্বেন। গৌড়ীয়মঠ Transcendental construction (অপ্রাকৃত রাজ্যের গঠনমূলক কার্য্য) আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন, আর অন্যান্য সকল আধ্যক্ষিক ব্যক্তি বা সম্প্রদায় construction-এর নামে destructive work আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। আধ্যক্ষিকতার কূপমণ্ডুকতায় মস্‌গুল থাকাকাল পর্য্যন্ত এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হ'বে না।

(৩)

যাঁ'র ভগবানে ভক্তি আছে, তিনিই মনুষ্য। যাঁ'র ভগবানে ভক্তি নাই, তিনি ভোগী ত্যাগী বা অন্যাভিলাষী। ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের যে বিচার শ্রীগৌরসুন্দর সাকর মল্লিককে* বলেছিলেন, তা'তে আমরা ভোগী ও ত্যাগিসম্প্রদায়ের বিচারের অসম্পূর্ণতা ও একদেশদর্শিতা দেখ্‌তে পাই। 'ঈশাবাস্য' জগতের ঈশসেবার উপকরণগুলিকে কাকবিষ্ঠার সহিত তুলনা নির্ব্বিশেষবাদিগণের অসম্পূর্ণ বিচারে লক্ষিত হ'লেও শ্রীগৌরসুন্দর তা' বলেন না। যাঁ'রা শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত পাঠ ক'রেছেন, তাঁ'রা বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী —এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর অন্যতম বিভাবের অন্তর্ভুক্ত আলম্বন ও উদ্দীপন, আবার আলম্বনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় ও আশ্রয়ের কথা শ্রবণ ক'রে থাকেন। 'কাব্য-প্রকাশ' ও 'সাহিত্যদর্পণে'র লেখক, তথা ভরতমুনি যে বিষয়াশ্রয়-বিবেকের কথা আলোচনা কর্‌তে পারেন নি, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ-গোস্বামীর দ্বারা 'শ্রীরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলে' তা' সুষ্ঠুভাবে আলোচনা ক'রেছেন। ভগবান্ ব্যতীত আর দ্বিতীয় বিষয় নাই। যাঁ'রা ভগবান্ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু আছে বিচার করেন, তাঁ'দের বিচার খণ্ডিতধর্ম্মে সংশ্লিষ্ট। "সদেব সোমোদমগ্রমাসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" জিনিষটা দশটা পাঁচটা নয়। Absolute Truth is one without a second. যাঁ'রা মনে করেন—Absolute Truth challengeable, তাঁদের success সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কিন্তু আমরা Personal Godhead-এর উপাসক—আমরা Impersonality-র উপাসক নই। প্রপন্নাশ্রিত আমাদের সাফল্য অনিবার্য্য। সবিশেষ বিষ্ণুবস্তুর উপাসকগণ বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ধ'রে রাখ্‌তে পারেন—'সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতে' ইহার প্রমাণ। তাঁ'রাই realise কর্‌তে পারেন—তাঁ'রাই "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" উপনিষন্মন্ত্র তাঁ'দেরই গান ক'রেছেন। বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবান্ ও আশ্রয়বিগ্রহ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম—এই দু'য়ের সম্মিলনে অসংখ্য বিপদের মস্তকের উপর দিয়ে চ'লে যেতে পার্‌ব—সাফল্য আমাদের নিশ্চয়ই হস্তামলক হ'বে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত সেবক কখনই বিচলিত হন না। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (৯/৩০-৩১) বলেন,—

*সাকর মল্লিক—শ্রীল সনাতন গোস্বামী।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতিঃ।।"[১]

অভক্ত সম্প্রদায় নিশ্চয়ই কালপ্রভাবে পতিত হ'বে। ভগবদ্ভক্ত কখনই অধঃপতিত হন না। অবক্ত পতিত হ'বে—আর যেখানে কপট ভক্তি, সেই ভণ্ড দলও পতিত হ'বে—mental speculationists (মনোধর্ম্মিগণ) সব প'ড়ে যাবে। স্বর্গের সিঁড়িতে অধিকক্ষণ balance (সমতা) রক্ষা কর্‌তে পারবে না।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততো পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।[২]
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০/২/৩২)

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি।।[৩]
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত)

যাঁ'রা শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে আশ্রিত, তাঁ'দের সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে,—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ।।[৪]

---

(১) যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজনা করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিবে, যেহেতু তাঁহার ব্যবসায়—সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর। হে কৌন্তেয়, আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার অনন্যভক্তিপথারূঢ় জীব কখনই নষ্ট হইবে না। প্রথম অবস্থায় 'নিসর্গ' ও 'ঘটনাবশতঃ' তাঁহার অধর্ম্মাচরণাদি থাকিলেও ঐ অধর্ম্মাদি শীঘ্রই পরমৌষধিরূপা হরিভক্তিদ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ স্বরূপগত আচারনিষ্ঠ হইয়া পাপপুণ্য-বন্ধন হইতে ভক্তিজনিত পরম-শান্তি লাভ করিবেন।

(২) হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তির অনাদর করতঃ অধঃপতিত হয়।

(৩) কাল কলি; ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুসকল অত্যন্ত বলবান্ এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কর্ম্মজ্ঞানাদি কোটিকণ্টক-জালে অবরুদ্ধ। অতএব হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি যদি আজ আমাকে কৃপা না কর, তাহা হইলে হায়! এই অবস্থায় বিহ্বল আমি কি করি, কোথা যাই?

(৪) ভক্তের স্বভাবজনিত দোষসমূহ এবং শারীরদোষসমূহদ্বারা প্রাকৃত দর্শনে ভক্তকে দৃষ্টি করিবে না। যেরূপ বুদ্বুদ্‌ফেনপঙ্ক গঙ্গাজলে মিলিত নীরধর্ম্মপ্রভাবে গঙ্গোদক ব্রহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভক্তের প্রাকৃত দোষসমূহ দেখিয়া তাঁহাতে ভক্তির অভাব আছে মনে করিতে হইবে না।

Ordinary common people (সাধারণ জনগণ) মনে করেন,—empiricism-এর (আধ্যক্ষিকতার) পুঁজিপাটাই আমাদের সত্যের দিঙ্‌নির্ণয়যন্ত্র। কিন্তু empiricism প্রতি মুহূর্ত্তে মানুষকে স্খলিতপদ ক'রে দিচ্ছে—প্রতি মুহূর্ত্তে বদলাচ্ছে। একমাত্র Absolute Truth (বাস্তব সত্য)-এর deviation (চ্যুতি) নাই। ভগবদ্ভক্তের সহিত সাধারণ কর্ম্মীর পার্থক্য এই যে, কর্ম্মী অভিজ্ঞতার ভূমিকম্পে সর্ব্বদা ত্রস্ত, ভীত ও সংশয়াত্মা। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সত্যভূমিকার অচলায়তনে—সত্যের একায়নে প্রতিষ্ঠিত। "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।" এঁদের বিহিস্তা স্বর্গ, বা প্যারাডাইসের বাদশাহ হ'বার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। বিহিস্তা প্রভৃতির প্রতি বিরক্ত হ'য়ে নির্ব্বিশেষ হ'য়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে ইঁহারা অভ্যর্থনা করেন না। যা'রা সত্য ব্যতীত অন্য জিনিষের আশ্রিত, তা'রা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানদ্বারা বস্তু মেপে নেয়। তা'দের মধ্যে personality (সবিশেষত্ব) ও Impersonality (নির্ব্বিশেষত্ব) নিয়ে বৃথা তর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু যাঁ'রা একায়ন-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রেছেন, তাঁ'রা লৌকিক ও বৈদিক যে কার্য্য করুন না কেন, কখনও ভগবানের সেবা হ'তে একচুলও বিচ্যুত হন না। নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের সাফল্য নিশ্চয়ই হ'বে; তদ্‌ব্যতীত অন্য কোন কথা নাই; অসাফল্য কখনই হ'তে পারে না। জীবের নিশ্চয়ই মঙ্গল হ'বে। জীবকে পাপপুণ্যের অতীত ক'রে দেবে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত জনগণ, মনোধর্ম্ম-জীবী ন'ন; তর্কপন্থীরাই মনোধর্ম্মজীবী, তাই তা'রা সংশয়াত্মা, তা'দের নশ্বরতা অবশ্যম্ভাবী; তা'দের সাফল্য নাই। তা'দের আপাত সাফল্যের প্রতিবিম্বও তা'দের পতনেরই পূর্ব্বাভাস। মনোধর্ম্মজীবী—ভোগী বা নির্ব্বিশেষবাদী ত্যাগী। তা'রা কাল্পনিক প্রদেশে লম্ফ প্রদান বা অজ্ঞাত নিরাকার প্রভৃতি ভূমিকা রচনা করে। তা'রা লাফিয়ে গিয়ে কোন্ জায়গায় পড়্‌বে তা'র ঠিকানা নাই—"লাগে তা'ক্, না লাগে তুক্" বিচার ক'রে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে। আমরা তা' নই; আমরা Transcendental positivists (পারমার্থিক আস্তিক্যবাদী)—আমরা সকল লোকের অনুগ্রহ পা'ব—জোর ক'রে তাঁ'দের অনুগ্রহলাভে দাবি করব—ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তববাণী অযাচক সকলকে হাতে পায়ে ধ'রে জানিয়ে দেব—সকলেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় উদ্‌ভাসিত হ'বে। 'সত্যকে আশ্রয় করা' মানে—চেতনময়তা লাভ করা। সেই চেতনময়তায় সমগ্র বিশ্ব উদ্বুদ্ধ হউক। জগতে যুক্তবৈরাগ্যের বিচার প্রসারিত হউক। সকল বৃত্তি, সকল ব্যাপার, লৌকিকী বৈদিকী যাবতীয় ক্রিয়া ভগবদ্-ভক্তির কৈঙ্কর্য্য করুক, তা' হ'লেই বিশ্ব পূর্ণ সুখময় ধাম হ'বে।

পিয়ন যেরূপ বহু মূল্যবান্ ইন্‌সিওর্ড দ্রব্য ও বহুমূল্য টাকার মনিঅর্ডার নিজে মালিক না হ'লেও তা' বহন করতে পারে, সেই সকল মুদ্রার অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, আমিও তেমনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের পিয়নসূত্রে আপনাদের

উর্ব্বরক্ষেত্রে—পরমোন্নতক্ষেত্রে সমগ্র মনুষ্যজাতির কাছে বাস্তব সত্যের কথা পৌঁছে দেবার বড় আশা পোষণ করি। যাঁ'র আধার আছে, যিনি অধিকারী, তিনি গ্রহণ কর্‌বেন। যাঁ'দের অন্য বিচার, তাঁ'রা বল্‌বেন,—আমরা ঐরূপ ধর্ম্মের কথা শুন্‌তে চাই না। তাঁ'দের ওরূপ বল্‌বার অধিকার আছে। তাঁ'রা ঐ কথা যত বল্‌বেন, ততই চেতনের কথা বল্‌বার জন্য আমাদের উৎসাহ অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই, কেবল কীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র কৃত্য, জড়ের কীর্ত্তন নয়—চৈতন্য কীর্ত্তন। হরিকথার দুর্ভিক্ষ আমাদিগকে—মানব-সমাজকে যেরূপভাবে গ্রাস কর্‌ছে, তা'তে অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে আমাদের কীর্ত্তন-ভাগীরথী জগতে সেচন করা ছাড়া আর অন্য কোন কৃত্য নাই।

বর্ত্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলময় কৃত্য হ'চ্ছে,—এই যে সংসার, এই যে বোকামির হাতে পড়েছি, তা' হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে নিত্য কৃষ্ণসংসারে প্রবিষ্ট হওয়া। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌লেই সেই বোকামির হাত হ'তে উদ্ধারলাভ হয়—অন্য উপায়ে হয় না। সেই গুরু কি অন্যাভিলাষী হ'তে পারেন? —সেই গুরুপাদপদ্ম কি অনিত্য কর্ম্মফলবাধ্য কর্ম্মী জীব হ'তে পারেন?—সেই গুরুদেব কি ছলনাময় প্রচ্ছন্ন নাস্তিক নির্ব্বেদজ্ঞানী হ'তে পারেন? সেই গুরু কি অভক্ত, অনিত্য যোগী হ'তে পারেন? সমগ্র ভগবানে সর্ব্বতোভাবে ভক্তিবিশিষ্ট না হ'লে কি কেহ গুরু হ'তে পারেন?

জড় জগতের অন্যান্য কথায় প্রবিষ্ট হ'লে আমরা তা'তে ভোগ্যবুদ্ধি করায় ভোগিরূপে ভোগে আচ্ছন্ন হ'য়ে যাই। জড়জগতে আচ্ছন্ন হওয়ার কার্য্য বা জড়জগৎকে ক্রোধভরে তিরস্কার মাত্র ক'রে অন্য প্রকার কৃষ্ণবিমুখতা-অর্জ্জনকার্যকেও গুরুর কার্য্য বলা যেতে পারে না। ঐ সকল অভক্তির পথ। এই ভক্তির কথা সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল,—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রাহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।।" *

(ভাঃ ১১/১৪/৩)

ভক্তিবাণী কালে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। বহির্জগতের নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তাড়নায় জীবজগৎ কৃষ্ণ-বিস্মৃত হ'য়েছে। আমরা নানাপ্রকার বিরূপে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপস্বার্থে আচ্ছন্ন হ'য়ে যন্ত্রণার পথে ধাবিত হই, আর তা'কেই বলি কর্ম্মের সিদ্ধি, জ্ঞানের সিদ্ধি; কোন কোন লোক আবার কপটতা ক'রে তা'কেই বলে ভক্তি! অক্ষজ পদার্থের প্রতি

---

* (শ্রীভগবান্ বলিলেন,—) যে বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কালপ্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম।

প্রভুত্ব—ভক্তি নয়, জুয়াচুরি বা আত্মবঞ্চনা মাত্র। এই অভক্তির পথ হ'তে জীবকুলকে রক্ষা কর্‌বার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছিলেন। শুদ্ধ আচার্য্যগণ যত্ন ক'রেছিলেন—সেই শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মের বীজ বপন ক'র্‌তে। কিন্তু আমাদের ঊষর ক্ষেত্রে আমরা তা' রক্ষা কর্‌তে পারি নাই। কি-ভাবে সুষ্ঠুরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্‌তে হয়, তা' ভাগবতধর্ম্মেই অকৃত্রিমরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। শ্রীগৌরসুন্দর তাহা স্বয়ং আচরণ ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন। সেই গৌরসুন্দরই পরম উপাস্য বস্তু—জগতের সকলেরই শেষ উপাস্য বস্তু—জগতে যত উপাস্য বস্তু আছে, সেই সকল উপাস্য বস্তুরও পরম উপাস্য বস্তু।

শ্রীগৌরসুন্দর---জগদ্‌গুরু। অবশ্য আমাদের অনর্থযুক্ত অবস্থায় জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ---যা' হ'তে বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, কারণবারিতে প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী, গর্ভবারিতে ব্রহ্মার পিতা গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরবারিতে ব্যষ্টি-বিষ্ণু ক্ষীরদোকশায়ী ও পাতালে অনন্তদেব শেষ-বিষ্ণু প্রকাশিত। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথার আলোচনায় আর একটী পুরুষের কথা বলা হয়। তিনি পুরুষমাত্র নহেন—তিনি শ্রীল পুরুযোত্তম ভট্টাচার্য্য—মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ব'লে শ্রীল স্বরূপ দামোদর—যা' হ'তে জগতে গৌড়ীয়গণ প্রকাশিত হ'য়েছেন। সেই দামোদর স্বরূপের পরম প্রিয় শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু—যা' হ'তে শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়সম্প্রদায়। সেই রূপ-প্রভুর অনুগত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু। তাঁ'র অনুগত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু। তদনুগত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। তাঁ'র অনুগবর্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। শ্রীল চক্রবর্ত্তীর অনুগত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁ'র অভিন্ন সুহৃৎ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর। আমরা আমাদের বর্ত্তমানকালেই সেই শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবরগণের দর্শন ও কথা শুন্‌বার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। এই ধারায় যে জিনিষ এসেছে, তাতে মহাপ্রভুর কথা অবিমিশ্রভাবে শুনেছি। অন্যে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে যে সম্মান ক'রে থাকেন তা' মৌখিক। স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থ ক'র্‌বার বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হ'য়ে যে আচার্য্য-সম্মানপ্রদর্শনের অভিনয়, তাহা কপটতা মাত্র। কিন্তু আমরা যে অকৃত্রিম অবিমিশ্রধারার কথা ব'ল্‌লাম, তা' সকল কপটতার আবরণ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন—সকল সত্য কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এই সকল কথার বিরোধ করেন যাঁ'রা তাঁ'দিগকে দূর হ'তে দণ্ডবৎ করি। কিন্তু জগৎ এই সকল কথায় প্রতারিত হ'চ্ছে; তা' হ'তে উদ্ধার ক'র্‌বার জন্য যাঁ'দের হৃদয় অকৃত্রিমভাবে ক্রন্দন ক'রেছিল, তাঁ'রাই জগতে শুদ্ধভক্তির প্রচারের অভাব বোধ ক'রেছেন, তাঁ'রাই আমাদের নিত্য আদরের বস্তু।

মিছাভক্ত-সম্প্রদায় সুষ্ঠুভাবে গুরুপাদপদ্ম-সেবা হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে অন্য ব্যাপারকে গুরুসেবা মনে ক'রেছিল—শুদ্ধভক্তগণকে আক্রমণ ক'র্‌ছিল; তদ্দ্বারা জগজ্জীবের মহা অমঙ্গল প্রসব কর্‌ছিল। শুদ্ধভক্তির কথাটী আমরা পাই নাই—শুদ্ধভক্তির কথা লুপ্ত

হ'য়ে গিয়েছিল। বহির্জ্জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের বিচারে যে মায়াবাদি-সম্প্রদায় আপনাদিগকে ভক্ত অভিমান ক'রে অভক্তির প্রশ্রয় দিয়েছেন, তা' যতদিন মানবজাতিকে বুঝান না যায়, ততদিন মানবজাতির মঙ্গল হ'বে না। জগৎকে এই বিরাট বিদ্ধ ধারণা হ'তে মুক্ত কর্‌বার জন্য আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীল জগন্নাথ হ'তে শুদ্ধভক্তির কথা বর্ত্তমান যুগে অবতরণ ক'রেছেন। যিনি বর্ত্তমান জগৎকে সেই শুদ্ধভক্তির কথা এবং শ্রীগুরুধারা প্রচুররূপে জান্‌বার সুযোগ দিয়েছেন, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদই আমাদের আশ্রয়স্থল।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিতেই 'প্রেয়োবুদ্ধি'। ভক্তিটীই 'শ্রেয়ঃ'—এই কথাটী পূর্ব্ব আচার্য্যগণ ব'লেছেন। ভক্তিটীই 'প্রেয়ঃ'—এই কথা শ্রীরূপানুগবর শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর জগৎকে বিশেষরূপে জানিয়েছেন। যাঁ'দের প্রেয়োবিচারে ভক্তি নাই, তাঁ'রাই শ্রেয়োহীন হরি-বিমুখ অবৈষ্ণব। মানবজাতির অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানে প্রেয়োবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়তর্পণে বিনোদন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে যাঁ'র প্রেয়োবুদ্ধি বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে যাঁ'র একমাত্র বিনোদ, তিনি শ্রীজগন্নাথ-বস্তুর সেবকোত্তম, সমগ্র জগতের প্রভু, বিষয়াশ্রয়বিগ্রহ জগন্নাথের অভিন্ন-বিগ্রহ।

ভগবদ্ভক্তিই পরমধর্ম্ম; সেই ভক্তিটী কি জিনিষ,—প্রাকৃত প্রেয়ঃপথাবলম্বী তা' বুঝ্‌তে পারে না। যাঁ'দের স্বরূপে অবস্থিতি নাই, যাঁ'রা পারমহংস্য-ধর্ম্মে অবস্থিত হ'ন নাই অর্থাৎ যাঁ'রা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি বর্ণ বিচারে, ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসাদি আশ্রম-বিচারে, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-পুরুষার্থ-বিচারে অবস্থিত আছেন, তাঁ'রা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-বঞ্চিত হইয়া পরম-মুক্ত-বিচারে অবস্থিত নহেন। "মুক্তিহিত্বান্যথা-রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" অন্যথারূপে অবস্থিতি কালেই মনুষ্যে কৃষ্ণেতররূপ-দর্শন-স্পৃহা উদিত হয়। প্রেয়ঃপথে চালিত হ'য়ে শ্রেয়োজ্ঞান ব'লে যা' উদিত হয়, তা' শ্রেয়ঃ নহে, উহা মোক্ষাদি নিজ-লাভেচ্ছার প্রকারভেদ প্রাকৃত প্রেয়েরই প্রকার-বিশেষ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অহৈতুকী ভক্তিকেই নিজ-প্রেয়ঃ জানিয়া একমাত্র শ্রেয়ঃপথ-জ্ঞান বিচার ক'র্‌বার উপদেশ জগৎকে দিয়েছেন।

বেদে অর্থাৎ পাণ্ডিত্যে বা ব্রহ্মে যিনি বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মচারী। যদি পাণ্ডিত্যের উপদিষ্ট বস্তু ভগবদ্ভক্তি না হয়, তা' হ'লে অন্ধ হ'য়ে তাদৃশ বিচরণের পথ স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য নহে; সেরূপ ব্রহ্মচর্য্য হ'তে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। স্বরূপে ব্যবস্থিতি হচ্ছে—অন্যথা-রূপের পরিত্যাগ। বর্ত্তমানে "আমি সৃষ্ট প্রাকৃত পুরুষ, আমি প্রাকৃত স্ত্রী'—মানব জাতিকে এই দুর্ব্বুদ্ধি আক্রমণ ক'রেছে; এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত 'অহংমম"-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হন না, ইহা বুঝিয়ে না দিলে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হ'বে না—জীবকুল বঞ্চিত হ'বে—অভক্তি প্রেয়ঃপথকেই 'শ্রেয়ঃপথ' মনে ক'রে অসুবিধায় পতিত হ'য়ে থাক্‌বে। "তোমার প্রেয়ঃপথ একটা, আমার প্রেয়ঃপথ আর একটা"—এরূপ অভক্তিবিনোদন-চেষ্টা হ'তে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবকুলকে রক্ষা

করেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ আংশিক বস্তুর বিনোদ—অভক্তির বিনোদের কথা জগতে প্রচার করেন নাই। "তোমার বিনোদন-যোগ্য-ব্যাপার 'ভক্তি' থাকে থাকুক, আমার বিনোদন-কার্য্যের বস্তু—অভক্তি'—এরূপ বিচারে যা'রা ধাবিত হয়, সেই সকল চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর বিচারও ভক্তিবিনোদের বিচার নহে। অভক্তি ও ভক্তি কখনই এক নহে, কৃষ্ণ ও মায়ার বিনোদ—এক বস্তু নহে। ভক্তির পূর্ণ বিনোদন ব্যতীত ভক্তিবিনোদের অন্য কোন বৃত্তিতে প্রীতি নাই।

আমরা নানাবিধভাবে জগতের বস্তু-সমূহের দ্বারা বঞ্চিত হ'লে, স্বরূপ-বিভ্রান্ত হ'লে, যখন দুর্ব্বুদ্ধি-যুক্ত হই, তখন শ্রীগুরু-পূজা কৃপা-পূর্ব্বক প্রকটিত হন। আমার ন্যায় নগণ্য লঘুবস্তু যে মহদ্‌বস্তু—গুরুবস্তু হ'তে কৃপা লাভ করে, সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই আমাদের নিত্যকৃত্য। ব্যাসের গণ যে গুরু-পূজা করেন, সেই গুরু-পূজার মন্ত্র—"সত্যং পরং ধীমহি"।

যত রথো লোক রথ দেখ্‌তে আসে। কেউ কলা বেচ্‌তে এসে, রথও দেখ্‌ছে মনে করে। ঐরূপ রথো লোক প্রকৃত প্রস্তাবে রথ দেখ্‌তে আসে না—কলা খেয়ে যায়—বঞ্চিত হ'য়ে যায়—স্ব-স্ব প্রেয়ঃসাধনকেই "রথ দেখা" মনে করে। কিন্তু "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" রথে বামন দর্শন করা চাই—বলির ন্যায় আত্ম-বলি অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করা চাই। শুক্রাচার্য্যের শিষ্যগণ এসে' বাধা দিবে; কিন্তু গুরু-কৃপা-বলে—বলদেবের বলে বলী হ'য়ে আত্মবলি দিতে হ'বে—সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর্‌তে হ'বে, তবে বামনের কৃপা লাভ হ'বে—বামন-দর্শন হ'বে।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।"*

(ভাঃ ১২।৩।৫২)

হরির কীর্ত্তন হ'লে সমস্ত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। সত্যযুগে ধ্যানের কথা বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান কলিকালে বিক্ষিপ্তমনে ধ্যানের কথা পালিত হ'তে পারে না। এজন্য মহাধ্যানের কথা বর্ণিত হ'য়েছে। হরিকীর্ত্তন—মহাধ্যান। কৃতযুগে স্বল্প ধ্যানের কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা'তে ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন হ'ত না; এজন্য কলিকালে মহাধ্যান। ধ্যানে দোষ প্রবেশ ক'রেছিল বলে ত্রেতায় যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। এজন্য কলিতে মহাযজ্ঞ সঙ্কীর্ত্তনের বিধি। যজ্ঞে দোষ আরোপিত হওয়ায় দ্বাপরে অর্চ্চন-বিধি প্রবর্ত্তিত হ'ল। কলিতে মহা-অর্চ্চন-বিধি। মহা-অর্চ্চন-শ্রীনাম-কীর্ত্তন। সমস্ত চিকিৎসায়

---

* সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনাদি করিয়া যে ফল লাভ হইত, কলিকালে হরিকীর্ত্তন হইতে সে সব ফললাভ হয়।

নিরাশ হ'য়ে অন্তিমকালে যেমন অত্যন্ত মুমূর্ষু রোগীকে বিষবড়ি খাইয়ে দেয়—তা'তে খুব শক্তি (potency) আছে ব'লে,—সেরূপ কলিকালে জীবের দুর্দ্দশার চরম দেখে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হ'য়েছে। শ্রীনাম-কীর্ত্তনে সর্ব্বশক্তি সমর্পিত হ'য়েছে—সকল শক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে। কীর্ত্তনই—মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহার্চ্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন--সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহার্চ্চনে তত্তদ্‌বিষয়ের পরিপূর্ণতা। যখনই মানুষের বিচার এসে' উপস্থিত হয় যে, সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি, তখনই যজ্ঞ কর্‌বার অবকাশ হয়। শ্রীনাম-ভজনেই মহার্চ্চন, মহাযজ্ঞ, মহাধ্যান। মহাধ্যানে অন্যমনস্ক হওয়া উচিত নয়। যখনই অন্যমনস্ক হ'ব, তখন বল্‌ব,—সত্যযুগে ফিরে যাই, কিন্তু এখন যে কলিযুগ! সুমেধোগণ এই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চ্চন করেন, আর কুমেধোগণ অন্যান্য পথ স্বীকার করেন, তা'তে তাঁ'দের মঙ্গল লাভ হয় না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।"*

(ভাঃ ১১/৫/৩২)

ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের উপাসকগণ যজ্ঞবিধিদ্বারা উপাসনা কর্‌তেন, তাঁ'রা ব'ল্‌ছেন,—"শ্রীরামচন্দ্রকে সীতাদেবী যে-ভাবে উপাসনা ক'রেছিলেন, সেইভাবে ত' সেবা কর্‌তে পারি না"। কিন্তু এখানে একটুকু কথা হ'য়েছে, শ্রীমদ্ভাগবত বল্‌ছেন--'সুমেধসঃ'। 'সুমেধস্'-শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হ'য়েছে। এক সীতাদেবী যদি বহু সীতাদেবী হ'য়ে সেবা করেন, তবে সীতা ও রাম—উভয়েই অসন্তুষ্ট হ'বেন; কারণ, শ্রীরামচন্দ্র—একপত্নীব্রতধর, আর সীতাদেবী একপতিব্রতধরা। কিন্ত—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।"

নাম-মহাযজ্ঞের দ্বারা যে পূর্ণ বস্তুর উপাসনা, তা'তে অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং পার্ষদের নিত্য অবস্থান বিশেষরূপে বিবেচ্য। তাঁ'দের অনুগত হ'য়ে সুমেধোগণ নাম-সঙ্কীর্ত্তন ক'রে থাকেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত হ'য়ে তাঁ'রই পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান ক'রে নামযজ্ঞ ক'রে থাকেন। যাঁ'রা গৌরবিহিত কীর্ত্তন পরিত্যাগ ক'রে অন্য প্রকারে কীর্ত্তন করেন, তাঁ'রা অচৈতন্যাশ্রিতজন। সুতরাং জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যে যে-সকল বিচার উপস্থিত হ'য়েছে, তা' অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। আম্নায়-

---

* যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

বেদ্য জিনিষটি বিমুখ কর্ণ দিয়ে শ্রবণ করা যায় না। গুরুদেবের শব্দ সেবোন্মুখ কর্ণে পৌঁছিলে—কর্ণবেধ হ'লে চক্ষুর অজ্ঞানতিমির বিদূরিত হয়; তখন চক্ষু নির্ম্মল হয় এবং সেই নির্ম্মল চক্ষুতে কৃষ্ণদর্শন হ'য়ে থাকে।

অভিজ্ঞতাবাদের ছলনাময়ী ধারণা ও কল্পনা স্বীকৃত হয় না। শ্রৌতপথের বিচার—সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে সূর্য্যদর্শন করতে হ'বে। আমার অন্যরূপ বিচারদ্বারা সূর্য্য বিপর্য্যস্ত বা অন্য বস্তু হ'য়ে যা'বে না, কিংবা কৃত্রিম আলোকসমূহের দ্বারাও বাস্তবসূর্য্য দর্শন হ'বে না। বাস্তব নিত্যবস্তুর অস্তিত্ব ও স্বাভাবিক স্বরূপের প্রতিদ্বন্দ্বী না হ'য়ে বস্তুর নিকটে উপনীত হ'বার চেষ্টা কর্‌তে হ'বে। আমার আবৃত স্বরূপের ধারণা-সম্বন্ধে খণ্ডত্ব বা অসম্পূর্ণত্বের আরোপ হ'তে পারে, কিন্তু পূর্ণ নিত্য বাস্তব-বস্তু-সম্বন্ধে তা' হ'তে পারে না। যাঁ'র সাক্ষাৎ লাগ পাই না, তাঁ'র সম্বন্ধে তর্ক বৃথা। অভিজ্ঞতা বা আরোহচেষ্টার দ্বারা বস্তুদর্শনের প্রয়াসমুখে যে বিশেষ ধারণা, তা' স্বভাবতঃই বিবাদময়ী ও বহু; কারণ তা'তে nondeviating principle (বাস্তবসত্যে চ্যুতিরহিত নিষ্ঠা) নাই।

কেবল অপ্রাকৃত শব্দাবতারের দ্বারাই তুরীয় এবং অনন্তমানের কথা এই তৃতীয়মানের রাজ্যে—সান্তজগতে আস্‌তে পারে। সুদূরস্থ জিনিষ শব্দের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী হ'তে পারে; সে শব্দ যখন উপস্থিত হয়, তখন অন্য কোন প্রকার চেষ্টা আমরা স্বীকার করি না। কি জিনিষ আস্‌ছে, তা' না বুঝ্‌তে পার্‌লে শুন্‌বার দরকার নাই, এ কথা আমরা বলি না। যদি না শুনি, তা' হ'লে এই স্থূলসূক্ষ্ম প্রকৃতির মধ্যেই থাকা হ'য়ে যায়।

জড়ের নানাত্ব-বহুত্বের বিচারে কেবল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'তে হ'বে। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে", "নিত্যো নিত্যানাং" প্রভৃতি শ্রুতি-মন্ত্রে "তস্য" একবচন। তিনি বহু নিত্য পদার্থের মধ্যে পরম নিত্য। তিনি বহু অনিত্য পদার্থের অন্যতম বা বহু নিত্য পদার্থের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত নহেন। তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় পরম নিত্যবস্তু। "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"। তাঁ'র অধিক ত' কেহ নাই-ই, তাঁহার সমান ও কেহই নাই। তিনি অদ্বয়বস্তু, তাঁ'রই অন্তর্ভুক্ত অন্য সকল জিনিষ। অর্থাৎ তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু হ'লেও তাঁ'র শক্তির বিচিত্রতা আছে। শ্রুতি ব'ল্‌ছেন,—"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।" আমরা প্রপত্তি দ্বারা বহুত্ব হ'তে একমাত্র অসমোর্দ্ধ অদ্বয়বস্তুর অনুশীলন করি। সেই অনন্ত শক্তিমানের অনুশীলনবিচিত্রতা অদ্বয়জ্ঞানের অবিরোধী।

শক্তির মোটামুটি তিন ভাগ। অঙ্গের তিন ভাগ। অঙ্গের অন্তর্গত ১, ২, ৩, ইত্যাদি। অঙ্গের তিন ভাগের সংজ্ঞা—অন্তঃ অঙ্গ, বহিঃ অঙ্গ, তটাঙ্গ। এখন আমরা বহিরঙ্গের সংস্পর্শে আছি। অন্তরঙ্গ এখন পর্য্যন্ত আমাদের নিকট প্রকটিত হয় নাই। বহিরঙ্গা শক্তিতে বহির্জগতের সৃষ্টি; বহিরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট জগতে বিচিত্রতা দেখতে পাই। কিন্তু

সেই বিচিত্রতা অদ্বয়ের বিরোধী, অনিত্য, হেয়, অনুপাদেয়, ছলনাময়। তাই ব'লে অন্তরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট জগৎ বিচিত্রতাবিহীন নহে। সেখানেই প্রকৃতপ্রস্তাবে অনন্ত, অফুরন্ত, পরমোপাদেয়, নিত্য বিচিত্রতা আছে। সেই বিচিত্রতা অদ্বয়জ্ঞানের সহিত সুসমন্বিত—অদ্বয়জ্ঞানের পরিপোষক। সেখানকার বিচিত্রতা মানসিক গবেষণার দ্বারা কল্পিত নয়, অবাস্তব নয়, অনিত্য নয়। সেই অন্তরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট নিত্য, অনন্ত বিচিত্রতারই খণ্ড, হেয়, বিকৃত প্রতিফলিত প্রতিবিম্বই বহিরঙ্গ-শক্তি-সৃষ্ট জড়-বিচিত্রতা।

বহির্জ্জগতের সমুদয় বস্তু কার্য্য ও কারণজাতীয়। কার্য্যকারণে পর্য্যবসিত হওয়া নির্ব্বিশেষবিচার। এই সমুদয় কেবল 'অঘ', 'অসুবিধা'। কেবলমাত্র—"বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"

সাক্ষাৎ 'বৈকুণ্ঠ' শব্দ যখন সেবোন্মুখ কর্ণে অবতরণ করেন, তখন তিনি অনায়াসে সকল অঘ অপসারিত ক'রে দেন। 'বৈকুণ্ঠ' শব্দে শব্দ-শব্দীর মধ্যে ভেদ নাই। বৈকুণ্ঠ-শব্দের শব্দীর অভিজ্ঞানের জন্য অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যগ্রহণের আবশ্যকতা হয় না। 'পূর্ণ' শব্দ দ্বারা খণ্ডিত শব্দকে লক্ষ্য কর্‌তে বলা হচ্ছে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির উৎপন্ন কোনও বস্তুবিশেষ ন'ন। তিনি অধোক্ষজ বস্তু। তিনি আরোহবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদীর জ্ঞানগম্য ন'ন—সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন, শুদ্ধস্বরূপের নিকট স্বপ্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণজ্ঞান প্রদান ক'রেছেন। কৃষ্ণেতর দেবতার কথা—অচৈতন্য দেবতার কথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেন নাই। গয়ায় দীক্ষা-লীলাভিনয়ের পরে শব্দমাত্রের ব্যাখ্যা ক'র্‌তে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব বলেন যে শব্দের 'কৃষ্ণ' ছাড়া ব্যাখ্যা নাই। শব্দের দ্বিবিধ দ্যোতক-বৃত্তি; এক প্রকার দ্যোতক-বৃত্তি কৃষ্ণকেই লক্ষ্য করে, অন্য প্রকার বৃত্তি অজ্ঞতা প্রসব করে অর্থাৎ শব্দের বাহ্য আবরণ প্রকাশ ক'রে কৃষ্ণ হ'তে বিক্ষিপ্ত করে।

বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ ক'র্‌লে সব সুবিধা হ'বে। নচেৎ অভ্যুদয়বাদী কিংবা নির্ব্বাণবাদী হ'য়ে যে'তে হ'বে। দীক্ষাগ্রহণ জিনিষটা—নামগ্রহণ। শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়িতে দিব্যজ্ঞান লাভ। বহিরঙ্গা শক্তির বিক্রমরূপ অভিজ্ঞতা-প্রসূত বুদ্ধির দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাবিচাররূপ বিপৎপাত হ'তে শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে সাবধান ক'রেছেন। তুমি বৈষ্ণব; কিন্তু তোমার ঐ বহির্ম্মুখবিচারগ্রস্ত শরীরটা বৈষ্ণব নয়। তোমার ঐ শরীর যদি বৈষ্ণবের অকৃত্রিম সেবায় লাগাও, তা' হ'লে ঐ শরীর শরীরীর তাৎপর্য্যের সহিত এক হ'য়ে যা'বে।

প্রতিকূল অনুশীলন-দ্বারা অসুবিধা হ'য়ে যায়। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা ব্যতীত কাহারও অন্য কোন কৃত্য নাই। জীব কৃষ্ণের দাস। যথেচ্ছাচারিতায় জীবনের ব্যবহার পাওয়া যায় না—জীবন্মৃত অবস্থামাত্র লাভ হয়। শুষ্কবৈরাগ্য কিছুক্ষণ পরে চেতনকে পর্য্যন্ত শুকিয়ে মেরে ফেলে! কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত; মরে যাওয়ার দরুণই অসৎ

কার্য্যে প্রবৃত্তি, সত্য কথায় অমনোযোগিতা। যা'রা নিজেরাই recipient (গৃহীতা) হ'তে চাচ্ছে, তাঁ'দের জীবন কিছুক্ষণ পরে থেমে যা'বে। তা'রা মৃতই আছে। বাস্তব-বেদ্যবস্তুর অনুশীলনে বঞ্চিত থাকাই মৃত অবস্থা। যে জীব বহিরঙ্গা শক্তির অধীন হ'য়েছে, সে জীবিতম্মন্য হ'লেও 'জীব'-শব্দ-বাচ্য নহে। তা'র তথা-কথিত জীবন কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় ভেসে যাওয়া মাত্র। পুত্তলকে সকল লোকেই আক্রমণ করে। এইরূপ ব্যক্তিগণ মৃত্যুর ভূমিকার উপর অস্বাভাবিকভাবে পরস্পর মারামারি করছে।

অমুক্তের কথার দ্বারা কখনও সত্য নিরূপিত হয় না। কেবল চেতনময় বস্তুর অনুসন্ধান ব্যতীত অন্য চেষ্টার দ্বারা বিপর্য্যস্ত ধারণামাত্র সম্ভব। নিত্যানিত্যবিবেক উদিত না হওয়ায় জীবের এইরূপ অমঙ্গল হচ্ছে। এজেন্ট মুনিবকে ফাঁকি দিচ্ছে। Phenomenal world-এ (জড়জগতে) meddle (সংশ্রব) করার জন্য মনকে powers delegate (শক্তি প্রদান) করা হ'য়েছে। শারীরিক এবং মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ হ'বার চেষ্টা আত্মার ধর্ম্ম নয়। জগতের বাদশাগিরি, স্বর্গের ইন্দ্র-গিরি—কেবল মুখোস্‌পরা দুর্ব্বুদ্ধিমাত্র—'মুখোস প'রে অন্য ভূমিকায় থাকার বুদ্ধি—যা' ইন্দ্রিয়রুচিকর প্রত্যক্ষজ্ঞানে বুঝি, তা'র মধ্যে থাকার বুদ্ধিমাত্র। কিন্তু তা'তে থাক্‌তে পারি না। অর্জ্জিত বস্তু চলে যাচ্ছে। তেমন বস্তুসংগ্রহ ক'র্‌ব, যেটা চ'লে যায় না।

জাগতিক অপূর্ণতা পরিত্যাগ ক'রে নিজের বুদ্ধিতে পূর্ণতার পক্ষপাতী হবার পক্ষপাতিত্ব ও কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার এবং আর একটি দুর্ব্বুদ্ধি। ঘটাকাশ ভেঙ্গে ফেলে কি মহাকাশ হওয়া যায়?—উহা প্রলাপ মাত্র। খুব বেশী পরিমাণে অনূচানমানিতা বা আত্মম্ভরিতার দ্বারা যে সেই জিনিষের কাছে পৌঁছাব, ইহাও কল্পনা-স্রোতমাত্র। ইহা বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত।

কেহ নাক টিপে সমাধি (?) লাভ ক'রে নিজের সুবিধা (?) ক'রে নিলেই বা কি হ'ল? তিনি আমার কি উপকার ক'র্‌লেন ? তাঁ'র নিজেরই বা লাভ কি? " আপনি এখানে মাটি কাট্‌বেন, আর আমি ব্রহ্ম (?) হ'য়ে যা'ব!"—এটা হ'চ্ছে অত্যন্ত হেয় রকমের অপস্বার্থপরতা। বর্ত্তমান সুবিধা, যা' দ্বারা অন্যের অনিষ্ট হ'চ্ছে, তা' আমার লভ্য হবে! মুক্ত ব্যক্তি মুক্তিকামনা করেন না।

চৈতন্যচন্দ্রের কথা এই সব জাতীয় জাগতিক দোলো কথা নয়। শ্রীচৈতন্যদেব ইহজগতের কোন দোলো কথা অবলম্বন ক'রে অমঙ্গলজনক কথা বলেন নাই—তিনি ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত প্রতিকূলতা ক'র্‌তে বলেন নাই।

ভক্তি একমাত্র সুখ, অন্যগুলি সুখের অভাব। ''আমার সুখ হোক্; বাদবাকী লোকের অসুবিধা হোক্, তোমাকে বঞ্চিত ক'রে আমার সুবিধা!'—এরই নাম অন্যাভিলাষ কর্ম্মজ্ঞানাদির পথ।

আর কা'কেও বঞ্চিত না ক'রে সকলে মিলে হরিকীর্ত্তন করি, ২৪ ঘণ্টা হরিকীর্ত্তন করি-এরূপ বিচার কেবলা ভক্তির পথের পথিকের। কেবলা ভক্তির পথে কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোনও অবান্তর সাধনের সাহায্য বা মিশ্রণ স্বীকৃত হয় না। কারণ কীর্ত্তনই একমাত্র নিরপেক্ষ অব্যর্থ অস্ত্র। প্রথমে কাণ দিয়ে শুন্‌তে হয়। পরে সকল ইন্দ্রিয়ের অনুকূল-ক্রিয়া উপস্থিত হয়। তখন ভগবানের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য, লীলা-দর্শন হয়। ফুটো হাঁড়িতে তরল পদার্থ রাখার দুর্ব্বুদ্ধিদ্বারা কেবল কাম-ক্রোধাদির প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম-রূপ-গুণ-পরিকরেষু সম্যক্-স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি। তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবত-শ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠম্। * (ভাঃ ৭/৫/১৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকা)।

শ্রীচৈতন্য-নিজজনের করুণাকটাক্ষবৈভববিশিষ্ট পুরুষ জগতের যাবতীয় কুবৈভবকে, কুযোগিবৈভবকে ফুৎকার ক'র্‌তে পারেন, নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বিচার ক'রে ভুক্তি-মুক্তি হ'তে তফাৎ থাকেন। কৃত্রিম প্রণালী কোন কাজে লাগে না। ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা—পিশাচী, ডাইনীস্বরূপা। তা'রা কখনও জীবের মঙ্গল ক'র্‌তে পারে না। কিন্তু এরা কত অসৎ সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছে—জীবসমষ্টির কত অসুবিধা ক'রেছে! জাগতিক লোক ঐসকল সাহিত্যে তাঁ'দের প্রেয়োরুচির সমর্থন ও ইন্ধন পান ব'লে ঐসকল সাহিত্যেরই আদর ক'রে থাকেন। শুদ্ধভক্তি-সাহিত্য তাঁদের রুচিকর হয় না, তাই তাঁ'রা তা' বুঝ্‌তে পারেন না, এরূপ অভিযোগ করেন।

মনুষ্যজাতির সৃষ্ট পুঁথি বা বিদ্যা-বুদ্ধির উপদেশ ভাগবতের উপদেশ নয়। ভাগবতে একমাত্র পরম ধর্ম্মের কথা আলোচিত হ'য়েছে। তদ্দ্বারা অন্য কথা গুলির অপ্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারা যা'বে। অপস্বার্থপর লোকের কখনও পরম মুক্তি হ'তে পারে না। তা'তে

---

* প্রথমতঃ অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য (শ্রীগুরুদেবের নিকটে) নাম-শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা আছে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণের রূপশ্রবণের দ্বারা উক্ত অন্তঃকরণ রূপোদয়ের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শুদ্ধ অন্তঃকরণে রূপশ্রবণদ্বারা রূপ উদয় হইতে পারে। রূপ অন্তঃকরণে সম্যগ্‌রূপে উদিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের গুণসকল শ্রবণদ্বারা অন্তঃকরণে গুণগণের স্ফুর্ত্তি হয়। গুণ-স্ফুরণসম্পন্ন হইলে, শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিতে করিতে অন্তঃকরণে সেই বৈশিষ্ট্যের স্ফুর্ত্তি হয়। তদনন্তর নাম-রূপ-গুণ-পরিকরসকল সম্যগ্‌রূপে স্ফুরিত হইলে লীলাশ্রবণদ্বারা লীলাস্ফুরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। লীলাশ্রবণে শ্রীভাগবত-শ্রবণই শ্রেষ্ঠ।

অন্য অপস্বার্থপর লোক বাধা দেয়, দেবতারা বাধা দেন। দেবতাদের পদবী ও আসন সীমাবদ্ধ, সেজন্য তাঁ'দের আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

জল থেকে দই হয় না। ব্রহ্ম হ'য়ে যাওয়ার কল্পনা নাস্তিকতা ও আকাশকুসুমের স্বপ্ন। অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধি স্বপ্নসিদ্ধিমাত্র। জীব কখনও ব্রহ্ম হ'তে পারে না। জীব তজ্জাতীয় ব'লে পরব্রহ্মের সেবা ক'র্‌তে পারে, কখনও পরব্রহ্মের অসমোর্দ্ধ পদটী গ্রহণ ক'র্‌তে পারে না।

অনন্ত অণুচেতন অদ্বিতীয় পরম চেতনের সেবক। এক ব্যক্তিই সব, অন্যে কিছু নয়,—এরূপ বিচারদ্বারা অন্যলোকের অধিষ্ঠানের প্রতি আক্রমণ করা হয়, মুমুক্ষু ব্যক্তির নিত্যত্বে ব্যাঘাত জন্মান হয়। যেমন Semetic Idea (জড়ধারণা)—আগে মানুষ ছিল না, পরে ঈশ্বর কতকগুলি উপাদান দিয়ে মানুষ সৃষ্টি ক'র্‌লেন। ইহা ভ্রমপূর্ণ মতবাদ। ''জীবাত্মা সৃষ্ট হ'য়েছে''—এই যে বিচার-প্রণালী Semetic thought (জড় চিন্তাস্রোত) এর মধ্যে এসে পড়েছে, তা' চালনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে নির্ব্বিশেষবাদ পাওয়া যায়। আধ্যক্ষিকতা প্রবল হ'য়ে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষবাদের বিস্তার হয়। আবার তা' পরিত্যাগ করবার জন্য 'অনল্‌হক' বা নির্ব্বিশেষবাদ উপস্থিত হয়। এই সমুদয় বিপথ-প্রদর্শক মতবাদগুলিকে সুদার্শনিক বিচার উন্মুলিত ক'রেছেন। ইহাই ভাগবতের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা, কাম-ক্রোধের দাস যা'রা—অমুক্ত যা'রা তা'রা এ সকল কথা বুঝতে পার্‌বে না। সাধুগণ কোন মতবাদের পক্ষে ন'ন; তাঁ'রা নির্ম্মৎসর—তাঁ'রা সম্পূর্ণ নিষ্কপট ও নিরপেক্ষ। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব সুষ্ঠুভাবে প্রচার ক'রেছেন। যিনি যে পরিমাণে শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় পৌঁছতে পার্‌বেন; তিনি সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান্ হ'তে পার্‌বেন।

ভক্তি অন্ধবৃত্তি নহে। মনুষ্য যতটা বুদ্ধিমত্তার শেষ সীমায় আরোহণ ক'র্‌তে পারেন, ভক্তি-আশ্রয়কারীর তা' অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান্ হ'তে হ'বে। আমরা মনুষ্যজাতির সৃষ্ট কোন কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'ব না। ইহাই নিরপেক্ষতা। মনুষ্যজাতি, দেবতাজাতি বা কোন জাতি দেশ-বিদেশের কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে যাওয়াই—দোলো লোক হ'য়ে যাওয়া—অপেক্ষাযুক্ত হওয়া। নিজ নিজ মনের কল্পনা কিংবা মনোধর্ম্মের বিকারসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াও—মস্ত দোলো লোক হওয়া—অপেক্ষাযুক্ত হওয়া। আমরা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাদ্বারা প্রলুব্ধ হ'ব না। আমাদের শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে। আমরা শ্রুতির উপাসক। কর্ণবেধ ক'রে শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে। আচার্য্য কর্ণবেধ কর্‌বেন, আমরা সমিৎপাণি হ'য়ে আচার্য্যের নিকটে অভিগমন ক'র্‌ব।

আমাদিগকে বাস্তব বস্তু জান্‌তে হ'বে—শ্রবণ-প্রণালীর দ্বারা; নিজের অনূচান-মানিতার দ্বারা নহে, অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-চেষ্টার দ্বারা নহে, তা'তে বাস্তব বস্তু জানা যায় না। বাস্তব বস্তু কি? 'বাস্তব' কা'কে ব'লে? সশক্তিক বস্তুর নাম—বাস্তব বস্তু। সশক্তিক জিনিষ—বাস্তব। বস্তুকে জানা অর্থে—জ্ঞান। নিঃশক্তিকবাদের ঈশ্বর

(?)---নাস্তিকতা---part aud parcel of phenomena---পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ বা ভাব-বিশেষ। শিবদং---যে বস্তু মঙ্গল দান করে, কল্যাণকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণচরণ। আর concocted thoughts-এর pursuit (উদ্ভাবিত চিন্তাধারার অনুসরণ) অমঙ্গল। শিবদ বস্তুর অনুশীলন ক'র্‌লে মনুষ্যজাতির ভোগা-দেওয়া ধারণাগুলির অধীন হ'তে হ'বে না।

কৃষ্ণভক্তি বাস্তব বস্তু। ইহা ভাগবতের পরিসমাপ্তিতে বর্ণিত হ'য়েছে,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্।।[১] ※
(ভাঃ ১২/১২/৫৫)

আগে স্মৃতি ছিল, পরে বিস্মৃতি হ'য়েছে। জন্মান্তরবাদ, একজন্মবাদ—এরূপ কথা নহে। সত্ত্বের শুদ্ধি হয়। সত্ত্ব—existence, absolute position, তা'তে যে-সকল অসুবিধা প্রবেশ ক'রেছে, সেগুলো হ'তে ছুটী হয়ে যায়।

আত্মাই আত্মার সেবা কর্‌তে পারে। 'বৈরাগ্য'—কৃষ্ণস্মৃতি-বিরোধিনী কথা ত্যাগ। বিজ্ঞান যা গ্রহণ কর্‌তে হ'বে। চিকিৎসক-সম্প্রদায় স্থূলদেহের কথা বলেন; জ্ঞানিগণ সূক্ষ্মদেহের কথা বলেন। অনাত্মভক্তি—আমরা বিমুখ অবস্থান এখন যা কর্‌ছি অর্থাৎ খণ্ডবস্তুর সেবা। অখণ্ডবস্তুকে সেবা কর্‌লে সকল বস্তুরই যোগ্য পরিচর্য্যা হয়।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্য।।[২] *
(ভাঃ ৪/৩১/১৪)

জোড়া-তাড়া-দেওয়া জিনিষ বদল হ'য়ে যায়। civic things—secular things (অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা) অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা। পরমাত্ম-ভক্তিই একমাত্র আবশ্যক। speculative literature (মনকল্পিত সাহিত্য) এখন থাক; কারণ, সময় খুব অল্প। কৃষ্ণভক্তি সহজ cooked drink (পক্ক পানীয়)। (তা'তে) সঙ্গে

---

※ (১) কৃষ্ণপদারবিন্দ-যুগলস্মৃতি মানবগণের অশুভ-বিনাশ, চিত্তশুদ্ধি, শ্রীহরিভক্তি এবং বিজ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান ও মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে।

* (২) যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুভাবে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয় (মূল ব্যতীত পৃথক্-পৃথক্-ভাবে বিভিন্ন স্থানে জল সেচন করিলে তদ্রূপ হয় না), প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয় (কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক্-পৃথক্-ভাবে অন্নলেপনদ্বারা তদ্রূপ হয় না), তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা-দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে (তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ আরাধনার অপেক্ষা করে না)।

সঙ্গে এখনই শং অর্থাৎ মঙ্গল পাওয়া যাবে। মায়াতে অবরুদ্ধ হ'বে না। পরমার্থ ভক্তির মধ্যে সমস্ত অবস্থিত। হরিকীর্ত্তন সর্ব্বদা করা আবশ্যক--অনন্তকাল করা আবশ্যক---একমাত্র আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বাস্তব প্রত্যক্ষের কথা। ভোগোন্মুখি-ভাষার দ্বারা ব'ল্বার কথা নয়। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার-প্রণালীই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার-প্রণালী অন্য প্রণালী সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত প্রণালী নহে। জীবমাত্রেরই শ্রীচৈতন্যদেবের পদাশ্রয় ক'র্তে হ'বে। হরিকীর্ত্তন সর্ব্বদা করা দরকার। শ্রীচৈতন্য-বিহিত হরিকীর্ত্তনই নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধির একমাত্র পথ, পাথেয় ও পথসীমা। হরিকীর্ত্তনে সর্ব্বশক্তি নিহিত র'য়েছে--সর্ব্বপ্রয়োজন-শিরোমণি অনুস্যূত আছে।

শ্রীচৈতন্যদেব কোন জাতীয় নায়কবিশেষ ন'ন। মানুষ জাতির সহিত ঝগড়া বা দু'দিনের বন্ধুত্ব করা শ্রীচৈতন্য-চরণানুচরগণের চেষ্টা নয়।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।"

শ্রীচৈতন্যদেব ইচ্ছা করেছিলেন যে, জগতের সকলের মঙ্গল হ'য়ে যা'ক্। ইহাই একমাত্র সত্য যে, শ্রীচৈতন্যসাহিত্যের আলোচনা হ'লে সকলের মঙ্গল হ'বে; সেই পরিচয় আর কিছু নয়। আত্মধর্ম্মের স্বরূপে শুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তিই অবস্থিত। সুতরাং ইতর পরিচয় ব্যতীত আত্মস্বরূপে ভক্তিই প্রতিষ্ঠিত।

(৪)

ভগবানের সেবা যা'রা না করে, তা'দের বদ্ধাবস্থা। মুক্তগণের ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই। শব্দের দ্বারাই পূর্ণসেবা হয়। ইহজগতের সেবা জড়বস্তুর প্রতি হ'য়ে যায়। অবিমিশ্রভাবে ভগবৎসেবা একমাত্র কীর্ত্তনের দ্বারা হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষ্ণকীর্ত্তন অর্থাৎ শ্রীশিক্ষাষ্টকে শিক্ষালাভ এবং শিক্ষাপ্রদান ব্যাপার একমাত্র আবশ্যক। প্রার্থনাও কীর্ত্তন। দূরস্থিত বস্তুকে কিছু বল্‌তে হ'লেই কীর্ত্তন কর্‌তে হয়। বস্তুকে নিকটে পেলে মন্ত্র individual sound (ব্যক্তিগতশব্দ) কৃষ্ণের কথা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কীর্ত্তিত হ'য়ে আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। যখন সেই কীর্ত্তন উপস্থিত হয়, তখন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করবার বিচার থাকে না। ভোগিত্ব কর্ত্তৃত্বের অভিমান উল্টে গিয়ে 'আমি দাস' এই বিচার প্রবল হয়। সেটাই—স্বাস্থ্য। বর্ত্তমানে আমাদের আময়যুক্ত অবস্থা। বর্ত্তমানের ইন্দ্রিয়ব্যাপার তাঁ'র কাছে যাচ্ছে না, মাঝখানে আটক করে দিয়েছে--গুণজাত পদার্থ আটক ক'রেছে। যা' আগে ছিল না, পরে উপস্থিত হ'য়েছে। যেমন সোডা ও এসিড্। কর্ত্তৃত্বটা অনুস্যূত ভাবে ছিল, দু'টো জিনিষ একত্র হওয়ায় ক্রিয়া আরম্ভ হ'ল। এটা ভগবানের গৌণ-ক্রিয়া।

ভগবানের মুখ্য ক্রিয়া—অন্তরঙ্গ-শক্তি-পরিণত জগতে। সেখানে নিত্যত্ব, পূর্ণত্ব এবং সদানন্দত্ব আছে। এ জগতে তা'র বৈপরীত্য দেখা যায়, প্রতিফলিত ভাবমাত্র।

এখানকার 'সত্য'—তাৎকালিক, সরে যায়, ধ্বংস হ'য়ে যায়, নিত্য নয়—খণ্ডকালের মধ্যে খানিকক্ষণ প্রকাশমান হয়, রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের ন্যায়। জড়জগতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থ কিছুক্ষণের জন্য। তা'তে আমাদের কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করার শক্তি কিছুদিনের জন্য হয়। শক্তি ক্রমে কমে যায় জোয়ার ভাটার মতন। বিদেশী (foreign) জিনিষ অভ্যাগতের মতন আসে আবার চলে যায়। ইহাই এই জগতের অবস্থা। আমরা এখানে—এই জড়জগতে আসি—ভোগীর পোষাকে নায়ক সজ্জায় আসি। আমাদের part কার্য্য বলাবলি হ'য়ে গেলে বাড়ী চলে যাই। এখানে আমাদের নিত্যাবস্থান নয়। জড়—পরিবর্ত্তনশীল। চেতনের পরিবর্ত্তন নাই। চেতনে ক্ষুব্ধ হয় না—ধ্বংস হয় না—বিকৃত বা বিপর্য্যস্ত হয় না। জড়ের পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম আছে ব'লে এর একটা নশ্বরভাবে, আগন্তুকভাবে progressive face ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ভঙ্গী আছে।

জীব—অজ। মনকে যদি 'জীব' বলা যায়, তা' হ'লে তা'তে অজত্ব আরোপ করা যায় না। মনোধর্ম্মিগণ বলেন,—মন মধ্যখানে আছে অচিদ্ গ্রহণের জন্য। সঙ্কল্প বিকল্পের দ্বারা অচিদ্-গ্রহণ সম্পাদিত হয়। মনকে আত্মার সহিত এক করা যায় না। মন সর্ব্বদা বহির্জ্জগতে বিচরণশীল। মন চেতনধর্ম্মের পরিচয়ে অবস্থিত। মন বহির্জগতের স্থূলবস্তু গ্রহণ ক'র্তে পারে, abstraction প্রতিবিরোধ বিচার ক'র্তে পারে—নিত্যবস্তু ঈশ্বরের সংবাদ রাখ্তে পারে না। নিত্যত্বের সংবাদ রাখে না, জ্ঞানময় হ'তে পারে না। এ সবই আত্মার ধর্ম্ম। যে স্থলে অধিষ্ঠান স্থায়ী নয়, সে স্থলে অভিনয়ের পোষাক পরে থাকামাত্র বল্তে হ'বে। লোকে যে ঘরে থাকে, সে ঘরটাকে 'লোক' বলা যায় না। লোক চ'লে গেলে ঘরটা প'ড়ে থাকে।

'শরীর' এবং 'আমি' এক নই। আমার স্থূলশরীর, আমার সূক্ষ্ম শরীর। 'আমি' আমার সহিত এক নই। সম্বন্ধযুক্ত হ'য়েছে মাত্র, কিন্তু identical অভিন্ন নয়। একজন--property (স্বত্ব), আর একজন—proprietor (স্বত্বাধিকারী), যখন analytical view (বিশ্লেষণমূলক ধারণা) নিতে পারি না তখন identical (অনন্য বা একই) ভাবি।

শরীর থেকে চেতনের উদ্ভব হয়, ইত্যাদি মত সকল নাস্তিকতা। দেহটা আমি নই, 'কাল' একটা স্বতন্ত্র জিনিষ,—'কাল' 'আমি' নই। যেখানে সম্বন্ধ, ষষ্ঠী প্রয়োগ, সেখানে পাত্র যদি দেহের সহিত নিজেকে 'এক' মনে করে, তা' হ'লে ভুল হ'ল। দেহী দেহ পরিত্যাগ করে,—শরীর পড়ে থাকে। মন—subtle body বা সূক্ষ্মশরীর dim reflection of animation (চেতনতার অস্পষ্ট প্রতিফলন)—চেতনের আভাস

meddling* with the world জড়জগতের সহিত চলাফেরা ক'র্ছে—কিন্তু স্বতন্ত্র। সে জিনিষটার মালিকের সঙ্গে পার্থক্য আছে। চেতন বা জীব—সূক্ষ্ম শরীরের মালিক, স্থূল শরীরের মালিক। জীব যেহেতু বিভিন্নাংশ, সেই জন্যই ভগবানের আর একটা শক্তি তা'কে পরাভূত ক'র্তে পারে। জীবশক্তি বদ্ধাবস্থায় নীত হ'বার যোগ্য। জীব এদেশে এল কেন? সে যখন অন্তর্জ্জগতের কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন বহির্জগৎ হ'তে পৃথক্ হতে পারে, বহির্জগৎকে সম্পূর্ণ তাড়িয়ে দিতে পারে। 'জীব তটস্থাশক্তি'। তটস্থ-ভাবটী জ্যামিতির রেখার মত জিনিষ। স্থূলভাবে দেখাতে গেলে প্রত্যক্ষবাদীর দর্শনীয় পদার্থের মধ্যে এসে যায়। চেতনের রাজ্যে দেখাতে গেলে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণহীন। এখন এইগুলি তাকে গ্রাস ক'রেছে। যখন আমাদিগকে মায়িক জগতের অন্তর্গত মনে করি, তখন আমাদের জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতি বিচার করি, কিন্তু তটস্থাশক্তি--নিত্যা, মায়ার সৃষ্ট পদার্থ নয়। কোন কোন ধর্ম্মমতে জীবের সৃষ্ট হওয়ার কথা আছে। কিন্তু কোন্ সময় সৃষ্ট হল? Semetic thought (ইহুদীগের ধারণা অনুসারে) আদম হবা সৃষ্ট হ'ল, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে এখানে এল, আখেরের দিনে বিচার হ'বে। অপর পক্ষীয়গণ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন। তাঁ'রা স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের বিচার বুঝ্তে পারেন। কেহ কেহ বলেন, সূক্ষ্ম শরীর ভগবানের সহিত এক হ'য়ে যায়। ঐ সমস্তই অজ্ঞান-প্রসূত বিচার—ভালরূপে ব্যাখ্যাত হয় না—বাধাযুক্ত হ'য়ে পড়ে। এই সমুদয় বিচার সুষ্ঠুতা লাভ ক'রেছে—শ্রীচৈতন্যদেবের কথায়। যাঁ'রা শ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলনামূলক অধ্যয়ন করেন, তাঁ'রা ইহা বুঝেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্যে সকলকথা সুমীমাংসিত হ'য়েছে।

দাহিকা শক্তির সহিত যেমন অগ্নির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, জীবের সহিত ভগবানের সেরূপ সম্বন্ধ। ভেদ-বুদ্ধি করার প্রয়োজন হয় না—অথচ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায়।

জীব ভোগী বা ত্যাগী হ'য়ে উঠেছে। এটা ব্যারাম—জীব তখন রোগী। তা'র মুখটাকে কৃষ্ণের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার নাম চিকিৎসা। ইন্দ্রিয়ের শক্তি unassorted (প্রতিহত বা বাধাপ্রাপ্ত) হ'য়ে অন্ধকারের দিকে ফিরেছে। আলোর দিকে ফিরিয়ে দিলে completely dove-tailed (সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত) হ'য়ে unity-র (ঐক্যের) বাধা দিবে না।

আমিত্ব-জ্ঞান তদীয়ের অতিরিক্ত নয়। তদতিরিক্ত হ'লে মনে হ'বে,—ঈশ্বরই ত' আমি ! হিরণ্যকশিপুর ন্যায় কনক-কামিনী-ভোগের স্পৃহা প্রশমিত হয় না। দেহ, ঘর, দেশ—আমার সঙ্গে incorporate (অংশভূত বা অনুস্যূত) ক'রে নেবার ক্ষমতা এসে পড়েছে। এ মতলবগুলো পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহাদের ingress (প্রবেশ) ও egress (বহির্গমন) সম্বন্ধেও অনেক বিচার আছে।

*meddle—অনধিকার চর্চ্চা।

পরিবর্ত্তনীয় অবস্থাই কি আমি? Bliss (পরমসুখ) বিরুদ্ধভাব আমাকে আচ্ছন্ন ক'র্‌বে না, এরূপ নয়। আমি অন্তরঙ্গা শক্তির পরিণামের factor (উৎপাদক বা কারণ) নই। এখন বহিরঙ্গা শক্তিপরিণতির factor ব'লে অভিমানগ্রস্ত হ'য়েছি। আমি অভেদ-প্রকাশ, না ভেদ-প্রকাশ-দ্যোতক ? অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবিচ্ছিন্নতা আছে—যা' আমাদের নাই। আমরা তটস্থা শক্তিপরিণতির factor (উৎপাদক বা কারণ)। external (বাহ্য) কিংবা astral body-কে (সূক্ষ্মশরীরকে) জীব ব'লে ভুল ক'র্‌তে হ'বে না। সেরূপ বিচার ক'র্‌লে হয় 'ভোগী', না হয় 'ত্যাগী' হ'য়ে যেতে হ'বে। এ দু'য়ের জ্ঞান বিভিন্ন। তা'দের মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌লে "আমি কে" বুঝ্‌তে পার্‌ব না। আমার স্বরূপ তটস্থ। এখনকার প্রতীতি হ'তে মুক্ত হওয়া দরকার। তা' হ'লে উৎক্রান্ত দশায় আর এখানে আস্‌তে হ'বে না—পরাগতি লাভ ক'র্‌ব।' তখন কৃষ্ণকে কিরূপ সেবা ক'র্‌তে হয়, জান্‌তে পার্‌ব।

সেবা—পাঁচ রকমের। গৌরসুন্দর যে সেবার কথা ব'লেছেন, সে সেবা সর্ব্বোত্তম। যে ঔষধ-দ্বারা বর্ত্তমান ব্যাধি আরোগ্য-হ'য়ে সেবা-বৃত্তির উদয় হয়, গৌর-বিহিত কীর্ত্তনের মধ্যে সে ঔষধটা আছে। এই ঔষধ গ্রহণ করা সকলের কর্ত্তব্য। তা' হ'লেই শান্ত হ'তে পার্‌ব—মনের শান্তি—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়ার শান্তি হ'বে।

সেবা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর—এই পাঁচ প্রকার রসে হয়। সেবা ভুলে এখানে আমরা প্রভু হ'য়ে গেছি। কৃষ্ণ (!) হ'বার ইচ্ছা হয়েছিল, এই জগৎ তা'র সুযোগ দিয়েছে। এই জগৎ সেইজন্য সাজানো রয়েছে। ইহা স্বরূপের ধর্ম্ম নয়। "খোলসের সাজানো আমি" কে দেখে আমি মনে করি—"আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ" ইত্যাদি। এ অবস্থা নিত্য নয়। আমরা এইরূপে অশান্তির জগতে আছি। সেবাময় অবস্থাই—শান্তি। যখনই আমি একথা হৃদয়ের সহিত জান্‌তে পার্‌ব, তখনই আমার বহুরূপিণী সাজানো অবস্থায় আমিত্বের আরোপ ক'র্‌ব না।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বৎসল্য ও মাধুর্য্যপর সেবাময় আমিত্বের কথা শ্রবণের সৌভাগ্য যদি আমাদের কখনও হয়, তা' হলে কালের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রে হিংসিত হ'বার অবস্থা হ'তে শান্তি প্রাপ্ত হ'ব। মনোধর্ম্মী হ'লে তা হ'বে না। অন্ধকারে ভ্রমণ মাত্র হবে। আলোকে পা বাড়ান হ'বে না।

মনকে অনুস্যূত (incorporate) ক'রে রেখেছে যে জিনিষটা, সেটা 'জীব' নয়। সাময়িক ঔপাধিক আবরণ-দ্বয় যাঁ'র তাঁ'র কথা অর্থাৎ আত্মার কথা আলোচনা করা আবশ্যক। স্বরূপ, স্বগুণ, স্বক্রিয়া আলোচনা কর্‌লে জান্‌ব,—আমরা বৈষ্ণব। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষাপ্রদান ক'রে 'স্বরূপের' কথা জানিয়ে দেন, 'স্বনাম' প্রকাশ ক'রে দেন, স্বগুণ ও স্বক্রিয়া শ্রীগুরুসেবা ফলেই প্রকাশিত হয়।

অন্য দেবতা বিষ্ণুর আবৃত দর্শন। ব্রাহ্মণের নিত্য আচমনের বা অর্চ্চনের মন্ত্র—"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।"[১] নিত্য ভজনের মন্ত্র—"ওঁ আহস্য জানপ্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ওঁ তৎ সৎ।।"[২]

আমাদের নিত্য আরাধ্য বস্তু—সকলের রক্ষক ও পালক—গোপ। শান্তসেবক—গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, কালিন্দী, কালিন্দী-তট, কদম্ব ইত্যাদি; দাস্য-সেবক—রক্তক, পত্রক, চিত্রক ইত্যাদিকে আকর্ষণ করেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ অচেতনকে repel (নিবৃত্ত) করেন। যে জীব foreign (বিজাতীয়) জিনিষ incorporate (অনুস্যূত) কর্‌তে ব্যস্ত আছেন, তাঁকে কৃষ্ণ আকর্ষণ করেন না। তাঁ'র আবৃত দর্শন হয়। যখন আকর্ষণ করেন, তখন দিব্যজ্ঞান হয়। জান্‌তে পারি, এখন সাজাসাজিতে দিন কাটাচ্ছি, নিজের প্রয়োজনীয় কথা বিচার কর্‌ছি না। জন্ম-জন্মান্তর এই রকম কর্‌ছি।

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্ন্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বমায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্মদাস্যে।।[৩]

নশ্বর relativity-র (আপেক্ষিকতার) মধ্যে দিন যাপন ক'র্‌লাম। আমার কৃত

---

(১) আকাশে অবাধে সূর্য্যালোক লাভে চক্ষুঃ যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ তেমন পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রম প্রমাদাদি দোষবর্জ্জিত ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে পরমপদ, তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ (প্রচার) করেন।

(২) হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশ-রূপ সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তবেই আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণব-ব্যঞ্জিত পদার্থ "সৎ" অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ; অতএব ভয় ও দ্বেষাদি-স্থলেও শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়া তাদৃশ অবস্থায় নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তিলাভ হইবে; কারণ "সাঙ্কেত্য" ইত্যাদি স্থলে নামোচ্চারণের (নামাভাসের) মুক্তিদত্ব শ্রুত হওয়া যায়।

(৩) হে ভগবান্, আমি কামাদিরিপুগণের কত প্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না; লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হইল না; হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইয়াছি, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

কাম-প্রভু, ক্রোধ-প্রভু, লোভ-প্রভু, মদ-প্রভু, মোহ-প্রভু, মাৎসর্য্য-প্রভুর সন্তোষের জন্য কতই তাণ্ডব নৃত্য না ক'রেছি! রিপুকে 'প্রভু' মনে ক'রেছিলাম! মৎসরতা ধর্ম্ম ত' আমার হাড়মাসে মজ্জাগত হ'য়ে র'য়েছে। লোকে কেন দু'বেলা খেতে পাবে? সব সুবিধা আমার একার হ'বে। এখন বুঝতে পেরেছি, ওদের চাকরী করে কোনো সুবিধা হ'বে না। কৃষ্ণের পাঁচরকম নিত্য চাকরদের কাছে শিক্ষানবিশী যদি ক'র্‌তে পারি, তা' হ'লে এ জন্মে কিংবা পরজন্মে সুবিধা হ'বে। নিজেকে মন বিবেচনা করায় জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে ঘুর্‌লাম। ওসব ক'র্‌বার আর সময় নাই। সমস্তগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত হ'ব। এখন আমার বুদ্ধি ঠিক হ'য়েছে—ব্রহ্মগায়ত্রী জপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমাকে তোমার একটা চাকরীতে নিযুক্ত কর।

মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় সাধনভক্তি উপস্থিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি সবই উপাদেয়ভাবে কৃষ্ণে আছে। কৃষ্ণের সেবায় সব বৃত্তিগুলি dove-tailed হ'য়ে যা'বে।

'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে,　　　　'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে,　　　　'মদ' কৃষ্ণগুণ-গানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা।।

দিক্‌টা—লক্ষ্যটা পরিবর্ত্তন করা দরকার। গৃহস্থ থেকে সত্য কথায় একটুকু মন দিলে ওসব ইতর কার্য্যে আর প্রবৃত্তি হবে না। তখন হরিসেবা ব্যতীত আর কিছু কর্‌ব না। আর কোন জিনিষ দিয়ে ঢেকে রেখে তাঁর মুখোস দেখ্‌তে যা'ব না। তা'র নিজের রূপ দেখ্‌ব—শ্যামসুন্দর-রূপ দর্শন ক'র্‌ব। সে বিচারে পৌঁছান কার্য্যটি চৈতন্যদেবের অতুলনীয়া দয়ার দ্বারাই এত সুলভ হ'য়েছে। সুতরাং মানুষ যদি তা' না শুনে, তা' হ'লে তা'কে জন্ম-জন্মান্তর ক্লেশভোগ ক'র্‌তে হ'বে। চৈতন্যদেবের একজন দাস ব'লেছেন,—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।।"

আপনাদের সকলের দু'টি পায়ে ধ'রে বল্‌ছি। আপনাদিগকে অসাধু বিবেচনা ক'র্‌ছি না। আপনারা সাধু; সুতরাং আমাকে ভিক্ষা দিবেন। আপনারা বহির্জ্জগতের বড় লোক, একথা ভুলে' যা'ন। সব ছেড়ে দিয়ে আপনাদের আসক্তি—সহযোগ চৈতন্যচন্দ্রের চরণে হোক্—একটুকু হোক্। একটুকু হ'লেই আপনারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পার্‌বেন যে, চৈতন্যদেবের কথার মধ্যে কোন অসুবিধার কথা নাই। সে কথা যাঁর কাণে সত্যি

সত্যি যাঁ'বে, তিনিই কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রে দেবেন। আমার ভাইসকল, এমনভাবে অমঙ্গলের পথে কেন যাচ্ছেন? অন্য কথায় কি প্রয়োজন? সব সময়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বতোভাবে মুকুন্দের সেবা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিদ্বারা সেবা করা কর্ত্তব্য। পরম-মুক্ত মহাপুরুষগণের কৃষ্ণ-কথা বলা ছাড়া অন্য কৃত্য নাই।

"যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিয়োজয়েৎ।"[১]

আকর বস্তুকে ছেড়ে দিয়ে মাঝখানে যে সব দর্শন হ'চ্ছে, সেগুলোকে ছেড়ে' দেওয়া আবশ্যক। কেউ মনে ক'র্‌বেন না যে, এত বড় কথায় আমার অধিকার নাই। এ সব দৃষ্ট বস্তু থাক্‌বে না। যা' থাক্‌বে, তা'র জন্য একটুকু চেষ্টা করা উচিত।

বর্ত্তমানে আত্মা মনকে সব ভার দিয়ে রেখে ঘুমুচ্ছেন। একটুকু ঘুমভাঙ্গা দরকার। তিনি মনকে ভার দিয়ে ভাবছেন (?) বড় শান্তিতে আছেন! কিন্তু মন তা'র মস্ত অশান্তি করিয়ে দেবে। মনকে অধীন রাখা দরকার।

আমরা যেরূপ অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁকে ভুলে থাক্‌লেই সব অমঙ্গল।

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।"[২]

তপস্বী, কর্ম্মকাণ্ডীদিগের যে ব্যাপার উপস্থিত হ'য়েছে, তদ্দ্বারা কি লাভ হ'চ্ছে? যদি হরিকেই ছেড়ে' দেওয়া যায়, তা' হ'লে ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ ক'রে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয়। এত কৃচ্ছ্রতা ক'রে কি হবে? বুনো মহিষ চরিয়ে লাভ কি? এত কষ্টের ফলে হয় ত' একদিন 'নোটিশ পাওয়া যাবে—তোমার যা' কিছু আছে, এক মুহূর্ত্তেই সব ছেড়ে' যেতে হবে। সে সমস্তই পরের আয়ত্ত; আমরা অত্যন্ত অধীন। সে অবস্থায় কতই সঙ্কল্প কর্‌ছি। কিন্তু সেগুলো ঘুরে' ফিরে' সেই এক কথাতেই দাঁড়াচ্ছে। তা'তে কিছু সুবিধা হ'বার যো নেই। মনুষ্য জন্ম পেয়েছি—বোকামী কর্‌বার জন্য নয়—সয়তানী কর্‌বার জন্যও নয়। মনুষ্য জন্মের normal condition (স্বাভাবিক অবস্থা)—ভগবানের সেবা করা।

---

(১) যে কোন উপায়ে হউক, মনকে কৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত করিতে হইবে।

(২) যদি (তপস্যা ব্যতিরেকে) হরি আরাধিত হন, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি? যদি তপস্যা দ্বারা হরি আরাধিত না হন তাহা হইলে সেই তপস্যার প্রয়োজন কি? যদি (তপস্যা ব্যতিরেকে) অন্তরে ও বাহিরে হরি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি? তপস্যা দ্বারা যদি অন্তরে ও বাহিরে হরি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত না হন তাহা হইলে সেই তপস্যার প্রয়োজন কি?

''কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার।।

কৃষ্ণ অচেতন পদার্থ ন'ন—chaotic agent (অব্যক্ত পদার্থ) ন'ন; তাঁ'র personality (ব্যক্তিত্ব) নাই, এরূপ ন'ন। তিনি personal, (ব্যক্তিত্বসম্পন্ন) তিনি Absolute (বাস্তববস্তু), তিনি Harmony (ঐক্য)। জীব সেই বস্তুর part and parcel (অপরিহার্য্য অংশ) জীবসমষ্টির প্রভু-সূত্রে তাঁ'র অধিষ্ঠানের কোন ব্যাঘাত হয় না। এই কাঠামোয় বিশ পঞ্চাশ বছরের স্মৃতি বেশ চ'লে আস্‌ছে—জন্মান্তরের সংস্কার রুচিরূপে চ'লে আস্‌ছে—জাতিস্মর নই ব'লে বুঝতে পারি না। সংস্কার দ্বারা অবস্থা-ভেদ হচ্ছে—ইহাই শাক্যসিংহের কর্ম্মভূমিকা। এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির বিচারে আবদ্ধ থাক্‌লে আমাদের মঙ্গল হবে না—কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌লেই সকল সুবিধা হবে।

প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-গোস্বামীকে দশদিন ধ'রে কৃষ্ণের কথা ব'লেছিলেন,—

''ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।।
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন।।
উপজিয়া বাড়ে লতা, ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মালোক ভেদি' পরব্যোম পায়।।
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।।''

কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তি জীবের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল-নিদান। কৃষ্ণের পদ—পূর্ণ কৃষ্ণ, পরিপূর্ণ-রস-পরাকাষ্ঠার কল্পবৃক্ষ।

বাহিরের ব্রহ্মাণ্ড—এই জগৎ ততদূর, যতদূর পর্য্যন্ত মানবের ধারণা, প্রাণীর ধারণা যায়; —যেমন ডিম্বের ভিতরের দিক্‌টা বাহিরের কথা নয়। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টির চারিদিকে যেন একটা প্রাচীর দেওয়া আছে। ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দশটী স্তর আছে।

যাঁ'রা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঢুকে প'ড়েছেন, তাঁ'রা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন—এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে সংগৃহীত জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন। চৌদ্দটি স্তর যথা—ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য; অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। নীচে ৭টা, মাঝে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং ঊর্দ্ধে ৫টা লোক। আমরা এই চতুর্দ্দশ ভুবনে যাতায়াত করি। সত্য, জন, মহঃ তপঃ ও স্বর্গ—এই ৫টী লোকে সূক্ষ্ম শরীরী থাকে। অন্যান্য ভুবনে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর-

মিশ্রিত প্রাণীদিগের বাস। পাঁচটি ঊর্দ্ধলোকে এবং অন্তরীক্ষের কিয়দংশে সূক্ষ্ম ব্যাপারসমূহ অবস্থিত। ভূলোকে স্থূলব্যাপার। এই চতুর্দ্দশ ভুবনই ব্রহ্মাণ্ড। আমরা যখন স্থূলটাকে ছেড়ে দিই'—নির্ম্মলতা লাভ করি, তখন ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করি। যখন স্থূলপ্রার্থী হই, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম-জড়িত অবস্থায় এই সব লোকে বাস করি।

'আমি'র উপরের আবরণ সূক্ষ্মশরীর—অন্তঃকরণ স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে রূপরস ইত্যাদি গ্রহণ করে। বিভিন্ন লোকে আমাদের গতি হয়। ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ।

কাহার ভ্রমণ হয়? জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ীয় শরীরসহ অবস্থান-কালে এইরূপ ভ্রাম্যমান্ হন, উহাই 'ভবঘুরে' অবস্থা—যাতায়াত—নাগরদোলায় উঠানামার মত কখনও সৎকর্ম্ম-বশে ঊর্দ্ধলোকে গমন, কখনও অসৎ-কর্ম্মফলে নিম্নলোকে আগমন। ঊর্দ্ধলোকে উঠ্‌লেই নিম্নলোকে আসতে হ'বে, নিম্নলোক হ'তে আবার ঊর্দ্ধলোকে উঠ্‌তে হ'বে—পুনরায় নিম্নলোকে আসার জন্য। পুণ্য ক'র্‌লেই পাপ ক'র্‌বার প্রবৃত্তি হ'বে, পাপ ক'র্‌লেই পুনরায় পুণ্য ক'র্‌বার জন্য প্রবৃত্তি হ'বে—এইরূপ ঘুরপাক। যখন আমরা সন্ন্যাসী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী হই, তখন, সত্য, জন, তপঃ ইত্যাদি লোকে বাস করি; সদাচারী গৃহস্থ স্বর্গে গমন করেন।

জীবাত্মা সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হওয়ার পর কখনও স্থূল আবরণদ্বারা নিম্নলোকে আসেন। আবার তপস্যাদি প্রভাবে স্থূল দেহ ত্যাগ ক'রে সূক্ষ্ম দেহে পুনরায় ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন। আমরা ইহলোকে অবস্থানকালেও চিন্তাদ্বারা ঊর্দ্ধলোকে গমন ক'র্‌তে পারি। কিন্তু গীতা তা' ক'র্‌তে নিষেধ ক'রেছেন,—

> "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
> ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে।।*

তা'তে মনুষ্যের অমঙ্গল ঘটে। বহির্জ্জগতের স্থূল ও স্থূল হ'তে সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করায় অমঙ্গল ঘটে।

একমাত্র ভগবদুপাসনা আবশ্যক। ভগবান্ স্থূল সূক্ষ্মের অতীত। কিছুতে তাঁ'র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্বের বাধা দিতে পারে না। তাঁ'র সেবাদ্বারা সেবকযোগ্য তদনুরূপ অবস্থা লাভ হয়।

এই চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণের আমাদের যোগ্যতা আছে। এই ভুবনে নানা যোনিতে ভ্রমণের যোগ্যতাও আছে। যে-যে খোলসে যে-যে ভুবনে বাস করা যায়, বাসনা পরিপূরণের উপযোগী তদনুরূপ বাহ্য আবরণও লাভ হয়। বাসনানির্ম্মুক্ত হওয়ার অনেক

---

* যে ব্যক্তি হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়াও বিষয়সমূহকে মনে মনে স্মরণ করে, সেই মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি 'মিথ্যাচারী' বলিয়া কথিত হয়।

কৃত্রিম পন্থা কল্পিত হ'য়েছে। সেই সমুদয় পন্থার বিস্তারিত বিবরণাদিও লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হ'লে জীব ভাগ্যবন্ হন। কালক্ষোভ্য অবস্থা অবলম্বনে জীবসকল ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ করেন। দেবতাই হউন, মনুষ্যই হউন—এই যাবতীয় অবস্থা বস্তুতঃ হেয় ও নশ্বর।

গুরুর অনুগ্রহবশে আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হ'লে অস্মিতায় ভক্তিবীজ লভ্য হয়। গুরুর কৃপা আর কৃষ্ণের কৃপা আলাদা আলাদা নয়। একজন কৃপা ক'রছেন, আর একজন বঞ্চনা ক'রে কৃপা গ্রহণ ক'র্‌ছেন না—এরূপ নয়। প্রসাদ—যা' প্রকৃষ্টরূপে আনন্দিত হ'য়ে প্রদত্ত হয়, সেই অনুগ্রহ। আমাদের ব্যবহারোপযোগী যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, সেই অনুগ্রহ পাই। কি পাই? ভৃত্য হ'য়ে প্রভুকে সেবা করা—'ভক্তি'। পরে সেবা-কার্য্যে মতি-গতি হ'বে, তা'র বীজ ভক্তি বা সেবালতার বীজ।

জ্ঞান-কর্ম্মবৃক্ষের বীজও নানা রকমের আছে। উহারাও বিস্তারশীল। সদ্‌গুরু বা কৃষ্ণের কৃপাবঞ্চিত ব্যক্তির ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ বা আত্মবিনাশের জন্য ঐ সকল আপাতপ্রেয়ঃ বিষ-বৃক্ষের বীজ লাভ হয়। কর্ম্মের ভোগ-প্রবৃত্তি ও জ্ঞানের ত্যাগ-প্রবৃত্তিতে নিজের সুখ-তাৎপর্য্য আছে; কিন্তু সেবাবৃত্তি নাই।

''আমি সেবক, আমার সেবন-ধর্ম্ম''—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ''মালী হওয়া''। মালী যেমন বৃক্ষের সেবা করে—বীজ থেকে আরম্ভ ক'রে গাছ বড় হওয়া পর্যন্ত—তা'র পরেও ফল-বিতরণ, ফলাস্বাদন মালীর কার্য্য, তদ্রূপ যিনি সেবন-ধর্ম্মের মালী হ'ন, তিনি বৃক্ষের বীজ লাভ করার সময় থেকে শ্রবণ-কীর্ত্তন জল-সেচন ক'র্‌তে থাকেন, সযত্নে অঙ্কুরকে রক্ষা করেন, বৃক্ষ বড় হ'লেও সেচন কার্য্য পরিত্যাগ করেন না—সেবন-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না—ফলাস্বাদন, ফলবিতরণরূপে সেবন-কার্য কর্‌তে থাকেন—নিত্যশ্রবণ কীর্ত্তন করেন।

আমরা কি সেবা ক'র্‌ব? ভক্তিলতার বীজ—যা' গুরুর নিকট হ'তে প্রাপ্ত হ'লাম—যা' কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপাবশতঃ নিজে সেবক-গুরুরূপে কৃষ্ণই প্রদান ক'রলেন, সেই বীজ পেয়ে আমিও কৃষ্ণ-সেবাই ক'র্‌ব। ভক্তিলতার বীজ-লাভ গুরুর আদর্শ-সেবকের সেবা দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ আমার হয়, যদি নিষ্কপটে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় করি। শ্রীগুরুপাদপদ্মে তখন আমার বিশ্রম্ভ সেবাবৃত্তির উদয় হয়।

কৃষ্ণসেবাবৃত্তি বিভিন্ন প্রণালীতে উদিত হয়—ভক্তপ্রসাদজ, কৃষ্ণপ্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ। তাঁহার ভক্তকে সেবা ক'র্‌বার জন্য ভগবান্ নিজ প্রেষ্ঠের দ্বারা সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি-বিশেষকে সেবার অধিকার দিবেন। যদি গুরু বলেন,—আমি সেবা গ্রহণ ক'র্‌ব না, তা' হ'লে শিষ্যের সেবা লাভ হ'বে না। গুরু বলেন,—যে জিনিষটির আমি সেবা ক'র্‌ছি, তুমি সেই জিনিষটির সেবা কর। ভোগী-ত্যাগী হ'য়ে তা হ'তে তফাৎ হ'য়ো না। সেই সুযোগ আমি তোমাকে দোবো।

"ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।"

ভগবানের সেবার উপকরণ আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হ'লে সেই উপকরণের সেবা, উপকরণদ্বারা সেবা সম্ভব হয়। যাঁ'র নিকট হ'তে সেবা শিক্ষা করি, তিনি যে-রকম সেবা ক'র্‌ছেন, সেইরূপ ক'র্‌লে সেবা হয়। তাঁ'র ফুলগুলো যদি তুলে এনে দি, সর্ব্বতোভাবে তাঁ'কে সাহায্য করি, তা হ'লে আমিও সেবক শ্রেণীর মধ্যে এসে গেলাম। তখন আমার গুরুদেব ও তাঁ'র বন্ধু সাধুগণ আমার সেব্য, এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কীর্ত্তন শ্রবণ ক'র্‌লে তাঁ'র শত করা শত পরিমাণ অপ্রতিহত সেবাধর্ম্ম যদি সুষ্ঠুভাবে দেখ্‌বার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাই, তা' হ'লে আমরাও সেবা ক'র্‌তে পারি। গুরুপাদপদ্ম ও তাঁ'র বন্ধুবর্গ বহির্জ্জগতের বস্তু ন'ন। আমি মূর্খ, যে ভাষায় বল্লে আমার মূর্খতা যায়, তাঁ'রা সেই ভাষার ব'লে আমার মূর্খতা অপনোদনের যত্ন করেন—আমাদিগের অন্তরে সাধুবৃত্তির সঞ্চার করেন। সাধুগণের বৃত্তি battery-র action-এর (ব্যাটারির কার্য্যের) মতন। উহা অসদ্‌বস্তুকে repel (প্রতিরোধ) ও সদ্‌বস্তুকে attract (আকর্ষণ) করে। সাধুদিগের সঙ্গদ্বারা সাধুবৃত্তি লাভ হয়। অসদ্‌বস্তু ত্যাগ ও সদ্‌বস্তু গ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্য পরামর্শ প্রদান করেন না। যাঁ'রা অসাধু, তাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ অন্যান্য পরামর্শ প্রদান করেন—অন্যান্য কথাবার্ত্তা বলেন। সাধুর মুখে যখন অসদ্‌বস্তু ত্যাগ ও সদ্‌বস্তু গ্রহণের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়, তখন তা'র তাৎপর্য্য অনুসন্ধান ক'র্‌তে হয়। সাধু-গুরু পৃথিবীতে সাজান আছে। সেবাপথে কিছুদূর অগ্রসর হ'লে তা' বুঝ্‌তে পারা যায়। তৎপূর্ব্বে অসাধুসঙ্গ হ'য়ে যায়। তদ্দ্বারা আমার ভজনে ব্যাঘাত হয়,—

"জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা।।"

গাধা যেমন জিনিষ ব'য়ে মরে, কুবিষয়ের পিপাসায়ও জগতের লোক তেমন গাধার মতন সংসারের বোঝা বহন করে, কখনও বৃথা ত্যাগ-তপস্যা করে। ঐরূপ কৃষ্ণভজনহীন ত্যাগ-তপস্যাও—গাধার মতন বোঝা বহন করা। এই সকল ভজনের বাধা। ভজনের বাধা উপস্থিত হ'লে আমরা আত্মঘাতী হই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-বলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হয়। ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ'লে সুবিধা হয়।

গুরুমুখ হ'তে—সাধুগণের নিকট হ'তে শ্রবণ হয়। তাঁ'দের নির্দ্দেশ মত পাঠাদি কার্য্যও শ্রবণের অন্তর্গত। নতুবা বিপথগামী হ'য়ে কখনও সৎকর্ম্মের গাধা হ'য়ে যাই —প্রচুর পরিমাণে নীতিবাদী হ'বার যত্ন করি—আইনকানুন বাঁচিয়ে চলি—আবার কখনও

নির্ব্বিশেষভাব গ্রহণ ক'রে অলসতা সাধন করি। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভাবে এইরূপ দুর্গতি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুতি হ'লে এরূপ অসুবিধা অনিবার্য্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন—জল; সেচনকারী—শ্রীগুরু-পাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তি। বিশ্রম্ভের সহিত সর্ব্বদা গুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য। আর পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার দরকার নেই। ভক্তিলতাকে সযত্নে পালন ক'র্‌তে হ'বে। সুষ্ঠুভাবে ভগবানের সেবা ক'র্‌ব—এই বুদ্ধি হ'তে বিচ্যুত হওয়ায় যত অমঙ্গল আস্‌ছে। সাধু-গুরুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। তাঁ'রা কৃপাপূর্ব্বক আমাদের কত সেবার সুযোগ দিয়েছেন। নিজেদের আদর্শ চরিত্র দেখিয়ে—আদর্শ-চরিত্র বর্ণন ক'রে তাঁ'রা আমাদের কত মঙ্গল-বিধান করেন। তাঁ'দের বর্ণনসমূহ অনুভব কর্‌বার বুদ্ধি যদি হয়, তা' হ'লে কত সুবিধা!

"আমি নিজে পড়্‌ছি"—এটা দুর্ব্বুদ্ধি। "আমার পড়া অন্য লোক শুনুক্‌"—এটা শ্রুত বাক্যের কীর্ত্তন হ'ল না।

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

বৈষ্ণবের নিকট হ'তে ভাগবত শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে। "আমি ভাগবত প'ড়্‌ছি—গৌড়ীয় মঠের অনুগত ব্যক্তি এরূপ কখনও বলেন না। গৌড়ীয় মঠবাসী বলেন,—"আমরা নিজের কোনো কথা প্রচার ক'র্‌ব না। পূর্ব্ব গুরুগণ যা' ব'লেছেন, একমাত্র তাই প্রচার কর্‌ব।" আমরা বেশী বোঝাতে পারি, পূর্ব্বগুরুবর্গ বোঝাতে পারেন নাই, তাঁ'দের কথা মনুষ্যজাতি বুঝ্‌তে শুন্‌তে পারে না"—ইহা দুর্ব্বুদ্ধি, নিজে না বুঝ্‌তে পারা। গৌড়ীয়মঠের কৃত্য—শ্রবণ-কীর্ত্তন—শ্রীগুরু-কৃপালব্ধ ভক্তিলতা-বীজে নিত্য জল সেচন করা। তাঁ'দের এরূপ বিচার নয় যে, তাঁ'রা বোঝেন, অন্য কেউ বোঝেন না কিংবা তাঁ'রা সোজা করে অন্যকে বোঝাতে পারেন—এ সব দুর্ব্বুদ্ধি তাঁ'দের নাই।

জল-সেচন না ক'র্‌লে বীজ শুকিয়ে নষ্ট হ'য়ে যায়। কোন সময় অতিরিক্ত জলে পচে যায়। অনধিকারী যদি শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল-সেচন ক'র্‌বার ছলনায় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি শ্রবণ (?) বা কীর্ত্তনের (?) বাড়াবাড়ি করেন, তবে ভক্তিলতার বীজটুকু আর অঙ্কুরিত হয় না। পঞ্চম বর্ষের বালিকাকে স্ত্রী পুরুষের প্রীতি শিক্ষা দিলে তা'র পক্ষে তা' "ইচড়ে পাকামী"র কাজ হয়, আর উপযুক্ত সময়ে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতির বিষয় স্বতঃই যুবতীর হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি হয়, তখন সে প্রকৃত প্রস্তাবে তা' বুঝ্‌তে পারে।

সুষ্ঠু অভিজ্ঞান লাভ আবশ্যক। বিপরীত কথা হ'তে তফাৎ হওয়ার জন্য যত্ন আবশ্যক; নতুবা সাধু-গুরুর কথা ধর্‌তে পার্‌ব না। জয়দেবের কথা বুঝতে না পেরে বৃথা সময় যা'বে—ম'রে যা'ব। সময়ে যদি কাজ না করি, তা' হ'লে সুবিধা হ'বে না। কিন্তু যক্ষ্মারোগীর বনিতাভিলাষের উদাহরণের তাৎপর্য্যে কাজ ক'র্‌তে হ'বে না—যেমন পুরীতে ব্যাখ্যা হচ্ছে। পরীক্ষিৎ মহারাজের বিচার যেরূপ, সেরূপ আবশ্যক।

"উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি" যায়।"

কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সেবা কর্‌তে হবে। ইন্দ্রিয়ের সেবাকার্য্যে ব্যস্ত হতে হবে না। ভক্তিলতাবীজে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন ক'রে লাভবান্ হওয়া আত্মার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। শরীর পালন করা পশুরও ধর্ম্ম। নিত্য মঙ্গলের অনুসন্ধান না কর্‌লে মনুষ্য-জন্মের কার্য্য হ'লো না। আত্মঘাতী পশুপ্রকৃতি অপ্রাকৃত বস্তুর শ্রবণ-কীর্ত্তন করে না। যখন ভক্তিলতা বাড়ে, তখন লতা একটি মাচা চায়। কোন্ জিনিষটা মাচার কার্য্য করে? কৃষ্ণপাদপদ্ম মাচার কার্য্য কর্‌বে। কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি বা আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেই লতা প্রফুল্ল ও পরিবর্দ্ধিত হ'তে থাকে। সত্য, জনঃ, মহঃ, তপঃ ইত্যাদি লোকে গেলে লতা জ্ব'লে যাবে—পু'ড়ে যাবে! তা'হলে পশুপরিশ্রমে পর্য্যবসিত হ'বে—খোলে কেবল চাটি দেওয়া মাত্রই সার হ'বে।

জগতে যে-সব বিভিন্ন মনোধর্ম্মের বিচারযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁ'দের সকলের ঐরূপ অসুবিধা হ'বে। ভক্তিলতা এই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ ক'রে যায়। ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজা—একটা বড় গড়খাই। তা'তে জল—কারণ-বারি আছে। কারণ-বারি থেকে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হ'য়েছে। সেখানে রজোধর্ম্ম নাই—অজধর্ম্ম আছে—গুণসাম্যাবস্থা আছে। রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব একটা জিনিষ তিন ভাগে বিভক্ত হ'য়ে ত্রিধা চূর্ণ হ'য়ে পড়ে—বিরজাতে neutralised (ক্রিয়াশূন্য) হয়। এখানে সৃষ্ট বস্তুর কারণ প্রকৃতি বর্ত্তমান।

খানিকটে প্রগতি (progress) দেখিয়ে স্তম্ভ-ভাব এনে দেওয়া ব্রহ্মাণ্ডের স্বভাব। এখানে অধিষ্ঠান পাওয়া যায় না—সেবা করার বস্তু পাওয়া যায় না।

বিরজার অপর পারে ব্রহ্মলোক। বিরজা-জলধির মধ্য দিয়ে লতা চল্‌লো। ব্রহ্মলোক নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় স্থান। সেখানেও লতা এমন কোন বস্তু পেল না—যা'র সেবা কর্‌তে পারা যায়।

ব্রহ্মলোকের পরে সবিশেষ ভগবদ্ধাম—মহাবৈকুণ্ঠ। সেখানে গৌরবের সহিত সেবা—শান্ত, দাস্য ও সখ্যের নিম্নার্দ্ধ বিরাজমান। মর্য্যাদা-পথে নারায়ণসেবাতে আড়াইটা রস আটক প'ড়ে যায়। ইহজগতে দেখ্‌ছি রস পাঁচপ্রকার। কিন্তু বৈকুণ্ঠে আড়াই প্রকার দেখা যা'চ্ছে, আর আড়াই প্রকার দেখা যাচ্ছে না। গোলোক-দর্শন—সমগ্রতার দর্শন--সেখান থেকে উপরের অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে—সখ্যের উত্তরার্দ্ধ অর্থাৎ বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। যে দিক্ থেকে দেখা যা'চ্ছে, সে দিক থেকে অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে।

"তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন।"

তা'র উপরে উঠে পাঁচটাই দেখতে পাওয়া যায়। আংশিক দর্শন ছাড়িয়ে পূর্ণ দর্শন। কৃষ্ণই পূর্ণ। বিষ্ণুর যাবতীয় অবতার—কৃষ্ণের অংশাংশ—কলা—বিকলা। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি দর্শন—আংশিক দর্শন, পূর্ণ দর্শন নহে। গোলোকে কৃষ্ণ আছেন। অন্যত্র কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—কৃষ্ণের অপূর্ণ দর্শন।

ভক্তির দ্বারা দর্শন—ভক্তিতে আড়াই প্রকার রসে আংশিক দর্শন । আংশিক দর্শনে কতকটা অসুবিধা হয়। পাঁচ প্রকার রসের যে কোনো রসে কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়। কৃষ্ণ-সেবায় সর্ব্বরসের রসিক হ'তে পারে। অন্য অবতারসমূহে তা' হয় না। উৎকর্ষ-অপকর্ষ-তারতম্য-বিচারে অবতার-সমূহে আড়াইটা রসের অভাবে আংশিক দর্শন।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"* (ভাঃ ১/৩/৮)

চব্বিশটি অবতার। অংশ প্রথমভাগ। যেমন ডিগ্রী, সেকেণ্ড ইত্যাদিকে অংশ অংশাংশ প্রভৃতি বলা যায়। minutes (মিনিট—এক ঘণ্টা বা ১ ডিগ্রির ৬০ ভাগের এক ভাগ) , seconds (সেকেণ্ড—মিনিটের ৬০ ভাগের এক ভাগ), thirds (তৃতীয়াংশ), fourths (চতুর্থাংশ) কলা বিকলা ইত্যাদি।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।।"*
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বি ২/৩২)

রসের দ্বারাই উৎকর্ষ-বিচার। কৃষ্ণ এবং অবতার-সমূহ বস্তুতঃ একই জিনিষ। কৃষ্ণ কেন পূর্ণ ভগবান্? রসের উৎকর্ষ-প্রাকট্যের কম-বেশীতে কৃষ্ণের অংশ এবং অংশত্ব বিচার।

গৌরসুন্দর অন্য অবতারদের কথা না ব'লে কেবল কৃষ্ণ-কথা বল্লেন। 'ইহা দোলো কথা, কিংবা গৌরসুন্দরের শিক্ষা দোলো শিক্ষা মাত্র'—এরূপ যাঁ'রা বলেন, তাঁ'রা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা মোটেই বুঝতে পারেন নাই। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণালোচনা ক'রলে বুঝতে পারা যা'বে যে, গৌরসুন্দর বেফাঁস কথা বলেন নাই। কৃষ্ণকথার দুর্ভিক্ষের জন্য এই সমুদয় অবিবেচনার কথা উপস্থিত হ'য়েছে। নিজেই ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য যে চেষ্টা করি, তা' যদি হরিসেবার দিকে নিয়োজিত করি—হরি-সেবকের সেবায় নিযুক্ত করি, তা' হ'লে ইন্দ্রিয়- তর্পণের দুর্ভোগ হ'তে পরিত্রাণ লাভ কর্‌তে পারি। শ্রীরূপ এবং তাঁহার অনুগ জনগণের ইহাই বক্তব্য।

এই সমুদয় জানা হ'য়ে গেলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়া হ'তে পার্‌বে। যদি চিত্তবৃত্তি সাধু-গুরুর চরণে থাকে, তা' হ'লে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সেবাবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ কর্‌বে। নতুবা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বৃদ্ধি হ'বে। যেমন কেউ বা প্রচারকের

* রাম-নৃসিংহাদি—পুরুষের (শ্রীহরির) অংশ বা কলা (অংশাংশ) কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

* নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপ দ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গার-রস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।

সজ্জায় সেজে জড় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে নিযুক্ত হ'য়ে গেলেন। এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা করা কর্ত্তব্য নহে। নিরন্তর সাধু-গুরু-কার্ষ্ণগণের সেবা ক'র্‌লে সব সুবিধা হ'য়ে যাবে। তখন শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার বিশুদ্ধতা লাভ ক'র্‌বে—সমস্ত কথার মধ্যে প্রবেশ লাভ হ'বে—যা'র যেরূপ যোগ্যতাই থাকুক না কেন।

মনুষ্যজাতি কৃষ্ণেতর কথার যথেষ্ট আলোচনা ক'র্‌ছে। কিন্তু কৃষ্ণকথার ভীষণ দুর্ভিক্ষ। কৃষ্ণকথার নামে কৃষ্ণেতর কথা আবার জগতে পূতনার ন্যায় স্নেহস্তন্যদায়িনী মূর্ত্তিতে এসে পরমার্থজগতের শিশুগণকে বিনাশ ক'র্‌ছে। চৈতন্যদেব যাঁ'কে দয়া করেন, তাঁ'রই অকৈতব কৃষ্ণপ্রসঙ্গ-শ্রবণে রুচি হয়। নতুবা অচৈতন্য-কথা শ্রবণের মাদকতা যায় না। চৈতন্য-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অধিকার আমাদের নাই। অন্য প্রকারে ভক্তি-বৃদ্ধির উপায় নাই; কৃষ্ণের কথা শোনা, কৃষ্ণের কথা বলা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণ হ'য়েও লোক-শিক্ষার জন্য কৃষ্ণকথা বল্‌বার লীলা প্রদর্শন ক'রেছেন।

গয়া গিয়ে কৃষ্ণের কথা শুন্‌লেন। পরে কৃষ্ণের কীর্ত্তন আরম্ভ ক'র্‌লেন। গয়া যাওয়ার পূর্ব্বে শ্রবণের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য প্রদর্শন ক'রেছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন সর্ব্বভাবে জয়যুক্ত হউন। "যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তি-সংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।"

কৃষ্ণ অক্ষজ বস্তু ন'ন। তিনি অধোক্ষজ। বিষয়-কথার মধ্যে তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। তা' হ'লে কি উপায়ে এগুলোর মধ্যে তাঁ'কে দেখতে পাওয়া যা'বে? নির্ম্মল অন্তঃকরণে শ্রবণ ক'র্‌তে হবে। কৃষ্ণকথা শ্রবণ কর্ত্তব্য। একটুকু শোনা হ'লে কীর্ত্তন আরম্ভ হ'বে। কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কর্ত্তব্য থাক্‌বে না। কেউ অন্য কথা শুনাতে আস্‌লে তা'কে মার্‌তে যা'বে। চৈতন্যদেব পড়ুয়াদিগকে মার্‌তে গিয়েছিলেন—গোপীর কথা তা'রা বুঝতে না পারার জন্য। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কৃষ্ণকথা বোঝা'বার জন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হ'লেন। তাঁ'রা বুঝতে পারলেন না—এখন পর্য্যন্ত বুঝতে পারেন নাই, অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে গেলেন।

আগে গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় ক'র্‌তে হ'বে। নচেৎ গুরু হ'য়ে (?) শোনা হ'য়ে যা'বে—থিয়েটারের অভিনয় দেখা শোনার মতন। প্রথমে নিজে লঘু হ'তে হ'বে। ইহার নাম—আশ্রয়। ভণ্ডকে যদি 'গুরু' বলে স্থাপন করা যায়, তা' হ'লে অসুবিধা হ'বে। শিষ্যের দান-গ্রহণকারী চোরকে 'গুরু' কর্‌তে হ'বে না। তা' হ'লে 'গুরু' করা না হ'য়ে চাকর করা হ'য়ে যাবে। সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ কর্‌তে হ'বে। আর যে গুরু (?) এক কপর্দ্দকও নিজের জন্য গ্রহণ কর্‌বেন, তিনি চোর হ'য়ে যাবেন। কৃষ্ণের দ্রব্য চুরি ক'রে নিলে আর গুরুপদবাচ্য হ'বেন না। যে-সকল গুরু (?) শিষ্যের (?) বিত্ত অপহরণ করেন, তা'রা লঘু। তা'দিগকে আশ্রয় কর্‌লে আরো লঘু হ'য়ে যেতে হ'বে। প্রকৃত

গুরু লাভ হ'লে তিনি (শ্রীগুরুদেব) হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা কিরূপে হৃষীকেশের সেবা করছেন লক্ষ্য করতে হ'বে, তা' হ'লে সুবিধা হ'বে। 'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ'। কৃষ্ণচন্দ্র আশ্রয়-মূর্ত্ত-বিগ্রহ হ'য়ে সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট উপস্থিত হন—ভাগ্যহীন জীবের নিকট উপস্থিত হন না।

বর্ত্তমানে আমাদের বিষয়ী আর যোষিৎ দর্শন হচ্ছে। গুরুপাদপদ্ম দর্শন না হ'লে কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরুপাদপদ্ম-দর্শনের পরেও যদি আবার যোষিৎ দর্শন হয়, তা' হ'লে পতন হ'য়ে গেল। তখন দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে, গুরু থেকেও বড় গুরু আছে। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, আর যদি গুরু-কৃষ্ণ সেবা করেন, তা' হ'লে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হ'বে—কৃষ্ণ-বিষয়ে দিব্যজ্ঞান—দীক্ষালাভ হ'বে।

কৃষ্ণেতর বিষয়ের জ্ঞান প্রদানের জন্য ভণ্ডগণ কতই না চেষ্টা ক'র্‌ছে! যে কার্য্য ক'র্‌লে বিষয়ী ও যোষিৎকে আর দেখ্‌তে হয় না, সেই কার্য্য ক'র্‌তে হ'বে। তখন কৃষ্ণযোষিৎকে পরমপূজ্যা গুরু জ্ঞান ক'র্‌তে পারা যা'বে। তখন 'যোষিতের ভোক্তা'—এই দর্শন হ'তে নিরস্ত হওয়ায় ভগবানের সেবাবৃত্তি উদিত হয়। তখন কৃষ্ণের সম্যক্ দর্শন হয়; 'আমি যোষিৎপতি'—এরূপ বিচার হয় না। কৃষ্ণই একমাত্র যোষিৎপতি—এরূপ দর্শন হয়। কেবল কৃষ্ণ-ভজনের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়। মানুষ তখন নিজেকে গুরুর পুত্র জ্ঞান করে; এ সকল পিতা-পুত্রের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না; তখন মঠবাস হয়। তখন শ্রীচৈতন্যদেব যা' ক'রেছেন, সেই কৃত্য ক'র্‌বার অভিলাষ হয়। সর্ব্বদা হরি-কীর্ত্তন হয়—তখন জীব প্রকৃত প্রস্তাবে 'তৃণাদপি সুনীচ' হন, নিন্দা কর্‌বার প্রবৃত্তি থাকে না।

শ্রবণ-কীর্ত্তন না হ'বার জন্য কৃষ্ণের দর্শন হ'চ্ছে না। আশ্রয় ত' ক'র্‌ব আমি। আমি আশ্রয় না ক'র্‌লে আর কি হ'বে? ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সদ্‌গুরু লাভ হয়। ভগবানের দয়া পেলেই সব হ'বে। তাঁ'র দয়া না হ'লে আমার শত চেষ্টাদ্বারাও কিছু হ'বে না। তাঁ'র দয়াই মূল জিনিষ। যদি হৃদয়ের মধ্যে নিষ্কপট আর্ত্তি থাকে, যদি তাঁ'কেই সত্য সত্য চাই, তা' হ'লে তা'র নিশ্চয়ই দয়া লাভ হয়। যতক্ষণ অন্য বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণই জন্মৈশ্বর্য্যাদির অভিমানে সর্ব্বনাশ হয়। ভগবান্ কি বস্তু, যাঁ'রা আলোচনা ক'র্‌লেন না, তাঁ'রা ঐ সব অসার জিনিষের (জন্মৈশ্বর্য্যাদির) আলোচনায় সময় কাটিয়ে দিলেন। এই সব বিষয়ে বেশী আসক্ত হ'য়ে পড়্‌লে শ্রবণ হয় না। শ্রবণ না কর্‌লে বিষয়ভোগ ছাড়া জীব আর কি কর্‌বে?

অনাত্মবস্তুর সৃষ্টি আছে। আত্মবস্তুর সৃষ্টি নাই। আত্মবস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হ'লে পুনরায় আমার স্বভাব প্রাপ্ত হ'ব। পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হ'বার অভিমান হ'বে না। কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে জীব নষ্ট কর্‌তে হ'বে না। F. R. S. D. C. L. হ'য়ে আধ্যক্ষিক হ'বার জন্য যত্ন হ'বে না।

আত্ম-পরীক্ষা না করার দরুণ—শ্যামাঘাসকে ধান গাছ বিবেচনা করার দরুণ দুর্গতি ঘট্‌লো। ব্রহ্মাণ্ডের সব সুবিধা পেয়ে গেলেই বা তা'তে কি হলো? তা'তে দুরাকাঙ্ক্ষা আরো বৃদ্ধি হ'লো বই ত' নয়। আবার পরে সে সব ছেড়ে দিয়ে নির্ব্বিশেষ চেষ্টা হ'বে। যোগভূমিকার প্রাপ্য পতঞ্জলি ঋষির কৈবল্য পেয়েই বা কি লাভ ? এ সব দুর্ব্বাসনা কালসর্পের মতন। কামড়ালেই পশুর ন্যায় করে ফেল্‌বে। এ গুলোর বিষ দাঁত না ভেঙ্গে এদের সঙ্গে বাস ক'র্‌লে মারা পড়্‌তে হয়।

বিষয়ী হ'বার চেষ্টায় অভিভূত হওয়ায় যে অমঙ্গল ঘটে, সেই সব অমঙ্গলবাসনার মুখে ছাই দেবার সুবিধা হয়—যখন ভগবানের দাসদের সঙ্গে দেখা হ'বার সুযোগ হয়। নারদ যেমন নিজের সুবিধা ক'রে নেওয়ার লীলা দেখিয়েছিলেন। নারদের অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় হ'য়েছিল; সেই সুকৃতিবশে তিনি বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে, জাগতিক ব্যাপার আবশ্যক নয়,—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।*

(ভাঃ ১১।২।৪০)

পৃথিবীর লোক ইঁহাদিগকে নির্ব্বোধ, পাগল ব'লে বিচার করে। ভগবানে অনুরাগ হ'ল। ক্রিয়া কি দেখা গেল? হাঁস্‌ছেন—দেখ্‌ছেন জগৎ কি কর্‌ছে, অথবা তখন 'বিশ্বং পূর্ণ-সুখায়তে', তাই তিনি আনন্দে হাসছেন—সর্ব্বত্র কৃষ্ণময় দর্শন; আবার কাঁদছেন —জগতের লোক কত অশান্তিতে র'য়েছে! অন্য লোক কি বিবেচনা কর্‌ছে, তাঁ'র গ্রাহ্যের বিষয় হ'চ্ছে না।

মহাভাগবতের সঙ্গ-প্রভাবে অযাচিতভাবে যদি সেই জিনিষ লাভ হয়, তা' হ'লে শ্রবণের যোগ্যতা হয়। হঠাৎ এই সৌভাগ্য উদিত হ'তে পারে।
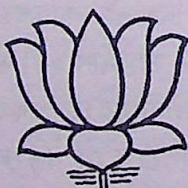
* এবম্বিধ ব্রতশীল হইয়া প্রিয়তম শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তনাদি-নিবন্ধন অনুরাগযুক্ত এবং বিগলিতচিত্ত পুরুষ লোকের হাস্যপ্রশংসাদিতে অবধান-শূন্য হইয়া উন্মাদতুল্য উচ্চহাস্য, রোদন, চীৎকার, গীত এবং নৃত্য-বিষয়ে রত হইয়া থাকেন।

# পঞ্চম অধ্যায়

## ধ্যেয়ং সদা শ্রীচৈতন্য-চরণারবিন্দম্

(১)

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।"

আমি সেই মহাপুরুষের চরণ বন্দনা করি, যিনি শিববিরিঞ্চি-নমস্কৃত অর্থাৎ মহাদেব-ব্রহ্মাদি যাঁকে সর্বদা প্রণাম করেন। তিনি জগদ্‌বরেণ্য, তাঁর আশ্রয় সকলেই আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি সংসারের মলিনতা সর্বতোভাবে দূর করতে পারেন। আমাদের যে প্রার্থনা হওয়া উচিত, তিনি তদনুসারে ফল দান করতে পারেন। তিনি ধ্যানযোগ্য। জড়-পদার্থগুলি ভোগ্য, তাহারা ধ্যেয় নহে। তুমিই তোমার সেবাকারী ব্যক্তির ক্লেশ মুক্ত করিয়া থাক। তুমিই প্রণতজনগণের পালনকর্তা। তোমার চরণ ভবসমুদ্র পারের নৌকা-স্বরূপ। তুমি সেই মহাপুরুষ, তোমার চরণ বন্দানা করি।

হে মহাপুরুষ, তুমি দেবতাদিগের কাম্য ভোগ্য সুদুস্ত্যজ রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করে আর্যশ্রুতিবাক্যানুসারে মায়াবাদ পরিহার পূর্বক পরমধর্মাশ্রয়ে বিশেষতঃ কান্তাগণের কান্তের প্রতি সেবাসৌষ্ঠব-বিধানভূমি বৃন্দারণ্যাশ্রয় করে যা শিক্ষা দিয়েছিলে, সেই লীলানুগত্যে তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করি। ভগবদ্বস্তু মহাপুরুষ সর্বদাই তাঁর সেবকগণের দ্বারা সেবিত হন। তিনি পরমেশ্বর-বস্তু হওয়ায় বশ্য ও ঈশ্বর-সম্প্রদায় তাঁকে নিত্য সেবা করে থাকেন। তা হ'লেও তিনি তা পরিত্যাগ ক'রে প্রিয়ভক্তগণের যে অভীষ্ট—ভজনীয়বস্তুর প্রতি যে বিচার, তার অনুবর্তী হয়ে বিষয়বিগ্রহের লীলারস আস্বাদনের পরিবর্তে আশ্রয়বিগ্রহের আস্বাদ্য রস—যার অনুভূতি বিষয়বিগ্রহ হওয়ায় তাঁর পূর্বে

ঘটেনি অর্থাৎ বিষয়বিগ্রহোচিত রসাস্বাদন পরিহার ক'রে আস্বাদক-সূত্রে আস্বাদ্যরস-বিলাস গ্রহণ করেছেন। তিনি যে ত্যাগটা করেছেন, সেটা কি জিনিষ?—'সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মী'। আর আর্ষবাক্যানুসারে মায়াবাদীয় শ্রুতিতে অনুসন্ধান ত্যাগ করেছেন। সুর—দেবতা, তাঁরা অভিলাষ করেন—ভোগ, তাতে স্বর্গাদি ভোগরাজ্যে—অমর-ভূমিকায় যে রাজ্যলক্ষ্মী, তা পরিত্যাগ ক'রে অর্থাৎ ভোগীর চেহারা ও মায়াবাদী মৃগের দ্রুতগতি পরিত্যাগ ক'রে চিদ্‌বিলাসারণ্য—বৃন্দারণ্য আশ্রয় করেছেন। আর তাঁর দয়িতের ঈপ্সিত আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহের যে বিষয়জাতীয় আস্বাদন, তাতে অনুধাবন করেছিলেন অর্থাৎ বার্ষভানবী যে বিচার অবলম্বন ক'রে তাঁ'র কান্তের সেবা করেন, সেই বার্ষভানবীর আনুগত্য-বিচারে মুক্তপুরুষগণ যে প্রকারে কৃষ্ণসেবা ক'রবেন, তার আদর্শরূপে অগ্রসর হয়ে বৃন্দারণ্যে গমনাভিলাষ দেখিয়েছিলেন। কেন না তাঁর বিচার-প্রণালীতে দেখি,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধুবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।

ব্রজবধুবর্গ যে প্রকার তাঁদের কান্তের উপাসনা করেছেন, সেটি লোকশিক্ষার জন্য তিনি দিয়েছেন। তিনি নিজেই সেই বস্তু হওয়ায় নিজেই নিজেকে আস্বাদন করেছেন। যথা,—

অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব।।

কৃষ্ণ বললেন, আহা! এই প্রগাঢ়-মাধুর্যচমৎকারকারী অবিচারিত-পূর্বচিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে? ইঁহার প্রতি দৃষ্টি করে আমি ক্ষুব্ধচিত্তে দেখছি এবং বলপূর্বক আলিঙ্গন ক'রতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা ক'রছি।

উপরিউক্ত শ্লোকোদ্দিষ্ট বিষয়ে যে প্রকার ভগবানের রসাস্বাদন-চেষ্টা, সেগুলি গৌরসুন্দরে চরিতার্থতা লাভ করেছে। অতএব সেই মহাপুরুষই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর। অনেকে সীতাপতির পক্ষে এই শেষোক্ত শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র এই সকল কথায় একটু আবরণ দিয়ে অন্য প্রকার বিচার করার ব্যবস্থাও করে থাকেন। সুতরাং আমাদের মৃগ্য-ধ্যেয় পদার্থ সেই পরমেশ্বর। যিনি সম্ভোগময়ী লীলায় কৃষ্ণচন্দ্র আর বিপ্রলম্ভময়ী লীলা, যাতে সম্ভোগের পুষ্টি সাধন করে, সেই পরম প্রয়োজনীয় বিষয় গৌরাঙ্গচন্দ্র।

সর্বেন্দ্রিয়-দ্বারা পূর্ণভাবে সেবা করার বিচার ধ্যানে আছে। ধ্যাননিষ্ঠা আনুষঙ্গিক ব্যাপারে বহির্জগতের অধিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হলে উহা বিপর্যস্ত হয়। ধ্যান পূর্ণবস্তুর হওয়া দরকার, যেখানে ধ্যেয় বস্তুর অপূর্ণতা আছে, সেখানে ধ্যানের ও অপূর্ণতা। সেইটাকে পূরণ করার জন্য যজ্ঞ ও অর্চন-বিধি। কিন্তু কীর্তনমুখে ধ্যানের পরিপূর্ণতা হয়ে থাকে। সেই ধ্যেয়বস্তু কেবল বিচিত্রতাপূর্ণ জগৎটুকু মাত্র নয়। জগৎটা নশ্বর আর বৈকুণ্ঠ নিত্য—নিরস্তকুহক সত্যবস্তু। ধর্মার্থকামমোক্ষধিক্কারী ধাম প্রকাশিত না হলে ধ্যানের পূর্ণতা হয় না, আংশিক স্মৃতিমাত্র উদিত হয়। ধ্যেয়বস্তুটি—পরমেশ্বর। 'পরমেশ্বর' বলতে গেলে শক্তিপরিণত ত্রিগুণান্তর্গত ভোগ্য জগৎ বা জগতের প্রভুমাত্র জ্ঞানটীতে আবদ্ধ থাকা ঠিক নয়। তা' হলে জগন্নাথবস্তু পরমেশ্বর হতে পৃথক হয়ে যান। জীবের মলিন ধারণায় যে জ্ঞান, তা অপূর্ণ ধর্মযুক্ত। সেজন্য সম্বন্ধজ্ঞানবিচারে জন্মস্থিতি-ভঙ্গ-ব্যাপার যাঁ হতে অন্বয় ও ব্যতিরেক ক্রমে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেই শক্তির পরিচয়টুকু নয়; ইহা গৌণীশক্তি। যেখানে চেতনজগতের প্রাকট্য, নিত্যত্ব, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, সেই আনন্দরসধাম—বিচিত্রতা-যুক্ত লীলাময়ের ধাম ইহজগতের বিচারদ্বারা বোধগম্য নন। মানব-জ্ঞানের বিচারে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্তমান। অল্প হতে বৃহৎএর দিকে ধাবমান হবার বিচারমাত্র আছে; কিন্তু যিনি নিজশক্তি দ্বারা বৃহৎকে আপেক্ষিক ক্ষুদ্রতায় পরিণত করতে পারেন, তাঁর কথা জগতের লোক জানে না। বড়টাকে সঙ্কোচ করে মাধ্যমিকতায় অবস্থান করার শক্তি তাঁর আছে। জাগতিক বিচারে শ্রেষ্ঠতার অভাব হবে বিচার করে যাঁরা ভগবানের তাদৃশ শক্তি অস্বীকার করেন, তারা ভগবান্‌কে অবজ্ঞা করেন।

"অবজানান্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।"

যে সকল জড়রস কাব্যশাস্ত্রে বর্ণিত, তিনি তার গম্য-পদার্থমাত্র হলে আমাদের গ্রাহ্যবস্তু হয়ে যান; কিন্তু তিনি ভূমা, অধোক্ষজ হলেও সেই ধর্মের সুবৃহত্ত্বকে সঙ্কোচ করার শক্তি তাঁর আছে।

'বিশ্ব' বলে যে জিনিষ, মানব যার ভোক্তা অভিমান করছেন, সেটুকু তাঁ হতে উদিত, তাঁতে অবস্থিত এবং কিছুদিন পরে নশ্বরতা-ধর্মবশে পরিবর্তিত বা নষ্ট হয়ে যায়।

এটা কর্মভূমিকা—কর্মের প্রাধান্য ইহজগতের ব্যক্তিমাত্রেই বিচার করেন। কর্ম অপেক্ষা নৈষ্কর্মবাদ উচ্চ, আর্থিক সম্প্রদায়ের মহত্ত্ব জ্ঞানের উচ্চসীমায় নয়, পারমার্থিকগণের বিচারই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা কর্মের নশ্বরতা অবগত আছেন।

কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।

লৌকিক ইন্দ্রিয় চক্ষুকর্ণনাসাজিহ্বাত্বগ্ দ্বারা যেটি নির্ণয় করে, তদ্দ্বারা আমরা কর্মের কর্তা-বিচারে সুখ-দুঃখ অনুভব করি। তাতে দুঃখবর্জন ও সুখ আবাহন করার দরকার হয়। সুখানুভূতি কিরূপে হয়? তজ্জন্য জ্ঞানলাভের বাসনায় বৃহত্ত্বধর্ম সংশ্লিষ্ট। ঐশ্বর্য-জ্ঞাপক বৃহত্ত্বের বিচার অপেক্ষা মাধুর্যই শ্রেষ্ঠ। হ্লাদিনীশক্তির পূর্ণবিকাশ-লাভের প্রয়োজনীয়তাকেই মাধুর্য বলে। হ্লাদিনী শক্তি আমাদের মধ্যে যৎসামান্যরূপে আছে। 'আমি ভোক্তা' এই বিচারে যে আনন্দসংগ্রহ-পিপাসা আমাতে আসে, সেটা হ্লাদিনীশক্তি ন্যূনাধিক বিপন্ন হলে হয়; কিন্তু যাঁর হ্লাদিনী, তাঁর সংযোগে সেবা-বৈচিত্র্যেই হ্লাদিনীর পূর্ণবিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

ভাবাশ্রয় যারা ক'রল না, যাদের রতি স্থির হ'ল না, নিজে ভোগকরে আনন্দ পাবে বা ত্যাগ করে আনন্দরহিত হয়ে যাবে, সে বিচারটি আদরের নয়। মুমুক্ষুদিগের ভোগাদেওয়া কথার মধ্যে সচ্চিদানন্দের পূর্ণত্ব-বর্ণন থাকলেও জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতৃত্বের রাহিত্য হয়ে সব আমিত্বে পর্যবসিত হবে, এটাই তাদের প্রধান বিচার। 'আমি' বলে জিনিষটা নির্ণয় করা দরকার। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব জীবকে তটস্থশক্তি বলে বিচার করেছেন। ভোগময় কর্ম ও ত্যাগময় জ্ঞানরাজ্যের অসম্পূর্ণতা পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। তাতে সেব্যের সুখানুসন্ধান-বিচার প্রবল, নিজের ভোগ বা ত্যাগে শান্তির কথা নেই। তখন বিচার হবে, "তোমার সুখের জন্য যাবতীয় অশান্তিকেও বরণ করতে প্রস্তুত আছি, আমি অসুখী হলেও যদি তোমার সুখ হয়, তাতে আমার দুঃখ নেই, সেইটাই আমার প্রয়োজনীয়।"

মেপে নেওয়া ধর্ম জড়জগতে সংশ্লিষ্ট, তা হতে উদ্ধার পাওয়া চাই। 'আমরা ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য'—এই বিচারে পরবঞ্চনা অবস্থিত। অন্যের ভোগ আমার দিকে আসুক—এইটিই পরবঞ্চনা। পূর্ণ ভোগগ্রহণ-ক্ষমতা বাস্তববস্তুতে আছে। তাঁতেই সকল বস্তু গিয়ে পৌঁছুক,—এই বিচার হ'লে 'আমি ভোক্তা' এরূপ অভিমান দূর হয়। আমাদের পরীক্ষার জন্য—মঙ্গলের জন্য বিশ্বদর্শন। 'আমি ভোক্তা নই'—এ বিচার পশুরা করতে পারে না, শুদ্ধভক্তি থাকলে মানবই করতে পারে। অন্যান্য লক্ষ লক্ষ জীব পরমেশ্বরের ধ্যানের অভাবে ন্যূনাধিক পশুধর্মবিশিষ্ট। তারা পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়ে অসমর্থতার কারণ যা, তাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। কিন্তু পরম করুণাময় বিগ্রহের হ্লাদিনীর কৃপা হলে মাধুর্যমূর্তির ও ঔদার্য-বিগ্রহের পরম পরাকাষ্ঠা উপলব্ধির বিষয় হয়। এজন্য 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যে পরমেশ্বরের বন্দনা করেছেন, তাতে জানি যে, তিনি পরম করুণাবশতঃ স্বভক্তিশোভা বিতরণ করেছেন। সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের হৃদ্দেশ অধিকার করে মঙ্গলবিধান করুন। সেই মঙ্গলটি কর্মপথ বা কর্মবন্ধ মাত্র নহে। কর্মের পরিণাম আছে। কর্মে লভ্য বস্তু পরিণাম-ধর্মবিশিষ্ট, তাকে রক্ষা করতে পারি না, চলে যায়। কিন্তু আমরা স্থূল-সূক্ষ্মশরীরে

তার ফলভোগ করতে বাধ্য হই। পরবঞ্চনা-দ্বারা স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ, ব্রহ্মে বিলীন হওয়া, পরমাত্মায় কৈবল্য লাভ করা—এই সকল সংকীর্ণ চেষ্টা হতে শ্রীচৈতন্যদেব মানবজাতিকে পরিষ্কৃত, নির্মল ও উন্নত করেছেন।

বিশুদ্ধ হ্লাদিনীশক্তিতে যে লীলার কথা, তা জগতে মেপে নেওয়া ধর্মযুক্ত লোকের ধারণায় কদর্যাকারে পরিণত হয়েছে। নিজভোগজনিত কদর্যতা আছে দেখে তারা পরমপবিত্র পূর্ণতম কৃষ্ণলীলায় ও কদর্যতার আশঙ্কা করে। বাসনার দাস, কামুক, ঘৃণিত জীব কৃষ্ণের নিকট যেতে পারে না বা তাদের কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা হয় না। তারা মনে করে, কৃষ্ণকে বঞ্চনা করে ভোগ করব; কিন্তু ভোগ করতে পারে না। ছায়াতে বস্তু-ভ্রান্তি করে যে কর্ম বা নৈষ্কর্ম্য—জ্ঞানচেষ্টা, তাতে মঙ্গল হয় না। বুদ্ধিমান্ লোক এরূপ বিপদে পড়েন না। জ্ঞেয়পদার্থ বিশ্ব, বিশ্ব জ্ঞাতা বা বিশ্বই জ্ঞান—এই সংকীর্ণ ধারণায় যারা আবদ্ধ, তাদের জন্য বলেছেন, এটা বৈকুণ্ঠধামের ছায়ামাত্র। বৈকুণ্ঠের ছায়া-প্রতিফলিত জগতে ভগবৎসেবা-বিমুখতাবশতঃ জীব অনিত্য ভোগ-ধর্মে অবস্থিত। তাতে মঙ্গল নেই। বৈকুণ্ঠ-সহ জগতের সৌসাদৃশ্য থাকলেও সেখানে নিত্যধর্ম, এখানে অনিত্যতা—তাৎকালিক বর্তমানতা মাত্র। অসংখ্য দর্শনশাস্ত্রে কপটতা বা অবিবেচনার কারণবশতঃ মুগ্ধ হওয়ায় ভগবানের পরমভাব বুঝতে পারে না। তারা বিমূঢ় জানতে হবে। আজ গোপীবসনহর রাসলীলার নায়কের কথা কিভাবে বুদ্ধিমান নামধারিগণের দ্বারাও কদর্থিত হচ্ছে—তাঁরা উহার সমালোচনা-দ্বারা প্রকৃত কথা গোপন করে কিরূপ অন্যায় ক'রছেন, মনুষ্যজীবনের সার্থকতা নাশ করে লোককে বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের বন্ধুবান্ধব আজ ভগবৎকথা ভুলে গিয়ে কৃষ্ণকে রূপক বা ঐতিহাসিক নায়করূপে কল্পনা করে, নানা অশ্রাব্য কথা আলোচনা ও অদর্শনীয় চিত্র অঙ্কিত করে নিজেরা ত খারাপ হচ্ছেনই, পরন্তু কত লোকের কপাল খারাপ করছেন। জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি, যা মহাপ্রভু তাঁর নিতান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ সঙ্গে পরমপ্রীতির সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তার নানাপ্রকার কদর্য করে হাটে ঘাটে যেখানে সেখানে ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু করে ফেলেছে। কি দুর্দৈবের কথা! অতি উচ্চস্থানীয় লোকের আলোচ্য বিষয়গুলি উচ্চতা বা যোগ্যতা লাভ করবার পূর্বেই সাধারণ্যে আলোচনা করা অত্যন্ত অন্যায়। মূর্খ বা পণ্ডিতাভিমানী কাহারও পক্ষে এ সব কথা শোভা পায় না। তাঁরা এ সব আলোচনা করবার দাম্ভিকতা করতে গিয়ে নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বহুলোকের সর্বনাশ ঘটাবেন। যে কথা মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজনীয়, মানুষ কি তা শুনবে? যাতে আপাত আনন্দ—ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাই শুনবার জন্য ব্যস্ত। বিবর্তবাদীর কথা শোনাই মানুষ প্রয়োজন বলে মনে করে নিয়েছে। হরিকথা শোনবার লোক পাওয়া যাবে না। ভক্তির সহিত বিরোধকারী অভক্ত, মহাজ্ঞানী, পরমসন্ন্যাসী "মহাব্রাহ্মণ" ও মায়াবাদী যারা, তারাই ভক্ত বা পাণ্ডিত্যটা তাঁদেরই মধ্যে আছে বলে লোক ঠকিয়ে

লোকের অমঙ্গল করেন। যাঁদের কপাল খারাপ, তাঁরা তাঁদের কবলে গিয়ে পড়েন। যারা ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করে না, তারা অঘবকশাখায় উদ্ভূত, এদের সঙ্গ ক'রে কোন দিনই মানুষের মঙ্গল হবে না। অপ্রাকৃত পঞ্চরসাশ্রিত সেবকধারার চিত্তবৃত্তির প্রতি লোভ এলেই মানুষের মঙ্গল। তাঁরা পরমমুক্তপুরুষ। আজ তাঁদেরই কথার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। সন্মুখনিঃসৃত হৃৎকর্ণরসায়ন কথায়ই মানুষের গ্রহণে যত্ন হোক।

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।"

শ্রীকপিলদেব বলেছেন,—নির্মৎসর সাধুদিগের সর্বতোভাবে সঙ্গকারিজনগণ আমার প্রবলবিক্রমের পরম প্রয়োজনীয় কথা জানেন। যাঁরা তাঁদের বাক্যে শ্রদ্ধাবন্ত, তাঁরাই ভগবৎস্বরূপ ও তাঁর লীলা উপলব্ধি করতে সমর্থ। ভগবৎকথা নির্মল হৃদয়ে রসপূর্ণ করে আনন্দবর্ধন করেন। ভগবদ্ভক্তকথিত হরি কথামৃতদ্বারা জীবের অনর্থ বিনষ্ট হলে ইতর কথা ও ভাবাদিতে শ্রদ্ধাহীন হবার পর হরিনামরূপগুণাদিতে বিপুলতর বিশ্বাসজাত হয়। তৎপ্রভাবেই ভাবভক্তির নিদর্শন স্থায়িভাবরতিতে জীবের প্রতিষ্ঠান এবং সামগ্রীসহযোগে রসোদয়ে প্রেমভক্তি লাভ ঘটে।

"আসামহো ......... ভেজুর্মুকুন্দপদবীম্" শ্লোকে যে মুকুন্দপদবীর কথা আছে, যাহা শ্রুতির বিশেষ অনুসন্ধানের পাত্র, যা বেদান্তের একমাত্র চরম প্রতিপাদ্য বিষয়, যে বস্তুটি লাভের জন্য শ্রুতিসকল অত্যন্ত ব্যস্ত, সেই বস্তু মুকুন্দপদবী। তাঁর ভজনা কখন বা কার দ্বারা সম্ভব? আর্যপথ ও স্বজন-পরিত্যাগের শক্তি যাঁদের হয়েছে, যাঁরা তাৎকালিক স্বজনকে নির্ভর করে কৃষ্ণ-প্রতি নির্ভরতা-পরিত্যাগের বিচার-বিশিষ্ট নন, সেই আর্যপথ ও স্বজন-পরিত্যাগকারী ব্যক্তিই মুকুন্দপদবী-সেবনে সমর্থ। সেইটী সকল শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়। আমাদের বর্তমান সময়ে যে জ্ঞান, তা অনেকসময় নানা অজ্ঞানে আচ্ছাদিত। অনেক সময় "তেজোবারি-মৃদাং যথা বিনিময়ঃ" শ্লোকে কথিত বিচারে প্রতারিত ও বিমূঢ় হয়ে আমি খুব বুঝেছি মনে ক'রে অহঙ্কার-বিমূঢ় হই। তৎপ্রতীতির কর্তৃত্বাভিমানে প্রকৃত সত্য বুঝতে পারি না। আমি প্রকৃত-প্রস্তাবে মঙ্গলপ্রার্থী হ'লে শ্রীচৈতন্যদেব আমার মঙ্গলবিধান করেন। প্রত্যেক চেতনধর্মে অবস্থিত ব্যক্তিরই তিনি মঙ্গল-বিধাতা। যারা নিত্যমঙ্গলের পরিবর্তে সাধারণ অমঙ্গল-লাভে তৎপর, তাদের চিন্তাস্রোতে আস্বাদন বা রসবিপর্যয় ঘটায়—ইহ-জগতে ভগবদ্‌রস-রহিত হয়ে জড়রসকে বহুমানন করে তাতে উন্মত্ত হলে চেতনময় রসকে, চেতনে যে রসের উদয় হয়, তা হতে বঞ্চিত হতে হয়।

দুই প্রকারে রস পাওয়া যায়—একটি প্রেয়ঃপন্থায় আর অপরটি শ্রেয়ঃপন্থায়। প্রেয়ঃ পন্থায় জড়ভোগকারীর কাব্য-শাস্ত্রে যে রস আস্বাদনের কথা আছে, তা আস্বাদন করতে গিয়ে বিচারভ্রান্তি উপস্থিত হয়। আস্বাদনকারীর হৃদয়ে মল-প্রবেশ-হেতু অমল

রস আস্বাদিত হন না। শ্রেয়ঃপন্থায় চিদ্-রসই আস্বাদনের বিষয়। যেমন শ্রীরূপপ্রভু উপদেশামৃত-গ্রন্থে বলেছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাঽপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী।।

মানুষের যখন ব্যাধি থাকে, তখন আস্বাদনকারীর জিহ্বা নানা অসুবিধার মধ্যে থাকে। কোনটী ভাল, কোনটী মন্দ—এ প্রকার বিচার এসে ব্যাঘাত উপস্থিত করে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় রসবিচারে প্রেয়ঃপন্থী হ'লে শ্রেয়ঃপন্থিগণ বলেন যে, তাদৃশ জড়রসভোগ হ'তে বিরাগই আশ্রয়ণীয়। বর্তমান সময়ে জড়েন্দ্রিয়ই আমাদের সম্পত্তি, সেই ইন্দ্রিয়-পরিচালনা হ'তে যে জড়বিলাস, তা থেকে পৃথক বা তার বিপরীত বিরাগ; কিন্তু তা আমাদের প্রয়োজনীয় নয়।

ভাগবত বলেছেন,—

নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।

যে কিছু কাজ ক'রব, তা ধর্মের জন্য না হয়; আবার ধর্ম ক'রলেও তা ভোগের জন্য সম্পন্ন হউক, বিরাগ ভাল নয়; বিরাগও আবার তীর্থপদসেবার জন্য না লাগুক; এই রকম বিচার যতদিন থাকে, ততদিন—"জীবন্নপি মৃতো হি সঃ"। সেইকালে চেতনের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক'রতে থাকি। তাকে জীবন্মৃতেরন্যায় অবস্থা বলা হয়েছে। প্রেয়ঃপন্থা দ্বারা চালিত হ'য়ে—ঈশ-সেবা-বৈমুখ্য অবলম্বন ক'রে জড়রসে প্রমত্ত হয়ে পড়ি। আধ্যক্ষিকতাই কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় মনে হয়। আনন্দ-লাভের পন্থা দুই প্রকার, —প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ। প্রেয়ঃপন্থায় আনন্দলাভে যে দোষ, সেটা বিরাগের পন্থায় ক্ষালিত হয়। আমরা কর্তৃত্বধর্মবশে যে কর্মের আবাহন করি, তাতে যে রসের উদয় হয়, শ্রেয়ঃপন্থী বলেন—তা ত্যাগ করা কর্তব্য। বিলাসের বিপরীত কথা বিরাগ। শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া এ উভয় বিচারের অতীত। শ্রুতিগণের বিশেষ অনুসন্ধানের পদার্থ যে মুকুন্দপদবী, তাঁকে ভজন করেছিলেন মহামহাবৈদান্তিকাগ্রগণ্যা বিশুদ্ধচেতনে অবস্থিতা পরমসিদ্ধা সর্বোত্তমা গোপীগণ। ইন্দ্রিয়লোলুপ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ জড়রস আস্বাদন-জন্য যে বিচার-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন তাদৃশ প্রেয়ঃপন্থার অনুসরণ না করে, স্বজন ও আর্যপথ পরিত্যাগ করে অধোক্ষজবিচারে আশ্রয়-জাতীয় গোপীগণ আত্মাভিজ্ঞান লাভ করেছেন। গুণজাত সত্ত্ব-প্রধান বিচারে যেটা নির্ণীত হয়, তাকে পরিত্যাগ করার শক্তি বিরাগের কোথায়? যাঁরা নৈসর্গিকী নিত্য উৎকট প্রীতিচেষ্টার বশে ভগবৎকর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে সেবার জন্য যত্নবিশিষ্ট, বাস্তববস্তুবিচারে যাঁদের বাস্তব রস হৃদয়ে প্রাকট্য লাভ করেছে,

রজস্তমঃ বাদ দিয়ে--সত্ত্বগুণের ভাল কথা পর্যন্ত বাদ দিয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করেছেন, তাঁরাই শ্রেয়ঃপন্থী। যাঁদের জ্ঞানটী অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত, যাঁরা বিবর্তগ্রস্থ হয়ে 'ভগবজ্জ্ঞান ছোট এবং স্বকপোলকল্পিত, জড়সবিশেষরচিত নির্বিশেষ জ্ঞানই বড়'-- এই মায়ামরীচিকায় ঢুকেছেন, তাঁদের মঙ্গলের জন্য চৈতন্যদেবের নিত্যদাস শ্রীচৈতন্যের পূর্ণা দয়াকে অমন্দোদয়দয়া বলেছেন। জড় বিশেষটা অপ্রয়োজনীয়। জড়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা হলে ভোগের বিচার হতে পরিত্রাণ-জন্য 'নেতি নেতি' বিচার এনে ভোগ থেকে অবসর নেয়। যেহেতু সুখভোগে দুঃখ, প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করলে ত্রিতাপ-যন্ত্রণা পাই, সুতরাং বোধরাহিত্যেই শেষ কথা বা বোধসাহিত্যের বিশেষানুসন্ধান-রাহিত্যই চরম পদবী--এতাদৃশ বোধ যাঁদের, তাঁরা অজ্ঞান-শ্রেণীরই অন্যতম ও অন্তর্ভুক্ত। সর্বাপেক্ষা ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবর্তবাদ আশ্রয় করে জড়তাকে বা জড়কে চিদভ্রান্তিক্রমে গ্রহণ করেন। তাতে বাস্তব বস্তু কিছুই নেই । তাঁরা বলেন,--স্বল্প, সঙ্কীর্ণ, জড়ভোগ জ্ঞানের চেষ্টার সঙ্গে জড়াতীত ভক্তিপূর্ণ পুরুষোত্তমজ্ঞানের চেষ্টা সমজাতীয়, স্বল্পক্রমবিশিষ্টের চেষ্টার সহিত উরুক্রমের চেষ্টা সমজাতীয়। অজ্ঞতাবশে ভগবৎসেবা-বঞ্চিত হয়ে, ভগবল্লীলানুকূল বস্তুকে উপেক্ষা করে নির্বিশেষবাদকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বে স্থাপন করেছেন। চৈতন্যদেব তার অপ্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে মনুষ্যজাতির যে মঙ্গল করেছেন তাই আমাদের প্রার্থনীয়। পূর্ণকে অপূর্ণ বলে স্থাপনের কুপিপাসা যাঁদের, তাঁরা মহা অসুবিধায় পড়েছেন। প্রাকৃতসহজিয়ার 'প্রকৃতিজাত জগতেই বিচিত্রতা আছে, চিৎএর বৈচিত্র্য-বিচার জড়শক্তিরই অন্তর্গত'--এই বিচারে যারা প্রতিষ্ঠিত সেইসকল লোক ভাগ্যহীন। জড়সবিশেষে চিৎসবিশেষের বিবর্ত হলে অভীষ্টলাভের পরিবর্তে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। জড়রসটা ধ্বংস করে দিতে হবে, শুকিয়ে দিতে হবে কিন্তু "রসো বৈ সঃ"---সেই সচ্চিদানন্দরসই ত' থাকবে। তা না হলে প্রকৃতিবাদীর বৌদ্ধবিচার বা মায়াবাদীর তর্কমাত্র হয়ে যাবে। বুদ্ধকে সচ্চিদানন্দবস্তু বিচার না করে বৌদ্ধগণ স্বতন্ত্র জড়ভোগ্য অবাস্তব-বিচার-বিশিষ্ট। জড়সবিশেষ-ধর্ম যেকাল পর্যন্ত নষ্ট না হচ্ছে, তৎকালাবধি প্রাপঞ্চিকতা নিয়ে বস্তুসান্নিধ্য হতে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু যে মুহূর্তে চেতনের উন্মেষ হবে, তখনই চিৎসবিশেষ বলে যে ব্যাপার, তা বুঝতে পারা যাবে। লীলা ক্রিয়া-মাত্র-উদ্দেশপরা নহে। 'মানবলীলা' বা 'দরিদ্রনারায়ণ'--এরূপ বিচার যাঁদের, তাঁরা ঘুরে ফিরে Henotheism (পঞ্চোপাসনা) বা Impersonalism-এ (নির্বিশেষতত্ত্বে) প্রবিষ্ট হন। জড়সবিশেষ হতে পার পাবার পরে যে রসের কথা আছে, তার আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। উহা রসে জলাঞ্জলি দেওয়া মাত্র নহে। দহরোপনিষদে (ছান্দোগ্যে) যে সকল কথা আছে, যথা---"স যদি পিতৃ-লোক কামো ভবতি.....মাতৃলোককামো ভবতি......ভ্রাতৃলোককামো ভবতি......স্বসৃলোককামো ভবতি......সখিলোককামো ভবতি.......গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি.......যদি অন্নপান-লোককামো ভবতি.......যদি

গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি.. ....স্ত্রীলোককামো ভবতি.....যং যমন্তনমভিকামো ভবতি........যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে।" এই সকল বাসনা হলে 'ভুতেজ্যা যান্তি ভূতানি' বিচার হবে । কামদেব-কামনা উদিত হবার পূর্ব পর্যন্তই বাসনা মাত্র। 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে' বিচার যদি প্রত্যক্ষানুমানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহালে empericicism এসে গেল। আমাদিগকে জড়ের relativity-তে আচ্ছন্ন করে 'উরুদাম্নিবদ্ধাঃ' করে রেখেছে।

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যতে গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্।।
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।।
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।

কপাল-পোড়া 'উরুদাম্নি বদ্ধাঃ' জীব আমরা, উরুদাম শক্ত দড়ি দিয়ে আষ্টে পিষ্ঠে মায়িকরাজ্যে আমাদিগকে মায়া বেঁধে রেখেছে। এ থেকে ছুটি কিরূপে হবে, তদুত্তরে বলেছেন---'নৈষাং মতিস্তাবৎ' ইত্যাদি। এখানে একটি ভাল কথা বলেছেন--- "নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ"। যাঁরা জগতে কিছু আছে মনে করে দৌড়াচ্ছেন, তাঁদের কথা নয়—নিষ্কিঞ্চনগণের কথা। তাঁরা ইহজগতের কিছু দান করতে আসেন না, সেই জগতের জিনিষ, যা' ইহজগতে নেই, তাই দিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তাঁদের পায়ের ধূলিতে যে মুকূট প্রস্তুত হবে, তা পরবার জন্য যাঁদের আকাঙ্ক্ষা, তাঁরা উরুক্রমাঙ্ঘ্রি স্পর্শাধিকার পাবেন। উরুক্রমের অঙ্ঘ্রি, যাঁর কথা গৌরসুন্দর একষট্টি প্রকার ব্যাখ্যা করলেন, সেই উরুক্রমের অঙ্ঘ্রি যে-কালপর্যন্ত স্পর্শ করবার যোগ্যতা না হয়, ততদিন অনর্থের শান্তি হবে না—Impersonalism থামবে না। চেতনময় সবিশেষ পাদপদ্ম, যে পা দিয়ে চলে বেড়ান, সেই পায়ের আঙ্গুলস্পর্শযোগ্যতা না হলে তাপত্রয়ের উন্মুল হবে না। বদ্ধজীব আমরা যে মুক্তির জন্য নানাপ্রকারে চেষ্টা-বিশিষ্ট হই, সেটা "মোক্ষং বিষ্ণুঙ্ঘি লাভম্"—উরুক্রমের আঙ্ঘ্রি লাভই প্রকৃত মোক্ষ। ভাগ্যহীন জীব সেই পাদপদ্ম পরিত্যাগ করে নরকের পথে—জড়-বিলাসের পথে অগ্রসর হচ্ছে, চেতনময় কৃষ্ণবিলাসে যোগদানের যে বৃত্তি, সেইটিই উরুক্রমাঙ্ঘ্রি-লাভ। যে পাদপদ্ম ত্রিজগদ্ব্যাপ্ত, সেই চরণ ব্রজজনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।।

বাস্তববস্তুর বিচার পরিত্যাগ করে যখনই অবাস্তব দর্শন হচ্ছে, তখনই ভোগ-বিলাসিতা বৃদ্ধি হচ্ছে—প্রভুত্ব করার যত্ন হচ্ছে, সেব্যভাব গ্রহণ করে তাঁকে সেবক বিচার করে বসছি। 'তিনি আমাদের সেবক, আমাদের ভক্ত,—এ দুর্বুদ্ধি হলে অসুবিধা, তাঁর ভক্ত হলে সকল সুবিধা। তিনি বলছেন—তোমার সর্বেন্দ্রিয় আমার পাদপদ্মে দাও। তোমার ইন্দ্রিয়দ্বারা আমাকে সুখ আস্বাদন করাও, তা হলে তোমাকেও আনন্দের আস্বাদন করাব। আর যাঁরা কলা দেখাবেন, Impersonal (নির্বিশেষ) হবেন, তাঁর শিরশ্ছেদ, হস্তপদাদি খণ্ড খণ্ড করে অস্তিত্ব ধ্বংস করে দেবেন—চোখ গেলে দেবেন, হাত পা কেটে ফেলবেন, তাঁরাই সর্বাপেক্ষা পরম শত্রু। তাঁদের পরিণাম—"সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ"। তা থেকে আরও অধিক শত্রু—যারা বিচার করছেন, নাভিদেশ হইতে মস্তক পর্যন্ত সেবার জন্য থাকুক আর নীচের অঙ্গগুলি অন্য সেবার জন্য থাকুক। তারা 'বর্ণাশ্রমাচারবতা' বিচারে রাধাগোবিন্দের লীলাকে আক্রমণ করছেন। তাদের এই নির্বুদ্ধিতা মূঢ়তা দূর হলে ভক্তিসদাচার জানবেন—রূপসনাতনের কথা জানতে পারবেন। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে গেলে বহু মতবাদের লোক তাঁকে আক্রমণ করেছিল।

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্।।

বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধ মতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রস্থলীয় দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যদিগকে কৃপা-চক্রদ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করে বৈষ্ণব করেছিলেন।

পরমকরুণাময় চৈতন্যদেব রাধাগোবিন্দের কথা দক্ষিণদেশে দিয়ে এসেছিলেন। মাদ্রাজের লোক পার্থসারথীর কথা নিয়ে ব্যস্ত, রাধাগোবিন্দের কথা জানে না। উত্তর ভারতে মহাপ্রভুর পার্ষদ-ষড়্‌গোস্বামী-প্রকটিত সেবাসৌখ্যদর্শনের যোগ্যতা তাদের হচ্ছে না, ইহা তাদের বড়ই দুর্ভাগ্য। চৈতন্যদেবের কথা যাঁদের শুনা হয়নি, চৈতন্যদেবের অনুগ্রহ যাঁদের নিকট পূর্ণমাত্রায় পৌঁছায়নি, তাঁরা ভাগবতের আলোচনাই বুঝবেন না।

ভাগ্যহীন লোকগণ নানা প্রশ্ন করে, ভাগবতে যখন রাধার নাম নেই, তখন গৌরসুন্দর ঐ নাম কোথায় পেলেন? কিন্তু আমরা বলি—কার জন্য থাকবে, বুদ্ধিকম লোকের জন্য থাকবে? মহাপ্রভু 'গোপী' 'গোপী' জপ করেছিলেন। সব নাম পাবে দেখা হলে।

কার নাম আছে? ললিতা, বিশাখা, রূপমঞ্জরী প্রভৃতি কারও নাম নেই বলে তাঁরা কি কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায় পূর্ণাধিকার লাভ করেন নি? চন্দ্রার নামও ত নেই? কার জন্য থাকবে? আমাদের মত নির্বোধের জন্য? নাম নিয়েই বা তারা কি করছে? সাধারণের পাঠের জন্য ব্যাস-শুকাদি ঐ নাম গোপন করেছেন। যাঁদের যোগ্যতা হবে, তাঁরা যত্ন করলে দেখতে পাবেন।

নিন্দন্তং পুলকোৎকরেণ বিকসন্নীপপ্রসূনচ্ছবিং
প্রোদ্ধীকৃত্য ভুজদ্বয়ং হরি-হরীত্যুচ্চৈর্বদন্তং মুহুঃ।
নৃত্যন্তং দ্রুতমশ্রুনির্ঝরচয়ৈঃ সিঞ্চন্তমুর্বীতলং
গায়দ্ভির্নিজপার্ষদৈঃ পরিবৃতং শ্রীগৌরচন্দ্রং স্তুমঃ।।

যাঁর পুলকাঞ্চিত গাত্র প্রস্ফুটিত কদম্বপ্রকাশকে নিন্দা করে, যিনি উর্ধ্ববাহু হয়ে মুহুর্মুহু উচৈঃস্বরে হরিকীর্তন করেন, নৃত্যকালে যাঁর অনর্গল অশ্রুধারা ভূমিতল সিক্ত করে এবং যিনি নিজ গীতকারী পার্ষদগণ-পরিবৃত, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি স্তব করি।

যে মহাপ্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দের কীর্তনকালে সকলভাব-সমন্বিত হয়ে জগতের নিকট নিজের কথা জানিয়ে ছিলেন, যিনি বার্ষভানবীর রসের সহিত রসময়ের ভজনের কথা জগতে সাত্ত্বিকভাবভরে জানিয়েছিলেন, সেই সপার্ষদগায়কবেষ্টিত গৌরসুন্দরকে নমস্কার করি।

আমাদের অসাধুতা অর্থাৎ নিত্য বৃত্তি হতে পৃথক থাকার যে বিচার, তাতে আমরা তাৎকালিক পারিপার্শ্বিক কতকগুলি বৃত্তি-চালিত হয়ে বিপথগামী হচ্ছি বা উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হয়ে ভগবৎ প্রীতি বাদ দিয়ে নিজে প্রীতিসাধনের জন্য যত্ন করছি; তাতে কর্মবাদ বা জ্ঞানবাদ আসে। কর্মপ্রবৃত্তিতে ইহজগতে বাস এবং পার্থিববিচারের মধ্যে আবদ্ধ থাকা হয়, তাতে বাস্তবিক সাধন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। আমরা যখন দেখি যে, কংসের ন্যায় অসুর কৃষ্ণকে ধ্বংস করার জন্য ইহজগতে যত্নবিশিষ্ট, কৃষ্ণ তাকে বধ করলেন, তখন আমরা মনে করি,—"প্রকটলীলায় যেরূপ অসুরবধ, সেরূপ অপ্রকটলীলায়ও নিত্যকাল থাকবে, কৃষ্ণের অসুবিধা হবে, সেই কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করলে কোন সময় হয়ত অসুর প্রবল হয়ে ব্যাঘাত করে বসবে; তাহলে উপদ্রুত কৃষ্ণ বলবান নহেন"। তাতে বিচার এই—এখানে দেবতার মূর্তি অর্চাতে স্থাপিত, এঁরা কথা কইতে পারেন না, ভাবের সমর্থন করেন না, আমরা যে ভাব প্রকাশ করি তা' সমর্থন করতে পারেন না; তাই বলি—এরকম অর্চাকে দেবতা স্বীকার করা প্রয়োজনীয় নয় অর্থাৎ আমরাই অর্চা স্থাপন করি এই সব দ্রব্যাদি দিয়ে; এতে যে চেতনধর্ম আছে, এটি বুঝতে পারি না। আর অপ্রকটলীলায় কংস, অঘ, বক, পূতনাদি অসুরগণের চেতনধর্ম থাকলে সবসময় ত' কৃষ্ণের অসুবিধা ঘটাবে। কিন্তু আমরা শুনেছি, যেখানে ভগবান্, সেখানে মায়িক বিক্রম বা মায়ার অধিষ্ঠান নেই; যেখানে মায়া, সেখানে ভগবৎপ্রীতির অভাব— "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি" ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই মায়ার অধিষ্ঠান। মায়িকরাজ্য-মধ্যে থাকা-কালে ভগবদ্দর্শন হয় না। এখন যে অবস্থা, তাতে ভগবদ্দর্শন সুদুর্লভ। অপ্রকটলীলায় যে ভগবানের অবস্থান, তা মায়ায় থাকা বুদ্ধিকালে গোচরীভূত হচ্ছে না। সেখানে মেপে নেওয়া বুদ্ধি যাবে না।

এখানে যেমন আর্চাবিগ্রহে চেতনধর্ম নেই বলে বিচার বা সেখানে কংসাদির চেতনধর্ম থাকলেও বিপ্লব উপস্থিত করবে, চিদ্রাজ্যে অবরতা প্রবেশ করবে, এরূপ আশঙ্কা হয়, তাতে বলছেন, নিত্যে অপ্রকটলীলায় অভিমন্যু প্রভৃতি কৃষ্ণভোগের ব্যাঘাতকারীর অধিষ্ঠান নেই। এখানে যেমন চিত্র, তাতে বস্তুর অধিষ্ঠান নেই, সেখানে সেইপ্রকার কংসাদি পুত্তলের আকার আছে, তাদের চেতনধর্ম নেই। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে বলেছেন, নিত্যলীলায় সেই সকল অসুর-ধর্মাবলম্বী কৃষ্ণবিরোধী জিনিষগুলির অস্তিত্বে অচেতনতামাত্র আছে। ইহজগতে যেমন আমরা অর্চাতে অচিৎ-মিশ্র-দৃষ্টিতে চেতনধর্ম দেখতে পাই না, তেমনই মুক্ত হলে সে-জগতে অবরতা, হেয়তা প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবানের প্রীতিসম্পাদক পাঁচপ্রকার ভৃত্য সেখানে পূর্ণচেতনাবস্থায় আছেন। এখানে পাঁচ প্রকারের মিশ্র-চেতনধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তি কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে অবস্থান করছে। সেখানে শুধু ভগবান্ ও তদাশ্রিত ব্যাপার। যেখানে অনুপাদেয়তা, সেখানে উপাদেয়তা। অবিমিশ্রচেতনরাজ্য ও মিশ্রচেতনরাজ্যে পার্থক্য আছে। মিশ্রচেতনরাজ্যে চেতনধর্ম থাকলেও স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করতে পারে না। যেমন ইলেকট্রিক্ পাখাতে আর একটা শক্তি না এলে তার নড়বার ক্ষমতা হয় না। শরীরে চেতনধর্ম না এলে সেটা খোসা মাত্র। এখানে অচেতনের ভিতরে চেতনের বিকাশ—চিদচিন্মিশ্রভাব। এখানকার অচিৎ স্থূল-সূক্ষ্মভাব সেবাবৈমুখ্যবশতঃ পরব্যোমে যেতে পারে না। সেখানকার অবিমিশ্র চেতনধর্ম এখানে আসতে পারে না। আসতে হলে জড়ের আকারবিশিষ্ট দ্রব্যের গৃহীত ভাব সংগ্রহ করে সূক্ষ্ম উপাধি কল্পনা করে থাকে। যেমন দয়া বলে যে শব্দটি, তাতে আমরা আলোচনা করতে পারি, একজন দান করছেন, একজন গ্রহণ করছেন। চিত্তে দয়া বস্তুটির মূর্তি না থাকলেও চিত্তে উদিত ভাবের দ্বারা জানতে পাচ্ছি। বহির্জগতের সংগৃহীত ভাব স্থায়ী নয়, পরিবর্তিত বা বিকৃত হয়; সেখানে পরিবর্তনশীলতা নাই, নিত্যধর্ম বিরাজমান। নিত্যবস্তুর মালিক ও তদধীন সম্পত্তি—সব চেতনময়; তাতে অচেতনতা—অবরতা বা অসম্পূর্ণতা নাই। এখানে পূর্বাপর স্মৃতির উদয় নাই, বর্তমানটাই কেবল জানি—বর্তমান নিয়েই বিচার করতে পারি। সেখানে সব জিনিষ নিত্যকাল আছে; জ্ঞান সংগ্রহ করে নিতে হয় না। এখানে যেমন শিশুকে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান লাভ করে নিতে হয়, শিশু অপেক্ষা যুবক অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করে থাকে, তদপেক্ষা বৃদ্ধ আরও অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করে, সেখানে সেরূপ নয়। সমগ্র জিনিষের পূর্ণ সমাবেশ আছে, কোন অভাব নাই। আর অভাব বলে যা আছে, তাতে পূর্ণতার—আনন্দের অভাব নাই, অভাবেও পূর্ণতা সাধিত হচ্ছে। ওখানকার বাস্তব-বিচিত্রতা এবং এখানকার বিচিত্রতার সৌসাদৃশ্য থাকলেও দুইটি এক নয়। এদেশের অবরতা-ধর্ম, ক্লেশ, অসম্পূর্ণতা সে-দেশে নিয়ে যেতে হবে না। বিচিত্রতাপূর্ণ ভাবসমূহ সেখানে পূর্ণমাত্রায় আছে। এতদ্দেশে সাহিত্যে, অলঙ্কার শাস্ত্রে

যে রসের আলোচনা, পঞ্চমুখ্যরস ও সপ্তগৌণরস এখানে যেমন বাধা-প্রাপ্ত হয়, সেখানে তা নয়; প্রত্যেক বস্তুর নিত্যতা আছে, অজ্ঞান প্রবেশ করতে পারে না, একের সাহায্যে অন্যের কিছু করতে হয় না। ইতরব্যোমের হেয়তা, অবরতা বা অপ্রার্থিত (দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি) ব্যাপারগুলির দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে সেখানে যেতে হয়। সেখানে পূর্ণতা ও পরমচমৎকারিতা আছে; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না---যেমন মেঘে আবৃত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। আবরণকারী আবৃত বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করে না। কিন্তু আমরা আবরণকারীর কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, আবৃত বস্তুকে দেখতে পাই না।

সেবা-চেষ্টার ব্যাঘাত হলে, অহঙ্কার-বিমূঢ়তা-বশে প্রভু হবার যত্ন হলে গুণজাত জগতে বাস হয়। রজঃসত্ত্বাদিগুণ-দ্বারা আচ্ছন্ন হলে হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিতের কারুণ্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। শক্তিত্রয়ের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে মিশ্রগুণবিচারে বিচিত্রতা-কারিণী শক্তিকে এরই পর্যায়ভূক্ত করি। কিন্তু নির্মৎসর ও সাধুগণ এসকল অসুবিধায় পড়েন না, তাঁরা পরমধর্মে অবস্থিত, পরশ্রীকাতর নন, সকলেই ভগবৎপরায়ণ। ভগবৎস্মৃতিরহিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই পরশ্রীকাতরতা-ধর্ম অবস্থিত। কামাদি পঞ্চবিধ অমঙ্গলের ভৃত্যধর্মে নিযুক্ত হলেই পরশ্রীকাতরতা আসে। অপরের কেন সুখ হবে, আমিই সুখকে একচেটে করে নেব, এজন্য 'আপন নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ' ন্যায় অবলম্বন করি। পরমধর্মের আলোচনা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্তব্য। আমি কামী হব, ক্রোধী হব, লোভী হব, প্রমত্ত হব প্রভৃতি বিচারপ্রণালী হতে অবসর গ্রহণ করা কর্তব্য। কামুক, ক্রোধী, লোভী, মূঢ় বা প্রমত্ত হবার যোগ্যতা এখানে আছে; ঐগুলোর সমষ্টি একীভূত হলে মৎসরতা আসে। যদি এগুলোর সেবা না করি, তাহলে মৎসরতা থাকবে না। কিন্তু বর্তমানে বড়ই প্রয়োজন হয়েছে, কামাদি রিপুকে প্রভু সাজিয়ে তাদের চাকরী করা; ভগবানের সেবা করব না। তাঁর সেবা করলে এদের সেবা করা হয় না। যাঁরা ভগবানের সেবা না করেন, তাঁরা রিপুষট্‌কের দাস। মৎসরদের ইতরধর্ম যে সকল শাস্ত্রে আলোচিত হয়, তাতে বাস্তববস্তুর অভিজ্ঞান পাওয়া যায় না। ভাগবতেই বাস্তববস্তুর অভিজ্ঞান আছে। বস্তু প্রতিম 'পদার্থ' আমাকে ভোগা দেয়, বিপথগামী করে। নির্মৎসর ও সাধুদের পরমধর্ম নিত্য বর্তমান, চেতনধর্মযুক্ত তাঁরা নিত্যের প্রতি সেবাচেষ্টাবিশিষ্ট, অনিত্যের জন্য চেষ্টা নাই। কিন্তু কর্মের ফলসকল অনিত্য, যেমন--কর্পূর বা স্পিরিটজাতীয় দ্রব্য মুখখোলা থাক্‌লে উপে যায়, তদ্রূপ কর্মার্জিত দ্রব্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—ধ্বংস হয়। এদেশের স্বভাবই এই। অনিত্য, যা নিত্য স্থিতিবান্ নয়, তাতেই আমাদের আগ্রহ। আমরা ভবিষ্যৎ দেখি না। ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রে দ্রব্য রাখলে যেমন সব গলে প'চে যায় বা বানর যেমন ধান সংগ্রহ করে বগলে রাখে, আবার সংগ্রহ করতে গেলে সেটা পড়ে যায়, সেই রকম ক্ষয়িষ্ণু জিনিষের জন্য যে সংগ্রহ-চেষ্টা, তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়, সংগ্রহকার্য সফল হয় না বা সে সাফল্যটাও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। যাঁরা নিত্যত্বের আলোচনা করেন, তাঁদের

রিপুষট্‌কের ভৃত্যত্ব করা কর্তব্য নয়। আমাদের বর্তমান অবস্থাকে পরিবর্তন করে অন্য অবস্থায় নীত হব, এটাও চাঞ্চল্য মাত্র। পরিবর্তনশীল বস্তুর সংগ্রহের জন্য যাদের উৎকট পিপাসা—নিত্যানিত্যবিবেক যাদের হয় নি, তারা কর্মরাজ্যে নিজেন্দ্রিয় প্রীতিজন্য মৎসরতা-ধর্মে অবস্থিত হয়ে অন্যের ক্ষতি করতে ব্যস্ত। নির্মৎর না হলে পরমধর্মের কথা কানে আসে না। যেটা নৈষ্ফল্য উৎপাদন করবে, মৃত্যুই যার শেষ বরণীয়, তাতে ব্যস্ত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য নয়, আপাতসুখ বা দুঃখের জন্য ভবিষ্যদ্দর্শীর চেষ্টা নাই। যে জিনিষের স্থায়িত্ব বিধান করতে পারবো না, নিজের বা নিজদলের ক'একটা লোকের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সেই সকল অনিত্যের সেবা কেন করবো? চিদচিৎ বিবেক বলে একটা ব্যাপার আছে, বুদ্ধিমান্ লোক মাত্রেরই সেটা চিন্তনীয় হওয়া দরকার।

বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞান তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ভোগী বা ত্যাগীর নিকট প্রতিভাত বস্তুগুলি ভোগ্য পদার্থ—সেবকজাতীয়। কিন্তু সেব্যজাতীয় পূজ্য না হওয়ায় সেইসকল বস্তুদ্বারা তাঁর স্মৃতির সম্ভাবনা থাকে না। আমরা যা ভোগ্য-বিচারে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে গ্রহণ করি তা কখনই সেব্য হতে পারে না। এজন্য ভগবদ্বস্তুকে 'অধোক্ষজ'-শব্দে উদ্দেশ করা হয়েছে অর্থাৎ যে বস্তু আপনাকে জৈবজ্ঞানের—বদ্ধজীবের জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে সর্বক্ষণ অবস্থিত রাখতে পারেন, তিনিই অধোক্ষজ। তিনি আরোহ, অধিরোহপন্থীদের প্রাপ্য বস্তু নহেন। তিনি যখন স্বেচ্ছাক্রমে অবতরণ করেন, তখনই আমাদের দৃগ্‌গোচর হন। এজন্য শ্রুতি বলেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।"

ভগবানের তনু কেহ এই চক্ষুদ্বারা দর্শনে সমর্থ হন না। এইপ্রকার চক্ষুদ্বারা সীমাবিশিষ্ট বস্তু দেখা যায়। তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু, এই চক্ষুদ্বারা তাঁকে দেখা যায় না, এই কর্ণদ্বারা তাঁর কথা শোনা যায় না, এই নাসাদ্বারা তাঁর নির্মাল্যের আঘ্রাণ লওয়া যায় না, এই জিহ্বাদ্বারা তাঁর উচ্ছিষ্ট আস্বাদন করতে পারা যায় না, এই মনে তাঁর চিন্তা হয় না। তিনি যদি তাঁকে সর্বকাল সর্বতোভাবে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তিপরিচালন-যোগ্য ভূমিকা হতে পৃথক না রাখতেন, তবে বাহ্য ভোগ্যবস্তুরই অন্যতম হতেন। তাহলে তিনি পূজ্য, আমাদিগকে তাঁর আশ্রয় নিতে হবে—এসকল কথা মনোমধ্যে উদিত হত না। এজন্য আমাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি অধোক্ষজ অর্থাৎ বদ্ধজীবের জ্ঞান-ভূমিকার ব্যাপারবিশেষ নন্। এখানে কথা হতে পারে—'অপরোক্ষ'-শব্দেও ত তাঁকে বুঝা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নয় যা, তাই অপরোক্ষ। তাতে একত্বের সমাধান আছে, কিন্তু বহুত্ব নেই। যেখানে বিচিত্রতার বহুত্ব আমাদের চিন্তাস্রোতকে রোধ করে—সীমাবিশিষ্ট পদার্থ আমাদের আলোচ্য হয়—দ্রষ্টৃসূত্রে সেই বস্তুকে ভোগ করি—তাঁকে দৃশ্যমাত্র জ্ঞান করি, শ্রীমূর্তির নিকট এসে এই পোড়া চোখ দিয়ে তাঁকে দেখতে প্রয়াস করি, সেখানে আমাদের

অক্ষজজ্ঞানপ্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। সেজন্য অধোক্ষজবস্তুই দ্রষ্টব্য। ভগবদ্বস্তু সাক্ষী, কেবল, চেতা, নির্গুণ। তিনি দয়াপূর্বক যদি আমাদিগকে দর্শন করেন, আমরাও যদি তাঁর দেখার উপযোগী হয়ে যেতে পারি, তবেই তাঁর দর্শন সম্ভব হতে পারে। শ্রীবিগ্রহকে যদি ভোগ্যজ্ঞান করি, পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, অপরাধক্ষালনের জন্য, ভবরোগের ঔষধ জ্ঞান করে দর্শন করতে যাই, তবে তিনি আমাদের মলিনচিত্ত দেখে দুঃখিত হয়ে দর্শন না করতেও পারেন। সেজন্য চিত্তের মলিনতাকে পরিমার্জিত করে গেলেই ভাল হয়। শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশক জগদ্‌গুরুসূত্রে মলিনহৃদয় আমাদের মঙ্গলের জন্য বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন সর্বোপরি জয়যুক্ত হউন। কীর্তন অর্থে—যাঁর বর্ণনে জীবের বৈকুণ্ঠবস্তুর শ্রবণাধিকার হয়। যদি বৈকুণ্ঠবস্তু কীর্তিত হন, তবেই শ্রবণ করতে পারি। কিন্তু বর্তমানে আমরা এমনই সেবাবিমুখবুদ্ধিতে বাস করি যে, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি না হলে কীর্তন শুনতে প্রস্তুত নই। এজন্য তৌর্যত্রিকগণের মঙ্গলার্থ কৃষ্ণকথা কর্ণরসায়ন হবে বলে গীতিমুখে কীর্তনের ব্যবস্থা। যারা গীতি ব্যতীত সাধারণ সাহিত্য শুনতে বিমুখ, তাদের জন্য বিভিন্ন decoration দিয়ে (যেমন চিনির দ্বারা তিক্ত বস্তুকে আবৃত করে দেওয়া হয়, সেইভাবে) হরিকথা কীর্তন করি। যদি তারা আগে থাকতেই ঠিক করে রাখে—কৃষ্ণ কথা শুনবো না, শুনলে আমাদের ভোগবুদ্ধি হ্রসিত হবে, হরিকথা বাদে আর যা কিছু শুনতে উৎকর্ণ আছি, প্রভুসজ্জায় সজ্জিত হয়ে লোকের নিকট ভোগের দাবী করার কথা শুনতে প্রস্তুত আছি, তাদের মঙ্গলার্থই হরিকীর্তন। যেমন গরু খড় না খেতে চাইলে খইল নুন্ মেখে দেওয়া হয়, সেরূপ হরিকথা সহ কিছু রোচমানা প্রবৃত্তির ভাব সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। তাহলে গান-শোনা-প্রবৃত্তি থেকে কিছু রাইকানুর গান শুনতে পারি। শ্রবণকে আকর্ষণ করবার জন্য কীর্ত্তন।

কেউ কেউ বলতে পারেন, কৃষ্ণ একটী দুর্নৈতিক, ঐতিহাসিক নায়ক, তাঁর কথা শুনে কি হবে, তা ছেড়ে নেপোলিয়ানের বীরত্বের কথা শুনবো। সেরূপ বিভিন্ন ধর্মে অবস্থিত থাকলে যাবতীয় মলিনতা দূর করবার জন্য কৃষ্ণকীর্তন আবশ্যক হয়। যেমন গানে হরিণের ও সাপের চিত্তবৃত্তি স্তব্ধ হয়, সেইপ্রকার গীত-যোগে হরিকথা কীর্তিত হলে কাব্য-রসামোদিগণেরও চিত্ত হরিকীর্তনে আকৃষ্ট হয়।

সম্যক্ কীর্তন বললে নীরস, বিরস, রসরহিত পথের পথিক যারা, তাদের বিচার-প্রণালীকে বাদ দেওয়া। এমন কি, বেদের শিরোভাগ উপনিষদে যে বিরাগ-কথা আছে, বিরাগ উপস্থিত হলেই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করবে (যদহরেব বিরজ্যেত, তদহরেব প্রব্রজেৎ), তারও মূল্য সংকীর্তনের নিকট তুচ্ছ। জড়ের সীমাবিশিষ্ট কথা আমাদের আদরের বিষয়। তদ্-বিপরীত ভাবটি বিরাগ, উহা বিলাসরহিত। জড়েন্দ্রিয়-বিলাসের স্তব্ধতাই বিরাগ। আমাদের আনন্দবর্ধন হবে জেনে আমরা বিলাসে ধাবমান হই, কিন্তু বিলাসের পরবর্তি-ফল ক্লেশের ভূমিকা বলে যখন আমরা বুঝ্‌তে পারি, তখন বিলাসকে

স্তব্ধ বা সংযত করে থাকি, উহাই বিরাগ।

শ্রেয়ের বিচার করলে জড়বিলাস—প্রেয়ের প্রতি আমাদের যে রোচমানা প্রবৃত্তি, তা হতে নিবৃত্ত হতে হয় কিন্তু মৎস্যধর্ম্মের বশীভূত হয়ে ভোগরূপ টোপ খেলে আনন্দ হবে মনে করে বঁড়শিবিদ্ধ হয়ে যাই। ইন্দ্রিয়ের বিলাস করতে যেয়ে এই অসুবিধা পেলে তখন বিরাগ-শাস্ত্র আলোচনা করি—উপনিষৎ, দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনা করে মুক্তিলাভের বিচার-বিশিষ্ট হই—আপাত-প্রেয়ঃ-কাব্যরসামোদ হতে বিরত হয়ে একটা অবস্থা পাব মনে করি। উপনিষদ্ পাঠ করলে জড়বিলাস ত্যাগ করে জড়বিরাগের উৎকর্ষ ধর্মে চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয়। তখন মনে করি—ত্যাগটা বড় জিনিষ, ভোগ ক্লেশপ্রদ, ত্যাগই দরকার, সেইটিই আমাদের বেশী উপযোগী। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, ত্যাগের বাসনা বেশী হলে আত্মহত্যা হয়ে যায়। তাই ভাগবত বলেন—"ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ"।

উহা অত্যন্ত বিলাস বা বিরাগ নয়। অতি আসক্তি বা অতি বৈরাগ্য অপ্রয়োজনীয়। আবার বিরাগ অপ্রয়োজনীয় বলে কি আসক্ত হয়ে যাব ? এর একটি সুষ্ঠুবিচার বলছেন—কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি করতে হবে; সেই ভক্তির প্রথম সোপান—নাম-সংকীর্তন। 'কাঁহার কীর্তন' বলতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব বললেন—শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন। সকলে মিলে যে কীর্তন, উহাই সংকীর্তন—'বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্তনং তদেব সংকীর্তনম্।' কেউ যদি বলে, নির্জনে বসে ধ্যান করবো, কিন্তু তাতে বহু বিরুদ্ধধর্ম বর্তমান। গমনের ভিন্ন ভিন্ন সরণি আছে, কোন্‌টী গ্রহণ করব জানি না। যখন আমরা ধ্যান করবার জন্য কপাট বন্ধ করে বসি, তখন অন্যান্য প্রবৃত্তি সকল আমাদিগকে টেনে নেয়—পূর্বসঞ্চিত অবিচারের কথা প্রবলতা লাভ করে আমাদের সর্বনাশ করে। বহুলোকের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি, তাতে যে অভাব আছে, সেটা পূর্ণ হতে পারে—সংকীর্তনে। যখন সকলে এক তাৎপর্য্যপর হয়ে প্রপূজ্য বস্তুর কীর্তন-মুখে শব্দ উচ্চারণ করি, তখন প্রত্যেকেরই হৃদ্‌গতভাব এই যে, কাকে ডাক্‌ছি, কিজন্য ডাক্‌ছি এবং এর ফল কি? ধ্যানাদিতে পরের সাহায্য পাই না। বধির না হলে—হরিকথা শুনবার কাণ থাকলে আমরা জানতে পারি—সম্যক্ কীর্তন দরকার। উহা বৈকুণ্ঠকথা, গ্রাম্যকথা আলোচনা নহে।

কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্তি। তাঁর কীর্তনই সম্যক্-কীর্তন। নৃসিংহ-লীলার কীর্তন করলে—ভক্তবৎসল, ভক্তবিঘ্নবিনাশন ভগবানের করুণ, বৎসললীলার কীর্তন করলে বল, দৃঢ়তা লাভ করতে পারি; কিন্তু তাতে ভক্তবৎসল ভগবানের সম্যক্ কীর্তন হয় না—ভক্তবৎসলের সমগ্র কৃপালাভে যত্নের ক্রটী থাকে। যদি জানতে চাই, নৃসিংহদেব কার অবতার? কেউ বলতে পারেন—নির্বিশেষব্রহ্মের অবতার, তা' নয়। জয়দেব বলেছেন,— বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে

দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।

পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।।

এরা কৃষ্ণেরই অবতার—তাঁর অংশকলা হতে জাত। কিন্তু এঁদের দ্বারা সকল রসের সমাধান হয় না। গীতায় ভগবান্ বলেছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর—সকল ভাবেই ভগবানের উপাসনা করতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণ ঐশ্বর্য ও মাধুর্যভেদে নিজ নিজ বৃত্তিদ্বারা ঐ বস্তুরই উপাসনা করেন। শান্তরসের রসিকগণ অবতার-বিশেষের উপাসনা করেন। দাস্যরসে মারুতি-বজ্রাঙ্গজী রামচন্দ্রের উপাসনা করেন। সখ্যরসে অর্জুন, বাৎসল্য-রসে বসুদেব-দেবকী কৃষ্ণচন্দ্রের উপাসনা করেন। উপাস্যবস্তুর যতরকম আকার হয়েছে, সে সকল স্বয়ংরূপের আকার থেকে কিছু পার্থক্য লাভ করেছে। কিন্তু তাতে পূর্ণতমতার অভাব আছে। এইজন্যই ভাগবত বলেছেন,—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" অর্জুনের কৃষ্ণসান্নিধ্য গৌরবসখ্যযুক্ত। তদপেক্ষা শ্রীদাম-সুদামাদির বিশ্রম্ভসখ্যের পরিচয় পেয়ে থাকি। তাঁরা, কান্তাগণ, পিতৃমাতৃবর্গ, চিত্রক-পত্রক প্রভৃতি দাসবৃন্দ, তাঁরা সিংহাসন, ব্যজন, পাঁচনবাড়ি যে প্রকার সেবা করেন, সেই সকল সেবাধর্মে যে কীর্তন আছে, সব একত্রিত হলে সম্যক্ কীর্তন হয়। পঞ্চরসরসিক একত্র হলে সম্যক কীর্তন হয়। কেনা টিকিটের শেষগতি পর্যন্ত না গেলে তা হতে দূরের কথা জানতে পারা যায় না।

ইহজগতেও আমরা পঞ্চরসের রসিক হয়ে বাস করছি, রসকে generate (রসোৎপত্তি) করছি; কিন্তু তাতে কৃষ্ণ নেই। কৃষ্ণে যে পূর্ণরস আছে, যদি তার ভিক্ষুক হই—রসগ্রহণের ভাণ্ডার অন্য জিনিষে পূর্ণ না করি—সম্পূর্ণ রিক্ত রাখি, তবে কৃষ্ণরস পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করতে পারব। চৈতন্যদেব বলেছেন,—চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়, সাংসারিক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কৃষ্ণ কীর্তনের দ্বারা। অখিলরসামৃতমূর্তি-কৃষ্ণলীলা শ্রবণ দ্বারাই সম্যক্ কীর্তন হবে, অন্য অবতারের কথা শুনলে হবে না। লক্ষ্মীনারায়ণের কীর্তন অপেক্ষা—রামের কীর্তন অপেক্ষা কৃষ্ণকীর্তন, মথুরেশ অপেক্ষা--ব্রজেন্দ্রনন্দনের কীর্তনই সর্বতোভাবে জয়যুক্ত। কৃষ্ণকীর্তন হলেই পূর্ণতমতার বাকী থাকে না, যত অভাব আছে, সকল অভাব থেকেই অবসর প্রাপ্তি হয়।

জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্যাসীদ্রসঃ।

পণ্ডিতেরা কে কত পাণ্ডিত, এই বলে বৃথা তর্কবিতর্ক করে দিন কাটাচ্ছেন। গৃহব্রতগণ স্ত্রীপুত্রাদি কথায় বড় আনন্দলাভ করছেন। "তনয়ো হি ভবেৎ পুংসাং হৃদয়ানন্দদায়কঃ" বিচার হয়েছে। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এই প্রকার নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। যখন শ্রীচৈতন্যদেব ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করলেন, তখন ঐ সব জড়রস

থেমে গেলে, ভক্তিরস প্রবল হল। সর্বাপেক্ষা প্রধান কর্তব্য বিচার্য হলে অন্যান্য কর্তব্য থাকে না। যাঁর যত পাণ্ডিত্য আছে, সব ছেড়ে দিলেন। মহামহা যোগীসকল সমাধিলাভের জন্য যমনিয়মাদি চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। হঠযোগ বা রাজযোগ-প্রণালী—কর্ম বা জ্ঞানযোগ-কথা সব ছেড়ে দিলেন। যাদের যা আস্বাদ্য পদার্থ হয়েছিল, যার যে রস প্রিয় বলে মনে হয়েছিল—যেমন বিষ্ঠার মাছি, সে পূতিগন্ধের দিকে দৌড়বে, সুগন্ধি ফুলের কাছে যাবে না; কতকগুলি লোক রাজসিকী, কতকগুলি তামসিকী, কতকগুলি সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয়ে জড়রসভোগে প্রমত্ত হয়ে শান্তিতে বাস করবার জন্য চেষ্টা করছিল; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যখন কৃষ্ণভক্তিরস প্রচার করলেন, তখন যার যেটাতে রসবোধ হচ্ছিল, সব রস কেটে গেল। জড়রসভোগী ও ত্যাগীর যথাক্রমে (জড়) রসসাহিত্য ও রসরাহিত্য-বিচার। পরমেশ্বরের সেবা যাঁরা করেন, তাঁদের সেবা করতে হবে—তাঁদের সংস্রবেই থাকতে হবে। একতাৎপর্যপর হয়ে এই সর্বজনের প্রয়োজনীয় ব্যাপার আলোচনা করা দরকার। যাঁ হতে শুধু এই ইন্দ্রিয়জজ্ঞানগম্য জগৎ নয়, অনন্তকোটী জগৎ উদ্ভূত হয়েছে, তাঁর কথা আলোচনা করা দরকার। ঈশ্বরবিমুখ লোকের মধ্যে কামের অতৃপ্তিতে ক্রোধ; ক্রোধের উদয়ে লোভ-মোহাদি অশান্তিপ্রদ অবস্থার উদয় হয়। কিন্তু Harmony—প্রেম তা হতে স্বতন্ত্র জিনিষ। ঈশ্বরের প্রতি খুব বেশী অনুরক্ত না হলে অপরের বিদ্বেষকে প্রেমা বিচার করা হয়।

যদি পূজ্যবস্তুর সেবা গ্রহণ করি, তাহলে নরকে যেতে হবে। শিলার নিকট থেকে সেবা নিতে পারি, পাথরের থাম দিয়ে বাড়ী তৈরী করতে পারি; কিন্তু অর্চ্য বিষ্ণু-শালগ্রামকে গণ্ডকীশিলা মাত্র বুদ্ধি করলে ভুল হয়। গুরুকে লঘুজ্ঞান করলে নরকে গমন করতে হবে। অবস্তুর সঙ্গে বাস্তব বস্তুর সমত্ববিচার ঠিক নয়। জাগতিক পদার্থের সঙ্গে তজ্জাতীয়ের সমতা হোক; তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু পরজগতের কথার সঙ্গে ইহজগতের কথাকে সমান করার চেষ্টা মূর্খতামাত্র। বিষ্ণুসেবার জন্য যাঁরা ব্যস্ত, বিষ্ণুমায়ার প্রভু হবার জন্য ব্যস্ত নন, তাঁদের অন্যলোকের সঙ্গে সমান বিচার, প্রভুর সহিত দাসকে সমান-বুদ্ধি, বিষ্ণুপদধৌত গঙ্গাজল, বৈষ্ণবের পাদোদক প্রভৃতিকে অন্য জলের সঙ্গে সমান-বুদ্ধি ঠিক নয়। হবে দুটোই সমান, কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। একটির স্বাভাব এমন যে, জড়জগৎ ধ্বংস করে কেবল চেতনধর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, আর একটি ঠিক তার বিপরীত। Seeming feature-এ ঠিক আছে; কিন্তু সেটা ভিতরে নাই। গুড়ের নাগরীর উপরে খানিক গুড় দিয়ে ভিতরে শেয়ালের হাড় প্রভৃতি যেতে পারে; সন্দেশের সঙ্গে ময়রার নাকের পোঁটা, ঘাম থাকতে পারে; কিন্তু বাস্তবসত্যকে ঐ প্রকার মিশ্রভাবের (adulteration) মধ্যে ফেললে সর্বনাশ। পরমার্থকে ordinary economy সঙ্গে, নিপুণকে অনিপুণের সঙ্গে, শিক্ষিতকে অশিক্ষিতের সঙ্গে,

পারমার্থিককে অপারমার্থিকের সঙ্গে সাম্যবিচার পয়সার জোরে করা যেতে পারে; কিন্তু তা হলে 'পদ্মানীতি' হয়ে যায়।

কৃষ্ণচেতা যারা নয়, তাদের দুঃখ অবর্ণনীয়, তারা নিজের বিচারানুসারেই দুর্গতি লাভ করেছে। তা থেকে অবসর পাওয়া দরকার। পুরূরবার কাম হতে বেদত্রয়ী আরম্ভ হল। পুরূরবা উর্বশীর রূপদর্শনে মোহিত হয়ে কর্মকাণ্ড আরম্ভ করেছিলেন। রূপরসাদি বাজে জিনিষে আকৃষ্ট হওয়ায় কৃষ্ণ-দর্শনে ব্যাঘাত ঘটে। Aesthetic culture-এ relative activity বর্তমান, উহা empericist-দের বিচার।

'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য, শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য, যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং' প্রভৃতি ভাগবতের শ্লোক যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা জানেন যে, ঐকার্য্যে অগ্রসর হয়ে পরিণামে বিফলমনোরথ হতে হয়—বাস্তবিক অজ্ঞানেই স্থায়িভাবে থেকে যেতে হয়। মুক্তিকামী কপটতা আশ্রয় করে Henotheism-এ সময় কাটিয়ে Impersonal হয়ে নিজের নিজস্ব—গুরুর গুরুত্ব পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলেন।

আমরা কৃষ্ণ-বিমুখের সঙ্গ হতে সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত থাকবো। ভাগবত-শ্রবণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সহিতই আমাদের সম্বন্ধ। সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির নিকটই ভাগবত কীর্তন করতে হবে। তবে যারা দুঃখে পড়ে আছে তাদের উদ্ধার আমাদের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু আজকাল তাতেও বিপদ। দুই পক্ষে ঝগড়া চলছে। তৃতীয়পক্ষ তাদের ঝগড়া মেটাতে গেলে লাঠিটা তারই ঘাড়ে পড়ে। জলে ডোবা লোককে যে উদ্ধার করতে যাবে, তাকে চেপে ধরে জলমগ্ন ব্যক্তি ডুবিয়ে দিতে চায়। 'ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।' বিদ্বেষীকে incorrigible জেনে দূরে রাখতে হবে। অশ্রদ্ধধানে হরিনাম দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু তাদৃশ জনগণ গুরুর কাছে হরিনাম-গ্রহণের অভিনয় করে বিপথগামী হচ্ছে। গুরুও বলছে যা ইচ্ছা কর, বার্ষিকটা দিও। কিন্তু অপরাধযুক্ত হলে হরিনাম হয় না। "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ, মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ" বিচার না করে যার যার গুরু তার কাছে, সয়তানের গুরু, চুরি করার গুরু হলে চলবে না। ঠাকুর ঘরে পূজা করবার জন্য কেউ যায়, আবার কেউ বা চুরি করার জন্যও ঠাকুরঘরে ঢোকে—এ রকম ভাগ্যহীনতার কথাও অনেক শুনতে পাই। ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন,—

'অসত্যেরে সত্য করি মানি বা অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু'।

শ্রীভগবান্ গীতায় "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ" এই গানটি শুনাচ্ছেন। "অনয়ারাধিতঃ" আর "অনয়া মীয়তে"—এই দুইটি বিচার আছে; এর প্রথমটি ভক্তি, দ্বিতীয়টি অভক্তি। একটি মাপ দেওয়ার বিচার, আর একটিতে মেপে নেওয়ার বিচার। মেপে নেওয়া ধর্মে আবদ্ধ যারা, তারাই বদ্ধ। মুক্তপুরুষের কৃষ্ণের কি কথা আছে, আলোচনার নামই

মুক্তি; আমাদের কথা দিয়ে কৃষ্ণকে না মেপে কৃষ্ণের কথা দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের বিচারই মুক্তপুরুষের বিচার।

শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন,—"মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভম্।" মুক্তি হলেই ভক্তি আরম্ভ হবে। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেছেন,——

"নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্তঃ।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।।"

হে হরিনাম প্রভো, হে বৈকুণ্ঠনাম, হে মুক্তকুলোপাস্য, আপনাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করি। বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণে সমস্ত অঘ দূরীভূত হয়, সূর্য প্রখর হলে যেমন আকাশের কুজ্ঝটিকা সমস্তই কেটে যায়, তেমনি মুক্তপুরুষের উচ্চারিত নাম শ্রবণ করে উচ্চারণ করতে করতে সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে আলো হয়ে যায়।

কিন্তু তাঁকে পেতে গিয়ে আমাদের মলিনতা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে সচ্চিদানন্দ—বাস্তব সত্যবস্তুর অনুসন্ধানের পরিবর্তে অসৎ, অচিৎ, অনিত্যানন্দপ্রধান সত্যাভাসের অনুসন্ধান হয়ে যাবে—রজঃ সত্ত্বতমোগুণমধ্যে আপেক্ষিকতা-চালিত হয়ে দুর্গতিই বরণ করব।

একদিকে ভক্তি, অপর দিকে অভক্তির বিচার। কৃষ্ণ ও ভক্তের মধ্যস্থলে ভক্তিরসটি বর্তমান। ভক্ত ভক্তিরসযুক্ত হয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেন। ভজনীয় বিচারে কৃষ্ণই পূর্ণ—সর্বোত্তম, তিনি অখিলরসামৃতমূর্তি।

শ্রীচৈতন্য ভগবানের যাবতীয় লীলা-কথার উত্তরোত্তর উন্নতির উপদেশকসূত্রে মহাবদান্য। সেই দয়ার কণমাত্র লাভ করিবার পিপাসু যাঁহারা তাঁহারাই হরিভজনের সর্ব্বোত্তম অনুশীলন বুঝিতে পারেন। শ্রীগুরুদেব সেই শ্রীগৌরসুন্দরের পক্ষে প্রতিভূ হইয়া স্বীয় পরম নির্ম্মল লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সকল কথা দেখাইয়া দেন। যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই চরম ও পরম প্রয়োজন, সেই প্রেমার কথা শ্রীগৌরপদসেবীর নিকট হইতেই পাওয়া যায়।

হেয়, বিরোধী, পরিচ্ছিন্ন মলিম্লুচাবৃত ভেজালমিশ্রিত চিন্তা-স্রোতের সহিত শুদ্ধা-ভক্তির সোপানগত কোন সম্বন্ধ নাই, পরন্তু পরিহারযোগ্য বিজাতীয় ভেদ আছে—ইহা মায়াবাদি-সম্প্রদায় বুঝিতে না পারায় রজস্তমোগুণমিশ্রিত সাত্ত্বিকভাবের সুনীচ প্রকাশকেই তাঁহারা ভক্তি বলিয়া অভিহিত করেন এবং শুদ্ধভক্তির অন্তরালে যাবতীয় অভক্তির তাণ্ডব-নৃত্যকেও ভক্তির প্রকারভেদ জানিয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ-ভোগ-ত্যাগ প্রভৃতি বিজাতীয় বস্তুকে আত্মীয়জ্ঞানে ভক্তির ব্যূহ বলিবার ধৃষ্টতা করেন। ইহার তারতম্য প্রদর্শন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যাস গুরুদেব চারিসম্প্রদায়-কর্ত্তৃক অনর্থনাশিনী চেষ্টার উল্লেখ করিয়াছেন। চারি সম্প্রদায়ের মূল সত্ত্বাধিকারী অবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র স্বয়ং ঔদার্য্যময়ী লীলা জগতে অবতরণ

করাইবার জন্য আচরণ ও প্রচারণকারীর বেষে জীবে দয়া বিতরণ করিয়া ভক্তিপদবীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে আমরা জানিতে পারি যে তিনি কৃষ্ণনামগানে গগন ও জল-স্থলকে নৃত্য করাইয়াছিলেন। প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদ্‌জগৎ, স্থাবর-অস্থাবর সকল প্রাণীই তাঁহার অলৌকিক আবির্ভাবে প্রেমাপ্লুত হইয়াছিল। দেবগণ অলক্ষ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের নানা-প্রকার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সেই মদ্রভূমি নানাপ্রকার কুতর্কের আশ্রয়ে কোথাও কোথাও দ্রবময় মনোভাব তর্কাচ্ছন্ন হইয়াছিল, কোথাও বা জ্ঞানমিশ্রা-সেবা-বিচারে প্রপন্নগণের মধ্যেও ঐশ্বর্য্যের কথা ভগবানের নিজ মাধুর্য্যকে ন্যূনাধিক আবরণ করিবার যোগ্যতা দেখাইয়াছিল। শ্রীমাধুর্য্যবিগ্রহ যখন তৎপ্রদেশে ঔদার্য্যের আবরণে উপদেশকের বেষে হরিগুণগান করিতে করিতে চলিতেছিলেন, তখন তাৎকালিক বিদ্যুৎকরণের অমিত শক্তি জীবহৃদয়কে মাধুর্য্য-সেবায় ন্যূনাধিক সঞ্জীবিত করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কর্ম্মাগ্রহিতা, জ্ঞানমিশ্রা সেবায় নামভজন প্রভৃতি মাধুর্য্য-সম্মিলনের ন্যূনাধিক বাধা দিয়াছিল। শ্রীরামানন্দ-রায়ের সহিত সম্মেলনে শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি--যাহা আমরা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে পাঠ করি, তাহাতে দেখি যে, দাক্ষিণাত্যবাসী জনগণ পুণ্যবান্ হইলেও, জ্ঞানালোকে অদ্বৈতসিংহদিগকে কুঞ্জর-বৃত্তিতে বিক্ষুব্ধ করিলেও অনর্পিতোজ্জ্বল-রস-শোভায় তাঁহারা অনেকেই উৎসাহ দেখাইতে পারেন নাই।

সেখানে নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানের প্রচণ্ড সূর্য্যালোক, বিশিষ্টাদ্বৈত বিচারের পরমৈশ্বর্য্য, মাধ্বদ্বৈত-বিচারের কৃষ্ণোপাসনার অঙ্কুরোন্মেষ। কিন্তু কৈ? গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের বিলাস-বৈচিত্র্য দাক্ষিণাত্যের অন্তিম প্রান্তে যে বিপ্রলম্ভরসে কাতরা রত্নাকর-সম্ভবা দুর্গা, তাঁহাকে কেন অনূঢ়া কৃষ্ণপ্রেয়সী বিপ্রলম্ভরসোন্মেষিণী মহাভাগবতরূপে দর্শন না করিয়া দধির আদর্শে মহাকালের অনূঢ়া বিরহ-কাতরা কান্তারূপে দেখিতে পাই? ওঃ! পার্থিব রাজ্যে বিকৃত প্রতিফলিত দৃষ্টিতে বিবর্ত্তবাদাশ্রয়! এই অনূঢ়া গোপীকে দর্শন দিবার জন্য গোপীজনবল্লভ অনূঢ়া গোপীর ভাবের সহিত শিক্ষয়িত্রী পরোঢ়া গোপীর ভাব লইয়া তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্যই কুমারিকাঅন্তরীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন! গরুড়স্তম্ভের মর্য্যাদাবাদ, রুচিপ্রধান পথের রাগানুগ চেষ্টা কি আবার শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যমিলন দেখাইবার জন্য কুমারিকা-অন্তরীপে শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর অর্চ্চাবতাররূপে প্রকটিত হইবেন না? শ্রীগৌর-সুন্দরের ইচ্ছা হইলে সমগ্র জগতে পরা বিদ্যার প্রতিভাকে তাৎপর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করাইবে। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" শ্লোকের ও "আজ্ঞায়ৈব গুণান্" শ্লোকের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেই "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ।।"--বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইতে তখনই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই যে বিদ্যাবধূর জীবন, এই গৌরবাণীর উপলব্ধি ঘটিবে।

ভক্তসন্তাপহারী বিষয়বিগ্রহ শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীগণাধিরাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাঁহার একায়নত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন; যেহেতু ভেদাংশপ্রতীতিতে সত্ত্ব-তমো-মিশ্রিত ভাবের একত্বেই গণাধিপত্য, সেই গণপতি অপেক্ষা বহুবিঘ্নের আদর্শ চরিত্র, আশ্রয়-চিন্ময়-বিগ্রহ প্রহ্লাদ জাগতিক বিঘ্নের সম্বেদক-সম্প্রদায়কে সৎপথে আনয়ন করিয়াছেন; সেই প্রহ্লাদ গরুড়স্তম্ভরূপে বিষয়-বিগ্রহ নৃসিংহের সেবা-মন্ত্রে জগদ্‌বাসীকে দীক্ষা দিয়াছেন। শ্রীআঞ্জনেয় গরুড়স্তম্ভরূপে শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাদর্শ দেখাইতেছেন। আমার শ্রীগৌরসুন্দর মহাভাগবতজনের একমাত্র আশ্রয় ও তিনিই শ্রীমহাভাগবত আশ্রয়ের একমাত্র বিষয়। সেই শ্রীগৌরসুন্দর অবতারী হওয়ায় আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীর সহিত গান্ধর্ব্বা-রমণের একত্ব-প্রদর্শনকল্পে সমসিংহাসনে যুগলমূর্ত্তি ও মধুর রসের বিভিন্ন কায়ব্যূহ-সমূহ সংশ্লিষ্ট। সেই কায়ব্যূহ-সমূহের প্রিয়-নর্ম্মাদি-বিচারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহের প্রকাশ ভেদ।

চিন্ময় রসের বিচার না থাকলে জড়রস এসে যাবে। কাল্পনিক রসে রসরাহিত্য। জড়রস শুকিয়ে ফেলতে হবে, এটা ঠিক—যেমন "স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ" ইত্যাদি; কিন্তু ভক্তিযোগে যতক্ষণ রস উৎপন্ন না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা জড়রসসাহিত্য ও জড়রসরাহিত্য মধ্যেই আছি। কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র জিনিষ। শান্তভাবে নিরপেক্ষ ভাব; তিনি সেবা নিলে সেবা করব, আমার চেষ্টা তাঁর অনুগ্রহ-সাপেক্ষে ফলবতী হবে। দাস্যরসে তিনি সেবা নিলে আমি সেবা করে আনন্দ পাব। সখ্যরস—প্রেয়োরস, এতে আমার ভাল লাগে যাকে, যার আমাকে ভাল লাগে—এই ভাব। বাৎসল্যরসে আমি যাকে স্নেহ করি—যেমন পিতা-মাতার সহিত পুত্রকন্যা। এর পর মধুররতি, তাতে স্ত্রী-পুরুষের যে রস। এইটি সাধারণ লোকে বুঝতে পারে না। তারা মনে করে কৃষ্ণলীলা বুঝি তাদেরই ন্যায় সাংসারিক ব্যভিচারপূর্ণ; তা নয়। সংসারের যাবতীয় ব্যভিচার অত্যন্ত হেয়ভাবপূর্ণ; সেই সব সর্বপ্রকার হেয়তা বর্জিত হয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর—পরমোপাদেয়রূপে কৃষ্ণলীলাকে দেখান হয়েছে। সেইজন্য মহাকবি জয়দেব বলেছেন,—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্।।

জয়দেবের বাণী শ্রবণ কর, যদি রসময় হরিতে প্রীতি থাকে, তাঁর রসবিচিত্রতা জানবার দরকার থাকে, হরি লীলায় স্পৃহা থাকে, তবে জয়দেবকবির মধুরকোমলকান্ত-পদাবলী—অষ্টপদী গীত শ্রবণ কর।

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,
নাচে গায় পরম আনন্দে।।"

# ষষ্ঠ অধ্যায়

# অথ উপদেশামৃতসারম্

## (১)

"মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।।"

"জয়নামধেয় মুনিবৃন্দগেয় জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি।।"

অনন্তপ্রকার সাধনভক্তির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বহুসংখ্যক ভক্ত্যঙ্গের বর্ণন আছে। প্রধানতঃ ভক্তিসাধনে চতুঃষষ্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বৈধ ও রাগানুগবিচারে কথিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদউক্তিতেও আমরা শুদ্ধভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনই সকলপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান।"

সঙ্কীর্তন-শব্দে সর্বতোভাবে কীর্তন অর্থাৎ যাহা কীর্তিত হইলে অন্যপ্রকার সাধনাঙ্গের সাহায্য আবশ্যক হয় না। শ্রীকৃষ্ণের আংশিক কীর্তন 'সঙ্কীর্তন'-শব্দের লক্ষ্য নহে। যদি কৃষ্ণের আংশিক কীর্তন করিয়া জীবের সর্বশুভোদয় না হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণকীর্তনের শক্তিবিষয়ে অনেকে সন্দিগ্ধ হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন সর্বোপরি জয়যুক্ত হউন্। বিষয়কথার কীর্তনে আংশিক, ভোগপরা সিদ্ধি হয়। অপ্রাকৃতরাজ্যে শ্রীকৃষ্ণই বিষয়, সেখানে কোন প্রাকৃতের অবকাশ নাই, সুতরাং প্রকৃতির অতীত সকল সিদ্ধিই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনে লভ্য হয়। সর্বসিদ্ধির মধ্যে সাতটি বিশেষ সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনে সংশ্লিষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন জীবের মলিন চিত্তদর্পণের মার্জনকারী। ঈশবৈমুখ্যরূপ অন্যাভিলাষ, ফলভোগ ও ফলত্যাগ এই ত্রিবিধ প্রাকৃত আবিলতা-দ্বারা বদ্ধজীবের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে আবৃত হইয়া আছে। জীবের চিত্তদর্পণ হইতে ঐ আবর্জনা পরিষ্কার করিবার প্রধান যন্ত্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন। জীব-চিত্তদর্পণে জীব-স্বরূপ প্রতিফলিত হইবার বাধারূপে ঐ ত্রিবিধ কৈতব-আবরণ বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্তনই তাহা উন্মোচন করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের

সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে জীব স্বীয় চিত্তমুকুরে নিজ কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য উপলব্ধি করেন।

এই সংসার আপাতমধুর হইলেও ইহা নিবিড় অরণ্যাভ্যন্তরে দাবাগ্নিসদৃশ। দাবাগ্নিদ্বারা কাননস্থিত বৃক্ষরাজি মধ্যে মধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণবিমুখজন সংসারের জ্বালা দাবাগ্নির তাপের ন্যায় সর্বদা সহ্য করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন হইলেই এই সংসারে থাকিয়াও কৃষ্ণোন্মুখতাহেতু দাবজ্বালার দহন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন পরম-মঙ্গলশোভা-বিতরণ করে। 'শ্রেয়ঃ'---মঙ্গল; 'কৈরব'—কুমুদ; 'চন্দ্রিকা'—জ্যোৎস্না, শুভ্রত্ব। চন্দ্রোদয়ে যেরূপ কুমুদের শুভ্রত্ব বিকাশ-লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনে সেরূপ অখিল কল্যাণ সমুদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনই জীবের পরম-মঙ্গলবিধায়ক।

মুণ্ডক-উপনিষদে দুইপ্রকার বিদ্যার কথা আছে। লৌকিকী-বিদ্যা ও পরা-বিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন গৌণভাবে লৌকিকী বিদ্যাবধূর জীবনসদৃশ এবং মুখ্যভাবে পরা বিদ্যা বা অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবন। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন-প্রভাবে জীব জাগতিক-বিদ্যার অহঙ্কার হইতে উন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভ করেন। অপ্রাকৃত-বিদ্যার লক্ষ্মীভূত বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনই জীবের অপ্রাকৃত আনন্দসাগরের বর্ধনকারী। খণ্ডজলাশয় সমুদ্র-শব্দবাচ্য নহে, অতএব অখণ্ড আনন্দই অসীম সমুদ্রের সহিত তুলনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন প্রতিপদেই পূর্ণামৃত আস্বাদন করায়। অপ্রাকৃত-রসাস্বাদনে অভাব বা অপূর্ণতা নাই। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন হইতেই সর্বক্ষণ পূর্ণ নিত্যরসাস্বাদন হয়।

অপ্রাকৃত সকলবস্তুই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনে স্নিগ্ধতালাভ করে এবং প্রাকৃত রাজ্যে দেহ, মন ও তদতিরিক্ত আত্মা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনে কেবল যে নির্মলতালাভ করে তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের স্নিগ্ধতাও অবশ্যম্ভাবী। উপাধিগ্রস্ত জীব স্থূলসূক্ষ্মভাবে যে-সকল মলিনতা লাভ করিয়াছেন, সেই সমস্তই কীর্তনপ্রভাবে বিধৌত হইয়া যায়। জড়ের অভিনিবেশ ছাড়িয়া গেলে কৃষ্ণোন্মুখ জীব সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা-লাভ করেন।

হে ভগবন্! আপনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া নামসমূহের বহু সংখ্যা প্রকট করিয়াছেন এবং সেই নামেই নামীর সকলপ্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন; শ্রীনামস্মরণ করিবার কাল কোন নিয়মে আবদ্ধ করেন নাই। অর্থাৎ ভোজন, শয়ন ও নিদ্রা কোন কালেই নামস্মরণ করিবার অসুবিধা বিধান করেন নাই। কিন্তু, আমার এতই দুর্ভাগ্য যে, শ্রীনামে কোন অনুরাগ জন্মিল না।

জীব ঈশবৈমুখ্যবশতঃ নশ্বর মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার দুর্দৈব উপস্থিত হইয়াছে। সেবা-বিমুখতাই দুর্দৈব। অন্যাভিলাষিতা, কর্ম ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ ভোগময় পথে জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি হওয়ায় তাঁহার দুর্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে। অন্যাভিলাষিতা-

বশে তিনি ঐহিক সুখলাভে প্রমত্ত। সৎকর্মপ্রভাবে ক্ষণভঙ্গুর-স্বর্গাদিসুখপ্রার্থী এবং ভোগ-ত্যাগেচ্ছায় তিনি নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানে নিরত। কৃষ্ণসেবনেচ্ছা জীব-স্বরূপের নিত্যধর্ম, তাহা কথিত ত্রিবিধ পথের আবর্জনায় আচ্ছাদিত হওয়ায় তাঁহার সৌভাগ্য ক্ষীণ হইয়াছে। তৎফলে তিনি কখনও ধর্ম, অর্থ, কাম-নামক ত্রিবর্গসংগ্রহে ব্যস্ত হওয়ায় অথবা অধর্ম, অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তিদ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া দশ অপরাধের আবাহনপূর্বক নাম-সেবা করিতে গিয়া অপরাধ করিতেছেন। সেইকালে তিনি যে নাম-গ্রহণ করেন, তাহা শুদ্ধ নাম গ্রহণ নহে, পরন্তু নামাপরাধ। নিজের অশান্ত ভাব অতিক্রম করিয়া শান্তি-লাভোদ্দেশে ভুক্তি-পিপাসায় চালিত না হইয়া তিনি যখন নিজ মঙ্গলের জন্য সম্বন্ধজ্ঞানে উদাসীন হইয়া নাম-গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার নামসেবনে আভাস মাত্র উদিত হয়; সেইকালে তাঁহার নামগ্রহণ হয় না, নামাভাস মাত্র হয়। নামাভাসের ফলে প্রপঞ্চ-জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমুহূর্তে হরিসেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। দুর্দৈবমুক্ত পুরুষোত্তমগণই শুদ্ধনাম গ্রহণে সুবিমল কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করেন। বদ্ধজীবের দুর্গতি দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম-ভজন-প্রণালী শিক্ষা দিতে গিয়া অনুরাগের অভাবরূপ দুর্দৈব উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ দুর্দৈবের মধ্যেও ভগবৎকৃপা বর্তমান। নামাপরাধের হস্ত হইতে উন্মুক্ত হইবার উপায় আছে। অপরাধের স্বরূপ জানিয়া অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত না হইলে এবং নিরন্তর নাম গ্রহণ করিলে অপরাধের অবসর হয় না। নামাভাসে মুক্তি হয় অর্থাৎ বিষয়াভিনিবেশ ধ্বংস হয়, তৎপরেই শ্রীনাম গ্রহণে জীবের অধিকার হয়। এই সকল সুযোগ ভগবানের দয়ার পরিচায়ক। নাম গ্রহণপ্রভাবে জীবের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ ঘটে। যেখানে তুচ্ছ অবান্তর ফললাভ-লালসা, সেখানে কালের বিধি ও যোগ্যতা প্রভৃতির কঠিন বিধি। কিন্তু ভগবানের দয়া কালাকালের কঠিন নিগড় হইতে নামোচ্চারণ-কারীকে অবসর দিয়াছেন।

"কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে।।"
"সর্বক্ষণ বল ঈথে বিধি নাই আর।।" —শ্রীচৈতন্যভাগবত।
"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল, দেশ, নিয়ম, নাহি, সর্বসিদ্ধি হয়।।"—শ্রীচরিতামৃত।

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া তাঁহার ইহ জগতে ও স্বধামে অবস্থানকালে নিত্যকাল হরিকীর্তনই ধর্ম। হরিকীর্তনের তুল্য স্বার্থসিদ্ধি ও পরোপকার, অন্য কোন উপায় বা উপায়ের মধ্যে বর্তমান নাই। কীর্তনদ্বারা পরার্থপরতা এবং নিজের সর্বশুভোদয় হয়। যেরূপে শ্রীনাম গ্রহণ করিলে নামাপরাধ হয় না, নামাভাস হয় না, তাহা জানাইবার জন্যই তৃণাদপি শ্লোকের অবতারণা। যাঁহার চিত্তের প্রবৃত্তি কৃষ্ণোন্মুখী না হইয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত হয়; তিনি কখনই নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভোক্তার ধর্মে

ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি নাই। ভোক্তার ধর্মে সহনশীলতা নাই। ভোক্তা কখনও জড়াভিমান ও জড়প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন। বিষয়ভোগী কখনও অপর বিষয়ীকে প্রতিষ্ঠা দিতে সম্মত নহেন। বিষয়ভোগী সমৎসর, আর নামভজনানন্দী বৈষ্ণবই তৃণ-অপেক্ষা সুনীচ, বৃক্ষ-অপেক্ষা সহ্যগুণসম্পন্ন, নিজ প্রতিষ্ঠাসমূহে উদাসীন এবং পরকে প্রতিষ্ঠাদানে উদ্‌গ্রীব। ইহ জগতে তিনিই সর্বদা হরিনাম করিবার যোগ্য ও সমর্থ। শ্রীশুদ্ধবৈষ্ণবগণ নিজ নিজ আচার্য শ্রীগুরুদেব ও অপর বৈষ্ণবকে যে-সকল সম্মানসূচক প্রতিষ্ঠার আরোপ করেন, তাহা তাঁহাদের মানদ-ধর্ম হইতেই উত্থিত হয়, আবার তাঁহাদের অনুগতজনের ভজনে উৎসাহপ্রদান করিবার জন্য যে-সকল সমাদর ও গৌরবস্নেহাদি অভিব্যক্ত করেন, উহা শুদ্ধভক্তের অমানী স্বভাবের প্রকাশমাত্র। শুদ্ধভক্ত তাদৃশ গৌরবাত্মক-প্রতিষ্ঠাকে জড়প্রতিষ্ঠা না জানিয়া মূর্খের কটাক্ষ সহ্য করিয়াও নিজ সহনশীলতার পরিচয় দেন। নামোচ্চারণকারী শুদ্ধভক্ত আপনাকে প্রাকৃত-জগতে সর্বপ্রাণি-পদদলিত তৃণ হইতেও নিম্নভাগে অবস্থিত ধারণা করেন। শুদ্ধভক্ত আপনাকে কখনই বৈষ্ণব বা গুরুজ্ঞান করেন না, তিনি আপনাকে জগতের শিষ্য ও সর্বাপেক্ষা হীন জানেন। প্রত্যেক পরমাণু এবং প্রতেক অণুচিৎ-জীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া কোন বস্তুকে নিজাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন না; নামোচ্চারণকারী জগতে কাহারও নিকট কিছুরই প্রার্থী নহেন। অপরে তাঁহার হিংসা করিলে তিনি কখনও প্রতিহিংসা করেন না, উপরন্তু হিংসাকারীর মঙ্গল প্রার্থনা করেন। কীর্তনকারী কখনও শ্রীগুরুদেব-প্রাপ্ত-প্রণালী পরিহারপূর্বক নবীন মত-প্রচারবাসনায় মহামন্ত্র শ্রীহরিনামের পরিবর্তে কাল্পনিক নাম লইয়া ছড়াসৃষ্টি করেন না। শ্রীগুরুদেবের-অনুগমনে শ্রীনামের মহিমা-কীর্তনাদি-প্রচারমুখে গ্রন্থরচনা ও কীর্তন করিলে বৈষ্ণবের সুনীচতার ব্যাঘাত হয় না। কপটতার উদ্দেশ্যে লোকপ্রতারণার জন্য নিজের সরলতার অভাববশতঃ কপট দৈন্যোক্তি ও ব্যবহার সুনীচতার পরিচায়ক নহে। মহাভাগবতগণ কৃষ্ণনামোচ্চারণকালে স্থাবর-জঙ্গমের প্রাকৃত-ভোগ্য মূর্তিসমূহ দর্শনের পরিবর্তে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবনোন্মুখ হইয়া জগৎ দর্শন করেন। ভোগপ্রবৃত্তিক্রমে জগৎকে নিজ-ভোগ্য মনে করেন না। মন্ত্রের স্রষ্টা হইয়া গুরু হইতে লব্ধ মহামন্ত্র-কীর্তন ছাড়েন না এবং নবীন মত-প্রচারোদ্দেশেও ব্যস্ত হ'ন না। আপনাকে কোন বৈষ্ণবের গুরু বলিয়া মনে করা সুনীচতার অন্তরায়। সৎকথা—শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের কথা না শুনিয়া অর্থ-প্রতিষ্ঠালোভে ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে স্বীয় স্বরূপ বিস্মৃত হইলে বৈষ্ণব বা গুরুপদাকাঙ্ক্ষীর মুখে হরিনাম কীর্তিত হইতে পারে না। তাদৃশ কীর্তনে শ্রদ্ধাযুক্ত শিষ্যও হরিনাম-শ্রবণে অধিকার লাভ করেন না।

হে জগদীশ! আমি ধন, জন ও 'সুন্দরী কবিতা' কামনা করি না। আমার জন্মজন্মান্তরে সেবা তুমি, তোমাতেই যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে। 'সুন্দরী কবিতা'-শব্দে বেদ-কথিত ধর্ম, 'ধন'-শব্দে অর্থ এবং 'জন'-শব্দে কলত্রাদি-কামনার বিষয় উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল

যে ধর্মার্থকামরূপ-ভুক্তি আমার অনভীপ্সিত এরূপ নহে, অপুনর্ভবরূপ-জন্ম-জন্মান্তররহিত-মুক্তিরও আমি প্রার্থী নহি। এই চতুর্বর্গহেতুমূলে বা কামনা-প্রণোদিত হইয়া আমি তোমার সেবায় প্রবৃত্ত হইব না। তোমার সেবার জন্য আমি সেবা করিতে ব্যগ্র। এস্থলে কুলশেখরের উক্তি আলোচ্যঃ—

''নাস্থা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্‌যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্বকর্মানুরূপম্। এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেহপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।।''

''নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দহেতোঃ কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। রম্যারামামৃদুতনুলতানন্দনে নাভিরন্তুং ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্।।''

ধর্মকামী বেদনিষ্ঠ সবিতার উপাসক, অর্থকামী গণেশের উপাসক, কামকামী শক্তির উপাসক এবং মোক্ষকামী রুদ্রোপাসক এবং হেতুমূলে অর্থাৎ সকাম বিষ্ণুর উপাসক সুতরাং বিদ্ধভক্ত। পঞ্চোপাসনা সকাম এবং নিষ্কাম অবস্থায় নির্গুণ-ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ। অহৈতুকী ভক্তির দ্বারা শুদ্ধ বিষ্ণুর উপাসনা হয়।

সেব্যবস্তু নন্দনন্দন। জীবের নিত্যস্বরূপে কৃষ্ণদাস্য বর্তমান। সেই কৃষ্ণদাস দাস্যে উদাসীন হওয়ায়, দুষ্পার ভয়ঙ্কর সংসার সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছেন। এক্ষণে ভগবৎকৃপাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া স্বীয় পাদপদ্মের ধুলিসদৃশ বলিয়া স্বীকার করিলেই জীবের আচ্ছাদিত নিত্যবৃত্তি পুনঃ প্রকাশিত হয়। জীব স্বীয় কামনা প্রবল করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে আরোহণ করা তাহার ধর্ম নহে পরন্তু কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত হইয়া সেবাপ্রবৃত্তিযুক্ত ন'ন, ইহাই তাৎপর্য।

জীবের স্বরূপাবস্থানের পূর্বপর্যন্ত অনর্থ থাকে; সেইকালে পরমার্থপ্রতীতির নির্মলতা নাই। সম্বন্ধজ্ঞানের উদ্‌গমে প্রেম-নাম-সঙ্কীর্তনের যোগ্যতা হয়। সে-কালে জীব জাতরতি বলিয়া কথিত হ'ন। অজাতরতি সাধক ও জাতরতি ভাবুকের মধ্যে নামসঙ্কীর্তনের পার্থক্য আছে। কপটতা করিয়া আমাদের সময়ের পূর্বে জাতরতি ভক্তের সজ্জা শোভনীয় নহে। অনর্থনিবৃত্তির পর নৈরন্তর্য, তৎপরে স্বেচ্ছাপূর্বিকা ও তাহার পর স্বারসিকী অবস্থাত্রয়, তৎপরে প্রেমভুমি।

হে গোপীজনবল্লভ, কবে তোমার নাম-গ্রহণকালে মাদৃশ-গোপললনার চক্ষে দরদর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে, গদ্‌গদ হইয়া বাক্য রুদ্ধ হইবে এবং শরীর রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইবে।

''কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্।।

যেখানে হরিকথা অবস্থান করেন, তথায় চিত্তের দ্রবতা এবং কম্প, অশ্রু, পুলক প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়। এখানে নিসর্গ-পিচ্ছিল-চক্ষু ও ভাবাভাসপ্রিয় ব্যক্তিদিগের বিকার উদ্দিষ্ট হয় নাই, পরন্তু শুদ্ধ-জীবাত্মা কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইলেই অনুকূল মন ও স্থূল অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ নিত্য ভাবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয় না, সুতরাং চিত্তের দ্রবতা ও সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক বিকারসমূহ অনর্থমুক্ত শুদ্ধভগবদ্ভক্তেই লক্ষিত হয়। যে-সকল কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি মহাভাগবতের অনুকরণে কৃত্রিমভাবে সাত্ত্বিক-বিকারাদি প্রদর্শন করিয়া লোকবঞ্চনা করেন, তাঁহাদের তাদৃশ অনুষ্ঠান শুদ্ধভক্তির বিরোধী।

হে গোবিন্দ, তোমার বিরহে আমার সমগ্র জগৎ শূন্য বোধ হইতেছে, চক্ষু বর্ষাকালের বারিধারার ন্যায় অশ্রুপ্লাবিত হইয়াছে, অক্ষিপত্রের পতনকাল যুগের ন্যায় বোধ হইতেছে। জাতরতি ভক্তগণের সম্ভোগের পরিবর্তে বিপ্রলম্ভরসের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। জড় বিপ্রলম্ভরসে বা বিরহরসে কেবল দুঃখ অবস্থিত। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভে অভ্যন্তর প্রদেশ পরমানন্দপূর্ণ, বাহিরে যন্ত্রণাবিশিষ্ট, "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহারদুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ।।" বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক। আবার বিপ্রলম্ভের মধ্যে প্রেমবৈচিত্ত-নামক অবস্থায় বাহ্যদর্শনে সম্ভোগে বিরাজমান। বিপ্রলম্ভকালে কৃষ্ণের স্মরণপ্রাচুর্যে হরিবিস্মৃতির অভাব, উহাই ভজনপরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণবিমুখ গৌরনাগরীদলে যে সম্ভোগরসের ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ অপ্রাকৃতরসের বাধা মাত্র। সম্ভোগবাদী আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিচেষ্টা-বিশিষ্ট; সুতরাং কৃষ্ণভক্তিরহিত। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম' এই কথা বুঝিতে পারিলে নিজ সম্ভোগরসের তাড়নায় ব্যস্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর সাজাইতে ধাবিত হইবেন না। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার রহস্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়জাতীয় ভাব গ্রহণ করিয়া বিপ্রলম্ভরসে নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত। সম্ভোগরসের পুষ্টির উদ্দেশে আশ্রয়জাতীয় জীবের পূর্ণবিকাশের পরাকাষ্ঠা বিপ্রলম্ভেই অবস্থিত; ইহা প্রদর্শন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রলম্ভরসাবতার নিত্য শ্রীগৌরস্বরূপ প্রকট করিয়াছেন।

পাদসেবানিরতা গোপীর কিঙ্করী আমি, আমাকে আলিঙ্গন করুন, অথবা আত্মসাৎ করুন, অথবা অদর্শন জন্য মর্মাহত করুন, সেই গোপবধূবিট্ লম্পটের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক; তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ। তদ্ব্যতীত তিনি অন্য কেহ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র পরমপুরুষ। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহারই অনুগমন আমার একমাত্র ধর্ম। আমি স্বেচ্ছাচারিণী নহি যে, তাঁহার অভিলাষের প্রতিকূলে আমার কোন সেবাপ্রবৃত্তি দেখাইতে পারি। জীবের সিদ্ধিতে দেহ বা মন উভয় উপাধিই নাই। সেই কালে নন্দনন্দনের স্বেচ্ছাবিহারক্ষেত্র অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে ব্রজবাসিনীর সহচরী হইয়া সিদ্ধ-দেহে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা একমাত্র কৃষ্ণেচ্ছা-পূরণ করাই প্রেমভক্তির স্বরূপ।

তন্নামরূপচরিতাদি-সুকীর্তনানু-স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্।।

যেরূপ পিত্তোপতপ্ত জিহ্বায় সুমিষ্ট মিশ্রিও রুচিপ্রদ হয় না, তদ্রূপ অনাদি-কৃষ্ণবহির্মুখতাক্রমে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ সুমিষ্ট রুচিপ্রদ মিশ্রিও ভাল লাগে না। কিন্তু যদি আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্বক্ষণ সেই কৃষ্ণনামচরিতাদি-রূপ মিশ্রি সেবন করা হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদিরূপ মিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে এবং কৃষ্ণবহির্মুখবাসনারূপ জড়ভোগব্যাধি বিদূরিত হয়। ''তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।'' অবিদ্যাবশে জীব দেহ, দ্রবিণ, জনতা, আসক্তি এবং ভগবান্ ও তদাভাব মায়াকে (অভিন্নবস্তুজ্ঞানরূপ ভ্রান্তিকে) বহুমানন করিয়া নিজ স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হয়। কৃষ্ণনামবলে তাহার অবিদ্যাজাত অভিমান কুজ্ঝটিকার ন্যায় অপগত হয়।

অজাতরুচি সাধক অন্যরুচিপর রসনা ও অন্যাভিলাষী মনকে ক্রমপন্থানুসারে কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্তন ও স্মরণাদিতে নিয়োগ করিয়া জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাস করিয়া ব্রজবাসিজনের অনুগমনপূর্বক কালাতিপাত করিবেন। ইহাই অখিল উপদেশসার। সাধকজীবনে আদৌ শ্রবণ দশা, তৎকালে কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে বরণ দশায় উপস্থিত হইলে শ্রুতবিষয়ের কীর্তন আরম্ভ হয়। নিজ ভাবের সহিত কীর্তন করিতে করিতে স্মরণাবস্থা। স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি ও সমাধিভেদে স্মরণ পাঁচ প্রকার। বিক্ষেপমিশ্র স্মরণ, অবিক্ষিপ্ত স্মরণরূপা ধারণা, ধ্যাত বিষয়ের সর্বাঙ্গভাবনাই ধ্যান, সর্বকাল ধ্যানই অনুস্মৃতি, ব্যবধান রহিত সম্পূর্ণ নৈরন্তর্যই সমাধি। স্মরণদশার পরেই আপন দশা। এই অবস্থায় সাধক নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। পরে সম্পত্তি দশায় বস্তুসিদ্ধি। বৈধভক্তগণ ''কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।'' তাহাতে তাহাদের রুচি জন্মে। রুচি জন্মিলে ''বিধি ধর্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।'' ''রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে। তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা-নামে।'' ''ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা।।''

''রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্।।
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।।

বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুই ত' সাধন।
বাহ্যে সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্তন।।
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।।"
"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।।"
"নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা।।"

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।" পরব্যোমধামস্থ বৈকুণ্ঠ অন্যধাম অপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ভগবানের জন্মনিবন্ধন মাথুরমণ্ডলের শ্রেষ্ঠতা। কৃষ্ণের রাসস্থলী বৃন্দাবন মথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বচ্ছন্দবিহারস্থলী গোবর্ধন বৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া গোবর্ধন অপেক্ষা রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। কোন্ সুবিচক্ষণ সদ্ভক্ত গোবর্ধন গিরিতটে প্রকাশমান শ্রীরাধাকুণ্ডসেবা বর্জিত হইয়া অন্য সেবায় মনোঽভিনিবেশ করিবেন? শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্বোচ্চতম ভাব রাধাকুণ্ডসেবাকেই পরম পরাকাষ্ঠাসেবারূপে উপদেশ দিয়াছেন।

যথেচ্ছাচারপরায়ণ জীবগণ অপেক্ষা সত্ত্বনিষ্ঠ সুকর্মিগণ কৃষ্ণের প্রিয়, কর্মী অপেক্ষা গুণত্রয়বর্জিত ব্রহ্মজ্ঞ-জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়, জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্তকৃষ্ণের প্রিয়, শুদ্ধভক্ত অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ-ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত অপেক্ষা ব্রজসুন্দরিগণ কৃষ্ণের প্রিয়, ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতী বার্ষভানবী কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়তমা, তাঁহার কুণ্ডও কৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সর্বাপেক্ষা অধিক-সৌভাগ্যবিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত অনন্যভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় করিবেন।

কৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়পাত্র এবং প্রিয়াবর্গের শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকা, শ্রীমতীর কুণ্ড শাস্ত্রে মুনিগণ শ্রীমতীর তুল্য পরমোত্তম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। নারদাদি প্রিয়বর্গেরও যে প্রেম সুলভ নহে, অন্যসাধক ভক্তের তো তাহা দূরের কথা, কিন্তু একবার মাত্র রাধাকুণ্ডস্নান-কারিজনের সেই প্রেম প্রাদুর্ভূত হয়। প্রেমপূর্ণ রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত বাস ও প্রেমামৃতপ্লাবিত রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত স্নান অর্থাৎ জীব প্রাকৃত জড়ভোগবাসনায় উদাসীন হইয়া শ্রীমতীর ঐকান্তিক আনুগত্যে মানস-ভজন করিতে করিতে জীবনাবশেষ এবং জীবিতোত্তরকালে অপ্রাকৃত নিত্যদেহে সাক্ষাৎ নিত্য-সেবা-তৎপর হইয়া রাধাকুণ্ড-স্নাত জনই সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃ লাভ করেন। তাঁহার সৌভাগ্য নারদাদি ভক্তগণেরও দুর্লভ পদবী। বিষয়িগণের কথা দূরে থাকুক, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য-

রসাশ্রিত ভক্তগণেরও রাধাকুণ্ডে-স্নান দুর্লভ। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি করতঃ বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয়পূর্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজনচাতুরী।

কৃষ্ণেতর কথা বাগ্‌বেগ তার নাম। কামের অতৃপ্তে ক্রোধবেগ মনোধাম।।
সুস্বাদু-ভোজন-শীল জিহ্বাবেগদাস। অতিরিক্ত ভোক্তা যেই উদরেতে আশ।।
যোষিতের ভৃত্য স্ত্রৈণ কামের কিঙ্কর। উপস্থবেগের বশে কন্দর্পতৎপর।।
এই ছয় বেগ যার বশে সদা রয়। সে জন গোস্বামী করে পৃথিবী বিজয়।।১।।
অত্যন্ত সংগ্রহে যার সদা চিত্ত ধায়। অত্যাহারী ভক্তিহীন সেই সংজ্ঞা পায়।।
প্রাকৃত বস্তুর আশে ভোগে যার মন। প্রয়াসী তাহার নাম ভক্তিহীনজন।।
কৃষ্ণকথা ছাড়ি জিহ্বা আন কথা কহে। প্রজল্পী তাঁহার নাম বৃথা বাক্য বহে।।
ভজনেতে উদাসীন কর্ম্মেতে প্রবীণ। বহ্বারম্ভী সে নিয়মাগ্রহী অতি দীন।।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গবিনা অন্য সঙ্গে রত। জনসঙ্গী কুবিষয়-বিলাসে বিব্রত।।
নানাস্থানে ভ্রমে যেই নিজ স্বার্থতরে। লৌল্যপর ভক্তিহীন সংজ্ঞা দেয় নরে।।
এই ছয় নহে কভু ভক্তি-অধিকারী ভক্তিহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট বিষয়ী সংসারী।।২।।
ভজনে উৎসাহ যার ভিতরে বাহিরে। সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি পাবে ধীরে ধীরে।।
কৃষ্ণভক্তি প্রতি যার বিশ্বাস নিশ্চয়। শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান্ জন সেই হয়।।
কৃষ্ণসেবা না পাইয়া ধীরভাবে যেই। ভক্তির সাধন করে ভক্তিমান সেই।।
যাহাতে কৃষ্ণের সেবা কৃষ্ণের সন্তোষ। সেই কর্ম্মে ব্রতী সদা না করয়ে রোষ।।
কৃষ্ণের অভক্ত-জনসঙ্গ পরিহরি। ভক্তিমান্ ভক্তসঙ্গে সদা ভজে হরি।।
কৃষ্ণভক্ত যাহা করে তদনুসরণে। ভক্তিমান্ আচরয় জীবনে মরণে।।
এই ছয় জন হয় ভক্তি-অধিকারী। বিশ্বের মঙ্গল করে ভক্তি পরচারি।।৩।।
দ্রব্যের প্রদান আর আদান করিলে। গোপনীয় বাক্যব্যয় আর জিজ্ঞাসিলে।।
ভোজন করিলে আর ভোজ্য খাওয়াইলে। প্রীতির লক্ষণ হয় যবে দুই মিলে।।
ভক্তজন সহ প্রীতি সঙ্গ ছয় এই। অভক্তে অপ্রীতি করে ভাগ্যবান্ যেই।।৪।।
কৃষ্ণসহ কৃষ্ণনাম অভিন্ন জানিয়া। অপ্রাকৃত একমাত্র সাধন মানিয়া।।
যেই নাম লয়, নামে দীক্ষিত হইয়া। আদর করিবে মনে স্বগোষ্ঠী জানিয়া।।
নামের ভজনে যেই কৃষ্ণ-সেবা করে। অপ্রাকৃত ব্রজে বসি' সর্বদা অন্তরে।।
মধ্যম বৈষ্ণব জানি ধর তার পায়। আনুগত্য কর তার মনে আর কায়।।
নামের ভজনে যেই স্বরূপ লভিয়া। অন্য বস্তু নাহি দেখে কৃষ্ণ তেয়াগিয়া।।

কৃষ্ণেতর সম্বন্ধ পাইয়া জগতে। সর্বজনে সমবুদ্ধি করে কৃষ্ণব্রতে।।
তাদৃশ ভজনবিজ্ঞে জানিয়া অভীষ্ট। কায়মনোবাক্যে সেব হইয়া নিবিষ্ট।।
শুশ্রুষা করিবে তাঁরে সর্বতো ভাবেতে। কৃষ্ণের চরণ লাভ হয় তাহা হ'তে।।৫।।
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত তাঁর স্বাভাবিক দোষ। আর তাঁর দেহ-দোষে না করিহ রোষ।।
প্রাকৃত দর্শনে দোষ যদি দৃষ্ট হয়। দর্শনেতে অপরাধ জানিবে নিশ্চয়।।
হীন-অধীকারী হ'য়ে মহতের দোষ। সিদ্ধভক্তে হীনজ্ঞানে না পাবে সন্তোষ।।
ব্রহ্মদ্রব গঙ্গোদক প্রবাহে যখন। বুদ্‌বুদ-ফেন-পঙ্ক জলের মিলন।।
অন্যজল গঙ্গালাভে হেয় কভু নয়। তদ্রূপ ভক্তের মল কভু নাহি রয়।।
সাধুদোষ-দ্রষ্টা যেই কৃষ্ণ-আজ্ঞা ত্যজি'। গর্বে ভক্তি ভ্রষ্ট হৈয়া মরে অধো মজি'।।৬
কৃষ্ণনামরূপগুণলীলা চতুষ্টয়। উপমা মিশ্রির সহ স্বাদ তুল্য হয়।।
অবিদ্যা পিত্তের তুল্য, তাতে জিহ্বা তপ্ত। জিহ্বার আস্বাদ-শক্তি তপ্তহেতু সুপ্ত।।
অপ্রাকৃত জ্ঞানে যদি লও সেই নাম। নিরন্তর নাম লৈলে ছাড়ে পীড়াধাম।।
নামমিশ্রি ক্রমে ক্রমে বাসনা শমিয়া। নামে রুচি করাইবে কল্যাণ আনিয়া।।৭।।
কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা চতুষ্টয়। গুরুমুখে শুনিলেই কীর্তন উদয়।।
কীর্তিত হইলে ক্রমে স্মরণাঙ্গ পায়। কীর্তনস্মরণকালে ক্রম পথে ধায়।।
জাতরুচি-জন জিহ্বা মন মিলাইয়া। কৃষ্ণ-অনুরাগি-ব্রজজনানুস্মরিয়া।।
নিরন্তর ব্রজবাস মানস ভজন। এই উপদেশ-সার করহ গ্রহণ।।৮।।
বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ মথুরা নগরী। জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি।।
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন-ধাম। যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব কাম।।
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্ধন শৈল। গিরিধারী গান্ধর্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল।।
গোবর্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ডতট। প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুললম্পট।।
গোবর্ধন গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি'। অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জ পুষ্পবাড়ী।।
নির্বোধ তাহার সম কেহ নাই আর। কুণ্ডতীর সর্বোত্তম স্থান—প্রেমাধার।।৯।।
সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্মী। হরিপ্রিয়জন বলি' গায় সব ধর্মী।।
কর্মী হইতে জ্ঞানী হরিপ্রিয়তম জন। সুখভোগবুদ্ধি জ্ঞানী না করে গণন।।
জ্ঞানমিশ্র ভাব ছাড়ি' মুক্তিজ্ঞানী জন। পরা ভক্তি সমাশ্রয়ে হরিপ্রিয় হ'ন।।
ভক্তিমান্ জন হৈতে প্রেমনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ। প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ।।
গোপী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা। সে রাধাসরসী প্রিয় হয় তাঁ'র সমা।।
সে কুণ্ড আশ্রয় ছাড়ি' কোন্‌মূঢ় জন। অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন।।১০।।
শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি। কৃষ্ণপ্রিয় মধ্যে তাঁ'র সম নাহি ধনী।।
মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে। গান্ধর্বিকা-তুল্য কুণ্ড করয়ে গণনে।।

নারদাদি প্রিয়বর্গের যে প্রেম দুর্লভ। অন্য সাধকেতে তাহা কভু না সুলভ।।
কিন্তু রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে। মধুর-রসেতে তা'র স্নানে সিদ্ধি ধরে।।
অপ্রাকৃত-ভাবে সদা যুগল-সেবন। রাধাপাদপদ্ম লভে সেই হরিজন।।১১।।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

গোবিন্দ-বচনে জানি; ইহাই গৌরাঙ্গ-বাণী, অপ্রকট কালে সারকথা।
নীলাচলে সিন্ধুতীরে, শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে, বলিল শুনিল ভক্ত তথা।।
গৌরমুখ-উপদেশ, সর্ব অমৃতের শেষ, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুবর।
কর্ণদ্বারা পান করি, লেখনীতে তাহা ধরি, কলিজীবে দিল ভবহর।।
দয়ানিধি গৌরহরি, কলিজীবে দয়া করি', শিক্ষাষ্টকে শিখাইল ধর্ম।
তাঁহার শ্রীমুখ হ'তে, যা' শিখিল ভালমতে, প্রভু রূপ জানি সেই মর্ম।।
জীবের কল্যাণ-খনি, প্রেমরত্ন-মহামণি, গ্রন্থরত্ন সরলে লিখিল।
গৌরভক্তকণ্ঠহার, উপদেশামৃতসার, রূপানুগে রূপ নিজে দিল।।
বিপ্রলম্ভ মূর্তিমান, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্, সম্ভোগের পুষ্টির লাগিয়া।
প্রচারিল নিজতত্ত্ব, প্রকাশিয়া শুদ্ধসত্ত্ব, ভজ কৃষ্ণ মায়াকে ছাড়িয়া।।
ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, নাশিয়া জগত ভ্রম, বসাইল গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া।
মহাজন পথ ধরি', রাধাকৃষ্ণ সদা স্মরি', ব্রজে ভজে নিজ হিয়া দিয়া।।
প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী' রাধাকৃষ্ণ গৌরবাণী, নারায়ণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
লক্ষ্মীদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া, নীলাদেবী ধাম হিয়া, তিনশক্তি রাধাকৃষ্ণ সেবি।।
গোপী অনুগত হ'য়ে, মানসে সেবিল ত্রয়ে, রাধাকৃষ্ণ গৌর-ভগবানে।
রূপানুগজন পদ, লভিবারে সুসম্পদ, রূপানুগজন-প্রীতি তরে।।
ভকতিবিনোদ নিজ, প্রভুপদ সরসিজ, আপনে জানিয়া গৌরভৃত্য।
নরোত্তম পদ স্মরি', মায়াপুরে প্রিয়া হরি, বসাইল জানি' নিজ কৃত্য।।
গৌরকিশোর প্রভু, ভকতিবিনোদ বিভু, শুদ্ধভক্তি যেই প্রচারিল।
সেই শুদ্ধভক্তি-সূচী, বদ্ধজীব যাহে শুচি, পাইবার তরে এক তিল।।
রূপানুগপূজ্যবরা, শ্রীবার্ষভানবীবরা, তাঁহার দয়িতদাসদাস।
রূপ-শিক্ষামৃত যেই, গৌর-শিক্ষামৃত সেই, অন্য শিক্ষা না শুনয়ে কাণ।।

**——প্রথম খণ্ড সমাপ্ত——**
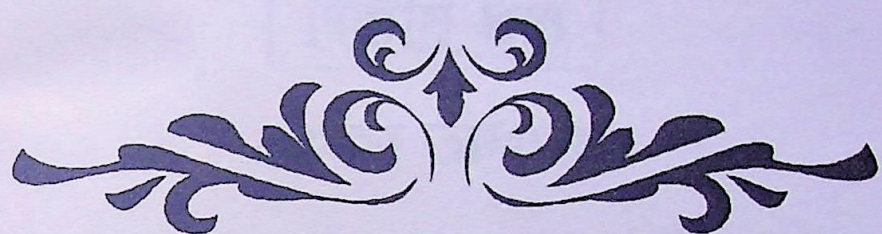
# দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্যদর্শনে

# প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

## দ্বিতীয় খণ্ড

## প্রথম অধ্যায়

### সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ

(১)

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।।"

যা' পূর্বে দেওয়া হয় নাই—মানবজাতি যা' পূর্বে জান্‌তে পারে নাই; সেই ভগবদ্ভক্তির সর্বোত্তমা শোভা সকলকে সম্যগ্‌রূপে অর্পণ কর্‌বার জন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন। তিনি যদি কতকগুলি কথা না বল্‌তেন, তা' হলে মানবজাতি পরজগৎ-সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে অজ্ঞ থাকত। তিনি সকলকে দয়া ক'রে সে কথাগুলো জানিয়ে দিয়েছেন। পূর্ব পূর্ব অবতারে পারমার্থিক সত্য যে প্রকারে উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছিল, তা' মানুষ সাধারণভাবে জান্‌তো। তিনি যে কথা বলেছিলেন, তা' মানুষ জান্‌তো না এবং জান্‌বার প্রয়োজনও মনে করে নাই। তাঁ'র দয়াতে জান্‌তে পারি যে, মানবজাতি দরিদ্র ছিল। তাঁ'র যথেষ্ট দয়া, কিন্তু মানবজাতির অনেকেই সে কথা নিতে পারেন নাই। যাঁ'রা নিতে পেরেছেন, তাঁ'রা অত্যন্ত লাভবান হ'য়েছেন। উন্নত-উজ্জ্বলরসের কথা—সেবার সৌন্দর্যের প্রদর্শনী তিনি জগতে খুলেছেন—তা' তিনি জগৎকে জানিয়েছেন; সেটা অভিনব ব্যাপার। মহাপ্রভু কিরূপ অবতার, তা' পরে বল্‌ছেন—

"হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ।"

তিনি জিনিষটি—'হরি'। হরি যেরূপভাবে শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছেন, সেরূপভাবে বর্ণিত না হ'য়ে সুবর্ণ-বর্ণ কান্তিরূপে সন্দীপিত হ'য়েছেন। কাঁচা সোনার রং-এর আলোকে সন্দীপিত। তাঁ'র গায়ের রং সেইরূপ।

তিনি জগতের প্রত্যেক লোকের হৃদয়ে এরূপ বিষয় প্রকাশ ক'রেছেন—যা' অপূর্ব, অতুলনীয়। এমন যে শ্রীশচীনন্দন, তিনি জগতের সমুদয় লোকের হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হউন।

তিনি—হরি। হরি—পূর্ণ পদার্থ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সেই হরি। তিনি পূর্ণপদার্থ হ'য়েও সাধারণ উপদেশকের ন্যায় জগতে অবতীর্ণ হ'য়ে নিজের সম্বন্ধে কথা ব'লেছেন—আত্মধর্ম-সম্বন্ধে ব'লেছেন। তিনি অনাত্ম বিষয়ের কথা—মনের দ্বারা বিচারের কথা বলেন নাই। তিনি অন্তর্যামি-সূত্রে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন—চৈত্ত্যগুরুরূপে আছেন। তিনি (Conscience) জাগতিক সদসৎ বিবেকমাত্র ন'ন। (Phenomenal) প্রাপঞ্চিক অবস্থায় যেটুকু দেখা যায়, সেইটুকু মাত্র প্রকাশিত কর্‌বার জন্য যে তিনি এসেছেন—এরূপ নহে। গুণজাত জগৎ-সম্বন্ধে মানুষ যেটুকু বুঝে সেটুকু বুঝা'বার জন্য তিনি আসেন নাই। তদ্ব্যতীত আরও ভাল কথা বল্‌তে এসেছিলেন।

মহাপ্রভু নিজের শোভা—ভগবদ্ভক্তির মহিমা বর্ণন কর্‌বার জন্য এসেছিলেন, উহাতে বার প্রকার রসের কথা আছে। পাঁচটি স্থায়ী রস। সাতটি আগন্তুক রস—ইহারা খানিক ক্ষণের জন্য এসে পূর্বোক্ত পাঁচটি মুখ্য রসের এক একটিকে সম্বর্ধনা করে। তা'তে দ্বাদশটি রসই পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত---যে-সকল রসের (temporary) অস্থায়ী প্রতিফলিত ভাব জগতে দেখা যায়। ব্যাসের লেখার মধ্যে যে কথার সন্ধান নাই, সেই বৈশিষ্ট্যের কথা মহাপ্রভু জগৎকে জানিয়েছেন,—যা' কৃষ্ণে আছে—যা' অন্য দেবতাতে দেখা যায় না। জীবহৃদয়ে তা' স্ফূর্তি করবার জন্য অন্তরে চৈত্তগুরুরূপে এবং বাহিরে মহান্তগুরুরূপে শ্রীচৈতন্যদেব বিরাজিত র'য়েছেন। অন্য অবতার-সমূহে সেরূপ প্রেমের প্রাচুর্য---সেরূপ প্রীতির পূর্ণতা আমরা পাই না।

মহাপ্রভুর পূর্বে আড়াই প্রকার রসের কথা আলোচনা হতো---শান্ত, দাস্য, সখ্যের নিম্নার্দ্ধ, (reverence, awe) মর্যাদা, সম্ভ্রম, ভয় নিয়ে যদি আমরা বন্ধুর কাছে উপস্থিত হই, সে বন্ধুত্ব মর্যাদাসূচক---তিনি আমাদের সম্মানিত বন্ধু। গৌরসুন্দর ইহা অপেক্ষা ভগবানের সহিত নিকটতর সম্বন্ধ দেখিয়েছেন—যা' মানুষ সহজে বুঝ্‌তে পারে না।

অপ্রাকৃত (Sonhood) পুত্রত্ব, (Consorthood) কান্তত্ব, ভগবৎসম্বন্ধে তিনি প্রথম দেখিয়েছেন। পূর্ব বিচার প্রণালী যা' মানবের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলোর চেতনের ধর্মে যে একটা (greater scope) অধিকতর প্রসারতা সম্ভাবনা আছে, তা' তিনি দেখিয়েছেন। (I can serve you more than you can serve

me) 'তুমি আমাকে যত সেবা করতে পার, তা' অপেক্ষা আমি তোমাকে বেশীরকম সেবা করতে পারি',—এরূপ (devotional activity) সেবা-চেষ্টা মনুষ্য পূর্বে জান্‌তো না। ইহা শুনে মনুষ্য আশ্চর্যান্বিত হ'বে যে, (Godhead) ভগবান্ অপেক্ষাও ( servant of Godhead) ভগবানের দাস বেশী সেবা কর্‌তে পারেন। সখাগণ কৃষ্ণের কাঁধে চ'ড়ে তালফল পাড়লেন, উচ্ছিষ্টানুচ্ছিষ্টের খানিক অংশ—যা ভালো লাগ্‌ছে—তা' কৃষ্ণের নিকট পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তাঁ'রা মনে কর্‌ছেন না—ইনি জগতের প্রভু এবং তাঁ'রা ক্ষুদ্র জীব। তাঁ'রা অত্যন্ত প্রেমের সহিত সেবা কর্‌তে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। ইহা কত (greater confidence) অধিকতর সাহসপূর্ণ বিশ্বাস। 'আমরা যদি না খাওয়াই, কে তাঁকে খাওয়াবে?'

পূর্বে ঈশ্বরের সম্বন্ধে 'অজ' বিচার প্রবল ছিল। সেটা (Theism) একেশ্বরবাদ নহে—(Theism) একেশ্বরবাদ (cross) লঙ্ঘন ক'রে বিচার। ঈশ্বরকে পিতা-মাতা জ্ঞান করা অর্থে—তাঁকে চাকর করা। পিতা-মাতা প্রথম থেকে সেবা কর্‌তে আরম্ভ করেছেন—যখন আমরা তাঁ'দের সেবা কর্‌তে পারি না—যে সেবকের ধর্ম্ম আমাদের জীবনের প্রারম্ভে নাই। সে জিনিষটা নিত্য হ'লো না। (Initiative) নিজ হ'তে পিতামাতার সেবা করবো, এটা অনেক (experience) জাগতিক অভিজ্ঞতার পরে। অন্যের ব্যবহার দেখে ক্রমে তাঁ'দের প্রতি পূজ্যভাব আরোপ করি। "ভগবান সেবক, আমরা ভোগী—আমাদের দাস ভগবান্"—এরূপ দুর্বুদ্ধি হ'য়ে যায়—যদি তাঁ'কে পিতা-মাতা বিচার করি।

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্ত ভব-ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।।

আমি সেই নন্দকে বন্দনা করি—যে নন্দের বারান্দায় হামাগুড়ি দিচ্ছেন সেই পরব্রহ্ম বস্তু। তিনি যাঁ'র পুত্রত্ব স্বীকার ক'রে পিতৃস্বরূপ সেবা গ্রহণ করেছেন, তাঁ'কে নমস্কার করি। অপর কতকগুলি লোক শ্রুতি-শাস্ত্রের কথা ব'লেছেন,—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।।
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষংমহান্তম্।।

প্রভৃতি বিচার দ্বারা সে জিনিষটা খুব (exalted) উন্নত, সম্মানিত হ'য়েছে। বেদশাস্ত্রের বিচার—অনাদি, অনন্ত বিচার।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।" 'বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাদ্ ব্রহ্ম', (compare) তুলনা কর্‌তে গেলে সর্বাপেক্ষা (greatest) বৃহৎ। এগুলো শ্রুতি-বাক্য। শ্রুতি এরূপ কেন বলেন?—

লোকগণ ভবভীত ব'লে। অন্যান্য লোক স্মৃতিশাস্ত্রের কতকগুলি কথা ব'লেছেন। পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্রে,—

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যশ্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।

মহাভারত শ্রীকৃষ্ণের কথা প্রচুর পরিমাণে ব'লেছেন। এই পৃথিবীর (Phenomenal grandeur) প্রাপঞ্চিক বৈভব দে'খে যাঁ'রা (startled) বঞ্চিত ও শঙ্কিত হ'য়ে গি'য়েছে—"কুম্ভীপাক নরকের ক্লেশ ভোগ কর্‌তে হ'বে, মামলায় পড়্‌তে হ'বে" —এইরূপ ভয়ে ভীত হ'য়ে যা'রা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তা'রা শ্রুতি, স্মৃতি, মহাভারত অবলম্বন ক'রে তোমার ভজন করে করুক। আমি কিন্তু সেরূপ ভজনা কর্‌তে চাই না। আমি গোড়া থেকে ভগবানের ভজনা কর্‌তে চাই।

সেই অজ বস্তু আমার ঘরে জন্মাবে, আমি তো ধর্‌তে পারি না। তাঁ'র নিকট আমাব যাওয়া অসম্ভব। সে যদি আমাকে ধরা দেয়, তা' হ'লে পিতা হ'য়ে তাঁ'র সেবা করবো। যার (potency) শক্তি নাই, (to come down to me) আমার নিকট নেমে আসতে তাঁ'র অজত্ব থাকে থাকুক, তাঁ'র সহিত আমার সম্বন্ধ অপ্রয়োজনীয়।

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ।।

যা'দের (thiestic devotion) একেশ্বরের প্রতি ভক্তি—আত্মার বৃত্তি উন্মেষিত না হ'য়েছে, তা'রা এসব কথা বুঝ্‌তে পারে না। অসীম অবস্থায় অবস্থিত যে ভগবান্ এই জগৎকে (cross) অতিক্রম ক'রে যে-জগতের (personality) ব্যক্তিত্ব হ'য়ে ব'সে আছেন, সেই অজ বস্তুর স্থানকে বৈকুণ্ঠ বলা যায়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দাস শ্রীরূপ বল্‌ছেন যে, বৈকুণ্ঠের ভগবান্—যা'তে তৃতীয় (dimension) মানের কোন প্রকার ব্যাপার (ascribe) আরোপ করা যায় না—যিনি অনাদি, অনন্ত, তিনি যে (transcendental plane) অপ্রাকৃত ভূমিকায় আছেন, তা অপেক্ষা মথুরা আর একটুকু উন্নত জায়গা—অজ সেখানে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে জন্মগ্রহণ ক'রে নন্দালয়ে নীত হ'য়েছেন—অজত্বে (restricted) সীমাবদ্ধ না থেকে—অজত্বকে (ignore) অস্বীকার ক'রে তিনি জন্মগ্রহণ ক'রেছেন। সে (plane) ভূমিকাটা শুধু বৈকুণ্ঠ নহে। তাঁ' থেকে বৃন্দারণ্যের উৎকর্ষ—যেখানে রাসোৎসব হ'য়েছিল। বৈকুণ্ঠ (lower half) গোলোকের নিম্নার্ধে অবস্থিত। (upper half) গোলোকের ঊর্দ্ধ

অর্দ্ধে এ কয়টি জিনিষ দেখা যাচ্ছে। তদুপরি গোবর্ধন—রাধাকুণ্ড। (vague idea of transcendental region) ইহা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের নির্দিষ্ট ধারণা-মাত্র নহে। (something higher) তা অপেক্ষা উচ্চ ব্যাপার।

বৈকুণ্ঠের অর্দ্ধেকটা আমরা এখান থেকে দেখ্‌তে পাই। আমরা যখন নীচে আছি—(reverence) সম্ভ্রমের সহিত যখন সেই বস্তুটিকে দেখছি, তখন (half is exposed to us) তাঁ'র অর্দ্ধেকটা আমাদের গোচর হয়—(the other half is invisible to us) অপরার্ধ আমাদের নিকট অদৃশ্য থাকে। নীচে থেকে নিম্নার্ধ দেখ্‌তে পাই। আমাদের বর্তমান চক্ষু দ্বারা (horizon) চক্রবালের ($180^0$ degrees) ১৮০ ডিগ্রী দেখ্‌তে পাই। অর্দ্ধেক দেখে নারায়ণ দর্শন ক'রে—বিষ্ণু দর্শন ক'রে—শান্তরসে অবস্থিত হই। তখন দাস্যের ধারণা উদিত হয়,—বুঝ্‌তে পারি আমার ন্যায় কোটি কোটি ভৃত্যবর্গ তাঁ'কে সেবা কর্‌তে প্রস্তুত আছেন। তখন তাঁ'র বন্ধুবর্গকে দেখ্‌তে পাই—যাঁ'রা তাঁ'কে সেবা ক'রে গৌরব অনুভব করেন। আমরা সখ্যের অর্দ্ধেকটা দেখি—বিশ্রম্ভ সখ্য দেখতে পাই না।

ভগবদ্বস্তুর উপলব্ধি যা'র আছে, তাঁ'কে 'বৈষ্ণব' বলা যায়। নীচে দাঁড়িয়ে আড়াই প্রকার সম্বন্ধ উপলব্ধি কর্‌তে পারি। তখন মোসাহেব পর্যন্ত হ'তে পারি। যেখানে অন্তরঙ্গ (confidence) বিশ্বাস আছে, সে পর্যন্ত তখন আমরা যেতে পারি না। নিম্নের আড়াইটা রস—অবনত রস। অবনত রসে অবস্থানকালে উন্নত রসে প্রবেশের অধিকার হয় না।

গৌরসুন্দর ব'লেছেন,—তোমরা আর আড়াই প্রকার রস বাদ দিয়ে কেন (relationship) সম্বন্ধ (curtail) ক্ষুণ্ণ কর্‌ছ? তখন তিনি আর আড়াই প্রকার রসের কথা বল্লেন। তদ্দ্বারা পাঁচপ্রকার দর্শন সম্ভব হ'য়েছে। উন্নত ও উজ্জ্বল—এই দুটো বাল-কৃষ্ণের উপাসনায় নাই। মধুরে উজ্জ্বলের পরমোন্নতি। সেই রসটা গৌরসুন্দর দিয়েছেন এই জগতে। শ্রীরাধামাধবের উন্নত উজ্জ্বল রস ইতিপূর্বে কোন অবতারে বিতরিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কলিতে জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া এই উন্নত-উজ্জ্বল রস পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যা'কে তা'কে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার চরণে একান্তভাবে শরণাগত হইলে অনর্থনিবৃত্তিক্রমে স্বরূপাস্থানে এই রস আস্বাদন করিতে পারি। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা কিরূপে সুষ্ঠুভাবে অনুশীলন করা যায়, তাহা গৌরসুন্দর স্বয়ং আচরণ করিয়া শুশ্রূষু জীবগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। মধুর রসে সেবার উৎকর্ষ একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাতেই পাওয়া যায়।

অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহে নিম্নার্ধ ব্যতীত উত্তমার্ধ দ্বারাই ভগবানের সেবা হইয়া থাকে, ইহাই আমরা জানিতাম। কিন্তু অনুসম্বিৎ চিদানন্দময় আত্মার বিষয় আমরা জানিতাম না। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত মনোধর্মের সহিত আত্মধর্মের সামঞ্জস্য করার দরুণ সুবিমল আত্মার

কথা আমাদের অজ্ঞাত ছিল। আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস্য। তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। উন্নত-উজ্জ্বল রসে ভগবান যে আমাদের নিজজন, তাঁহাকে যে মধুর রসে সেবা করা যায়, ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। জীবন্মুক্ত পুরুষগণ কি প্রকারে ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি-বিধান করেন, তাহা আমাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল।

আমরা দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ যদি আমাদের সেবা গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই আমরা তাঁহাকে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে বিশ্রম্ভ সেবা করিতে পারি। ভগবানের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও রাম অবতারে যে সেবা প্রচলিত আছে, তাহা মূলে গৌরবমিশ্রিত সম্ভ্রম সেবা। সুতরাং তাহা আত্মার সম্প্রসারণ-কল্পে সীমাবদ্ধ। চিন্ময় ধামের বিকৃত প্রতিফলন—এই জড় জগতে পাঁচটি রসে পঞ্চবিধ সেবা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা অসম্পূর্ণ ও হেয়। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র লক্ষীভূত বস্তু, তিনি সকল রসের আকর। আমরা এই পাঁচটি রসের যে কোন রসে স্বীয় সিদ্ধ-স্বরূপে তাঁহার সেবা করিতে পারি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য অবতারে সেরূপ বিশ্রম্ভ-সেবা সম্ভবপর নহে।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, শ্রীরামচন্দ্রকে আমরা মধুর রসে সেবা করিতে পারি না, তাহা হইলে শ্রীসীতাদেবী অসন্তুষ্ট হইবেন—এক পত্নীব্রতধর শ্রীরামচন্দ্রের নৈতিক চরিত্রে লাঘবতা দৃষ্ট হইবে। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ যখন শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তখন একপত্নীব্রতধর শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার প্রজাবর্গের, বিশেষতঃ বজ্রাঙ্গজী, লক্ষ্মণজী প্রভৃতি সেবকবৃন্দের গৌরবমিশ্রিত দাস্যরসের সেবা গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু কান্তরসের সেবা গ্রহণ করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ, তিনি তাঁহার মধুর-রসাশ্রিত কান্তাগণের সম্ভোগ-বিগ্রহ। শ্রীরামচন্দ্র শান্ত, দাস্য, গৌরব-সখ্য ও বাৎসল্যরসে সেবিত হইলেও মধুর রসে কান্তভাবে তাঁহার সেবা হইতে পারে না বলিয়া বহু সেবক সে রসে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—গোপীজনবল্লভ; যে কোন আত্মা গোপীর আনুগত্যে কান্তভাবে তাঁহার সেবা করিতে পারেন। সেই সেবা হইতে তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। তাই বলিয়া জড়কামের তিনি বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেন নাই। যে কোন আত্মা স্বরূপ-শক্তির আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারেন; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ-গোপীজনবল্লভ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোন অবতারে সেবকগণের ইচ্ছা থাকিলেও সেরূপ সেবা তিনি গ্রহণ করেন নাই।

মনোধর্মের দ্বারা চালিত না হইয়া যদি শুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা নির্ব্ব্যলীক চিত্তে শুদ্ধ সেবা-অভিলাষী হই, তাহা হইলে শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারি,

তখন তিনি কাহকেও প্রত্যাখ্যান করেন না—ব্রজবাসীর আনুগত্য ব্যতীত এবং বিশ্রম্ভসেবা ছাড়া অন্য কোন সেবা তিনি গ্রহণ করেন না।

তিনি আত্মারই অধীশ্বর। মোট কথা, তিনি পূর্ণবস্তু, তিনি আমাদের সর্বস্বের মালিক, কিন্তু কৃষ্ণের অন্যান্য অবতারগণকে সর্বস্ব দিয়া সর্বতোভাবে উপাসনা করা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগকে মানুষ-পূজা করিতে বলেন নাই, কিংবা মানুষোচিত গুণগুলি বা ধর্মগুলিকে ভগবানে আরোপ করিতে বলেন নাই। সাধারণ লোক কিন্তু মর্ত্যজীবকে 'ভগবান' বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ইহা মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত। ভগবান্ সর্ব শক্তিমান্—পূর্ণ বস্তু, খণ্ড বস্তু নহেন। খণ্ড জ্ঞানে অখণ্ড বস্তুর ধারণা হয় না। মনুষ্য-জ্ঞানে নৈতিক-জ্ঞান ও বুদ্ধি যতদূর বিকশিত হইতে পারে ভগবান্ সেইটুকুমাত্র খণ্ড জ্ঞানের খণ্ড নৈতিকের অধীন তত্ত্ব নহেন; কেন না, ভগবান স্বতন্ত্র, পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান্। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগকে সর্বপ্রথমে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে বলিয়াছেন। নতুবা আমরা আত্মার সহিত দেহমনের সামঞ্জস্য করিয়া ফেলিব। আত্মা কিছু মন নয়, মন কিছু আত্মা নয়। মন বাহ্য জগতের দ্রষ্টা ও কর্তা—দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য জগতের অভিজ্ঞান লাভ করিয়া জড়ভোক্তা, তাহার যত কিছু জ্ঞান, বিচার, আনন্দ সমস্তই বাহ্য জগৎ লইয়া; সুতরাং মন কিছু আত্মার অনুসন্ধান করে না, বরং শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

যখন আমরা ভগবানের অনুসন্ধান করি, তখন আমরা চতুঃশ্লোকী ভাগবতে দেখিতে পাই যে, শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন,—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈবতত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।

অর্থাৎ আমার যে রূপ, আমার যে গুণ, যে পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা, তাহা তুমি আমার অনুগ্রহে অবগত হও। যাহারা মনস্তত্ত্বে অভিভূত বা মনোধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করে, তাহারা ভগবানের এই সবিশেষ তত্ত্ব ভগবৎকৃপালোকের অভাবে জানিতে পারে না। মুক্তাত্মগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে গুহ্যাতিগুহ্য রাসলীলা, তাহা অতীব চমৎকারপ্রদা। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এ রাসলীলা অপর কোন বিষ্ণুতত্ত্বে দেখা যায় না। সেবার শতকরা শতভাগই আমরা কৃষ্ণকেই দিতে পারি, অপর কোন বিষ্ণুকে দিতে পারি না। আমাদের ষোল আনা স্বার্থের একমাত্রগতি শ্রীকৃষ্ণ। আমরা এজগতে দেখিতে পাই যে, কোন ব্যক্তি মনে করিতেছেন—আমি কতকগুলি ভৃত্যের প্রভু, আমি বহু সম্পত্তির মালিক, আমি খুব বিদ্বান, ইত্যাদি। আমরা জড় জগতের খণ্ডজ্ঞানের এরূপ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইলে আমাদের অপর বস্তুর সম্বন্ধে যেমন পূর্ণ আধিপত্য বা পূর্ণজ্ঞান সম্ভবপর হয় না, তদ্রূপ অখণ্ড, অব্যয়, অসীম, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত, সকল শক্তির অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-

তত্ত্বে সর্বস্ব অর্পণ না করিলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার অভাবে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অবতারগণের লীলাগত পার্থক্য কোথায়, তাহা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না।

জগতে যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, সে-সমস্ত চিদচিৎ-এর অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং মানব জ্ঞানে তাঁহাকে খণ্ডজ্ঞানের বা খণ্ডনীতির অধীনস্থ বস্তুর অন্যতম জ্ঞান করা উচিত নহে। তিনি স্বতন্ত্র এবং মানব-কল্পিত-জ্ঞানের অধীন বস্তু নহেন। তিনি পরিপূর্ণ বস্তু, সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, অখিলরসামৃতসিন্ধু—সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি; সুতরাং সজ্জন মাত্রেরই উপাস্য বস্তু। তিনি আমাদের মনোধর্মের কারখানার বস্তু নহেন, কিংবা কোন ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহেন; আমাদের জানা কর্তব্য যে, তিনি সর্বগুণাকর, রসামৃতসিন্ধু ও আমাদের খণ্ড দর্শনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন; তবে কেহ কেহ তাঁহার একাংশ দর্শন করিয়া তাঁহাতে আবিষ্ট হন। সম্পূর্ণ দর্শন—ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমময় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত মাধুর্য্য, সমস্ত ঔদার্য্য তাঁহাতেই পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। তিনি প্রেমবশ্য—প্রেমের ঠাকুর। ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমে তাঁহার প্রীতি হয় না।

প্রেমময়ের সেবা সুষ্ঠুভাবে করিতে পারিলে আমরা শুদ্ধভক্ত হইতে পারিব। ''আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম।।'' অতএব আমরা শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের দয়ায় বুঝিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণই অখিলরসামৃত মূর্তি, সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান; তিনি সকল অবতারের অবতারী। সমস্ত অবতার তাঁহাদের সমস্ত রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার (লীলার) সহিত তাঁহাতেই অবস্থিত। তাঁহার ভজনা করিলেই সমস্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টি বিষ্ণুর ভজনা করা হয়। আমরা স্বরূপসিদ্ধি-উপলব্ধি ক্রমে অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহে তাঁহার সর্ববিধ অন্তরঙ্গ- সেবা-শোভায় অধিকার লাভ করিতে পারি। তৃতীয় (dimension) মানের বুদ্ধি থাকা-কালে পঞ্চম জুয় মুরলীধ্বনি শ্রবণের অধিকার থাকে না। ইহা তুরীর (dimension) মানের ঐশ্বর্য্যযুক্ত বিষ্ণু দর্শন-মাত্র নহে, পঞ্চম মানে চেতনের নিত্য স্বভাব থেকে এ অধিকারটা আসে তখন—যখন (unconditional surrender) অহৈতুকী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ হয়—যখন তৃতীয় (dimension) মানের (acquisitions) সংগৃহীত সম্পত্তিগুলো (fully give up) সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ হয়—যখন (I would not examine matters which are confined to three dimensions) আমি তৃতীয় মানের বিষয়ের আলোচনাতেই নিযুক্ত হই না, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হয়। (fourth dimension) চতুর্থ মানের পৌঁছাবার সময়ে ( surrender) আত্মসমর্পণ বলে একটা কথা আসে। I do not identify myself as an object that is capable of being investigated. ভগবান বলেছেন, যে বস্তু জীবের ইন্দ্রিয় দ্বারা আলোচ্য হ'বার যোগ্য, তা হ'তে আমি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকি। আমি কখনই তাহার সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত

হই না। তৃতীয় মান হ'তে বাহিরে আছি, যখন কাহারও এরূপ বিশ্বাস উপস্থিত হয়, তখন তুরীয়ের মানে যাওয়ার জন্য তা'র তৃতীয় মানের ব্যাপার হ'তে নিবৃত্ত হ'বার (retirement) ইচ্ছা উপস্থিত হয়। (he no longer exercises the function of his senses as an empericist) তখন সে অক্ষজ জ্ঞানের ন্যায় আর নিজের ইন্দ্রিয়-পরিচালনা করতে প্রবৃত্ত হ য় না। এই জিনিষটা মায়া উত্তীর্ণ হওয়ার (process ) পদ্ধতি। (surrender) আত্মসমর্পণ-দ্বারা মেপে-নেওয়া-ধর্ম-থেকে উদ্ধার হওয়া যায়। তারপর—যখন কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে, তখন পঞ্চম মানে উপস্থিত হয়, তখন উন্নত-উজ্জ্বলরস আস্বাদন হয় (consorthood of Godhead) ভগবানের ভোগ্যা স্ত্রীত্ব উপস্থিত হয়। হরি তাঁর নিজের স্ত্রীকেও নিজের সৌন্দর্য্য দ্বারা হরণ করতে পারেন।

এই সমস্ত নূতন বিষয় প্রচারিত ক'রে শ্রীচৈতন্যদেব (poverty of Theism) ভাগবত-ধর্ম্মের দারিদ্রতা, অসম্পূর্ণতা বিদূরিত ক'রে ভগবৎসেবা-ধর্মকে (Theism) সমৃদ্ধ করেছেন। উন্নত উজ্জ্বল ভগবৎসেবারস পূর্বে জগতে দেওয়া হয় নাই, রাধাগোবিন্দের পরম রমণীয় লীলার কথা তিনি জগতে প্রকাশ করেছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন যে, সমগ্র জীবাত্মা অবিচার পরিত্যাগ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হোক। বাঁশী যখন বাজে, তখন অনূঢ়া পরোঢ়া প্রভৃতি সব শ্রেণীর গোপী—যাঁ'রা মধুর রসের কোনও সংবাদ পান নাই তাঁ'রা সকলে এসে পারকীয়ত্ব-সেবা লাভ করুন। হাড় মাংসের ব্যভিচারের কথা বলা হচ্ছে না, কৃষ্ণের নিজের সেবার শ্রী—তাঁর পাঁচ প্রকারের সেবার কথাটা এই মরণশীল জীবের অমঙ্গলকে ধ্বংস করে দিতে পারে। চৈতন্যদেবের শিক্ষার দ্বারা সকলে কৃষ্ণের প্রীতি লাভ করুক। তিনি রক্ত-মাংসের শরীরধারী প্রচারক মাত্র নহেন, তিনি দেব, পুরুষ, অন্যান্য অবতার কিম্বা বলদেবমাত্র নহেন; শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। তাঁর দাসেরা অতি (nice and scrutinising) চমৎকার এবং পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিচার দ্বারা অতি সুষ্ঠুভাবে এই সব কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা বলেন নাই। যাঁর সৌভাগ্য হ'বে, তিনি তা গ্রহণ কর্‌বেন।

জগতে যে সকল দানের পরিচয় আছে, সেই সকল দান অল্পকালস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তা'রপর জগতের দাতৃগণের সমষ্টিও অতি অল্প। যদি দানপ্রার্থীর আশা ভরসা বেশী থাকে তা' হ'লে সেই সকল দাতা প্রার্থিগণের আশানুরূপ দান দিয়ে উঠ্‌তে পারেন না। পণ্ডিত মূর্খগণকে, ধনবান্ দরিদ্রগণকে, স্বাস্থ্যবান্ রোগিগণকে, বুদ্ধিমান্ নির্বুদ্ধিগণকে, তাঁ'দের আশানুরূপ দান দিতে পারেন না, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে দান প্রদান ক'রেছেন, মানবজাতি তত বড় দানের আশা প্রার্থনাও ক'রতে পারে নাই। এত বড় দান জগতে আস্‌তে পারে, জীবের ভাগ্যে বর্ষিত হ'তে পারে—একথা মানবজাতি

পূর্বে ভাব্‌তে ও আশা ক'রতে পারে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর যে অপূর্ব দান মানবজাতিকে দিয়েছেন, তা সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রেমা। জগতে প্রেমের বড়ই অভাব; সেই জন্যই হিংসা, বিদ্বেষ, কামনা, অন্যান্য কথা জীবকুলকে এত ক্লেশ প্রদান ক'রছে। ভগবানের সেবা কর্‌বার জন্য যাঁ'রা অভিলাষবিশিষ্ট, তাঁ'দিকে বাধা দিবার জন্য এমন কি, দেবপ্রতিম ব্যক্তিগণ—সাক্ষাৎ দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত।

আমরা প্রত্যেক মানুষ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত—অত্যন্ত খর্বদৃষ্টিসম্পন্ন। আমরা ত্রিগুণে তাড়িত হ'য়ে বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান ক'রতে পারি না। এজন্য অনেক অসত্য কথা প্রলোভনের টোপ নিয়ে উপস্থিত হয়। যদি তা'তে প্রলুব্ধ হ'য়ে পড়ি, তা'হলে মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা হয় না।

গৌরসুন্দরের দান কোন্ গোমুখীর মুখ দিয়ে বর্ষিত হ'য়েছিল? শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী সেই সৌরসুন্দরের দান—সেই প্রেমপ্রয়োজন-মহীরুহের মধ্যমূল। যে প্রেম একমাত্র মৃগ্য—অবিকৃত আত্মার একমাত্র প্রয়োজন, সেই প্রেম যে-ভাবে পাওয়া যায়, শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ তা'র একটী মূলমন্ত্র গান ক'রেছিলেন। সেই গান শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ শুনেছিলেন, মহাপ্রভু আবার ঈশ্বরপুরীপাদের মুখে সেই গান শুন্‌বার লীলা দেখিয়েছিলেন। সেই গানটী এই—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।"

ভারতবর্ষে এই দান দিয়েছিলেন—মাধবেন্দ্র পুরীপাদ; ভারতের অতীত স্থানে দিয়েছিলেন কি না, আমরা তা' জানি না। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলার এই মূলমন্ত্রটী যে ভারতবাসীর কানে পৌঁছেছে, তাঁ'রই সর্বাথসিদ্ধিলাভ হ'য়েছে। আর যা'দের কানে পৌঁছে নাই, তা'রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ হ'য়ে র'য়েছে। এই মূলমন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা যিনি বুঝলেন না, তাঁর মানবজীবন-ধারণ বৃথা। এই বিপ্রলম্ভ-গীতি আমাদের অবিকৃত আত্মার ধর্ম—আমাদের সহজ স্বভাব।

ঠাকুর বিল্বমঙ্গল এককালে কুবিষয়ে অভিনিবেশের অভিনয় প্রদর্শন ক'রেছিলেন। শিখিপিচ্ছমৌলির সেবায় নিরত হ'য়ে লীলাশুক তাঁ'র কর্ণামৃতের মধ্যেও বিপ্রলম্ভভজনের কথা ন্যূনাধিক গান ক'রেছেন। গৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে-কথা বলবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সেই কথার আলোচনা হ'ক। 'গৌড়দেশের অধিবাসী' অভিমান ক'রে আমরা এখনও বিষয়-কার্য্যে অভিনিবিষ্ট র'য়েছি! ইহা এতদূর দরিদ্রতা যে, মানবের ভাষা দ্বারা তা' ব্যক্ত হ'তে পারে না। এই দরিদ্রতা মোচনের জন্য মাধবেন্দ্রপাদ এই বিপ্রলম্ভগীতি গেয়েছিলেন—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।"

যে-ব্যক্তি আমাদের অভাবের কথা বুঝে না, আমরা তা'কে অনেক সময় দুঃখের সহিত ঠাট্টা তামাসা ক'রে ব'লে থাকি 'দয়িত'। ব্রজবাসিগণের নিকট হ'তে ভগবান্ যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন ব্রজবাসিগণ নন্দতনুজকে এই কথা ব'লেছিলেন; আর বলেন,—'মথুরানাথ'; 'বৃন্দাবনপতি' বল্লেন না। মাথুরগানের কথা অনেকেই শুনে থাকবেন; এ সকল শব্দ বিপ্রলম্ভময়ী পরিভাষা। যা'কে 'বিরহ' বলা হয়, তা'কে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 'বিপ্রলম্ভ' বলে। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে বিরহে বল্ছেন,—তুমি 'দয়িত' বটে, কিন্তু তুমি 'মথুরা-নাথ'; আমাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে চ'লে গেছ; আমরা কাঙ্গাল, তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব, সেই সবর্স্ব আজ লুণ্ঠিত হ'য়েছে। সুতরাং দুঃখের কথা ব'ল্তে গিয়ে হাস্যরস ছাড়া আর কি আস্তে পারে? তুমি আমাদের নয়নের মণি, আজ আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছ—আমাদিগকে চিন্তাকুল ক'রে মথুরায় চ'লে গেছ।

হে নন্দতনুজ, তুমি কি চিরদিনই অধোক্ষজ থাকবে? তোমার এমন সৌন্দর্য, রূপ, রস আমরা দর্শন কর্তে পাব না? তুমি জ্ঞানগম্য বস্তু; আমাদের জ্ঞান নাই ব'লে দেখতে পাই না। আমরা যে অজ্ঞান, বালক, অবুঝ। আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যা নাই ব'লে তুমি জ্ঞান-ভূমিতে চ'লে গেছ—যেখানে আমাদের ইন্দ্রিয় যায় না। কিন্তু তুমিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, আর দয়াতে তোমার চিত্ত আর্দ্র। তোমাকে কবে আমরা দেখ্তে পাব? তুমি দেখা দিয়েছিলে—আমাদিগের চিত্তবিত্ত সেই দেখা দ্বারা হরণ ক'রেছিলে—আমাদের সর্বস্বহরণকারী সেই হরি আজ মথুরায় চ'লে গেলে! তোমার দর্শনের অভাবে আমাদের হৃদয় কাতর।

সেই চিত্তের বৃত্তি—কৃষ্ণ-বিরহ-বিভ্রান্ত চিত্তের যে ব্যাধি, তা'র ওষধি কোথায়? সেই জিনিষটী হ'চ্ছে শ্রীগৌরসুন্দরের মূল মন্ত্র,—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোমহ্যম্।।"

গৌরসুন্দর ব'ল্লেন,—হে বিষয়-নিবিষ্ট-চিত্ত মানবকুল, এই দুনিয়াদারীর ছাই-পাঁশের মুটেগিরি ক'র্তে ক'র্তেও তা'র প্রতি বিরক্তি এসে কি প্রকারে তোমাদের মঙ্গল হ'বে, তোমরা কি প্রকারে উৎক্রান্তদশায় এসে উপস্থিত হ'বে, সেজন্য তোমরা এই শিক্ষা গ্রহণ কর, তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন কর।

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্।।"

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনে আট প্রকার সুখোদয় হয়। হে কর্ম্মঠ জীব-সম্প্রদায়—

মনুষ্যজাতি, এই কথাটী একটু শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের সম্যগ্রূপ কীর্ত্তন জয় লাভ করুক। যে সকল লোকের বিষয় কথা শুন্‌তে শুন্‌তে কর্ণ একেবারে বধির হ'য়ে গেছে, তা'দিকে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন শুনা'তে হয়। বহির্জগতের চিন্তাস্রোত তা'দিকে ঠেলে মায়াবাদের অকূল সাগরে ফেলে দিচ্ছে। সংসার-সাগরের বিষয়-ভোগের স্রোত তা'দিকে মায়াবাদ-সাগরের বিষয়-ত্যাগের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণবিমুখতার চরম আবর্ত্ত-বিবর্ত্তে পতিত ক'রছে। 'হাম খোদাই' বুদ্ধিতে চালিত হ'য়ে মানুষ স্বগত স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন—ত্রিপুটী বিনাশের বিচার অবলম্বন ক'রে আত্মবিনাশের পথে ধাবিত হন। তা' হ'তে রক্ষা পেতে হ'লে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন কর; তা'তে আট প্রকার সুখোদয় হ'বে।

চিত্তদর্পণে দৃশ্যজগতের আবহাওয়া নিরন্তর স্তূপীকৃত আবর্জনা এনে ফেল্‌ছে। সেই আবর্জনারাশি চেতনের বৃত্তিকে চাপা দেয়। চিত্তদর্পণে যে ধূলো প'ড়ে গিয়েছে,-—তা'র উপর যে প্রকারে বিকৃতভাবে দৃশ্য জগৎ প্রতিফলিত হ'চ্ছে, যা'র ফলে আমরা কেহ কর্ম্মবীর, কেহ ধর্ম্মবীর, কেহ কামবীর, কেহ অর্থবীর, কেহ জ্ঞানবীর, যোগবীর, তপোবীর হওয়ার অবৈধ অভিলাষ সৃষ্টি ক'রে তা'তে ধ্বংস লাভ করবার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছি—মানবসমাজ আমরা প্রেম হ'তে দিন দিন কতদূরে চ'লে যাচ্ছি, সেই সব অসুবিধা আনুষঙ্গিক ভাবে অতি সহজে বিদূরিত হ'তে পারে—কৃষ্ণের সম্যগ্রূপ কীর্ত্তনে। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের অভাবে মানব জাতির শুভোদয়ের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'য়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের—'শ্রীকৃষ্ণটি' মানুষের মনোধর্মের কারখানায় প্রস্তুত কৃষ্ণ ন'ন। ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, রূপক কৃষ্ণ, তথাকথিত আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ, কল্পিত কৃষ্ণ, প্রাকৃত সহজিয়ার কৃষ্ণ, প্রাকৃত কামুকের কৃষ্ণ, প্রাকৃত চিত্রকরের কৃষ্ণ, যথেচ্ছাচারিতার কবলে কবলিত কৃষ্ণ, মেটেবুদ্ধির কৃষ্ণ, কা'রও ব্যক্তিগত রুচির ইন্ধন-সরবরাহকারী কৃষ্ণ, মায়ামিশ্রিত কৃষ্ণ—"শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের কৃষ্ণ" ন'ন।

বিখ্যাতকীর্তি ঔপন্যাসিক যখন কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন ক'রলেন, তখন নবীন বঙ্গীয় যুবকগণ কত উচ্ছ্বাসভরেই না সেই বর্ণনার কীর্তিগাথা বাঙ্গালার হাটে-ঘাটে-মাঠে গে'য়ে বেড়া'তে লাগলেন। যখন প্রথম কৃষ্ণচরিত্র-গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লো, তখন নবীন প্রবীণ সকলের মুখেই শুনলাম যে, এবার কৃষ্ণচরিত্রের উপর এক নূতন আলোক এ'সে গেছে! 'মহাভারতের কৃষ্ণ', 'ভাগবতের কৃষ্ণ' প্রভৃতি কত কি বিচার হ'লো। আমাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ সেইরূপ কোন লোকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন-সরবরাহকারী কৃষ্ণ ন'ন। মানুষের মেটেবুদ্ধি সেই শ্রীকৃষ্ণকে মেপে নিতে পারে না।

'শ্রীকৃষ্ণ'—এখানে যে "শ্রী" কথাটি, সেই "শ্রী" আকৃষ্টা হ'য়েছেন কৃষ্ণের দ্বারা; এজন্য "শ্রীকৃষ্ণ"। কৃষ্ণ-আকর্ষক, শ্রী—আকৃষ্টা। শ্রী—পরম সৌন্দর্যবতী। পরম

সৌন্দর্যবতীকে যিনি নিজ সৌন্দর্যের দ্বারা আকর্ষণ ক'রতে সমর্থ, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

পঞ্চমস্বরে যে বংশীধ্বনি গীত হয়, তা' ত্রিগুণতাড়িত ব্যক্তি শু'নতে পায় না, এমন কি, চতুর্থমানেও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চম তান অনেকে শুন্‌তে পান না। তুরীয় রাজ্য বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসকগণ কৃষ্ণ-মুরলীর পঞ্চম তানের মাধুরী বুঝ্‌তে পারেন না।

যেরূপ ভাবে রুদ্রের পরিচয়, ব্রহ্মার পরিচয় বা বিষ্ণুর পরিচয় হয়, সেইরূপ গুণাবতারজাতীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ন'ন। তিনি গুণাবতারগণের অবতারী। জড়বোধ-ব্যাপার-বিশেষমাত্রও তিনি ন'ন। তিনি চেতনাভাস মনকে মাত্র আকর্ষণ করেন না; তিনি অনাবিল আত্মাকে আকর্ষণ করেন---তিনি সৌন্দর্যবান্‌কে আকর্ষণ করেন---সৌন্দর্যবতীগণকে আকর্ষণ করেন।

আমরা যেখানে অত্যন্ত ভীতি, সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সহিত পূজা কর্‌তে যাই, সেখানে আমরা কৃষ্ণকে পাই না—কৃষ্ণের অবতারসমূহকে পাই। আমরা অভাবক্লিষ্ট, এই হেতুমূলক বোধ তখন আমাদিগকে ঐশ্বর্যবানের উপাসক ক'রে তুলে। গৌরসুন্দর যখন দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন, তখন,সে দেশ থেকে একখানা গ্রন্থের একটি অধ্যায় তিনি এনেছিলেন, তা'র নাম—'ব্রহ্মসংহিতা'। তা'তে ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন ক'রে ব'লছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।।

সকল কারণের কারণ অনুসন্ধান কর্‌তে গেলে কৃষ্ণকেই পাওয়া যায়। কার্যকারণবাদের মূল চরম বস্তু অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সেই অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসার অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভূত হন। সৌন্দর্য না থাকলে—যোগ্যতা না থাক্‌লে তিনি আকর্ষণ করেন না। দয়া নিতে হ'লে দয়ার দানীর চিত্ত আকর্ষণ করতে হয়—সকল জগতের সহিত বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন ক'রে দানীর অব্যভিচারী বান্ধব-প্রেয়সী হ'তে হয়।

তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দঘনমূর্তি। তিনি নিত্যকাল অবস্থিত; কাল তা' হ'তেই প্রসূত হ'য়েছে, কালের কাল মহাকাল তাঁ'র অধীন, তিনি পূর্ণজ্ঞানবস্তু, তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় বস্তু।

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তনে জীবের সর্বসুখোদয় হয়। কৃষ্ণের আংশিক কীর্তন ক'রে যদি জীবের সর্বসুখোদয় হয়, তা' হলে অনেকে কৃষ্ণকীর্তনের শক্তি বিষয়ে সন্দিগ্ধ হ'য়ে প'ড়তে পারেন। কৃষ্ণের বিকৃত কীর্তনে জীবের তুচ্ছফল লাভ হ'তে পারে। এজন্য বুদ্ধিমানগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তনের বিজয় বাঞ্ছা করেন।

সেই নাম—বৈকুণ্ঠনাম। সেই নাম এই কুণ্ঠাধর্মযুক্ত গুণজাত জগতের বিভিন্ন ভাষার শব্দের মত দেখতে হ'লেও তাঁর সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। সে নাম—বৈকুণ্ঠনাম,

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং অশেষাঘহরং বিদুঃ"—যে বৈকুণ্ঠ নামের আভাসে নিখিল পাপ অনায়াসে বিদগ্ধ হ'য়ে যায়, সেই নাম সর্বক্ষণ কীর্তনীয়। বৈকুণ্ঠ-নাম উচ্চারণ করলে মানব বৈকুণ্ঠে অবস্থিত হয়—পরম ধর্মে অবস্থিত হয়—পরমার্থ লাভের জন্য ব্যস্ত হয়। মায়িক নাম—কুণ্ঠানাম সেরূপ নয়।

আমাদের ভাগ্য এমন মন্দ যে, আমাদের সর্বশক্তিমান্ বৈকুণ্ঠ-নামে রতি না হওয়ায় আমরা ইতর কথায় ব্যস্ত র'য়েছি। জগতের অন্যান্য কার্য সম্পাদনের জন্য—অন্যান্য অভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্য—অন্যান্য চর্চা করবার জন্য আমরা যে-সকল শব্দ ব্যবহার করি, সেই সকল ভাষাগত শব্দ আমাদের সেবা করে—আমাদের ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়—আমাদের অভিলাষের সরবরাহ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে; কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম সেরূপ নহেন। আমার মঙ্গলের জন্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" শ্রৌতমন্ত্রের যে প্রকৃত অর্থ,—জীবের চরমাবস্থা লাভের পরে যা' হয়,—গৌরসুন্দর 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকে তা' বলে দিয়েছেন। অন্যান্য শব্দ আমাদিগকে উচ্চাকাঙ্খা বা দুরাকাঙ্খার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম আমাদিগকে কৃষ্ণের সেবা-পথে ধাবিত করায়—আমাদিগের উপর তাঁর পূর্ণ প্রভুত্ব, পূর্ণ স্বরাজ্য বিস্তার করে।

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।।"

তাৎকালিক অভাব-পূরণ এক কথা, আর আমাদের যে স্থায়ী অভাব অর্থাৎ কৃষ্ণ-বিস্মৃতিজনিত অস্বাস্থ্য তা' দূর করা আরও অনেক বড় কথা। শ্রীচৈতন্যদেব সেই কথাই বলেছেন। ভগবদ্ভক্তি সকল জীবের নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়। আত্মার নিত্যধর্মের নাম 'ভক্তি', তা' ভজনীয় বস্তুর সেবা।

কোন্ বস্তু ভজনীয় হবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় উদিত হ'লে মীমাংসক শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, তিনি ভজনীয় বস্তু, যিনি সকলপ্রকার রসের ভোক্তা—তিনিই ভজনীয় বস্তু, যিনি অখিলরসময়বিগ্রহ। অনেকে বিচার করেন, জগতে যে রস আছে, তাতে নানাপ্রকার অভাব থাকার দরুণ আনন্দ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভগবান্‌কে 'রসময়' বিচার করলে—সকল রসের ভোক্তা ব'ললে বোধ হয় সেরূপ কোন অভাব ও হেয়তা ভগবানে আরোপিত হ'বে। বস্তুতঃ বৈকুণ্ঠরস ও মায়িক-রস এক নয়। গোলোকপতি কৃষ্ণ যে রস ভোগ করেন, তা' জড়রস নয়। জড়রস সেই অপ্রাকৃত রসেরই হেয় খণ্ড প্রতিফলন।

রসের আংশিকতায় আমাদের উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায়। আমরা আনন্দ লাভের জন্য রসের আবাহন করি। যখন দেখি, আনন্দ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আনন্দাভাব আমাদিগকে ক্লিষ্ট করছে, তখন সে বিষয়ে উদাসীন থাকাকেই আমরা বহুমানন করি।

পাছে জাগতিক রসের অসম্পূর্ণতা আমাদিগকে রসবিষয়ে শিথিল-প্রযত্ন করায়, এই আশঙ্কায় আমরা রসরহিত অবস্থায়ই ভগবত্তা হউক—এই প্রকার প্রস্তাব ক'রে থাকি, বস্তুতঃ নীরস বা বিরস জীবন আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। জগতে সকলেই রসের অনুসন্ধান করেন। আনন্দের প্রাপকসূত্রে আমরা যে সকলকার্য ক'রে থাকি, তা' অপূর্ণ রাজ্যে অবস্থিত থাকায় তা'তে রসের হানি লক্ষ্য ক'রে থাকি। ইহজগতে হানি ও বৃদ্ধি—উভয় অবস্থাই দোষযুক্ত। সেই দোষযুক্ত অবস্থার অভিজ্ঞতা হ'তে আমরা রস-রহিত নির্বিশেষ অবস্থাকেই শান্তির কেন্দ্র ব'লে কল্পনা করি। যেস্থানে রস-বৈচিত্র্যের অভাব আছে, সেই স্থানকেই গন্তব্য পথের শেষ সীমা মনে করি।

যিনি শান্তিলাভ করবেন,তাঁর যদি বাস্তব অস্তিত্বই না থাকে, তবে সেরূপ শান্তির কামনারই বা প্রয়োজন কি? নির্বিশেষ অবস্থায়ই যদি চরমসীমা বা শেষ কথা হয়, তবে সেখানে রসসমূহ পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। এজগতে মুখ্যরসের সহিত গৌণরসের বিরুদ্ধভাব দৃষ্ট হয়। কিন্তু চিজ্জগতে সেই আপাতবিরুদ্ধ ভাবই আরও প্রীতিবর্ধনের জন্য—আরও উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিযুক্ত হ'য়ে থাকে। যাঁরা রসবিগ্রহের খবর রাখেন, তাঁরা জানেন যে সেই বেদ-প্রতিপাদ্য রসের একটি কণার আভাসও যদি এজগতে আগমন করে, তাতেই আমাদিগকে চঞ্চল ক'রে দেয়। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর সেই অপ্রাকৃত রসের আস্বাদন ক'রতে পারে না, তা' সেই রসের নিকট প্রতিবন্ধক রূপেই উপস্থিত হয়।

কোন শান্তির প্রস্তাব হ'তে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। আলস্য-ধর্মপরায়ণ হ'য়ে স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রতিবন্ধকের দ্বারা অপ্রাকৃত রস প্রবাহকে বাধা প্রদান করলে রসময় বিগ্রহের সন্ধান পাওয়া যাবে না। পুরুষোত্তমবস্তু দ্বাদশ প্রকার রসের দ্বারা সেবিত হন। সেই সেবারসের সন্ধান পুরুষোত্তম-সেবকগণের নিকট হ'তে পাওয়া যায়। জড়রস-বৈচিত্র্যের ভূমিকা অতিক্রম ক'রে অপ্রাকৃতরস বৈচিত্র্যের সন্ধান পেতে হ'লে জাগতিক সকল বিচারের গণ্ডীকে অতিক্রম করতে হবে।

এ জগতে আপাত সুখান্বেষিব্যক্তিগণের প্রস্তাব-মুখে যে সকল কামনা ও অভিসন্ধি দেখতে পাওয়া যায়, তাহাই অন্যাভিলাষ। সেই সকল অন্যাভিলাষ হ'তে যে সকল শান্তির প্রস্তাব মানবজাতির মধ্যে ধর্মের নানামত ও নানাপথ সৃষ্টি ক'রেছে, তা হয় প্রাকৃত রস পর্য্যন্ত, না হয় জড়রস-নিরাকরণ-রূপ নির্বিশেষ অবস্থা পর্য্যন্ত দৌড়িয়ে তা'র গতি সমাপ্ত ক'রতে পারে। তখনই তার হৃদয়ে বিদ্যাপতির "মাধব-হাম পরিণাম নিরাশা"—এই সঙ্গীতের ঝঙ্কার উদিত হয়। কিন্তু এই পরিণাম নিরাশার পরও বিদ্যাপতি রসময় বিগ্রহের যে রসবৈচিত্র্যের কথা ব'লেছেন, তা আলোচনার বিষয় না হ'লে আমাদের জড়রসেই পুনরাবৃত্তি হ'য়ে থাকে।

এ জগতে রসের যে সকল অসুবিধা আছে, যদি আমরা চিজ্জগতে সেই সকল কথা আরোপ করতে চাই, তা হ'লে তা'তে দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত ভয় ও অমঙ্গল এসে উপস্থিত হয়। অব্যভিচারিণী ভক্তি যে কাল পর্য্যন্ত হৃদয়ে উদিত না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত ঐহিক ও আমুষ্মিক বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার পথের হ'য়ে আমরা জাগতিক ভোগের বহু-মানন করি। কাম, ক্রোধ, লোভের দ্বারা কবলিত জীবও বুঝতে পারছে যে, এরূপ একটি ব্যাপার বাস্তবিকই আছে (mental scope) মনের গতি যতটা যায়, কেবল ততটুকু সমগ্র নয়। জগতে সেই জিনিষটাকে দেখবার কোন সম্ভাবনা নাই। যোগ-সাধন করতে গিয়ে ' সেবা' ব'লে একটা বৃত্তি উদিত হয়। পরমাত্মবস্তুর দর্শনের পরে সেবার প্রারম্ভ। ব্রহ্ম দর্শনের দূরত্বের জন্য সেবা সম্ভব হয় না। (communion) পরস্পর আদান-প্রদান-সান্নিধ্য না হ'লে সেবা হয় না। (detached observation) বিযুক্ত দর্শনে তিনি খুব বৃহৎ, কিন্তু আমার যে কাজ (function of the soul) আত্মার যে কাজ—তার সুবিধা নিকটতম দর্শন না হ'লে হয় না।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।

কেবল জ্ঞান আশ্রয় ক'রে যদি বস্তু নির্দ্দেশ করি, তা' হলে বৃহত্ত্বকে লক্ষ্য করা আমাদের ধর্ম হ'য়ে উঠে—যা'র মধ্যে সব (included) অন্তর্ভুক্ত আছে। জ্ঞানের দ্বারা যখন (dislocated) স্থানচ্যুত আছি, তখন এরূপ দর্শন হয়।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।

যখন (foreign contamination) বিজাতীয় আবর্জনা (sweep off) ঝেটিয়ে দূর করতে পারি, তখন সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। তখন প্রসন্নতার লাঘব হয় না—শোক হয় না। আকাঙ্ক্ষা—অভাব-জাত। সমজ্ঞান—বলশেভিক (idea) ধারণা মাত্র নয়—সবজিনিষে চেতন ধর্ম দর্শন হয়। (eclipsed form of inspection) আবৃত দর্শনে পূর্ণ প্রকাশ দ্রষ্টব্য বিষয় হয় না। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান,—এই তিনটি সংজ্ঞা আমরা সেই বস্তু বিষয়ে লাভ করি। ভক্ত বলেন—'ভগবান্', যোগী বলেন—'পরমাত্মা', ব্রহ্মভূত ব্রাহ্মণ বলেন—ব্রহ্ম। জ্ঞানের সহিত সন্ধিনীর যোগে পরমাত্মা। দূরস্থিত বিজ্ঞান-রাহিত্য হ'য়ে বস্তুর সহিত এক হ'য়ে যাওয়া—আত্মার ধর্ম নহে। যখন আমরা বিশুদ্ধভাবে সেই বস্তুর নিকট উপস্থিত হই, তখন প্রথমে আমরা ব্রাহ্মণ হই, পরে যোগী হই, শেষে ভক্ত হই, ভগবত্তার আংশিক ছেড়ে পূর্ণ দর্শন হয়।

ইতর দেবতার (Fountain-head) মূল আকর—বিষ্ণু বস্তু। আচমন মন্ত্রে বিষ্ণুপারতম্য সূচীত হ'য়েছে—

"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।"

বিষ্ণু হ'তে দেবত্ব। সমগ্র জগৎ তাঁ-কর্তৃক পালিত হয়। বিষ্ণু সবিশেষ বস্তু। সবিশেষ-সম্বন্ধে ভগবত্তা-বিচার উপস্থিত হয়। ভগবত্তার খানিক খানিক অংশ যাঁরা লাভ করেন, তাঁ' দিগকে ভগবান্ বলি। কিন্তু তা' ছাড়া অন্যভাব অর্থাৎ ভৃত্যভাব যাঁতে আছে, তাঁকে দেবদের পরমেশ্বর বলি না। সূরিসকল বিষ্ণুর পরমতত্ত্ব দর্শন করেন। যাঁরা সূরি তাঁরা অবিদ্বান্ নহেন। অবিদ্বৎ-প্রতীতি-বশে বিষ্ণুবস্তুকে অন্য দেবতার সহিত সমজ্ঞান হয়। "আততং চক্ষুঃ" যদ্দ্বারা দ্যোতমান রাজ্যে সব জিনিষটাকে দেখা যায়।

বিষ্ণু হ'তে চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত, স্থিতি ও লয়প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের কার্য্য—কালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। আবার বিষ্ণু বস্তুতেই লীন, সংগোপিত হ'য়ে যায়। রজোগুণের অবতারকে, তমোগুণের অবতারকে আমরা—ব্রহ্মা, শিব দর্শন করি। জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ। জন্ম ও ভঙ্গ—স্থিতির আগের এবং পরের অবস্থা। সৃষ্টির (analytical view) বিশ্লিষ্ট দর্শন যাঁরা পেতে চান, তাঁরা বিষ্ণুর তিনটি রূপ দর্শন করেন —গুণের দ্বারা বিভাগ ক'রে শক্তি দর্শন করেন। তিন প্রকার ক্রিয়া—(Integer) অদ্বয়-বস্তুর বিভিন্ন ভাবক্রিয়ার দর্শন। তিনি বৈকুণ্ঠ বস্তু। আমাদের অসম্পূর্ণ (equipment) যন্ত্র সমূহের দ্বারা তাঁকে মেপে নেওয়া যায় না। আমাদের করণ দ্বারা সসীম বস্তুর আরাধনা ক'রে থাকি। ইন্দ্র, ঊষা, ইত্যাদি (different phenomenal aspect) বিভিন্ন খণ্ডিত, (partial aspcets) আংশিক ভাবসমূহ—(of that Integer) সেই অখণ্ড বস্তুর। আলোকময় অংশকে আমরা সূর্য্য বলি—যা' জল টেনে নেয়। ইন্দ্র সেই জল বর্ষণ করেন, বায়ু সঞ্চালন করেন। ইহা এক একটা (different aspect) ভিন্ন ভাব—(not the full Absolute) পূর্ণ ও স্বতন্ত্র বস্তু নহে। এই (partial vision) আংশিক দর্শনকে (create) সৃষ্টি করবার জন্য যে (potency) শক্তি, সেটা বিষ্ণুমায়া।

ভূতাকাশে বায়ু দেবতার ক্রিয়া আমরা ভিন্ন ভিন্ন (location) অবস্থানে লক্ষ্য করি। দেবতাগুলো (partial) খণ্ড-দর্শনে বিষ্ণুতে অবস্থিত। দেবতার উপাসনা—এই হিসাবে বিষ্ণুর উপাসনা, কিন্তু শালগ্রাম এনে তাঁদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। বিষ্ণু—পূর্ণ বস্তু। তাঁরই অপূর্ণ দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা-প্রতীতি।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম।।

মানুষের (particular angle) কোণ-বিশেষ বিষ্ণু দৃষ্ট হ'লে বিষ্ণুর (attribution) আরোপিত গুণমাত্র দৃষ্ট হয়। (one of the faces) অন্বয়ের একটি খণ্ডিত ভাবকে অবিধিপূর্বক ভজন-কার্য হয়। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজক—অপূর্ণের

সেবক; যেমন হাতীর শুধু লেজ; কিংবা একটা পা' দেখে হাতি-বিষয়ক জ্ঞানটা অসম্পূর্ণ জ্ঞান, সেইরূপ। শ্রীভগবান্ বল্‌ছেন,—আমার আংশিক উপলব্ধি করবার জন্য যা'রা ব্যস্ত হয়েছে, তা'দের এইরূপ দর্শন হয়। বিষ্ণুতত্ত্ব-বর্ণনে মৎস্য-কূর্মাদি অবতার সংশ্লিষ্ট আছেন, বিষ্ণুতত্ত্ববর্ণন হ'তে অসংশ্লিষ্ট উপাস্যের উপাসককে—যেমন বুদ্ধের (followers) অনুগত ব্যক্তিদিগকে—বৈষ্ণব কিংবা বৌদ্ধ-বৈষ্ণব বলা হয় না। তপস্যা এখান থেকে (start) আরম্ভ ক'রে উদ্ভুত। তপস্যিগণ বৈষ্ণবতা থেকে বাদ পড়েছে; কিন্তু বৈষ্ণব তা'দিগকে বাদ দিতে পারেন না।

যদি কেহ অপূর্ণ হ'য়ে অপূর্ণত্বেরর সেবা করে, তা' হ'লে তা'র বিষ্ণু-সেবা হয় না, (dislocated part from Vishnu) অসঙ্গতরূপে বিষ্ণুর কল্পিত খণ্ডিত অংশের সেবা (?) হয়। অংশভূত বিচার না ক'রে বিভিন্ন কল্পনা করা ভ্রম। (particular angle of vision) বিশেষ কোণজ-দর্শনে প্রকৃত প্রস্তাবে আমারই (বিষ্ণুরই) একটা মাত্র গুণ অবলোকনদ্বারা অখণ্ড বস্তুর দর্শন কল্পনা করবার অবৈধ চেষ্টা। সেইরূপ দর্শকেরাও আমাকেও (বিষ্ণুকে) ভজনা করে; কিন্তু তা'রা আমার একটা (aspect) দিকের ভজনা করে। But they are found to be inadequate, irregular. তা'দের দর্শন—অসম্যক্ ও অবৈধ—তাদের (hallucinative thought) প্রবঞ্চনাপূর্ণ চিন্তাস্রোতে যা' উপস্থিত হ'ল তা'র দর্শন। আমার (ভগবানের) নিকট নিজেকে (fully surrender) সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করতে হয়, আমি পরিপূর্ণ বস্তু—অনিবেদিত দ্রষ্টার আংশিক প্রতীতি কল্পিত দেবতা-মাত্র নহি।' (It is a policy by which we measure things through our senses) ইহা আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তু মাপিবার বৃত্তি। মায়া দ্বারা যখন আমরা (tied up) আবদ্ধ হই, তখন এই প্রকার শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদির ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। তখন মনের দ্বারা বহির্জগৎ হ'তে একটা (subtle impression) সূক্ষ্ম অনুভূতি নেবার ক্ষমতা উপস্থিত হয়। বৈকুণ্ঠ বস্তুকে খানিক খানিক মেপে নিয়ে এক একটা (School) মতবাদ স্থাপন করি। অক্ষপাদ, পাতঞ্জল প্রভৃতির (scholastic thought) আরোহ চিন্তার এইরূপ বিভিন্ন বিচার। (reclpised fourm of knowledge instead of knowledge in full) ইহাতে পূর্ণ জ্ঞানের পরিবর্তে আবৃত জ্ঞান (eclipsed bliss) আবৃত আনন্দ (as effect) ফলরূপে উপস্থিত হয়, ইহাই জীবের দুর্গতি।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।<br>মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।

'মায়া আমার সম্বন্ধিনী। আমি (Fountain-head) আকর। আমার (deluding potency) বঞ্চনাকারিণী শক্তি অনুচিৎ এর উপর (act) ক্রিয়া করে—পূর্ণচিৎ-

আমার উপর (act) ক্রিয়া করতে পারে না,—সেখানে (condemned) অপাশ্রিত জুগুপ্সিত হয়ে দূরে অবস্থান করে। এই মায়াশক্তি 'দুষ্পারা'। মায়াগ্রস্ত ব্যক্তি (can not cross over the particular chamber) তারা, সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠ-বিশেষের গণ্ডি ছাড়াইতে পারে না। (different atmospheres are not available to him) উন্মুক্ত অবকাশের বিভিন্ন অংশ তা'র নিকট উন্মুক্ত নহে।'

শ্রীচৈতন্যদেব নির্বিশেষবাদীর কথা বলেন নাই। নির্বিশেষবাদিগণ বলেন,---বহির্জগতে থাকা-কালে নানা প্রকার কার্য করবো, পরজগতে আর ঐ সকল কার্য্যের বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য থাকবে না, সম্পূর্ণ নির্বিশেষ হ'য়ে যা'বে। সেখানে কোন বিচিত্রতা থাক্‌তে পারে না। কারণ, কালের অধীনেই বিচিত্রতা উৎপত্তি লাভ ক'রে সম্বর্দ্ধিত হয় এবং কালের মধ্যেই সমাপ্ত হ'য়ে যায়। সুতরাং কালাতীত বস্তুকে বিচিত্রতার অধীন কর্‌লে তাঁকে কালাধীন নশ্বর বস্তুরূপে প্রমাণিত করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তা' বলেন না। তিনি ভগবান্ পুরুষোত্তমবাদের কথা বলেন। ভগবত্তা যে কেবল শক্তি পরিচালনা ক'রে, শক্তি-পরিণত জগতে অনিত্য ও নিত্য ব্যাপার-দ্বয় স্থাপন করেছেন, তা'র মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব ভগবত্তাকে সংক্ষেপ ও সঙ্কীর্ণ কর্‌বার কথা বলেন নাই। নির্বিশেষবাদী যেরূপ স্তব্ধ ক'রে দেওয়ার যোগাড় করেন, সেরূপ ধরণের কথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেন নাই।

বিচিত্রতার নিত্যতা আছে, তা'র নিত্যত্ব আবৃতাবস্থায় এখানে পরিদৃষ্ট হ'চ্ছে। তা' কালের অধীনে দেখা যাচ্ছে ব'লে সম্যগ্-দর্শনে প্রতিবন্ধক এসে যাচ্ছে। কিন্তু অখণ্ডকালে তত্তদ্ বিষয়ের বিচিত্রতার নিত্যস্বরূপ নিত্য বর্তমান আছে।

বহির্জগতের চিন্তাস্রোত অন্তর্জগতের নিত্যকালের বিষয়ে আরোপ করার নামই Anthropomorphism. এই জগতের সংগৃহীত তথ্য চিজ্জগতে সংশ্লিষ্ট করা—আরোপ কর্‌তে যাওয়াই Anthropomorphism, যেরূপ জড় জগতের পশুপক্ষীর কথা চিজ্জগতের অপ্রাকৃত অবতার সমূহে আরোপ করার নামই---Zoo-morphism, অচেতনে যদি চেতনের কথা আরোপ করা যায়, তা'হলে সেরূপ Animism or Animistic চিন্তাস্রোতও প্রাকৃত সহজিয়াবাদের সৃষ্টি করে। জিন্দাবেস্ত (Zend-avesta) পুস্তকে যে Zoroastrianism ধর্মের কথা বা লাউজির (Latzes) তাওইজম্ (Taoism) কিম্বা Confucian ধর্মের কথা, তা'তে বহির্জগতের বিচার থেকে নির্বিশেষবাদের উৎপত্তি হয়। সে সকল মানবের চিন্তাস্রোত হ'তে উদ্ভুত মনোধর্ম মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উপাস্যতত্ত্ব-নির্ণয়ে ঐরূপ কোন মনোধর্মের আশ্রয় করেন নাই। তিনি বলেন, পরতত্ত্ব বস্তু স্বয়ংরূপ হওয়া দরকার। স্বয়ংরূপের রূপ-রূপী, দেহ-দেহী, নাম-নামী, গুণ-গুণী ভেদ নাই। যেখানে রূপের পরিচয় হ'তে রূপীর পরিচয় লাভ

করা যায় বা রূপ-রূপীকে যে জায়গায় স্বতন্ত্র করা যায়, সেরূপ ধরণের কথা স্বয়ংরূপের কথায় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, জীব যদি অনাবৃত কেবল জ্ঞান ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সংবাদ রাখেন, তবে নশ্বর আবৃত বিচারে প্রমত্ত হ'তে পারেন না।

ব্যক্তিগত পরমেশ্বরত্ব স্বয়ংরূপের বিচার না হ'লে সম্প্রকাশিত হ'বে না। এখানে শক্তি-দ্বারা শক্তিমানের পরিচয় হ'চ্ছে, রূপের দ্বারা রূপীর বিচার হচ্ছে না। অখিল কল্যাণগুণের দ্বারা গুণীর বিচার হ'চ্ছে না, তা' তদেকাত্মবিচারের বিলাস মাত্র।

Phenomena (পরিদৃশ্যমান্ প্রপঞ্চ) দর্শন ক'রে তা'র থেকে যেরূপ 'ভাব' গ্রহণ করছি, তা' পরিবর্তনশীল। কিন্তু স্বয়ংরূপ—অবিকৃত মূল আকর বস্তু। স্বয়ংরূপ হ'তেই যাবতীয় রূপ; অক্ষজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিদৃষ্ট রূপ বা কাল্পনিক রূপের কথা নহে। যাঁ'রা স্বয়ংরূপের বিচারটা জানেন না, তাঁ'রা ন্যূনাধিক প্রাকৃত-সহজিয়া। তাঁ'রা বহির্জগতের চিন্তা-স্রোতকে অধোক্ষজ ভগবানে আরোপ করেন।

পুরুষোত্তম বস্তু স্বয়ংরূপ না হ'লে নানা মতবাদ আস্‌বে। পুরুষোত্তম বস্তু যদি স্বয়ংরূপ না হন তা' হ'লে Henotheism, Kathenotheism, Apotheism, Pantheism প্রভৃতি বাদ এসে উপস্থিত হ'বে। স্বয়ংরূপ-দর্শনকারী যে আমি বা আমার অপরিণামী চিত্তবৃত্তি সুষ্ঠুভাবে আপেক্ষিক ধর্ম্মে আচ্ছন্ন থাক্‌বে যতদিন, ততদিন তদেকাত্ম প্রকাশবিশেষের আলোচনা কর্‌তে গিয়ে অনেক প্রকার অবিবেচনার কথা আলোচনা হ'বে।

রাম, নৃসিংহাদি অবতারের আলোচনায় স্বয়ংরূপের বা দেববাদিগণের বিচার-স্রোতে স্বয়ংরূপের কোন আলোচনা নাই, সেখানে রূপের দ্বারা রূপীর পরিচয় হ'চ্ছে; গুণের দ্বারা গুণীর পরিচয় হ'চ্ছে, শক্তির দ্বারা শক্তিমানের পরিচয় হ'চ্ছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু একমাত্র পুরুষোত্তমবাদের বিচার ব'লেছেন। লক্ষ্ম্যধীন নারায়ণ নহেন, নারায়ণের অধীন লক্ষ্মী, রুক্মিণ্যাদির অধীন কৃষ্ণ নহেন, কিন্তু কৃষ্ণের অধীন রুক্মিণ্যাদি মহিষীবৃন্দ, যেখানে বার্ষভানবীর অধীন কৃষ্ণ, সেখানে স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংরূপাতে কোন ভেদ নাই। সেখানে যে স্বয়ংরূপ দর্শন, তা'তে স্বয়ংরূপা বার্ষভানবী কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন সেবা করেন না। পাঁচ প্রকার রস পূর্ণভাবে তাঁ'র পদাশ্রিত। তাঁ'র অনুগতা ললিতা-বিশাখাদি সেবার এক একটী অংশমাত্র গ্রহণ ক'রে সেবা ক'র্‌ছেন। স্বয়ংরূপাই একমাত্র সর্বতোভাবে তাঁ'র সকল ব্যূহের দ্বারা স্বয়ংরূপের সম্পূর্ণ ও সমগ্র সেবা করেন।

চেতন উন্মেষিত হ'লে আমাদের নিত্য-স্বরূপের প্রাকট্য বিষয়ে যে মলিনতা এসে উপস্থিত হয়েছে, সেই মলিনতা তিরোহিত হয়। এই মলিনতানিবৃত্তিকেই অনর্থ-নিবৃত্তি বলে। সেবাসাম্মুখ্য-ধর্ম্মে আমাদের নিত্যস্বরূপ প্রাকট্যে অর্থাৎ অনর্থ-নিবৃত্তিতে আমাদের স্থায়িভাবের উদয় হয়। স্থায়িভাবের সহিত চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর মিলনে রসোৎপত্তি; সুতরাং স্থায়িভাবই রসের মূল। আলম্বন ও উদ্দীপন রসের হেতু, স্থায়িভাবের পরিপাকে প্রেমোদয়,

কিন্তু এই প্রেমটী কদর্থীকৃত হ'লে প্রপঞ্চে তা'র ভূমিকা স্থাপিত হয়। মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায় স্বয়ংরূপ-তত্ত্বকে বিকৃতভাবে গ্রহণ কর্‌তে যত্ন ক'রেছেন। সাধারণ দার্শনিক সম্প্রদায় cognition, volition এবং emotion এর বিচারে কলুষিত হন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তা' বারণ ক'রেছেন। তিনি বলেন—

নিসর্গপিচ্ছিল-স্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ।।

হৃদয়ের কপটতা যে আর্দ্রতা দেখায়, সেরূপ কপটতা বারণ কর্‌বার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত এই শ্লোকের অবতারণা ক'রেছেন,—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।।

ভাবভক্তি-পর্য্যায়ে স্থায়িভাবে-রতি; তা'র সহিত সামগ্রী-সম্মেলনে রসের উৎপত্তি। কিন্তু সামগ্রী-সম্মেলনে যদি আবার ইট, পাটকেলজাতীয় বহির্জগতের চিন্তাস্রোত এসে উপস্থিত হয়, তবে আলম্বন বিষয় ও আশ্রয়ের অনুভূতিতে ব্যাঘাত হ'বে—আমরা নামাপরাধী হ'য়ে যা'ব। তখন দু'শ পাঁচ'শ লম্ফ-ঝম্ফ, কিম্বা চোখ দিয়ে দু'মণ, দশমণ জল বের ক'রলেও আসল জিনিষ পাওয়া যাবে না—কেবল কপটতা হ'য়ে যাবে। উহা মধুপূর্ণ স্বচ্ছ কাচভাণ্ডের বাইরে ব'সে মক্ষিকার 'মধুর নাগাল পেয়েছি' কল্পনার ন্যায় কল্পনামাত্র হ'যে যাবে। দারুক শ্রীকৃষ্ণকে পাখা কর্‌ছিলেন, এমন সময় প্রেমানন্দে তাঁ'র হাত থেকে পাখা পড়ে গেল। কিন্তু নিত্য-জাতপ্রেম দারুক সেই নিজের প্রেমানন্দটাকে বড় মনে কর্‌লেন না। সেরূপ প্রেমানন্দজনিত দেহের জড়তাকে সেবার বিঘ্নকর জেনে ধিক্কার কর্‌লেন। সম্ভোগবাদীর নিজের প্রেমটা নিয়েই বড় কাজ! কিন্তু নিষ্কপট সেবকের ভগবানের বাতাস নিয়েই কাজ। কৃষ্ণ-সেবা করাতে বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দ এসে উপস্থিত হ'য়েছে, সেই সুখ-স্বচ্ছন্দই বাধার কার্য্য কর্‌ছে। সেরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দে প্রমত্ত হ'য়ে যাওয়াই প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ। যাঁ'রা হরিসেবা কর্‌তে গিয়ে নিজের সুখস্বচ্ছন্দকেই বা নিজের আনন্দলাভকেই 'শান্তি' মনে করে, তা'রা ভগবানের সেবক নহে, আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকামী মাত্র, সেখানে প্রেমের কোন কথা নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম এজন্য 'এঁচড়ে পাকা' হ'তে দেন না।

'অনর্থ' কা'কে বলে,তা' না জান্‌লে রসিকতার অভিনয়—কপটতা-মাত্র। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে যে রসভ্রান্তি হয়, 'তা'তে প্রাকৃত-সহজিয়াগণ লুব্ধ হ'লেও তা কৃষ্ণপ্রেম নহে। সেখানে বিষয়ানন্দে আশ্রয়ানন্দের আদর্শ নাই।

স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংরূপের বিচিত্র বিলাসের আধার—বার্ষভানবী। তাঁদের ভূমিকা—বৃন্দাবন। সেই বৃন্দাবনে, জ্ঞানের অপ্রাকৃতত্ব চেতন বৃত্তিতে উদয়, না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের জড়ের জ্ঞান প্রবল।

"অন্যের হৃদয় মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।।"

(৩)

শ্রীজয়দেব-সরস্বতী গৌরাবির্ভাবের আগমনী এরূপভাবে গান করিয়াছেন,—

"মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ-কেলয়ঃ।।"

"হে রাধে, নভোমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, বনভূমিও তমালতরু-নিকরে কৃষ্ণবর্ণ, নিশাভাগে শ্রীকৃষ্ণ ভীরু, একাকী গমনে সমর্থ হইবে না; সুতরাং তুমি শ্রীকৃষ্ণকে নিজ সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে যাও!—নন্দের এইরূপ আদেশে বৃষভানুনন্দিনী হরির সহিত মিলিত হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী কুঞ্জতরুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই রাধামাধবমিলিতযুগলের যমুনাকূলে বিরলকেলি জয়যুক্ত হউন।"

পূজারী গোস্বামী উক্ত শ্লোকের যে টীকা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা সকল কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মহানুভব বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে শ্রীজয়দেব সরস্বতী এই গৌরচন্দ্রিকা যে-ভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীধাম মায়াপুরের মহাযোগ-পীঠের এক প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধামাধব ও স্বতন্ত্র রূপে রাধামাধবমিলিততনু গৌরশশধরের প্রকট লক্ষিত হয়। পারমার্থিক আকাশ নানা মতবাদরূপ নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, বৃন্দা-বিপিনের তরুনিকরের মাধুর্য্যময়ী সুষমা নানাপ্রকার আবরণে লোকলোচনে অন্ধকারময় প্রতিভাত হইয়াছে, দ্বাপরের নিশাভাগে অর্থাৎ দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া "মামেকং শরণং ব্রজ", "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" প্রভৃতি যে সকল সাক্ষাদ্‌বাণী নিজোদ্দেশে বলিয়াছিলেন, নাস্তিকতার নিশাও নেশা প্রবল হইলে জীবকুল স্বরাট্ পুরুষোত্তমের সেই সকল বাণীকে আসুরবুদ্ধিতে দম্ভময়ী বিচার করিয়া মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছে; সুতরাং এ সময় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে গমন করিলে কেহ তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে না। লোকলোচনে শ্রীকৃষ্ণের এই ভীরুতার প্রতীতিকে প্রশমিত করিবার জন্য বৃষভানুনন্দিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলিত হইয়া আবির্ভাব আবশ্যক। সুতরাং 'গৃহং প্রাপয়' অর্থাৎ 'গৌরগৃহং মহাযোগপীঠং প্রাপয়', গৌরগৃহ মহাযোগপীঠে রাধামাধবমিলিততনু হইয়া গমন কর—নন্দগৃহ বা পুরন্দর জগন্নাথমিশ্রগৃহ যোগপীঠে গমন কর।

নন্দের অপর একনাম---বসুদেব। যদিও আমরা চতুর্থ স্কন্ধে 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্' শ্লোকে খানিকটা ঐশ্বর্য্যমার্গের বিচার দেখিতে পাই, তথাপি বিশুদ্ধসত্ত্বেই বাসুদেবের আবির্ভাব। রাধামাধবমিলিততনুর আবির্ভাবের অধিবাসোৎসব সঙ্কীর্ত্তনমুখে সাধিত হউক, অন্য সমস্ত চিন্তাস্রোতঃ সঙ্কীর্ত্তনাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া যাউক, কৃষ্ণকামাগ্নি, কৃষ্ণধামাগ্নিতে বিশ্বের নিখিল চেতন ইন্ধন হউক। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন আবির্ভূত হওয়ায় শ্রীযমুনার সহিত অভিন্নতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন যে গঙ্গাদেবী, তৎকূলে রাধামাধবমিলিত-যুগলের রহঃকেলি যে সঙ্কীর্ত্তনরাস, তাহা জয়যুক্ত হউক।

শ্রীকৃষ্ণ---পরতত্ত্ববস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন---'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ-বিলাস-বিগ্রহসকল, চতুর্ব্ব্যূহ, ত্রিবিধ পুরুষাবতার, নৈমিত্তিক অবতারাবলী, কেহ বা কৃষ্ণের 'অংশ', কেহ বা 'কলা'। শ্রীকৃষ্ণকে যদি কেহ আংশিকভাবে ধারণা করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ধারণা হইবে না। অপ্রাকৃত জগতে যাবতীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলা সেই কৃষ্ণ-বস্তুরই। তাঁহারই বিকৃত প্রতিফলন আমরা এই জড়জগতে দেখিতে পাই। আমরা অঘাসুর-বকাসুরাদির বধের সময় শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্য-লীলা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না; কিন্তু অভিন্ন-নন্দনন্দন গৌরসুন্দরের লীলায় তাঁহার মহাবদান্য-লীলা বুঝিতে পারি। আমাদের ন্যায় পতিত পাষণ্ডী অক্ষজজ্ঞান-প্রতারিত ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত তিনি কৃপা-পূর্ব্বক চরম-মঙ্গল প্রদান করিবার জন্য উদ্যত,---একটু-আধটু মঙ্গল নয়, সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে প্রদান করিতে তিনি সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব। তিনি আমাদিগকে যে মহা-দান করিতে উদ্যত, তাহার ফলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু আমাদের হস্তামলক (করতলগত আমলকীবৎ) রূপে আমাদের সেব্য হইয়া আমাদের নিকট সর্ব্বদা সমুপস্থিত থাকিতে পারেন। সেই মহা-বদান্য শ্রীচৈতন্যের অমন্দোদয়া দয়া কেবলমাত্র অবিদ্যা-প্রতীতি বা বাহ্যজগতের চিন্তা-স্রোত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নহে। পরমাত্মার সহিত যোগ হইতে, ব্রহ্মের-সহিত একীভূত হওয়ারূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে, নির্ব্বিলাস ও খণ্ড পরমাত্মানুশীলন হইতে যিনি জীবকে পরিত্রাণ ও রক্ষা করিতে পারেন, শ্রীচৈতন্যদেব সেইরূপ মহাবদান্য জীবের প্রতি তাঁহার যে মহানুগ্রহ, তাহার তুলনা হয় না।

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় মূঢ়জীবের প্রতি পরম-করুণা-পরবশ হইয়া---আমরা যে ভাষায় তাঁহার কথা বুঝিতে পারিব, এইরূপ ভাষায় আমাদের নিকট শ্রীহরির কীর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বাবস্থায় সেবকগণের প্রকার-ভেদ অর্থাৎ মানুষ, দেবতা, পশু, বৃক্ষ,লতা-প্রভৃতি সচেতন পদার্থ ও জগতের অচেতন পদার্থসমূহ কতরকমে কৃষ্ণের সেবা করিতে সমর্থ,যে যেরূপভাবে যে-স্থানে অবস্থিত---যাহার আত্মবৃত্তি যেরূপভাবে উন্মেষিত হইয়াছে, তাহা লইয়াই সে সেই একমাত্র সেব্য-বস্তুর যেভাবে যে-প্রকারে কৃষ্ণের সেবা করিতে পারে, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর জগতে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রস্তরাদি সকলেই তাঁহার অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

ভক্তগণের হৃদয়ে তিনি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-অবতারে যে-সকল ভাব উদয় করাইয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাদৃশ দান করিয়া এই যুগে ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু তিনি এই যুগে এক 'অনর্পিতচর' বস্তু দান করিয়াছেন; তাহাই—'স্বভক্তি-শ্রী'। 'স্ব' শব্দের দ্বারা 'আত্মাকে' বুঝায়; সেই আত্ম-প্রতীতিগত সেবার শোভা তিনি দান করিয়াছেন। তিনি পঞ্চরসাশ্রিত শুদ্ধ আত্মার সেবার প্রকার ভেদ জানাইয়াছেন। আমাদের ন্যায় মরু-তপ্তহৃদয়ে—আমাদের ন্যায় গুণজাত অবস্থায় পতিত কাঙ্গাল জীবগণকে সুদুষ্প্রাপ্য 'অনর্পিতচরী' স্বীয় উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী স্বভক্তি-শোভা প্রদান করিবার জন্য—জগতের সকল জীবকে বিতরণ করিবার জন্য তিনি জগতে আসিয়াছিলেন। আবার তিনি একটী সামান্য পরিমিত সম্পত্তি-বিশিষ্ট পুরুষও নহেন,—তিনি একটি সামান্য-জগতের সৃষ্টিকর্তা-মাত্রও নহেন! দাতা স্বয়ং হরি! মানুষ মনে করেন,—এই ব্যক্ত জগৎ যাঁহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তিনিই মূলবস্তু কিন্তু সকল-কারণের কারণ, সকল মূলের মূল—স্বয়ং ভগবানই এই অপূর্ব্ব দানের দাতা। তাঁহাতেই সকল শোভা ও সৌন্দর্য্য অবস্থিত।

জগতের লোকসকল আনন্দ দ্বারা আকৃষ্ট; কেহই নিরানন্দ চা'ন না। আনন্দ আবার বস্তুর নামে, রূপে, গুণে ও ক্রিয়ায় অবস্থিত। কিন্তু এই জগতে নাম, রূপ গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহা চিরকালস্থায়ি নহে; তাহাতে হেয়তা, অবরতা, পরিচ্ছিন্নতা ও পরিমেয়তা প্রভৃতি ধর্ম বর্ত্তমান। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের বিকৃত প্রতিফলনসমূহ এই জগতে নশ্বররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐসকল ব্যাপার কালের মধ্যে আসে, আবার কালের মধ্যে চলিয়া যায়। এই জগতের নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া নশ্বর বলিয়া—জগতের সৌন্দর্য্য অসৌন্দর্য্যের দ্বারা আবৃত হয় বলিয়া—বুদ্ধিমান্ পুরুষ পার্থিব নাম-রূপ-গুণাদিতে, পার্থিব ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতিতে আবদ্ধ হন না। ইহ জগতের আনন্দস্রোত শুকাইয়া যায়; কেননা, উহা সীমা-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা গৃহীত হয়। তাহার যতটুকু প্রাপ্য, জীব এইস্থানে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রার্থনা করে; ফলে, তাহার যোগ্য প্রাপ্যটিও হারাইয়া ফেলে।

যে মূলবস্তু হইতে জগতের বহুমাননীয় ষড়ৈশ্বর্য্য আসিয়াছে, তিনিই শ্রীভগবান্ হরি। যাঁহার অসংখ্য অনুগত অর্থাৎ বশ্য বা ঈশিতব্য সম্প্রদায় রহিয়াছে, তিনিই 'ঈশ্বর' বস্তু। আমরা ইহজগতে যে-সকল বস্তু বলিয়া উপভোগ্য বোধ করিতেছি, সেইসকল বস্তু তাহাদের নিত্যস্বরূপে অবস্থান করিয়া যাঁহাকে নিরন্তর সেবা করিবার জন্য সমুদ্‌গ্রীব, তিনিই শ্রীভগবান্। যাঁহার আংশিক প্রকাশ—জৈব-জ্ঞানের উপভোগ্য 'ব্রহ্ম'-নামে অভিহিত, সেই ব্রহ্ম—পরাৎপর মূল-পুরুষ শ্রীভগবানের দ্যুতিমালায় প্রকাশিত। এই পরতত্ত্বই সাক্ষাদ্‌ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব।

আমরা কাল্পনিক শ্রীগৌরহরির কথা বলিতেছি না; ব্রহ্মজ্ঞগণ পূর্ণব্রহ্ম হরির যে অসম্যক্ স্ফূর্তি, যোগিগণ যে আংশিকবৈভব বা ব্যাপক ভূমার কথা বলিয়াছেন, আমরা সেই বস্তুর কথাও বলিতেছি না; যাঁহারা উজ্জ্বলরসের বিরসাবস্থাবিশেষে—জড়জগতের প্রাকৃত রসে বিরাগবিশিষ্ট, সেইরূপ ব্যক্তিগণের জ্ঞানগম্য অসম্যক্ খণ্ডপ্রতীতির কথাও বলিতেছি না; 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ একটি অপেক্ষাকৃত 'ক্ষুদ্র অনুভূতি বা ইহজগতের খাওয়া-দাওয়া-থাকা, চতুর্দশভুবনের কথা বা উন্নত সপ্ত-ব্যাহৃতির কথায় আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট না হউক; কিন্তু যাঁহার আংশিক বিকৃত প্রতিফলিত রস আমরা ইহজগতের স্ত্রী-পুরুষে, পিতা-পুত্রে, বন্ধুতে-বন্ধুতে, প্রভু-ভৃত্যে বা নিরপেক্ষাবস্থায় লক্ষ্য করি, সেই বিকৃতরসগুলি যাঁহাদের নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাঁহাদের উপাস্য-বস্তুর কথাও আমরা বলিতেছি না। এই অতন্নিরসনরূপ কার্য্যটিতে তাঁহাদের সহিত আমাদের বাহিরের দিকে কিঞ্চিৎ মিল দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে এমন একটি রসের কথা বলিয়াছেন,—যিনি কেবলমাত্র রস-রাহিত্যরূপে বর্ণিত হন না, পরন্তু যাঁহার একটা নিত্য পরম-চমৎকারিতা-যুক্ত নিত্যপরিপূর্ণরসময় বাস্তব-স্বরূপ আছে,—যে জিনিষটি পরিপূর্ণরসময়, যাঁহার পূর্ণপ্রাকট্য আছে, শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রূপগোস্বামি প্রভুকে সেই বাস্তব-সত্য নিত্যচিন্ময়রসের কথা বলিয়াছিলেন (ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫ম লঃ)—

"ব্যতীত্য ভাবনা-বর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।"

ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া চমৎকারভাবের ভূমিকায় সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে 'রস' উপলব্ধ হয়। জাগতিক গৌণী বিচিত্রতার মধ্যে অসম্পূর্ণ রস লক্ষিত হয়। যখন হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব-দ্বারা অতিশয় পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ যখন আত্মধর্মে অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত যে বস্তু আস্বাদিত হয়, তখন তাহাকে 'রস' বলে। উহা নল-দয়মন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা বা পশু-পক্ষীর পরস্পর হেয় কাম-রস নহে। আত্মা যখন নিজস্বভাব প্রাপ্ত হন, তখনই আত্মবৃত্তি দ্বারা ঐ রস আস্বাদিত হইতে থাকে। 'আমিত্বে'র অনুভূতিতে যখন 'ইট-পাট্‌কেল' বা কোন গুণজাত বস্তু 'ধাক্কা' দেয় না, তখনই ঐ রস আস্বাদিত হয়।

এই জড় প্রপঞ্চে পঞ্চবিধ বিকৃত-রস বর্তমান; আমরা এই বিকৃত প্রতিফলন দেখিয়া মনে করি,—এই অনুভূতিটি থামিয়া গেলেই বুঝি বাঁচিয়া যাওয়া! কিন্তু জগতে এই রস কোথা হইতে আসিল? শ্রুতি (তৈঃ পঃ ১ অনু) বলেন,—

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদেব ব্রহ্ম।'

ব্রহ্মবস্তু অর্থাৎ বৃহদ্বস্তু—পূর্ণবস্তু হইতেই এই আংশিক বিচিত্রতা এই খণ্ড-জগতে

বিকৃতরূপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মবস্তু—নিত্য নব-নব-ভাবে রস-বিলাসময়। আমি যদি ' ঘোড়দৌড়' দেখিতে গিয়া একটি গৃহের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হই এবং একটি জানালা দিয়া ঘোড়সোয়ারকে আমার সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া মনে করি যে, ঐ অশ্ব পূর্বে দৌড়াইতে ছিল না, পরেও দৌড়াইবে না এবং ঐ ধাবমান অশ্বের পৃষ্ঠোপরি উপবিষ্ট অশ্বারোহীও আমার দর্শনের পূর্ব্বে বা পরে আর থাকিবে না, তাহা হইলে আমার বিচারে যেমন ভুল হয়; —কেন না, আমার ক্ষুদ্র জানালা দিয়া দেখিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই অশ্বারোহী দৌড়াইতেছে এবং পরেও সে দৌড়াইতে থাকিবে,—কেবল আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দোষ নিবন্ধন অর্থাৎ প্রতিঘাতযোগ্যতা থাকায় বা অসম্পূর্ণ যন্ত্র-সাহায্যে দর্শন করিতে যাওয়ায় উহা যথার্থভাবে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না, সুতরাং এই ভ্রান্ত ধারণা বা বিচার যেমন আমর ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ের অপটুতা ও সম্যক্‌দর্শনের অভাবদ্যোতক;—তদ্রূপ, যাঁহারা তাঁহাদের ক্ষুদ্রজৈবজ্ঞান-দ্বারা বিচার করেন যে, চিদ্বস্তুর বিচিত্রতা থামিয়া যায়, তাঁহারাও ভ্রান্ত তর্কহতধী ও অসম্যগ্‌দর্শী। আমি যদি মনে করি যে, আমার পূর্ব্বে কোন মানুষ ছিল না বা আমি মরিয়া গেলেও কোন মানুষ থাকিবে না, তাহা হইলে আমার বিচার—যেমন মূর্খতামাত্র, কেন না, আমি মরিয়া গেলেও মানুষের কর্ত্তৃসত্তা থাকিবে, তদ্রূপ চিদ্ধামে চিদ্‌রসময়-ব্রহ্মের বিলাস বা বিচিত্রতা নাই, —এরূপ বলাও দুর্ব্বিচার বা বিচারাভাব মাত্র। উহা—অজ্ঞেয়তা-বাদিগণের (Agnostic-দের) ক্ষুদ্র ধারণা। নিত্যপূর্ণরসের রসিকগণ এরূপ ক্ষুদ্র বিচারে আবদ্ধ নহেন।

মধুর-রস চিদ্ধামে—পরাকাশে অতীব উপাদেয়ভাবে পঞ্চরসের পরমচমৎকারিতা বর্ত্তমান। তথায় একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণই 'বিষয়', আর সমস্তই তাঁহার 'আশ্রয়' বা সেবোপকরণ। এই পঞ্চপ্রকার রসের মধ্যে মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সকল রসই মধুর-রসের অন্তর্গত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর রসের মধ্যে 'স্বক' ও 'পরক'-বিচার শ্রীগৌরসুন্দর ছাড়া আর কেহ এত সুন্দরভাবে দেখান নাই। নিয়মানন্দ—কাহারও মতে যিনি—দ্বিতীয়শতাব্দীর, কাহারও মতে বা দশম-শতাব্দীর আচার্য, এবং বিশেষজ্ঞের মতে যাঁহার আবির্ভাবের পরিচয়—মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর প্রচারিত, তিনিও উজ্জ্বলরসের আংশিক চিত্রমাত্র প্রদান করিয়াছেন। একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরপ্রদত্ত কৃপার মধ্যে সেই রসের প্রচুর ঔজ্জ্বল্য নিহিত রহিয়াছে। যাহা—জীবাত্মার সহজপ্রাপ্য, যাহা—জীবাত্মার সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশিত হয়, যাহা—কৃত্রিম সাধনপ্রণালী দ্বারা লভ্য বা সাধ্য নয়, যাহাতে—সকলের উপযোগিতা আছে, এইরূপ অসমোর্দ্ধ বস্তুই তিনি জগতে প্রচার ও প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনই মানবজাতির একমাত্র পরমকৃত্য;—এইটিই তাঁহার মহা-বদান্যতা। দেবশ্রেষ্ঠগণের, নারদাদি মুনিবরগণের, এমন কি,

ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবাদিরও দুষ্প্রাপ্য দুর্গম ব্যাপার ব্রজের প্রেমধন পর্যন্ত এই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইতেই জীব প্রাপ্ত হইতে পারেন।

জগতের যত বড় সম্প্রদায় এবং যত বড় শ্রেষ্ঠ সাধন উৎপন্ন হইয়াছে বা হইবে, তৎসমুদয় যে অত্যন্ত দুর্বল ও কৈতবময়, তাহা গৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং আরও দেখাইয়াছেন যে, কৃষ্ণসঙ্কীর্তনই সমগ্র-জগতের একমাত্র মঙ্গলের উপায় কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্কীর্তন হওয়া চাই। যাহা কিছু ভোগ-বাঞ্ছা-মূলক ধারণা, তাহা 'কৃষ্ণ' নহে—বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা 'কৃষ্ণের কীর্তন' নহে। মায়ার কীর্তনকে যদি আমরা 'কৃষ্ণকীর্তন' বলিয়া ভ্রম করি, শুক্তিতে যদি আমাদের রজত-ভ্রম হয়, আভিধানিক শব্দ বা অক্ষরকে যদি আমরা 'নাম' বলিয়া ভুল কল্পনা করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব।

শ্রীকৃষ্ণ-শব্দ, শ্রীকৃষ্ণনাম বা শ্রীকৃষ্ণাক্ষর—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। "বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্তনং তদেব সঙ্কীর্তনম্" অর্থাৎ বহুলোকে একত্র মিলিয়া যে কীর্তন, তাহারই নাম—'সঙ্কীর্তন'। কিন্তু ইহা-দ্বারা কেহ যেন 'ছুঁচোর কীর্তন'কে 'কৃষ্ণকীর্তন' বলিয়া মনে না করেন। কৃষ্ণসঙ্কীর্তন ঐরূপ বা ঐজাতীয় কীর্তন নহে,—কেবলমাত্র পিত্ত বৃদ্ধি করিবার কীর্তন নহে,—মানুষের কল্পিত কীর্তন নহে—জড়-ভোগময় ইন্দ্রিয়-তর্পণ নহে,—ওলাউঠা ভাল করিবার কীর্তন নহে,—সামান্য জড়-মুক্তির প্রার্থনা লইয়া কীর্তন নহে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইলে নির্বিশেষবাদিগণের দুবুর্দ্ধি বিদূরিত হইয়া, সায়নমাধবের, সদানন্দের তথা অপ্যয়দীক্ষিতের নাস্তিকতা দূরীভূত হইয়া তাঁহাদের যথার্থ মুক্তিলাভ হইতে পারে,—কাশীর মায়াবাদি-প্রকাশানন্দ তাহার সাক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইলে বিষয়ে আচ্ছন্ন ও অতি-অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রকৃত সিদ্ধিলাভ হইতে পারে,—রাজা প্রতাপরুদ্রাদি তাহার প্রমাণ। কৃষ্ণ-কীর্তনের দ্বারা গাছের মুক্তি, পাথরের মুক্তি, পশু, পক্ষী, স্ত্রী-পুরুষাদি সর্বজীবের প্রকৃত মুক্তিলাভ হইতে পারে,—মহাপ্রভুর ঝারিখণ্ডের বনপথে যাইবার কালে বৃক্ষ, লতা পশু-পক্ষীই তাহার উদাহরণ। কেবল কৃষ্ণ-কীর্তন হইতেছে না বলিয়া জীবের প্রকৃত মুক্তি হইতেছে না। গৌরসুন্দর সকলের মঙ্গলের জন্য—উদ্ভিদ, পশু, পক্ষী, মানব,—প্রত্যেক জাতির মঙ্গলের জন্য জগতে আসিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা নির্মৎসর সাধুগণের সতত-সেবা পরম-বাস্তব প্রোজ্ঝিত-কৈতব সত্যবস্তুর কথা আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'হাবিজাবির মধ্যে যাওয়ার কিছুমাত্র দরকার নাই, হাজার-হাজার দোকানদার তাঁহাদের নিজ-নিজ-দোকানের মন-গড়া জিনিষসমূহের প্রচার প্রচলনের জন্য বিজ্ঞাপন-বিস্তার ও ক্রেতা সংগ্রহ (advertise ও canvass) করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হইতেছেন

ও হইবেন। যদি তাঁহাদের ঐসকল মনোহারিণী কথায় ভুলিয়া ঐসকল দোকানদারগণের দোকানে আমরা যাই, তবে আমরা নিত্যসত্যবাস্তব-বস্তু-লাভে বঞ্চিত হইব। কিন্তু আমাদের অচেতন-হৃদয়ে যদি চৈতন্যদেব উদিত হন—যদি চৈতন্য-হরি আমাদের হৃদয়কন্দরে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন—যদি স্বয়ংপ্রকাশবস্তু নিজকে নিজে কৃপা-পূর্বক প্রকাশ করেন, তবেই আমরা ঐসকল দোকানদারদিগকে অনায়াসে একেবারেই বাদ দিয়া (summarily reject করিয়া) দিতে পারিব। সেই চেতনময় বস্তু স্ফটিকস্তম্ভ হইতে বহির্গত হইয়া হিরণ্যকশিপুর নির্বিশেষবাদ বিনাশ এবং বলির সর্বস্ব গ্রহণ ও শুক্রাচার্যের কর্মকাণ্ড-ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি আত্মার ধর্মই জানাইয়া দিয়াছেন।

বাস্তব সত্যবস্তু যখন কৃপা করিয়া নিজে প্রকাশিত হন, তখনই আমরা তাঁহারই কৃপালোকে তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারি। নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহার দুর্বুদ্ধি বিনাশ করিয়া তাঁহার স্বরূপ জানাইয়া দিয়াছিলেন। প্রহ্লাদের নিকট নৃসিংহদেব নিত্যকাল প্রকাশমান। শ্রীচৈতন্যদেব যখন আমাদের হৃদয়কন্দরে প্রকাশিত হন, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, জগতের লোকসমূহ—ভূতপূজক, পুতুল-পূজক, কাল্পনিক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের সেবক।

"চেতো-দর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যা-বধূ জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্।।"

একমাত্র কৃষ্ণসংকীর্তনেই আমাদের সমস্ত সুবিধা হইবে। আমাদের চিত্তদর্পণে অনেক বাহ্যবিষয়রূপ ধূলি আসিয়া পড়িয়াছে, সেই ভোগোন্মুখ চিত্তে বাস্তব-সত্যবস্তু কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হইতে পারিতেছেন না। যেকাল-পর্য্যন্ত জগতের লোকের প্রতি আমাদের 'ছোট' বলিয়া জ্ঞান থাকিবে, যে কাল-পর্য্যন্ত জগতের সকল লোকেরাই স্বরূপতঃ হরিভজন করিতেছেন—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩ শ পঃ)—"সবে কৃষ্ণ ভজন করে, এইমাত্র জানে"—এই আত্মস্বরূপ-প্রতীতিটী উদিত না হইবে, সেকাল-পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তদর্পণ মার্জিত হইবে না।

একমাত্র কৃষ্ণসংকীর্তনই—ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণকারী; শ্রেয়ঃ-কুমুদবিকাশিনী পরমস্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নার বিস্তারকারী অর্থাৎ কৃষ্ণসংকীর্তনেই চরমশ্রেয়ো লাভ হয়।

কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—বিদ্যা-বধূজীবন-স্বরূপ। লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষ কথা—"শ্রীহরিনাম-কীর্তন"। পরবিদ্যাশ্রিত পণ্ডিত না হইলে হরিনাম-কীর্তন হয় না। যাঁহারা জড়-জগতে 'বড়' হইতে অভিলাষী, স্বর্গ-সুখ লাভ করিবার প্রয়াসী, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা 'পণ্ডিত' নহেন। আমাদের দুর্ভাগা দেশের এখন ধারণা যে, যাঁহারা লেখাপড়া জানে না, যাঁহারা—স্ত্রীলোক, ছোট-জাতি, অতি-সহজেই

চোখে জল-বাহিরকারী প্রাকৃতসহজিয়া, অলস লোক, অবসরপ্রাপ্ত লোক (retired men), তাঁহাদের জন্যই হরি-কীর্তন (?)! অথবা, যাঁহারা ব্যবসায় করিবার জন্য, উদরভরণের জন্য, সুর-তাল-মান লয় দেখাইয়া প্রতিষ্ঠালাভের জন্য 'দশা'য় পড়ে, ভাবপ্রবণতা (emotion) দেখায়, তাঁহারাই 'কীর্তনীয়া' এবং তাঁহাদের কীর্তিত ব্যাপারই—'কীর্তন'! কিন্তু ঐগুলি কখনও 'হরিকীর্তন' নহে; ঐগুলি ব্যবসায়—মায়ার কীর্তন। যাহারা জহরৎ চিনে না, তাহাদিগকে যেমন প্রতারক ব্যবসায়ী কাচ দিয়া ঠকাইয়া থাকেন, তদ্রূপ সাধারণ অজ্ঞ মূর্খ লোকগণকেও ব্যবসায়িগণ সুর, মান, লয়, তাল দেখাইয়া কৃষ্ণেতর গীতকে 'হরিনাম' বলিয়া প্রতারণা করে।

কৃষ্ণসংকীর্তনফলে কৃষ্ণসেবানন্দ অনুক্ষণ বৃদ্ধি এবং পদে পদে কৃষ্ণপ্রেমামৃতের আস্বাদ-লাভ হইতে থাকে। কৃষ্ণসংকীর্তন-ফলেই সর্বাত্মার স্নান-লাভ হয়। কার্য্যের দ্বারাই যেমন কারণ অবগত হওয়া যায়, তদ্রূপ কেহ হরিনাম গ্রহণ করিতেছেন কিনা, তাহা তাহার ফল দেখিয়াই বুঝা যায়। হরিনাম করিতে করিতে যদি আবার কাহারও সংসারের প্রবৃত্তি বা সংসারবুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহার কীর্তিত বিষয়ও নিশ্চয়ই 'হরিনাম' নহে বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীহরিই একমাত্র সম্যক্‌রূপে নিরন্তর কীর্তনীয়, আর জগতের যত অভিধেয়ের কথা আছে, উহাদের মূল্য—অন্ধ কপর্দ্দক মাত্র। অন্যান্য অভিধেয়ের কথা উপাধিদ্বারা জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব এত সরল ও নিরপেক্ষভাবে এইসকল কথাবলিয়াছেন, কিন্তু তথাপি 'কোন্ কথাটী গ্রহণ করিব'—এইরূপ বিচারে লোক হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে।

শ্রুতি বলেন,—ভগবান্ স্বয়ং পরিপূর্ণ চেতনময় বস্তু। অণুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য হইতে অসংলগ্ন হইয়া যে বিচার করে, তাহা কখনও যথার্থ বিচার হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার একান্ত আশ্রিত প্রণত ভক্তগণের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের নিকটই স্বরূপ প্রকাশ করেন। যে-জীব সেইরূপ চৈতন্যভক্তের নিকট চৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পা'ন, তিনিই নিত্য বাস্তব-সত্যবস্তু গৌর-কৃষ্ণের সন্ধান পাইয়া নিত্যকাল শ্রীচৈতন্যদেব জগতের অচেতন জীবের চৈতন্যবৃত্তি উদ্বোধন করিয়া সেই চৈতন্যবৃত্তির নিকট শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করিয়াছেন (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ)—

'শেষ-লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানাঞা সবে, বিশ্ব কৈলা ধন্য।।"

জগতের দার্শনিকগণ সকলেই নিজ-নিজ মনোহারী দোকানের পণ্যদ্রব্য সমূহের ক্রেতৃ-সংগ্রহকারী (canvasser), কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব সেইরূপ canvasser নহেন; কারণ, বদান্যতা (charity) ও ক্রেতৃসংগ্রহ-চেষ্টা। (canvass) 'এক' কথা নহে। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর—নিরস্তকুহক সত্যের প্রচারক। তিনি বলেন,—বাস্তব-সত্য স্বয়ংই

সুকৃতিমান্ জীবের সেবোন্মুখবৃত্তির নিকট প্রকাশিত হন, সত্য জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা মাপিয়া লইবার বস্তু নহেন। বন্ধমোক্ষবিৎ শ্রৌতপন্থিগণই—মহাজন, আর তর্কপন্থিগণ—মহাজন নহেন। প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায়-সমূহ-পরস্পর মতভেদযুক্ত, এবং বাস্তব-সত্য-বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার করাইতে অসমর্থ বলিয়াই এইরূপ গোলমাল---গণ্ডগোল। কেহ বলিতেছেন,—'সূর্য্য, গণেশ, শক্তি বা নিরীশ্বরতার পূজা করিব।' কেহ বলিতেছেন,—'ভগবান্ নিশ্চয়ই আমার রুচির---আমার খেয়ালের অনুরূপ হইবেন।' কেহ বা বলিতেছেন,—'ভগবানকে আমি এই মন দিয়াই গড়িয়া লইব, আবার এই মনের দ্বারাই আমার মনগড়া মূর্তিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিব।' এইরূপ নানা কুমতবাদ জগতে প্রচলিত আছে।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের এইরূপ কথা নহে। চেতন-বৃত্তিতে মনোধর্ম নাই। শ্রীচৈতন্যদেব শুদ্ধভক্তগণের নিকটই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভক্তের শ্রীচৈতন্য-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। কিন্তু অচেতন জাগতিক লোকদের তদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু কার্য্য আসিয়া পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ জগতের অন্যান্য লোকের ন্যায় কখনও হিংসার কথা বলেন না। জগতের কর্মবীর বা ধর্মবীরগণ তাৎকালিক অভাব-প্রতীকারের চেষ্টা দেখাইয়াছেন বা দেখাইতেছেন মাত্র। অসত্যকে 'সত্য' মনে করিয়া লইয়া যে প্রতারণা হইতেছে, তাহাতে আমাদের প্রকৃত নিত্যমঙ্গল হইতেছে না। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ আমাদের যথার্থ নিত্য-মঙ্গল বিধান করিতে সচেষ্ট।

## গৌরানুগত্যের লক্ষণ

কাহারও কাহারও মতে,—ভগবান্ একজন ইন্দ্রিয়তর্পণযোগ্য যাবতীয় দ্রব্যের সরবরাহকারী (order-supplier); তাই আমরা অনেক-সময় 'ধনং দেহি, জনং দেহি' রব লইয়াই বিভ্রান্ত। ভগবান্ গৌরসুন্দর বলেন,----বণিক্ হইও না। তাঁহার ভক্তগণ—'ফেল কড়ি, মাখ তেল'—এই ন্যায়ের অন্তর্গত বস্তু নহেন। শ্রীচৈতন্যদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা ত্রিদণ্ডিগোস্বামিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে (চৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১১৩)—

"স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্ব্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজ-ক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ।।"

ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করিতে উপস্থিত হইয়া ভগবৎ-সেবকের ভগবৎসেবা ছাড়া আর অন্য কোনরূপ অভিলাষ থাকে না। যাহার যে কিছু বস্তু আছে বলিয়া অভিমান আছে, সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরণে সমর্পণ করিয়া উহা দ্বারা শ্রীচৈতন্যের সেবা করাই প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচতা' ও 'মানদ'-ধর্ম।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ বলেন,---'হে জীব! তুমি স্বরূপতঃ কে, তাহা আগে জান' তাঁহাদের কথা যদি আমাদের 'অপ্রিয়' বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আমারাই বঞ্চিত হইব। স্নেহময়ী মাতা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা পিতা যেরূপ অবাধ্য শিশুর মঙ্গলের জন্য শিশুকে এবং সদ্‌বৈদ্য যেরূপ রোগীর নিরাময়ের জন্য রোগীকে তাহার রুচির প্রতিকুল ব্যবস্থা বলিয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণও তদ্রূপ জগতের কৃষ্ণবহির্মুখ-মানব-জাতির রুচির প্রতিকূল চেতনময় কথা বলিলেও তাহাদের যথার্থ মঙ্গলের জন্যই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। অস্ত্র-চিকিৎসকের হস্তে অস্ত্র দেখিলেই ভীত হইতে হইবে না; তাঁহারা আমাদের বহির্মুখ হৃদয়গ্রন্থিরূপ পচা-ঘা বিস্ফোটকের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া স্বাস্থ্যবিধান বা মঙ্গল-সাধনের জন্যই আসেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১৯ সংখ্যায়----

তাবদ্‌ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিক্তীভবেৎ
তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো কোকবেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানা-বহির্ব্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়নো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ।।

যে-কাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য পাদারবিন্দ-মকরন্দ-ভৃঙ্গ অন্তরঙ্গ-ভক্ত জীবের দর্শনের বিষয় না হন সে-কাল পর্যন্তই নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচার ও ঈশ্বর-সাযুজ্যাদি মুক্তিমার্গকে তিক্ত বলিয়া বোধ হয় না, সে-কাল পর্যন্তই লোকমর্যাদা ও বেদমর্যাদা বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ 'লোকে ও বেদে পরিনিষ্ঠিত-মতি' পরিত্যক্ত হয় না, সেকাল পর্যন্তই বিবিধ বহির্মুখমার্গে বিচরণশীল শাস্ত্রবিৎ অর্থাৎ পণ্ডিন্মন্য ব্যক্তিগণের স্ব-স্ব-মতবাদ লইয়া পরস্পর বাদ-বিসম্বাদ-অবশ্যম্ভাবী।

④

আনন্দলীলাময় বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে।।

কৃষ্ণপ্রেমরস লাভই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। সেই কৃষ্ণপ্রেমরস প্রদানের শক্তি একমাত্র রসিক—শেখরেই প্রতিষ্ঠিত। সেই রসবিগ্রহ আনন্দ-লীলাময় স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সুবর্ণকান্তি গৌরসুন্দর বদ্ধজীবের হৃদয়ের ভোগতিমিরবিনাশ কল্পে কিরণ বিস্তার করিয়াছেন।

স্বয়ংরূপ তদতিরিক্ত রূপের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করেন না। স্বয়ংরূপেই দিব্যরূপের সমগ্রতা ও অবস্থিতি আছে। সেবা-পরায়ণের সেব্যের নয়নমনোভিরাম রূপ-প্রদর্শনকল্পে সেব্যবস্তু আশ্রয়ের রূপ গ্রহণ করিয়া ভোক্তৃভাবের সেবায় ভোগ্যভাব-সৌন্দর্য প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ দয়া-মানবজাতি আর কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই। প্রয়োজন-তত্ত্ববিজ্ঞান যাঁহাকে লীলায় পূর্ণতমভাবে প্রকাশিত হইয়া জীবের চরম কল্যাণ বিধান

করিয়াছে, তাঁহার অনুশীলনে—তাঁহার সেবায় জীবের পূর্ণ চেতনবৃত্তি নিযুক্ত হইলেই গুণজাত ভোক্তৃভাবের অহঙ্কার চিরতরে বিদূরিত হইবে।

যাঁহারা জগতের মোহ-নিদ্রায় অভিভূত, যাঁহারা পূর্ণ চেতনধর্মে অনবস্থিত, তাঁহাদের অস্মিতা জাগ্রত হইয়া দিব্যলোকে বিভাবিত হউক, সর্বোত্তমতার শোভনীয় কান্তির রূপদর্শনে সমৃদ্ধ নিজ সৌন্দর্য লক্ষ্য করিবার যোগ্যতা লাভ করুক। সেই সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যেই চৈতন্যচন্দ্রের আনুগত্য আমাদের জড়াহঙ্কার বিদূরিত করিয়া সেব্যবস্তুর পরিচয় ও সান্নিধ্য—সেবাধিকার প্রদান করুক।

কিন্তু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া ও পরোপকারের বাণী বিচার কর্‌লে জানা যায়, আত্মার উন্মেষণে বাধা দেওয়া সর্বাপেক্ষা পরের অপকার এবং আত্মার উন্মেষণের প্রতিবন্ধকগুলি সরিয়ে দেওয়া সর্বাপেক্ষা পরের উপকার। বহির্জগতে মানবের উপকারের আদর্শ—তাৎকালিক ও অপূর্ণাবস্থার নিদর্শন।

চিন্তাস্রোত প্রকাশ ক'রেছেন, নির্বিশেষবাদী, সন্দেহবাদী, অভিজ্ঞতাবাদী, শূন্যবাদী যে সকল চিন্তাস্রোত বল্‌বার জন্য চেষ্টা করেছেন, চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে আলোচনা করলে উহাদের কোথায় কিরূপ "বুরা" আছে—কোথায় কতটা কৃষ্ণপ্রেমার অভাব ও ব্যাঘাত আছে, তা' দর্পণের মত প্রকাশ করে। শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মই ঐসকল অসম্মতগ্রাহের বিপদ হ'তে উদ্ধার ক'রতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর আবার শ্রীগুরুর পোষাকে ঐসকল কথা ব'লেছেন, তাঁর কথা শুনবার কাণ হ'লেই মঙ্গল।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমভক্তির অসামান্য আলোক যেদিন মানবজাতি দেখিতে পাইবে সেদিন কর্মধারের কর্ম থামিয়া গিয়া অচ্যুতভাব—সহিত-নৈষ্কর্ম্ম্যের উদয় হইবে; জ্ঞানী তাঁহার অজ্ঞানের অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারিয়া পরম মঙ্গলময় বাস্তব-জ্ঞান (সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিজ্ঞান) লাভ করিবেন। গৃহী স্ত্রী-পুত্রাদির প্রাকৃত মঙ্গল কামনায় বিতৃষ্ণ হইয়া সকলেই "হরিভজন করুক" এইপ্রকার মঙ্গালাকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট হইবেন; তপস্বিগণ-তপঃক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া "আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।। অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা তত কিম্।।"—বিচার বিশিষ্ট হইবেন। যোগীন্দ্রগণ বায়ুর নিয়মন জন্য ক্লেশ পরিত্যাগ করিযা ভক্তিযোগ পদবীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইবেন।

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়-কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষ বৈভবতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ।।"

অর্থাৎ যে বিশ্বম্ভর-গৌরসুন্দরের করুণা-কটাক্ষে বৈভবান্বিত ভক্তগণের নিকট

কৈবল্য-পিপাসা নরক যন্ত্রণার সহিত সমভাবে অনুভূত হয়, অনন্তভোগ সুখময় স্বর্গাদি অমর-লোক আকাশকুসুমবৎ প্রতীত হয়, দুর্দ্দমণীয় ইন্দ্রিয়লৌল্যরূপ বিষধর সর্প ভগ্নদন্ত হইয়া ভোগোদ্যমে নিবৃত্ত হয়; ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট বিশ্বে বাস করিয়াও বিশ্ব পূর্ণ সুখাগার সেবাধামরূপে প্রতীত হয় এবং আত্যন্তিক ত্রিতাপ নাশ করিবার চেষ্টায় ঔদাসীন্য উপস্থিত হইয়া সেবা সুখলাভ ঘটে, সর্বলোক পিতামহ জগৎস্রষ্টা বিরিঞ্চিরও সর্বদেবরাজ ইন্দ্রের পরমোচ্চ পদবীকে অকিঞ্চিৎকর পদদলিত কীট-সদৃশ বোধ হয়, সেই গৌরচন্দ্রকেই আমরা স্তব করি।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরম পরিপূর্ণ চেতন বস্তু। যিনি এই চৈতন্যচন্দ্রকে ভজনা না করিবেন, তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট না হইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু। বর্তমান সমাজ শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ না করাতে বহু বাহ্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া যিনি বিচার করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিরন্তর চৈতন্য-চরণকমল-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ মূহূর্তের জন্যও হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।।"

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা-কথা যে পরিমাণে যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চেতন-বিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোলকলা বিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু, সুতরাং তাঁহার চেতনময়া কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোল আনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্যন্ত জীব দেহ, গেহ, পুত্র; কলত্র, কায়মনোবাক্য যথাসর্বস্ব দ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্ত না হইয়াছেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহার ষোল আনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই জানিতে হইবে।

'যেষাং স এষ ভগবান দয়য়েদনন্তঃ সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে।।"

শ্রীনিত্যানন্দের পদকমল আশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভ হয় না। নিত্যানন্দের পদাশ্রয় হইলে জীবের বিবর্তবুদ্ধি দূর হয়। তখন জীব আর অসত্যকে সত্য বলিয়া বহুমানন করে না। (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—)

"নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।

হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।।
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যা-কূলে কি করিবে তার।।
অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ভজ তাঁর চরণ দুখানি।।
নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।
এ অধম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ।।"

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল আচার্য প্রভু, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু এইরূপ দৃঢ়তার সহিত নিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করিবার জন্য জীবকুলকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অপ্রকটের কিছুকাল পর হইতে অনাদি বহির্মুখ-সমাজ তাঁহাদের মঙ্গলময়ী শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণপূর্বক সমাজে ধর্মের নামে কলঙ্ক, বৈষ্ণবতার নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ, কত কি অনর্থ আনয়ন করিয়াছেন! গত তিন শত বৎসরের বৈষ্ণবজগতের ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন; কেবল তন্মধ্যে কদাচিৎ দুই একটি ভজনানন্দী পুরুষ নিজে নিজে ভজন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এতদূর বহির্মুখ সমাজের মধ্যে শুদ্ধ ভক্তিকথা আলাপ করিবার জন্য খুব কম লোকই পাইয়াছেন।

আমরা মনে করিয়াছিলাম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় যে সকল বিশুদ্ধাত্মা পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঐ প্রকার মহদ্‌ব্যক্তির দর্শন বোধ হয় আর আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ভাগ্যে এমন সব মহাত্মা মিলাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালীয় ভক্ত অপেক্ষা ন্যূন নহেন। তাঁহারা সর্বক্ষণ হরিভজন ও হরিকীর্তন করিতেছেন।

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার।।
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার।।"

অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্তিত হন না। অপরাধময় কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ আমাদিগকে কোটি জন্ম কীর্তন করিলেও কৃষ্ণপদে প্রেমদান করে না। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অনর্থযুক্তাবস্থায় জীব যদি নিষ্কপট ভগবদ্‌বুদ্ধিতে গৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন, তবে তাহার অনর্থ দূরীভূত হয়। কিন্তু যদি গৌর-নিত্যানন্দে ভোগবুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ 'গৌর-নিত্যানন্দ আমার উদরভরণ, প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ বা আমার মনোধর্মের ছাঁচে গড়া আমার ইন্দ্রিয়ভোগ্য কোন বস্তু' এই জ্ঞানে মুখে "গৌর গৌর" করি, তাহা হইলে আমাদের গৌর-নাম-কীর্তন হইবে না, ভোগের ইন্ধনস্বরূপ মায়ার নাম কীর্তন হইবে মাত্র। 'গৌর' নাম কীর্তিত হইলেই নাম লইতে প্রেমের উদয় হইবে, সর্ব অনর্থ দূরীভূত হইয়া যাইবে। কলিকাতা হইতে হাওড়া দুই মাইল পশ্চিমে। কেহ যদি দুই মাইল পূর্বদিকে হাঁটিয়া আসিয়া বলেন যে, যখন আমি কলিকাতা হইতে দুই মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি তখন নিশ্চয়ই হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সেই ব্যক্তির এইরূপ কল্পনা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু তাহার কল্পিত হাওড়ায় আসিয়া সে ব্যক্তি ট্রেণ ধরিতে পারিবে না। সুতরাং তাহার গন্তব্য স্থানে যাওয়াও হইবে না। একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, বরিশালে এক সম্প্রদায় এক সময়ে 'প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ' বলিতে বলিতে ডাকাতি করিয়াছিল। ঐরূপ ডাকাতের দলের গৌরনিত্যানন্দ-নামাক্ষর গৌর নিত্যানন্দের নাম নহে।

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মঙ্গলাচরণে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণাম করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ।।"

শ্রীগৌরসুন্দর ত্রিকাল সত্যবস্তু। অক্ষজ দ্রষ্টা, যে প্রকার গৌরসুন্দরকে শ্রীমর্ত্যজীবের ন্যায় জগতে কোন একসময়ে প্রকট এবং কিছুকাল পরে অপ্রকট দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে 'মহাপুরুষ' বা কিছুকালের জন্য উদিত একটি 'ধর্মপ্রচারে তাৎকালিক উপযোগিতা প্রভৃতি কল্পনা করিয়া তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ-দান এবং নিত্যচরমপ্রয়োজনলাভ হইতে বঞ্চিত হন, শ্রীগৌরসুন্দর সেইরূপ বস্তু নহেন। তিনি ত্রিকাল সত্য বাস্তব বস্তু। তিনি জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন অর্থাৎ আনন্দবর্ধক। জগন্নাথ মিশ্র পিতৃরূপে তাঁহার সেবক। তিনি বিষ্ণুপরতত্ত্ব; আর কেহ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় নহেন, পিতামাতা গুরুবর্গও গুরুরূপে সেই অসমোর্ধ পরতত্ত্বেরই সেবক (চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ)—

পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাবে কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব দাস্যভাব সে করয়।।

সেই গৌরসুন্দর ভৃত্যবর্গের সহিত, নিজ পাল্যবর্গের সহিত এবং শক্তিবর্গের সহিত অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বরূপে নিত্য বিরাজিত। তিনি নিত্যবস্তু, ত্রিকাল সত্যবস্তু, সুতরাং তাঁহার ভৃত্যবর্গ; পাল্যবর্গ ও শক্তিবর্গও নিত্য। 'ভৃত্য'শব্দের দ্বারা তাঁহার সেবকগণকে বুঝাইতেছে। আর যাঁহারা তাঁহার সেবার দ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ পাল্যবর্গমধ্যে গণিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার পুত্র। "আত্মা বৈ জীয়তে পুত্রঃ"—শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পাল্যবর্গের পিতা। তিনি তাঁহার পাল্যবর্গের বিশুদ্ধ চিত্তে উদিত হইয়া শ্রীনামপ্রেম প্রচার করিতেছেন। ইঁহারাই তাঁহার পুত্র। ইঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজবংশ। শ্রীভগবানের এই অচ্যুত-গোত্রীয় বংশগণই জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-প্রেম-প্রচার-ধারা রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আর যাঁহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তুতে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া চ্যুত গোত্রের পরিচয়ে নিত্যানন্দাদ্বৈতকুলের কন্টকবৃক্ষস্বরূপ হইয়া জগতের মহা অমঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাঁহারা 'নিত্যানন্দাদ্বৈতের বংশ' বলিয়া যাহা উদ্দিষ্ট হয়, তাহা নহেন। যাঁহারা গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতের অন্তরঙ্গ সেবাধিকার লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহাদের মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের পাল্য অর্থাৎ পুত্র। শ্রীগৌর নিত্যানন্দ তাঁহাদের নির্মল আত্মায় উদিত হইয়া সুকৃতিমান্ জীবগণের নিকট জগতে বিস্তার লাভ করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। বৈধ-বিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার কলত্র, আর প্রকৃত প্রস্তাবে ভজন-বিচারে শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীনরহরি ঠাকুর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার উজ্জ্বল মধুর রসাশ্রিত ত্রিকাল সত্য কলত্র। শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও বিপ্রলম্ভাবতার। শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগময় বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর—বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—প্রেমভক্তিস্বরূপিণী। শাক্তেয়বাদী, মনোধর্মী কতিপয় ব্যক্তি নিজ ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে গৌরসুন্দরকে মাপিয়া লইবার চেষ্টায় গৌরনাগরীরূপ পাষণ্ড মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার দৈবীমায়ায় বিমোহিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের উজ্জ্বল মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের সুনির্মল-ভজন-প্রণালী বুঝিতে না পারিয়া সম্ভোগবাদী হইয়া এইরূপ অনর্থ জগতে প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদিগকে গৌরভক্ত না বলিয়া 'গৌরভোগী' বলা ন্যায়-সঙ্গত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুই যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন করিলেই ত' সব হয়, পৃথক কৃষ্ণারাধনার আবশ্যক কি? এইরূপ বিচার সেবাহীন জনগণের কৃষ্ণ ও গৌরে ভেদবুদ্ধি হইতেই উদিত হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক গৌরানুগত্যের ছলনা করিয়া যে গৌরভজন কৃষ্ণভজন হইতেও বড় বা কৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা নাই প্রভৃতি প্রলাপ বকিয়া থাকেন, তাহা গৌরভজন নহে; তাহা কপটতা ও ভণ্ডতামাত্র।

শ্রীগৌরপার্ষদ গোস্বামিপাদগণের অনুমোদিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত

মতবাদ জড়েন্দ্রিয় তর্পণমূলে পাষণ্ডতা ব্যতীত আর কি? শ্রীগৌরসুন্দরই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যেমন আচার্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু 'মনঃশিক্ষায়' বলিয়াছেন,—"শচীসূনুং নন্দীশ্বর পতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ"—হে মন, তুমি শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দের প্রিয়তমস্বরূপে নিরন্তর স্মরণ কর। এই স্থানে শ্রীদাসগোস্বামিপ্রভু শচীনন্দনকে নন্দনন্দনরূপেই স্মরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু নন্দনন্দনের আরাধনার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে পরবর্তীপদে শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দদয়িতরূপে জ্ঞান করিতে বলিতেন না। শ্রীগুরুদেব—আচার্য, তিনি আচরণ করিয়া শিষ্যকে ভজন শিক্ষা দেন। শ্রীগুরুদেব সর্বদা মুকুন্দের আরাধনা তৎপর, তিনি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ রাধা-প্রিয়সখী। কৃষ্ণ হইতে বড় বস্তুর কল্পনাই মনোধর্ম বা মায়া। যাঁহারা হরিলীলা মায়ান্তর্গতা, এইরূপ অপরাধময়ী বুদ্ধি পোষণ করিয়া দুরভিসন্ধিমূলে ইন্দ্রিয়তোষণপর ভোগবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সম্ভোগবাদি ভোগী। তাঁহারা গৌরে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বিকৃত মস্তিক, আর কতকগুলি ভজনহীন নির্বোধ; সুতরাং বঞ্চিত হইবার জন্যই তাঁহাদের অনুগত। অনর্থময় সাধকের বর্তমান অবস্থারও উপাস্য শ্রীগৌরসুন্দর, আর অনর্থহীন সাধকের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। সাধকের শ্রীকৃষ্ণোপাসনার পূর্বাভাসই গৌরোপাসনা, আর সিদ্ধের গৌরোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণোপাসনা। অসিদ্ধ অর্থাৎ অনর্থযুক্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারেন না, যাইবার ছল করিলে কৃষ্ণ, বিষ্ণুর দ্বারা অঘ-বক-পূতনার ন্যায়, অকালে তাঁহার বধ সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু পরমৌদার্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ন্যায় বিষয়ীকে, জগাই মাধাইয়ের ন্যায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকেও অনর্থ হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণারাধনায় নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা প্রদান করেন। কতকগুলি শাক্তেয়বাদী ও বঞ্চিত ব্যক্তি বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাবৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া এবং রূপানুগ শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করিয়া মাটিয়া-বুদ্ধিবলে জড়ভোগতৎপর হইয়া 'গৌরভজা' বা 'গৌরবাদী' হইয়া পড়িয়াছেন। আবার কতকগুলি লোক গৌর বাদ দিয়া গৌর-নাম-মন্ত্রে বিরোধ করিয়া ত্রিগুণ-চালিত হইয়া জড়াহঙ্কারে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলা-বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিবার দাম্ভিকতা দেখাইয়া ঘৃণিত প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িয়াছেন। এক সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দর ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট, আর এক সম্প্রদায় মুখে 'গৌর' মানিয়া অন্তরে গৌরবিরোধী ও কৃষ্ণকে মায়িক ভোগ্যবস্তুমাত্র জ্ঞানে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট।

আবার, আর এক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা গৌরভজা হইবার পরিবর্তে গুরুভজা বা কর্তাভজা নাম ধারণ করিয়াছেন। ইঁহাদের ধারণা এই যে, গুরুই কৃষ্ণ। সুতরাং কৃষ্ণারাধনার আর আবশ্যকতা নাই। এই সকল স্বতন্ত্র জড়-বুদ্ধিজীবী

পাষণ্ডমতবাদী ব্যক্তির অনুগত ব্যক্তিগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-প্রমত্ত জরদ্গবতুল্য গুরুব্রুবকে কৃষ্ণ সাজাইয়া নিজেরা ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত হয় এবং বহু মূর্খ ব্যক্তিকে সেই অপরাধজনক কার্যে লিপ্ত করাইয়া থাকেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ঐ সকল অপরাধী-ব্যক্তিগণের কথা খুব সরল ভাষায় বলিয়াছেন—

কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া 'নারায়ণ'।।
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার।।
(চৈঃ ভাঃ আদি ১।১৪।৮৪-৮৫)

উদর ভরণ লাগি, এবে পাপী সব।
লওয়ায় ঈশ্বর আমি, মূলে জরদ্গব।।
গর্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বলে,—'আমি রঘুনাথ' ভাব গিয়া।।
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ,—ইহারে লইয়া।
বলয়ে, 'ঈশ্বর' বিষ্ণু-মায়া-মুগ্ধ হৈয়া।।
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩৪।৪৮০-৪৮২)

এই সকল ব্যক্তি আত্মতুল্য শিষ্যগণের দ্বারা শৃগাল কুক্কুর-ভক্ষ্য স্বীয় জড়পিণ্ডের পদদেশে তদীয়া তুলসী (?) সমর্পণ করাইবার দুঃসাহস ও পাষণ্ডতা দেখাইয়া অনন্ত রৌরবের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকে। এই সকল পাষণ্ডের কথা বহুলোক আমাদের নিকট জানাইতেছেন, কিন্তু ইহারা নরক-গমনের জন্য এতদূর কৃতসঙ্কল্প যে, কোন ভাল কথা কিংবা শাস্ত্রীয় কথা ইহাদের কর্ণমূলে প্রবিষ্ট হয় না। এই যে ত্রিগুণাদেবীর যূপকাষ্ঠমুখে পূজা হইতেছে, তাহাতে এই সকল পাষণ্ডবুদ্ধিরূপ মস্তক বিচ্ছিনন হইলে আর ভোগপরতা বিষ্ণুতে আরোপিত হয় না। এই 'গুরু-ভজা' মত জগতে বহু প্রকারে প্রবষ্টি হইয়াছে। মূর্খ লোকই এই সকল মতের আদর করিয়া থাকে।

গোস্বামিপাদগণ ও শ্রীল রূপানুগ ভক্তগণ ভজনের প্রণালী সুন্দরভাবে কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু প্রথমে শ্রীগুরুদেব, তৎপরে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শেষে শ্রীগান্ধর্বিকাগিরিধারীর ভজন কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার স্তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ইন্দ্রিয়-প্রমত্ত গুরু-ভজাগণের গুরুই 'গৌরাঙ্গ'—এইরূপ পাষণ্ড মতবাদ প্রচার করেন নাই। গুরু-ভজনের ছল দেখাইতে গিয়া গৌরাঙ্গের ভজন বাদ দেন নাই। আবার গৌরভজা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সহিত বিরোধ করেন নাই।

'বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল।
কৃষ্ণনাম পরায়ণ, পরম মঙ্গল।।

যাঁর প্রাণধন—নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য।।
(চৈঃ চঃ আদি ৫ম ২২৮-২২৯ সংখ্যা)

শ্রীগুরুদেব গৌরাভিন্নবিগ্রহ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব গৌরাঙ্গের প্রকাশবিগ্রহ। তিনি আশ্রয় জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব। বিষয় জাতীয় ভগবত্তত্ত্বের সহিত তাঁহাকে একীভূত করিয়া বিষয়তত্ত্বের বিলোপ সাধন করিবার চেষ্টা অপরাধময় নির্বিশেষ বাদীর চেষ্টামাত্র। উহাই মায়াবাদ বা পাষণ্ডতা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।।"

অন্যস্থানে আরও বলিয়াছেন—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।।"

তিনি শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে কৃষ্ণভজনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বহুস্থানে এই সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন—

হেন নিতাই বিনে ভাই' রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।
নিতাইর করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইর চরণ দু'খানি।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধো লোকনাথ দীনবন্ধো
মুঞি দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন, প্রিয়নর্মসখিগণ,
নরোত্তম মাগে এই দান।
"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।"

❖ ❖ ❖ ❖

"শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ।।"

গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দ কন্দ,
পরিবার গোপ-গোপী সঙ্গে।

নন্দীশ্বর যা'র ধাম, গিরিধারী যা'র নাম,
সখী সঙ্গে তারে ভজ রঙ্গে।।
প্রেমভক্তি তত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই,
আর দুর্বাসনা পরিহরি।
শ্রীগুরু প্রসাদে ভাই, এ সব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী অনুচরি।।
অহঙ্কার অভিমান, অসৎসঙ্গ অসৎজ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুর-পাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, দেহ-গেহ-পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতি মতি ভাবে সেব,
প্রেমকল্পতরু দাতা।
ব্রজরাজ-নন্দন, রাধিকা-জীবন-ধন,
অপরূপ এই সব কথা।।

—শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম

❖ ❖ ❖ ❖

শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু গুরুদেবকে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের প্রিয়তমতত্ত্ব বলিয়াছেন। শ্রীল দাসগোস্বামীর পরমপ্রিয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু তাঁহার ভজন-প্রণালী এই শ্লোকটীতে কীর্তন করিয়াছেন—

"বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।"

সর্বপ্রথমে মন্ত্রদীক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেবের ভজন, তৎপরে পরম, পরাৎপর প্রভৃতি গুরুবর্গ যথা—শ্রীমদানন্দতীর্থ, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রমুখ গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে চতুর্যুগোদ্ভূত ভাগবতবৈষ্ণবগণের ভজন, তৎপরে অভিধেয়াচার্য যুগলচরণ-ভজন-প্রদানের মালিক শ্রীরূপ প্রভুর ভজন, তৎপরে রূপানুগযুথ শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব প্রমুখ গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত সাধারণ ঈশতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভজন। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই "কৃষ্ণ জানাইয়া বিশ্ব কৈল ধন্য"। তিনি অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বলরস প্রদাতা। শ্রীরূপপাদ তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।"

তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা বলিয়াই মহাবদান্য। তাঁহার উপদেশ—"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ"। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার রূপ—গৌর, তাঁহার লীলা---কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান। এই নাম, রূপ, গুণ ও লীলা তাৎকালিক বা কালব্যবধানগত কোন বস্তু নহে, উহা নিত্য। কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলা (গৌরলীলা)---এই উভয় নিত্যলীলার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তাহাও নিত্য। এই দুই নিত্যলীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্যের বিলোপ সাধন করিবার বৃথা প্রয়াস করিলে ইন্দ্রিয়-তর্পণোত্থ অপরাধময় নির্বিশেষবাদের আবাহরন করা হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের সম্ভোগরসময় বিগ্রহ। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত ভজনই গোপীর আনুগত্যে শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজন। আচার্য শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থোমহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো ন পরঃ।।

ঐশ্বর্যপ্রকাশ পরতত্ত্ব-বস্তু নারায়ণের শ্রী, ভূ ও লীলা—এই তিনটি শক্তি। কমলা বা লক্ষ্মী---শ্রীশক্তি, বিষ্ণুভক্তিই—ভূশক্তি, আর নারায়ণের পদালিঙ্গিতা আধারভূতা বিচরণ-ভূমিই—নীলাশক্তি, ইহাকেই 'দূর্গাশক্তি' বলে; ইনি জগতের আধারস্বরূপা। গৌর-নারায়ণে এই তিনটি শক্তিই বর্তমানা। অবতারীর দেহে সর্বাবতারের স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণে কৈমুতিকন্যায়ানুসারে 'নারায়ণত্ব' বিরাজিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন। সুতরাং তাঁহাতে কোন তত্ত্বেরই অভাব নাই। এইজন্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'ক্ষীরোদশায়ী' বিষ্ণু বলিয়া এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও—"ভক্তের বাক্য ব্যভিচারী হইতে পারে না"—ইহা দেখাইয়া অংশী-শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সর্বতত্ত্বের সমাবেশ আছেন—প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গয়া গমনের পূর্বপর্যন্ত যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্যপর নারায়ণলীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলায় তিনি তাঁহার নারায়ণস্বরূপই প্রকাশিত করিয়াছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরের গার্হস্থ্যলীলা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা বলিয়াই জানিতে হইবে। গৌরগণোদ্দেশের ৪৩ সংখ্যায় কবি কর্ণপুর বলিয়াছেন যে, যিনি পূর্বে মিথিলাধিপতি রাজা জনক ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে বল্লভাচার্য; সেই বল্লভাচার্যের কন্যাই লক্ষ্মীপ্রিয়া। জানকী ও রুক্মিণী—এই দুই একত্রে মিলিয়া 'লক্ষ্মী'-নাম্নী তাঁহার এক কন্যা হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিস্বরূপ প্রকাশ করিবার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া' প্রেমভক্তিস্বরূপিণী, তিনি যখন পরিবর্ধিতা হইতেছিলেন, তখন লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌর-নারায়ণের সেবিকাস্বরূপে বিরাজিতা ছিলেন। ক্রমে সেই প্রেমভক্তি যখন পরিবর্ধিতা হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের

সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তত্ত্ববিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভূশক্তি-স্বরূপিণী। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে কবি কর্ণপুর লিখিয়াছেন যে, পুরাকালে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে 'সনাতন রাজপণ্ডিত' নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভূশক্তি স্বরূপিণী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহারই কন্যা। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কবি কর্ণপুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পৃথিবীর অংশরূপা বলিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-প্রচার কার্যে সহায়কারিণী। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু, ভক্তবাৎসল্য-বিধায়িনী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে 'রাধাকৃষ্ণের সেবিকা' বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে একজন বৃষভানু-নন্দিনীর সহচরী, ভক্তা পরমেশ্বরী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর আদি লীলায় অর্থাৎ গয়া গমনের পূর্ব পর্যন্ত যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নারায়ণস্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইবার পরও তিনি যে লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাও অনেকটা মিশ্রভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহাতেও ঐশ্বর্যপ্রকাশ বর্তমান রহিয়াছে। যেমন শ্রীবাস-ভবনে চতুর্ভুজ নৃসিংহরূপ ও মুরারি গুপ্তের গৃহে বরাহমূর্তি প্রভৃতি প্রকট করিয়াছেন, কখনও বা বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়াছেন। গৃহাবস্থানের শেষ লীলায় তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মাধুর্যপর কৃষ্ণলীলার কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার গৃহাবস্থানের মধ্যলীলায়ও যে তিনি কৃষ্ণলীলা-কথা প্রকাশ করেন নাই, তাহা নহে। তিনি গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরে স্বয়ংরূপ বিষয় হইয়াও আশ্রয়ের ভাবে "গোপী" "গোপী" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। ঠাকুর হরিদাস ও নিত্যানন্দকে জগতের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণকথা কীর্তনের আজ্ঞা দিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরই রাধাকৃষ্ণমিলিত তনু। তাঁহার শরীর কৃষ্ণের ন্যায় আকারবিশিষ্ট; তিনি বৃষভানুনন্দিনীর ভাবে এরূপ বিভাবিত যে ঐ ভাব ওতঃপ্রোতরূপে তাঁহাতে বর্তমান থাকিয়া তাঁহার কৃষ্ণবর্ণকে শ্রীমতীর গাত্রবর্ণদ্বারা বাহিরে পর্যন্ত আবৃত করিয়াছে। তাঁহার অন্তর যেমন সর্বোতোভাবে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, তদ্রূপ তাঁহার বাহ্য শরীরও শ্রীমতীর কান্তি-দ্বারা আবৃত। পণ্ডিত গদাধর গোস্বামী—বৃষভানুনন্দিনীর ভাবরূপে গৌরলীলায় বর্তমান, আর শ্রীদাস গদাধর শ্রীমতীর কান্তিরূপে প্রকাশিত। শ্রীগৌরগণোদ্দেশের ১৫৩ ও ১৫৪ সংখ্যায় কবি কর্ণপূর লিখিয়াছেন,—

অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাত্রিরূপতাম্।
অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ।।
রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা।
সাদ্য গৌরাঙ্গ-নিকটে দাসবংশ্য গদাধরঃ।।

রাধাভাব-সুবলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা দ্বারা স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ, রাধিকারূপ ও ললিতারূপ—এই ত্রিবিধরূপ হইয়াছেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত সেই রাধিকার ভাবরূপ অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকাই ভিন্ন মূর্তিতে তাঁহার ভাব প্রকাশ করিবার জন্য গদাধররূপে প্রকাশিত এবং শ্রীমতী রাধিকাই তাঁহার কান্তি প্রকাশ করিবার জন্য দাস গদাধররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এইরূপ বিচার নহে যে, মহাপ্রভু সম্ভোগবিগ্রহ কৃষ্ণ আর গদাধর পণ্ডিত রাধিকা। শ্রীগৌরসুন্দরও এই স্থলে শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত, তিনি আশ্রয়ের ভাবে মত্ত হইয়া সর্বদা কৃষ্ণান্বেষণে ব্যস্ত। আবার গদাধরও স্বতন্ত্ররূপে আশ্রয়ের ভাবে মত্ত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরেরই বিপ্রলম্ভরসের সহায়কারী। উভয়েই বিপ্রলম্ভরসে মত্ত। তবে যে গৌর-গদাধরের ভজন-প্রণালী রহিয়াছে বা গদাধরকে 'শক্তিতত্ত্ব' গৌরসুন্দরকে 'শক্তিমত্তত্ত্ব' বলা হয়, তাহার দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, শ্রীগৌর সুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনের দেহ ও শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ। গদাধর পণ্ডিত সেই রাধিকারই ভাব-প্রকাশ বা কায়ব্যূহস্বরূপ। গদাধর পণ্ডিত কিছু শ্রীমতীর দেহ লইয়া প্রকাশিত হন নাই; কিন্তু তিনি আশ্রয়জাতীয় শক্তিতত্ত্ব, শ্রীমতীর ভাবরূপিণী। বিপ্রলম্ভ-লীলা ও সম্ভোগলীলায় যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, কল্পনার দ্বারা তাহা লোপ করিবার চেষ্টা করিলে রসাভাস দোষ উপস্থিত হয়। এইরূপ দোষ হইতে গৌরনাগরীবাদ এবং নানাবিধ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মতবাদ জগতে উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুকে যে ভক্তির স্বরূপে পরিচিত করিয়াছেন, এবং যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন প্রভুকে ভক্তিসিদ্ধান্ত-আচার্যরূপে 'সম্বন্ধ'-শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, এবং যে সনাতন-শিক্ষা শ্রীজীবে প্রতিফলিত হইয়া ভাগবতাচার্যরূপে দেদীপ্যমান আছে এবং যে শ্রীরূপানুগত্ব মূর্ত্তিমতী ভক্তিস্বরূপে শ্রীরঘুনাথ প্রভুবরে স্বরূপানুগত্যের দেদীপ্যমান শোভাময় থাকিয়া গৌড়ীয়ের হৃৎসরোবরের আশাবারি অবিশ্রান্তভাবে পরিপূরণ করিতেছেন, শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবহৃদয়তট সেই ভক্তিরসামৃত-জলধির পরিরক্ষক এবং সুসিদ্ধান্তবিরোধ ও অনর্থরূপ-পঙ্কিলজলপ্রবাহ-সমূহের প্রতিষেধকরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন।

শ্রীরূপোপদিষ্টা শ্রীচৈতন্য-ভক্তি শ্রীরূপের শ্রীকরোদ্ভাসিতা। "দুর্গমসঙ্গমনী" জীববৃত্তি পঞ্চরাত্র-মত-ধ্বংসিনী নহেন। যাঁহারা মনে করেন যে, শ্রীজীব পাঞ্চরাত্রিক মতের সহিত বিরোধ করিবার উদ্দেশ্যেই শৌক্রবিচারের প্রাধান্য ও স্বকীয় বাদ প্রভৃতি স্থাপন করিয়া শ্রীরূপানুগত্ব ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন; শ্রীরূপরঘুনাথানুগ জনগণ তাঁহাদের ঐরূপ নিকৃষ্ট বিচারের পক্ষপাতী নহেন। শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীমন্নরোত্তম প্রভু প্রভৃতি গৌড়ীয়গণই এই ঘৃণিত-বিশ্বাস-রোগের চিকিৎসক! "মনঃশিক্ষা", "বিলাপকুসুমাঞ্জলি" প্রভৃতি শ্রীরূপানুগত্বের প্রকৃষ্ট নির্য্যাস। তাই বলি,

শ্রীব্যাসাসনে বসিয়া শ্রীজীবানুগত্যে আমাদিগের শুদ্ধজীবানুগত্য পরিচয় লাভ হউক আর 'স্বরূপের শ্রীরঘুনাথে'র আনুগত্যে ব্যাসাসনে' শ্রীব্যাস-পূজার উদ্দেশে প্রাকৃত চাঞ্চল্য অপসারিত হইয়া অপ্রাকৃত সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হউক। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে আনীত শ্রীজীব-ঘটে স্বরূপের রঘুদাস্য আমাদিগের কামাদি ষড়রিপুর অনিত্য দাস্যদস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া অমরসলিলে স্নাত ও পিপাসার নিবৃত্তি করুক।

"গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বস্মরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ।।"

শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট শ্রবণকালে তাঁহার পূর্ব পরিচয়ে "দবির খাস" বলিয়া অভিহিত হন। ভক্তির স্বরূপবিজ্ঞানে তদনুগ-সম্প্রদায় তাঁহাকে "দবির খাস" বলিয়া না জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকথিত 'শ্রীরূপ' বলিয়াই জানেন। শ্রীরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট ভক্তি-বিষয়িণী শিক্ষালাভের অভিনয় প্রদর্শন করেন। যাহা তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কৃপা-স্বরূপে তদনুগ-সম্প্রদায়ে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অধিকার প্রদান। তিনি যাঁহার নিকট ভক্তিসিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধ-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে 'সাকর মল্লিক'কে সনাতন-বিগ্রহত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরূপ তজ্জন্যই শ্রীসনাতন প্রভুকে 'গুরু' বলিয়া জানাইয়াছেন; শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু তজ্জন্যই "বিলাপকুসুমাঞ্জলি"তে শ্রীসনাতনকে কৃষ্ণসম্বন্ধকারক বলিয়া উক্তি করায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহাকেই 'ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য' বলিয়াছেন। সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রীরূপ-শ্রীকরাঙ্কিত হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সন্ধান-দায়িনী সরণীরূপে শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবানুগসম্প্রদায়ের সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে উদয় করাইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পান করাইয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামীর দ্বারা যাহারা নিজ নিজ প্রাকৃত স্বার্থ সিদ্ধ করিবার যত্ন করিয়াছেন, তাহারা দুর্গম পথে ভ্রান্ত হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। যাহারা শ্রীজীব গোস্বামীকে 'শ্রীরূপানুগ' বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন, তাহাদের 'রূপানুগ' বলিয়া পরিচয় দিবার সম্ভাবনা নাই এবং শ্রীদাস-গোস্বামিপ্রদর্শিত রূপানুগ ভজন-প্রণালীর অনুসরণে কখনই যোগ্যতা হইবে না। শ্রীদাস-গোস্বামিপ্রভুর আনুগত্য ব্যতীত শ্রীজীবের অনুগ-গণের গত্যন্তর নাই। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়েই ভক্তির প্রবৃত্তি এবং ভক্তির উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য-বিলাসাদি ভক্তিমানের সম্বন্ধজ্ঞানে পারদর্শিতা সাধন করে।

ভগবান—রসময়। ভগবন্মায়া-রচিত বস্তুতে যে রস আছে, তাহা অনিত্য, অজ্ঞান-মণ্ডিত ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের প্রতিষেধক। স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিগ্রস্ত অনর্থময় জীব বাস্তববস্তু শ্রীকৃষ্ণে সম্বন্ধ-সংস্থাপনে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সহিত তন্মায়া-রচিত জড়শক্তিপরিণতির

বৈষম্য না জানিয়া তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন এবং তাদৃশ বিবর্ত্তে পতিত হইয়া মায়া-বৈচিত্র্য-রহিত অবস্থাকেই 'ব্রহ্ম' ও তাঁহার সহিত নির্ব্বিভিন্ন হওয়াকেই 'অভিধেয়' বলিয়া বিচার করিয়া থাকেন। কেহ বা বিবর্ত্তে পতিত হইয়া জড়ভোগের প্রভুরূপে নিজেন্দ্রিয়দ্বারা স্বীয় অনর্থময় অবস্থার পরিপোষণ করেন। এই দুই প্রকার অভক্তির অনুষ্ঠান—ভক্তিস্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। রসময়ী ভক্তি নীরস বা বিরস-জাতীয় পরিণামদ্বয়ে কখনই পরিচিত হন না। জীবের স্বরূপ-বোধাভাবে ভুক্তি ও মুক্তি কোনও সময় প্রয়োজন-তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়, আবার কোন সময়ে ভক্তির স্বরূপ-বোধের অভাবে ভক্তিকে সাধন জানিয়া মুক্তি বা ভুক্তিকে সাধ্যজ্ঞান হয়। প্রকৃত-প্রস্তাবে শুদ্ধজীব ভজন-বলে মুক্তিকে প্রাপ্য না জানিয়া তাহাদিগের প্রভু হইয়া পরমৈশ্বর্য্যময়ী ভক্তির পরিচর্য্যায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন। ভক্তির পরিচারকরূপেই কর্ম ও জ্ঞানের অধিষ্ঠান, কর্ম্ম ও জ্ঞানের দাসীরূপে কদাপি শুদ্ধাভক্তির অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না। কর্ম্মের বৈরস্য ও জ্ঞানের নিরসতা রসময়ী ভক্তির প্রতিকূলে অবস্থিত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের কথারই প্রাধান্য। গৌণভাবে ঐ প্রাধান্যের সমর্থন-জন্য প্রতিকূলভাবসমূহের নিষেধোক্তি বর্ণিত আছে। কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন-বিচারে বিষ্ণুর বিভিন্ন সেবা-প্রকাশ-সমূহ কৃষ্ণের আংশিক বৈভব প্রকাশ করে। কৃষ্ণের প্রভুত্ব ও বিভুত্ব অপহরণ করিয়া যে প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিবৃত্তির চাঞ্চল্যে জীবের আসুরিকভাব সমূহের উদয় হয়, তাহাতে অভক্তিরই স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্য প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলন-বিষয়ে অনর্থময় বিবর্ত্তবাদী জীব আপনাকে নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত করিয়া তোলে। সুতরাং প্রভু ও ভক্তরূপ সেব্য-সেবক-ভাবরাহিত্যে যে দুর্গতি উপস্থিত হয়, তজ্জাতীয়-বিকৃত-বস্তুধারণা কৃষ্ণের প্রতিকূল অনুশীলনপর্য্যায়ে প্রাধান্য লাভ করে। প্রপঞ্চে প্রকটিত কংস-জরাসন্ধাদি দুষ্প্রবৃত্তির অবতারসমূহ ভক্তিরহিত হইয়া ভুক্তি-মুক্তিকে প্রয়োজন-জ্ঞানে যে প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলন করেন, তাহা পূর্ব্বকথিত নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধানের পর্য্যায়ে প্রপঞ্চে অবতরণ মাত্র।

গুরু, গোষ্ঠ, ধামবাসী, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, নামকীর্ত্তন ও মন্ত্রোচ্চারণ অনুকূলভাবে ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের সেবা করিতে পারে আর প্রতিকূলভাবে সেব্য হইবার পিপাসায় তত্তদ্বস্তুর কৃষ্ণ-সেবন-ভাবের বিপরীত প্রতিকূল আবরণের প্রকার ভেদ সৃষ্টি করে। অনুকূল অনুশীলনকারী বস্তুসপ্তক—ভগবদ্ভক্তির সহায়, আবার 'দম্ভ' আসিয়া ঐ বস্তু-সপ্তকের বাস্তববিচারকে আবৃত্ত করিয়া আধ্যক্ষিক দর্শনে কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পথে লইয়া গিয়া পিপথগামী করে।

সাধনভক্তি—রসোদয়ের পূর্বাবস্থিতির নামান্তর অর্থাৎ উহা-রসের প্রাগুদয়ভাবমাত্র; রসোদয়ে ভক্তি আর 'সাধন-ভক্তি' নামে পরিচিত না হইয়া 'ভাব-ভক্তি' নামে অভিহিত হন। স্থায়িভাব রতি প্রাক্কালে 'শ্রদ্ধা' নামে পরিচিত। স্থায়িভাবের সহিত সামগ্রী-চতুষ্টয়ের

সম্মেলনে রসোদয়। সামগ্রী-রহিত অসম্মিলিত রতির প্রাগ্‌দর্শনে সাধনপর্য্যায়ে আমরা 'শ্রদ্ধা' অর্থাৎ চিৎসাহিত্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখিতে পাই।

যাহারা জড়সাহিত্যে অপ্রাকৃতের বিবর্ত্ত-দর্শনে প্রমত্ত, তাহারা জড়ালঙ্কারিকের আবরণে প্রতারিত হইয়া 'অজ্ঞ-ভক্ত' হইয়াও আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তপর্য্যায়ে গণনা করে। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে অবগাহনাভাবে তটস্থজীবানুগ আপনার রূপানুগ পরিচয় ভুলিয়া গিয়া শ্রীরূপানুগ 'স্বরূপের রঘু'র আনুগত্য হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত হয় এবং রূপানুগগণের চরণে অপরাধ করিয়া বসে। এতাদৃশ বদ্ধজীব আত্ম-বৃত্তি ভক্তির সন্ধান না পাইয়া কখনও বা শ্রীজীবের বিরোধ, কখনও বা রূপানুগ-রঘুনাথের বিরোধ করিয়া বসে। বৈষ্ণবের পক্ষপাত দোষ আছে জানিয়া তাহাদের বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। ঐ ভ্রান্তিই তাহাদিগকে শ্রীরূপানুগধর্মযাজনের অর্গল স্বরূপে বাধা দেয়, কখনও কৃষ্ণেতরাভিলাষ, কখনও বা স্বভোগ-তাৎপর্য্যপর কর্মাবরণ, স্বত্যাগতাৎপর্য্যপর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদ ভক্তির সন্ধানে বাধা দেয়।

ভক্তিরস—তরল, তাহা প্রাপঞ্চিক রসের ন্যায় শুষ্ক হইতে পারে না। নিত্য রস-সমুদ্রের ক্ষয় নাই এবং তাহা সঙ্কীর্ণ জলাশয় মাত্র নহে। ভজনীয় বস্তু পরিমিতরাজ্যের দ্রব্যবিশেষ নহে বলিয়া তাঁহার সেবামৃতসিন্ধু—অপরিমিত বৈকুণ্ঠ-রস-সমুদ্র।

ভবরোগাক্রান্ত ভোক্তৃজীব অনর্থমুক্ত হইয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিতে পারিলেই তাঁহার সর্বার্থসিদ্ধি করতলগত হয়। কর্মজ্ঞানাদির আবরণ বা অন্যাভিলাষরূপ স্বেচ্ছাচারের অপব্যবহারসমূহ ভক্তিপথের কন্টকরূপে সমাগত হয় না। যাহাদের পূর্ব দুষ্কৃতিক্রমে ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিবার রুচি হয় না, তাহারা শ্রীরূপের অনুগের দয়ার উপলব্ধি করিতে পারে নাই জানিতে হইবে। শ্রীদামোদরস্বরূপের কথিত দয়ানিধি গৌরসুন্দর ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সেই ভক্তিসমুদ্রের শোভা প্রদর্শন করাইবার জন্যই সেনাপতি শ্রীরূপকে প্রকিকূল-অনুশীলনকারি জনগণের কল্যাণ-বিধানার্থ শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট করাইয়াছেন। শ্রীরূপানুগ-জনগণই শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি করিতে সমর্থ। অভক্তজনের কথিত মায়া-মরীচিকা কখনই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পথের সন্ধান দিতে পারে না। তজ্জন্য বিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে রূপানুগত্বই একমাত্র পথ।

চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতিসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্য বস্তু, বাস্তব-বিষয়াশ্রয় মিলিত-তনু-শ্রীচৈতন্যদেব। চিৎ বা সম্বিৎ-স্বতন্ত্র, অচিৎ বা অজ্ঞান—অস্বতন্ত্র। জ্ঞান ও জ্ঞানের অভাব—এই মিশ্রভাবসম্পন্ন আমরা বদ্ধজীব-সম্প্রদায়। সেইরূপ আমাদের একমাত্র উপাস্য—শ্রীচৈতন্যদেব। বিষয় ও আশ্রয় মিলিত হ'য়ে যে অপ্রাকৃত শরীরটী, তিনি সেই বস্তু। জড়বিষয় ও জড় আশ্রয়কে লক্ষ্য ক'রে একথা বলা হচ্ছে না। জড়জগতে

অসংখ্য বিষয় ও অসংখ্য আশ্রয়ের অভিমানে সকলে অভিমানী। পূর্ণচেতন কোন অস্বতন্ত্রতার বাধ্য ন'ন, এজন্য তাঁকেই 'বিষয়' বলা হয়। তাঁ'র যোষা সম্প্রদায়কে 'আশ্রয়' বলা হয়। শ্রীচৈতন্যদেব যদি কেবল বিষয়বিগ্রহের লীলা ক'রতেন, তা'হলে চিদচিন্মিশ্র বদ্ধজীব-সম্প্রদায়ের মঙ্গল হ'তো না, তা হ'লে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেতো। ''প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' এই গীতার বাক্যানুসারে আমরা যে জড়জগতের কর্ত্তা বা বিষয়াভিমান ক'রছিলাম—শ্রুতির তাৎপর্য্যবোধে বিমুখ হ'য়ে ''অহং ব্রহ্মাস্মি'' বাক্য উচ্চারণ ক'রে যে 'বিষয়' সাজ্‌বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ ক'রছিলাম—ক্ষুদ্র হ'য়ে বৃহৎ এর প্রতি যে মুখভঙ্গী ক'রছিলাম, সে অমঙ্গলের হাত হ'তে আমরা উদ্ধার পেতাম না, যদি বিষয়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়-বিগ্রহের রূপ ও ভাব অবলম্বন না ক'রতেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেবাধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ, কিন্তু স্বয়ং বিষয়তত্ত্ব। যে বিষয়তত্ত্ব হ'তে অনন্ত কোটি জীব প্রকাশিত হ'য়েছে, তিনি সেই বিষয়বিগ্রহ বলদেবেরও প্রভু, পরম বিষয়; এজন্য তাঁকে 'মহাপ্রভু' বলা হয়। তিনি বিষয়-বিগ্রহ হ'য়েও আশ্রয়ের ভাব-কান্তি গ্রহণ ক'রেছেন। এ জগৎ থেকে দেখতে গেলে বিষয়—এক অর্দ্ধ, অপরার্দ্ধ—আশ্রয়। আমরা বিষয় বিগ্রহ হ'তে চ্যুত হ'য়ে যে জগতের বিষয়বিগ্রহের অভিমান কর্‌ছি—মূল আশ্রয়-বিগ্রহের বিষয়বিগ্রহের প্রতি সেবার আনুকূল্য হ'তে পৃথক হয়ে বিপথগামী হচ্ছি,তা'হতে রক্ষা করবার জন্য বিষয়বিগ্রহ আশ্রয়বিগ্রহের রূপ গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁর রূপের তুলনা হয় না। আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের ভোগী চিদচিন্মিশ্রিত জীব, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের পিঞ্জরে—মনোধর্ম্মের পিঞ্জরে আবদ্ধ। এমন নরশরীরবিশিষ্ট হ'য়ে সর্বদা পরমার্থ বিহীন—সর্বদা ভগবৎ সেবা-বঞ্চিত; সুতরাং আমাদের শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত আর অন্য গতি নাই। বিষয় একটি—'একমেবাদ্বিতীয়ম্; ছান্দোগ্য ব'লছেন,—

''শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে''

এখান হ'তে একটি উর্দ্ধস্থিত গোলোক-পদার্থের একটা দিক্ দেখা যায়, অপরাংশ দেখা যায় না—উন্নতাংশে না গেলে দেখা যায় না।

সাধারণ সাহিত্যিক-সম্প্রদায় যে বিষয়াশ্রয়ের কথা আলোচনা করেন, তা'তে বিষয়ের বহুত্ব। ভরতমুনি অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে বিষয়াশ্রয়ের যুক্ত ভাবের কথা আলোচনা ক'রেছেন, তা'তে আমরা জান্‌তে পারি,—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারি প্রকার সামগ্রীর সমগ্রতা সম্পন্ন হয়, যদি তা'রা স্থায়িভাবের সহিত সংযোগ লাভ করে। তা'তে একটি সুন্দর পানা বা রস প্রস্তুত হয়। কেউ কেউ ব'ল্‌তে পারেন, রসের সৃষ্টি ত' এ জগতেও হ'চ্ছে। এখানে অসমগ্রের সহিত অস্থায়িভাবের সম্মিলনে বিকৃত ও খণ্ড-রসের উদয় হ'চ্ছে, উহা পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মের অধীন। শ্রীচৈতন্যদাসগণই এ কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝ্‌তে পারেন, অপরের সুদুরূহ ব্যাপার।

নিজ ভক্তিযোগ---নিজ প্রয়োজনীয় ভক্তি---নিজ আত্মার ভক্তিযোগ। তিনি কৃপাম্বুধি—দয়ার সাগর। এত দয়া কেহ দিতে পারে না। ভগবানের কোন অবতারে এত দয়ার পরিমাণ নাই। এ দয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতা দেওয়ার জন্য। অনন্তকালের জন্য পূর্ণ দয়া—ভগবানের নিজকে নিজে দিয়ে দেওয়া—এরূপ কেহই দেন নাই।

ভৃঙ্গ যেমন চঞ্চলতা ক্রমে মধুলাভের জন্য পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, সেরূপ নহে; কিন্তু আমার চিত্ত যেন—মৌমাছির ন্যায় মধুপানে প্রমত্ত হইয়া চৈতন্যচরণ-পুষ্প-মধুপানে মত্ত হয়। চৈতন্যদেব সর্বজীবকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। তিনি যে 'প্রেম' দান করিয়াছেন, তাহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে 'কর্ম্মী' 'যোগী' ও 'জ্ঞানী' অসমর্থ; কিন্তু যে কেহ তাহা লাভ করিতে সমর্থ।

ভগবদ্ বস্তু পূর্ণজ্ঞানময়, আনন্দময়; তাঁহাকে জানিবার জন্য কত স্থানে না ছুটিতেছি, কিন্তু ঘরের কাছে গোলোকপতি মানুষের আকারে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তির নিকটও যেকথা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা না শুনিয়া অন্য চেষ্টা করিলে বুদ্ধিমান্ আমাদিগকে প্রশংসা করিবেন না বা আমরাও আমাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা করিব না।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## গৌড়ীয় দর্শন—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদঃ

### (১)

দৃশ্যবস্তুর সহিত দ্রষ্টার সম্বন্ধস্থাপনকে 'দর্শন' বলে। সাধারণতঃ যে করণের সাহায্যে বস্তু পরিদৃষ্ট হয়, দ্রষ্টার সেই ইন্দ্রিয়কে 'চক্ষু' বলে। অক্ষি-দ্বারা বস্তুর বাহ্যরূপ ও আকারাদির অনুভূতি হয়। বস্তু-সম্বন্ধে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতে হইলে চক্ষু-নামক জ্ঞানেন্দ্রিয় বা করণের সাহায্য আবশ্যক। কেবল চক্ষু থাকিলেই যে দর্শন-কার্য্য সম্পন্ন হয়, এরূপ নহে। কারণরূপে চক্ষুর অভিভাবকের বা চালকরূপে অপর একটী বাহ্যেন্দ্রিয়পতির অবস্থান আমরা বুঝিতে পারি। দর্শনক্রিয়ার কারণ-রূপে চক্ষুর অধিষ্ঠান থাকিলেও তাহার কারণরূপে মনের প্রতিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার্য্য। চক্ষুর্দ্বারা দর্শনে যেস্থলে বাধা নাই, এমত স্থলেও যাহার কর্ত্তৃত্বাভাবে চক্ষু কার্য্য করে না, তাহাই 'মন' বলিয়া সংজ্ঞিত। মন যে কেবল চক্ষুর নায়ক, তাহাও নহে। মনের অধীনতায় চক্ষুর ন্যায় আরও চারিটী জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। তাহাদের দ্বারা মন বস্তুবিষয়ে ভিন্ন-ভিন্ন অনুভূতি সংগ্রহ করেন। বস্তুর বাহ্যরূপ বা আকারাদি না থাকিলে বা বস্তুর ক্ষুদ্রত্ব, বৃহত্ত্ব বা আবরণ-যোগ্যতা থাকিলে অথবা অভিঘাত ও সুদূরাবস্থিতি ঘটিলে অনেক সময় চক্ষুর অধিষ্ঠান-সত্ত্বেও বাহ্যবস্তুর প্রতীতি হয় না। বাহ্যবস্তুর অধিষ্ঠান অপর চারিটী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধ হয়। জ্ঞান সংগ্রহোপযোগী করণ বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইন্দ্রিয়পতি মন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্রভাবে অননুভূত বস্তুরও ধারণা করিতে সমর্থ হন। মুখ্যভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যে অনুভব সংগ্রহ করিতে অসমর্থ, তাহাও মন করণসমষ্টি-বলে প্রত্যক্ষপথ ব্যতীত অনুমান-পথে নিরূপণ করিতে পারেন। প্রত্যক্ষ-দর্শনাদি যদিও একমাত্র স্বানুভব-পথ, তথাপি দোষদুষ্ট না হইলে অনুমিতিও প্রত্যক্ষের সহায়তা করে। কিন্তু প্রত্যক্ষও কোন-কোন সময়ে সত্যের আলাপ করিয়া মনকে বস্তুর সত্যানুভূতি-সংগ্রহে বঞ্চনা করে। মাদকদ্রব্যাদির সহযোগে করণের দ্বারা অনুভূতি অনেকসময়ে ভ্রান্তির কারণ হয়।

দর্শন-সঙ্গে সাধারণতঃ চক্ষুর কার্য্য বুঝাইলেও অপরেন্দ্রিয়র গোচরীভূত বস্তুর প্রতীতিও 'দর্শন' নামে আখ্যাত হয়। জড়ীয় বস্তুসত্তার দর্শনকে 'জড়বিজ্ঞান' এবং এবং জড়াতীত চেতনাভাস বস্তুসত্তার দর্শনকে 'মনোবিজ্ঞান' বলিয়া উক্তি করা হয়। ভারতীয়

দর্শন-শাস্ত্রসমূহে, মনের কারণরূপে বুদ্ধি, বুদ্ধির কারণরূপে অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণরূপে চিত্ত বা মহত্তত্ত্ব এবং চিত্তের কারণরূপে প্রকৃতি বা অব্যক্ত-তত্ত্বের নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন—অংশাশিরূপে ক্রমান্বয়ে অবস্থিত। দ্রব্যে কর্তৃসত্তার অভাব থাকিলে তাহাকে দ্রষ্টৃ, শক্তি-রহিত 'জড়' এবং দ্রব্যে কর্তৃসত্তার বা চেতনের অস্তিত্ব ও দ্রষ্টৃত্ব পাওয়া গেলে, সেই চেতনই ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনরূপে কথিত হয়।

পুরাকালে ভারতে ছয়টি বিভিন্ন দর্শন প্রসিদ্ধি লাভ করে,—কণাদের বৈশেষিক-দর্শন, গৌতমের ন্যায়-দর্শন, কপিলের সাংখ্য-দর্শন, পতঞ্জলির যোগ-দর্শন, জৈমিনির পূর্ব-মীমাংসা-দর্শন এবং বেদব্যাসের বেদান্ত-দর্শন। এতদ্ব্যতীত মধ্যযুগে চার্বাকের নাস্তিক্য-দর্শন, নকুলীশ পাশুপত-দর্শন, রসেশ্বর দর্শন, অর্হৎ-দর্শন, সুগত-দর্শন প্রভৃতি আরও দশপ্রকার দার্শনিক মতসমূহের ন্যূনাধিক পরিচয় সায়নাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে জানা যায়। প্রত্যেক দর্শনের স্থাপ্য বিষয়গুলির তারতম্য-গত গবেষণা সমগ্রভাবে আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র উত্তরমীমাংসা বা শ্রীবেদব্যাসকৃত বেদান্ত-দর্শনের প্রারম্ভিক আলোচনা আমাদের আরব্ধ বিষয়ের মূল আকর-জ্ঞানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব।

বেদের শিরোভাগ 'উপনিষৎ' বলিয়া পরিচিত। ঐ উপনিষৎ-তাৎপর্য ধারাবাহিক-ভাবে প্রকৃত দ্রষ্টার দর্শনে উপলব্ধ হইবে না বলিয়া উপনিষদবলম্বনেই ব্যাসদেব 'ব্রহ্মসূত্র'-নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাই উত্তর-মীমাংসা, শারীরক সূত্র বা বেদান্তদর্শন-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য দার্শনিকগণের পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া শব্দ বা শ্রুতির আপ্তবাক্যকে মূল-প্রমাণরূপে গ্রহণপূর্বক প্রত্যক্ষ ও অনুমিতিকে তাহার সোদরজ্ঞানে শ্রীব্যাস বেদপ্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত বর্ণন করিয়াছেন। ভারতীয় বৈদিক-ধর্মপ্রণালীসমূহ সমস্তই ন্যূনাধিক বেদান্তদর্শনাবলম্বনে গঠিত। এই শারীরক-মীমাংসার ব্যাখ্যাতৃরূপে আমরা অসংখ্য ভাষ্যকার ও বার্তিককারকে দেখিতে পাই; তন্মধ্যে প্রাচীন ব্যাখ্যাতা বৌধায়ন, টঙ্ক, ভারুচি, দ্রমিড় প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য প্রভৃতি অনেকেই শারীরক-ভাষ্য প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া বেদান্তচার্য বলিয়া আদৃত আছেন। পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতও এই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া সারগ্রাহি-বিদ্বৎসমাজে উদাহৃত হন। যাদবাচার্য, প্রভাকর ও ভাস্করভট্ট প্রভৃতি মনীষিগণও বেদান্তের শিক্ষকরূপে কতিপয় গ্রন্থ ও মতভেদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্যের অনুগামি-সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা আনন্দগিরি ও সায়ন-মাধব প্রভৃতির লেখনীতে এবং বাচস্পতিমিশ্রের 'ভামতি'-টীকাদিতে কেবলাদ্বৈত মতেরই পুষ্টি লক্ষ্য করি। ব্রহ্মসূত্র বা উত্তরমীমাংসাবলম্বনে কয়েক শতাব্দী পূর্বে নির্বিশেষ-বিশ্বাস-মূলক কেবলাদ্বৈত-মতের বিরুদ্ধে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব লক্ষ্য ও বিশ্বাস করিয়াছিলেন—এমন অনেকগুলি শেমুষীসম্পন্ন ভগবৎপরায়ণ আচার্যের উদয় হইয়াছিল। তাঁহারাই সবিশেষ-ব্রহ্মদর্শনের

রক্ষক ও প্রচারক। তাঁহার কেবলমাত্র খণ্ড দার্শনিক নহেন, পরন্তু সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট ও সিদ্ধান্তপারঙ্গত, সুতরাং বাস্তবসত্যবস্তু-সম্বন্ধি অভিধেয় ও প্রয়োজনদর্শনেও বিমুখ ছিলেন না।

পুরাকালে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এরূপ ধারণা করিতেন যে, এই বিশ্বের কেন্দ্রেই আমাদের আধার ও আবাসস্থলী ধরণী অবস্থিতা এবং তাহাকেই কেন্দ্রত্বে বরণ করিয়া সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কপুঞ্জ আবর্তন করিতেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মালোচনার ফলে তাঁহাদের সেই ধারণা পরে পরিবর্তিত হওয়ায় তাঁহারাই জানিয়াছেন যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদিগকে বক্ষে ধরিয়া যে মহীতল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল-কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাহাকেও বুধগ্রহ বা শুক্রগ্রহের ন্যায়, শুক্রগ্রহ ও বুধগ্রহের মধ্যাকাশে সূর্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যেক সৌরবর্ষে একবার পরিভ্রমণ করিতে হয়। পৃথ্বীস্থিত দ্রষ্টা নিজস্থানে বিশ্বের কেন্দ্র স্থাপন করিতে গিয়া যেরূপ ভ্রমপূর্ণ জ্ঞান আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভ্রান্তবিশ্বাস-ভরে জড়-বৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের স্থূলশরীরকেই ভোগের কেন্দ্র জ্ঞান করিয়া ভোক্তৃত্বে বা বিষয়ত্বে বিশ্বাস করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান-বিদ্‌গণও জড়বিজ্ঞানে মনের প্রভুত্ব দেখিতে পাইয়া সেই জড়শরীরের কেন্দ্রে মনের অবস্থিতি জ্ঞান করিয়া দ্রষ্টৃরূপে মনশচক্ষে জড়কে দৃশ্যস্থানীয় জানিয়া সুষ্ঠুভাবে অবলোকন করিতেছেন। জড়বস্তু কিছু মনকে দেখেন না বা বুঝেন না, পরন্তু মনই জড়কে দেখেন, ---এইরূপ প্রতীতি তাঁহাদের প্রবল। বস্তুতঃ মনন-শক্তির অভাবে জড়চক্ষুতে জড়োপাদানমাত্র অবস্থিত হওয়ায় তাদৃশ দর্শনক্রিয়া-শক্তি-রহিত কেবলমাত্র জড়োপাদান কখনও মনকে বা চক্ষুকে দেখিতে পায় না। মননশক্তির অভাবে অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ই এইরূপ ক্রিয়া-শক্তিবিহীন হইয়া পড়ে।

জীবের পরলোকে বিশ্বাসহীন চার্বাক, জড়রসানন্দী এপিকিউরাস্, অজ্ঞেয়তা-বাদী এগ্‌নষ্টিক্ হাক্সলে, পারলৌকিক বিশ্বাসে সন্দেহবাদী স্কেপ্টিক্‌গণ, দিব্যজ্ঞানবাদী হেগেল্, সপেন্‌হুয়ার্ ও ক্যান্ট-প্রমুখ মনীষিবৃন্দ, সক্রেটিস, প্লেটো এপ্লাটুন্ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকগণ এবং অস্মদ্দেশীয় দার্শনিকগণ অনেকেই মনোবিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্রের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং নিজ-নিজ অভিজ্ঞতা জগৎকে দেখাইয়া স্ব-স্ব সাম্প্রদায়িক কৈঙ্কর্যে বস্তু দর্শন করিতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা নিজ-নিজ-মনোময় অভিজ্ঞতাকে বহুমাননপূর্বক চিন্তাস্রোতের কেন্দ্রে বসাইয়া, বস্তু দেখাইতে গিয়া বিভিন্ন-স্থানস্থিত দ্রষ্টৃবর্গের চক্ষে ভ্রান্তিজনক বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। একপ্রকার দর্শন অন্যের দর্শনের সহিত বিরোধ করায় নানা-প্রকার বিবদমান দর্শন বা দার্শনিক মতবাদসমূহ শ্রোতৃবর্গকে স্ব-স্ব বিপণীতে টানিয়া লইবার প্রযত্ন করিয়া আসিতেছে। যাঁহাদের চিত্তবৃত্তিরূপা বাসস্থলী যে দার্শনিকের মতবিপণীর সন্নিকট, তাঁহারা, পুরাকালের অজ্ঞ জ্যোতিষিগণের ন্যায়, একমাত্র তাঁহাকেই দর্শনরাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া

ভ্রমময়ী ধারণার পুষ্টি সাধন করিতেছেন। যাঁহারা দার্শনিকমণ্ডলীর বিভিন্ন বিপণীস্থিত বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য দেখিতেছেন, তাঁহারা স্ব-স্ব-যোগ্যতানুরূপ সেই সেই দ্রব্যে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতেছেন।

যেরূপ জ্যোতিষিগণ পুরাকালে আমাদের পৃথিবীকেই অন্যান্য সকলজ্যোতিষ্কের কেন্দ্র বলিয়া মনে করিতেন, যেরূপ মানবগণ পুরাকালে আমাদের দেহাধারকেই সকল অনুভবেরর মধ্যবর্তী মনে করিতেন, তদ্রূপ দার্শীনকগণও প্রাথমিকজ্ঞানবিকাশক্রমে দ্রষ্টৃ—মনকেই 'আত্মা' বা যাবতীয় বস্তুবিচারের কেন্দ্র বলিয়া জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাদৃশ বিচার-ফলেই বেদান্ত-দর্শনে অহংগ্রহোপাসনা বা মায়াবাদ স্থান পাইয়াছে। 'বেদান্ত' বলিলেই কিছুকাল পূর্ব হইতে কেবলাদ্বৈতবাদ, জীবেশ্বরৈক্যবাদ জড়চিদৈক্যবাদ, বিবর্তবাদ, নিঃশক্তিকবাদ, সগুণ-নির্গুণৈক্যবাদ, নির্ভেদব্রহ্মবাদ, নির্বিশেষবাদ প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ মতবাদসমূহ বিশ্বজনীন উদার বিচারপুষ্ট বলিয়া দর্শন-শাস্ত্রার্থিগণের নয়ন আবরণ করিয়া আসিতেছে, এবং সবিশেষ চিদ্‌বিচিত্রানুভূতি-পর শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি সিদ্ধান্ত বেদান্তের প্রতিপাদ্য নহে বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য অসংখ্য সঙ্কীর্ণ চেষ্টা প্রকৃত উদার বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িকতাকে বিপন্ন করিয়াছে ও করিতেছে।

শ্রীশঙ্করাচার্যের অভ্যুদয়-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সায়ন বা বিদ্যারণ্যভারতীয় শেষদশা পর্যন্ত কেবলাদ্বৈতবিচারপর বৈদান্তিকগণের সাম্প্রদায়িক ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, জীবাত্মাকে পরমাত্মা ও জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন, আংশিক দর্শন বা খণ্ডজ্ঞানের সাহায্যে পূর্ণত্বের কল্পনা, জড়ীয় অখণ্ড দেশকালাদিকে পূর্ণবস্তুত্বে স্থাপন এবং বিষয়াশ্রয়বিবেকাভাবে বাস্তব সত্যবস্তুকে নীরসতার আধার বলিয়া স্থাপন করিবার অসংখ্যপ্রকার প্রয়াসে জগতের বৃথা কালক্ষেপমাত্র হইয়াছে। বাস্তববস্তুদর্শনের ছলনায় খণ্ডজ্ঞানকে পূর্ণজ্ঞান, সগুণকে নির্গুণ বা গুণাতীতজ্ঞান প্রভৃতি বিবর্তমূলক মনোধর্মে লোকে ব্যাপৃত থাকায় পরমসত্যদর্শন আচ্ছাদিত হইয়াছিল। যদিও শ্রীশঙ্করপ্রমুখ দার্শনিক মনীষিগণ বেদান্তদর্শনে জড়ীয় ভেদদর্শনসমূহ নিরাস করিয়াছেন, তাহা হইলেও দ্রষ্টৃ, ভোক্তৃ বা বিষয়রূপে জীবাত্মাকে এবং দৃশ্য, ভোগ্য বা আশ্রয়রূপে জগৎকে প্রতিষ্ঠা করায় তাঁহারা পরমসত্যের বিচিত্রবিলাস হইতে দূরে অবস্থিত। এই পরমসত্যের দর্শন প্রদর্শন করিবার জন্যই স্বরংরূপ বস্তু স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিলেন;—তাঁহাকে অন্য কোন ইতর শক্তির অপেক্ষায় বা সহায়তায় প্রকাশিত হইতে হয় নাই।

জড় হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-মূলক পরাক্‌পথে বস্তু নির্দেশ করিবার প্রতিপক্ষে অপরোক্ষ প্রত্যক্‌পথের মহিমা একমাত্র বৈষ্ণবদর্শনেই নিহিত আছে। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিমভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই 'সর্বদর্শন-শিরোমণি' বলিয়া

বিদ্বৎপরমহংস-সমাজে অনাদিকাল হইতে সুপ্রসিদ্ধ; যেহেতু, যাবতীয় দার্শনিক তথ্য এই সর্ব-বেদান্তসার গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আপেক্ষিক অস্মিতার অভিমানে, আপেক্ষিক কর্মকে আশ্রয় করিয়া, আপেক্ষিক করণের দ্বারা, আপেক্ষিক বস্তুকে সম্প্রদান করিয়া, আপেক্ষিক বস্তুসমূহ হইতে নিরপেক্ষ থাকিয়া, আপেক্ষিক বস্তুর সম্বন্ধে, আপেক্ষিক আধারে দর্শন করিতে গেলে পরমসত্যবস্তুর দর্শন-লাভ যে ঘটে না, ইহা বিস্মৃত হইলে অর্থাৎ বস্তুদর্শন-কালে বিশেষরূপে নিরপেক্ষ না হইলে প্রত্যেক দ্রষ্টাই বস্তুর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-দর্শনে বিমুখ হইবেন। যাঁহারা মায়াদ্বারা বা খণ্ডজ্ঞানপ্রতীতির সাহায্যে বস্তুদর্শনে ব্যস্ত, তাঁহারাই মায়াবাদি বৈদান্তিক; আর যাঁহারা মায়াবাদীর অধীনতা-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বাস্তববস্তুর চিদ্‌বিলাসস্বরূপ দর্শন করেন, তাঁহারাই তত্ত্ববিৎ বা 'বৈষ্ণব'। সেই তত্ত্ব কেবল 'মায়া' নহেন, পরন্তু অখণ্ড পরম সত্য, পূর্ণ ও অবিমিশ্র চিৎ এবং অনুপাদেয়তা'-রহিত ঘনানন্দ অদ্বয়জ্ঞান।

মায়াবাদী বস্তু দর্শন করিতে গিয়া কেবলমাত্র মায়ার আশ্রয়ে দৃশ্য দর্শন করেন। ব্যবহারিক পরিচয়ের মিথ্যাত্ব প্রবল হইয়া তাঁহাকে বাস্তব-বস্তুর স্বরূপ দেখিতে দেয় না। ফলতঃ, খণ্ডজ্ঞানে খণ্ডজ্ঞানী কখনই সত্যবস্তু দেখিতে পান না। সুতরাং তর্ক আসিয়া তাহাকে খণ্ডবস্তুর ভ্রান্ত দ্রষ্টা ও খণ্ডবস্তুপ্রতীতির মিথ্যাত্ব জ্ঞান করাইয়া নিত্যসত্যজ্ঞান হইতে বিপথগামী করায়। তত্ত্ববিৎ জগৎকে 'মিথ্যা' মনে করেন না, বস্তুর বহিঃখণ্ডপ্রতীতিজন্য 'তাৎকালিক' বা 'নশ্বর' বলিয়া থাকেন। যাহাকে পরিমিত করা যায়,তাহাই মায়া-গঠিত বা সঙ্কোচ-ধর্ম্মযুক্ত। দ্রষ্টা যখনই তত্ত্ব ভুলিয়া মায়ার সাহায্যে বাহ্যবস্তুসমূহ নিরীক্ষণ করেন, তখনই জাড্য আসিয়া দৃশ্যবস্তুর নানাত্ব দেখাইয়া তাঁহাকে বিষয় ও দৃশ্যবস্তুসমূহকে আশ্রয়, অবলম্বন বা দর্শনের আধার বলিয়া মনে করায়। মায়া বা পরিমিতি-শক্তি—বস্তুরই শক্তিবিশেষ। সেই শক্তি-পরিচালিত হইয়া দ্রষ্টা দৃশ্যবস্তু নানাত্ব ও তাহাদের ভোগোপকরণত্ব দর্শন করে।

বস্তুর স্থূলত্ব-প্রসবিনী মায়া-শক্তির ক্রিয়া দ্রষ্টৃজীবের অস্মিতায় কার্য্য করিবার অবকাশ পাইলেই তাহাকে চিত্ত বা মহত্তত্ত্বরূপে পরিণত করে এবং চিত্ত পরিণত হইয়া অহঙ্কার, অহঙ্কার পরিণত হইয়া বুদ্ধি এবং বুদ্ধি পরিণত হইয়া করণপতি মনরূপে পরিণত হয়।

মায়াবাদী মায়ার আশ্রয়ে ভেদজ্ঞানযুক্ত হইয়া বলেন,—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনে বাস্তব-ভেদ নাই এবং বস্তুতে স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই। কিন্তু তত্ত্ববাদী অদ্বয়-জ্ঞানাশ্রয়ে বলেন,—তত্ত্ববস্তু ভগবানে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদিকা পূর্ণ উপাদেয় শক্তি নিত্যবিরাজমানা। তত্ত্ববাদী অদ্বয়জ্ঞানাশ্রয়ে ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে ভগবত্তা হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক্ দর্শন করেন না। তত্ত্ববাদী বাস্তব-বস্তুকে 'সচ্চিদানন্দ বিষ্ণুতত্ত্ব' বলিয়া দর্শন করেন। বিষ্ণুতত্ত্বে স্বগত নিত্যশক্তি-বৈচিত্র্যময়ী লীলা আছে এবং তৎসহ চিজ্জাতীয় জীবশক্তি-পরিণত জৈবজগতে স্বজাতীয় ও অচিচ্ছক্তি-পরিণত বহির্জ্জগতে বিজাতীয়

ভেদ দৃষ্ট হয়। বস্তু ও তচ্ছক্তি পরস্পর ভিন্ন না হইলেও অচিন্ত্যশক্তিবলে সেই বিষ্ণুতেই চিৎপ্রকাশিনী ও অচিৎসর্গ-জননীরূপে উভয় শক্তিই নিত্যবর্ত্তমানা। বেদান্তদর্শন কেবল মায়াবাদিগণের কাল্পনিক মায়িক আংশিক দর্শনমাত্র নহেন, পরন্তু বেদান্তদর্শনে চিদচিদীশ্বর বিষ্ণুতত্ত্বই স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিবলে চতুর্ব্বিধ বৈশিষ্ট্যে অবস্থিত বলিয়া দৃষ্ট হন।

শ্রুতিতে লিখিত আছে,—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।' দিব্যসূরিগণ দৃশ্যবস্তুকে সর্ব্বদাই বিষ্ণুর পরম-পদ বলিয়া দেখেন। তাঁহারা অনুপাদেয় দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন অচিদ্দর্শনে বিষ্ণুত্ব বা বস্তুত্বকে আবদ্ধ করেন না। বিষ্ণুর চিচ্ছক্তি বা অচিচ্ছক্তি-পরিণত বস্তুপ্রতীতিকে কখনও 'বিষ্ণু' বলেন না এবং বিষ্ণু-ব্যতীত তাঁহারা অন্যাধিষ্ঠানও স্বীকার করেন না। বিষ্ণুসম্বন্ধিনী উন্মুখবস্তুপ্রতীতিকে বা বস্তুসত্তাকে 'চিৎ' এবং বিষ্ণুবিমুখ বস্তুপ্রতীতিকে বা বস্তুসত্তাকে 'অচিৎ' বা 'জড়'-সংজ্ঞায় ভেদ স্বীকার করেন। এই নিত্যভেদ দর্শন করেন বলিয়া তাঁহারা যে বহ্বীশ্বর-বাদী, তাহা নহে। বৈষ্ণবগণ একেশ্বর বিষ্ণুবস্তুই দর্শন করেন;—বিষ্ণুই তদ্বস্তু এবং বৈষ্ণবগণই তদীয়। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব, যথাক্রমে নিত্যশক্তিমান্ ও শক্তি-পরিণত এবং বিষয় ও আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া নিত্যরসের আলম্বন এবং অন্যোঽন্য-সম্বন্ধময়। উভয়ের সেব্য-সেবনবৃত্তি নিত্যা, সুতরাং কালক্ষোভ্য না হওয়ায় নশ্বর বা কর্ম্মায়ত্ত নহে,—পরন্তু অনাদি। শ্রৌত-শ্রীগুরু-মুখ হ'তে অবিমিশ্রভাবে সেবাস্নিগ্ধ-শিষ্যের বিশুদ্ধ-হৃদয়-খাতে যে বাস্তব-সত্য-সুধা-সঞ্জীবনীধারা কর্ণাঞ্জলিদ্বারে সঞ্চারিত হয়, তা'ই শ্রুতি। যে গুরুপাদপদ্ম হ'তে সেবোন্মুখ স্নিগ্ধ শিষ্য সত্য লাভ করেন, সেই গুরুপাদপদ্ম যদি নিত্য ও শ্রৌত না হ'ন অর্থাৎ আমার গুরুদেব যদি তাঁ'র শ্রৌত গুরুদেবের নিকট নিত্যসত্য শ্রবণ না ক'রে থাকেন এবং সেই গুরুদেব যদি তদ্রূপ শ্রৌত ও নিত্য না হন, তা' হ'লে সেইরূপ সাময়িক গুরু-শিষ্য-পরস্পরার অভিনয়ের মধ্যে কখনই শ্রুতি আপনাকে প্রকাশিত করেন না,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"

'পরাভক্তি'-শব্দে অন্যাভিলাষরহিতা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির আবরণনির্ম্মুক্তা আনুকূল্যে-কৃষ্ণানুশীলনময়ী অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা শুদ্ধাভক্তি। মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পূর্ব্বপুরুষ,—ইঁহারা লৌকিক গুরু হ'লেও কালক্ষোভ্য হওয়ায় ইঁহাদের নিত্যত্ব নাই। পাঠশালার গুরু মহাশয়, বাদ্য-শিক্ষা দিবার গুরুমহাশয়, ইঁহারা 'গুরু' নামে পরিচিত হ'লেও ইঁহাদের 'গুরুত্ব' সার্ব্বকালিক বা নিত্য নয়। আবার উপায় ও উপেয়-ভেদবাদী জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি যে সকল গুরু স্বীকার ক'রে থাকেন, তাঁ'দেরও নিত্যত্ব নেই। ত্রিপুটীবিনাশে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ থাকে না, যোগসিদ্ধিতে

কৈবল্যলাভের পর গুরু-সেবার প্রয়োজন বোধ হয় না; সুতরাং সেইরূপ তাৎকালিক বা ক্ষণিক গুরু-স্বীকারবাদে পরা ভক্তি নেই। দেবতা যেরূপ নিত্য, গুরুও তদ্রূপ নিত্য। 'দেবতা' শব্দে—অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণ। শ্রীগুরুদেব সেই কৃষ্ণস্বরূপ—কৃষ্ণ হ'তে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

নিখিল শাস্ত্র যাঁকে সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণস্বরূপ' ব'লে কীর্ত্তন ক'রেছেন এবং সাধুগণও যাঁকে সেইরূপেই চিন্তা ক'রে থাকেন, তথাপি যিনি মহাপ্রভুর একান্ত প্রেষ্ঠ, আমি ভগবানের সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

গৌড়ীয়-দর্শনে গুরুতত্ত্বের বিচার এরূপ। সুতরাং গৌড়ীয়গণ গুরুদেব ও কৃষ্ণে নিত্য-অভিন্ন-বুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবে পরা ভক্তিযুক্ত। এই পরা ভক্তি-বৃত্তি যাঁ'তে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, তাঁ'রই কর্ণে শ্রীগুরুমুখ-নিঃসৃত শ্রৌতবাণী পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হয়। হরিসেবারহিত চেষ্টা, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদির আবরণ-আবর্জ্জনার কর্ণ-মলে কর্ণপুট অবরুদ্ধ থাক্‌লে তা'তে শ্রুতি সঞ্চারিত হ'তে পারে না। সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবিষ্টমান পরব্যোমাতীর্ণ নিত্য শব্দপরম্পরাকে 'শ্রুতি' বলা যায়।

শব্দ দুই প্রকার---নিত্য ও অনিত্য। মহর্ষি পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ স্ফোটাত্মকরূপে শব্দের নিত্যত্ব এবং বর্ণাত্মকরূপে শব্দের অনিত্যত্ব বিচার করেন। পতঞ্জলির মতও—পাণিনির অনুরূপ।

পাণিনি স্ফোটকে জগন্নিদান নিত্য শব্দ এবং সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম ব'লেছেন—"জগন্নিদানং স্ফোটাখ্যো নিরবয়বো নিত্যঃ শব্দো ব্রহ্মৈবেতি।"

ব্রহ্মকাণ্ডে—

"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
নিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।।"

শ্রীহরি স্বয়ং ব্রহ্মকাণ্ডে ব'লেছেন, শব্দতত্ত্ব অনাদিনিধন ও অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ। ইহা হ'তেই জগতের প্রক্রিয়া হ'য়ে থাকে।

জিজ্ঞাস্য হ'তে পারে, অর্থপ্রত্যয় সমুৎপাদন করে কে? ব্যস্ত (বিভক্ত বা পৃথক্‌কৃত) বর্ণ অথবা সমস্ত (সমুদায়) বর্ণ? মহর্ষি পাণিনি বলেন, ব্যস্তবর্ণ অথবা সমস্তবর্ণ কোনটিই অর্থ-প্রতীতি-উৎপাদনে সমর্থ নহে। কেন না, ব্যস্তবর্ণ হ'তে অর্থাৎ পৃথক্‌কৃত বর্ণ হ'তে অর্থ প্রত্যয় সম্ভবপরই হ'তে পারে না। যেমন 'ভক্ষণ'—এস্থানে 'ভ', 'ক', 'ষ', ও 'ণ' দ্বারা পৃথগ্‌রূপে ভক্ষণ-ক্রিয়া-বিষয়ক কিছুমাত্র অর্থ-প্রতীতি হয় না। আর বর্ণসকল যখন ক্ষণিক, তখন তা'দের সমূহও অসম্ভব। 'ভ', 'ক', 'ষ', এবং 'ণ'—এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের নাদ একটীর পর আর একটী লয় প্রাপ্ত হ'য়ে যাওয়ায় উহাদের চার্‌টীর একত্র

অবস্থান হ'য়ে কমলপত্র-শতবেধন্যায়-বিচারে অর্থবোধ-জন্মান অসম্ভব। আবার ব্যাস ও সমাস উভয়ের দ্বারা অন্য প্রকারও সাধিত হ'তে পারে না। এ কারণে বর্ণসকলের স্ফোটবিচ্ছিন্ন স্বতঃসিদ্ধ-বাচকত্ব অনুপপন্ন হয়। সুতরাং যা'র বলে অর্থ-প্রতীতি সমুৎপন্ন হয়, তাকেই স্ফোট' বলে,—

তস্মাদ্বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্বলার্থপ্রতিপত্তিঃ স স্ফোট ইতি বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যোঽর্থপ্রত্যায়কো নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোট ইতি তদ্বিদো বদন্তি। অতএব স্ফুট্যতে ব্যজ্যতে বর্ণৈরিতি স্ফোটো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যঃ স্ফুটীভবত্যস্মাদর্থ ইতি স্ফোটোঽর্থপ্রত্যায়ক ইতি স্ফোটশব্দার্থমুভয়থা নিরাহুঃ।।

অর্থাৎ বর্ণসকলের বাচকত্ব অনুপপন্ন হওয়ায় যা'র বলে অর্থ-প্রতীতি সমুৎপাদিত হয়, তা'কেই 'স্ফোট' বলে। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ব'লে থাকেন, বর্ণাতিরিক্ত বর্ণাভিব্যঙ্গ অর্থ-প্রত্যয়-সমুদ্ভাবক নিত্যশব্দই স্ফোট'-পদবাচ্য। বর্ণাভিব্যঙ্গ----বর্ণের দ্বারা 'অভিব্যঙ্গ' অর্থাৎ 'অভি' সর্ব্বতোভাবে ব্যক্ত বা স্ফুটিত হয় ব'লে ইহার নাম 'স্ফোট'। আর ইহা হ'তে স্ফুটিত হয় ব'লে ইহাকে অর্থ-প্রত্যয়-সমুদ্ভাবক ' স্ফোট' বলা হয়। এইরূপে উভয় প্রকারে স্ফোট-শব্দার্থ নিরুক্ত হ'য়েছে।

পতঞ্জলি, কৈয়ট প্রভৃতিও স্ফোটের বিচার প্রদর্শন ক'রেছন। মীমাংসা শ্লোকবার্ত্তিকের ভট্টাচার্য্যগণও স্ফোটবাদের আলোচনা ক'রেছেন। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহকার স্ফোটবাদের যে আলোচনা প্রদর্শন ক'রেছেন, তা'তে সংক্ষেপে এই বলা যেতে পারে যে, পাণিনিপ্রমুখ বৈয়াকরণ-স্ফোটবাদিগণ বলেছেন, স্ফোট না থাক্‌লে কেবল বর্ণাত্মক শব্দের দ্বারা অর্থ বোধ হ'ত না। যেমন 'অ', 'গ', 'ন' ও 'ই'—এই চার্‌টী বর্ণস্বরূপ যে 'অগ্নি' শব্দ, তদ্দ্বারা বহ্নির বোধ হয়; কিন্তু ঐ বোধ কেবল চার্‌টী বর্ণের দ্বারা সম্পাদিত হ'তে পারে না। যদি এই চার্‌টী বর্ণের প্রত্যেক বর্ণের দ্বারাই বহ্নির বোধ হ'ত, তা' হলে কেবল অকার কিম্বা গকার উচ্চারণ কর্‌লেও বহ্নির বোধ হয় না কেন? যদি কেউ বলেন, ঐ চারটী বর্ণ একত্রিত হ'য়ে বহ্নির বোধ জন্মিয়ে দেয়। এখানে স্ফোটবাদিগণ বলেন যে, এরূপ যুক্তি একটা বাল-কোলাহল মাত্র; কেন না, বর্ণসকল আশুবিনাশী। পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণসকল বিনষ্ট হ'য়ে যায়; কাজেই অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, তাদের একত্র অবস্থানই সম্ভবপর হয় না। অতএব ঐ চারটী বর্ণের দ্বারা প্রথমতঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্ফুটতা জন্মে, পরে স্ফুট স্ফোট দ্বারা বহ্নির বোধ হয়।

এস্থানে কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে পূর্ব্বপক্ষ ক'রে থাকেন, প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার কর্‌তে হ'লে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা অর্থবোধস্থলীয় দোষ ঘটে। আর সমুদয় বর্ণের দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করলে

সেই দোষই উৎপন্ন হয়। কাজেই উভয়-পক্ষেই যখন এরূপ দোষ জাগরূক র'য়েছে, তখন স্ফোটবাদ আবাহনের আবশ্যকতা কি?

স্ফোটবাদিগণ এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলেন, যেমন একবারমাত্র পাঠের দ্বারাই স্বাধ্যায় অবধারিত হয় না, কিন্তু বারংবার আলোচনা বা অভ্যাসের দ্বারাই পাঠ্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য দৃঢ়রূপে অবধারিত হয়, তেমনি প্রথমবর্ণ 'অ' কার দ্বারা স্ফোটের কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুটতা জন্মালেও পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা ক্রমশঃ স্ফুটতর স্ফুটতম হ'য়ে স্ফোট বহ্নির বোধক হয়। কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুট হ'লেই যে স্ফোট অর্থবোধক হ'বে, এরূপ নয়। যেমন, রত্নতত্ত্ব প্রথম প্রতীতিতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু চরমে চিত্তে যথাবৎ অভিব্যক্ত হয়, তেমনি প্রথমে নাদ দ্বারা বীজ আহিত হয়, পরে অন্ত্য-ধ্বনির সঙ্গে আবৃত্তির পরিপাক হ'লে বুদ্ধিতে শব্দ অবধারিত হ'য়ে থাকে। পতঞ্জলি বলেন,—

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ প্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্।।
(পাতঞ্জল সূঃ ৩য় অঃ ১৭ সূত্র)

ভাষ্যতাৎপর্য্য—বর্ণসমূহ এককালে উৎপত্তিশীল না হওয়ায় অর্থ-প্রতিপাদনে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হ'তে পারে না। তা'রা পদকে স্পর্শ না ক'রে, তা'কে প্রকাশিত না করেই (অর্থাৎ তা'র প্রকাশের পূর্ব্বেই) আবির্ভূত ও তিরোহিত হ'য়ে থাকে, অতএব তা'রা প্রত্যেকে পদ স্বরূপে গণ্য হয় না। পরন্তু তা'রা প্রত্যেকেই পদাত্মক এবং যাবতীয় অর্থপ্রকাশক শক্তিবিশিষ্ট ব'লে সহকারী অন্যান্য বর্ণ-সমূহের সহিত বিভিন্নক্রমে সংযুক্ত ও বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হ'য়ে বিভিন্নার্থ-প্রতিপাদক হ'লেও পূর্ব্ববর্ণ পরবর্ত্তী বর্ণের দ্বারা এবং পরবর্ত্তী বর্ণ পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ দ্বারা কোন নিয়তরূপে নিয়তার্থ-বিশেষেই স্থাপিত রয়েছে। এইরূপে ক্রমানুরোধে মিলিত বহুবর্ণ কোন বিশেষ-অর্থের সূচকরূপেই নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে থাকে। যেমন 'গ' কার, 'ঔ'কার এবং বিসর্গ বর্ণ প্রত্যেকে সর্ব্বার্থপ্রকাশশক্তিসম্পন্ন হ'য়েই কোন নির্দ্দিষ্ট-ক্রমে সজ্জিত হ'য়ে ' গৌঃ' ইত্যাকার পদরূপে সাস্নাদিবিশিষ্ট (গলকম্বলাদিযুক্ত) প্রাণিবিশেষেরই প্রকাশক হ'য়ে থাকে। অতএব ঐ বর্ণসকলের উচ্চারণের পর (বিনাশ হ'লেও) অর্থপ্রকাশকরূপে নিয়ত ঐ বর্ণসকলের উচ্চারণ-ক্রমসমূহ স্মৃতিবলে একত্র সংগৃহীত হ'লে যে একটী বুদ্ধির প্রকাশ পায়, উহাই 'পদ' (স্ফোট) নামে অভিহিত এবং উহাই বাচ্যবস্তুর বাচকরূপে নিয়ত হ'য়ে থাকে।

জৈমিনী শব্দের নিত্যত্ব-স্থাপনের যুক্তি প্রদর্শন ক'রে ব'লেছেন,—"নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।" (১।১।১৮)

শব্দের কেন নিত্যত্ব স্বীকৃত হ'বে? জৈমিনী তা'র কারণ নির্দ্দেশ করছেন—শব্দকে 'নিত্য' ব'লেই স্বীকার করতে হ'বে; কেন না, উচ্চারণের দ্বারা পূর্ব্বাবগত শব্দই পরের

বোধ জন্মাবার হেতুস্বরূপ হয়। শব্দ ত পূর্ব্ব হ'তেই আছে। শব্দ পূর্ব্বাবধি বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে কোন একটী বিশেষ অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হ'য়ে র'য়েছে। বক্তার বুদ্ধিতে প্রথমে তা' দৃষ্ট হ'লে তদ্‌ব্যঞ্জক ধ্বনি বক্তার দ্বারা উচ্চারিত হয়। পরে শ্রোতাও সেই ধ্বনি দ্বারা প্রবুদ্ধ হ'য়ে সেই স্ফোট হ'তে শব্দের অর্থ বোধ করেন। কাজেই 'স্ফোট' শব্দটী ধ্বনি হ'তে ব্যতিরিক্ত। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যেতে পারে,—আলোক ও দৃষ্টিশক্তিসাহায্যে একটী বস্তু এখন আমার দর্শনের বিষয় হ'য়েছে ব'লে সেই বস্তুটীকে তৎকালেই যেমন আলোকের দ্বারা উৎপন্ন বস্তু বলা যাবে না, তেম্‌নি শব্দও উচ্চারণ-ক্রিয়াসাহায্যে এখন বুদ্ধিতে আরূঢ় হ'লো ব'লে শব্দকে উচ্চারণোৎপন্ন ধ্বনি বলা যাবে না; উহা ধ্বনি নিরপেক্ষ একটী সদ্‌বস্তু, কাজেই শব্দ—নিত্য।

সাংখ্য বৈয়াকরণগণের স্ফোটবাদ নিরাস ক'রেছেন,—

"প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ।।" (৫।৫৭)

অর্থাৎ বর্ণসমূহ উচ্চারণের পর তৃতীয় ক্ষণেই বিনাশশীল ব'লে তা'দের মিলিতভাবে শব্দরূপে কোন অর্থ-প্রতিপাদনের সামর্থ্য না থাকায় পতঞ্জলি প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ শব্দকে বর্ণাত্মকরূপে স্বীকার করেন না। পরন্তু ঐ বর্ণসমূহের উচ্চারণ-প্রকাশিত 'স্ফোট' নামক কোন অতিরিক্ত পদার্থই—শব্দের স্বরূপ এবং উহাকেই তাঁ'রা অর্থপ্রতিপাদকরূপে কল্পনা ক'রে থাকেন। তাঁ'দের উক্ত মত খণ্ডনের জন্য সাংখ্যকার এই সূত্রে ব'ল্‌ছেন যে,—তোমরা অর্থের প্রতীতিজনকরূপে যে স্ফোট পদার্থের স্বীকার করছ, উহা স্বয়ং প্রতীত হয় কি না? যদি বল প্রতীত হয়, তা' হ'লে যে-সকল বর্ণের উচ্চারণ হ'তে তার প্রতীতি হয়, সেইসকল বর্ণের উচ্চারণ হ'তে অর্থের প্রতীতিও জন্মিতে পারে, মধ্যবর্ত্তী 'স্ফোট' নামক অতিরিক্ত পদার্থের কল্পনা আবশ্যক হয় না। পক্ষান্তরে, যদি বল, স্ফোট-পদার্থ স্বয়ং প্রতীত না হ'য়েই অর্থের প্রতীতিজনক হয়, তা'হলে বক্তব্য এই যে, কোন বস্তু স্বয়ং অপ্রতীত হ'য়ে অপরের প্রতীতি-জননে সমর্থ হয় না। অতএব প্রতীতি এবং অপ্রতীতি—উভয়কল্প-বিচারেই স্ফোটের সাধন অসম্ভবপর ব'লে শব্দ স্ফোটাত্মক নহে।

কোন কোন আচার্য্য আন্তর-স্ফোট ও বহিঃস্ফোট বিচার ক'রেছেন। তাঁহারা বলেন,—

"ততোঽভুত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।।"

অর্থাৎ অনন্তর সেই নাদ হ'তে অব্যক্তপ্রভব স্বতঃ হৃদয়ে প্রকাশমান ত্রিমাত্র অর্থাৎ কণ্ঠ-ওষ্ঠাদি দ্বারা উচ্চার্য্যমান অথবা 'ত্রিবৃৎ' শব্দে 'অ' কার, 'উ'কার ও 'ম' কারাত্মক ওঁকার উৎপন্ন হ'লো। এই ওঁকার—পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবানের বোধদ্বার বা অবয়বস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রমাণানুসারে প্রণবাত্মক বর্ণসমূহের নিত্যত্ব প্রমাণিত হ'চ্ছে। আকাশের নিত্যদ্রব্যত্বহেতু তদ্‌গুণস্বরূপ শব্দেরও নিত্যত্ব যুক্তিসিদ্ধ। বায়ুর প্রেরণ ও অপ্রেরণ-বশতঃই যখন শব্দের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে, তখন শব্দ—নিত্য পদার্থ। অন্তঃকরণে উপলভ্যমান এই নিত্যবর্ণই আন্তরস্ফোট। শব্দার্থ যদি অন্তরে উপলভ্যমান হয়, তা' হলে তাহা আন্তর-স্ফোটবাচ্য। সেখানে যে শব্দস্ফোট, তাহাই শব্দব্রহ্ম। এই আন্তরস্ফোট—নিরংশ, বর্ণের সহিত অভিন্ন নিত্যজ্ঞান-স্বরূপ ও শব্দার্থময়। এই মতে প্রণব হ'তেই নিখিল বেদের আবির্ভাব। অন্তরে উপলভ্যমানত্ব হেতু সেই প্রণব আন্তরস্ফোট অর্থাৎ অব্যক্ত উদাহরণ স্বরূপ। ইঁহারা বলেন,—

"জাতান্ধমূকবধিরস্যান্তঃস্বীয়পরামৃশি।
স্ববাক্‌শব্দার্থয়োর্বোধ আন্তরস্ফোট এব সঃ।।"

যা'রা জন্মাবধি অন্ধ, মূক বা বধির, তা'দের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অভাব থাকার দরুণ অন্তঃকরণে স্বতঃই শব্দার্থের পরামর্শ ঘটে এবং ত'াদের বাক্য ও শব্দার্থের বোধও জ'ন্মে থাকে, ইহাঁই আন্তরস্ফোট।

বৈয়াকরণগণ শাব্দবোধের প্রতি বহিঃস্ফোটকেই কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন। তাঁ'দিগের বিচারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণোচ্চারণে যে সংস্কার অভিব্যক্ত হয়, তত্তৎ সংস্কার-সহকৃত যে চরম বর্ণসংস্কার, সেই সংস্কারনিষ্ঠ পদজন্য একপদার্থবোধজনকতাই 'পদস্ফোট'। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদের উচ্চারণে যে সংস্কার অভিব্যক্ত হয়, তত্তৎসংস্কার-সহকৃত আবার যে চরম পদসংস্কার, তৎসংস্কার নিষ্ঠ-বাক্য জন্য একবাক্য-বোধকতাই বাক্যস্ফোট। অদ্বিতীয়, নিত্য, পদাভিব্যঙ্গ্য, বাক্যাভিব্যঙ্গ্য, অখণ্ড এবং তাদৃশ অনেক পদঘটিত মহাবাক্যস্ফোটই---জাতিস্ফোট'-পদবাচ্য। এই ব্যক্তিস্ফোটের সহিত জাতিস্ফোটই মহাবাক্য-জন্য শব্দবোধের কারণ। ইহাই বৈয়াকরণগণের মত। তাঁ'রা বলেন, পদব্যুৎপাদন সময়ে স্ফোটদ্বারাই শাব্দ-বোধ হ'য়ে থাকে। এতদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অর্থাপত্তি, উভয়প্রমাণের সম্ভাবনা আছে। যেমন 'গৌঃ' উচ্চারণ করলে 'গ'কার, 'ঔ'কার ও বিসর্গ প্রতীত হয় না, গলকম্বলাদি বিশিষ্ট কোন পদার্থই প্রতীত হ'য়ে থাকে, ইহাই প্রত্যক্ষ। আর 'গ' কারাদি বর্ণসমূহ ব্যস্তভাবে ও সমস্তভাবে অর্থবোধকজনক হয় না, এর কারণও পূর্ব্বে বলা হ'য়েছে অর্থাৎ বৈয়াকরণগণ বলেন, একটী বর্ণ দ্বারাই অর্থ-প্রতীতি হ'লে অপরাপর বর্ণোচ্চারণের ব্যর্থতা হয়। আর বর্ণ যখন উৎপন্ন হ'য়েই বিনষ্ট হয়, তখন বর্ণসমূহেরও সমস্তজ্ঞান অসম্ভব। এইরূপে স্ফোটই অর্থাপত্তি প্রমাণসিদ্ধ।

"পৃথক্‌সম্বন্ধানাং সাংস্কারাণাং ক্রমেণ পরস্পরসম্বন্ধকারিত্বং স্ফোটত্বম্‌" অর্থাৎ আনুপূর্ব্বীরহিত সংস্কার-সমূহের প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণের ক্রমানুসারে পরস্পর আনুপূর্ব্বীরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট চরমবর্ণের জ্ঞানে শাব্দ-বোধের জনকতাই স্ফোটত্ব। এইরূপ

স্ফোট স্বীকার না ক'রে তত্তদ্বর্ণজ্ঞানের জন্য শাব্দাবোধস্বীকার 'রস' স্থানে 'সর' বা 'নদী' স্থানে 'দীন' এরূপ প্রতিলোম-পাঠেও রেফ-স-কারাদি বর্ণ-জন্য সংস্কারের বিদ্যমানতা-হেতু 'সর' ও 'নদী' বস্তুদ্বয়ের শব্দ বোধ হ'তে পারে। অনুলোমসংস্কারবশে যাদৃশার্থবিশিষ্ট পদ ব্যুৎপাদিত হ'বে, প্রতি-লোমোচ্চারিত সে-সকল বর্ণ কখনই তাদৃশ পদের ব্যুৎপাদক হ'তে পারে না।' যদি তাই হ'য়, তা' হলে অনুলোম ও প্রতিলোম-পদের কোন ভেদই থাকে না।

গৌড়ীয়-দার্শনিকগুরু সর্ব্বসম্বাদিনীকার শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস ক'রে বর্ণরূপ 'বেদ'-শব্দের নিত্যত্ব ও অর্থপ্রত্যায়কত্ব স্থাপন ক'রেছেন,—

তদেবং সর্ব্বস্মিন্নপি বেদাত্মকে সর্ব্বস্বার্থং প্রতি প্রামাণ্যমুপলব্ধে স কথমর্থং প্রসূত ইতি বিব্রিয়তে;—তত্র বর্ণানামাশুবিনাশিত্বান্নার্থং জনয়িতুং শক্তিঃ সম্ভবতি। ততশ্চপূর্ব্ব-পূর্ব্বাক্ষর-জন্য-সংস্কারবদন্ত্যাক্ষরস্যৈবার্থপ্রত্যায়কত্বং মন্যন্তে। তে চ সংস্কারাঃ কার্য্য-মাত্র প্রত্যায়িতাঃ অপ্রত্যক্ষত্বাৎ, সংস্কার-কার্য্যস্য স্মরণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ সমুদায়প্রত্যয়া-ভাবান্নান্ত্যব স্যাপ্যর্থপ্রত্যায়কত্বমিত্যভিপ্রেত্যাপরে তু স্ফোটমেব তৎপ্রত্যায়কমাহুঃ— "স চ বর্ণানামনেকত্বেনৈক প্রত্যয়ানুপপত্তেরেকৈক-বর্ণ প্রত্যয়াহিতসংস্কার-বীজেহন্ত্যবর্ণ-প্রত্যয়জনিতপরিপাকে প্রত্যয়িনি একপ্রত্যয়বিষয়তয়া ঝটিতি প্রত্যবভাসতে।" (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২৮ সূত্রীয় শাঙ্করভাষ্যে)

অতএব স্ফোটরূপত্বাদ্বেদস্য নিত্যত্বং তস্য প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। বেদান্তিনস্তু "বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্য" ইত্যেতং ন্যায়মনুসৃত্য 'দ্বির্গো' শব্দোহয়মুচ্চারিতঃ,—ন তু দ্বৌ গৌশব্দাবিত্যেকতৈব সর্ব্বৈঃ প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ বর্ণাত্মকানমেব শব্দানাং নিত্যত্বমঙ্গীকৃত্য তে চ বর্ণাঃ পিপীলিকা-পংক্তিবৎ ক্রমাদ্যনুগৃহীতার্থবিশেষসংবদ্ধাঃ সন্তঃ স্বব্যবহারেহপ্যেকৈকবর্ণ- গ্রহণান্তরং সমস্ত-বর্ণ-প্রত্যয়দর্শিন্যাং বুদ্ধৌ তাদৃশমেব প্রত্যবভাসমানাস্তং তমর্থমব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িস্যন্তীত্যতো বর্ণবাদিনাং লঘীয়সী কল্পনা স্যাৎ; স্ফোটবাদিনাং তু দৃষ্ট-হানিরদৃষ্টকল্পনা চ; তথা বর্ণাশ্চেমে ক্রমেণ গৃহ্যমাণাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি, স স্ফোটোহর্থং ব্যনক্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাদিতি মন্যন্তে। তদেবং বর্ণারূপাণ্যামেব বেদশব্দানাং নিত্যত্বমর্থপ্রত্যায়কত্বং চাঙ্গীকৃতম্।

এইরূপে বেদাত্মক যাবতীয় শব্দই সমস্ত স্বার্থবিষয়ে প্রামাণ্য লাভ করায় ঐ শব্দ কিরূপে অর্থপ্রকাশক হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ, আপত্তি এই যে, বর্ণসমূহ শীঘ্র বিনাশশীল অর্থাৎ তৃতীয়ক্ষণবিধ্বংসী বলিয়া অর্থ প্রতিপাদনে তাহাদের শক্তি সম্ভবপর হয় না। অতএব কেহ কেহ শব্দস্থিত পূর্ব পূর্ব অক্ষরসমূহের উচ্চারণজনিত সংস্কারের সহিত সংযুক্ত অন্ত্য অক্ষরই অর্থপ্রকাশক হয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই সেই পূর্ব পূর্ব বর্ণের উচ্চারণজনিত সংস্কার অপ্রত্যক্ষ পদার্থ বলিয়া

কেবলমাত্র অর্থপ্রকাশরূপ কার্যদ্বারাই প্রতীতির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। অপর কেহ কেহ বলেন,----পূর্ব পূর্ব বর্ণ যেরূপ ক্রমশঃ উচ্চারিত হয়, সেইরূপ তাহাদের উচ্চারণজনিত সংস্কারের কার্যস্বরূপ স্মরণও ক্রমশঃই হয়, পরন্তু এককালে হয় না। অতএব এককালে সমুদয়ের প্রতীতি না হওয়ায় তৎসহকৃত অন্ত্যবর্ণও অর্থপ্রতীতি-জনক হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা 'স্ফোট' নামক পদার্থবিশেষকেই অর্থপ্রতীতিজনকরূপে বলিয়া থাকেন।

"বর্ণ-সমূহের অনেকত্বনিবন্ধন এক প্রতীতি অসম্ভব বলিয়া এক একটি বর্ণের যে প্রতীতি, উক্ত প্রতীতিসমূহ দ্বারা যে সংস্কার উপস্থাপিত হয়, উক্ত সংস্কাররূপ বীজযুক্ত এবং অন্ত্যবর্ণের প্রতীতিজনিত পরিপাকবিশিষ্ট পুরুষে এক প্রতীতির বিষয়রূপে উক্ত স্ফোট প্রতিভাসমান হইয়া থাকে।"

অতএব স্ফোটস্বরূপ বলিয়া বেদ নিত্য, যেহেতু প্রতি বর্ণের উচ্চারণেই তাহার প্রত্যভিজ্ঞ অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব সংস্কার-জ্ঞান। বর্তমান বৈদান্তিকগণ বলেন,----"ভগবান্ উপবর্ষ বর্ণ-সমূহকেই শব্দস্বরূপ বলিয়া থাকেন"—এই নীতির অনুসরণ পূর্বক "দ্বির্গৌ" এই স্থলে এক শব্দেরই উচ্চারণ, পরন্তু দুইটি 'গৌ' শব্দের উচ্চারণ হয় নাই, যেহেতু একত্বরূপেই সমস্তের প্রত্যভিজ্ঞান হইয়াছে। অতএব বর্ণাত্মকরূপেই শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত বর্ণসমূহ পংক্তিস্থিত পিপীলিকা-সমূহের ন্যায় ক্রমশঃ অনুগৃহীত অর্থবিশেষের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া নিজব্যবহারে ও এক একটি বর্ণোচ্চারণের অনন্তর সমস্ত বর্ণের প্রতীতি-প্রকাশিনী বুদ্ধিতে অর্থবিশেষ সম্বন্ধরূপেই প্রতিভাসমান হইয়া নিয়মিতরূপে উক্ত অর্থের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। অতএব বর্ণবাদিগণের কল্পনার লাঘব হইয়া থাকে। স্ফোটবাদিগণের মতে অর্থ-প্রতীতিবিষয়ে দৃষ্টবর্ণসমূহের পরিহার-হেতু দৃষ্টহানি এবং অদৃষ্ট-স্ফোটের উপাদানহেতু অদৃষ্টকল্পনারূপ দোষদ্বয়ের উপস্থিতি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই বর্ণসকলই একবার ক্রমশঃ উচ্চারিত হইয়া স্ফোটকে প্রকাশ করে, পুনরায় ঐ স্ফোট-পদার্থ অর্থকে প্রকাশ করে, এই কল্পনাপক্ষে কল্পনা-গৌরবরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব এইরূপে বর্ণাত্মক বৈদিক শব্দসমূহেরই নিত্যত্ব এবং অর্থ-প্রতীতিজনকত্ব অঙ্গীকৃত হইল।

শাঙ্করভাষ্যে রত্নপ্রভা-টীকা, আনন্দগিরি, ভামতী, জয়ন্তভট্টকৃত ন্যায়মঞ্জরী প্রভৃতিতে স্ফোটবাদের অনেক আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁ'র অধ্যাপক-লীলায়, আচার্য-লীলায় যে অভূতপূর্ব স্ফোটবাদের বিচার প্রদর্শন ক'রেছিলেন, সেই বিচার পরমার্থ-বিজ্ঞান-বিশ্বে আর ইতঃপূর্বে এরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ তত্ত্বসন্দর্ভীয় অনুব্যাখ্যায় সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস ক'রে যে বর্ণরূপ বেদশব্দের নিত্যত্ব ও অর্থপ্রত্যায়কত্ব স্বীকার ক'রেছেন, তা' দ্বারা, শ্রীমন্মহাপ্রভু অধ্যাপক লীলায় যে স্ফোটবাদের বিদ্বদ্রূঢ়িগত বিচার প্রদর্শন ক'রেছিলেন, তাহাই

স্থাপিত হ'য়েছে। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণের অবতারণা পাণিনীয় সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস ক'রে স্ফোটবাদের বিদ্বদ্রূঢ়ি-স্থাপনাভিপ্রায়েই হ'য়েছিল। বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদ গৌড়ীয় দর্শনের সার-শিক্ষা শ্রীনামভজনেই পরিস্ফুট হ'য়েছে। শিক্ষাষ্টকে যে বিদ্যাবধূজীবন-শ্রীনামসঙ্কীর্তনের বিজয়-দুন্দুভি ঘোষিত হ'য়েছে, তা'তে বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদই পরিস্ফুট হ'য়ে পড়েছে।

বর্ণের উচ্চারণবোধক বেদাঙ্গশাস্ত্রকে 'শিক্ষা' বলে। উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরবিজ্ঞান 'শিক্ষা'-বেদাঙ্গের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু শিক্ষাষ্টক সেরূপ বেদাঙ্গমাত্র নহেন। শিক্ষাষ্টকের অন্তর্গতই নিখিল সাঙ্গবেদ। শিক্ষাষ্টকে যে শিক্ষা, তা'তে বেদাঙ্গ-শাস্ত্রের বিদ্বদ্রূঢ়িগত বিচার বেদের অঙ্গমাত্রে আবদ্ধ না থেকে সাঙ্গবেদকে ক্রোড়ীভূত ক'রে ফেলেছে। সেই শিক্ষাষ্টকে নামী হইতে অভিন্ন স্বরাট্ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহ শ্রীনামচিন্তামণি স্ফোটব্রহ্মের কথা ব্যক্ত হ'য়েছে।

বৈয়াকরণগণ বা শাব্দিকগণ স্ফোটকে বর্ণাতিরিক্ত বা বর্ণ হ'তে ভিন্ন বিচার ক'রে নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক বাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি ক'রেছেন। কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শনের শ্রীনামের বিচারে সাধারণ স্ফোটবাদের যাবতীয় সাম্প্রদায়িক বিবাদ প্রশমিত হ'য়েছে। সাধারণ স্ফোটবাদে বর্ণ ও বর্ণীতে ভেদ, কেন না, তা'দের বর্ণ বা শব্দের বিচার প্রকৃতি বা ইতরব্যোমের অন্তর্গত; কিন্তু বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদের বিচারে কোন প্রকার মায়ার ব্যবধান নাই। সেখানে বর্ণ ও বর্ণীতে, শব্দ ও শব্দীতে, বাচ্য ও বাচকত্বে কোন ভেদ নাই। সেখানে বর্ণসকলের বাচকত্ব অসম্ভাবিত নহে। কারণ, সেখানকার বর্ণ ও বর্ণী, শব্দ ও শব্দী, বাচ্য ও বাচক, উভয়েই পরব্যোমের বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট এইরূপ বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদের কথাই ব'লেছিলেন,—

> 'শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্।
> যেন বাগ্ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ।।
> স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
> স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্।।"
>
> (ভাঃ ১২।৬।৪০-৪১)

যে সময় আচ্ছাদনাদি হেতু শ্রবণেন্দ্রিয় বৃত্তিশূন্য হইয়া থাকে, সেই সময় ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্য ব্যতীত স্বাভাবিক জ্ঞানশালী যে-পুরুষ স্ফোট অর্থাৎ অব্যক্ত ওঁকারধ্বনি শ্রবণ ক'রে থাকেন, তিনিই পরমাত্মা। ঐ স্ফোট দ্বারাই বৃহতী-সংজ্ঞক বাক্যের প্রকাশ হয় এবং ঐ স্ফোট স্বয়ং হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট হ'তে প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। ঐ স্ফোট নিজের কারণস্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাদ্বাচক এবং উহাই যাবতীয় মন্ত্রসমূহের রহস্য ও বেদসমূহের সনাতন বীজস্বরূপ।

স্ফোট-ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ বাচক। সাধারণ বিচারে 'স্ফোট' শব্দে—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ক্ষুদ্রত্বের পর পর বিচারে উন্নত দর্শনমাত্র। বৃহত্ত্ববোধক বিচার জ্ঞাপন করবার জন্য 'ব্রহ্ম' বলা হচ্ছে। ক্ষুদ্রতা পরিহার ক'রে 'ব্রহ্ম' শব্দের অবতারণায় বৃহত্ত্ববাচক স্ফোটবাদের বিচার। হৈরণ্যগর্ভগণ বলেন,—সেই বিচারটি পরমাত্মাতে আবদ্ধ। সেইরূপ বিষয়টা এরূপভাবে বিচারগ্রাহ্য নহে। 'নব' ও 'বন' শব্দের সাম্য-বিচারে শব্দার্থের বিচার হয়। 'নদী', 'দীন', 'সর', 'রস' প্রভৃতি শব্দের বিন্যাসের বৈপরীত্যহিসাবে উদ্দিষ্ট বস্তুর ভেদ লক্ষিত হয়। সেই সকল শব্দের ন্যায় 'ব্রহ্ম'-শব্দ নয়। মনোধর্মচালিত হ'য়ে 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গেলে শব্দের সত্যার্থ প্রকাশিত হয় না। গুরুপাদাশ্রিতের নিকট তাহা স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

স্ফোটের বিচার সমৃদ্ধ হ'য়ে রূঢ়ি প্রকাশিত হয়। রূঢ়ি তিন প্রকার—অজ্ঞরূঢ়ি, সাধারণরূঢ়ি ও বিদ্বদ্‌রূঢ়ি। বিদ্বদ্‌রূঢ়ি অদ্বয়জ্ঞানকে লক্ষ্য করে, সাধারণরূঢ়ি ব্যবহারিক পরিভাষাগত বস্তুর ধারণায় বুদ্ধিবৃত্তিকে আবদ্ধ করে, অজ্ঞরূঢ়ি তাহা অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণতা পোষণ ক'রে ব্যবহারজগতে রজস্তমোগুণেরও মর্যাদা স্থাপন করে—জীবের বিভিন্ন প্রতীতির জন্য এই সকল কথা এসে উপস্থিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে স্ফোটবাদের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি পরব্রহ্ম-বস্তুকে লক্ষ্য করে। সেখানে স্ফোট কেবল বাচকমাত্র নহে, তাহাতে বাচ্যের বিচারও পরিস্ফুট, তখন আমরা জানি,—নাম ও নামী অভিন্ন।

যাহার প্রতিকূলে অপর কেহ তর্কবাদ অবলম্বন ক'রে তাহার বাস্তবতাকে প্রতিহত করতে পারে না, তাহাই শ্রৌতপন্থা। স্থূলসূক্ষ্মাকারে যদি শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি চেতনের নিকট আবৃত হয়, তা'হলেই স্ফোটের কদর্থ হ'য়ে থাকে, তখন শব্দ ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন বস্তুর অভিজ্ঞান উপস্থিত করে। শব্দ গীত হ'য়ে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হ'ল বটে; কিন্তু চিদাকাশে বিচরণশীল বাস্তবকর্ণে প্রবেশ করবার অবকাশ পেলো না। তা'তে শব্দের বাস্তব বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হ'তে না পারায় পরিছিন্ন, সঙ্কীর্ণ, বিকৃত ও বিবর্ত্তগ্রস্ত জ্ঞানে স্ফোটকে আবৃত ক'রে ফেল্‌লে।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভৃতি গৌড়ীয় দার্শনিক গুরুগণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে এইরূপ স্ফোটের বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন;—মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক—স্ফোটবিচারেরই পরিস্ফুট বিজ্ঞান। মহাপ্রভু অতি অল্পাক্ষরে স্ফোটের বিচার ব'লেছেন,—

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

হরি সর্বদা কীর্ত্তনীয়। যা'তে অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত হয়, সেরূপ শব্দ দ্বারা লোককে আচ্ছন্ন হওয়ার উপদেশ মহাপ্রভু দেন নি। বিদ্বদ্‌রূঢ়ি-বৃত্তিতে প্রত্যেক শব্দ বিষ্ণু-বাচক—পরব্রহ্ম-বাচক। প্রত্যেক শব্দে স্ফোটধর্ম হ'তে বিদ্বদ্‌রূঢ়ি প্রকাশিত। মহান্ত

গুরুর দ্বারা কর্ণবেধসংস্কার হ'লে—দিব্যজ্ঞান লাভ হ'লে স্ফোটধর্মগত বিদ্বদ্‌রূঢ়ি প্রকাশিত হয়। রূঢ়িবৃত্তি শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ করে। অজ্ঞ ও সাধারণ-রূঢ়িতে বাচ্য-বাচক ও শব্দ-শব্দীতে ভেদ থাকায় সেখানে পৌত্তলিকতা বা প্রাকৃত-সাহজিকবাদ উপস্থিত হয়; কিন্তু বিদ্বদ্‌রূঢ়িতে বাচ্য-বাচকে আবরণ না থাকায় সেখানে পৌত্তলিকতার কোন স্থান নাই। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ষট্‌সন্দর্ভে, শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভুদ্বয় ভাগবতামৃত প্রভৃতিতে এবং গৌড়ীয় দার্শনিকগণ সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত এই বিচার বিশেষভাবে প্রদর্শন ক'রেছেন।

যখন কোন একটা বস্তু আকারবিশিষ্ট না হয়, তখন আমাদের দর্শনের বিষয় হয় না। কেবল নিরাকারের ধারণা অবাস্তব দার্শনিকগণের আকাশের পশ্চাদ্ভূমিকার কল্পনা মাত্র। যে বস্তু কিছুক্ষণ স্থূল-সূক্ষ্ম আকার সংরক্ষণ ক'রে নিত্য চিদাকার সংরক্ষণ কর্‌তে পারে না, সে বস্তু অবাস্তব কল্পনামাত্র, তাহা কখনও সচ্চিদানন্দবস্তু নয়। গৌড়ীয়-দর্শনে যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্বকারণকারণ পরমেশ্বর-বস্তুর কথা বলা হ'য়েছে, তাহা নিত্য চিদাকারবিগ্রহ। তাহাই বাস্তব দার্শনিকগণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তাহাই স্ফোটের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি দ্বারা গুরুপাদাশ্রিত বিদ্বজ্জনগণেরর শ্রুতিতে ও বাণীতে শব্দার্চ্চাকারে প্রকাশিত।

গৌড়ীয়-দর্শনের গোড়ার কথা—'কর্ম' ও 'লীলা'তে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। কর্ম—বহির্ম্মুখ-জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য, লীলা—সেবোন্মুখ-চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা ভোগ্য-জড়ের ন্যায় বুঝে নিতে পারা যায়, লীলা এরূপ কোন কার্য প্রকাশ করে না। মনের দ্বারা জড়ের যে আকার ধারণা কর্‌তে পারা যায়, তাহা বস্তুর বাস্তব আকারের সহিত ভেদ স্থাপন করে। কিন্তু শব্দ এই দুর্ভেদ্যদুর্গ দেহ ও মন ভেদ ক'রে চেতনের সন্ধিনীভূমিকায় প্রকাশিত হয়। বিদ্বদ্‌রূঢ়িতে সেই শব্দ সাক্ষাৎ বিগ্রহবান্ হরিরূপে গৌড়ীয়-দার্শনিকের দর্শনের বিষয় হয়।

সর্বত্রই এই হরির গান আছে;—যে সকলকে ইংরেজী পরিভাষায় Scripture বলা হয়—যাকে 'শাস্ত্র' বলা হয়—'বেদ', 'ভাগবত', 'পুরাণ' বলা হয়, সে সকলের মধ্যেই হরির কথা বর্ণিত আছে,—

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে।।"

লীলার ভাষায় বেদাদিতে 'হরি' শব্দের অবতারণা। গীতার উদ্দিষ্ট কৃষ্ণতত্ত্ব বিদ্বদ্‌রূঢ়িগত বিচারে না বুঝতে পেরে অনেকে তা'তে স্বকপোল কল্পনা বা মনোধর্ম্মের আবরণ এনে ফেল্‌ছে। গৌড়ীয়-দর্শন শাস্ত্রকে ঐরূপ মনোধর্ম দ্বারা আচ্ছন্ন কর্‌বার পক্ষপাতী নহেন, উহাতে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি হ'লো না। কৃষ্ণতত্ত্ব কর্মান্তর্গত নহে। যাহা স্বরাট্—যাহা সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র—যাহা একমাত্র স্বেচ্ছাময়, তাহা কর্মের অধীন

হ'তে পারে না। গৌড়ীয়-দর্শন এই চরম সত্য কথা—পরম সত্যের স্বেচ্ছাময়ত্ব, লীলাময়ত্ব দর্শন ক'রে থাকেন,—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।।

শ্রীমদ্ভাগবত এই গৌড়ীয়-দর্শনের ভাষ্যগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে যে নৈষ্কর্ম্যবাদ আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তাহা কর্মবাদগর্হণকারী কেবলাদ্বৈতবাদমাত্রকে লক্ষ্য করে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।।

ভক্তির বিচার অবলম্বন না করা পর্য্যন্ত কর্ম-জ্ঞান-যোগাদির জাগতিক ও অসম্যক্ বিচারের হাত হ'তে কিছুতেই অবসর পাওয়া যায় না। মনোধর্ম ও দেহধর্ম নানা প্রকার ধর্মের আবাহন ক'রেছে। সেই সকল ধর্মের ধারণা ও কর্ত্তব্যতা হৃদয়ে সমারূঢ় থাকা কাল পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-দর্শনের অনাবিল সাম্রাজ্যে প্রবেশলাভ ঘটে না। সমস্ত জগৎ যে সকল কথায় ব্যস্ত র'য়েছে, গৌড়ীয়-দার্শনিক সে সকল কথার জন্য অধিক সময় দেন না,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।

একমাত্র স্ফোটাকারে শব্দরূপে আবির্ভূত হ'য়েছেন যে অদ্বয়জ্ঞান—স্বতঃসিদ্ধ কথা, সদা তা'র আলোচনা হউক। একবার নয়, দু'বার নয়, বিশ্রান্ত নয়, প্রতিহতভাবে নয়, নিত্যকাল অবিশ্রান্ত, অপ্রতিহতভাবে সেই স্ফোট, ব্রহ্মের—ভগবন্নামের আলোচনা হউক।

সেই শব্দ হৃদয়-কর্ণকে রসযুক্ত করে। স্বরূপোপলব্ধিক্রমে সেবোন্মুখ কর্ণে সাধুর প্রসঙ্গযোগে হৃৎকর্ণ রসযুক্ত হয়। সাধুর সঙ্গ আরম্ভ ক'র্‌লেন যাঁ'রা, তাঁরা অন্য কার্য্যে সময় দিতে পারেন না, সর্বচিদিন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশকে আকর্ষণ করেন এবং নিজেও প্রকৃতির বাস্তব-বিষয় অপ্রাকৃত হৃষীকেশের আকর্ষণে আকৃষ্ট হন, ইহাই হ'লো—লীলায় প্রবেশ।

মুক্তির পথে আবদ্ধ থাকবার যে বিচার-প্রণালী, তা' হ'তে মুক্ত হ'য়ে—কাল্পনিক মুক্তি—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হ'তে মুক্ত হ'য়ে পরম মুক্তগণের উপাস্য লীলাপুরুষোত্তমের

নাম-রূপ-গুণ-লীলায় প্রবেশ ঘটে সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'তে। তখন আর কর্ত্তৃসত্তাগত বা কর্মসত্তাগত বিচারে আবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌তে হয় না। তখনই শ্রুতিগত শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়িবৃত্তি আমাদের অধিগত হ'য়ে থাকে। ইন্দ্রিয় দ্বারা—চক্ষু-নাসা-দ্বারা—মানসিক পর্য্যালোচনা দ্বারা শব্দের যে অর্থবিচার, তা' অচিদ্‌বিলাস। ঐ সকল ইন্দ্রিয়-পরিচালনা—ভোগ মাত্র। বহির্জগতের অর্থ আমাদিগকে শ্রৌতপথ হ'তে বিচলিত করে—বাস্তব সত্য হ'তে ভ্রষ্ট করে; সে প্রণালীতে আমরা পরমেশ্বরের সন্ধান পাই না। ভূতাকাশের শব্দ স্ফোটাকার ধারণ ক'রেছে দেখে সেই জিনিষটাকে যদি বলি 'ব্রহ্ম', তা'হলে সেইরূপ ধরণের analogy draw (সাদৃশ্য অনুমান) ক'রে সত্যবিষয়ের অভিজ্ঞান নাও হ'তে পারে। কর্ম্মের বিচার কখনই সুষ্ঠু নহে। জ্ঞানও—খণ্ডজ্ঞান ও অখণ্ডজ্ঞান; সমগ্র জ্ঞান নহে। কর্মত্যাগ না কর্‌লে জ্ঞানে প্রবেশ হয় না; আবার জ্ঞানের দ্বারা অতন্নিরসনই হ'তে পারে। কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে জীবের সেবাপথ আবিষ্কৃত হয়। অতন্নিরসনে 'তৎ' নির্দিষ্ট হয়, সেই তদ্বস্তু যখন আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন, তখনই সেই স্ফোটাকার 'ওঁ তৎ সৎ'এর স্বরূপ আমাদের নির্মল চেতনবৃত্তিতে প্রকাশিত হয়,—

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ গুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।"

ভগবানের কৃপা হ'লে তিনি শব্দরূপে এসে উপস্থিত হন। তিনি রূপধৃক, গুণময়, লীলাময়, পরিজনপরিবেষ্টিত, তাঁ'র ধাম আছে, এই জগৎ তাঁ'রই নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের বিকৃত হেয় প্রতিফলন। সেই শ্রীহরিই কৃপা ক'রে—'তিনি কিরূপ আকারের হরি, কি রকম রং-এর হরি;—সকলই চেতনের বৃত্তিতে প্রকাশিত ক'রে দেন।

গৌড়ীয়-দর্শনে পূর্ণবস্তু দর্শন করা যায়, কর্তৃত্বাভিমান নিয়ে যে-সকল দর্শনের প্রচেষ্টা, তা'তে ভগবদ্দর্শন হয় না। শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারে আমরাবিবর্ত্তবাদ ছেড়ে দিতে পারি। নির্বিশেষ বিচারটা কিছু খারাপ নয়, কারণ, জড় বিশেষটা—পৌত্তলিকতা। জড়বিশেষরহিত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু জড়বিশেষরহিত অবস্থাটাই শেষ বা চরম কথা নয়। জড়বিশেষকে অতিক্রম ক'রে নিত্য চিদ্‌বিশেষের রাজ্যে উপনীত হওয়াই—চেতনের স্বভাবে আগমন।

যাঁ'রা 'সাকারবাদ', 'নিরাকারবাদ' বা 'নির্গুণবাদ' কথাগুলি নিয়ে মারামারি করছেন, তাঁ'রা যদি গৌড়ীয়দর্শনের সুসম্যক্‌ বিচার পরিদর্শন করেন, তা'হলে ঐরূপ একদেশ-দর্শিতা ও সাম্প্রদায়িক বিবাদ হ'তে নিরস্ত হ'তে পারেন। গৌড়ীয়-দর্শন একদেশদর্শী জড়সাকারবাদীকে সমর্থন করে না, কিম্বা একদেশদর্শী নির্গুণবাদীকেও প্রশ্রয় দেয় না। গৌড়ীয়-দর্শনের সাকারবাদ জড়সাকারবাদ নহে, উহা জড়সাকারবাদ নিরাস ক'রে

অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন, সচ্চিদানন্দবিগ্রহের নিরাকার আকার বা সূক্ষ্ম ভূতাকাশময় আকার কল্পনা ক'রে দ্বিতীয় প্রকার কপটতাময় জড়সাকারবাদরূপ ব্যুৎপরস্ত বা পাপের আবাহন করে না, কিম্বা অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের পারমৈশ্বর্য্যকে মানবীয়, মস্তিষ্কের বা মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঢালিয়া অপরাধময় আকার কল্পনা করতে ধাবিত হয় না, অথবা তথাকথিত নির্গুণবাদ আবাহনের নামে ত্রিগুণাতীত শুদ্ধসত্ত্বতনু কল্যাণবারিধিকে মানবীয় অকল্যাণময় চিন্তাস্রোতের দ্বারা বিচার ক'রে পরমেশ্বরকে শূন্যবাদের যুপকাষ্ঠে বলি দিবার পাষণ্ডতাও করে না। গৌড়ীয়দর্শন চিদ্‌বিশেষ বা চিৎসাকারবাদ স্বীকার করে। জড়সাকারবাদকে নিরাস করায় গৌড়ীয়-দর্শনে 'অতন্নিরসন' নামক নিরাকারবাদেরও সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু নিরাকারবাদের একদেশদর্শিতা ও হেয়তা নাই। গৌড়ীয়-দর্শন মিশ্রসত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই প্রাকৃত গুণসমূহে পূর্ণচেতন পরমেশ্বরের আরোপ করে না ব'লে এবং পরমেশ্বরকে শুদ্ধসত্ত্বতনু অখিল-কল্যাণনিলয় বিচার করে ব'লে নির্গুণবাদেরও প্রকৃত তাৎপর্য এই দর্শনেই সমন্বিত হ'য়েছে।

স্ফোট কাহাকে লক্ষ্য কর্‌ছে—কোন্ আকারকে লক্ষ্য করছে? স্ফোট যখন স্ফুটিত, অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই অভিব্যক্তি বা স্ফোটের লক্ষীভূত নাম-রূপ-গুণ-লীলার অভিজ্ঞানকে 'দর্শন' বলি। শ্রবণানুগ্রহে যখন সে অভিজ্ঞানটা এসে উপস্থিত হয়, তখনই তা'কে 'দর্শন' বলতে পারি, এটা যেন বালকদিগের (Kindergarden system) -এর মত। সাধুর মুখে স্ফোটের নাম-রূপ-গুণ-লীলা অর্থাৎ নামের নাম, নামের রূপ, নামের গুণ, নামের লীলার কথা শ্রবণকারীই স্ফোটবাদের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি কর্‌তে সমর্থ।

জীবস্বরূপে জ্ঞানস্বরূপতা ও জ্ঞাতৃত্বস্বরূপতা—উভয়ই আছে। যে-কাল পর্যন্ত আনন্দধর্ম জীবে প্রস্ফুটিত না হয়, ততদিনই বদ্ধজীবাভিমান থাকে। সাধুর সঙ্গক্রমে ভগবানের কথা শ্রবণ কর্‌বার যখন সুযোগ হয়, তখনই জীব বুঝতে পারে, তা'তেও আনন্দ-ধর্ম আছে। অপ্রাকৃত আনন্দানুসন্ধানে বিরত হ'য়ে জীব জ্ঞানপথে প্রধাবিত হয়,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।

Emperic activity (অক্ষজ চেষ্টা) নিয়ে বহির্জগতের যে সমস্ত কথা আছে, তা'কে ভূমিকা ক'রে অভিজ্ঞতার সিঁড়ি প্রস্তুত কর্‌তে কর্‌তে যদি রাবণের মত স্বর্গে উঠ্‌তে থাকি, তা'হ'লে বাস্তব আনন্দলাভের সৌভাগ্য হ'বে না—যে জিনিষটি আমাদের আত্মার অভীষ্ট, সেই জিনিষটি পাব না। স্যার আইজাক নিউটনের মত মনীষী পর্যন্ত

জাগতিক অভিজ্ঞতা, জ্ঞানবিজ্ঞানের নিরর্থকতা হৃদয়ঙ্গম ক'রে বলেছিলেন,—"আমি জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন করা দূরে থাকুক, স্পর্শও করতে পারি নাই, উহার তীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ কর্‌ছি মাত্র।"

বহির্জগৎ দর্শন ক'রে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সেই অভিজ্ঞতা অবলম্বন ক'রে কখনও অধোক্ষজ-জ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। যখন আমরা জাগতিক যাবতীয় অভিজ্ঞতার অভিমান পরিত্যাগ করি, তখনই অধোক্ষজজ্ঞান জান্‌তে পারি। বহু বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রেছি—সমস্ত পৃথিবী দর্শন ক'রেছি—লোককে অন্য প্রকার বুঝিয়ে দিতে পারি—এরূপ বিচার নিয়ে পূর্ণ জ্ঞান, শুদ্ধজ্ঞান বা মুক্তাবস্থার জ্ঞান আমরা কখনই পেতে পারি না। যেমন তলবকারোপনিষৎ বলছেন,—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।।
যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।।

ক্রমবিকশিত জ্ঞান বা খণ্ডিত বস্তুর জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানের সমগ্রতা সম্পাদিত হয় না। আমাদের অনুচেতন বৃত্তির একমাত্র স্বভাব—শরণাগত হওয়া—বৃহচ্চেতনের আশ্রয় গ্রহণ করা। বহির্জগতের কথা সম্বল কর্‌লে আমরা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'তে পারি না, তা'তে স্থায়িভাব রতির উদয় হয় না। যিনি বহির্জগতের কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি অকিঞ্চন, প্রাকৃত জগতের দৃশ্য যাঁর অবলম্বনীয় হয় না, তিনিই শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'তে পারেন। জীবন্ত শাস্ত্র—জীবন্ত ভাগবতের নিকট আমরা শাস্ত্রোপদেশ—ভবদীয়বার্ত্তা বা হরিকথা শ্রবণ কর্‌তে কর্‌তে অধোক্ষজ পূর্ণজ্ঞান প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারি। খণ্ডজ্ঞানসমূহ মায়াকে আশ্রয় ক'রে বিরাজিত, আর পূর্ণজ্ঞান স্বয়ং মায়াধীশ ভগবান্। পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত সকলই মায়া—

ঋতেঽর্থ যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।।

ভগবৎপ্রতীতি বা অখণ্ড বস্তুর প্রতীতি ব্যতীত ইতর প্রতীতি যা' কিছু হয়, তা'ই মায়া। বহির্জগতের অধ্যাপক শ্রেণীর নিকট হ'তে শব্দের সাহায্যে যে জ্ঞানলাভ হয়, সে সকলই মায়াময়। যদি গুরু অনাত্মবিৎ হন, তা' হ'লে তাঁ'র বাক্য এবং মুখ-নিঃসৃত শাস্ত্রোপদেশও মঙ্গল সাধন কর্‌তে পার্‌বে না।

সায়নমাধব-কথিত ষোড়শ দর্শন বা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের কথিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ সংগ্রহ ক'রে আমাদের অধোক্ষজ দর্শনের কথা জানা যা'বে না। পূর্বোক্ত পন্থায় দার্শনিক সত্য অনুসন্ধান কর্‌তে হ'লে কেবল পরস্পরের তর্ক-বিতর্ক হ'বে—বাস্তবসত্যের অনুসন্ধানের পথ সুগম হ'বে না। যদি প্রত্যেক সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় দ্বারা

বাস্তব বস্তুর অনুশীলন করি—২৪ ঘন্টা অনুশীলন করি, তা' হ'লেই দার্শনিক সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হ'বে।

"আমার অধিকার হয় নাই—সংস্কৃত ভাষায় অত্যুন্নত নই—কর্ম-জ্ঞান-যোগ-তপস্যাদি নেই"—প্রভৃতি বিচার ক'রে হতাশ হওয়ার আবশ্যকতা নাই। জড়ের কোন প্রকার অভিজ্ঞতা চেতনকে দর্শন কর্‌তে পারে না। চেতনের বৃত্তি দ্বারা—চেতনের চক্ষু দ্বারা চেতনের দর্শন হয়। এই জন্য গৌড়ীয়-দর্শন বল্লেন,—"স্থানে স্থিতাঃ"। মানুষ যে যেখানে আছেন থাকুন, মানুষের মধ্যে চেতনের ধর্মে যে অদ্বয়জ্ঞানের কথা আছে, তা' যদি চেতন-কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করেন—যদি তর্কপন্থা অবলম্বন না করেন—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" শ্লোক বিচার করেন—যদি শ্রবণোন্মুখ কর্ণ প্রদান করেন—যদি শ্রবণার্থ সম্মুখীন হন, তা' হ'লেই প্রকৃত মঙ্গল হ'বে। 'আমাদের academical career বেশী থাকা আবশ্যক' প্রভৃতি বিচার আরোহবাদীর।

পাশ্চাত্যদেশে জড়দেহের ক্রমবিকাশবাদ জড়বিজ্ঞানকে সম্বর্দ্ধিত ক'রেছে; কিন্তু ভারতের অপ্রাকৃত ক্রমবিকাশবাদ আত্মার সেবা-বৃত্তির ক্রমবিকাশের সহিত সেব্য পরমাত্মার তত্তৎসেবা-যোগ্য নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলার অপ্রাকৃত বিজ্ঞান আবিষ্কার ক'রেছে। আত্মার সেবাবৃত্তির সঙ্কোচাবস্থা, খর্বাবস্থা, মুকুলিতাবস্থা, বিকচিতাবস্থা ও পূর্ণ প্রস্ফুটিতাবস্থার সহিত পরমাত্মার তত্তৎ নিত্য নাম-রূপাদির প্রাকট্য। বিষ্ণুর অবতার-বর্ণনায় মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি মানব-হৃদয়ের ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করে। বামন ক্ষুদ্র মানুষ—পূর্ণ পুরুষের আকার নহে। বামনের পূর্বে অর্ধনর-অর্ধপশুরাজমিলিত-তনু। ক্ষুদ্র নরাবস্থার পর অসভ্য নরাবস্থা। তৎপরে সভ্য নরাবস্থা বা নীতিপুষ্ট নরমূর্তি। তৎপরে পুরুষের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়ত্ব বা পূর্ণজ্ঞানাবস্থা। বুদ্ধে অতিজ্ঞানাবস্থা। কল্কিতে প্রলয়াবস্থা।

সনাতন দার্শনিকগণের অবতার-বিজ্ঞানের অনুকরণ আমরা আধ্যক্ষিকগণের নায়কপূজাতে লক্ষ্য করি। এই নায়কপূজা নির্বিশেষবাদ হ'তে উত্থিত হ'য়েছে, ইহা একপ্রকার নাস্তিক্যবাদ। ২৪ জন ভগবদবতারের অনুকরণে ২৪ জন জিন বা তীর্থঙ্করের উপাসনা প্রভৃতি এই নায়ক পূজার অন্তর্গত। বর্ধমান-জ্ঞাতিপুত্র, সিদ্ধার্থ প্রভৃতি নায়কগণের উপাসনা বা জৈনগণের নির্গ্রন্থবিচার, শ্রমণগণের বৈরাগ্য-বিচার প্রভৃতি—অচিন্মাত্রবাদ বা শূন্যবাদের বিচারে প্রতিষ্ঠিত। মায়াবাদিগণের নির্বিশেষ-বিচারমূলে যে আচার্য্যোপাসনা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তা'ও নায়কপূজার অন্তর্গত নাস্তিক্যমতবাদ-বিশেষ। কর্মিগণের পিতৃদেবার্চ্চন প্রভৃতি, প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের সাহিত্যিক পূজা প্রভৃতি নায়ক-পূজার অন্তর্গত। ঐরূপ কর্মবাদে কর্মফলবাধ্য নশ্বর দেহ-মনের ধর্ম প্রবল থাকায় উহাতে ভগবদুপাসনা বা প্রকৃত আস্তিকতা কিছুই নাই। কর্মিগণের ঐরূপ পিতৃদেবার্চ্চন বা নশ্বর নায়ক-পূজার প্রতিযোগিসূত্রে তত্তুল্য অন্য প্রকার নায়কপূজক

অর্থাৎ আত্মজড়দেহপূজক চার্বাক পিতৃদেবার্চ্চনকারী কর্ম্মিগণকে ভণ্ড, ধূর্ত্ত, নিশাচর এবং তাহাদের বাগ্ বৈখরীকে 'জর্ঝরী', 'তুর্ঝরী' প্রভৃতি শব্দে আখ্যাত ক'রেছে। পরবর্ত্তী সময়ে নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ ঐরূপ আধ্যক্ষিক বিচারের অগ্নিকুণ্ডে আরও ঘৃতাহুতি নিক্ষেপ ক'রেছে। গৌড়ীয়-দর্শনে ভগবদবতার বা ভাগবতাবতারগণের পূজা সেইরূপ নায়কপূজার অন্তর্গত নহে। তাঁ'রা কর্মফলবাধ্য কোন নায়কের উপাসনা করেন না। এজন্য গৌড়ীয়-দর্শনে কর্মফলবাধ্য পিতৃদেবার্চ্চন নাই। চার্বাক গৌড়ীয়-দর্শনকে আক্রমণ ক'র্তে পারে না। চার্বাকের দর্শন কর্ম্মীর হেয়তার গণ্ডি পর্য্যন্ত পৌঁছে। জ্ঞানীর দর্শনের সীমা অতন্নিরসন পর্য্যন্ত, তৎপরে সে নিরস্ত হ'য়ে যায়। কিন্তু গৌড়ীয়ের দর্শন---অধোক্ষজ দর্শন। কর্ম্মীর সৎকর্ম-অসৎকর্মের বিচার, জ্ঞানীর অতন্নিরসন, এমন কি অপ্রাকৃত রাজ্যের ঐশ্বর্য্যবিচার পর্য্যন্ত অতিক্রম ক'রে একমাত্র একচ্ছত্র নায়ক-স্বরাটের সর্বাঙ্গীন সেবাই গৌড়ীয়-দর্শনের উদ্দিষ্ট বিষয়।

মধ্যযুগে ভগবদ্‌বিশ্বাসের আলোচনায় আমরা কর্ম, জ্ঞান ও বহির্ম্মুখ-যুক্তির অকর্মণ্যতা-বিচারে সায়নের লেখনীর মধ্যে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বনামক আনন্দতীর্থের বেদান্তের দ্বৈতপর বিচার এবং তদনুগ জয়তীর্থের ন্যায়সুধা, ব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃত প্রভৃতি লক্ষ্য করি। ন্যায়সুধায় শ্রীজয়তীর্থ ও ন্যায়ামৃতে শ্রীব্যাসতীর্থ নির্ব্বিশেষবাদকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত ক'রেছেন। শ্রীল লক্ষ্মণদেশিকের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মায়াবাদীর জিহ্বাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ক'রে দেওয়ায় প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ মায়াবাদী, রামানুজাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন তার্কিক ব'লে আত্মগোপন কর্‌বার চেষ্টা করেছেন। বিষ্ণুভক্তিকে আশ্রয় ক'রে যে সকল আচার্য্যজগতে মায়াবাদ নিরাস ক'রেছেন, তন্মধ্যে শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বই বিশেষরূপে প্রচারিত আছেন। নিম্বার্কের নামে লিখিত বর্তমান ভাষ্যে নির্ব্বিশেষ মতবাদের তাদৃশ স্পষ্ট খণ্ডন নাই। বিষ্ণুস্বামীর সর্বজ্ঞসূক্তে প্রাচীন 'শুদ্ধাদ্বৈতবিচার নবীন কেবলাদ্বৈতবাদিগণের চাতুর্যপূর্ণ কৌশলে সর্বজ্ঞাত্মমুনির নামে আরোপিত হ'য়ে নির্ব্বিশেষ মতবাদে পরিণত কর্‌বার চেষ্টা হ'য়েছে। বোধায়ন ঋষির বিচার অবলম্বনে যামুনাচার্য, রামানুজাচার্য প্রভৃতি, ঔড়লোমী প্রভৃতির বিচার অবলম্বন ক'রে নিম্বার্ক, ব্যাসের বিচার অবলম্বন ক'রে শ্রীমধ্ব, রুদ্রের বিচার অবলম্বন ক'রে শ্রীবিষ্ণুস্বামী জগতে বিষ্ণুভক্তির কথা প্রচার ক'রেছেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী প্রাচীন বিষ্ণুস্বামীর বিচারপ্রণালী নবীন কেবলাদ্বৈত নির্ব্বিশেষমায়াবাদীর বিচারমুখে সায়ন-মাধব-লিখিত রসেশ্বর-দর্শনের মধ্যে কিঞ্চিৎ লিখিত আছে। কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদের দার্শনিক সাহিত্যে তা'র বিবৃতি দেখা যায়। নৃপঞ্চাস্য শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের আরাধ্য। প্রাচীন বিষ্ণুস্বামীর মত হইতে ইদানীন্তন শ্রীবল্লভাচার্যের প্রস্তাবিত শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত পার্থক্য লাভ ক'রেছে। ইদানীন্তন শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ, শ্রীব্রজনাথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য, 'প্রমেয়রত্নার্ণব' প্রভৃতি গ্রন্থে যে-সকল বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন বা শ্রীবল্লভাচার্যপাদ

স্বয়ং প্রাচীন বিষ্ণুস্বামীর পূর্বাধস্তন শ্রীধরের বিচার প্রণালী হ'তে পৃথক হয়ে মায়াবাদ নিরসনকল্পে যে অণুভাষ্যাদি লিখেছেন, তাতে সর্বজ্ঞমুনির প্রাচীন শুদ্ধাদ্বৈত মত সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। কেবলাদ্বৈত বিচারের কল্পনারম্ভকালে লক্ষ্মীধর ও শ্রীধর নামক দুই গুরুভ্রাতা নৃপঞ্চাস্যোপাসক প্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তন-সূত্রে শ্রীনাম-মহিমা বিস্তার ক'রেছেন। লক্ষ্মীধরের নামকৌমুদীতে এবং শ্রীরূপপাদের পদ্যাবলীধৃত শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীলক্ষ্মীধরস্বামিপাদের রচিত শ্লোকাবলীতে উক্ত বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়াধস্তনদ্বয়ের নামনিষ্ঠা প্রকটিত হ'য়েছে। ভাগবতের আদিম শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁ'র স্ব-সম্প্রদায় অর্থাৎ বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের মত অতি মিত ও সারবাক্যে ব'লেছেন। 'সংক্ষেপ শারীরকে'র বিচার শুদ্ধাদ্বৈতবাদ হ'তে পার্থক্য লাভ ক'রে শঙ্করপ্রবর্তিত নবীন কেবলাদ্বৈতবাদে বিকৃত হ'য়েছে।

ব্যাসরচিত সূত্রাবলম্বনে ব্যাখ্যাভেদে পরস্পরের মত এত পার্থক্য স্থাপন ক'রেছে যে, বাস্তব বিচারটা যে কি, তা' আর সাধারণের জান্‌বার উপায় নেই। এই জন্যই মহাভারত ব'লেছেন,—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।।

সূত্রকর্তা ব্যাসদেব এইজন্য স্বয়ং সূত্রের ভাষ্য রচনা ক'রেছেন। সেই অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতে সর্বমতের যথার্থ সমন্বয় হ'য়েছে। স্বকপোলকল্পিত নবীন ভাষ্য বা বিভিন্ন মতবাদযুক্ত ভাষ্যগুলি অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য-সূর্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকটনে নিরস্ততেজঃ হ'য়েছে।

সেই শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্তলীলাময় বিগ্রহ এবং ভূত, ভাবী ও বর্তমান কালের নিখিল মহাজনগণের শিরোমণিরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে গৌড়ীয়-দর্শন জগতে প্রদান ক'রেছেন, তা' হ'তেই প্রকৃত অপ্রাকৃত সবিশেষ বেদান্ত ও শ্রুতির অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়।

গৌড়ীয়দার্শনিকবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু প্রকাশানন্দের উক্তি—প্রচার-মুখে এই গৌড়ীয়-দর্শনের কথা স্বল্পাক্ষরে ব'লেছন,—

আচার্যের আগ্রহ—'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে।
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে।।
'ভগবত্তা' মানিতে 'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন।।
যেই গ্রন্থকর্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হৈতে।।
'মীমাংসক' কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্মের অঙ্গ'।
'সাংখ্য' কহে,—'জগতের প্রকৃতি কারণ'।।

'ন্যায়' কহে,—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ আখ্যান'।
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্।।
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্তন।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত'-বর্ণন।।
'বেদান্ত'-মতে—ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ।
'নির্গুণ' ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' 'সগুণ'।।
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে।।
তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী—অমৃতের ধার
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব'—সার।।

সাধু-মহাজনের নিকট ভগবানের কথা শুনে যখন আমরা তাঁ'র আনুগত্য লাভ করি, তখনই আমাদের সুবিধা হয়।

পুরুষোত্তমের লীলাকথা শ্রবণ ক'রে আমাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। 'সেশ্বর-সাংখ্য' নামধৃক্ পতঞ্জলি ঋষির অষ্টাঙ্গযোগের কথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রভৃতির কথা—শ্রীঈশ্বর কৃষ্ণের মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পুরুষ প্রকৃতি অথবা অষ্ট প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার, ত্রিবিধ বন্ধ, ত্রিবিধ মোক্ষ প্রভৃতির কথা—জৈমিনীর কথিত স্ফোট, ধর্ম প্রভৃতি—বৈশেষিকের অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়স, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, বিশেষ, সমবায় প্রভৃতি কিম্বা গৌতমের প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন, প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের প্রাকৃত নশ্বর কথাগুলি শুনে আমাদের আত্যন্তিক কল্যাণ হ'বে না। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৬।৩৬) ব'লেছেন,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি।।

বদ্ধবুদ্ধি-পরিহারে মুকুন্দসেবা দ্বারা সদা কাম-লোভাদিরিপু-বশীভূত অশান্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, প্রাপঞ্চিক, ধারণাসমন্বিত যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গ অবলম্বন দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

হরিকথা শ্রবণ কর্‌তে কর্‌তে যদি কোন ব্যক্তি অপক্ক দশায় স্খলিত বা মৃতও হয়, তথাপি তাঁর' অমঙ্গল ঘটে না; আর হরিকথা পরিত্যাগ ক'রে যম-নিয়মাদি চেষ্টার ধর্মমেঘ-সঞ্চারে সমাধি প্রভৃতি প্রাপ্ত হ'লেও ত'ার প্রকৃত মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না,—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক্ক বাভদ্রমভূদমুস্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ।।

(ভাঃ ১।৫।১৭)

প্রাপঞ্চিক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম বর্ণাশ্রমধর্মপালন পরিত্যাগ ক'রে আত্মবৃত্তি ভক্তিতে প্রবিষ্ট হ'য়েও যদি কোন ব্যক্তি প্রপঞ্চে থাকা কালে দুর্ভাগ্য-ক্রমে ভজন পরিপাকের পূর্বেই ভজন হ'তে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট বা মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তথাপি আংশিক স্বরূপোদ্বোধন-জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সেবা-বাঞ্ছা থাকায় তার কোন অমঙ্গল হয় না; আর যা'রা হরিকথা শ্রবণ করে নাই বা যা'রা ভজনহীন—ঐরূপ ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য অনিত্য অজ্ঞানমিশ্র নিরবচ্ছিন্নানন্দবাধময় স্বধর্ম পালনের দ্বারা কোন নিত্য প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না।

একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ উদ্ধবকে বলেছেন,—হে উদ্ধব, তুমি একমাত্র কেবলাভক্তি আশ্রয় কর। কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি আশ্রয়ে কখনও মঙ্গল লাভ হ'বে না। যে ব্যক্তি আমার কথা শ্রবণ করে, তা'র কোন কালেই অমঙ্গল হয় না,—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে।।

(ভাঃ ১১।১৪।১৮)

যদিও আমার ভক্তকে সাধারণ ব্যক্তিগণের দর্শনে কোন কোন সময় অজিতেন্দ্রিয় হ'য়ে বিষয়ে আকৃষ্যমাণ দেখা যায়, তথাপি পরম সমর্থা ভক্তির প্রভাবে তিনি কখনও বিষয় দ্বারা অভিভূত হন না।

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ হ'লে দেহী জীব দেহ-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হয়,—

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যম্ যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-সৌগন্ধলব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ।।

(ভাঃ ৪।৯।১২)

হে পদ্মনাভ, আপনার শ্রীচরণ-কমলের সৌরভ-লুব্ধহৃদয় যে-সকল ভক্ত জগতে বিরাজমান, তাঁ'দের সঙ্গে আপনার প্রসঙ্গ-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণ অতিপ্রিয় মানবশরীর এবং মানব তনুর অনুগামী গৃহ, ধন, সুহৃৎ, পুত্র ভার্যা সমস্তই বিস্মৃত হ'য়ে থাকে।

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা।।
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাঽবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্।।

(ভাঃ ১১।১২।১-২)

বাহ্য ও অন্তরের অশেষ আসক্তি-নিরসনকারী সাধুসঙ্গে আমাকে যেমন বশীভূত করে, কি যোগ, কি সাংখ্য, কি ধর্ম, কি বেদাধ্যয়ন, কি তপস্যা, কি সন্ন্যাস, কি ইষ্টাপূর্ত, কি দান, কি ব্রত, কি যজ্ঞ, কি বেদমন্ত্রপাঠ, কি তীর্থভ্রমণ কি নিয়ম, কি যম—কিছুই আমাকে সেরূপ বশীভূত করতে পারে না।

আমরা স্বাধ্যায়-নিরত হ'য়ে—গুরুকুলে বাস ক'রে অপর পক্ষকে নিরস্ত কর্‌তে প্রবৃত্ত হ'য়ে—যোগাদি সাধনে রত হ'য়ে, কি লাভ করতে পারি? যোগাদি সাধনে সিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই যদি কাম-ক্রোধ-রিপু এসে আমাদিগকে আক্রমণ করে, তা'হলে কিরূপে আমাদের অভীষ্ট লাভ হ'বে? জঙ্গলে গিয়ে ডাল ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে, লাঠি কাটতে কাটতে যদি বাঘ এসে আমাদের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে, তা'হলে আর লাঠি-কাটা হলো না, বাঘ-মারাও হলো না, বাঘের হাতে চিরজীবনের তরে মারা পড়্‌তে হলো। ডাক্তার ডাক্‌তে ডাক্‌তে মৃত্যু হ'লে ডাক্তার এসে আর কি করবে? রেচক-পূরক-কুম্ভকাদি দ্বারা ধর্মমেঘসমাধি সঞ্চারের পূর্বেই যদি কাম-ক্রোধাদি-ব্যাঘ্র এসে উপস্থিত হয়, তা'হলে ঐরূপ যোগ-সমাধি আমাদের কি মঙ্গল কর্‌বে? যোগ-ব্রত তপস্যাদি জগতে যত কিছু মত আছে, সেগুলি কোনটী সাধ্য বা উপেয় নহে—একথা ঐ-সকল পথের পথিকগণও স্বীকার করেন। আত্মবৃত্তি ভক্তি কিন্তু উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য—উভয়ই; কাজেই ভক্তিপথে যতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়, ততটুকুই মঙ্গল, পূর্ণ অগ্রসর হ'লে পূর্ণ মঙ্গল। অভক্তি-যোগাদিপথে তা' নয়, সেখান থেকে পতিত হ'লে আবার কেঁচে গণ্ডুষ 'কর্‌তে হ'বে। ঐগুলি সব experimental আরোহবাদ। একটা experiment বিফল হ'লে আবার নূতন ক'রে আর একটা experiment কর্‌তে হ'বে। এরূপ experiment কর্‌তে কর্‌তে জীবন শেষ হ'য়ে যেতে পারে—ডাল কাটতে কাটতে বাঘের হাতে পড়ে মৃত্যু হ'তে পারে, তখন আর কাঠ দিয়ে লাঠি-তৈয়াররূপ অভিধেয়বলে বাঘ মেরে শান্তিলাভের প্রয়োজন সিদ্ধ হ'লো না।

শ্রীগৌরসুন্দর বা গৌড়ীয়-দর্শন এরূপ আরোহবাদীর অভিজ্ঞতাবাদোত্থ সাধনপ্রণালীর বিচারগুলি স্বীকার করেন না।

শ্রীরামানুজের পূর্বগুরু গোষ্ঠীপূর্ণ প্রভৃতিতে কিঞ্চিৎ যোগাদিমিশ্র-ভক্তি দেখা গেলেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনে তাদৃশ যোগ-পদ্ধতি পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হ'য়েছে। গৌড়ীয় দর্শন অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, ব্রত, তপস্যাদি সর্বপ্রকার আবরণ পরিত্যাগ পূর্বক আনুকুল্যে কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ সর্ববিধ আবরণ উন্মুক্ত ক'রে কৃষ্ণ-দর্শনের কথাই প্রতিপাদন ক'রেছেন। গৌড়ীয়-দর্শনে সাক্ষাৎ ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার কথা শব্দাকারে স্ফুটিত হ'য়ে 'দর্শন' শব্দের চরম সার্থকতা প্রকাশ করে। পুরুষোত্তমের লীলা-কথাকে যেরূপ নশ্বর কর্মরাজ্যের অন্তর্গত বিচার করা উচিত নহে, তদ্রূপ তা'তে আধ্যাত্মিক বিচার আনয়ন করাও বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে।

গৌরসুন্দর যখন দাক্ষিণাত্যে পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন বৌদ্ধ, শৈব, মায়াবাদী প্রভৃতি বিরোধি-সম্প্রদায়ের মত দক্ষিণদেশকে প্লাবিত ক'রেছিল। সায়নমাধব চারপ্রকার শিবোপাসকের কথা লিখেছেন—নকুলীশপাশুপত, প্রত্যভিজ্ঞা, মহেশ্বর ও রসেশ্বর। এই মতগুলি সকলই নির্ব্বিশেষবাদমূলে সৃষ্ট। নির্ব্বিশেষবাদ যাঁ'দের লক্ষ্য, যাঁ'রা ভজনীয় বস্তুর অপ্রাকৃত আকার স্বীকার করেন না, মুক্তিকালে নিত্য নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য লীলার অপ্রাকৃতত্ব বিচার করেন না, সেই সকল দার্শনিক-ব্রুব-সম্প্রদায় বেদান্তের বিচারপ্রণালী হ'তে পৃথক হ'য়ে নানাপ্রকার মনোধর্ম্মপর মতবাদকে বৈদান্তিক মতবাদ ব'লে চালিয়ে দিয়ে ভ্রান্ত হন। কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার-প্রচারক এরূপ কথার আদর করেন না। অন্যান্য দার্শনিকগণ ন্যূনাধিক সকলেই প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট ইন্দ্রিয়-তর্পণকামী। কামদেবের কাম, নাম ও ধামের পরিপূর্ণ সেবা বা পূর্ণ শ্রদ্ধা—যা' বেদান্তভাষ্য-ভূত শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন ক'রেছেন, তা' একমাত্র গৌড়ীয়-দর্শনের বিচারেই পরিপূর্ণতমরূপে দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ দেশে লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের কথাও এককালে যথেষ্ট ছিল। শ্রীকর মিশ্র প্রভৃতি বিষ্ণুস্বামীরই অনুগত—প্রেমাকর প্রভৃতি রুদ্রসম্প্রদায়ের অন্তর্গত হ'লেও বিষ্ণুভক্তিরই প্রচারক। লিঙ্গায়েত সম্প্রদায় এবং বিষ্ণুস্বামী ও রুদ্রসম্প্রদায়ের মধ্যে এককালে ভীষণ বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হ'য়েছিল। যেখানে ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই—যেখানে স্ফোট অনিত্য আকারে স্ফুটিত হ'চ্ছে, শ্রীচৈতন্যদেব তা' বহুমানন কর্‌তে প্রস্তুত হন নাই।

শৈবাদ্বৈতবাদ, শৈবদ্বৈতবাদ এবং পরিমলের লেখকের শৈববিশিষ্টাদ্বৈতপর ভাষ্যগুলি—সকলই সুদার্শনিক বিচার হ'তে বিক্ষিপ্ত হ'য়েছে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—"ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।" কুদার্শনিকগণের মধ্যে ভগবানের নির্ব্বিশেষ বিচার নানাপ্রকার পল্লবিত হ'য়েছে। এই শ্রেণীর লোকের সাকার-নিরাকারের খণ্ডিত বিচার—সকলই মনোধর্ম্মের অন্তর্গত। নকুলীশপাশুপত শৈবগণ মহাদেবকে পরমেশ্বর এবং জীবগণকে পশু বলেন। নকুলীশ-পাশুপত-মতবাদ মধ্ব-সিদ্ধান্তের প্রতিযোগিতা ক'রে নির্বিশেষ মতকেই স্থাপন কর্‌বার চেষ্টা দেখি'য়েছে। মনোধর্মী নকুলীশ-পাশুপত বলেন,—মধ্বাচার্য্যের কথিত ভগবদ্দাস্য-প্রাপ্তিকে মুক্তি বলা কেবল উক্তি মাত্র; কারণ মুক্ত ব্যক্তি যদি দাসত্বরূপ অধীনতা-শৃঙ্খলেই বদ্ধ হ'ল, তা' হলে কিরূপে মুক্ত বলা যেতে পারে? মুক্তের ভগবদ্দাস্য বুঝ্‌তে না পেরে নকুলীশপাশুপত বলছেন,—অমূল্য মণিমাণিক্য-রত্নাদি-বিনির্মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তিকেও লোকে বদ্ধই ব'লে থাকে। অন্ধকে পদ্মপলাশলোচন বলার ন্যায় ভগবদ্দাসত্বে বদ্ধব্যক্তিকে মুক্ত বলা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ ও হাস্যাস্পদ। কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শন এই মনোধর্মীর জ্ঞানের ফল্গুতা প্রদর্শন ক'রে বলেন,—"মুক্তির্হিত্বান্যাথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" অনর্থযুক্ত জীব যখন নিজের কৃষ্ণদাস্যরূপ নিত্যস্বরূপ বুঝ্‌তে পারেন, তখনই তিনি ভগবদ্দাস্যরূপ নিত্যধর্ম্মে

নিত্যাসক্ত হ'য়ে অতিমুক্তগণের প্রেমধর্ম লাভ করেন। ইহাই চরম স্বাধীনতা। কৃষ্ণের সহিত বন্ধন, জাগতিক নশ্বর মায়িক রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথাকথিত স্বাধীনতার বন্ধন অথবা নির্বিশেষবাদিগণের ফল্গুমুক্তিরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণের দাস্য নয়; স্বরাট-পুরুষের দাস্যই পূর্ণতম স্বাধীনতা—পূর্ণতম হেয়তা-ছেদন। এই বন্ধন মুক্তগণ আকাঙ্ক্ষা ক'রে থাকেন। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলছেন,—

"স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বান্য-ত্রায়তনমলব্ধা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্যতন্মনো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধা প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি।।"

যেরূপ শকুনি সূত্রের দ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ হ'য়ে এদিক ওদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্য কোন জায়গায় আশ্রয় না পেয়ে শেষে বন্ধনকেই স্বীকার ক'রে থাকে, সেইরূপ মনোধর্ম-চালিত ব্যক্তি মনোধর্ম দ্বারা মুক্তি পাবার জন্য নানাদিক অনুসন্ধান ক'রে থাকেন, কতই না চেষ্টা-চরিত্র করেন—মুক্ত হ'বার জন্য। কেউ মনে করেন, এ জগতের ক্ষুদ্র সুখ লাভ হ'লেই স্বাধীনতা পাব, কেউ মনে করেন, এ জগতে কিছুকাল স্বায়ত্তশাসন লাভ করলেই স্বাধীনতা লাভ হ'বে, কেউ মনে করেন, স্বর্গসুখলাভ হ'লে স্বাধীনতা হ'বে, কেউ মনে করেন, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'লে স্বাধীনতা হ'বে-—এরূপ নানাদিক দিয়ে জড়িত হ'বার কামনায় জড়ভোগময় স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করতে করতে লোক যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে—অন্য কুত্রাপি স্বাধীনতা নাই, আশ্রয় নাই বুঝতে পারে, তখন সকল প্রাণের প্রাণ—সকল স্বাধীনতম পুরুষগণের স্বাধীন স্বরাট্ পুরুষোত্তমের পাদ-পদ্মকে আশ্রয় করে এবং সেই পাদপদ্মে নিত্যবন্ধনই—প্রেম বন্ধনই স্বাধীনতার চরমসীমা বুঝতে পারে। গৌরসুন্দর আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

তবে হয় মুক্ত সর্ব বন্ধের বিনাশ।
মুক্ত হৈলে হয় সেই গোবিন্দের দাস।।

বিষ্ণুস্বামিপাদ সর্বজ্ঞসূক্তে মুক্তপুরুষেরই ভগবৎসেবার কথা জানিয়েছেন,—

'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।'

শ্রীমন্মহাপ্রভু "আত্মারামাশ্চ" শ্লোকে মুক্তপুরুষগণের ভগবৎসেবার কথা দেখিয়েছেন। চিদ্‌বিলাসরাজ্যের কথা মুক্ত না হ'লে কেউ বুঝতে পারে না। যাঁ'রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুক্তির চেষ্টা বা মুক্তির চেষ্টাকে কল্পিত স্বাধীনতা ব'লে ভ্রান্ত হন, তাঁ'দের অধিকার ও আশা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। গৌড়ীয়-দর্শনে সেইরূপ ক্ষুদ্র সংকীর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব'লে লোককে বিপথগামী করা হয় নাই। কেউ বলছেন,—পারদ-রসকে আশ্রয় কর্‌লেই উত্তমা মুক্তি লাভ হ'বে, মূর্চ্ছিত পারদের দ্বারা ব্যাধি বিনষ্ট হয়, মৃত পারদের দ্বারা জীবিত হওয়া যায়, শূন্য পারদের দ্বারা গতিশক্তি জন্মে। পারদ সংসার-সমুদ্রের যন্ত্রণা হইতে পার করে। পারদ-নির্মিত শিবলিঙ্গের পূজা কাশী প্রভৃতি তীর্থের শিবপূজা অপেক্ষা

অধিকতর শ্রেষ্ঠ। কেউ কেউ মনে করেন,—যড়্‌গুণজারিত মকরধ্বজ প্রভৃতি দ্বারা দেহের সুস্থতা বিধান কর্‌লে মনের শান্তি হ'বে। মহাদেবকে আশ্রয় ক'রে আমরা ঐরূপ ভুক্তি-মুক্তি-কামী হ'য়ে পড়্‌ব। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতার চেষ্টা জীবের বদ্ধদশার চেষ্টা মাত্র। গৌড়ীয়-দর্শন সেইরূপ বদ্ধ-দশার কথা বা জীবকে অধিকতর বদ্ধ-দশায় আনয়নের শিক্ষার কৌশলের কথা বলেন না। গৌড়ীয়-দর্শনে অমুক্তগণের যথার্থ মুক্তির কথা এবং মুক্তগণের চিদ্‌বিলাস-সেবার কথা অতি সুন্দররূপে কীর্ত্তিত আছে। রসেশ্বর-শৈবগণ মনে করেন, প্রতিমা পূজার যদি ব্যবস্থা হ'তে পারে, তা' হলে পারদনির্ম্মিত শিবপূজার কেন না ব্যবস্থা হ'বে? তাঁ'রা পঞ্চোপাসকের অনিত্য প্রতিমা পূজা বা প্রতীক-পূজাই লক্ষ্য ক'রেছেন। গৌড়ীয়-দর্শনে যে শ্রীবিগ্রহ পূজার কথা বর্ণিত আছে তা' ঐসকল পৌত্তলিক পূজা হ'তে বহু-বহু দূরে।

বর্তমান হিন্দুনামধারী ব্যক্তিগণের অধিকাংশই শঙ্কর-শাসিত সমাজে বাস করিতেছেন। 'হিন্দু' বলিতে আজকাল 'পঞ্চোপাসক'কেই বুঝায়। কিন্তু ঐ পঞ্চোপাসকদিগের উপাসনা-প্রণালী নিত্যা নহে। উপাসকগণের স্ব-স্ব-অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া গেলে আর উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং উপাসনাটী অনিত্য ব্যাপার মাত্র।

জগতে 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' নামে—দুইটী কথা বর্তমান। 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' এই দুইটীকেই বজায় রাখিবার নাম—'সমন্বয়'। ভোগিকুল পাঁচপ্রকার খাজাঞ্চীর (বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ ও সূর্য্যের) নিকট হইতে ভোগ্যবস্তু লাভ করিয়া ইহ ও পরলোকে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ ইচ্ছা করেন।

শাক্যসিংহ ভোগের পরিণাম দেখিয়া ব্যথিত হইয়া কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন—ত্যাগ ও তপস্যার বিচার প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে, তপস্যা-ত্যাগাদি যে কোনও কৃচ্ছ্র সাধ্য উপায়েই হউক, অনুভবশক্তির রাহিত্যই প্রয়োজন। সেই চেতন-রাহিত্যই তাঁহার মতে 'নির্বাণ' বা 'মুক্তি' এইরূপ 'অচিৎপরিণতি'রূপা মুক্তির বিচার চিদচিৎ এর সমন্বয় বিধান-চেষ্টা হইতেই উদ্ভুত। শ্রীপাদ শঙ্করও প্রচ্ছন্নভাবে অনেকটা শাক্যসিংহের (সাংখ্যসিংহের?) মতই স্থাপন করিলেন। শ্রীশঙ্করের চেষ্টা বহির্দৃষ্টিতে শাক্যসিংহের প্রতিকূল হইলেও কার্য্যতঃ শঙ্করাচার্য্য শাক্যসিংহেরই প্রচ্ছন্ন অনুগত বলিয়া স্বীয় মতবাদের পরিচয় দিয়াছেন। সাংখ্যকার কপিলের মতে, প্রকৃতিলীন অবস্থাতেই 'মুক্তি' এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রকাশেই মায়ার ক্রিয়া, ভোগ বা কর্ম। শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই সাংখ্যবাদের বিপরীত ভাব নির্গুণতা গ্রহণপূর্বক চিন্মাত্রবাদ প্রচার করিলেন। "অসতো সদজায়ত"—অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগৎ প্রকাশিত হইল—এই শ্রুতিমন্ত্রে যে শক্তিপরিণামবাদ নিহিত রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিলে অধিকারী ঈশ্বরকে 'বিকারী' ও শ্রীগুরু-ব্যাসদেবকে 'ভ্রান্ত' বলিতে হইবে—এই যুক্তি দেখাইয়া মায়াবাদাচার্য 'বিবর্তবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে বেদান্তসূত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র তাঁহার

অবিচিন্ত্যশক্তির কার্য্য-বিকাররূপে যে এই বিশ্ব,—এইরূপ শক্তিপরিণামবাদ উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

"পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে"—এই শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্মের একটী অবিচিন্ত্য পরাশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। এক বস্তুতে বস্ত্বন্তর বুদ্ধির নাম—'বিবর্ত',—যেমন রজ্জুতে সর্প, শুক্তিতে রজত-ভ্রম ইত্যাদি। বদ্ধজীব যখন জড়দেহে আত্মবুদ্ধি করেন, তখনই বিবর্তের উদাহরণ উপস্থিত হয়। সেই বিবর্তদোষকে মূলবিশ্বতত্ত্বে ও জীবতত্ত্বে আরোপ—ভগবানের চিচ্ছক্তির অস্বীকার ব্যতীত আর কিছুই নহে;—ইহাই প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা। এই বিবর্তবাদের (Idealism-এর) মতে বস্তুর অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপযোগী। এই বিবর্তবাদ সমতাপ্রাপ্ত (neutralised) হইলে আর গুণজাত জগৎ থাকিবে না এবং ত্রিপুটী বিনষ্ট হইলে আর বিবর্তস্বরূপ (?) জীব ও জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। সুতরাং শাক্য সিংহের মতে প্রাপ্যমুক্তি যেমন অচিদ্‌বিলাসে অবস্থিত, শঙ্করাচার্য্যের মতে উহা তদ্রূপ চিন্মাত্রবাদ বা চিদ্‌বিলাসের অনবস্থিতি। নির্বাণ বা দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—এই ত্রিপুটীর বিনাশরূপ নাস্তিকতাই যখন চরমলক্ষ্য, তখন যিনি যে পথ দিয়াই চলুন না কেন, সকলেই সমান; ইহারই নাম সমন্বয়-বাদ। এই সমন্বয়বাদের সুবিধা এই যে, যে কোনও ভ্রান্তমত ইহার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া একটী স্বতন্ত্র মত বা পথবিশেষ বলিয়া পরিচয় দিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। এইজন্যই বিষ্ণুবিরোধী মনোধর্মি-জগতে চিজ্জড়সমন্বয়বাদের বহুল আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

সমন্বয়বাদের দ্রষ্টা ভগবানের নিত্য আনুগত্য স্বীকার করেন না। তাঁহার মিছা বা ব্যবহারিক আনুগত্য-ভান---ভগবানের প্রকৃত আনুগত্য নহে। উহা কৌশলে কার্য্যসাধনরূপ নাস্তিকতারই অপর দিক্। বহ্বীশ্বরবাদ বিশেষতঃ পঞ্চোপাসনা হইতেই সমন্বয়বাদের সৃষ্টি এবং এই সমন্বয়বাদ—মানব-কল্পিত।

অসাম্প্রদায়িকতা বা উদারতার নামে কাল্পনিক অনিত্য সত্য-ছলনা অর্থাৎ নাস্তিকতা ও অবিসংবাদিত নিত্যসত্য আস্তিকতার সমন্বয় প্রয়াস---কেবল ভক্তিহীন ও ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ-লোক-রঞ্জনরূপ ব্যাপার হইতেই উদ্ভূত। এই সকল অসাম্প্রদায়িক নামধারিগণ কার্য্যতঃ মনঃকল্পিত ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ সম্প্রদায়েরই স্রষ্টা।

এইরূপ বিষ্ণুবিরোধমূলা সমন্বয়চেষ্টার প্রয়াস কেবল আধুনিক নহে, বহুপূর্বেও জগতে প্রচলিত ছিল। তাহা দেখিয়া করুণাবশতঃ দুইজন ভগবৎ-প্রেরিত পরম উদার মহাপুরুষ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐসকল ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ অসাম্প্রদায়িক-ব্রুবগণকে প্রকৃত ভগবদনুগত ব্যক্তিগণ হইতে পৃথক্ করিবার বাসনায় 'অসৎ সাম্প্রদায়িক' ও 'সৎ সাম্প্রদায়িক' আখ্যা প্রদান করিলেন। লক্ষণদেশিকই এই বিষয়ে অগ্রণী হইলেন। সৎ সাম্প্রদায়িকগণের মনগড়া সম্প্রদায় নাই—তাঁহারা কপট উদারতার নামে নাস্তিকতার প্রশ্রয় দেন না। ভগবানই একমাত্র সত্ত্ব অর্থাৎ নিত্য-সত্ত্ব-বিশিষ্ট বস্তু।

সেই ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিও নিত্যা। সৎ সাম্প্রদায়িকগণ সেই নিত্য-সত্ত্বাবিশিষ্ট অবিচিন্ত্যশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবানের নিত্য উপাসক, সুতরাং তাঁহারাই একমাত্র পরম উদার। জগতে অধোক্ষজ ভগবৎসেবকগণ অপেক্ষা উদার আর কেহ থাকিতে পারে না। জড়ের উদারতা—উদারতা নহে; উহা ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে উদারতার ভান বা কপটতামাত্র। সমন্বয়বাদিগণ উদারতার ছল করিয়া, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য, ইঁহাদের যে কোন একটীর উপাসনা (?) আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাঁহাকে এতকাল উপাসনা করিলেন, পরে সেই উপাস্যের উপরই খড়গ নিপাতিত করিয়া তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন! চুনকাম করা হইল, পলস্তারা করা হইল, আবার কিছুকাল পরে ঐ পলস্তারাকে ফেলিয়া দেওয়া হইল! যখন এইভাবে ভগবানের নিত্য সবিশেষত্ব ও নিত্য আরাধনা অস্বীকৃত হইতে লাগিল তখনই ভগবানের ইচ্ছায় মদ্র প্রদেশের (বর্তমান তামিলনাড়ুর) অন্তর্গত মহাভূতপুরী নগরীতে (শ্রীপেরাম্‌বদুর) শ্রীলক্ষ্মণদেশিক-নামে এক পরম শক্তিশালী মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন; ইঁহারই অপর নাম—শ্রীরামানুজাচার্য্য। শ্রীরামানুজাচার্য্যের পরবর্ত্তী—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ। যখনই কোনও ভগবদানুগত্যযুক্ত সত্যধর্মের কথা জগতে প্রচারিত হয়, তখনই জগতের বিষ্ণুবিরোধী মনুষ্যগণ, এমন কি, দেবতাগণ পর্য্যন্ত তাহার পরম শত্রু হইয়া পড়েন।

সত্যযুগেও হরিভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি বিরোধ-চেষ্টা-দমনের নিমিত্ত ভগবান শ্রীনৃসিংহ-দেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। পাষণ্ডিগণের আত্মবিনাশ সাধন করাইবার জন্যই ভগবানের ক্রোধের সঞ্চার হয়। পাষণ্ডিগণ হরি ও হরিভক্তের বিরোধ করিতে করিতে অনন্তবিনাশের পথে ধাবিত হয়। যখন শ্রীরামানুজাচার্য্য আবির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহার প্রচারে অনেক বিষ্ণুবিরোধী ব্যক্তি বাধা প্রদান করিল; এমন কি, যে গুরুব্রুব রামানুজাচার্য্যের মত অসীম প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে নিজশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন, রামানুজ যখন সেই গুরু ব্রুবসম্প্রদায়ের প্রচারিত কুমতবাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়া ভগবদানুগত্যময় ধর্ম প্রচার করিলেন, এবং যখন রামানুজের যশ-সৌরভ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইতে থাকিল, তখন সেই মৎসর-সম্প্রদায় শ্রীরামানুজের শত্রু হইয়া পড়িলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শুক্রাচার্য্য ও বলির চরিত্রেও এইরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রামানুজাচার্য্যকে দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকিতে হইয়াছিল। আজও ভারতে শ্রীরামানুজাচার্য্যের অনুগত প্রায় কোটি কোটি লোক বাস করিতেছেন। ভারতবর্ষে 'রামানন্দী রামায়েৎ সম্প্রদায়'-নামে একপ্রকার ধর্মসম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। এই রামানন্দ—শ্রীরামানুজের ষোড়শ অধস্তন। ইনি ঠিক শ্রীরামানুজাচার্য্যের সম্পূর্ণ অনুগত নহেন। ইঁহার অনুগগণ শ্রীরামানুজাচার্য্যের একনিষ্ঠ সদাচার হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা সাধারণ লোকের নিকট উপাসক সম্প্রদায়-নামে পরিচিত হইলেও চরমে শঙ্করের নির্ব্বিশেষবাদ ও বহু দেবতার উপাসনা

ন্যূনাধিক গ্রহণ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ গুরুর আনুগত্য ও শাস্ত্রীয় আলোচনার অভাব হইতেই তাঁহাদের মধ্যে এই বিপত্তি প্রবেশ করিয়াছে। অযোধ্যা, পুরী প্রভৃতি স্থানে রামানন্দী রামায়েৎ সম্প্রদায়ের আখড়া আছে। রামানুজীয়গণ—একনিষ্ঠ বা ঐকান্তিক বিষ্ণুসেবক।

কাহারও কাহারও মতে, শ্রীধরস্বামিপাদ কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতও তাহাই। 'দীপিকা-দীপনে'র লেখক তৎকালে বৃন্দাবন-মথুরা-প্রভৃতি স্থানে বল্লভীয়-চিন্তা-স্রোতের প্রাবল্য ও সঙ্গ-ফলে শ্রীধরস্বামিপাদকে 'কেবলাদ্বৈতবাদী' মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু নাভাদাস-লিখিত 'ভক্তমাল' ও অপরাপর সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য এবং শ্রীধরের উক্তি ও বিচারসমূহ সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা নিরপেক্ষভাবে পাঠ করিলে তাঁহার প্রতি উক্ত ধারণার বিপরীত ভাবই প্রমাণিত হয়।

শ্রীধরস্বামিপাদ কখনও কেবলাদ্বৈতবাদী হইতে পারেন না, তিনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-মতে বস্তুর অংশ—জীব, বস্তুর শক্তি—মায়া, বস্তুর কার্য্য—জগৎ; তজ্জন্য জীব, মায়া ও মায়িক জগৎ সকলই 'বস্তু'-শব্দবাচ্য। ভাগবতে দ্বিতীয় শ্লোকের "বেদ্যং বাস্তবমত্রবস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্" এই চরণের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"বাস্তবশব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবো, বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ, বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্বং বস্ত্বেব, ন ততঃ পৃথক্।" এই বাক্যদ্বারা তিনি যে কখনও কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন না,—ইহা বেশ বোঝা যায়। নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতবাদী কখনও জীবের বাস্তব-সত্তা, তত্ত্ববস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি ও বস্তুর কার্য স্বীকার করেন না। কেবলাদ্বৈতবাদী মায়াকে অবস্তু, বস্তুকে নির্ব্বিশেষ, জীব ও ব্রহ্মকে ত্রিবিধভেদহীন, জগৎকে অসত্য, জৈবজ্ঞানের বিবর্ত-জন্য তাৎকালিকী অনুভূতির মিথ্যাত্বই বিচার করিয়া থাকেন।

শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের স্ব-কৃত 'ভাবার্থদীপিকা'-টীকায় অন্য কোন আচার্যের নাম উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীর নামই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৭।৬ শ্লোকের টীকায় "তদুক্তং বিষ্ণুস্বামিনা—'হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীব সংক্লেশনিকরাকরঃ।।' তথা 'স ঈশো যদ্বশে মায়া, স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ। স্বাবির্ভূত-পরানন্দ স্বাবির্ভূতসুখদুঃখভূঃ।। স্বাদৃগুত্থবিপর্য্যাস-ভবভেদজ-ভীশুচঃ। যন্মায়য়া জুষন্নাস্তে তমিমং নৃহরিং নুমঃ।।" এবং ৩।১২।২ শ্লোকের টীকায় 'শ্রীবিষ্ণুস্বামিপ্রোক্তা বা' প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণুস্বামি বাক্যের উল্লেখ-দ্বারা শ্রীধরস্বামিপাদ যে শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের অনুগত হ্লাদিনী-সংবিদাশ্লিষ্ট সচ্চিদানন্দ মায়াধীশ শ্রীনৃসিংহের উপাসক শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহাই স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে।

নাভাদাসজীর 'শ্রীভক্তমাল' গ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, বিষ্ণুস্বামীর পরমানন্দ নামক একজন অধস্তন ছিলেন। পারম্পর্য্যক্রমে এই পরমানন্দই শ্রীধরস্বামি পাদের

গুরু। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে ''যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্'' এই শ্লোকে ভগবদভিন্ন গুরুদেবের বন্দনা করিয়াছেন।

মায়াবাদিগণ পঞ্চোপসনা অবলম্বন-পূর্বক নৃপঞ্চাস্যের পরিবর্তে পঞ্চোপাস্যের অন্যতম রুদ্রের উপাসনা স্বীকার করিয়া চরমে নির্বিশেষ-প্রাপ্তিকেই 'সাধ্য' বলিয়া জানেন। কিন্তু শ্রীধরপাদের ভাগবতীয়-টীকার মঙ্গলাচরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি ঐরূপ নির্বিশেষ-মায়াবাদীর বিচার অবলম্বন না করিয়া শ্রীরুদ্র-সম্প্রদায়ভুক্তরূপে পরমধাম, জগদ্ধাম, দশমতত্ত্ব আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীনারায়ণের বিলাসবিগ্রহ সদাশিবকে পরস্পর-আলিঙ্গিত বিগ্রহরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—

''মাধবোমাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ।
বন্দে পরস্পরাত্মনৌ পরস্পর-নতিপ্রিয়ৌ।।''

উক্ত মঙ্গলাচরণের প্রথম-শ্লোকেও ''নৃসিংহমহং ভজে'' এই বাক্যদ্বারা শ্রীধরস্বামী যে নৃসিংহোপাসক ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

শ্রীধরের গুরুভ্রাতার নাম—শ্রীলক্ষ্মীধর-স্বামী। এই শ্রীলক্ষ্মীধর—'শ্রীনামকৌমুদী' নামক গ্রন্থের লেখক। শ্রীধরস্বামিপাদও শ্রীনামের অপ্রাকৃততত্ত্ব ও নিত্যত্ব-সম্বন্ধে অনেক শ্লোক রচনা করিয়াছেন। শ্রীল রূপপাদ 'পদ্যাবলী'—গ্রন্থে তাহার অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐসমস্ত শ্লোক আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীধরস্বামিপাদ কিছুতেই নির্বিশেষ কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী হইতে পারেন না; কারণ, নির্বিশেষ-কেবলাদ্বৈতবাদিগণ কখনও শ্রীভগবানের এবং তদীয় নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অভেদ, চিন্ময়ত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। সায়নমাধবের 'রসেশ্বরদর্শন' পাঠে জানা যায় যে, শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ শ্রীনৃসিংহদেবের নিত্য অভিন্ন নামরূপাদি স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীধরস্বামিপাদ যে বিষ্ণুস্বামি-মতাবলম্বী শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণবযতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীধরস্বামিপাদ যদি কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী হইতেন, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবল্লভ-ভট্টজীকে শাসন করিয়া শ্রীধরস্বামিপাদকে 'জগদ্গুরু' বলিয়া স্বীকার এবং শ্রীধরস্বামীর অনুগত হইয়া ভাগবতের ব্যাখ্যা করিবার জন্য আচার্য ও জগজ্জীবকে শিক্ষা দান করিতেন না। শ্রীধরস্বামিপাদ কেবলাদ্বৈতবাদী হইলে শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদও তাঁহাকে ''ভক্ত্যেকরক্ষক'' বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীজীব প্রভু ও বৈষ্ণবাচার্যগণ নির্বিশেষ-মায়াবাদিগণকে 'ভক্তির রক্ষাকারী' বলিবার পরিবর্তে ''ভক্তির সর্বনাশকারী'' বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্যগণের যে-কোন গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শন,—ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ—ত্রিবিধ বিভাগে অদ্বয়জ্ঞান পরমব্রহ্ম স্বীয় শক্তিদ্বারা নিত্যপ্রকাশমান বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। বস্তুর অদ্বয়তার ব্যাঘাত

করিয়া বস্তুশক্তির বৈচিত্রক্রমে ভগবান্ তিন প্রকারে লীলা-বিশিষ্ট; ভগবান্—চিৎ ও অচিৎ উভয়েরই ঈশ্বর; তিনি—অনন্ত ও নিত্যশক্তিমান্ সবিশেষ বস্তু এবং স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় বিশেষত্রয়ে নিত্যবিরাজমান। শুদ্ধদ্বৈত-দর্শনে,—সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ ও ভক্ত—পরস্পর নিত্য-সেব্য-সেবকরূপে ভেদসম্বন্ধবিশিষ্ট। একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই স্বতন্ত্র, আর সকলেই পরতন্ত্র; তিনি—ক্ষর ও অক্ষর (লক্ষ্মীদেবী), উভয় হইতেই উত্তম অর্থাৎ পুরুষোত্তম। ভগবানে ও জীবে, ভগবানে ও জড়ে, জীবে ও জড়ে এবং জড়ে ও জড়ের মধ্যে পরস্পর ভেদ নিত্যবর্তমান। এইরূপ পাঁচপ্রকার নিত্য-ভেদসত্তা ভগবানে নিত্য-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে। দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনে,—চিন্ময়রসবিগ্রহ ভগবান্—সর্বদা বিষয় ও আশ্রয়গত বস্তুরূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত। যেস্থলে আশ্রয়গত চিৎসত্তা, সেস্থলে আশ্রয়ের নিত্যসত্তায় ঘনানন্দের সম্বেতৃরূপে ভগবান্ লীলাময় এবং যেস্থলে নশ্বর সমল আশ্রয়রূপে জড়সত্তা, সেস্থলে ভগবানের লীলা—কুণ্ঠদর্শনে সঙ্কুচিত; তাহা বৈকুণ্ঠ হইলেও প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিতে মায়িক অনিত্য বলিয়া প্রতীত হয়। শুদ্ধাদ্বৈত-দর্শনে,—ভগবত্তায় জড়ের হেয়ত্ব ও ভেদ আরোপিত হয় না; ভগবদুন্মুখ হইলেই মুক্তজীবের চিদ্দর্শনে জড়ের ভেদগত সত্তা তাঁহার সত্যদর্শনে বাধা দেয় না এবং চিদ্বৈচিত্র্যের নিত্য অস্তিত্বের বিনাশকও হয় না। বিভুচৈতন্যের সহিত অণুচৈতন্যের সেব্য-সেবক ভাবে লীলা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাতকারিণী নহে। অদ্বৈতদর্শনে নশ্বর জড়সত্তা নিত্যসত্তা হইতে ভিন্নরূপে দৃষ্ট হয় বলিয়া চিদ্বৈচিত্র্য অস্বীকৃত বা অস্বীকার্য নহে।

ভগবান্ বিষ্ণুর ব্যক্তিগত সত্তার অর্থাৎ পুরুষোত্তমত্বের বিরোধী দলকেই 'অবৈষ্ণব দার্শনিক' বলা যায়। নির্বিশেষ-বাদে ভগবৎসম্বন্ধী চিন্ময় বিশেষসমূহকেও বলপূর্বক 'মায়িক' বলা হইয়াছে। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা মায়ার রচিত বলিয়া মনে করিলে ভগবত্তার নির্বিশেষত্বেরই কল্পনা করা হয়। ভগবানের নিত্যবিলাস- বৈচিত্র্যরূপ বিশেষসমূহ মায়া উৎপন্ন হইবার পূর্বেও ছিল, মায়ার ক্রিয়া সমাপ্ত হইলেও থাকিবে। মায়াতে সেই বিশেষত্বের একপাদ-পরিমিত সামান্য প্রতিফলিত ধর্মমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে, এরূপ বুঝিবার পরিবর্তে ভগবত্তাকে 'মায়িক' মনে করা সূক্ষ্মবুদ্ধির ও তত্ত্ববিমর্শনের অভাব বলিতে হইবে। 'মায়ার রাজ্যেই মায়াতীত বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে বাস করিতে হইবে, সর্বশক্তিমান্ ভগবানের শক্তির অভাব আছে, জীব স্বীয় জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা যাঁহাকে পরিমাণ করিতে অসমর্থ, তাদৃশ বাস্তব ভগবদধিষ্ঠানের নিত্যস্থিতি নাই,—এরূপ আত্মম্ভরিতাময়ী চিত্তবৃত্তি লইয়া পরমার্থতত্ত্বের দর্শন সম্ভব নহে।

বিভুচৈতন্য ভগবান্ বিষ্ণু—নিত্যকাল মায়ার অধীশ্বর, আর অণুচৈতন্য বৈষ্ণব জীব—মায়ার বশ্য। বিভুচৈতন্য এক অদ্বিতীয় হইয়াও অনন্ত অসংখ্য নিত্যমূর্তিতে নিত্যকাল নিত্যধামে প্রকাশমান আছেন, আর অণুচৈতন্য শুদ্ধ জীবাত্মা অনেক ও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া নিত্যকাল তাঁহার নিত্য-সেবায় ব্যাপৃত। অণুচৈতন্য মায়াবাদী জীবগণ

দুর্ভাগ্যক্রমে মায়াকে স্বীয় ঈশ্বরী বলিয়া জ্ঞান করিয়া মায়ার অনিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করায় তাঁহারা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বিভুচৈতন্য হইবার উদ্দেশ্যে মায়াবশই হইয়া পড়েন। অণুচৈতন্য-জীবের স্বরূপে নিত্য বৃহত্ত্বাভাব-বশতঃ তাঁহাতে সেব্য-ধর্ম কোনদিনই নাই,—তাঁহার চিন্ময়ী আত্মস্বরূপ-বৃত্তিতে ভগবদ্দাস্যই নিত্যকাল বিরাজমান। যখন তিনি হরিসেবা-বিমুখ, তখনই তাঁহাকে মায়ার সেবকরূপে মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে অনিত্যভোগে ব্যস্ত দেখা যায়।

(২)

নিরীশ্বর সাংখ্যমতকে গৌড়ীয়-দর্শন বিশেষভাবে খণ্ডন ক'রেছেন। জগতের উপাদান-কারণরূপ প্রধান এবং নিমিত্তকারণরূপ মায়া—মায়ার এই দুই প্রকার অবস্থিতি। গৌড়ীয়-দর্শন বলেন,—গুণময়ী মায়া কখনই মুখ্য জগৎকারণ হ'তে পারে না। ভগবদীক্ষণ-শক্তি সঞ্চারিত হ'লে প্রকৃতি সেই ভগবচ্ছক্তিবলে জগৎসৃষ্টির গৌণ কারণ হয়—অগ্নি প্রবেশ ক'রে লৌহকে যেরূপ জীবনশক্তি প্রদান করে, তদ্রূপ। অজাগলস্তনের ন্যায় প্রকৃতির দ্রব্যরূপ-কারণত্ব। গুণরূপ অংশে যে নিমিত্ত-কারণ বলা যায়, তা'তেও কৃষ্ণই নিমিত্ত-কারণ; যেরূপ ঘট-নির্মাণে কুম্ভকার। এ'রা নিমিত্ত-কারণ। নারায়ণ-কুম্ভকারস্থলীয় মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, আর মায়া—চক্র-দণ্ডাদিস্থলীয় গৌণনিমিত্ত-কারণ। যেরূপ কুম্ভকার ব্যতীত ঘট হ'তে পারে না, সেইরূপ কৃষ্ণ ব্যতীতও জগৎ হয় না। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হ'তে মায়ার প্রতি যে ঈক্ষণ করেন, তা'তে দুই প্রকার কার্য হয়। পুরুষের কিরণরূপে অনন্ত জীবকে মায়া-মধ্যে নিবিষ্ট করে এবং স্বয়ং অঙ্গাভাসে মায়া স্পর্শ ক'রে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। অঙ্গাভাস—অঙ্গমিলনের আভাসমাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে অঙ্গমিলন নয়। উহা ''মায়া মিশায়ে এস ভগবান্'' প্রভৃতি চিন্তা-স্রোতের ন্যায় নহে। কৃষ্ণই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক পুরুষাকারে প্রবিষ্ট হন। অতএব কৃষ্ণই মূল জগৎকারণ—

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ।।

পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মধাম, তা'র বাহিরে কারণসমুদ্র। চিন্ময়ধাম—কারণশূন্য, মায়া—কারণময়ী। এই দু'-এর মধ্যবর্তী স্থলকে 'চিন্ময় জলনিধি কারণসমুদ্র' বলা হ'য়েছে। সেই জলশায়ী ভগবানের ঈক্ষণই তা'র বাহিরে মায়াকে লক্ষ্য ক'রে সৃষ্ট্যাদি কার্য করে। সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়াশূন্য কৃষ্ণ ও পরব্যোমনাথের স্বরূপে কোন মায়া-সম্বন্ধিনী ক্রিয়া হয় না। মহাসঙ্কর্ষণ স্বীয় সুদূর ঈক্ষণাংশে কারণার্ণবে শায়িতভাবে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। ইনি আদ্যপুরুষাবতার। কারণার্ণবের বাহিরে মায়াশক্তির অবস্থিতি। মায়া কারণসমুদ্রকে স্পর্শ করতে পারে না; ভগবদীক্ষণ মায়া-মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে মায়াকে ক্রিয়াবতী ক'রে থাকে।

পরব্যোমে মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের 'মহাবস্থ' নামক ব্যূহচতুষ্টয়। তন্মধ্যে বাসুদেব আদি-ব্যূহ—চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অবস্থিত,—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে।।

সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের স্বাংশ বা বিলাস। সঙ্কর্ষণকে দ্বিতীয় ব্যূহ, সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ এবং অহঙ্কারতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা হ'য়েছে। ইনি অনন্তদেবে আধারশক্তি নিধান ক'রেছেন এবং রুদ্র, অধর্ম, অহি, অন্ত ও অসুরদিগের অন্তর্যামিরূপে জগতের সংহার-কার্য সম্পাদন করেন। এই সঙ্কর্ষণের বিলাসমূর্তি তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন। ইনি বুদ্ধিতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং স্রষ্টৃত্ব-শক্তি কন্দর্পে সমর্পণ ক'রেছেন। তিনিই বিধাতা, নিখিল প্রজাপতি, বিষয়ানুরক্ত দেব-মনুষ্যাদি প্রাণী এবং কন্দর্পের অন্তর্যামিরূপে সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করেন। চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ ইঁহার বিলাসমূর্তি। ইনি মনস্তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং ব্যষ্টি জীবান্তর্যামী পুরুষ। ইনি ধর্ম, মনু, দেবতা ও নৃপতিগণের অন্তর্যামিরূপে জগতের পালন করেন।

ব্রহ্মসূত্রের ২য় পাদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে' শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যমধ্যে চতুর্ব্যূহের বিষয়ে ভ্রমপূর্ণ বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুবস্তুকে দৃশ্যজগতের অন্যতম বস্তুজ্ঞানে শ্রীপাদের যে ভ্রান্তি, তাহা পঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণ তাহাকে স্বয়ং বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু বদ্ধ ও আসুর-প্রকৃতি জীবের মোহের জন্য তাহাকে যে বিপ্রলিপ্সা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তৎফলেই অদ্বৈতপন্থী অপ্পয়দীক্ষিতাদি ভ্রান্তির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন। বদ্ধজীবগণের যোগ্যতায় চতুর্ব্যূহ জ্ঞান সম্ভবপর নহে। তাহাদের নির্বুদ্ধিতা-বর্দ্ধনের জন্য আচার্য্যের এইপ্রকার দুরুক্তি। চতুর্ব্যূহ শুদ্ধসত্ত্বময়, চিচ্ছক্তিবিলাসী ও ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। তাঁহাদিগকে দরিদ্র ও নিঃশক্তিক বলা ও বোধ করা মূঢ়জীবের ধর্ম। তাদৃশ জীব মায়ামোহিত হইবারই যোগ্য। বৈকুণ্ঠ ও মায়িক দেশকে বুঝিতে না পারিলে এইপ্রকার ভ্রান্তিরই সম্ভাবনা। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের ৪২—৪৫ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে এই চতুর্ব্যূহ বাদ নিরাস করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য হইতে 'চতুর্ব্যূহ' সম্বন্ধে তাহার বিকৃত ধারণামূলক বাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" (৪২)—(শঃ ভাঃ)—

ভাষ্যার্থ এই—'ভাগবতগণ মনে করেন যে, ভগবান্ বাসুদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপু এবং তিনিই পরমার্থতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং আপনাকে চতুর্দ্ধা বিভাগ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই চারপ্রকার ব্যূহ এই,—১ম বাসুদেবব্যূহ, ২য় সঙ্কর্ষণ-ব্যূহ, ৩য় প্রদ্যুম্ন-ব্যূহ, ৪র্থ অনিরুদ্ধ ব্যূহ, এই চারিপ্রকার ব্যূহই তাঁহার শরীর। বাসুদেবের অপর নাম 'পরমাত্মা', সঙ্কর্ষণের অন্য নাম 'জীব', প্রদ্যুম্নের নামান্তর 'মন' এবং অনিরুদ্ধের আর

একটী নাম 'অহঙ্কার'। এই ব্যূহচতুষ্টয়ের মধ্যে বাসুদেব ব্যূহই পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ মূল কারণ। সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বাসুদেব-ব্যূহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, সেই পরা-প্রকৃতির কার্য্য। জীব দীর্ঘকাল ভগবৎ-গৃহে গমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগসাধনে রত থাকিয়া নিষ্পাপ হয়, এবং পুণ্যশরীরী হইয়া পরা-প্রকৃতি ভগবান্‌কে লাভ করে। মহাত্মা ভাগবতগণ যে বলেন, নারায়ণ প্রকৃতির পর এবং পরমাত্ম-নামে প্রসিদ্ধ ও সর্বাত্মা, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে এবং তিনি যে আপনা-আপনি অনেকপ্রকার ব্যূহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা স্বীকার করি। অতএব ভাগবত-মতের ঐ অংশ এই সূত্রের নিরাকরণীয় নহে। ভাগবতগণ যে বলেন, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ উৎপত্তি হইয়াছে, এতদংশের নিষেধার্থ ই আচার্য্য এই সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন।

অনিত্যত্বাদিদোষগ্রস্ত বলিয়া বাসুদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণসংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি একান্ত অসম্ভব। জীব যদি উৎপত্তিমান্ হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি-দোষ অপরিহার্য হইবে। জীব নশ্বরস্বভাব হইলে তাহার ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতেই পারে না। কারণ বিনাশে কার্য্য-বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আচার্য্য বেদব্যাস জীবের উৎপত্তি ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের "নাত্মশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" এই সূত্রদ্বারা নিষেধ করিয়াছেন এবং উৎপত্তিনিষেধদ্বারা নিত্যতা প্রমাণিত করিবেন। অতএব এই কল্পনা অসংগত।'

ভাষ্যার্থ এই—'এতাদৃশী কল্পনা যে অসঙ্গত, তাহার কারণ আছে। লোকমধ্যে দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে দাত্রাদি করণের উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না; অথচ ভাগবতগণ বর্ণনা করেন, সঙ্কর্ষণ-নামক কর্ত্তা-জীব হইতে প্রদ্যুম্ননামক করণ-মন জন্মিয়াছে, আবার সেই কর্তৃজাত প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ভাগবতের এই কথা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে না পারিলে কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে? এই তত্ত্বের অববোধক শ্রুতিবাক্যও শুনা যায় না।'

'ভাগবতদিগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে, উক্ত সঙ্কর্ষণাদি জীবভাবান্বিত নহেন, তাঁহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি ও ঐশ্বর্য্যশক্তিযুক্ত, বল, বীর্য্য ও তেজঃসম্পন্ন সকলেই বাসুদেব, সকলেই নির্দোষ, নিরধিষ্ঠিত, নিরবদ্য। সুতরাং, তাহাদের সম্বন্ধে উৎপত্ত্যসম্ভব—দোষ নাই। এই অভিপ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে যে, এই প্রকার অভিপ্রায় থাকিলে উৎপত্ত্যসম্ভবদোষ নিবারিত হয় না, অন্য প্রকারে এই দোষ থাকিয়া যায়। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—ইহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন; অথচ সকলেই সমধর্মী ও ঈশ্বর। এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে, অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। অনেক ঈশ্বর স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন; কেননা এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই অভিলাষ পূর্ণ হয়। আরও ভগবান্ বাসুদেব এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ও পরমার্থতত্ত্ব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধান্তহানি দোষও প্রসক্ত হইতেছে। এই চতুর্ব্বূহ ভগবানেরই

এবং তাঁহারা সকলেই সমধর্মী, এইরূপ হইলেও উৎপত্ত্যসম্ভব-দোষ পরিহার করা যায় না; কেননা, কোনও রূপ আতিশয্য (ন্যূনতাধিক্য) না থাকিলে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হইতে পারে না। কার্য্যকারণ-মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে; যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়। অতিশয় না থাকিলে কোনটী কার্য্য, কোনটী কারণ, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। আরও দেখ, পঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তিরা বাসুদেবাদির জ্ঞানাদি-তারতম্যকৃত ভেদ বলিয়া মানেন না, প্রত্যুত ব্যূহচতুষ্টয়কে অবশেষে বাসুদেব মান্য করেন। ভগবানের ব্যূহ কি চতুঃসংখ্যায় পর্য্যাপ্ত? অবশ্যই তাহা নহে। ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত সমুদায় জগৎ ভগবদ্ ব্যূহ—ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, উভয়ত্র প্রমাণিত হইয়াছে।'

'ভাগবতদিগের পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রে গুণ গুণিভাব প্রভৃতি অনেক প্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা দেখা যায়। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী, ইহা কোনও প্রকারে সম্ভাব্য নহে। ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন, জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য্যশক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃ এইসকল গুণ এবং প্রদ্যুম্নাদি ভিন্ন হইলেও আত্মা এবং ভগবান্ বাসুদেব।'

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের এই মতবাদের উত্তরে শ্রীরূপ প্রভু লঘুভাগবতামৃতে (চতুর্ব্যূহ বর্ণন প্রসঙ্গে ৮০-৮৩ শ্লোকে) ঃ—

পরব্যোম মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের 'মহাবস্থ' নামক বিখ্যাত ব্যূহচতুষ্টয়ের মধ্যে এই বাসুদেব আদি ব্যূহ এবং চিত্তে উপাস্য; যেহেতু ইনি চিত্তের অধিষ্টাতৃদেবতা এবং বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত। (ভাঃ ৪।৩।২৩) শ্রীসঙ্কর্ষণ ইহার স্বাংশ অর্থাৎ বিলাস; সঙ্কর্ষণকে দ্বিতীয় ব্যূহ এবং সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ বলিয়া 'জীব' ও বলিয়া থাকে। অসংখ্য শারদীয় পূর্ণ শশধরের শুভ্র কিরণ অপেক্ষাও তাহার অঙ্গকান্তি সুমধুর। তিনি অহঙ্কারতত্ত্বে উপাস্য; তিনি অনন্তদেবে স্বীয় আধারশক্তি নিধান করিয়াছেন এবং তিনি স্মরারাতি রুদ্র এবং অধর্ম, অহি, অন্তক ও অসুরদিগের অন্তর্যামিরূপে জগতের সংহার কার্য্য সম্পাদন করেন। সেই সঙ্কর্ষণের বিলাসমূর্ত্তি তৃতীয়-ব্যূহ প্রদ্যুম্ন। বুদ্ধিমান্‌গণ বুদ্ধিতত্ত্বে এই প্রদ্যুম্নের উপাসনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবী ইলাবৃতবর্ষে তাহার গুণগান করিতে করিতে পরিচর্যা করিতেছেন। কোন স্থানে তপ্ত জাম্বুনদের (সুবর্ণের) ন্যায়, কোন স্থানে বা নবীন নীল জলধরের ন্যায় তাঁহার অঙ্গকান্তি। তিনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং স্বীয় স্রষ্টৃত্ব-শক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন। তিনি বিধাতা,—সমস্ত প্রজাপতি, বিষয়ানুরক্ত দেবমানবাদি প্রাণিগণ এবং কন্দর্পের অন্তর্যামিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ ইঁহার বিলাসমূর্ত্তি। মনীষিগণ মনস্তত্ত্বে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি নীলনীরদের সদৃশ। তিনি বিশ্বরক্ষণে তৎপর। তিনি ধর্ম, মনু, দেবতা এবং নরপতিগণের অন্তর্যামিরূপে জগতের পালন করেন। মোক্ষধর্মে প্রদ্যুম্নকে মনের অধিদেবতা এবং অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিদেবতা বলিয়া

নির্দেশ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া (অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন যে বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ যে মনের অধিদেবতা, ইহা) সর্ববিধ পঞ্চরাত্রের সম্মত।

ভগবানের বিলাস ও অচিন্ত্যশক্তি সম্বন্ধে লঘু ভাগবতামৃতে (৪৪-৬৬ সংখ্যা) "এইস্থানে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে মহাবরাহপুরাণে ইহাই শুনিতে পাওয়া যায়---সেই পরমাত্মা হরির সর্ববিধ দেহই নিত্য এবং সর্ববিধ দেহই জগতে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে; ঐ সকল দেহ হানোপাদান-শূন্য, সুতরাং কখনই প্রকৃতির কার্য্য নহে। সকল দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ, চিদেকরসস্বরূপ, সর্ববিধ চিন্ময় গুণযুক্ত এবং সর্বদোষ-বিবর্জিত।' আবার নারদ পঞ্চরাত্রেও বলিয়াছেন---বৈদূর্য্যমণি যেমন স্থানভেদে নীল পীতাদি ছবি ধারণ করে, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুত উপাসনাভেদে স্ব-স্বরূপকে বিবিধাকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন।' অতএব কি নিমিত্ত সেই সকল অবতারের তারতম্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন? উক্ত অহঙ্কার উত্তরে ইহাই বলিতে পারা যায় যে, অচিন্ত্য অনন্ত শক্তির প্রভাবে, একাধারে সেই একই পুরুষোত্তমে একত্ব ও পৃথক্ত্ব, অংশত্ব ও অংশিত্ব, ইহার কিছুই অসম্ভব ও অযুক্ত নহে। তন্মধ্যে একত্বসত্ত্বেও পৃথক্ প্রকাশ, যথা শ্রীদশমে (নারদের উক্তি—"বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, একই শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ষোড়শসহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।" পৃথকত্বেও একরূপত্বাপত্তি, যথা পদ্মপুরাণে—"সেই নির্গুণ নির্দোষ, আদিকর্ত্তা, পুরুষোত্তম দেব হরিঃ বহুরূপ হইয়া পুনর্বার একরূপে শয়ন করেন।" একেরই অংশাংশিত্ব ও বিরুদ্ধ শক্তিত্ব, যথা শ্রীদশমে—'তুমি বহুমূর্তি হইয়াও একমূর্ত্তি, অতএব ভক্তগণ তোমাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া তোমার পূজা করিয়া থাকেন।" আর কূর্মপুরাণে বলিয়াছেন—"যিনি সর্বতোভাবে অস্থূল হইয়াও স্থূল, অনণু হইয়াও অণু, অবর্ণ হইয়াও শ্যামবর্ণ, ও রক্তান্তলোচন।" এই সকল গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ভগবানে নিত্যই অবস্থিত। তথাপি পরমেশ্বরে অনিত্যত্ব প্রভৃতি কোনরূপ দোষ আহরণ কর্ত্তব্য নহে; অথচ ঐ সকল গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহাতে সর্বতোভাবে অপহৃত হইতে পারে।' ইতি। শ্রীষষ্ঠস্কন্ধীয় পদ্যেও পরস্পরবিরুদ্ধ অচিন্ত্যশক্তির কথা কথিত হইয়াছে, যথা—'হে ভগবন্, তোমার অপ্রাকৃত লীলা বিহার বা ক্রীড়া দুর্বোধের ন্যায় প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাধারণ কার্য্য-কারণভাব তোমাতে দেখা যায় না; যেহেতু তুমি আশ্রয়শূন্য, শরীর চেষ্টা-রহিত এবং স্বয়ং নির্গুণ হইয়া এবং আমাদিগের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া স্ব-স্বরূপদ্বারাই এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কর, অথচ তাহাতে তোমার কোনরূপ বিকার নাই। হে প্রভো! তুমি কি দেবদত্ত নামধারী প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় এই সংসারে দেবাসুররূপ গুণবিসর্গমধ্যে পতিত হইয়া পরাধীনতাবশতঃ স্বীয় দেবতাকৃত সুখদুঃখাদি ফল নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া থাক, অথবা অপ্রচ্যুত চিচ্ছক্তিমান থাকিয়াই আত্মারাম এবং উপশমশীলরূপে ঐ সমস্ত ব্যাপারে উদাসীন

অর্থাৎ সাক্ষিরূপেই অবস্থান কর, ইহা আমরা জানি না। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, যাঁহার গুণরাশি গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, যিনি সকলেরই শাসনকর্ত্তা, যাঁহার মাহাত্ম্য কাহারই বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না এবং বস্তু স্বরূপাবোধক বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস এবং কুতর্কজালে আচ্ছাদিত শাস্ত্রদ্বারা যাহাদিগের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত সেই বাদিগণের বিবাদ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ, সেই অচিন্ত্য শক্তিশালী তোমাতে পূর্বোক্ত উভয় গুণই অবিরোধী। সমস্ত প্রাকৃত-জ্ঞানাতীত কেবল-শুদ্ধজ্ঞানময় তোমাতে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? নির্বিশেষ ও সবিশেষ অথবা চিদ্‌গুণময় ও নির্গুণ, এই দুইটি যে তোমার দুইটি ভিন্ন স্বরূপ, তাহা নহে; ভাবনা-ভেদে তোমার একই স্বরূপের দুইপ্রকার প্রতীতি মাত্র। তবে যাহাদিগের বুদ্ধির বিষয় সর্পাদি, তাহাদিগের নিকট যেমন এক রজ্জুখণ্ডই সর্পাদি ভিন্নভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের বুদ্ধি সম এবং বিষম অর্থাৎ অনিশ্চিত, তুমি তাহাদিগের অভিপ্রায়ের অনুসরণ বা তাহাদিগের মধ্যে ভিন্নভিন্ন মতবাদ প্রকাশিত করিয়া থাক।'' ইতি। এই স্থানে কারিকা—শরীরের চেষ্টা ভূম্যাদি আশ্রয় এবং দণ্ডচক্রাদি সহায় ব্যতীত, বিকার-শূন্য তোমার কর্ম অতিশয় দুর্গম। গুণ-বিসর্গ-শব্দদ্বারা দেবাসুরের যুদ্ধাদি উক্ত হইয়াছে। তাহাতে পতিত-আসক্ত, ইহাকেই পারতন্ত্র্য অর্থাৎ পরাধীনতা বলে; যেহেতু আশ্রিত দেবগণের নিকট তোমার পারতন্ত্র্য—কৃপাজনিত (অর্থাৎ তোমার স্বতন্ত্রতার হানি হয় না), তুমি সেই জন্য স্বকৃত-আত্মীয়কৃত অর্থাৎ স্বীয় দেবগণকর্ত্তৃক অর্জ্জিত, সুখ-দুঃখাদিরূপ শুভাশুভ ফলকে কি আপনার বলিয়া মনে কর, অথবা আত্মারামতাপ্রযুক্ত তাহাতে একেবারে ঔদাসীন্য অবলম্বন কর, ইহা আমরা জানি না। কিন্তু (বিরুদ্ধ গুণশালী) তোমাতে এতদুভয়ই অসম্ভব নহে। 'ভগবতি' ইত্যাদি বিশেষণদ্বয় এবং 'ঈশ্বরে' ইত্যাদি পঞ্চ বিশেষণ তাহাতে হেতু; তন্মধ্যে 'ভগবৎ' শব্দদ্বারা সর্বজ্ঞতা, 'অপরিগণিত' ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা সদ্‌গুণশালিতা এবং 'কেবল' পদদ্বারা ব্রহ্মত্বের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। ব্রহ্মত্বহেতু সর্বত্র ঔদাসীন্যের সম্ভাবনা হইলেও, 'ভগবতি ইত্যাদি গুণদ্বয় দ্বারা ভক্তপক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা আছে। যদি বল, একই স্বরূপের যুগপৎ দ্বিরূপতা কিরূপে সম্ভাবিত হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন,—'অর্বাচীন' ইত্যাদি, অর্থাৎ যাহারা বস্তুস্বরূপ অবগত হইতে পারে না, তুমি সেই বাদিগণের বিবাদের অনবসর অর্থাৎ অগোচর। অতএব অচিন্ত্য আত্মশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া, বিরুদ্ধ হইলেও তোমাতে কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? তোমার স্বরূপ অভক্ত বিবাদিগণের অচিন্ত্য, শক্তিও সেইরূপই অচিন্ত্য। নানাপ্রকার বিরুদ্ধ কার্য্যসমূহের আশ্রয় হইতে দেখিয়াই অনুমান করা যায় যে, তোমার সেই শক্তি অচিন্ত্য। ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"অচিন্ত্যে সেব্য বিষয় একমাত্র শ্রুতি অর্থাৎ শব্দ প্রমাণের গোচর হইয়া থাকে।" আর স্কন্দ পুরাণেও বলিয়াছেন— "অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কের উদ্ভাবনা করিতে নাই।" প্রাকৃতমণিমহৌষধাদিতেও এই অচিন্ত্য

প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাদৃশ অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবেই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য দুরবগাহ্য বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। অজ্ঞান এবং ইন্দ্রিজালবিদ্যা যেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব অজ্ঞান ও ইন্দ্রজালাদি দ্বারা পরমেশ্বরের পারমৈশ্বর্য্য প্রতিপন্ন হয় না; যেহেতু 'উপরত' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা ঈশ্বরে ঐ উভয়ের অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বরে অজ্ঞান ও ঈন্দ্রজাল স্বীকার করিলে, 'ভগবতি' ইত্যাদি ষড়্‌বিধ বিশেষণ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য নিষ্ফল হইয়া উঠে। অতএব অচিন্ত্যশক্তি-নিরূপক শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা বিশ্বপালকত্ব এবং তাহাতে ঔদাসীন্য এই দুইগুণ বিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহাদিগের চিত্ত অজ্ঞানবশতঃ সর্পাদিভাবে ভাবিত, তাহাদিগের বুদ্ধিতে রজ্জুখণ্ড যেমন সর্পাদিরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের মতি নানাভাবে ভাবিত, সুতরাং যাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, তুমিও তাহাদিগের মতানুসারে সেই সেই ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাক। যদি বল, কেবল-জ্ঞানকে ব্রহ্ম এবং নানাধর্মাশ্রয় বস্তুকে 'ভগবান্' বলায়, তাঁহাতে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে; এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য বলিয়াছেন,—'স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ। এতদ্দ্বারা কখনই তাহার স্বরূপের দ্বৈতত্ব বলা হয় নাই, কেবল একই স্বরূপের ধর্মদ্বয় নির্ণয় করা হইয়াছে। অতএব তাঁহার শক্তিবিলাসের যে বিরোধ প্রতীতি হয়, তাহাকেই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বলে; ইহা তাঁহার ভূষণ ব্যতীত দূষণ নহে। তৃতীয়স্কন্ধেও এতাদৃশ বিরোধ কথিত হইয়াছে—"প্রাকৃতচেষ্টাহীনতা কর্ম, অজের জন্ম, কাল স্বরূপ হইয়াও শত্রুভয়ে দুর্গাশ্রয় ও মথুরা হইতে পলায়ন এবং আত্মারামের ষোড়শসহস্র রমণীর সহিত বিলাস, এই সকল বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়।" সেই সকল কর্মাদি বাস্তব না হইলে কখনই তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধি ভ্রান্ত হইত না। অতএব ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই লীলার হেতু। তাঁহার যেমন যেমন ইচ্ছা প্রকটিত হয়, অচিন্ত্যশক্তিও সেই সেইরূপেই লীলার আবিষ্কার করিয়া থাকেন।

পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র সম্পূর্ণ বেদানুমোদিত উপাসনাকাণ্ডময় বেদ বিস্তার গ্রন্থ। ইহা রাজস বা তামস তন্ত্র নহে, পরন্তু 'সাত্বত-সংহিতা' নামে সূরিগণের নিকট পরিচিত। ইহার বক্তা স্বয়ং শ্রীনারায়ণ, ইহা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম-পর্বে ৩৪৯ অঃ ৬৮ শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীনারদাদি ভ্রমাদি-দোষচতুষ্টয়-রহিত দিব্যসূরিগণ ইহার প্রবর্তক। শ্রীভাগবতগ্রন্থও সাত্বত-সংহিতা-নামে পরিচিত। এই পাঞ্চরাত্রিক মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ও বিপরীত কথাকে পাঞ্চরাত্রিক-মতরূপে পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন প্রয়াস-ন্যায় ও সত্যের নিরতিশয় অপলাপ মাত্র, তাহা সংক্ষেপে খণ্ডনমুখে প্রদর্শিত হইতেছে—

(১) ৪২ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর সঙ্কর্ষণকে 'জীব' বলিয়াছেন, বাস্তবিক ভাগবতগণ সঙ্কর্ষণকে কখনও 'জীব' বলেন নাই, তিনি স্বয়ং অধোক্ষজ, অচ্যুত, বিষ্ণু-

তত্ত্ব, জীবের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, পূর্ণ, অংশী, বিভুচৈতন্য, যাবতীয় প্রাকৃতাপ্রাকৃতসর্গের কারণ—অণুচৈতন্য, অংশ জীব নহেন। জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যু নাই—ইহা ভাগবতগণ এবং যে কোন শ্রৌতপন্থী শাস্ত্রদ্রষ্টা ও শাস্ত্রশ্রোতা স্বীকার করিবেন।

(২) ৪৩ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যের উত্তরে মূল-সঙ্কর্ষণ হইতে অন্যান্য যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের প্রাকট্যের বিষয় 'ব্রহ্মসংহিতা'য় উক্ত,—

''দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতু-সমানধর্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।''

অর্থাৎ 'দীপরশ্মি যেরূপ ভিন্নাধারে পৃথক্ দীপের ন্যায় কার্য করে অর্থাৎ পূর্বদীপের ন্যায় সমানধর্মা, তদ্রূপ যে আদি পুরুষ গোবিন্দ বিষ্ণু হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।'

(৩) ৪৪ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে 'ইহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন'—শ্রীপাদের এই পূর্বপক্ষকে পাঞ্চরাত্রিকগণ কখনই নিজমত বলিয়া স্বীকার করেন না। শ্রীপাদ শঙ্করের নিজেরই ৪২ সূত্রের ভাষ্যে পূর্বোল্লিখিত স্বীকৃত-মত—''স আত্মাত্মানমনেকধা ব্যূহ্যাবস্থিত ইতি, তন্ন নিরাক্রিয়তে'' অর্থাৎ ''তিনি যে আপনা আপনিই অনেক প্রকার ব্যূহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা শ্রুতিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি।''-—তাঁহার এই সূত্রের পূর্বপক্ষের আপত্তির বিরোধী অর্থাৎ তাঁহার ৪৪ সূত্রের ভাষ্য ও ৪২ সূত্রের ভাষ্যের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী—যাহা তিনি পূর্বে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহাই এক্ষণে পূর্বপক্ষরূপে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভাগবতগণ নারায়ণের চতুর্ব্যূহ স্বীকার করায় 'বহ্বীশ্বরবাদ' স্বীকার করেন নাই—তাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বলিয়াই জানেন—কখনই বেদবিরোধী বহ্বীশ্বরবাদী নহেন। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের অচিন্ত্য-মহাশক্তি-সত্তায় দৃঢ়বিশ্বাসী। লঘুভাগবতামৃতের মর্মানুবাদ দ্রষ্টব্য। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই তত্ত্বচতুষ্টয় মধ্যে কারণ-কার্যভাব নাই—''নান্যৎ যৎ সদসৎপরং'', দেহ-দেহি-বিভেদোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ (কূর্ম পূঃ), তাঁহারা সকলেই মায়াধীশতত্ত্ব, শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, তুরীয়; তাঁহাদের প্রকাশে মায়ার কোন বিক্রম বা বিকার অথবা পরিণাম বা খণ্ডত্ব থাকিতে পারে না। তাঁহারা একই অদ্বয়জ্ঞান, অধোক্ষজ ও পূর্ণবস্তু, শ্রুতিপ্রমাণ—''ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।'' (বৃঃ আঃ ৫।১) আব্রহ্মস্তম্ব বা ভগবান্ বিষ্ণুর স্থূল বহিরঙ্গকে শক্তিত্রয়াধীশ শ্রীচতুর্ব্যূহের সহিত এক বা সমজ্ঞান চিদচিৎ-সমন্বয়বাদীর বৃথা প্রয়াস ও নিতান্ত ভগবদ্ বিরোধমূলক নাস্তিক্যবাদ মাত্র। আব্রহ্মবস্ত বা বিশ্বরূপ বিষ্ণুর বহিরঙ্গ বৈভব—একপাদবিভূতি, মায়া বা প্রকৃতি-সম্বন্ধী, সুতরাং প্রাকৃত, উহার সহিত চিদচিদের ঈশ্বর চতুর্ব্যূহের সাম্যজ্ঞান বা প্রয়াস মায়াবাদীর ধর্ম।

(৪) ৪৫ সংখ্যক ভাষ্যের উত্তরে লঘুভাগবতামৃতে ভগবদ্গুণের অপ্রাকৃতত্ববর্ণন-

প্রসঙ্গে (৯৭-৯৯ সংখ্যা) উদ্ধৃত বাক্যের মর্মানুবাদ, যথা—'যদি বল, গুণ-মাত্রই প্রকৃতি কার্য, অতএব মরীচিকাসদৃশ, তাহার গণনা করা যায় না, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? তুমি একথা বলিতে পারিতেছ না। ভগবানের গুণ কখনই প্রাকৃত হইতে পারে না, তাঁহার সমস্ত গুণই তাঁহার স্বরূপভূত, সুতরাং সেই সকল গুণ নিশ্চয়ই সুখস্বরূপ। যথা ব্রহ্মতর্কে —"ভগবান্ হরি স্ব-স্বরূপভূত গুণে গুণবান্, অতএব বিষ্ণু এবং মুক্ত জীবের গুণ কদাপি স্ব-স্বরূপ হইতে পৃথক নহে।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"যে পরমেশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণের সংসর্গ নাই, সেই পরমশুদ্ধ আদিপুরুষ হরি প্রসন্ন হউন।" যথা সেই বিষ্ণু পুরাণেই— "হেয় অর্থাৎ প্রাকৃত গুণ ব্যতীত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য এবং তেজঃ, ইহারা ভগবৎ শব্দের অভিধেয়।" পদ্মপুরাণেও—"পরমেশ্বর যে শাস্ত্রে 'নির্গুণ' বলিয়া কীর্তিত আছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাতে হেয় বা প্রাকৃত গুণের অভাবই বলা হইয়াছে। প্রথম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়েও—"হে ধর্ম, যে সকল গুণ কীর্তন করিলাম, সেই গুণপরম্পরা এবং অন্য মহাগুণরাশি যে শ্রীকৃষ্ণে নিত্যরূপে বিরাজমান, মহত্ত্বাভিলাষী ব্যক্তিগণ যে সকল গুণ প্রার্থনা করেন, সেই সকল গুণাবলী কখনই শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিযুক্ত হয় না।" ইতি। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য-অপ্রাকৃত-গুণশালী, অপরিমিত শক্তিবিশিষ্ট এবং পূর্ণানন্দঘনবিগ্রহ। ভাঃ ৩।২৬।২১, ২৫, ২৭, ২৮ দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামানুজ তৎকৃত শ্রীভাষ্যে যে শাঙ্কর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার মর্মানুবাদ—

"ভগবদুক্ত পরমমঙ্গলসাধন পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রেরও কোন কোন অংশকে কপিলাদি-শাস্ত্রের ন্যায় শ্রুতি বিরুদ্ধ-জ্ঞানে অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া শ্রীশঙ্কর নিরাস করিয়াছেন। পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে কথিত আছে যে—পরমকারণ ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে 'সঙ্কর্ষণ' নামক জীবের উৎপত্তি, সঙ্কর্ষণ হইতে 'প্রদ্যুম্ন' নামক মনের উৎপত্তি এবং মন হইতে 'অনিরুদ্ধ' নামক অহংকারের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে জীবের উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না, কেননা, উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। 'চিন্ময় জীবাত্মা কখনও জন্মে না, বা মরে না' (কঠ ২।১৮) এই বাক্যে সকল শ্রুতিই জীবের অনাদিত্ব বা উৎপত্তি-রাহিত্য বলিয়াছেন; অতএব জীব, মন ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃ-দেবের আবির্ভাবই উদ্দিষ্ট হইয়াছে (৪২ সূঃ)

সঙ্কর্ষণ হইতে 'প্রদ্যুম্ন'-নামক মনের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এস্থলেও কর্তা-জীব হইতে করণ মনের উৎপত্তি সম্ভব হয় না; কারণ, 'পরমাত্মা হইতে প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি হয়' ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। অতএব যদি জীব হইতে মনের উৎপত্তি কথিত হয়, তবে 'পরমাত্মা হইতেই উহাদের উৎপত্তি' এতাদৃশ শ্রুতি বচনের সহিত উহার বিরোধ ঘটে, অতএব এই বাক্য শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া ইহার প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে (৪৩ সূঃ)

সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইঁহাদের পরব্রহ্মভাব বিদ্যমান থাকায় তৎ প্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না অর্থাৎ এই সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহ সাধারণ জীবের ন্যায় মায়াবশযোগ্যরূপে অভিপ্রেত নহেন—ইঁহারা সকলেই ঈশ্বর—সকলেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল বীর্য ও তেজঃ প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন, অতএব পঞ্চরাত্রের মত অপ্রামাণ্য নহে। যাহারা পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-প্রক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই 'জীবোৎপত্তিরূপা বিরুদ্ধকথা অভিহিত হইয়াছে', এইরূপ অশাস্ত্রীয় কথা বলা সম্ভব। ভাগবত প্রক্রিয়া এইরূপ—যিনি স্বাশ্রিত ভক্তবৎসল বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্বাশ্রিত ও সমশ্রেণীয়তার জন্য চারি প্রকারে অবস্থান করেন; যথা পৌষ্কর-সংহিতায় এইরূপ কথিত আছে—যে স্থলে (শাস্ত্রে) ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ক্রমাগত সংজ্ঞাসমূহ দ্বারা অবশ্যকর্তব্যরূপে চাতুরাত্ম্য (চতুর্ব্যূহ) উপাসিত হন, সেই শাস্ত্রই 'আগম'। ঐ চাতুরাত্ম্যের উপাসনা যে বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মেরই উপাসনা, উহা সাত্বতসংহিতায়ও কথিত হইয়াছে; বাসুদেব নামক পরমব্রহ্ম, সম্পূর্ণ যাড়্গুণ্যবপু, সূক্ষ্ম, ব্যূহ ও বিভব, এইসকল ভেদাভিন্ন এবং অধিকারানুসারে ভক্তগণ দ্বারা জ্ঞানপূর্বক কর্মদ্বারা অর্চিত হইয়া সম্যগ্রূপে লব্ধ হন। বিভব অর্থাৎ নৃসিংহ, রঘুনাথ বা মৎস্যকূর্মাদি অবতারের অর্চন হইতে সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহ-প্রাপ্তি এবং ব্যূহার্চন হইতে বাসুদেব নামক পরব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। যেহেতু পৌষ্করসংহিতায় কথিত হইয়াছে—'এই শাস্ত্র হইতে জ্ঞানপূর্বক কর্মদ্বারা বাসুদেব নামক অব্যয় পরমব্রহ্ম পাওয়া যায়, অতএব সঙ্কর্ষণাদিরও পরব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল, কেননা, তাঁহারাও স্বেচ্ছাক্রমে বিগ্রহবিশিষ্ট'। 'তিনি প্রাকৃতের ন্যায় জন্মগ্রহণ না করিয়া বহুরূপে অবতীর্ণ বা প্রকটিত হন' ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। আশ্রিতবাৎসল্যনিমিত্ত স্বেচ্ছাক্রমে মূর্তি পরিগ্রহ করেন বলিয়া তদভিধায়ক এই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ নহে। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—যথাক্রমে জীব, মন ও অহঙ্কার, এই সত্ত্বসমূহের অধিষ্ঠাতৃদেব, এইজন্য ইঁহাদিগকে যে 'জীবাদি'-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ নাই। যেমন 'আকাশ' ও 'প্রাণাদি'-শব্দে ব্রহ্মের অভিধান হইয়া থাকে, তদ্রূপ (৪৪ সূঃ)

এই শাস্ত্রে জীবোৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, যেহেতু পরমসংহিতায় কথিত, আছে—'অচেতন, পরার্থসাধক, সর্বদা বিকারযোগ্য ত্রিগুণই কর্মীদিগের ক্ষেত্র—ইহাই প্রকৃতির রূপ। ইহার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ ব্যপ্তিরূপ, উহা যে অনাদি, ইহাও সত্য'। এইরূপ সকল সংহিতায়ই 'জীব' নিত্য, এইজন্য পঞ্চরাত্র-মতে তাহার উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহর উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী,—জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বিনাশও স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু জীব যখন নিত্য, তখন নিত্যত্বহেতু তাহার উৎপত্তি আপনা হইতেই প্রতিষিদ্ধ হইবে। পূর্বে পরমসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—'প্রকৃতির রূপ সতত বিকারযুক্ত' অতএব উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি এই 'সত্ত বিকারে'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত

জানিতে হইবে। অতএব সঙ্কর্ষণাদি জীবরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া শঙ্করাচার্য্য যে দোষ দিয়াছেন, তাহা নিরাকৃত হইল (৪৫ সূঃ)। (ভা ৩।১৩।৩৪), শ্রীধরটীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই চতুর্ব্যূহ-বাদ-খণ্ডনের বিস্তৃত নিরাস জানিতে হ'লে শ্রীভাষ্যের শ্রীমৎ সুদর্শনাচার্য্যকৃত 'শ্রুতপ্রকাশিকা' টীকা আলোচ্য।

(৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর যখন শ্রীপুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য নদীয়া-সম্পর্কে যুবক-সন্ন্যাসীকে স্নেহচক্ষে দেখিয়াছিলেন। বহু সন্ন্যাসীর উপদেষ্টা অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ও বেদান্তশাস্ত্রের পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাশয় নিমাইকে বেদান্তদর্শনে অনভিজ্ঞ জ্ঞানে শাস্ত্র শ্রবণ করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অমানি-মানদ-ধর্মের প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেব সপ্ত দিবস পণ্ডিতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার পর "বুঝিতে পারিয়াছেন কিনা" পণ্ডিত সার্বভৌম মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করায় মহাপ্রভু বলিলেন,—"আপনার কৃত অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ব্যাসের অভিপ্রায় শ্লোকে স্পষ্ট প্রকাশিত, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।" সার্বভৌমের ব্যাখ্যাত 'বিবর্তবাদ' তিনি স্বীকার করিলেন না, শক্তি-পরিণামবাদের কথাই বিশেষভাবে বিচার করিলেন।

ব্রহ্মসূত্রে ব্যাস শক্তি-পরিণামবাদের বিচারই ব'লেছেন। বস্তু-পরিণামবাদ ব্যাসের অভিমত নহে। কাজেই আচার্য্য শঙ্কর ব্যাস পাছে 'ভ্রান্ত' প্রতিপন্ন হন, এই আশঙ্কায় যে বাদ উঠিয়েছেন, তা'র কোন অবকাশই নাই। শ্রীগৌর সুন্দর ব'লেছেন—

ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম-বাদ'।
'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি' তা'র উঠাইল বিবাদ।।
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি' 'বির্বত-বাদ' স্থাপনা যে করি।।
বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ সেই ত' প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্তের স্থান।।
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম।।
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি।।
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিও মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে।।
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি,—ইথে কি বিস্ময়?

ব্রহ্মসূত্রের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্রকে উপলক্ষ ক'রে "অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি"—এই সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলেন যে, আনন্দময়-বাক্যে ব্রহ্ম-শব্দটি সংযুক্ত না থাকায় তাঁ'কে 'মুখ্য ব্রহ্ম' বলা যেতে পারে না। আনন্দময়কে 'ব্রহ্ম' ব'ল্‌লে বাধ্য হ'য়ে অবয়ব-সম্বন্ধ-হেতু সবিশেষ-ব্রহ্মই ব'লতে হয়। আনন্দময়-শব্দে আনন্দ-প্রচুর অর্থাৎ প্রাচুর্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় কথিত হ'লে তা'তে দুঃখেরও অস্তিত্ব আছে জানা যায়; কেন না, আধিক্য-অনুসারেই 'প্রচুর' শব্দের প্রয়োগ হয়, অল্পতা তা'র লক্ষ্য থাকে না। শঙ্করাচার্য আরও বলেন,—আনন্দময় 'শুদ্ধ ব্রহ্ম' ন'ন্ ব'লেই শ্রুতি আনন্দময়ের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উক্তি না ক'রে আন্দমাত্রের অভ্যাস ক'রেছন। তিনি আরও বলেন, যদিও "আনন্দময়মাত্মানং" শ্রুতিতে আনন্দময়েরই অভ্যাস দেখা যায়, তথাপি অন্ন-ময়াদির মধ্যে উহা পতিত হওয়ায় আনন্দময়েরও শুদ্ধ-ব্রহ্মবোধকতা নিরস্ত হ'য়েছে। শ্রীশঙ্করাচার্য "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" সূত্রের ভাষ্যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং"—এই ছান্দোগ্য-মন্ত্রের উদাহরণ দিয়ে পরিণামবাদকে দোষযুক্ত 'বিকারবাদ' ব'লে বিতর্ক উত্থাপন ক'রেছেন।

পরিণাম-বাদের লক্ষণ এই—"স-তত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।" একটি সত্য তত্ত্ব হ'তে অন্য একটি সত্য তত্ত্বের উদয় হ'লে তা'তে অন্যবস্তু ব'লে যে বুদ্ধি, উহাই 'বিকার' বা 'পরিণাম'। বিকার বা পরিণাম-বাদের উদাহরণরূপে আমরা দেখতে পাই,—'দুগ্ধ' একটি সত্যপদার্থ; উহাই 'দধি'রূপ অন্য সত্যপদার্থরূপে বিকৃত। 'ব্রহ্ম— একটি সত্যবস্তু, তা' হ'তে জীব'রূপ অন্য একটি সত্যবস্তু, 'মায়িক ব্রহ্মাণ্ড'রূপ আর একটি সত্যবস্তুর পৃথগ্‌রূপে উদয় হ'য়েছে, এরূপ বুদ্ধিকে ব্রহ্মের 'বিকার' বা 'পরিণাম' বলা হয়।

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং"—এই বেদমন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মেরই শক্তি যে জগদ্‌রূপে পরিণত হ'য়েছে, এ'তে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মের একটি অচিন্ত্য শক্তি আছে। তা' আমরা "পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" এই শ্রুতিমন্ত্রে জান্‌তে পারি। সেই শক্তিক্রমে ব্রহ্মের শক্তিধর্মই জগদ্‌রূপে পরিণত হয়,—এরূপ সিদ্ধান্তে কোন দোষ হ'তে পারে না। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ং" (ছাঃ ৬।২।১), "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।২।৩), "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" (ছাঃ ৬।৮।৪), "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৬।৮।৭) প্রভৃতি ছান্দোগ্যমন্ত্রে সেই ব্রহ্মই যে নিজ-শক্তিক্রমে চিজ্জড়াত্মক জদগ্‌রূপে পরিণত, ইহাই প্রসিদ্ধ। জগৎ ও জীব—'উপাদেয়', ব্রহ্ম—'উপাদান'। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্মের উপাদানত্ব এবং জীব ও জড়ের উপাদেয়ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। পরিণাম-বাদের যথার্থ মর্ম বুঝতে না পারলে এই 'জগৎ' ও 'জীব'কে পৃথক সত্যতত্ত্ব ব'লে বোধ হয় না। "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ" ইত্যাদি ছান্দোগ্যমন্ত্র হ'তে জানা যায়,—

'জীব' ও জীবায়তন 'জড়জগৎ' সত্যবস্তু। সুতরাং এস্থলে "ব্রহ্মের বিকারিত্ব হ'বে"—এই নিরর্থক আশঙ্কায় 'রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি' ও 'শুক্তিতে রজত-বুদ্ধি'র ন্যায় জীব ও জগতের মিথ্যা-স্বরূপ কল্পনা করা প্রতারণা-মাত্র। অবশ্য এরূপ অদৈব-মোহন-কার্যের ভার নিয়ে আচার্য শঙ্কর ভগবদাদেশেই জগতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন এবং তিনি তদনুসারেই প্রচার ক'রে অদৈবদিগের হস্ত হ'তে বেদ-সরস্বতীকে রক্ষা ক'রেছেন।

মাণ্ডুক্যাদি শ্রুতিতে যে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও শুক্তিতে রজতবুদ্ধির উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়, তাদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োগস্থল আছে। জীব শুদ্ধ চিৎকণ, মানবদেহবিশিষ্ট জীবের যে জড়দেহে আত্মবুদ্ধি, সেইটিই বিবর্তের স্থল। "অবত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ"—যে বস্তু যেটি নয়, তা'কে সেই বস্তু ব'লে প্রতীতি করার নাম 'বিবর্ত'। জীবের পক্ষে বিবর্ত একটি মহাদোষ। বদ্ধজীব সেই বিবর্তবুদ্ধিদোষে দুষ্ট। এরূপ বিবর্তদোষকে মূলবিশ্বতত্ত্বে ও জীবতত্ত্বে আরোপ করা বঞ্চনা মাত্র। অচিন্ত্যশক্তিকে ভুলে গেলেই এরূপ ভ্রমের উদয় হয়।

শঙ্করাচার্য বলেন,—আনন্দময়-শব্দের 'ময়ট্' প্রত্যয় বিকার-বোধক—প্রাচুর্য-বোধক নয়। এ সম্বন্ধে 'সর্বসম্বাদিনী'তে শ্রীল জীবগোস্বামী ব'লেছেন,—"যদি চ সূত্রকারস্য বেদান্তার্থানভিজ্ঞতাং নিগূঢ়মভিপ্রায়তা, তৎ-প্রমাদমার্জ্জনস্বচাতুরী-ব্যঙ্গ ভঙ্গ্যা তৎ "আনন্দময়ঃ" সূত্রমেবং ব্যাখ্যেয়ং—

আনন্দময়ঃ ইত্যত্র "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি স্বপ্রধানমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ইতি, তথা বিকারসূত্রে (১।১।১৩) চ 'বিকার'-শব্দেনাবয়বঃ, 'প্রাচুর্য'-শব্দেন 'সাদৃশ্যং' ব্যাখ্যেয়ং তদা সূত্রকারস্যাশাব্দিকত্বৈব প্রসজ্যেৎ—তত্তচ্ছব্দাদিভিস্তৎ তদর্থানভিধানাৎ। 'ময়ট্'-প্রত্যয়-বিকার-প্রাচুর্য-শব্দানামনন্তর-নির্দ্দিষ্টানাং অন্যার্থত্বং ন বা বালকস্যাপি হৃদয়মারোহতি।"

'আনন্দময়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের মধ্যে "ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা"—এই শ্রুতিবাক্যে 'মুখ্য ব্রহ্ম'ই উপদিষ্ট। "বিকার-শব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্যাৎ"-সূত্রে বিকার-শব্দে 'অবয়ব' এবং প্রাচুর্য-শব্দে 'সাদৃশ্য' ব্যাখ্যাত হ'লে সূত্রকারের শব্দজ্ঞান ছিল না,—এরূপ প্রসক্তি হয়। যেহেতু তাঁর ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা বেদান্তের তত্তদর্থ প্রতিপন্ন হয় না। 'ময়ট্'-প্রত্যয় হ'তে উৎপন্ন বিকার-প্রাচুর্য-শব্দাদির অনন্তর নির্দিষ্ট শব্দ-সমূহের অন্য অর্থই বা কি হ'তে পারে,—এ কথা ত' বালকের হৃদয়েও উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ময়ট্-প্রত্যয়ে বিকার ও প্রাচুর্যার্থ-ব্যতীত তা'তে অন্য অর্থ যোজনা করা যে নিতান্ত ভ্রম, তা' সহজেই বুঝা যায়।

মায়াবাদিগণের মতে বিবর্ত বা মিথ্যাবাদের আশ্রয়ে জীব প্রভৃতি যাবতীয় দ্বিতীয়-ভাববিশিষ্ট তত্ত্ব ব্রহ্মের নিজস্ব-স্বরূপে অজ্ঞান-দ্বারা কল্পিত হ'য়েছে। কিন্তু এরূপ বিচার তা'দের যুক্তিতেই টিক্‌তে পারে না। অন্য কোন প্রকার ধর্ম-রহিত, সর্ববিলক্ষণ, অহঙ্কার-

শূন্য, চিন্মাত্র ব্রহ্মবস্তুর অজ্ঞানাশ্রয়-যোগ্যতা, অজ্ঞানবিষয়াশ্রিতত্ত্ব ও ভ্রম-হেতুত্ব কখনই সম্ভব হ'তে পারে না। ব্রহ্ম পরম অলৌকিক বস্তু, সুতরাং তাঁ'তে মানবমনীষা বা জীবমনীষার নিকট যা' অচিন্ত্যনীয়, সেরূপ অবিচিন্ত্যশক্তির অধিষ্ঠান আছে। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু চিন্তামণির উদাহরণ দিয়ে শক্তি-পরিণামবাদ বুঝা'লেন। প্রাকৃত চিন্তামণি প্রভৃতি বস্তুতেও যখন অলৌকিক শক্তি দেখা যায় অর্থাৎ প্রাকৃত চিন্তামণি স্বর্ণ প্রসব ক'রেও যখন নিজে অবিকৃত থাকে, তখন পরব্রহ্মে যে অলৌকিক শক্তি অর্থাৎ জীব ও জগৎ প্রসব ক'রেও অবিকৃত থাক্‌বার শক্তি নিহিত থাক্‌বে, এতে আর আশ্চর্য কি? বাত-কফ-পিত্ত ত্রিবিধ দোষ একাধারে রোগীকে আশ্রয় ক'রলে যেরূপ পরস্পর বিরোধি ধাতু-শোধনের জন্য ঔষদের ব্যবস্থা হয়, তদ্রূপ পরস্পর-বিরোধি-গুণত্রয়ের ধারিণী শক্তির দ্বারা ব্রহ্মের নিরাকারত্বাদি ব্যাপার বিচারিত হ'লেও অবয়বাদি স্বীকৃত হয়। শ্রুতি বলেন,—"বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশঃ স্যুঃ," "আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্র-শক্তিঃ"—অর্থাৎ সনাতনপুরুষ বিচিত্র শক্তিবিশিষ্ট। অপরে তাদৃশ শক্তি-সমূহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতে ব'লেছেন,—আত্মা ঈশ্বর অতর্ক্য-সহস্রশক্তি-বিশিষ্ট। ব্রহ্মসূত্রেও আত্মার ঐ প্রকার বিচিত্রতার স্বীকার আছে,—"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৮)।

ব্রহ্মে কখনও দ্বৈতভাবের সঙ্গতি না থাকায় তাঁ'তে অজ্ঞানাদির অসম্ভাবনাহেতু কল্পনা করা যেতে পারে না। "ব্রহ্ম যে অচিন্ত্যশক্তি-সমন্বিত"—এই শ্রুতিমন্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তি-অনুসারে ব্রহ্মে দ্বৈত-অনুপপত্তি দূরীভূত হ'য়েছে। অচিন্ত্যশক্তিই দ্বৈত-উপপত্তির একমাত্র কারণ ব'লে অবশিষ্ট। সে-জন্য নির্বিকারস্বভাব-সম্পন্ন হ'লেও পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে বিশ্বরূপে পরিণামাদি সংঘটিত হয়। যেরূপ চিন্তামণি স্বয়ং বিকার-বিশিষ্ট না হ'য়েও সর্বার্থ-প্রসবে সমর্থ—অয়স্কান্তমণি যেরূপ নিজে বিকারবিশিষ্ট না হ'য়ে অন্য লৌহাদিকে আকর্ষণ-চালনাদি ক'র্‌তে সমর্থ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তু বিকৃত না হ'য়ে ব্রহ্মের বিকারযোগ্য শক্তিই বিকৃত হ'য়ে বিশ্বাকারে পরিণত হয়। সন্মাত্রত্ব প্রকাশমান স্বরূপেরই বিস্তাররূপে দ্রব্য-নামক শক্তি। সেই শক্তিরূপেরই পরিণতি হয়, স্বরূপের পরিণাম ঘটে না। পূর্বে জল দর্শন ক'রে জল-সম্বন্ধে যে ধারণা উদিত হয়, উহার অপ্রসঙ্গ-সময়ে সেই ভাব নিদ্রিত থাকে বটে, কিন্তু আবার তত্তুল্য বস্তুর দর্শনে সেই বৃত্তি জাগরিত হয়। সেই বস্তুর বিশেষ অনুসন্ধান-ব্যতীত সেই বস্তুকে পূর্ববস্তুর সঙ্গে অভেদপর ব'লে আরোপ কর্‌লে জল কিছু মিথ্যা হ'য়ে যায় না, কিংবা স্মরণময়ী তদাকারা বৃত্তিও মিথ্যা হয় না, অথবা বারিতুল্য মরীচিকাদি বস্তুও মিথ্যা হয় না; কিন্তু বারির সঙ্গে অভেদ ব'লে আরোপই অযথার্থ বা মিথ্যা। "মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্নেন অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ"—এই ন্যায়-অবলম্বনে স্বপ্নে ও জাগরণকালের দৃষ্টবস্তুর আকার স্বরূপিণী মনোবৃত্তিতে পরমাত্মমায়া পূর্বের ন্যায় সেই বস্তুতে অভেদ আরোপ করে।

তজ্জন্য বস্তুতঃ কিছুই মিথ্যা নয়। শুদ্ধাত্মা পরমাত্মায় তাদৃশ তদারোপই মিথ্যা; বিশ্ব মিথ্যা নয়। বিশেষতঃ বিবর্তের উদাহরণ জ্ঞানাদি-প্রকরণের মধ্যে উল্লিখিত হওয়ায় গৌণ ব'লে, পরিণামবাদ স্বপ্রকরণে পঠিত হওয়ায় মুখ্য ব'লে এবং জ্ঞানাদি উভয়-প্রকরণে পঠিত ব'লে "সন্দংশন্যায়সিদ্ধ" প্রাবল্যহেতু শক্তিপরিণামকেই ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য বলে জানা যায়।

শক্তিপরিণামবাদই "জন্মাদ্যস্য"-সূত্রের সম্মত। অসংখ্য অনন্ত নিত্যশক্তির পরিণাম যাঁ'তে জাত, স্থিত ও অব্যক্ত—অনন্ত নিত্যশক্তিসমূহ যাঁ'র অধীন,—এরূপ শক্তি-সমূহের প্রভুই ঈশ্বর। নিত্যানিত্যশক্তি, আত্মানাত্মশক্তি প্রভৃতির যুগপৎ অবস্থিতি অনন্তরূপে বিরাজমান পরমেশ্বরে কিরূপে সম্ভব; তা' জীব বর্তমান জড়বদ্ধাবস্থায় মায়াশক্তির অধীন থাকা-কালে বুঝতে পারে না। তজ্জন্য মানবজ্ঞানের নিকট প্রতীত ঐরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ-গুণ-সমাশ্রয় পরমেশ্বরে নিত্য অবস্থিত। মানব জড়জ্ঞানের অহঙ্কারে নিজের ক্ষুদ্র অজ্ঞানরূপ সামর্থ্যকে মিথ্যা কল্পনার দ্বারা বিপুল ব'লে জ্ঞান ক'রে যে শক্তিরাহিত্যরূপ একটি অবস্থাকে ব্রহ্ম ব'লে কল্পনা করে, তা' চিন্ত্যশক্তির একটি প্রকারভেদমাত্র।" তদ্দ্বারা জগৎকে ঈশ্বরের পরিণাম ব'লে বুঝ্‌তে গেলে বিবর্তবাদ গ্রহণীয় হ'য়ে পড়ে। কিন্তু ঈশ্বরে যে অচিন্ত্য নিত্যশক্তিমত্তা নিহিত,ইহা জানতে পার্‌লে ঈশ্বরের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-পরিণত খণ্ডজ্ঞান-গম্য রাজ্যেও যে তিনি প্রপঞ্চাতীতরূপে প্রকাশিত বা অবতীর্ণ হ'তে পারেন, তা' বুঝা যায়।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা," তদুত্তরে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই সূত্রটি। এই সূত্র পরিণাম-বাদের উদ্দেশ্যেই লিখিত। "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় মন্ত্র, "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ"—এই মুণ্ডক-মন্ত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভোক্ত শ্লোক-সমূহের তাৎপর্য্যই পরিণাম-বাদ। কিন্তু পরিণাম-বাদ গ্রহণ ক'রলে পাছে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র দুষ্টসূত্র ও তল্লেখক শ্রীব্যাসদেব ভ্রান্ত ব'লে কাল্পনিক লক্ষণাবৃত্তিবাদিগণের আক্রমণের পাত্র হন, ইহার প্রতিষেধার্থ শ্রীশঙ্করাচার্য কাল্পনিক যুক্তি বিস্তার ক'রে বেদের অংশবিশেষের অন্যতাৎপর্য্য-জ্ঞাপক বিবর্তবাদই সত্য ব'লে স্থাপন ক'রেছেন।

নির্বিশেষবাদী লক্ষণা-বৃত্তি অবলম্বন ক'রে যে তত্ত্বাভাস প্রদর্শন করেন, তাহাই তত্ত্ববাদের পরিবর্তে 'মায়াবাদ'-নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবিচার কেবলাদ্বৈত-বিচার-দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হ'বার পরেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শ্রীমধ্বাচার্যের তত্ত্ববাদ শ্রৌতপথাবলম্বনে অতাত্ত্বিকগণের তর্কপন্থামূলক সিদ্ধান্ত খণ্ডন ক'রেছন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিধাবৃত্তি-অবলম্বন-পূর্বক বেদান্তার্থকে আদর ক'রেছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য লক্ষণা-বৃত্তি-অবলম্বন-পূর্বক যে বেদান্তার্থ নিজভাষ্যে প্রচার ক'রেছন, তদ্দ্বারা জীবের সর্বনাশ হয়,—ইহাই সাত্বত শাস্ত্র ও শ্রীমন্মহাপ্রভু জানিয়েছেন,—

"মায়াবাদিভাষ্য-শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।।
তাঁ'র দোষ নাহি, তিঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তা'র হয় সর্ব্বনাশ।।"
(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৯ ও আ ৭।১১৪)

"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি।।
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ন্ লোকগর্হিতম্।
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে।।
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে।
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে।।
(পদ্মপুরাণ)

শ্রীশম্ভু বল্‌লেন,—দেবি, আমি যথাক্রমে তামস-শাস্ত্রসকল ব'ল্‌ব তা' শ্রবণ কর—যে-সকল তামস-শাস্ত্রের শ্রবণ-মাত্রে জ্ঞানিগণেরও পাতিত্য হয়। এই সকল শাস্ত্রে শ্রুতিবাক্য-সকলের লোকনিন্দিত কদর্থ প্রদর্শন-পূর্বক কর্মস্বরূপের ত্যাগ প্রতিপাদিত হ'য়েছে। সর্ব-কর্ম-পরিত্যাগে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয় ব'লে এ'তে উক্ত হ'য়েছে এবং আমি পরমাত্মা ও জীবের ঐক্য এ'তে প্রতিপন্ন ক'রেছি।

যেখানে আনন্দ ও চেতনধর্ম নাই, সেখানেই জড়ত্ব। বহির্জগতের জড়বস্তুতে চেতনের ধর্ম নাই—নিত্য ও অব্যাহত আনন্দ-ধর্ম নাই। এখানে পরিবর্তনশীল নিরানন্দফলদায়ক ধর্ম আছে।

শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য ঈশ্বর, জীব ও জড়ে পঞ্চভেদ স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "তত্ত্বমসি"—এই শ্রুতি ব্রহ্মমাত্রনিষ্ঠ "তৎ" পদের দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞাপন ক'রে জীবনিষ্ঠ "ত্বং" পদের দ্বারা জীবের ব্যপদেশ ক'র্‌ছে। "তৎ" এবং "ত্বং" পদদ্বয়ের অর্থভূত সর্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্ব-বিশিষ্ট ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ বা বিশেষ ব্যতীত শ্রুতির সঙ্গতি হয় না।

ঈশ্বর কখনই জীব ন'ন। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সৌসাদৃশ্যমাত্র আছে। quantitative reference এ জীব ও ব্রহ্ম সমান ন'ন।

প্রতিবিম্বভূত নিখিল জীবের বিম্বস্বরূপ বিষ্ণু স্বাভাবিক অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট। যেহেতু তিনি "নিত্যো নিত্যানাং"—এই শ্রুতি-মন্ত্রানুসারে বহু নিত্য প্রতিবিম্বভূত জীবের বিম্ব-স্বরূপ। "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ"—এই শ্রুতি যে ব্রহ্মের স্বাভাবিক নিত্যগুণত্ব ব'লে থাকেন, তাঁ'কে মায়াবাদী মায়া উপাধিযুক্ত ব'ল্‌তে চা'ন! এ'টা শ্রুতি-বিরোধ-ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মায়াবাদিগণ শ্রুতির কদর্থ ক'রে "অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায়

ঈশ্বর ও জীব—এই দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে থাকেন,'' ব'লেছেন। মায়ার বিদ্যাবৃত্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন মহান্ খণ্ড—ঈশ্বর, আর অবিদ্যাবৃত্তি-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অল্পখণ্ড-জীব।

''বিদ্যায়াং প্রতিবিম্ব ঈশ্বরঃ, অবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বস্তু জীবঃ। যথা সরসি রবেঃ প্রতিবিম্বঃ, যথা চ ঘটে প্রতিবিম্বঃ, প্রতিবিম্বো মহদল্পত্বব্যপদেশং ভজতে তদ্বৎ।''

যেমন মহাকাশ নিত্যই বিদ্যমান আছে, একটি ঘটের দ্বারা তা'র কতক অংশ আবৃত হওয়ায় তা' ঘটাকাশ-আখ্যা লাভ ক'রেছে, আবার ঐ মহাকাশের তদপেক্ষা কিছু অল্প অংশ শরাব-দ্বারা আবৃত হওয়ায় উহা শরাবাকাশ নাম ধারণ ক'রেছে। সূর্য্য যেমন সরোবরে ও জলপূর্ণ ঘটে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে যথাক্রমে বৃহৎ ক্ষুদ্র আকারে দৃষ্ট হয়, তেমনি ব্রহ্ম ও বিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হ'য়ে বৃহদ্রূপে ঈশ্বর এবং অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হ'য়ে ক্ষুদ্র জীবরূপে পরিচিত হ'ন। এর নাম—প্রতিবিম্ববাদ।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ একটি সংক্ষিপ্ত সুযুক্তিদ্বারা এই পরিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন ক'রেছেন,—'তত্র যদ্যুপাধেরনাবিদ্য কত্বেন বাস্তবত্বং তর্হি অবিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাসম্ভবঃ। নিধর্মকস্য ব্যাপকস্য নিরবয়বস্য চ প্রতিবিম্বত্বাযোগোঽপি উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ বিম্বপ্রতিবিম্ব-ভেদাভাবাৎ দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ; উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্থ-জ্যোতিরংশস্যৈব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে ন ত্বাকাশস্য দৃশ্যত্বাভাবাদেব''।

উপাধির অবিদ্যা-কল্পিতত্ব স্বীকার না ক'রে যদি তা'র বাস্তবতা স্বীকার করা যায়, তা' হলে অবিষয় ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ-বিষয়তা সম্ভব হ'তে পারে না। যাঁর কোন বিশেষধর্ম নাই, তাঁ'র উপাধির সম্ভাবনা কোথায়? তিনি সর্বব্যাপক; তাঁ'র বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ ভেদই বা কিরূপে হ'তে পারে? নিরবয়ব বস্তু দৃষ্টির বিষয়ীভূত না হওয়ায় তাঁ'র প্রতিবিম্বই বা কিরূপে হ'তে পারে? উপাধি-পরিচ্ছিন্ন-আকাশে চন্দ্র-সূর্য্যাদি যে-সমস্ত জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, তা'দেরই প্রতিবিম্ব সম্ভব। নিরাকার আকাশের প্রতিবিম্ব সম্ভব নয়।

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায়গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ।।

ব্রহ্মের রূপটি অচিন্ত্য ও অব্যক্ত। ব্রহ্ম সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু; চিন্তনীয় নহেন যাহা, তাহাই অচিন্ত্য অর্থাৎ তিনি মানবগণের চিন্তার বিষয় নহেন। যদি চিন্তার বিষয় হইতেন, তাহা হইলে অচিন্ত্য হইতেন না। ব্যক্ত বা প্রকাশিত হন নাই যাহা, তাহাই অব্যক্ত। চিন্ত্য ও ব্যক্ত রূপসকল জড়। চিন্ত্য ও ব্যক্ত রূপের দর্শনই বিশ্বরূপ দর্শন। নিরীশ্বর সাংখ্যকার 'অব্যক্ত' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। নির্বিশেষবাদীর অব্যক্ত বস্তুটি জগৎ—সৃষ্টির পূর্বাস্থা মাত্র। কিন্তু সেই বস্তুকে 'অব্যক্ত-রূপ' বলা হইয়াছে। রূপমাত্রেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। যে বৃহৎ বস্তু বিশ্ব-জগতের দৃশ্য-বস্তুর ক্ষুদ্রতা হইতে নিজ নিরপেক্ষ সত্তাসংরক্ষণে সমর্থ, তিনি ব্রহ্ম। যাহা অব্যক্ত, তাহার রূপ নাই, যাহার রূপ আছে তাহা অব্যক্ত নহে। ''অব্যক্তরূপ'' কথাটি বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।

রূপ ও রূপরহিত অবস্থা যাহাতে যুগপৎ বর্তমান, তিনি অব্যক্ত ও অচিন্ত্যরূপ অর্থাৎ তাঁহার নিত্য রূপ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া আমাদিগের আধ্যক্ষিক বিচারে confusion আনিয়া দেয়, আবার উক্ত বিচার নিরসন করিয়া নিজ অনন্যাপেক্ষিরূপ প্রকট করিতে পারেন।

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায়" অর্থাৎ যে রূপটি নিজেকে পরিবর্তন করেন না। বিশ্বের রূপমাত্রই fade হ'য়ে যায়। তিনি যখন ইন্দ্রিয়জ্ঞানের গোচরীভূত হন, তখনই প্রকাশিত অর্থাৎ অভিধা-বৃত্তিদ্বারাই তখন গ্রহণ-যোগ্য, লক্ষণার দ্বারা গ্রহণ-যোগ্য নহেন। "রূপ" বলিলে রূপদ্রষ্টার চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট জিনিষিকে বুঝায়। তিনি অচিন্ত্যব্যক্তরূপ। তিনি—নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ নাই যাঁহাতে, এমন বস্তু। "গুণাত্মনে" অর্থাৎ তিনি নির্গুণ অথচ "সগুণ" অর্থাৎ সকলকল্যাণ-নিলয় চিদ্গুণরাশি তাঁহাতে অবস্থান করে। জড়-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন বলিয়াই তাঁহাকে "নির্গুণ" বলা হইতেছে। তিনি আমাদের দর্শন, শ্রবণ, মনঃ প্রভৃতির গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত আসামী শ্রেণীর নহেন; যেহেতু 'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ'।

আত্মা—আ-তন্+মনিন্। তন্ ধাতু বিস্তারার্থে প্রযুক্ত। শাস্ত্রে বলেন—'আতত্বাৎ মাতৃত্বাৎ আত্মা হি পরমো হরিঃ'। মা—অর্থাৎ মেপে নেওয়া তিনি মাতৃত্ব গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ যাঁহা হইতে জীব প্রসূত হয়, যিনি Fountainhead তিনিই ব্রহ্ম; তাঁহার সংজ্ঞা এইরূপ—"বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাদ্ ব্রহ্মেতি নিগদ্যতে"। তিনি সকলকে পালন করিতেছেন। আত্মা পালক ও বিস্তৃতিশীল। তিনি—যুগপৎ All-engrossing, All-pervading, All-permeating, All-inclusive ও All-exclusive. গুণজাত জগতে খণ্ডপ্রতীতিতে যে বিস্তার-ধর্ম বা inclusion আছে, তাহাও তাঁহার খানিক আংশিক প্রতীতি মাত্র। সেইজন্যই তাঁহাকে "আততত্মাৎ মাতৃত্বাচ্চ" ইত্যাদি ভাষায় বর্ণন করা হইয়াছে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্বনিরূপণে বলেছেন,—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণোঃ য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।।

শ্রীচৈতন্যদেব ও কৃষ্ণ একই অভিন্ন বস্তু। তিনি পরতত্ত্ব। এই জগৎ হইতে আরোহ বা অধিরোহ পথে ক্রমোর্দ্ধ বিচারে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের অনুভূতির পার্থক্য লক্ষিত হয়। বহিরঙ্গা শক্তির রাহিত্য-বিচারে ব্রহ্ম, তটস্থশক্তির সাহিত্য-বিচারে পরমাত্মা

এবং অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তির সাহিত্যবিচারে বৈকুণ্ঠবিগ্রহ অধোক্ষজ ভগবান্—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।

"তত্ত্ব" শব্দে তদ্ বস্তু ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইতে; তত্ত্ববিদ্‌গণ সেই অদ্বয়-জ্ঞান বস্তুকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে নির্দেশ করেন। এখানে অতদ্‌বস্তুর কথা বলা হইতেছে না, কেবল তদ্‌বস্তুর কথাই আলোচ্য। অদ্বয় অর্থাৎ যাঁহার alternate হয় না, যিনি void of change, যাঁহার integral and differential calculus আছে। Absolute কে বাদ দেওয়া যায় না। পরতত্ত্ববস্তুকে কোন আচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত, কোন আচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈত, কোন আচার্য্য শুদ্ধদ্বৈত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ অর্থাৎ একায়ন ও সংখ্যায়নদের বিচারের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই সকল বিচারের কথা পৃথিবীর ভাষার সাহায্যে বলা হইতেছে বলিয়া তাহাতে বাধা উপস্থিত হইতেছে। একায়নস্কন্ধী সম্প্রদায় ও বহ্বয়নশাখী সম্প্রদায় সেই তত্ত্ববস্তুর ত্রিবিধ প্রতীতি লক্ষ্য করিয়াছেন, যথা—ব্রহ্ম, আত্মা ও পরমাত্মা। যাঁহারা ব্রহ্মশব্দ ব্যবহার করেন, তাঁহারা ভগবান্-শব্দটি ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, যেহেতু তাঁহারা নির্বিশেষবাদী। ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব বলিলে সবিশেষভাবের খণ্ডন হইয়া যায়। ব্রহ্মবাদী Exclusionist ; তাঁহাতে খণ্ডকাল ignored হইতেছে,—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং, সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।।

চেতনরাজ্যে এখানকার কোনও মলিনতা বহন করিয়া লইতে হইবে না। সে জগতের আলোচনা করিতে হইলে এ জগতের কোন চিন্তা বা শব্দ লইয়া মাপিতে গেলে চলিবে না। Tabula rasa পরিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুণ খণ্ডপ্রতীতিতে বিষ্ণুবস্তুকে কালের অধীন ও দেবতান্তরসাম্যে দর্শন হইয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্র বলেন—"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।" বেদে দেবতাদের কথা আছে এবং বিষ্ণুর কথাও আছে; কিন্তু "বিষ্ণুর্বৈ পরমঃ"। তিনি অসমোর্দ্ধতত্ত্ব, তাঁহার সমান বা বড় কেহ নাই। অসমোর্দ্ধ পদার্থকে অপর দেবতার সহিত সমান জ্ঞান করিলে ফললাভ হয়—নরক গমন। এখানে Hemotheism (পঞ্চোপাসনা) discarded (পরিত্যক্ত) হইয়াছে। মনুষ্যজাতির ভাষায় ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিন প্রকার ভাব অভিব্যক্ত হইতেছে। বাস্তববস্তুকে বাদ দিয়া বর্তমানে কণভোজীর পরমাণুবাদ প্রচলিত হইয়াছে। ব্রহ্ম বলিতে জড় নির্বিশিষ্ট বস্তুকে লক্ষ্য করিতেছে। জড়ে যে সকল conceptional value আছে, তাহাকে নিরসন করা হইতেছে। যাহা জড়জগতে দৃশ্য, তাহা তিনি নহেন। বৈশেষিক-দর্শন পরমাণুবাদ স্থাপন করিয়াছেন। বর্তমানে জড় বৈজ্ঞানিকগণ element এর বিচারে ৯০।৯৫ প্রকার জিনিষ আবিষ্কার করিয়াছেন।

কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।।
(শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)

তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া-শক্তি এবং 'চ' অর্থে যে স্বয়ংরূপ—ইহাই ওঁ তৎসৎ। সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতিও তাঁহার শক্তি ধারণ করিতেছে। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে"। ভগবান্—সবিশেষ। তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির পরিণতি হইতে Politheistic বিচার উদ্ভূত হইয়াছে। ব্রহ্মশব্দের দ্বারা জড়বস্তুর exclusion করা হইতেছে এবং কালের খণ্ডত্ব হইতে ভেদ করিতেছেন। ঘটাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আকাশকে ভেদ করা হইতেছে অথবা ভেদ প্রতীতি হইতেছে। নির্ব্বিশেষবাদীরা ভগবত্তত্ত্বকে দেশ, কাল ও পাত্রগত নির্ব্বিশিষ্ট প্রতীতিমাত্র বলিতে গিয়া বিবর্ত্তবাদে পতিত হইতেছে।

অদ্বয়জ্ঞানের deviation হইতেই বিবর্ত্তবাদের উৎপত্তি। Absolute Entity is a concoction of the conception of Godhead হইতে পারে না। বিবর্ত্তবাদে ব্রহ্ম হইলেন concoction of senses, কিন্তু where senses come from? ইহাতে মায়াবাদীদের কোন উত্তর নাই। নির্ব্বিশেষবাদী সদানন্দ যোগীন্দ্র ন্যায়ের ফাঁকি বিস্তার করিয়া নিজের ভ্রম হইতে আত্মরক্ষা করিবার যত্ন করেন। মায়াবাদীরা আত্মকৃত যুক্তিজালে এমনভাবে আবদ্ধ হয় যে, তাহা হইতে উদ্ধারের আর উপায় খুজিয়া পান না। তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুকে বুঝিতে না পারিয়া অন্যায় করিয়াছেন। বিশেষবাদী কণভোজী Inclusionist. তিনি জড়জগতের ধারণাকে include করিয়াছেন। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মবস্তুকে exclude করিতে চান। 'পঞ্চদশী' প্রভৃতির লেখক বিদ্যারণ্য ও অন্যান্য মায়াবাদী বৈদান্তিকগণ নিজেদের যুক্তিতে নিজেরা আটক পড়িয়াছেন। দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকগণ আবার অদ্বৈতবাদী নির্ব্বিশেষবাদিগণের দোষ দেখান।

তর্ক উঠিতে পারে ভগবানের লীলা রূপক কিনা? রূপক বিচার করিতে গেলে ফল এই দাঁড়ায় যে, তাঁহার প্রতি একটি রূপ কল্পনা করিয়া আরোপ করিলাম, পরে ইচ্ছা হইলে আমি তাহা ছাড়িয়া দিতে পারিব—এইরূপ। আমি যে ধার করিলাম, তাহা শোধ করিয়া দিব—এরূপ বিচার—Algebra-র factor করিবার সময় addition ও eliminable-এর ন্যায় কতকটা। পরমাত্মার বিচার প্রসারিত করিলে ভগবত্তত্ত্বের বিচার আসিয়া পড়ে। যোগিগণ তত্ত্ববস্তুর সঙ্গে বিরাট্ বিশ্বরূপ দর্শনের অভিজ্ঞতাকে যোগ দিতেছেন। কেবলাদ্বৈতবাদী জড়বস্তুকে exclude করিতে গিয়া বৈকুণ্ঠবস্তুকে ও exclude করিতেছেন; কিন্তু বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুপার্ষদ বিশ্বক্সেন্, গরুড় প্রভৃতির নিত্যাবস্থান এবং চিজ্জগতেও চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থান প্রভৃতির কথা দহরোপনিষদে আছে।

চেতনের বিলাসের কথা শ্রুতিতে অনেক আছে। ছান্দোগ্যে—"য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ পৈতি সঃ ব্রাহ্মণঃ, য এতদক্ষরমবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ পৈতি সঃ কৃপণঃ।" মায়াবাদীর বিচার প্রাকৃত concrete হইতে abstract- এর দিকে অর্থাৎ অধিরোহবাদ অবলম্বন করাই নির্বিশেষ বস্তুর প্রতি অভিযান। অনেকে মায়াবাদী হইয়া তদ্‌বস্তুর স্বরূপবিলাস না জানিয়া মৃত্যুকবলে পতিত হন। মায়াবাদি সম্প্রদায় মরণের দিন পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তির কথা ধরিতে পারিবে না।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ।।
অচিন্ত্যাব্যক্ত-রূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ।।

মায়াবাদীরা exclusionist ও পরমাত্মবাদীরা inclusionists বা জড় সবিশেষ জ্ঞানযুক্ত। দ্বিতীয় পুরুষাবতার প্রদ্যুম্নবিষ্ণুই পরমাত্মা—"যঃ আত্মান্তর্যামী পুরুষঃ" ইতি সোঽপ্যস্যাংশবিভবঃ। "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা"। 'তনুভা' শব্দের দ্বারা নির্বিশিষ্ট বস্তুকে বুঝায়। পরমাত্মাও বিশেষণ জাতীয়বস্তু। পরমাত্মার বিচারও খণ্ডবিচার। উক্ত দুইটি ধারণাতেই বিশেষ্যজাতীয় বস্তুকে খণ্ডিত করা হইয়াছে। exclusion ও inclusion -এর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া দরকার। শ্রীমদ্ভাগবত একটিমাত্র কথাদ্বারা কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও রাজযোগিগণের জ্ঞানের দফা শেষ করিয়াছেন, উহাই 'অদ্বয়-জ্ঞান'। অভক্তেরা অতদ্-বিচারে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে বসিয়াছে। ঈশ-ভক্তগণকে ঈশ্বতত্ত্ব হইতে পৃথক জ্ঞান করিলে অপরাধ হইবে। এতদ্ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াৎ" শ্লোক আলোচ্য।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

শ্রুতি এই কথা বলেছেন। বেদানুগ সম্প্রদায় কি করিয়া এক অদ্বিতীয় বস্তুতে ভেদ কল্পনা করেন?

যা যা শ্রুতিজল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।।

যে যে শ্রুতি তত্ত্ব-বস্তুকে প্রথমে নির্বিশেষ করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্বিশেষ' ও 'সবিশেষ' ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য—ইহা বিচার করিলে সবিশেষতত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে, কেন না, জগতে সবিশেষ তত্ত্বই অনুভূত হয় নির্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।

যে সকল বেদমন্ত্র নির্বিশেষের বিচার করেন, নির্বিশেষ বিচার করতে গিয়ে সে সকল শেষে বিশেষে'র বিচারই লক্ষিত হয়। প্রাকৃতরাজ্যে চতুর্বিংশতি-তত্ত্বের বিচার প্রণালী। সেজন্য সাধারণ জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি প্রাকৃত জগতের ধারণা নিয়ে তদতিরিক্ত

ধারণা করতে গেলে জড়বিচারকে রহিত ক'রে নির্বিশেষ বিচারকে আবাহন করে। এখানে এই যে 'নির্বিশেষ' শব্দটি ব্যবহার হ'চ্ছে—যে বিশেষ রহিত তিনি, বিশেষযুক্ত নন্ এতে বুঝতে হ'বে এই বিশেষটি প্রকৃতির অন্তর্গত। প্রকৃতি অন্তর্গতর বিশেষে তিনি বিশিষ্ট নন, তার ব্যতিরেক ভাব তাঁতে। এখানে প্রত্যেক বস্তুর অসীম—সীমাবিশিষ্ট তিনি অসীম—বৈকুণ্ঠ বস্তু। এখানে প্রত্যেক বস্তু পরস্পর বিরোধধর্মী তাঁতে যে বিশেষ, সেরূপ বিরোধধর্ম নাই, সমস্ত বিরুদ্ধ-ধর্মের সামঞ্জস্য রয়েছে তাঁতে। এখানকার বস্তু কালক্ষোভ্য—পরিবর্তনশীল, সেখানে তাদৃশ কোন কথা নাই। এখানকার প্রত্যেক বস্তু বিকারযোগ্য, সেখানে তা নয়। এখানে বহুত্ব, সেখানে একত্ব।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।।

সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দ্রিয়-সাহায্যে কোন কার্য্য নাই; যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তিনি পরাৎপর বস্তু। তাঁহার সমান বা অধিক কোন বস্তু নাই। তিনি অবিচিন্ত্য পরাশক্তির আধার। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকীশক্তি জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা।

এখানে যেমন কারণ রূপ মৃত্তিকা হতে ঘটাদি বহু প্রকার মৃন্ময় পদার্থ প্রস্তুত হয় এবং তাহারা বিশেষধর্ম বা ভেদ ধর্মে অবস্থিত হয় সেরূপ সেখানে সেই একটি জিনিষ, তিনিই মূল নিমিত্ত কারণ তাঁ হ'তেই সকল বিশেষ ধর্ম উদ্ভূত। সেখানে (অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে) নিত্যত্ব, এখানে (প্রাকৃত জগতে) তা'র অভাব। সেখানে পূর্ণজ্ঞান, এখানে অজ্ঞান-দ্বারা আচ্ছন্ন হবার যোগ্যতা বর্তমান; সেখানে পূর্ণানন্দ এখানে আনন্দবাধ রয়েছে—সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ। কালের দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত পরিমাণযুক্ত ব্যক্তি-সকল এখানে, সেখানে তাহা নহে। তিনি সর্বশক্তি সম্পন্ন, বিশেষ ধর্ম তাঁতে অবস্থিত। জড় জগতের বিশেষ ধর্মের যে অভাব ও আংশিকতা তাতে সেরূপ নাই। তিনি চিৎ সবিশেষ, জড়সবিশেষ ধর্ম তাঁতে নাই। জড়সবিশেষ তাঁতে ও জড়বিশেষ আমাদের বিচারে পার্থক্য এই যে জড়বিশেষ আমাদের জড়েন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ্য ব্যাপার নয় পরন্তু আমাদের সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা তিনি সেব্য। এই বিচারটি দেখাবার জন্য শ্রীল রূপপাদ তাঁর ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে বলেছেন,—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।

সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম 'ভক্তি'। এই (স্বরূপ-লক্ষণময়ী) সেবার দুইটি তটস্থ লক্ষণ—যথা, ঐ শুদ্ধাভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নির্মলা থাকিবে।

আমরা হৃষীক দ্বারা বস্তুর সেবা করি না বস্তু থেকে সেবা গ্রহণ করি। এখানে যে বস্তু আছে তা থেকে সেবা গ্রহণ করি, হৃষীকেশের ভোগ বিবর্দ্ধনের যত্ন না ক'রে নিজের ভোগ চেষ্টায় মত্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু জগৎকে ভোগ্য বলে বিচার ক'রে ব'সলেও ভগবদ্‌বস্তু আমাদের সে বিচারের অন্তর্ভুক্ত নন, তিনি ভোগ্য নন। সেজন্য বেদ বলেছেন,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" ইত্যাদি।

অর্থাৎ কারণ হা'তে কার্য্যের উৎপত্তি, কার্য্য থেকে কারণ নয়। তিনি (ভগবান্) কারণ-জাতীয় বস্তু, কার্য্য-জাতীয় ন'ন। জগতের কার্য্য ধ্বংসশীল পরিবর্তন-যোগ্য। তাঁর কার্য্য সেরূপ নয় তা' অপরিবর্তনীয়। এখানকার ন্যায় (ধ্বংসশীল) কার্য্যের (ধ্বংসশীল) কর্তা তিনি নন। সেখানকার কার্য্যের সঙ্গে এখানকার কার্য্যের অনুভূতি একতাৎপর্য্যপর নহে। এখানকার কার্য্য কিরূপ ?

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।।

যে সকল ভগবত সেবাপর জীব তাঁর সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা সেই সেবা কার্য্যের ফল-ভোক্তা নন। ভগবানের সেবা-কার্য্য তাঁর সেবক-দ্বারা সাধিত হ'চ্ছে; কার্য্যের ফল গ্রহণ ক'রছেন—ভোগ ক'রছেন সেই ভগবান্‌ই। প্রাকৃত লোক যেমন বিবর্ত-বুদ্ধিতে কার্য্যের কর্তা অভিমানে কার্য্য করে, যেরূপ অভিমান তাঁতে নাই। এখানে যেমন আমরা আমাদের করণের সাহায্য নিয়ে কার্য্য করি, তিনি তদ্রূপ কোন বস্তুর সাহায্য নিয়ে কর্ম করেন না। তিনি শক্তিমদ্ বস্তু। শক্তিজাতীয় নন। তাঁহা হইতে জাত শক্তি। জনকের সহিত 'জাত' এক তাৎপর্য্যপর নহে। এক অধিক পদার্থ সকলের মধ্যে সমান, উর্দ্ধ ও অধঃ বিচার আছে কিন্তু তিনি অতুলনীয় অসমোর্দ্ধ তাঁহার তুলনা নাই, তিনি একটিই জিনিষ। 'অস্য' শব্দ এক বচনের পদ; তিনি একজন, তাঁর শক্তি অনেক প্রকার। শক্তির জ্ঞাতা তিনি। শক্তিতে তিনি যে জ্ঞাতৃত্বের বিধান করেন তদ্দ্বারা শক্তিরাও শক্তিমৎ এর অনুভবে সমর্থ হয়। যারা শক্তির বিচারে শক্তিমদ্ বস্তুর আরোপ করেন তাঁদের বিচারে ভুল হয়।

পরা হস্য শক্তিঃ—তাঁর পরাশক্তি—নিজশক্তি—নিজশক্তি তা হ'তে জাত অন্যান্য শক্তি। অপরার সহিত পরা এক নয়। যেমন—

ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।
অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।

পরাশক্তি কি? না যাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই ত্রিশক্তির বিভূত্ব ও অনুত্বের ক্রিয়া লক্ষিত হ'চ্ছে। অণুচিৎ পদার্থেও এসব আছে। অণুসম্বিতে অণুসন্ধিনী ও অণুহ্লাদিনী আছে। কিন্তু এঁরা পরাশক্তিরই অংশ-বিশেষ, পৃথক্‌শক্তিমৎ তত্ত্ব নহেন। এজন্য জীবশক্তিকে তটস্থা বলা হয়। পরাশক্তির তটে অবস্থিত হ'লে জীব মুক্ত আর অপরাশক্তির তটে অবস্থিত হ'লে জীববদ্ধ। জীব যখন পঞ্চভূত এবং মনবুদ্ধি ও অহঙ্কারের বিচারে প্রবিষ্ট হন, তখন অপরাশক্তির অন্তর্ভুক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গুরু হ'য়ে জগতে মানব জাতির চেতনা সম্পাদন ক'রলেন। অচেতন জীব জড়তা বা অপরা অচেতন শক্তির অন্তর্ভুক্ত ব'লে আপনাকে মনে করে। পরাশক্তির কথা তা'দের নিকট অপূর্ব বলে মনে হয়। অপরা-শক্তি মায়ার দ্বারা মূঢ় হ'য়ে জীব নিজ বিবেচনা-শক্তি হারিয়ে ফেলে, তাতে সেবাপর বস্তু হ'য়েও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক ব'লে মনে করে,—

"ময়া (মায়য়া) সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎ কৃপঞ্চাভিপদ্যতে।।"

আত্মশব্দের অর্থ—"আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরি" আত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ; বৃহদাত্মা—পরমাত্মা, হরি। 'আততত্ব'-শব্দের 'তন্' ধাতু বিস্তার অর্থে ব্যবহৃত এবং 'মাতৃত্ব'—মাতা যেরূপ পালন করেন, হরি তেমনই পালনকর্তা। অথবা মাতার পালন-কর্ত্তৃত্ব, হরির মাতৃত্ব বা পালনধর্মের অতি সামান্য বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। উদ্ভব ও বিনাশ-কার্য্যের মধ্যস্থানে যে স্থিতি বা সত্তা, তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা—বিষ্ণু বা সত্ত্বতনু হরি। পরমাত্মাকর্তৃক সত্ত্ব-সমূহ পালিত হয়—বিনষ্ট হয় না—'আততত্ব'-শব্দে বিস্তৃতি লক্ষ্য করে। শ্রুতি বলেন,—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।।

জীবাত্মাকে কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশতুল্য সূক্ষ্ম জানিতে হইবে, অর্থাৎ জীবাত্মা অতি ক্ষুদ্র—অণুচেতন। "স চানন্ত্যায় কল্পতে"। বিভুচেতনে যে-সকল গুণ, উহাই অণুরূপে জীবাত্মায় বর্তমান। বিভুতে যা' আছে, তা' অণুতেও আছে। কিন্তু বিভু কখনও অণু নয়, অংশী কখনও অংশ বা কলা, বিকলা নয়। অনেক সময় পরমাত্মাও 'আত্মা'-শব্দে সংজ্ঞিত হয়, অনেক সময় জীবও 'আত্মা'-শব্দে লক্ষিত হয়।

'আত্ম-শব্দের দ্বারা নিজকে নিজে সংরক্ষণ করিতে সমর্থ, ইহা বুঝায়। যা' সমর্থ নয়, তা' 'আত্ম' শব্দে ব্যবহৃত হ'তে পারে না। স্বল্পতা বা বৃহত্ত্ব নির্বিশেষে আত্মশব্দের ব্যবহার।

জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যবর্তী-স্থানে 'জ্ঞান' অবস্থিত। কেবল-জ্ঞাতা ও কেবল জ্ঞেয়ের মাঝখানে কেবল-জ্ঞান বর্তমান। অন্য তৃতীয় ব্যাপার যদি মাঝখানে দাঁড়ায়, তা' হলে জ্ঞান হ'বে না। যা' থেকে জ্ঞান লাভ হয়, বোধের প্রমাণস্বরূপ যা' আছে, তা' কেবল

চেতন, চিদচিন্মিশ্র ও অচেতন—এই তিন প্রকারের হ'তে পারে। মাঝখানে যদি চেতনের সহিত চেতনাভাব অন্য বস্তু আসে, তবে সেটা মিশ্র চেতন।

চেতনের বিপরীত—অচিৎ। যখন জ্ঞেয়—অচিৎ, জ্ঞাতা—অচিন্মিশ্র, তখন চিদচিন্মিশ্র জ্ঞাতার জ্ঞানও—অচিতের জ্ঞান, তখন কেবল-জ্ঞানের ক্রিয়ার সুষুপ্তি অবস্থা—শুদ্ধ জ্ঞাতৃত্ব লুপ্ত। জ্ঞেয় বস্তুর যদি কিছু চেতনতা থাক্‌ত' তবে তা'র স্বতন্ত্রতা ব্যবহার ক'রত।

'আমি কে'—এই প্রশ্ন যখন বদ্ধজীব (conditioned soul) জিজ্ঞাসা করেন, আমি স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণমুক্ত হ'য়েছি, চিদচিন্মিশ্র ভাবাপন্ন হ'য়েছি, আমার জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম—যা'কে অবলম্বন ক'রে জান্‌ব, তা' চিদচিন্মিশ্র, তখন চিদচিন্মিশ্র জ্ঞান মাত্র লাভ হ'বে। জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা যদি কেবল-চেতন হয়, তবেই পূর্ণজ্ঞান লাভ হ'তে পারে। জ্ঞাতা যদি বহির্জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, তবে ন্যূনাধিক মিশ্রজ্ঞান লাভ হয়।

পরমাত্মা ও ব্রহ্ম—একই বস্তু। ব্রহ্মের ভাব অদ্বিতীয় বৃহত্তত্ত্ব মাত্র, ব্যাপক পরমাত্ম-প্রতীতিবৈশিষ্ট্য তা'তে নাই। প্রকৃতিজাত খণ্ডিত পদার্থ সমস্তই ব্রহ্ম-প্রতীতি-বর্জিত। অখণ্ড ব্রহ্মে কোন খণ্ডিতভাব আরোপ করা যা'বে না।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—উভয়ধর্ম পরমাত্ম-প্রতীতিতে অবস্থিত। ব্রহ্মে খণ্ডিতভাব বাদ দেওয়া হয়—নিঃশক্তিক বিচার। পরমাত্মায় চিদচিৎ-শক্তিবিচার এসে গেছে। যেখানে নিঃশক্তিক নির্বিশেষ ব্রহ্ম-বিচার; সেখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—এই বিশেষধর্ম নষ্ট হয়। বৃহত্ত্বের এক অংশ—প্রকাশ রহিত নির্বিশেষ ও আর এক—চিৎপ্রতীতি স্বপ্রকাশ পূর্ণ সবিশেষ।

ব্রহ্মে যে নির্বিশেষ-বিচার, তা'তে ইহ জগতের ধর্মের অভাবমাত্র বলা হ'চ্ছে। সবিশেষবাদী বলেন,—নির্বিশেষবাদও একটা অসংখ্য চিদ্বিশেষের অন্যতম। প্রাকৃত সবিশেষের অভাবরূপ বিশেষ-নির্বিশেষবাদে বর্তমান। একই বস্তুর নিঃশক্তিক ও সশক্তিক-বিচার বর্তমান যেখানে, সেখানে পরমাত্মার বিচার।

পরমাত্ম-বিচারে নির্বিশেষের বিপরীত ভূমা, বিরাট্ বিশ্বরূপ বিচার। পতঞ্জলির "ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা", "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" প্রভৃতি কথা ব্রহ্মবিচার হ'তে একটুকু পৃথক্। তা'তে বিবর্তাশ্রয়ে সব বস্তুর মিথ্যাত্ব স্বীকৃত হয় নাই। পরমাত্মার সশক্তিক-বিচারে অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয় আছে। অঙ্গ ও অঙ্গী-বিচারে যাহার অঙ্গ, সে অঙ্গী; অঙ্গীর অঙ্গ, রূপ ও রূপী, শক্তি ও শক্তিমান্—প্রথমটির দ্বারা দ্বিতীয়টি পরিচিত। বস্তু—এক, শক্তি—অসংখ্য। নিঃশক্তিক বিচার এইরূপ বিচার হ'তে দূরে—স্বগত সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানবিশেষ নাই।

কতকগুলি লোক cessation of conception and perception (ধারণা ও অনুভূতিশূন্যতা) কেই লক্ষ্য বস্তু মনে করেন। শাক্যসিংহের পরবর্তীকালে চিদ্‌রাহিত্য

বা অচিন্মাত্রবাদ এবং তৎপরে জ্ঞান-সাহিত্যই স্বীকৃত। কেবল-জ্ঞানই থাকবে; দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন থাক্‌বে না।

পরমাত্মা—পরিমাণগত একে বিভু, অপরটি বিভিন্নাংশ অণু। বহিরঙ্গা শক্তিতে কালক্ষোভ্য ভাব, একত্বের বিরুদ্ধ দ্বৈতভাব বর্তমান। অন্তরঙ্গা শক্তিতে নিত্যত্ব উপাদেয় অদ্বয়-বিচিত্রতা ভাব বর্তমান। বহিরঙ্গা শক্তিতে ক্লেশ, অন্তরঙ্গা-শক্তিতে সমস্তই শুদ্ধ অবিমিশ্র।

অচিদংশকে যদি বর্জন করি, সূক্ষ্মদেহের বিচারকেও যদি বাদ দেই, তা' হ'লে শুদ্ধচেতনের বিচারে উপস্থিত হই। যখন আমরা শুদ্ধ চেতনের বিচারে উপস্থিত হই, তখন বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হই না। কিন্তু যখন সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ উভয়কে সংযুক্ত ক'রে আলোচনা করি, তখন চিদচিন্মিশ্রভাব, কর্ম-বিচারে হঠযোগ ও জ্ঞান-বিচারে রাজযোগের কথা জানি—চিদচিন্মিশ্রভাবে উপদিষ্ট হই।

যখন ভগবৎ-প্রতীতি হয়, তখন কেবল চিদণু বিভুচিৎকর্তৃক আকৃষ্ট হয়, বস্তুর শক্তির অংশ বা ভেদ লক্ষিত হয়। গুণমায়া রচিত যে-সকল উপকরণ, সেগুলি এক, দুই, বহু অঙ্ক (numerals) সৃষ্টি করে। দ্রষ্টায় ভেদ, দৃশ্যে ভেদ, দর্শনে ভেদ—বহুত্ব দর্শন—বিভিন্ন আধারে প্রতিবিম্বিত এক বিম্বের বহু প্রতিবিম্ব উপস্থিত হয়। অন্তরঙ্গা শক্তির রাজ্যে এক-তাৎপর্য্যপর হওয়ায় ১, ২, ৩, ৪ বৈচিত্র্যপর পরস্পর বিবদমান (contending) নয়; এ জগৎ যেমন পরস্পর বিবদমান, পরিবর্তনশীল ও নশ্বরধর্মযুক্ত, সেরূপ অন্তরঙ্গা শক্তির নিত্য চিদ্‌বৈচিত্র্য নহে। নশ্বরতা বা ধ্বংসশীলতা নিত্য মাতৃত্বধর্মের স্বরূপ নহে—বিষ্ণুর প্রতীতি নহে—বিষ্ণুমায়ারচিত চিৎ-প্রতিকৃতি মাত্র। এ জগতে বিভিন্ন বস্তু—নশ্বর, উহা 'আত্ম'-শব্দ-বাচ্য নহে, উহা অনাত্ম, অনিত্য।

জীবাত্মা—অনাত্মা নহে। নাস্তিক বলেন,—জীবাত্মা—অনাত্মা। আস্তিক বলেন,— জীবাত্মা নিত্য আত্মবস্তু—শুদ্ধস্বরূপে অবিমিশ্র চেতনবস্তু—পূর্ণচেতনের শক্তিরূপ অণু-অংশ—পূর্ণ চেতনের নিত্য অধীন বা বশ্য।

ভগবানের এক প্রকার অঙ্গ অন্তরের, আর এক প্রকার অঙ্গ বাহিরের। বাহিরের অঙ্গে পূর্ণ জ্ঞানের বাধা, কালক্ষোভ্য ধর্ম বর্তমান; বাহিরের অঙ্গ হইতেই জগৎ। জগতে গমনশীলতা-ধর্ম, জাগতিক বস্তু কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হয়। জগতে পরিবর্তনশীল ধর্ম র'য়েছে—শিশু, যুবা, বৃদ্ধ হয়—মৃত্যুগ্রস্ত হয়—বাসনার দ্বারা চালিত হ'য়ে ভিন্ন স্তরে নীত হয়—ওজঃ বীর্য-দ্বারা মাতৃ-কুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করে।

আত্মজিজ্ঞাসা কর্তব্য গীতায় ২য় অধ্যায়ে,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।।

পুণঃ ৭ম অধ্যায়ে,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।

জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নব-বসন পরিধান করে, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করতঃ অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। জীবাত্মা অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ুদ্বারাও শুষ্ক হন না। এই জীবাত্মা—অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য; ইনি—নিত্য, সর্বগত, স্থাণু ও অচল অর্থাৎ স্থিরতর; ইনি—সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান।

ভগবৎস্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য্য-জ্ঞানের নামই 'ভগবজ্-জ্ঞান'। তাহার বিবৃতি এই যে, 'আমি—সদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত শক্তিসম্পন্ন তত্ত্ববিশেষ; ব্রহ্ম—আমার শক্তিগত একটি নির্বিশেষ ভাবমাত্র; তাহার স্বরূপ নাই,—সৃষ্টজগতের ব্যতিরেক চিন্তাতেই তাহার সাম্বন্ধিক-অবস্থিতি। পরমাত্মাও জগন্মধ্যে আমার শক্তিগত আবির্ভাব-বিশেষ; ফলতঃ তাহাও অনিত্য-জগৎ-সম্বন্ধি তত্ত্ববিশেষ, তাহারও 'নিত্য' স্বরূপ নাই। আমার ভগবৎ-স্বরূপই 'নিত্য' তাহাতে আমার শক্তির দুইপ্রকার পরিচয় আছে; শক্তির একটি পরিচয়ের নাম-'বহিরঙ্গা' বা 'মায়াশক্তি'। জড়-জননী বলিয়া তাহাকে 'অপরা শক্তি' ও বলা যায়; আমার এই অপরা বা জড়-সম্বন্ধিনী শক্তির মধ্যে তত্ত্ব সংখ্যা লক্ষ্য করিবে; ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি মহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি তন্মাত্র; এই প্রকার দশটি তত্ত্ব গৃহীত হয়। অহঙ্কার-তত্ত্বে তাহার কার্যভূত ইন্দ্রিয়সকল ও কারণভূত মহত্তত্ত্ব গৃহীত হইবে। বুদ্ধি ও মনের পৃথগুক্তি—কেবল তত্ত্বসমূহের মধ্যে তাহাদের প্রাধান্য-মতে ভিন্ন কার্য থাকা-প্রযুক্ত, ফলতঃ তাহারা—'এক'তত্ত্ব। এই সমুদয়ই আমার বহিরঙ্গা-শক্তিগত। এতদ্ব্যতীত আমার একটি 'তটস্থা প্রকৃতি' আছে, যাহাকে 'পরা প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গাশক্তি মিশ্রিত জড়জগৎ—এই উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থা শক্তি' বলা যায়।

যখন আমি 'প্রভু' সাজ্‌তে চাই, অন্যের উপর প্রভুত্ব কর্‌তে চাই, তখন প্রকৃতির বশ হ্ই, মায়াবাদী হই। বৌদ্ধগণকে প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী বলা হয়। শ্রৌতব্রুব মায়াবাদিগণ আধ্যক্ষিকতা ও প্রচ্ছন্ন তার্কিকতা অবলম্বন করায় 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' নামে অভিহিত।

চিৎসমন্বয় শুদ্ধাদ্বৈতবিচারে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীধর স্বামিপাদ----শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রীধর স্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবিচারকে বিদ্ধ বিচারে পরিণত কর্‌বার জন্য সচেষ্ট। ইহা বিদ্ধাদ্বৈতবাদিগণের অসদভিপ্রায়। সর্বজ্ঞ মুনি শঙ্করাচার্যের বহু শত বৎসর পূর্বে মাদুরা জেলার কল্যাণপুর গ্রামে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তা' কালপ্রভাবে অভক্ত-মোহনকল্পে বিকৃত হ'য়ে কেবলাদ্বৈতবাদে প্রাধান্য লাভ ক'রেছে। এমন কি, শ্রীপাদ শঙ্করের পর সর্বজ্ঞাত্ম মুনির সহিত সর্ব্বজ্ঞ মুনির একটা গোঁজামিল দিয়ে লোকের চক্ষে ধাঁ ধাঁ লাগাবার চেষ্টা পর্যন্ত হ'য়েছে।

বস্তুর অংশ-বিচারে বিকার-বাদের হেয়তা প্রবল হ'বে, এজন্য শ্রীল লক্ষ্মণদেশিকের শক্তি-বিচার শ্রীগৌরসুন্দর অনুমোদন ক'রেছেন। বস্তুর বিকার এই জগৎ নহে, পরন্তু বস্তুর বহিরঙ্গা শক্তির বিকার, ইহা গৌরসুন্দর ব'লেছেন। খৃষ্টাবলম্বিগণের বিচারে জীব কালাধীনে ঈশ্বর-সৃষ্ট মাত্র; এই বিচার সমীচীন নহে। জীব বস্তুর শক্তির অংশ বা বিভেদ। জীবে সদসৎ উভয় প্রকার গুণ বর্তমান। অন্তরঙ্গা শক্তিতে নিখিল সৎ (অস্তিত্বযুক্ত) নিত্যগুণরাশি বর্তমান। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয় বহিরঙ্গা শক্তি প্রকৃতিতে বর্তমান। নিখিল-সদ্‌গুণ-কল্যাণ-বারিধি বিষ্ণুতে বিশুদ্ধসত্ত্ব নিত্য বর্তমান; সেখানে আপেক্ষিকতা নাই। গুণজাত জগতে আপেক্ষিকতা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমে পরস্পর আপেক্ষিকতা বর্তমান।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।। (গীঃ ৩।২৭)*

এই গুণজাত জগতের বিপরীতভাব জাড্য বা সুষুপ্তি নির্বিশেষ-বিচারে আবৃত। "সুখমহমস্বাপ্সম্"—আমি সুখে নিদ্রা গিয়েছিলাম। সুখ-নিদ্রা তাঁহার স্মৃতির বিষয়। তিনি সুষুপ্তিতেও অস্মিতা পর্যন্ত উপলব্ধি করেন, নতুবা সুখ-নিদ্রার স্মৃতি হ'ত না। যেমন জাতিস্মর-অবস্থায় পূর্বজন্মের কথা স্মরণ ক'রে বল্‌তে পারে।

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বির্বতের স্থান", এই স্থূলদেহ—'আমি'—ইহাই এক বস্তুতে অন্য বস্তু ভ্রম বা বিবর্ত। "আমি দেহ, আমার কালক্ষোভ্য দেহ, আমাকে অমুক লোক

* বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের ভেদ বলি, শ্রবণ কর। অবিদ্যাদ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য মনে করিয়া 'আমি কর্তা'—এইরূপ অভিমান করেন। ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ।

গালাগালি দিল''—বর্ণনগুলি স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহ-সংক্রান্ত। প্রকৃত শুদ্ধ আমি আগমাপায়ী নহে। দেহ আমি নই, মনও আমি নই; সকালে, দু'পুরে, সন্ধ্যায় বদ্‌লে যায় যে মন, কখনও প্রসন্ন, কখনও অপ্রসন্ন হয় যে মন, তা' আমি নই। সত্যের যে ধারণা বদ্‌লে যায়, তা' মনোধর্ম্ম। যে চেতন অচিতের সহিত মিশ্রিত হ'বার উপযোগী, উহা তটস্থা শক্তি হ'তে উদ্ভূত। তটস্থশক্তিজাত হ'য়েও নিজকে শক্তিমান্ বা শক্তির চালক মনে করা কতটা অসদভিপ্রায়-পোষণ! ইহারা ''প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি'', 'ঈশ্বরোঽহম্'' প্রভৃতি গীতোক্ত শ্লোকের বিষয়।

যেরূপ ধান ও শ্যামা গাছ বস্তুতঃ পৃথক্ বস্তু, যেরূপ ধানের নিড়ান দেওয়া আবশ্যক, সেরূপ শুদ্ধচিৎ ও চিদাভাস, চিৎপ্রতীতি ও অচিৎপ্রতীতি বস্তুতঃ পৃথক্; চিৎ হ'তে অচিৎকে নিরাকরণ করা আবশ্যক। চিজ্জড়সমন্বয়বাদী সৎ ও অসৎসঙ্গ, ধান গাছ ও শ্যামা গাছ, ভক্তি ও অভক্তিকে সমান মনে করে। মায়াবাদের বিকৃতিই চিজ্জড়সমন্বয়বাদ। মায়াবাদিগণ মুখে বলেন—'সকলই মানি'; কিন্তু তাঁ'রা পরমেশ্বর বস্তুকেই মানেন না—পরমেশ্বর-তত্ত্বের নিত্য নাম, নিত্য রূপ, নিত্য গুণ, নিত্য পরিকর-বৈশিষ্ট্য, নিত্যলীলা স্বীকার করেন না। ইঁহারা মানবোচিত ব্যবহার পরমেশ্বরে আরোপবাদ (anthropomorphism) বা মনুষ্যে দেবারোপ-কল্পনাবাদ (apotheosism) সৃষ্টি করেন—ভগবানের নিত্য শুদ্ধ নাম-রূপাদি বাদ দিয়ে এখানকার মলিনতা পূর্ণ সচ্চিদানন্দবস্তুর গায়ে মাখাবার চেষ্টা করেন। পশুতে দেবারোপ-কল্পনাবাদ (zoomorphism) ইহাদেরই সৃষ্ট মত। ইহারা সকলেই ব্যুৎপরস্তের পূজক। বাস্তব রাম-নৃসিংহ-বরাহ-মৎস্য-কূর্ম্মাদি শ্রীনারায়ণ—নিত্যনাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ, নিত্য-পরিকর-বৈশিষ্ট্যযুক্ত, নিত্য লীলাময়, মায়াধীশ, অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তু। ইঁহাদের প্রত্যেকের নিত্য বৈকুণ্ঠ আছে; তাঁ'রা বৈকুণ্ঠ হ'তে কৃপাপূর্ব্বক স্বেচ্ছাবশতঃ জীবসকলের জন্য কুণ্ঠজগতে স্ব-প্রকাশ প্রদর্শনকল্পে অবতীর্ণ হ'য়েও সর্ব্বদা পূর্ণ বৈকুণ্ঠস্থ থাকেন। ইঁহারা সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্রতা-ধর্ম সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করেন। ইঁহারা মনুষ্যে দেবারোপকল্পনাবাদী বা পশুতে দেবারোপ-কল্পনাবাদী, পৌত্তলিক, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী কিম্বা মায়াবাদিগণের নায়ক বা আরাধ্য তত্ত্ব ন'ন। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের কল্পনা, কপটতা, পূজার ছলনা—রাবণের মায়াসীতা হরণচেষ্টার ন্যায় সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বিষ্ণুতত্ত্বকে স্পর্শও করতে পারে না। আত্মবিদ্‌গণ বহির্জ্জগতের এরূপ সমুদয় মল পরিত্যাগ ক'রে নিত্য, বাস্তব, অখণ্ড, পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ, নিত্য-নাম-রূপ গুণ লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য ভগবদ্বস্তুর নিত্য সেবা করেন। মায়াবাদী এই জগতের হেয় পরিচ্ছিন্নভাব ভগবদ্বস্তুতে আরোপিত বা ব্যাপ্ত করবার দুবুর্দ্ধি পোষণ করেন। তাঁ'র বিবর্তের নেশা তাঁ'কে কোনকালেই পরিত্যাগ করে না; ভগবদ্বস্তুর অনুশীলনকালেও ভগবদ্বস্তুতে তাঁ'র মায়িকবস্তু ভ্রান্তি আসিয়া

উপস্থিত হয়। তাই মায়াবাদী ভগবদ্বস্তুতে হেয়তার আরোপ করেন, ভগবদ্বস্তুর নিত্য নাম-রূপ-গুণাদিকে মায়াময় মনে করেন। আধুনিক খৃষ্টোপাসকগণেরও কেহ কেহ আমাদিগের পৌরাণিকগণকে মনুষ্যে দেবারোপকল্পনাবাদী বা পশুতে দেবারোপ-কল্পনাবাদী মনে করেন। ইহা তাঁ'দের সুষ্ঠু বিচারের অভাব।

বাস্তব সনাতন ধর্ম—শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম এরূপ নহে।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।
বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর।।"

বিষ্ণু-নিরবচ্ছিন্ন চেতন, স্থিতিবান্ ও আনন্দময়। মায়ার জগতে বিষয়ের বহুত্ব; বৈকুণ্ঠ এক অদ্বয় বিষয়। সেখানে henotheism, polytheism or cathonitheism (পঞ্চোপাসনা, বহ্বীশ্বরবাদ) নাই। মেক্ষ্মূলার সাহেব কতকটা পঞ্চোপাসনাকে henotheism নামে অভিহিত করেছেন। সদানন্দ যোগীন্দ্র সদসদ্ হ'তে অনির্বচনীয় অজ্ঞান-সমষ্টিকে 'ঈশ্বর' কল্পনা ক'রেছেন। সদানন্দ যোগীন্দ্রর কল্পনার কারখানায় গড়া ক্ষণভঙ্গুর ঈশ্বর—পূর্ণ আস্তিকগণের বাস্তব পরমেশ্বর বস্তু নহে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।" অদ্বয়জ্ঞানে প্রাকৃত দ্বৈতজ্ঞান নাই—"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম। এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম।।" কেবলাদ্বৈতের সহিত যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদের নিত্য পার্থক্য আছে, তা' ভক্তিধর্মে জানতে পারি। অনাত্ম-প্রতীতির সহিত আত্ম-প্রতীতির, অচিৎ-প্রতীতির সহিত চিৎপ্রতীতির যে ভেদ আছে, উহাকে সমন্বয় করা উচিত নহে, উহা ভক্তি-বিরুদ্ধ।

রামানুজীয় দার্শনিক সাহিত্যে শক্তি-বিচার দেখি,—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাহিত্যে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। যদি 'চিৎ' শব্দ সুষ্ঠু হ'ত তবে অচিতের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'ত না। শ্রীচৈতন্যদেব আনন্দতীর্থের বিচার-প্রণালীকে স্বীকার ক'রে কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত অত্যন্ত পার্থক্য স্থাপন ক'রেছেন,—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিম্
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ।।"

গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদিই প্রমাণ। সেই প্রমাণদ্বারা স্থির হয় যে, হরিই পরমতত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু ; মুক্ত ও বদ্ধ—দুই প্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ, বদ্ধজীব—মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব—মায়ামুক্ত; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্য-ভেদাভেদপ্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণম্
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র।।"*

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদানন্দতীর্থের বিচারপ্রণালীকে স্বীকারপূর্বক কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত পৃথক্ ক'রেছেন। আত্মজিজ্ঞাসায় আমরা যখন পরমাত্মার পদবী গ্রহণ করি, তখন আমাদিগকে আচার্য জিজ্ঞাসা ক'রবেন,—

"ঐশ্বর্য্যং তব কুত্র কুত্র বিভূতা সর্ব্বজ্ঞতা কৃত্র তে।
তন্মেরোরিব সর্ষপেণ হি তুলা জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ।।"

দেখ, তোমার ঐশ্বর্য, বিভুতা ও সর্বজ্ঞতা কোথায়? হে জীব, সর্ষপের সহিত যেরূপ সুমেরু পর্বতের তুলনা, তোমার সহিত সেইরূপ ব্রহ্মের অভেদ তুলনা।

নদ্যঃ সমুদ্রে মিলিতাঃ সমন্তান্নৈক্যং গতা ভিন্নতয়া বিভান্তি।
ক্ষীরোদশুদ্ধোদকয়োর্বিভেদাদাস্তে তয়োর্বাস্তব এব ভেদঃ।।
দুগ্ধে তোয়ং মিলিতমপরে নৈব পশ্যন্তি ভেদং
হংসস্তাবৎ সপদি কুরুতে ক্ষীরনীরস্য ভেদম্।
এবং জীবা লয়মধিপরে ব্রহ্মণা যে বিলীনা
ভক্তা ভেদং বিদধতি গুরোর্বাক্যমাসাদ্য সদ্যঃ।।

নদীসকল সমুদ্রে মিলিত হইলে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য লাভ করে না। পয়োরাশির মধ্যে উভয় জল পৃথক্ পৃথক্ থাকে। ক্ষীর-সমুদ্রের জল ও নদীর জল সর্বদা ভিন্ন থাকায় নদী ও সমুদ্রের বাস্তব ভেদ নিত্য। দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করলে অপরে তা'তে ভেদ দেখতে পায় না। কিন্তু হংস উপস্থিত থাকলে তৎক্ষণাৎ ক্ষীরকে নীর হ'তে পৃথক করে। তদ্রূপ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে যে-সকল জীব পরতত্ত্বে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হয়, ভক্তসকল গুরুবাক্য অবলম্বনপূর্বক সদ্য সেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখিয়ে দিতে পারেন।

জীব যদি ব্রহ্ম হয়, তবে তা'কে শিষ্য বা অজ্ঞানী—এরূপ জ্ঞান কর কেন? আর তোমার মতে জগতের অসত্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় শিষ্য, আচার্য ও আচার্যের উপদিষ্ট জ্ঞান—এ সমস্তও যে জগতেরই অন্তর্গত।

---

*শ্রীল মধ্বচার্য বলেন—শ্রীবিষ্ণুই শ্রেষ্ঠতত্ত্ব; তিনি সর্ববেদবেদ্য। বিশ্ব সত্য (মিথ্যা নহে) কিন্তু বিষ্ণু হইতে ভিন্ন। জীবসকল শ্রীহরির চরণসেবনকারী; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে হরিসেবনানুসারে তারতম্য আছে। শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মলাভই মোক্ষ। শ্রীবিষ্ণুর অমলভজনই শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মলাভের হেতু। প্রত্যক্ষাদি তিনটি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ,—এই তিনটি প্রমাণ; ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র হরি উপদেশ দিয়াছেন।

"তর্হ্যেবং জগন্মিথ্যাত্ববাদে শিষ্যাচার্য্যয়োস্তদুপদিষ্ট-জ্ঞানস্যাপি তদন্তর্গত-ত্বাচ্ছিষ্যোপদেশার্থং কল্পিতমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুম্, কল্পিতাচার্য্যোপদিষ্টেন কল্পিতজ্ঞানেন কল্পিতস্য শিষ্যস্য কা বার্থসিদ্ধিঃ। নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রাতিরেকি সর্ব্বং মিথ্যেতি বদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদি প্রযত্নো নিষ্ফলোঽবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ শুক্তিকারজতাদিষু রজতাদ্যুপাদানাদি প্রযত্নবৎ। মোক্ষার্থপ্রযত্নোঽপিব্যর্থঃ, কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ। শুক-প্রহ্লাদ-বামদেবাদিপ্রযত্নবৎ।"

শ্রীরামানুজাচার্য বলেন,—যেখানে জগৎ অসত্য, সেখনে আচার্য ও আচার্য উপদিষ্ট জ্ঞানও মিথ্যা। ঐ সকল জ্ঞান কেবল শিষ্যোপদেশের জন্য কল্পিত হ'য়েছে, একথাও বলতে পার না; কারণ কল্পিত আচার্যের কল্পিত জ্ঞানদ্বারা কল্পিত শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হ'তে পারে?

রজতরূপে প্রতীয়মান শুক্তি দেখে 'রজতার্থী কোন ব্যক্তি যদি রজত আহরণের জন্য তা'তে প্রবৃত্ত হয়, তা' হ'লে তা'র সেই প্রযত্ন যেরূপ বিফল হয় অর্থাৎ রজত লাভ হয় না, সেরূপ নির্বিশেষজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা ব'লে মোক্ষলাভের জন্য শ্রবণাদি বিষয়ে প্রযত্নও অবিদ্যার কার্য ব'লে নিষ্ফল হ'য়ে পড়ে।

মুক্তিলাভের চেষ্টাও কল্পিত আচার্যের অধীন জ্ঞানের কার্য ব'লে কল্পিত শুক, প্রহ্লাদ এবং বামদেব প্রভৃতির চেষ্টার ন্যায় ব্যর্থ হয়।

"জাতে তু জ্ঞানে যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদিশ্রুতের্নে দ্বৈতদর্শনমিতি চেত্তহি অদ্বিতীয়াসাক্ষাৎকারাদ্ বিনষ্টমূলাজ্ঞান-তাৎকার্য্যস্য কথং দ্বৈতদর্শনপূর্ব্বকোপদেশাদি ব্যবহারাঃ।"

হে মায়াবাদিন্, যদি বল, তত্ত্বকালোৎপত্তির পূর্বে উপদেশ প্রভৃতি বিষয় যথার্থরূপেই বর্তমান থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হ'লে " যে-সময় ইহার নিকট সমস্তই আত্মস্বরূপে প্রতিভাত হয়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিব"—এই শ্রুতি অনুসারে দ্বৈতদর্শন না থাকায় উপদেশাদি সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। তা' হ'লেও বক্তব্য এই যে, গুরুর অদ্বৈত সাক্ষাৎকারদ্বারা মূল অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য দ্বৈতদর্শন বিনষ্ট হ'য়েছে, তিনি আবার কিরূপে দ্বৈতদর্শনপূর্বক শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে সমর্থ হন? অদ্বৈতোপলব্ধিতে যখন দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন ত' উপদেশ সম্ভবই নহে। যাঁর ভেদভান বিরাজ থাকা-কালে অজ্ঞান থাকে, সে কালে অজ্ঞানী, অসিদ্ধ ব্যক্তি ত' উপদেশই করিতে পারেন না। সুতরাং মায়াবাদী ত' কোনও কালেই 'গুরু' হ'তে পারেন না। সিদ্ধাবস্থায় (?) তাঁহার গুরু হওয়া অসম্ভব। অসিদ্ধাবস্থায় ত' গুরু হ'তেই পারেন না। এজন্য কখনও মায়াবাদীকে গুরু করা উচিত নয়। তিনি নিজেই যদি উপদেশকালে অসিদ্ধ থাকেন, তা'হলে সেই অসিদ্ধের নিকট গমন ও শ্রবণ বৃথা।

আমরা চিদচিন্মিশ্র তটস্থ—বিরজায় বা কারণ-সমুদ্রে মানবজ্ঞানের ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা লাভ ক'রেছে। সেখানে গুণ-বৈচিত্র্য দেখা যায় না। সেখানে ভাগবত-প্রতিপাদ্য বাস্তব-সত্যের কথা নাই।

রামানুজীর বিচারে যেখানে চিৎ এর ব্যবহার, সেখানে বিবর্ত আসার শঙ্কা। "অহং ব্রহ্মাস্মি" তটস্থ ভাবমাত্র—তৃণাদপি সুনীচ ভাবটি প্রকৃত জীবের ধর্ম।

গৌড়ীয়-দর্শনকে "অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শন" বলা যায়। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।" ইহা 'কে আমি' প্রশ্নোত্তরে বলা হ'য়েছে। তুমি ব্রহ্ম নহ, তটস্থ শক্তিজাত চেতনও বটে; আবার অচেতনের সহিত সংমিশ্রিত, চিদচিদ্ বৃত্তিযুক্ত। যদি কেবল অচেতন হ'তে, তবে স্বতন্ত্রতা থাকত না।

'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।

(গীঃ ১৮।৬১)

যদি স্বেচ্ছায় প্রেয়ঃপথে চালিত হই, তবে ত্রিতাপজ্বালা অনিবার্য। কিন্তু আমি জন্ম-স্থিতিধ্বংসযুক্ত বস্তু নই। আমি তটস্থ ধর্মযুক্ত। আমার প্রভূত্বে ইচ্ছা আমার সর্বনাশের কারণ। মুক্তগণের—আত্মবিদ্‌গণের বিচার নহে,—ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ হওয়া।

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।
ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।।

মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে-সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যাভিলাষি ব্যক্তি সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরিসেবার অনুকূলা হয়, সেইরূপভাবে করিবেন।

যে-কোনও অবস্থায়ই পতিত হউন না কেন, কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা হরির দাস্যে যাঁহার সর্বতোভাবে প্রযত্ন, কৃষ্ণার্থেঽখিলচেষ্টা সেই পুরুষই জীবন্মুক্ত।

"মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"। অন্যরূপ অর্থাৎ বিরূপ পরিত্যাগ ক'রে নিত্যশুদ্ধ স্বরূপে বিশেষরূপে অবস্থিতির নামই মুক্তি। এরূপ ধরণের কথা নয় যে, অণুচিৎ আমি বৃহৎ চিৎ হ'ব।

যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভুরি জীবাঃ।
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধিস্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব?

যেরূপ সমুদ্রে অনন্ত তরঙ্গ র'য়েছে, সেরূপ আমরাও চিৎসমুদ্রস্বরূপ ব্রহ্মে অনন্ত জীব অবস্থিত। তরঙ্গ যেরূপ কখনই সমগ্র সমুদ্র ব'লে গণ্য হ'তে পারে না, সেরূপ

তুমি জীব কিরূপে আপনাকে ব্রহ্ম ব'লে প্রতিপন্ন ক'রবে? অর্থাৎ সমুদ্র তরঙ্গপূর্ণ বটে, যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রের অঙ্গ, কিন্তু তরঙ্গ কখনই—সমগ্র সমুদ্র বা নিজ সমুদ্র (ocean proper) নয়। চিৎকণ জীবসমূহ ব্রহ্মের বিভিন্নাংশ হ'লেও জীব কখনই ব্রহ্ম হ'তে পারে না।

ঘটাকাশ ও মহাকাশের উপমা খুব অসম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্ট। বোকা লোকের ডাঁশাবুদ্ধি সাময়িক অভিভূত ক'রে তা'দিগকে ঠকানোর চেষ্টা! ঘটাবৃত আকাশ—মহাকাশ নয়। ঘট ভাঙ্গলে—"স চ অনন্তায় কল্পতে।" সে তখন কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণকর্তৃক আকৃষ্ট পূর্ণতমকর্তৃক পূর্ণরূপে আকৃষ্ট।

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।

ভাবনার পথ অতিক্রম ক'রে অপ্রাকৃত চমৎকার পরাকাষ্ঠার আধার স্বরূপ যে স্থায়ীভাব শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে নিশ্চিতরূপে আস্বাদিত হয়, তাই 'রস' বলে কথিত। নলদময়ন্তীর—ভরতমুনির প্রাকৃত রস—'রস' নহে। জয়দেবের "চন্দ্রালোকের" রস হ'তে উহা পৃথক। বৈরাগ্য 'রস' নয়। আত্মজিজ্ঞাসা—মনের দ্বারা জিজ্ঞাসা নয়। লব্ধ সমাধিতে অর্থাৎ neutral stage-এ (নিরপেক্ষ অবস্থায়) Absolute -এর অবস্থান। তথায় আমরা 'শান্ত রস' দেখি। নির্বিশেষবাদীর শান্তরস নয়, যেহেতু জড়বিশেষবাদে সাপেক্ষধর্ম চিত্তদর্পণকে পার্থিব চিন্তারজো-দ্বারা আবরণ করায় উহা হ'তে মুমুক্ষাই নির্বিশেষ-বিচার।

যদি নৈষ্কর্ম্য-বিচারে পূর্ণমাত্রায় অবস্থান করি, তা' হ'লেই আমরা এই সকল বিচার বুঝ্তে পারি।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।

তত্ত্ববস্তুর ধারণা কেবল চেতন হ'লে—ব্রহ্ম ধারণা, সৎচিৎ ধারণা হ'লে পরমাত্মা ও সচ্চিৎসহ আনন্দসংযুক্ত হ'য়ে ধারণা হ'লে—ভগবান্। সুতরাং অসম্পূর্ণ ধারণা তিনটিকে পৃথক্ করে না, তবে অস্পূর্ণতা সংরক্ষণকারী তাহাদের পৃথক্ বুঝে। অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলে। 'ব্রহ্ম' ভগবানের পূর্ণ প্রতীতিরই একটি অসম্যক্ আবির্ভাব-বিশেষ।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা-
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পুর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।।

তত্ত্ববাদ—ওঁ তৎ সৎ বিচারে প্রকটিত। মায়াবাদ—তত্ত্বের প্রতীতিতে উদ্ভুত।

কিছুদিন পূর্বে বৌদ্ধগণকে মায়াবাদী বলা হ'ত। আর তা'র পর যা'রা শ্রুতির অর্থ বিপর্যয় ক'রে ব্রহ্মে মায়া-মিশ্রিত-ভাব আরোপ ক'রত তা'দিগকে মায়াবাদী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হ'য়েছে।

মায়াবাদমতান্ধকারমুষিত-প্রজ্ঞোহসি যস্মাদহং
ব্রহ্মাস্মীতি বচো মুহুর্বদসি রে জীব ত্বমুন্মত্তবৎ।
ঐশ্বর্য্যং তব কুত্র কুত্র বিভুতা সর্ব্বজ্ঞতা কুত্র তে
তন্মেরোরিব সর্ষপেণ হি তুলা জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ।।

হে জীব, মায়াবাদ-মতবাদরূপ অন্ধকারের দ্বারা তোমার প্রজ্ঞা অপহৃত হ'য়েছে। সেজন্যই তুমি উন্মত্তের ন্যায় মুহুর্মুহু 'আমি ব্রহ্ম'—একথা বলছ। দেখ, তোমার ঐশ্বর্য, বিভুতা ও সর্বজ্ঞতা কোথায়? হে জীব, সর্ষপের সঙ্গে যেরূপ সুমেরুর তুলনা, তোমার সঙ্গেও সেরূপ ব্রহ্মের তুলনা।

আমরা কেবল চেতনের—তত্ত্ববস্তুর জিজ্ঞাসা চাই—কোনরূপ মনঃকল্পিত একদেশ বিচার চাই না।

পরিকর জিজ্ঞাসা—অবিকৃত অমিশ্র চেতনে প্রবিষ্ট হ'য়ে কিরূপে বিলাসে অবস্থিতি হয়, তা'র জিজ্ঞাসা।

——এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত—এখানে পঞ্চভেদের বিচার আলোচ্য। নিঃশক্তিক ও সশক্তিক—ভগবান্—সশক্তিক। ভগবদ্বস্তুকে মিশ্রবোধ ক'রে যে বিচার-ভ্রান্তিতে ব্রহ্মবিচার, উহাই নিঃশক্তিক বিচার। অপরিবর্তিত শক্তি—অন্তরঙ্গা শক্তি—বৈকুণ্ঠ-বস্তু। আর বহিরঙ্গা শক্তিজাত বস্তু—মায়িক। "মীয়তেঽনয়া ইতি মায়া"। স্বরূপ-নির্ণয় সত্য জ্ঞানকে বিপন্ন করে, তা' হ'তে মুক্ত হ'য়ে যে বিচার তা'ই স্বরূপ-নির্ণায়ক বিচার। স্বরূপের বিকৃত অবস্থা আমাদের নিত্যত্বের, চেতনত্বের ও আনন্দের ব্যাঘাতকারক। স্বরূপের দাস্য—ভগবদ্দাস্যময়। আর বিরূপের দাস্য—ভগবদ্দাস্য ব্যতীত অন্য চেষ্টাময়। নশ্বর বস্তুর সেবায় আমাদের দিন দিন অমঙ্গল, দরিদ্রের সেবায় আমাদেরও দরিদ্রতা লাভ হয়, অতএব পূর্ণজ্ঞানের—পূণসত্তার—পূর্ণ আনন্দের সেবা করাই মানবের একমাত্র স্বরূপের ধর্ম। পূর্ণজ্ঞানময়, পূর্ণ দয়াময়ের বিচারের বিরুদ্ধে চেষ্টা প্রশংসনীয় নহে।

যে-কোন অবস্থা আমরা পাই, ইন্দ্রত্ব—অমরত্ব সব অবস্থায় প্রভুত্ব চলতে পারে—কোনটা সত্ত্বগুণ, কোনটা রজোগুণ, কোনটা তমোগুণের দ্বারা হ'তে পারে। কিন্তু কতদিন কর্‌তে পারব্?

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ।। (১)
(ভাঃ ৬।৩।২৫)

যিনি আমাদিগকে জড়ানুভূতিতে রেখে' কাম্য কর্মের উপদেশ করেন, তিনি 'মহাজন' ন'ন। কতক্ষণের জন্য কতদূর কর্মফল লাভ হ'বে? আমাদিগকে বেশ লাড্ডু দেখিয়ে ইতর বস্তুর সেবায় নিযুক্ত করে। আমরা আর জন্মজন্মান্তর এরূপভাবে সময় নষ্ট করব না। মূর্খলোক তাৎকালিক কথায় আবদ্ধ থাকে—পূর্ণচেতনের কথা না শুনা পর্যন্ত তা'রা নিজ নিজ ক্ষুদ্র অধিকারের কথায় ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু পারমার্থিকগণ,—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ।। (২)
(ভাঃ ১১।২১।২)

—এই শ্লোকের বহুমানন করেন।

উচ্চ অধিকারের নিন্দা বা তা'তে উদাসীন হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্।। (৩)
(ভাঃ ১১।২০।৩৬)

যাঁহারা সর্বক্ষণ ভগবৎসেবা করেন, তাঁ'দের বাক্য সর্বতোভাবে শ্রোতব্য। সুতরাং বহু জন্মান্তরের পরে মানবজন্ম পেয়ে মানবকে আক্রমণ বা হিংসা করা উচিত নয়। মানবজন্মের একমাত্র সার্থকতা যে হরিভজন, সেই হরিভজনে অন্যাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞান-

---

১। নাম সঙ্কীর্তনাদির দ্বারাই যদি মুক্তি সুলভা হয়, তবে বিদ্বদ্গণ কর্ম-যোগাদির উপদেশ করেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—) ভাগবতধর্ম তত্ত্ববেত্তা পূর্বোক্ত দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য-জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবী মায়ায় অতিশয় বিমোহিতা হওয়ায়, তাঁহারা এই নাম-সঙ্কীর্তনরূপ পরম ভাগবত ধর্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্ যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদি দ্বারা মনোহর বাক্যেই জড়ীভূত; তাই, তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি-দ্বারা বিস্তৃত বহুকষ্টসাধ্য দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি তুচ্ছ অনিত্যফলপ্রদ কর্মযজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সুখসাধ্য অথচ চতুর্বর্গধিক্কারী পরমার্থফলপ্রদ নাম-কীর্তনাদিতে রত হন নাই।

২। নিজ নিজ অধিকারে অবস্থানই গুণ এবং তাহার বিপর্যয়ই দোষগুণদোষের এইরূপ নির্দ্ধারণ অবগত হইবে।

৩। রাগাদিরহিত, সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বুদ্ধির অতীত ভগবদ্বস্তু-প্রাপ্ত মদীয় একান্ত ভক্তগণের বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্মজন্য পুণ্য বা পাপের সম্ভব হয় না।)

যোগাদির চেষ্টাদ্বারা যে বাধাপ্রদান, তা'ই মানবের প্রতি অত্যন্ত ক্রূরজাতীয় হিংসা; ঐ হিংসার মূল্য বেশী নাই। আমাদের চিদচিদ্ বিবেক আছে, তথাপি যদি আমরা পশুভাবের সহিত আমাদিগকে এক মনে করি, তবে আমাদিগকে কেউ প্রশংসা করবেন না।

যা' ধ্বংসশীল, যা' নিত্য নয়, যা' কেবল চিৎ নয়, তা'র প্রতি আমাদের সেবাবৃত্তি প্রযুক্ত হ'লে আমরা বড় ক্ষতিগ্রস্ত হ'ব।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।*

(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যিনি অচ্যুত, তাঁ'র সেবাই কর্তব্য। আত্মবিষয়ই আলোচ্য। যদি তা' না হয়, তবে আমাদের অমঙ্গল নিশ্চয়।

মানুষমাত্রেই নিত্যকালই উপাসক—কেবল নিষ্ক্রিয় নহে। উপাসনার বস্তু—চিরস্থায়ী, নিত্য চিন্ময়, নিত্য আনন্দময় কি না জান্‌বার যোগ্যতা আমাদের আছে। আমরা সংশয় নিবৃত্ত করতে পারি, আমরা নির্বুদ্ধির নিকট পরামর্শ চাই না, পারমার্থিকের নিকট শ্রেয়ঃ চাই।

মানব জাতির মধ্যে যাহার যত কথা আছে তাহাতে বাধা দিয়া সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাটের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কথার অবতারণা। মানবজাতি ভোগী বা ত্যাগি সজ্জার যত কিছু উচ্চ অবস্থা লাভ করুক, তাহা সকলই 'কাম' শব্দবাচ্য। শ্রীমদ্ভাগবত মানবজাতির ঐ সমস্ত কথা নিরাস করিয়া বাস্তব সত্যের কথা বলিয়াছেন, —সত্যের মুখ্যশক্তির উপাসক হইলে প্রেমের সন্ধান পাওয়া যাইবে জানাইয়াছেন। বিদ্ধ-শাক্তেয়বাদিগণ গৌণীশক্তির উপাসনা করিয়া যে সকল Hegelian চিন্তাস্রোত আহ্বান করিয়াছেন বা বৈদান্তিক-ব্রুব হইয়া ত্যাগী সম্প্রদায় phenomenal exploitation-এর দ্বারা Transcendental-এর যে কল্পনা করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেব সেই সকল ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষের কপটতাকে নিরাস করিয়া প্রেমকেই চরমপ্রাপ্য বস্তুরূপে স্থাপন করিয়াছেন। Anthropomorphic, Zoomorphic, Apotheotic Philanthropic প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি প্রেমের অভাবজ্ঞাপক।

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবকে বলিয়াছেন—হে মহাবদান্য তোমার মত দানশৌণ্ড আর কেহ নাই; তুমি নিজের জন্য কিছু না রাখিয়া সমস্ত দান করিয়াছ, ইহা মানবজাতিকে

---

* যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুভাবে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য প্রদান করিলে, যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা-দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে। (তাঁহাদের আর পৃথক পৃথক আরাধনার অপেক্ষা করে না।

ভোগ দেওয়ার মত দান নয়, অনর্থদাস নয়—সাক্ষাৎ কৃষ্ণদাস। শ্রীরূপ আমাদিগকে তাঁহার 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকে আরও জানাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্ভোগ-লীলাতে আমাদিগের নিকট কিছু কৃপণতা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ঔদার্যময়ী শ্রীচৈতন্যলীলায় কোন কৃপণতাই করেন নাই। শ্রীচৈতন্যকে ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়া বিষ্ণুর শতকরা শতভাগ সেবার ঔজ্জ্বল্যপ্রদর্শনকারীই যে সত্য ব্রাহ্মণ, ইহা জানাইয়াছেন। প্রেমানন্দ সমুদ্রের নিকট ব্রহ্মানন্দ গোষ্পদস্থ জলবিন্দু তুল্য।

দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর কেহই শ্রীরূপানুগবরের প্রার্থনা পরিপূরণ করিতে পারেন না। কোন প্রাদেশিক বা জাতীয়তাবাদের দিক হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার নহে। আমরা বাংলাদেশের লোক বা ভারতবর্ষের লোক, আমরা অমুসলমান, সুতরাং আমাদের বাংলাদেশের, ভারতের বা অমুসলমান সম্প্রদায়ের সুবিধা হউক,---এইরূপ অপসাম্প্রদায়িকতা প্রচার প্রেমের বিরুদ্ধ ধর্ম। যে কোনও দেশে, যে কোন স্থানে, যে কোন পাত্রে, যে কেহ উদিত হউক না কেন, শ্রীচৈতন্যের প্রেম সকলের চেতনবৃত্তিতে উদিত হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত সর্বাঙ্গময়ী শতকরা শত পরিমাণ সেবায় পঞ্চরসের পরিপূর্ণতা প্রকটিত হইয়াছে। বিভুচিৎ পরমেশ্বর ও অনুচিৎ জীব—ইঁহাদের মধ্যস্থ হইয়া যিনি ইঁহাদের নিত্য সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুরুবস্তু opaque অস্বচ্ছ নহেন, তিনি নিরবিচ্ছিন্ন transparent স্বচ্ছ বস্তু। শ্রীগুরুদেবের মধ্য দিয়া কৃষ্ণদর্শন হয়।

চতুর্ম্মুখের হৃদয়োদ্ভাসিত তত্ত্বসমূহ শ্রীনারদচরিত্রে প্রতিফলিত হইয়া বৈষ্ণবগুরু শ্রীবেদব্যাসের কৃপায় আমরা তদীয় অধস্তনসূত্রে আম্নায়সমূহের তথ্য লাভ করি। এই সুষ্ঠু পথই 'শ্রৌতপথ' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যাঁহারা শ্রীব্যাসানুগত্যে উদাসীন, তাঁহারা স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া শ্রৌতপথ পরিহারপূর্বক তর্কপথাশ্রয়ে আম্নায়ালোচনায় স্ব-স্ব-চেষ্টা প্রদর্শন করিতে গিয়া বিভিন্ন মত উদ্ভাবিত করিয়াছেন। সেইগুলিকে কেহ কেহ শ্রৌতপথ বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া বিবর্ত আশ্রয় করেন। শ্রীব্যাস-কথিত পথের সৌন্দর্য ও সুষ্ঠুতা-প্রদর্শনকল্পে শ্রীগৌরসুন্দর যে মহাজনের অনুসরণের পন্থা জগৎকে দিয়াছেন, তাহাই সকল সাধ্য ও সাধনের একমাত্র সম্বল। শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিতজনগণের সেবা-প্রণালীতে যে প্রকার সাধন ও সাধ্যের তত্ত্ব লক্ষিত হয়, তাহা কালপ্রভাবে তর্কপন্থী আস্তিক-ব্রুবের সঙ্গে সেবাময়ী প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া অভক্তিমূলা চেষ্টার উদয় করাইয়া দিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাসের পন্থা পরবর্তিকালে ভাগবত ও পঞ্চরাত্র-নামক সাত্বতশাস্ত্রদ্বয়াবলম্বনে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নিরস্তকুহক বাস্তবসত্য আজ উপাধির চাঞ্চল্যে প্রপঞ্চে নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া আম্নায়-পথকে ন্যূনাধিক বিপন্ন করিতে উদ্যত। অনুসরণের পরিবর্তে ঔপাধিক-জ্ঞানে বিচলিত হইয়া আজ অনুসরণ-পথ অনুকরণ-পথে পর্যবসিত।

এইজন্য ভগবদ্‌বিমুখ আম্নায়-প্রতিপন্থি-সম্প্রদায়ের কল্যাণ-বিধানার্থ শ্রীগৌরসুন্দর তারস্বরে বলিতেছেন (ভাঃ ১২।১৩।১৮),—

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্‌বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।।"

এই প্রপঞ্চ হইতে জীবন্মুক্তপুরুষ-সম্প্রদায় ভক্তি অবলম্বন করিয়া সাধ্য লাভ করিবেন এবং সাধনপর্যায়ে অবস্থিত জনগণের মঙ্গল-বিধানে স্বতঃ পরতঃ বিশেষ যত্ন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য-লীলা প্রকটিত করিবেন। বস্তুতঃ আম্নায়শাস্ত্র ত্রিবিধ বিষয়বিভাগে শ্রুত, পঠিত ও বিচারিত হন। স্বরূপাবস্থিত পরেশানুভূতি ভগবানের সহিত ভাগবতের সম্বন্ধ স্থাপন করে। সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই সাধ্য-তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইয়া সাধ্য বা প্রয়োজন-লাভের উদ্দেশ্যে অভিধেয় অনুষ্ঠিত হয়।

সাধনাভিধেয় ও সাধ্যাভিধেয় প্রাপঞ্চিক দর্শনে সমস্তরে অবস্থিত প্রতীত হইলেও উহাদের মধ্যে নিত্যবৈশিষ্ট্য বর্তমান। সাধনাভিধেয় পরিপক্বাবস্থায় ভাবোন্মুখী অভিধেয়াত্মিকা বৃত্তিতে প্রকাশিতা হন এবং পরে প্রেমভক্তিস্বরূপিণী বৃত্তিতে উন্নতোজ্জ্বল-রসের উচ্ছ্বুরিত কিরণে সাধ্য ভাবভক্তির স্বরূপ নির্দেশ করেন। প্রয়োজন-তত্ত্ববিচারে মুক্তিলক্ষণে বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভরূপ প্রেমভক্তিরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী প্রাপঞ্চিক দর্শনে অনিত্য-উপাধিতে অস্মিতা স্থাপন করিয়া সাধন-রাজ্যে স্থূলসূক্ষ্ম অনাত্মপ্রতীতিগত চেষ্টাকেই মুখ্য-সাধন-জ্ঞানে সাধ্য অপবর্গের বিচারে জড়বৈশিষ্ট্য স্তব্ধ করেন মাত্র; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐরূপ চেষ্টা ঔপাধিক খণ্ডজ্ঞানোত্থ ও সাধ্য-শব্দ-বাচ্য হইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। পঞ্চবিধ মায়াবাদীর মুক্তির প্রতীতি ত্রিপুটী-বিনাশের পূর্বে অনুভূত হওয়ায় স্বরূপের নির্দেশে বিবর্তবাদ আসিয়া চিচ্ছক্তি-পরিণামবাদের সত্যতা তর্কপ্রণালীতে প্রবাহিত করে মাত্র; তখন জীবের অর্ণবত্রয়ের অভিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক বিচার প্রবল হয়। "ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং" প্রভৃতি ঈশ্বরকৃষ্ণের বাণীসমূহ গৌড়পাদাশ্রয়ে কেবলাদ্বৈতবাদীর কর্মান্তর ষট্‌কসাধনই সম্বল হইয়া পড়ে।

এইসকল কথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের বাণীতে বেদান্তাচার্য শ্রীপাদ বলদেব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি 'প্রমেয়রত্নাবলী'তে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমাধ্বমতসংগ্রহসূচক শ্লোকে বলেন,—

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়-বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।

মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি লাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ।।
শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভুতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদি-ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ।।"

অর্থাৎ শ্রীমধ্বাচার্য বলেন,—(১) বিষ্ণুই পরতম বস্তু, (২) বিষ্ণুই অখিলবেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব—সত্য, (৪) জীব—বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ—শ্রীহরির চরণ-সেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্ত-ভেদে তারতম্য বর্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি, (৮) বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজনই জীবের মুক্তিলাভের কারণ, এবং (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতিই প্রমাণ।

শ্রীমধ্বের মতে,—ভগবান্ শ্রীহরিই পরতত্ত্ব, জগৎ সত্য হইলেও ভগবান্ হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন, জীব—বহুসংখ্যক ও সকলহৈ শ্রীহরির নিত্য অনুচর। সাধনভেদে ফলগত তারতম্য হয় বলিয়াই তাঁহাদের পরস্পর উচ্চনীচভাবপ্রাপ্তি, কৃষ্ণসেবার বিস্মৃতিক্রমে অবিদ্যা-ঘটিত বৈরূপ্য পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধচিৎস্বরূপে অবস্থানপূর্বক ভগবৎসেবানন্দানুভূতিই মুক্তি; অন্যাভিলাষজ্ঞান-কর্মাদি মলদ্বারা অনাবৃতা নির্মলা শুদ্ধভক্তিই ঐ মুক্তিলাভের সাধন। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ,—এই তিনটি প্রমাণ এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরিই নিখিলশ্রুতি-প্রতিপাদ্য পরমপুরুষ।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত কথায় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—তত্ত্বত্রয় 'দশমূলে' এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ।।১
স্বতঃ সিদ্ধো বেদো হরিদয়িত-বেধঃপ্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তঃ প্রমিতি-বিষয়ান্ তান্ নববিধান্।
তথা প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতি-সহিতং সাধয়তি নো
ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা।।২
হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধিশিব-সুরেশ-প্রণমিতো
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতিরহিতং তত্ত্বনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ।।৩

পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে মহিমনি
স্থিতো জীবাখ্যং স্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাম্।
স্বতন্ত্রেচ্ছঃ শক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরো
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষোঽয়ং বিজয়তে।।৪
স বৈ হ্লাদিন্যায়াঃ প্রণয়বিকৃতের্হ্লাদনরত-
স্তথা সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিতরহোভাব-রসিতঃ।
তয়া শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদ-তদ্ধাম-নিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে।।৫
স্ফুলিঙ্গা ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়া
হরেঃ সূর্য্যস্যেবাপৃথগপি তু তদ্ভেদ-বিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ।।৬
স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়া দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধবরনৈঃ ক্লেশনিকরৈর্মহা
কর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ।।৭
যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যন্ তদনুগমনে স্যাদ্রুচিরিহ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে।।৮
হরেঃ শক্তেঃ সর্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতি-
র্বিবর্ত্তং নো সত্যং শ্রুতিমতি বিরুদ্ধং কলিমলম্।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিত-তত্ত্বং সুবিমলং
ততঃ প্রেম্ণঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্যবিষয়ে।।৯
শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ-নতি-পূজা-বিধিগণা-
স্তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্
নবাঙ্গান্যেতানীহ বিধিগতভক্তেরনুদিনং
ভজন্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ সুবিমলরতিং বৈ স লভতে।।১০

শ্রীগৌরসুন্দর তত্ত্ববাদি-শাখাস্থিত একদণ্ডিগণের সহিত যে তত্ত্ববাদশাখার অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সুষ্ঠু-ভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। দাক্ষিণাত্য-দেশ পরিভ্রমণকালে শ্রীলক্ষ্মণদেশিকাধ্যুষিত মূলকেন্দ্র শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণতা-সাধনোদ্দেশে শ্রীগৌরসুন্দর যে-সকল কথা স্বীয় লীলায়

গৌড়ীয়গণের সাধন সুষ্ঠুতার জন্য প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীচরিতামৃতে স্থানে স্থানে উল্লিখিত আছে। শ্রীনিয়মানন্দ-মুনির 'পারিজাত', 'দশশ্লোকী' প্রভৃতি গ্রন্থে যে-সকল অভাব তদনুগ-সম্প্রদায়ে কৃষ্ণভজনের অন্তরায়রূপে পরিগণিত হইত, সেইসকল অভাব কাশ্মীর-দেশীয় (?) কেশবাচার্যের সহিত বিচারকালে শ্রীগৌরকৃষ্ণ পরিপূরণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের শিষ্য-বংশ-পারম্পর্যে উদিত শ্রীবল্লভাচার্য-রচিত 'সুবোধিনী' নাম্নী শ্রীমদ্ভাগবত-টীকায় যে-সকল অভাব ছিল, তাহার পরিপূরণ-লীলাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-নামক গ্রন্থে সর্বতোভাবে উদাহৃত আছে।

শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক-প্রবর্তিত সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের কথা বেদ, পুরাণাদি ও মহাভারতপ্রমুখ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আছে। মহাভারতাদি ঐতিহ্যগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত ইতিহাস এতদ্বিষয়ে প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বর্ণিত হইতেছে।

ব্রহ্মার সাতটী বিভিন্ন জন্মে সেই বাস্তব-সত্য পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। কালপ্রভাবে সেই সত্য ন্যূনাধিক লুপ্ত হইয়া কলিযুগে বিবিধ তর্কপথের আবাহন করিয়াছে।

(১) ব্রহ্মার প্রথম মানস জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ফেণপগণ, তাঁহাদের নিকট হইতে বৈখানসগণ এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে চন্দ্র প্রথমে বাস্তব-সত্য লাভ করেন। (২) ব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুষ জন্মে শ্রীনারায়ণের কৃপা-ক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্র এবং রুদ্র হইতে বালিখিল্যগণ সেই সত্যে উপনীত হন। (৩) ব্রহ্মার তৃতীয় বাচিক জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে সুপর্ণ ঋগ্‌বেদের আকর-মন্ত্র লাভ করেন। তৎকালে বায়ু হইতে বিঘশাসিগণ এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে মহোদধি (রত্নাকর) ঐকান্তিকধর্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। (৪) ব্রহ্মার চতুর্থ শ্রৌত জন্মে আরণ্যকসহ বেদশাস্ত্রে সাত্বত-ধর্ম প্রচারিত হয়, তৎকালে ব্রহ্মা হইতে স্বারোচিষ মনু, মনু হইতে তাঁহার পুত্র শঙ্খপদ এবং তাঁহা হইতে সুবর্ণাভ সাত্বত-ধর্ম শিক্ষা করেন। ব্রহ্মার পূর্বোক্ত মানস, চাক্ষুষ, বাক্যজ ও শ্রবণজ—এই চারিপ্রকার আবির্ভাবে সত্যযুগের ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল।

তৎকালে ত্রেতাযুগের ন্যায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম ও বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রচার আরব্ধ হয় নাই। ফেণপ, বৈখানস, সোম, রুদ্র, বালিখিল্য, সুপর্ণ, বায়ু, মহোদধি, স্বারোচিষ মনু, শঙ্খপদ ও সুবর্ণাভ প্রভৃতি প্রাগ্‌বন্ধযুগের হরিজনগণের সকলেই একায়ন-স্কন্ধী ছিলেন। তৎকালে বৈদিক শাখার কোন বিভাগ ছিল না বলিয়াই বৈদিক ঋষিগণ 'একায়নস্কন্ধী'-নামে পরিচিত ছিলেন। প্রাগুক্ত ফেণপ, বৈখানস, বালিখিল্য ও পরবর্তিকালে ঔডুম্বরগণ পূর্বসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের অনুসরণে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার কালেও বান-প্রস্থের শাখা-বিশেষে পর্য্যবসিত হইয়াছিলেন।

(৫) ত্রেতাযুগে ব্রহ্মার পঞ্চম নাসত্য জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে সনৎকুমার ঐকান্তিক-ধর্মে প্রবিষ্ট হন। সনৎকুমার হইতে বীরণ, বীরণ হইতে রৈভ্য, রৈভ্য হইতে কুক্ষি ঐ ধর্মে শিক্ষা লাভ করেন। (৬) তৎকালে ব্রহ্মার ষষ্ঠ অণ্ডজ জন্মে ব্রহ্মা হইতে বর্হিষ্মৎ ও তদগ্রজ অবিকম্পন প্রভৃতি ঐকান্তিক সাত্বত-ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

(৭) ব্রহ্মার সপ্তম পাদ্মজন্মেই শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে দক্ষ, আদিত্য, বিবস্বান, মনু ও ইক্ষাকু প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ভাগবতধর্মে অবস্থিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শ্রীসম্প্রদায়—রত্নাকর হইতে উদ্ভূত। রত্নাকর প্রাচীন বিঘশাসি-সম্প্রদায় হইতে এবং উক্ত সম্প্রদায় আবার বায়ু হইতে ব্রহ্মার তৃতীয় বাক্যজ-জন্মে প্রকটিত হন।

ব্রহ্মার চাক্ষুষ-জন্মে ব্রহ্ম-সম্প্রদায় ও রুদ্র-সম্প্রদায় শ্রীনারায়ণ হইতে কৃপা লাভ করেন। তাঁহাদের অধস্তন বালিখিল্যগণই ব্রহ্ম ও রুদ্রসম্প্রদায় সংরক্ষণ করেন।

সনৎকুমার ব্রহ্মার নাসত্য পঞ্চমজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ত্রেতা-প্রারম্ভে ঐকান্তিক-ধর্ম লাভ করেন।

কালপ্রভাবে চতুর্দশভুবনপতি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক যথার্থ বেদসিদ্ধান্তের প্রতিকূলে যে চতুর্দশপ্রকার প্রবল মতবাদ কলিকালে প্রচারিত হইয়াছিল, উহাদের কথা শ্রীসায়ন-মাধব 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা সংক্ষেপে এই,—

১। বেদবিদ্বেষী, অন্যাভিলাষী, আধ্যাত্মিক গুণোপাসক নাস্তিক চার্বাক-সম্প্রদায়।

২। ক্ষণিকবাদী গুণোপাসক নাস্তিক তার্কিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়।

৩। স্যাদ্‌বাদী গুণোপাসক তার্কিক জৈন আর্হত্‌-সম্প্রদায়।

৪। নিরীশ্বর নির্গুণাত্মবাদী তার্কিক সাংখ্যবাদী কাপিল-সম্প্রদায়।

৫। সেশ্বর নির্গুণাত্মবাদী তার্কিক পাতঞ্জল-সম্প্রদায়।

৬। চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী শ্রৌতব্রুব কেবলাদ্বৈত-বিচারপর (হরিবিমুখ) শাঙ্কর-সম্প্রদায়।

৭। বাক্যার্থবেদী শ্রৌতব্রুব সগুণোপাসক মীমাংসক সম্প্রদায়।

৮। উৎপত্তি-সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দপ্রমাণান্তরাঙ্গীকারী সগুণোপাসক নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়।

৯। উৎপত্তি সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দপ্রমাণান্তরানঙ্গীকারী সগুণোপাসক বৈশেষিক-সম্প্রদায়।

১০। পদার্থবেদী শ্রৌতব্রুব সগুণোপাসক বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়।

১১। নিরস্ততর্ক ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী জীবন্মুক্ত-বিচারপর সগুণোপাসকশৈব রসেশ্বর-সম্প্রদায়।

১২। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী বিদেহমুক্তিবাদী আত্মৈক্যবাদী সগুণোপাসক প্রত্যভিজ্ঞ-সম্প্রদায়।

১৩। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী আত্মভেদবাদী বিদেহমুক্তিবাদী কর্মানপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগুণোপাসক নকুলীশ পাশুপত শৈব-সম্প্রদায়।

১৪। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী বিদেহমুক্তিবাদী আত্মভেদবাদী কর্ম-সাপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগুণোপাসক শৈব-সম্প্রদায়।

শ্রীচৈতন্যলীলার লেখক পরমহংসলীলাভিনয়কারী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু "নানামত-গ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্। কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্।।"—শ্লোকদ্বারা আধ্যক্ষিক জড় তর্কপন্থিদিগকে শ্রীব্যাসের আনুগত্যলাভের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী আশ্রমীর বেষে সেই পারমহংস্যধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য দৈব-বর্ণাশ্রমি-জগতের মহোপদেশক হইয়াছেন। তাঁহার বিজয়বৈজয়ন্তী-বহন-সূত্রে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত প্রচারকসম্প্রদায়কে 'শ্রীরূপানুগ' বলিয়া জানিতে যেন কাহারও বিবর্ত উপস্থিত না হয়,—ইহাই আমার সকাতর প্রার্থনা। বাহ্য প্রাপঞ্চিক জড় ধারণা-বশে পরমহংসানুগত বৈষ্ণবদাসানুদাসের আনুষ্ঠানিক অপ্রাকৃত ক্রিয়াকলাপ যেন কাহারও সত্যদর্শনে বাধা না দেয়।

ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগৌরসুন্দর-প্রকাশিত সাধন-তত্ত্ব অন্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞানে আবদ্ধ নহে, কিন্তু ন্যূনাধিক সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঐগুলি সাধন বলিয়া বহুমানিত হয়। অন্যাভিলাষীর ঐহিকফললাভ, কর্মীর পারলৌকিক নশ্বর-ফললাভ, নির্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃত্বাভাব-জন্য স্বরূপ-নির্বাণ-চেষ্টা প্রভৃতি সাধ্যবস্তুর ভগবৎপ্রেমার সহিত তুলনা হয় না। ভগবৎপ্রেমা যাহার নিকট সাধ্যবস্তুরূপে নিত্যকাল পরিদৃষ্ট হইবার পরিবর্তে পরিবর্তনশীল, তাহাদের সাধ্য-বিচার-প্রাপঞ্চিক বা ঔপাধিক অজ্ঞানের সহিত সমশ্রেণীস্থ। এই সকল সাধ্য-সাধন-বিচারের কথা শ্রীচৈতন্যলীলা-বর্ণনকারী পরমহংসসম্প্রদায়ের পূর্বগুরু শ্রীকবিরাজগোস্বামী স্বীয় উপাস্যবস্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতলীলা-বিগ্রহে সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সাধ্যের উদ্দেশে সাধকের চেষ্টার নামই 'সাধন'। সাধকের স্বরূপ-জ্ঞানের অন্তর্গত বর্তমান প্রপঞ্চও পঞ্চকোষাবৃত, সুতরাং এই আবরণপঞ্চকের উন্মোচন সাধিত না হইলে সাধ্য-ভূমিকার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আবার, সাধ্য-বস্তুকে প্রপঞ্চান্তর্গত করিবার ভ্রান্তি উপস্থিত হইলে সাধ্যাভিধেয়ের প্রতি অবিচারিত বিধান পরিলক্ষিত হয়। এজন্য, সাধনকালীয় ভক্তের অনর্থনিবৃত্তি চেষ্টা কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া সাধারণের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইলেও সাধনভক্তি কেবলমাত্র ঔপাধিক-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট মনোনিগ্রহ-লক্ষণাত্মক ব্যাপারমাত্র নহে। উহা নিরুপাধিকা-সেবা-প্রবৃত্তিস্বরূপা ও তৎফলে গৌণ-

ভাবে দ্বিতীয়াভিনিবেশজ অতদ্‌বস্তুর সংসর্গরহিত মনোনিগ্রহণলক্ষণাত্মিকা। এতদ্‌বিষয়ে পঞ্চরাত্রে বলেন,—

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ।।"
"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।"
'ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।।"
"সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।"

শ্রীমদ্ভাগবত সেই বিচার সমর্থনকল্পে

(১) শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি মুখে (ভাঃ ৭।৫।৩০-৩২),—

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্বণানাম্।।
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।।
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।

(২) ব্রাহ্মণবর্য ভরতের উক্তিমুখে (ভাঃ ৫।১২।১২),—

"রহূগণৈর্তত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্‌বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্।।"

এবং (৩) শ্রীব্রহ্মার উক্তি-মুখে (ভাঃ ৩।৯।৬),—

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ।।"

প্রভৃতি শ্লোকে শুদ্ধভক্তিরই সাধনত্ব এবং উন্নতরসাত্মিকা প্রেম-ভক্তিকেই সাধ্য-প্রেমার সহিত অবিচ্ছিন্ন অভিধেয়রূপে স্থির করিয়াছেন।

প্রপঞ্চে উদিত সকল আচার্য্যই ভগবদ্‌বস্তুকে 'সম্বন্ধ', ভগবৎসেবাকে 'অভিধেয়' এবং ভগবৎপ্রীতিকেই 'ফল'রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তবে তাঁহাদের অধস্তনগণ সেইসকল কথায় অন্যাভিলাষ-মিশ্রা, কর্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা সেবাকে সাধনাত্মক অভিধেয়রূপে গ্রহণ করায় ফলকালে নিত্যভক্তির অধিষ্ঠান বিস্মৃত হইবার ছলনা দেখাইয়াছেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে আত্মার নির্মলা বৃত্তি 'ভক্তি' আচ্ছাদিত হওয়ায় শ্রীব্যাসদেবের নিজ-গুরূপদেশের

সহিত উহা অমিল হইয়া পড়ে, এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে শ্রীব্যাসদেবের বাস্তব-বস্তুর নির্মলদর্শনে আমরা অবগত হই যে,—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-পুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা।।"

'অহং ব্রহ্মাস্মি' শ্রুতি মন্ত্র, 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'অমানী', পদদ্বয়ে ক্রোড়ীভূত হ'য়েছে। 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি বা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' শ্রুতিমন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য। 'তত্ত্বমসি' শ্রুতি 'তরোরপি সহিষ্ণু' ও 'মানদ' পদে ক্রোড়ীভূত হ'য়েছে। "যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" ইহাই 'তত্ত্বমসি' শ্রুতির তাৎপর্য্য। 'প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' কীর্তনীয়ঃ' পদে ক্রোড়ীভূত হ'য়েছে। কীর্তন জন্য প্রেমাই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য। 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' 'তৃণাদপি' শ্লোকের 'হরিঃ' পদে ক্রোড়ীভূত হ'য়েছে। 'অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন' বাক্যই 'একমেকাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' এই শ্রুতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য।

কৃষ্ণপ্রেমা—প্রাপ্যাধিকারের সকল প্রাপ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা লাভ করিতে হইলে শ্রবণ-কীর্তন-লিপ্সু সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বর্তমান বদ্ধাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই একমাত্র সম্বল। এই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই আ-জন্মমরণকাল আমাদের সহায়। এই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্যে আমরা ভগবানের অচিচ্ছক্তি-পরিণত-জগতে বিচরণ করিবার যোগ্যতা লাভ করি। এই অচিচ্ছক্তি-পরিণামই প্রতিকূলভাবে আমাদের অভিনিবেশ বর্ধন করে এবং উত্তরোত্তর অচিচ্ছক্তি-পরিণত বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সন্ধান আমরা পাই না। কিন্তু ঔদার্য্যলীলাময় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর প্রকৃত-প্রস্তাবে আমাদের কল্যাণবিধানের নিমিত্তই এই অসীম, পরিচ্ছিন্ন, কালক্ষোভ্য সংসারে তাপত্রয়ের বিধান করিয়া স্বয়ং সেই তাপত্রয়ের উন্মীলনসাধক শ্রীব্যাসদেব-কথিত শ্রীভাগবত-গানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার, স্বীয় পার্ষদ শিক্ষক-সম্প্রদায়ের অভাবাদি পূরণ করিবার জন্য স্বয়ং আচার্য্যের বেষে স্বীয় ভজনমুদ্রা অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, সহস্রপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু-লিখিত চতুঃষষ্টি প্রকার সাধন ভক্ত্যঙ্গের এবং তন্মধ্যে নবধা ভক্তিরই প্রাধান্য বর্তমান।

আবার, তদপেক্ষা পাঁচপ্রকার সেবাই অধিকতর ফলপ্রদ, তন্মধ্যে আবার শ্রীনাম-সংকীর্তনই একমাত্র অপরিহার্য সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ। অপর-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ সাধন করিতে হইলেও শ্রীনামকীর্তনই সর্বোপরি জয়যুক্ত হন। শ্রীভগবদ্বাণীতে যে শ্রীনামের সেবারূপ কীর্তন প্রচারিত হয়, তাহা শ্রবণ-মুখেই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রবণকীর্তনাদিমুখে প্রচারিত হয়, তাহা শ্রবণ-মুখেই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রবণকীর্তনাদিমুখে শ্রীরূপ-দর্শন, গুণগ্রহণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্যোপলব্ধি ও লীলাবস্থিতিরূপ বিবিধ বৈচিত্র্যময় নিত্যসেবা-কার্য্যে আমাদিগকে অবস্থিতি করায়। তৎকালে আমরা নশ্বর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতির রাজ্য-অতিক্রমপূর্বক বৈকুণ্ঠ-গোলোকাদি প্রদেশে অবস্থান করি। তথায় আমাদের বর্তমান নশ্বর অস্থি, মাংস, মজ্জা ও তৎসংশ্লিষ্ট দ্রব্যসমূহ সঙ্গে লইয়া যাই না। এই সর্বার্থসিদ্ধিলাভের একমাত্র সাধনই বৈকুণ্ঠ-নামকীর্তন। বৈকুণ্ঠ শ্রীনাম মায়িক-নামের সহিত তুল্য-পর্য্যায়ে দৃষ্ট হইলেও তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে।

আমাদের প্রত্যেক্ষ পদ-বিক্ষেপে, ভ্রমণে, জাগরণে, শয়নে, তীর্থভ্রমণে, সদসৎ-কার্যকালে কৃষ্ণ যদি আমাদের স্মৃতি পথে না থাকেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই আমরা বিপথ-গামী হ'ব। বিকৃত স্বদেশগত বা বিদেশগত বর্ণাশ্রমধর্ম—প্রস্তাবিত বর্ণাশ্রমধর্ম প্রভৃতি দ্বারা আমাদের মঙ্গল হ'বে না। একমাত্র পারমহংস্যধর্মে অবস্থিত অর্থাৎ অনুক্ষণ সর্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন-ব্যতীত জীবের পূর্ণ মঙ্গল নাই—নাই—নাই। ঐ জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন,—

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ।।

কিন্তু পূর্ণভগবৎসেবার কথা আবিষ্কৃত হ'লে ভোগের বা ত্যাগের বিচারে অকর্মণ্যতা প্রতিপন্ন হয়।

স্ত্রীপুত্রাদিকথা জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ।।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার কর্‌লে প্রাকৃত বিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্বতোভাবে বর্জন ক'রেছিলেন। তপস্বিগণ তাঁ'দের তপস্যা ত্যাগ ক'রেছিলেন, জ্ঞান-সন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, তখন ভক্তিরস-ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 'রস' আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

(৪)

ভারতীয় যে ষড়্‌দর্শনের কথা প্রসিদ্ধ আছে, বেদান্ত-দর্শন তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চরম মীমাংসা। যিনি এই সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার ভাষ্যগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনা করিয়া বেদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য বেদান্তের ভাষ্য লিখিয়াছেন এবং তাহাই হিন্দু-সম্প্রদায়ের একশ্রেণীর উপর বা পৃথিবীর অনেকের হৃদয়েই ন্যূনাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ভাষ্য ঘুরিয়া-ফিরিয়া প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা পরিপূর্ণ। তাঁহার পরবর্তীকালে চারিজন আচার্য আস্তিকতা বা পরাৎপর তত্ত্বের সবিশেষ-বিচার প্রচার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী বা তৎপূর্ব হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সকল আচার্যের অভ্যুদয়-কাল। ইঁহারা সকলেই দক্ষিণ-দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতে আস্তিক-বিচার-স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে। এই চিন্তা-ধারার মূলে স্বতঃসিদ্ধান্ত শব্দ-প্রমাণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস মেরুদণ্ডের ন্যায় অবস্থিত আছে। এই শব্দ-প্রমাণই 'শ্রুতি' বা 'বেদ' নামে পরিচিত।

খৃষ্টের অভ্যুদয়ের বহু শতাব্দী পূর্বে কেহ কেহ এই মেরুদণ্ড ভগ্ন অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ শব্দ-প্রমাণের নিরঙ্কুশ প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহবাদ উপস্থিত করেন এবং ইহাকেই তাঁহার বিচার-যুগ বলিয়া অভিহিত করিতে চাহেন। কাহারও কাহারও মতে এই যুগেই ভারতীয় ষড়-দর্শন ভাস্করালোক দর্শন করিয়াছিল। গ্রীক্‌গণের সংঘর্ষে, সিদিয়ান এবং অন্যান্য অনার্য আদিম আদিবাসিগণের আগমনে শ্রুতি-মূলে আস্তিকতার চিন্তাধারা নানাভাবে সন্দেহবাদের জটিলতায় আক্রান্ত হইয়াছিল। জাতি ও কৃষ্টি সম্বন্ধে নানাপ্রকার সংমিশ্রণ উপস্থিত হইয়াছিল। বিভিন্ন বিবদ্‌মান মতবাদ সমূহের অভ্যুদয়ের দ্বারা বর্তমান ধর্ম বিবাদ-মহীরুহের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। বেদান্তদর্শন তাহার মীমাংসা করিলেও আচার্যশঙ্কর ভারতীয় বহু ব্যক্তির উপর তাঁহার মনীষা ও পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দ্বারা যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা তাৎকালিক আপেক্ষিক মঙ্গলের কারণ হইলেও জগতে প্রচ্ছন্ন-বেদ বিরুদ্ধ-মতবাদ-বিস্তারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। ইহা ভগবদিচ্ছায়ই সংঘটিত হয়। আচার্যশঙ্কর কেবল আজ্ঞা-বাহক মাত্র ছিলেন। সাত্বত আচার্যগণ এই প্রচ্ছন্ন-বেদ-বিরুদ্ধ মত-বাদের জন্যই নানাপ্রকার অভিযান আনয়ন করিয়াছিলেন। নবম হইতে দ্বাদশ-শতাব্দীর মধ্যে মুসলমানগণ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। এ সময়ও শ্রুতির বিচার নানাভাবে সন্দেহবাদের প্রহেলিকার অবগুণ্ঠনে আত্মমর্যাদা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। এইসময় আস্তিকতা এবং শ্রুতির প্রামাণ্য বিশেষভাবে প্রচার হইবার প্রয়োজনীয়তা হইয়া পড়িয়াছিল। আচার্যগণ এই কার্যের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সকল আচার্য যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়া সম্পূর্ণভাবে বলিতে পারেন

নাই তাহারই পূর্ণ অভিব্যক্তি সাধন করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। যাবতীয় দার্শনিক মতবাদ ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় মত—যাহা তৎকালে এবং অনাদিকাল হইতে প্রচলিত বা ভাবিকালে উৎপন্ন হইতে পারে সেই সমস্ত মতের মূল তত্ত্বগুলির আনুপূর্বিক সমালোচনা এবং তুলনামূলক বিচার প্রদর্শন করিয়া তিনি বাস্তবসত্যের বাণী জগতে জানাইয়াছেন। একমাত্র তাঁহার বাণীর মধ্যেই যাবতীয় সংঘর্ষের ও সমস্যার এবং প্রকৃত সমন্বয়ের রাজকীয় পথ সুধীসমাজ লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন মতবাদিগণের বিবদমান্ মতের অতি সুন্দর সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। সমন্বয় করিতে গিয়া তিনি বিভিন্ন মতবাদের তোযামোদকারী হন নাই। কিংবা "সবাই সমান"—এইরূপ গোঁজামিল দেওয়া মত প্রচার করিয়া লোক-প্রিয়তা-প্রাপ্তির আশায় লোককে বাস্তব অকৈতব সত্য হইতে বঞ্চিত করিবার আদর্শও দেখান নাই। যে-সকল মতবাদ মানবজাতির মনে নানাপ্রকার ধাঁধাঁ উপস্থিত করিয়াছে, তিনি সেইসকল ধাঁধাগুলি অতি সুন্দররূপে ভঞ্জন করিয়া পরম সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মায়া বহুরূপিণী হ'য়ে বিভিন্ন শক্তি প্রয়োগ ক'রেছে—যদ্বারা মায়া আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তি প্রয়োগ ক'রেছে। সেই বৃত্তিতে জীবের বস্তুর বাস্তব জ্ঞান আবৃত। এই মায়ার হাত হ'তে উদ্ধার লাভ করবার জন্য একমাত্র কৃষ্ণেরই শরণ গ্রহণ করা ব্যতীত আর অন্য কোন পন্থা নাই—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

আরোহবাদী বহু হ'তে একের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সাংখ্য চব্বিশটি তত্ত্ব লক্ষ্য করছেন। পৃথিবী থেকে তিনি বিচারটাকে start দিয়েছেন যা তিনি প্রত্যক্ষ্যজ্ঞানে দেখতে পান। প্রত্যক্ষকে অবলম্বন ক'রে যে অনুমান হচ্ছে, তা'ই তাঁর ভিত্তি-সম্বল। তা' ই তাঁর শক্তি। অনেকের বিচারে বিশ্বে বহু দেব-বাদ উপস্থিত হ'য়েছে। "অসদ্ অকরাৎ উপাদান-গ্রহণাৎ সর্ব্ব সম্ভবাভাবাৎ"।

জল থেকে 'দই' হ'তে পারে না, দুধ থেকেই 'দই' হয়। খণ্ডরাজ্যের সব জিনিষে সব নেই। লোহা জিনিষটা আগুনের হাপরে থাক্‌লে উত্তপ্ত হয়; তখন অপরকে পোড়াতে পারে; কিন্তু লোহার নিজের দাহিকাশক্তি নাই। আগুনের দাহিকাশক্তি লৌহে অর্পিত হচ্ছে। লৌহে দাহিকাশক্তি গ্রহণের যোগ্যতা আছে। যত পার্থিব ব্যাপার বুদ্‌বুদের ন্যায় অভ্যুদয়ের নিশান নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে, সব থেমে যাবে। যখন বস্তু বিকার প্রদর্শন করে; তখনই স্বরূপটি ফুটে উঠে অর্থাৎ 'বস্তু' না 'অবস্তু' ধরা পড়ে।

অপরা প্রকৃতি—প্র+কৃতি; যা' দ্বারা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির ইচ্ছা প্রকৃষ্টরূপে স্থানপ্রাপ্ত হয়—বহিরঙ্গা শক্তির ইচ্ছা যেখানে কৃতিত্ব লাভ করে—নশ্বর অপ্রয়োজনীয় অভাবযুক্ত ব্যাপার-সমূহ প্রসূত করবার জন্য যে শক্তি আছে, সেই শক্তি-স্বরূপ ছায়া-সদৃশ। যেমন একটি মানুষ পুকুরের জলে মানুষটির ছায়া পড়েছে। ছায়াতে মানুষের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ছায়াটা—মানুষ নয়।

ভগবান্—চেতন-ধর্ম-বিশিষ্ট। তা'র বিপরীত বস্তু—চেতনের অভাবজ্ঞাপক। আমরা যখন ছায়াটা দেখছি, তখন ঠিক সেই জিনিষটার মতই দেখি। অনেক সময় 'চূণ' গোলাকে 'দুধ' মনে করি—শ্যামাঘাসকে 'ধান্য' মনে করি। তখন analogy deceptive হয়। আমাদের বর্তমান বহিঃপ্রজ্ঞাপ্রচারিত চক্ষু দ্বারা বস্তু দর্শন করায় আমরা অবাস্তব বিজ্ঞানকে বহুমানন করছি—বস্তুতঃ অজ্ঞানকেই বিজ্ঞান বল্‌ছি—আলেয়ার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছি। প্রতিফলিত ব্যাপারটাকে বাস্তব বস্তু জ্ঞান করছি,—

আমরা অধনকে 'ধন' জ্ঞান করছি। এই অবস্থা বাস্তব সত্য বিষয়ে পূর্ণজ্ঞানের অভাবের জন্য। আমাদের স্বাস্থ্য পুনরায় লাভ হ'লে আমরা জানব,—ব্যারামের সময় আমরা কিরূপ প্রলাপ বক্‌ছিলাম। For the time being যেটা আমাদিগকে suit করছে, সেটা সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকবে না। Infant class এবং জ্ঞানের সঙ্গে post-graduate class এর জ্ঞানের তুলনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, জ্ঞানটা কিরূপ পরিবর্দ্ধিত হ'য়েছে। Paralysis হ'লে আমাদের যোগ্যতাও হঠাৎ বিনষ্ট হ'য়ে যায়। পরজন্মে অন্যত্র posted হ'লে এজন্মের সঞ্চিত জ্ঞানের অকর্মণ্যতা সাধিত হয়।

"মুক্ত্যৈ সঃ প্রস্তরত্বায় শাস্ত্রমুক্তে মহামুনিঃ।।"

পাথরের ন্যায় অনুভূতি রাহিত্য অচিন্মাত্রবাদীর কাম্য। প্রকৃতিকে প্রসূতিজ্ঞান করার প্রণালী—মূর্খতা। নিরীশ্বর সাংখ্যের বিচারের সহিত নির্বিশেষ বিচারের আন্তরিক সহানুভূতি আছে—বাহিরের দিকে একটা আপাতপার্থক্যের প্রহেলিকা থাকলেও তা'রা পরস্পর আত্মীয়।

আগস্ত কোমতের Positivism 'বাস্তব-বিজ্ঞান' নহে। ঐরূপ বাস্তবতা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য নয়। কোমতের positivism বস্তুতঃ অবাস্তব দর্শন।

আধ্যক্ষিক দার্শনিক মত ভারতীয় হউক, আর অভারতীয় হউক, অবাস্তববিচারের অসুবিধার মধ্যে প'ড়ে গিয়েছে। যা'রা আমিত্বের প্রাপ্য ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ-মাত্র বুঝেছেন, তাঁরা অবাস্তব বস্তু-জ্ঞানে আবদ্ধ হ'লেন। বাস্তববস্তু-বিজ্ঞান উদিত হ'লে অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগাদিকে সাধনের ক্রম ব'লে আমরা গ্রহণ করি না। আর অবাস্তব বস্তুজ্ঞানে এই জগতের চিন্তাস্রোত নিয়ে ধর্মার্থ-কাম-সেবা এবং মোক্ষকে প্রয়োজন জ্ঞান করে start করি। বুভুক্ষু-সম্প্রদায়—ধর্মার্থ-কামী, আর মুমুক্ষু-সম্প্রদায়—ধর্মার্থ-কাম পরিত্যাগ করে বা ধর্মার্থ-কামকে ভোগ করতে করতে মুক্তি ভোগ-কামী। এই প্রবৃত্তি যে-কাল পর্যন্ত থাকে, সে-কাল পর্যন্ত আমরা অবাস্তব বিজ্ঞানে-আবদ্ধ।

সম্পূর্ণভাবে অপ্রতিহত কৈবল্য হচ্ছে—প্রেমা। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাই প্রেমা। তা'তে অমঙ্গলের কোন কথাই নেই।

বাস্তব বস্তু জানতে হ'বে। বস্তুর শক্তি কত রকম জানতে হ'বে। অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা—এই উভয় শক্তির বিক্রম না জানলে তটস্থা শক্তি অজ্ঞানাবৃত হ'য়ে অবাস্তব বস্তুকেই বাস্তব বস্তু ব'লে মনে করে।

যে জিনিষটা আমাদের জানা উচিত ছিল, সে জিনিষটা না জেনে আমরা অভাবগ্রস্ত জিনিযটাকে জানতে চাচ্ছি। আমরা পুষ্পের ঘ্রাণ গ্রহণ না ক'রে পুষ্পের ছায়াটাকে আঘ্রাণ করতে যাচ্ছি। অবাস্তব বস্তুতে বস্তু-ভ্রমই—বিবর্ত, যে-বিষয়ে আমরা কামলুব্ধ হ'য়ে দৌড়াচ্ছি, সেই জিনিযটা পেলেই আমাদের হ'য়ে যাবে—এরূপ ভোগোন্মুখতা অবাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞান হ'তে উদিত হয়।

আমরা cynical এবং stoical idea কখনও গ্রহণ করছি। Privations from all necessaries of life—ডাসা বৈরাগী হওয়াটাকেই আমাদের প্রচ্ছন্ন ভোগের সুযোগ মনে করছি। এইরূপে নানাভাবে ambitious করিয়ে মায়াদেবী আমাদিগকে ভোগী করাচ্ছে। এজন্য বুদ্ধিমান লোক বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাকে ডাইনী ব'লেছেন।

ভগবদ্‌বস্তুকে আমি deprive করব—কলা দেখিয়ে দিব—আমার সুবিধা করে নেব; কিন্তু জানি না, কি ক'রে সুবিধা হয়। ত্রিপুটি বিনষ্ট হ'য়ে গেলে আমার সুবিধা হবে মনে করছি। চিন্মাত্র হ'য়ে যাব আমি। আমার নিত্য চিদ্‌বিশেষ আমি চাই না,—যেহেতু, অচিদ্-বিশেষ আমাকে 'জুজু' দেখিয়ে দিচ্ছে। সেই জুজুর ভয়ে আমি ভীত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

তাবদ্ ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ।।
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।

যে ছায়াগুলো আমি সংগ্রহ করেছি, সেই ছায়াগুলো আমার পকেটে ক'রে রাখতে হবে—মরে গেলে সব ছায়াগুলো রেখে যা'ব। এই হাতে ক'রে রেখেছি যে টাকা, তা ছেড়ে চলে যেতে হবে। যে জ্ঞানটুকু বিশ্ব হ'তে সংগ্রহ করেছি, তা ছেড়ে চলে যেতে হ'বে। আমি এই সৌর-জগতে posted হ'ব, না কোথায় posted হ'ব, জানি না, কারণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। যে-সব জিনিষকে আমি সম্পত্তিবোধে গ্রহণ করেছি ও করছি, সেই সকল সম্পত্তি নষ্ট হ'য়ে যায়—এ প্রত্যক্ষ দেখছি। খানিকক্ষণের জন্য অর্জ্জন অর্জিত দ্রব্যকেও আবার হস্তান্তরিত করতে হয়। অবাস্তর বিচারে ব্যস্ত আমি—বস্তুর ছায়ায় ব্যস্ত আমি—বস্তুর প্রতি ব্যস্ত নহি। অভাবগ্রস্ত যে আমি দ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তুত—পুণ্য সংগ্রহ করবার জন্য প্রস্তুত—আমার সেই সকল যত্ন কেবল আমার aggrandisement এর জন্য—আমার দাঁড়ে ছোলা দাও—আমি পাখী।

কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ কয় মিনিটের জন্য? এই ইন্দ্রিয়ও থাকবে না—তৃপ্তিও থাকবে না। স্বর্গ (Paradise), 'বিহিস্তা' আমাকে ভবিষ্যতে সুখ দেবে ইহা কেবল ভোগা দেওয়া বুদ্ধি। ইহ জগতে আমি ভোগ চাই না—আমি কেবল 'বুঁদ' হ'য়ে যাব—আমার মুক্তির জন্য যে ইচ্ছা, তাহাও অবাস্তব।

ব্রহ্ম-সাযুজ্য তত অপরাধজনক নয়, ঈশ্বর-সাযুজ্য সর্বাপেক্ষা অধিক অপরাধজনক। ব্রহ্ম—কেবল জ্ঞানমাত্র। সেটা virtually cessation of conception and perception.

সুখের প্রার্থী আমরা সকলেই। সুখের মধ্যে কোনও রূপ দুঃখ এসে উপস্থিত না হয়, এজন্য আমরা ব্যস্ত। ভুক্তি মুক্তিতে থাকা মানে ডাইনীর হাতে থাকা। 'মুক্তি' ব'লে যে জিনিসটা অহংগ্রহোপাসক বিচার করেন, সে জিনিষটা অশ্বডিম্ববৎ। Impersonalist-দের মুক্তি—বিকারের মধ্যে মুক্তিকে স্থাপন করা; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।"

স্বরূপে অবস্থান করা মানে—ভক্তিতে অবস্থিত থাকা। 'অনিত্য' কখনও 'নিত্য' হ'তে পারে না; 'নিত্য' কখনও 'অনিত্য' হ'তে পারে না। 'নিত্য' ও 'অনিত্য' যদি কোথাও একস্থানে থাকে সেটা হচ্ছে—তটস্থাবস্থা।

ভক্তির সুখ-সমুদ্র কি প্রকারে উদিত হ'বে—যদি ধর্মার্থ-কাম চরম কল্যাণের বস্তু ব'লে বিবেচিত হয়? যে প্রীতিকর ধর্ম বর্তমানে আমাদের নিকট পরম অপ্রীতি-কর ব্যাপার, তাকে বাধা দিবার জন্য এ প্রকার কঠিন শুষ্ক-তর্কশাস্ত্রের কথাগুলি তা'র মূল্য কতটুকু?

ভুক্তি-মুক্তি-কামীর উচ্চাকাঙ্খা স্মরণ ক'রে ভগবদ্ভক্ত হাস্য সম্বরণ করতে পারেন না। কিন্তু তা'রা অনেক সময় হাস্য করেন না ব'লে ভুক্তি-মুক্তি-কামী মনে করেন যে ভগবদ্ভক্তগণের বুদ্ধি কম।

অঘ, বক, পূতনা, দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি প্রতিকূল অনুশীলন ক'রে Theism নষ্ট করতে চেয়েছিল। সবগুলোকে কৃষ্ণ বেশ ক'রে বিনাশ ক'রেছিলেন।

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনেই Theism proper, চিত্রক, রক্তক, পত্রক, শ্রীদাম-সুদাম, শ্রীনন্দ-যশোদা, ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনকারী। ইঁহাদের পর্য্যায়ে ইঁহাদের আনুগত্যে যত লোক উদিত হ'য়েছেন, তাঁরা' সকলেই অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনকারী।

ঘটপট-বিচার পরায়ণ-ব্যক্তিগণ এই জড় জগতের চিন্তাস্রোত অতিক্রম করিতে পারেন না। তাঁহারা জড়াকাশজাত-শব্দের আলোচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করেন। জড়নৈয়ায়িকগণ মৃত্যুর পর শৃগাল হয়।

"আন্বিক্ষীকিমধীয়ানঃ শার্গালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ।"

“শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য” প্রণেতা গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ মহানৈয়ায়িক ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যের দ্বারা তিনি যথার্থ ন্যায় স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্তী সময়ে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি কুতার্কিক নৈয়ায়িকগণ নানাপ্রকার বাগ্‌বৈখরীর দ্বারা বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ হইতে শুদ্ধ হরি-ভক্তিকে উৎসাদিত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন সম্বন্ধে একটি প্রবাদ,—

“অভাগ্যে গৌড়ীয়দেশে কাণভট্টো রঘুনন্দনঃ।”

‘কৃষ্ণকর্ণামৃতে’র লেখক শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর পূর্ব জীবনে বৈদান্তিক নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল শিহ্লন মিশ্র। তিনি অদ্বৈতবাদের পথ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমরসে মদমত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইষ্টদেবের জয়গান করিয়াছিলেন এইভাবে,—

“চিন্তামণির্জয়তি সোম্‌গিরির্গুরুর্মে শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ।।”

মধ্য ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি দার্শনিক জন্মিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক সায়ন মাধব ১৬ প্রকার দার্শনিক ধর্ম দেখাইয়াছিলেন। অনেকে কেবল যড়্‌দর্শনের কথামাত্র জানেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যাবতীয় দর্শনের সুষ্ঠু মীমাংসা ও সমন্বয় সাধন করিয়া বেদান্ত দর্শনের চরম কথা “আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ” “অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ”-মন্ত্র সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। নিজ অন্তরঙ্গভক্ত শ্রীসনাতনের দ্বারা “অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা” করাইয়া “কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ—এই মহাবাক্যে সু-দর্শনের চরম কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবেরহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা-চেতনতা বিতরণের জন্য জানায়াছেন যে, তোমরা কখনও অহংগ্রহোপাসক হইও না। জীব কখনও ব্রহ্ম নহে—এই কথা তোমাদের যেন ভুল না হয়। কুলশেখরাচার্য্যও এইরূপভাবে একটি শ্লোক বলিয়াছেন,—

“মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্‌ভৃত্য ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ।।”

শ্রীগৌরসুন্দর নিজে বিষয়জাতীয় ভগবদ্‌বস্তু হইয়াও আশ্রয়জাতীয় ভগবানের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বক্তব্য বিষয় এই—হে জীব তোমারা আশ্রয় জাতীয় বিভিন্নাংশ। তোমরা আশ্রয়-জাতীয় স্বাংশ নহ। জীব ভেদাংশ জাত।

ভেদাংশের মায়াবশযোগ্যতা আছে। কিন্তু মায়াধীশ ভগবানের কখনও মাধাধীশতা নষ্ট হয় না। ভগবদ্ভক্তের স্বরূপের অভিব্যক্তি কিরূপ, তাহা যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলায় জানাইতেছেন, তখন ভগবান নিজেকে "ভক্ত" বলিয়া pose করিতেছেন। অসুর মোহনাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী হইয়া জীব অধঃপতিত না হয়, এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আশ্রয়-জাতীয় অভিমান করিয়াছেন। উপনিষদ্ ব্রহ্মসূত্র, গীতা প্রভৃতি পড়িয়াও অনেকের ধারণা ভ্রান্ত-পথে প্রবাহিত হইয়াছিল, অর্থাৎ অনেকেই জীব-ব্রহ্মৈক-বাদ গ্রহণ করিয়াছিল, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং পরমব্রহ্ম হইয়া অত্যন্ত করুণাময় লীলা প্রকাশ করিয়াছেন,—আপনাকে ভগবানের দাসানুদাসরূপে প্রচার করিয়াছেন। জীবের স্বরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মের ধূলি-সদৃশ--অণুচৈতন্য। জীব শ্রীচৈতন্য নহেন, শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাস। আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব হইতেও বিদ্ধদ্বৈতবাদ জগতে প্রচারিত ছিল। বিদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদের বিচারকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদই সংশোধিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিদ্ধাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের সকল কথার মধ্যে যে-সকল অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহার পরিপূরণ করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশেও mystical pantheism প্রচারিত হইয়াছে। হেগেল, শুপেনহুয়ার, এক্কাহার্ট, পলিনাস প্রভৃতি মনীষিগণ নানা আকারে pantheism-এর ওকালতি করিয়াছেন। সুফি-সম্প্রদায়ের মধ্যেও 'অনলহক্' প্রভৃতি কথা চলিয়াছিল। দত্তাত্রেয়, বশিষ্ঠ, শঙ্করাচার্য্য, বিদ্যারণ্য ভারতী এবং উত্তর ভারতের বহু ব্যক্তি যাঁহারা সাধারণ পাণ্ডিত্য লইয়া ব্যস্ত, যাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী ও অনুমানবাদী, নিজের খেয়াল অনুসারে বেদ পড়িয়াছেন ও পড়ান, যাঁহারা শ্রৌত শব্দকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেও tabula-rasa মনে করেন,----পাছে শব্দ শুনিতে গিয়া তাহা দ্বারা অভিভূত হইতে হয় এই আশঙ্কায় যাঁহারা সর্বদা শঙ্কিত; যাঁহারা স্ফোট-বিচারের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া বহির্বিচারের ভাব ও ভাষায় আবদ্ধ, যাঁহারা ন্যূনাধিক মায়াবাদ বা নির্বিশেষবাদেরই পক্ষ সমর্থন করিবেন---এইজন্যই মায়াবাদ-সমর্থকের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ না করা পর্যন্ত ঐ সকল মনীষীর বিচার পদ্ধতির মধ্যে যে আধ্যক্ষিকতা আছে, তাহা লক্ষ্য করিবার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের বিচার-প্রণালী লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট জানা যায় যে, শ্রীধর কেবলাদ্বৈতবাদী নহেন, তিনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। অধিক কি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকের শ্রীধরের টীকা আলোচনা করিলেই ইহার সত্যতা নিরূপিত হয়; ঈশ্বর বস্তুর সঙ্গে নির্বিশেষবাদীদের কখনও সাক্ষাৎ হয় না। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের অনুস্বার, বিসর্গ বুঝিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারেন না। যেমন মালার ভিতর হাতী পুরা যায়

না, তেমনি আধ্যক্ষিকতার কবলে বাস্তব সত্য কবলিত হন না। আমরা তৃতীয়মানের রাজ্যে বাস করিতেছি। আমরা এখানে সাধারণ গণিত শাস্ত্র আলোচনা করি মাত্র। ডক্টর আইন্‌ষ্টাইন চতুর্থমানের গল্প বলিতে বসিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু তাহার স্থান, কাল ও পাত্র অতি সঙ্কীর্ণ। পঞ্চমমানের বংশীধ্বনি যখন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবে, তখন চতুর্থের অধোক্ষজত্ব উপলব্ধি হইবে। এখানে যে ষষ্ঠ ও সপ্তমের কথা—ধৈবত ও নিষাদের স্বর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ।

Impersonal school ''অপ্রাকৃত' শব্দটি ধরিতে পারেন না। এইজন্যই তাঁহাদের ধারণা ভাল হইতেছে না। তাঁহারা অপ্রাকৃতকে অপরোক্ষানুভূতির অন্তর্গত বা তদপেক্ষাও নিম্নস্তরের বলিয়া মনে করেন।

অচিদ্বিলাসে হেয়তা, অনিত্যতা প্রভৃতি দর্শন ক'রে চিদ্বিলাস ভগবল্লীলায়ও অনিত্যতাজ্ঞান সিদ্ধান্ত-প্রবেশাধিকার-বর্জিত অনুমানের দ্বারা শব্দপ্রমাণ ও বাস্তব-সত্যের সঙ্গে বিরোধ-মাত্র।

তৃতীয় মানেরই সকল প্রকোষ্ঠে যখন অনুমানের পূর্ণ প্রবেশাধিকার নাই, তখন চতুর্থমানের অতীত চিদ্বিলাসরাজ্যের কথায় যে অনুমানের কোন রকমই সার্থকতা থাকতে পারে না, তা'র আর কথা কি!

ইন্দ্রিয়-চালনার নাম—বিলাস, আর তা' হ'তে বিরতির নাম—বিরাগ। অচিদ্‌রাজ্যে ইন্দ্রিয়-চালনা ক্ষুদ্র জীবের ত্রিতাপ আনয়ন করে ব'লে তা' হ'তে বিরতিকেই বহুমানন করা হয়। কিন্তু যে স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয় জড়ের কোন পরমাণু দ্বারা গঠিত নয়—জড়াকাশে যা' পরিচালিত হয় না—যিনি পূর্ণ চেতন—যাঁ'র সমস্ত ইন্দ্রিয় পূর্ণ চেতন—যে-স্থানে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিপতি পৃথক ন'ন, সে-স্থানে—চেতনরাজ্যে চেতনের ইন্দ্রিয়-চালনা কখনই জড়-বিলাসের মত অনিত্যাদি ধর্মের বিষয় হ'তে পারে না।

চিদ্বিলাসের সঙ্গে যেন আমরা অচিৎ-এর হেয়তা, অবরতা না মিশাই—চিল্লীলা-মিথুনে যেন পৌত্তলিকতা বা অপৌত্তলিকতা, সগুণ বা তথাকথিত নির্গুণের বিচার না চাপাই। আমাদের চেতনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হ'লে যখন সেই স্বরাটের স্বরূপ দর্শন করবার সুযোগ হয়, তখনই আমরা এ সকল কথা উপলব্ধি করি।

আমরা জড়-চক্ষু দিয়ে জড়-বস্তুই দর্শন করি; জড়-মনের অনুমানাদি-দ্বারা জড়-বস্তুর সম্বন্ধে বিচার করতে পারি। জড় বা জড়-ব্যতিরেক চিন্তা-দ্বারা কখনই অধোক্ষজ পূর্ণ চেতনবস্তুর কোন অভিজ্ঞান হয় না। এই জন্যই শব্দের আবশ্যকতা।

অপ্রাকৃত শব্দকে বাহন ক'রে অতীন্দ্রিয় বাস্তব-জ্ঞান অবতীর্ণ হ'লেও সে-স্থানে শব্দী শব্দ হ'তে পৃথক ন'ন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হ'তে সেই শব্দ আমাদের কর্ণে সঞ্চারিত হ'লেও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। এই জন্যই আমরা শ্রুতি-মন্ত্র পাঠ করি,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিত হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।
(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।

সেই বস্তু অধোক্ষজ। কৃষ্ণ আধ্যক্ষিক বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের অধিগম্য ন'ন। গৌড়ীয়গণ জড়াকার বা নিরাকার-উপাসক ন'ন। তাঁ'রা ভগবানের সাক্ষাৎ আরাধনা ক'রে থাকেন।

পরমেশ্বর চিদচিৎ এর একমাত্র আশ্রয়, তটস্থা শক্তির একমাত্র শক্তিধর। আর কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেব ইহজগতে প্রকট-লীলার বিস্তার-কালে সর্বাপেক্ষা অধিকরূপে ও পূর্ণতমভাবে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত এবং অপ্রকটলীলা বিস্তার ক'রে নিত্য-কৃষ্ণলীলায় প্রবিষ্ট।

লাম্পট্য-বিনাশের জন্য এবং অপ্রাকৃত রসচমৎকারিতার চরমকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলা অবতীর্ণ হ'য়েছেন। আর বৈধস্ত্রী-আসক্তি নিবারণের জন্য শ্রীসীতারামের লীলা জগতে প্রকাশিত হ'য়েছেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার ন্যায় পরমোচ্চ বিচার আর কিছুই নাই। ঈশ্বর-বিষয়ের ধারণা মানবজাতির মধ্যে যা' আছে বা যা' হ'বে, সেরূপ পরিমিত মায়িক ধারণা, কৃষ্ণে আরোপ করা যায় না। কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব অচিন্ত্য ব্যাপার, অথচ তা' অধোক্ষজ-সেবকগণের গম্য। নারায়ণের ঐশ্বর্যমাত্র কৃষ্ণত্ব নয়।

অভেদবাদী ব'লতে পারেন যে, ভগবদ্‌বস্তু প্রাকৃত নীতির সঙ্গে অভিন্ন থা'কবেন। নীতি জড়জীবের দুর্বলতার প্রতিষেধক হ'তে পারে। যে-স্থানে বহু ভোক্তার অভিমান, যে-স্থানে কাম-ক্রোধাদির হেয়তা ও দুর্বলতা, সে-স্থানেই নীতির প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু যে-স্থানে জড়জগতের কোন হেয়তা, দুর্বলতা বা পরিচ্ছিন্ন ভাব নাই, যে-স্থানে একমাত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় হ'য়ে বিরাজ ক'রছেন, সে স্থানে নীতির আদৌ প্রবেশাধিকারই নাই, অথবা জাগতিক দুর্নীতিরও কোন ছায়া তথায় প্রবেশ ক'রতে পারে না। নিরঙ্কুশ লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয় চালনার বাধা-প্রদানের চেষ্টা ঈশ্বরে অবিশ্বাস বা নাস্তিকতা।

শ্রীসীতা ও শ্রীরামচন্দ্রে মানব-বুদ্ধি উদিত হ'লে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। আবার লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনায় শ্রদ্ধা কিঞ্চিৎ শ্লথ হ'লে বাসুদেবের উপাসনার কথা উপস্থিত হয়। আবার তা' হ'তে ক্লীবত্বকে abstract ক'রে আমরা চিন্মাত্রধারণার গ্রাহক হই।

প্রকৃতি হ'তে মহত্তত্ত্বের উদয় হয়। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াই প্রপঞ্চের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গকারিণী। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—সেই মায়া ত্রিবর্ণা—লোহিতা, শুক্লা ও কৃষ্ণা। লোহিতবর্ণে প্রাপঞ্চিকসৃষ্টি, শুক্লবর্ণে অবস্থিতি এবং কৃষ্ণ বর্ণে বিলুপ্তি। এই মায়া হ'তে মহত্তত্ত্বের উদয় হয়। এতে ত্রিবিধ অহঙ্কারের অধিষ্ঠান আছে। তামস-অহঙ্কার হ'তে পঞ্চমহাভূত, রাজস অহঙ্কার হ'তে একাদশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এবং সাত্ত্বিক-অহঙ্কার হ'তে দেবগণের বৈশিষ্ট্য উদ্ভূত হয়। লয়কালে পঞ্চমহাভূত তামস-অহঙ্কারে লীন হয়, একাদশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি রাজস-অহঙ্কারে মিলিত হয় এবং দেবগণের সঙ্গে সাত্ত্বিক অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে মিশে প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে। আকাশ হ'তে যে-কালে শব্দগুণ অপহৃত হয়, তখনই আকাশের অধিষ্ঠান লীন হ'য়ে যায়। বায়ু হ'তে স্পর্শগুণ অবসর লাভ ক'রলে আকাশে বায়ুর অধিষ্ঠান লীন হয়। তেজঃপুঞ্জ হ'তে অন্ধকারের দ্বারা রূপ অপসারিত হ'লে সেই তেজঃ বায়ুতে বিলীন হয়। জল হ'তে রস বিযুক্ত হ'লে তেজঃপুঞ্জে জলের অধিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায় না। বায়ুই স্পর্শাপহরণের হেতু হ'য়ে তেজে বিলীন হয়। পৃথিবী হ'তে, গন্ধ বায়ু-কর্তৃক অপহৃত হ'লে উহা নির্গন্ধ-সলিলে লীন হয়।

পৃথিবীতে শব্দ,স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বর্তমান; জলে গন্ধ-রাহিত্য অবস্থা আছে ব'লে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস বর্তমান; তেজে রস ও গন্ধ-রাহিত্য আছে ব'লে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ বর্তমান; বায়ুতে গন্ধ, রস ও রূপ-রাহিত্য আছে ব'লে, শব্দ ও স্পর্শ বর্তমান; আকাশে গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ-রাহিত্য-ধর্ম আছে ব'লে শব্দ বর্তমান। আকাশ কালরহিত হ'লে উহার আত্মা মহত্তত্ত্বে অবস্থান করে।

আকাশাদির গুণের একটি প্রাকৃত উদাহরণের দ্বারা গৌড়ীয়-দার্শনিকগণ রসের তারতম্য ব'লেছেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই পাঁচটিকে মহাভূত বলে। আকাশের শব্দ-গুণ; বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ—দুইটি গুণ; অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ—তিনটি গুণ; জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস—এই চারটি গুণ; মৃত্তিকার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি গুণ আছে। আকাশাদি পর পর ভূতসকলের ক্রমশঃ গুণ-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। একত্রে পঞ্চগুণের সমাবেশই পৃথিবীতে লক্ষিত হয়। সেইরূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরে ক্রমশঃ গুণ বৃদ্ধি হ'য়ে মধুর-রসে পাঁচটি গুণই পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়।

যেরূপ প্রাণিগণের ভিতরে ও বাহিরে পঞ্চভূত বর্তমান আছে, সেইরূপ আশ্রিতগণের ভিতরে ও বাহিরে ভগবদ্বস্তু স্ফূর্তি-প্রাপ্ত হন।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্।।

চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকে অর্থাৎ "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকে তিনবার "অহং" শব্দ আছে। প্রথম চরণের "অহমেব" পদে, তৃতীয় চরণের "পশ্চাদহং" পদে এবং চতুর্থ চরণের "সোঽস্ম্যহং" পদে "অহং" পদ বর্তমান। এদ্দ্বারা ভগবানের ব্যক্তিগত বিগ্রহ নির্ধারিত হ'য়েছে; তিনি নির্বিশেষ-মাত্র ন'ন। নির্বিশেষবাদী ভগবানের অপ্রাকৃত-সবিশেষ-বিগ্রহ স্বীকার করেন না ব'লে তাঁ'র বিচার যে ভ্রম-পূর্ণ ও সর্বতোভাবে ত্যাজ্য, ইহা বুঝাবার জন্য তিনবার "অহং" ব'লে সম্বন্ধ স্থাপন ক'রেছেন।

জ্ঞান—শাস্ত্রোত্থ, বিজ্ঞান—অনুভব। গুরু বা শাস্ত্র-ব্যতীত অন্য মূল হ'তে আগত 'বিবেক' অনেক সময় মনোধর্ম বা নির্বিশেষপর। আবার অনুভব অনর্থ বা চেতন-ধর্মের আবরণ-গত বৃত্তি নয়। অপ্রাকৃত অনুভূতি হ'তে বিবেক উদিত হ'লে ভগবদ্‌বিগ্রহের উপলব্ধি হয়।

ভগবানের নিজ-বিগ্রহ মায়া ও মায়িক কার্য হ'তে ভিন্ন। বিজ্ঞানের অনুদয়ে জীবের সেই বোধ হয় না। যেরূপ সূর্যে রশ্মি প্রকাশিত, কিন্তু রশ্মি সূর্য হ'তে ভিন্ন, আবার সূর্য্যব্যতীত রশ্মির স্বতঃপ্রকাশও সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ ও মায়া—এই দুইটি বিজাতীয় বিভিন্ন প্রতীতি, জীব মায়াতীত না হ'লে অনুভব ক'রতে পারে না। অর্থাৎ মায়ান্তর্গত বুদ্ধিতে ভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহত্ব বা ব্যক্তিত্ব বুঝা যায় না।

ধর্মশাস্ত্রে যেরূপ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চা'রটি তত্ত্ব বিচারিত হ'য়েছে, তত্ত্বশাস্ত্রেও তদ্রূপ জ্ঞান, বিজ্ঞান, তদঙ্গ ও তদ্‌রহস্যের বিচার আছে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি সামান্য সংসার-নীতির অনুগত। কিন্তু জ্ঞান, বিজ্ঞানাদি তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের বিচার তদ্রূপ নয়। ঐ তত্ত্বচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বপ্রাথমিক যে সাধনভক্তি, তাহাও ধর্মাদি তত্ত্ব-চতুষ্টয় হ'তে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। অভিধেয় সাধন-ভক্তি—দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নিরপেক্ষ।

'অভিধেয়' সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্বজন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যা'র।।
ধর্মাদি বিষয়ে যৈছে এ 'চারি' বিচার।
সাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার।।
সর্ব-দেশ-কাল-দশায় জনের কর্তব্য।
গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য।।

কৃষ্ণ—পুরুষ। 'পুরুষ' অর্থে—যিনি 'স্ত্রী' ন'ন, অর্থাৎ কাহারও বাধ্য ন'ন। স্ত্রী—পুরুষের অনুগত, স্ত্রী—অনাথা, অবলা; পুরুষই নাথ ও প্রকৃতির বল-স্বরূপ। শক্তিমানের অধীনতা স্বীকারেই শক্তির শক্তিত্ব; শক্তির স্বতন্ত্রশক্তিত্ব নাই। পুরুষ—ভোক্তা; স্ত্রী—ভোগ্যা।

সেব্য বস্তু পুরুষ না হ'লে ন্যূনাধিক ভোগ্য-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে পড়েন। প্রকৃতির কখনও নিরপেক্ষ ভোক্তৃত্ব নাই। গৌড়ীয়গণ যে শ্রীমতী বার্ষভানবী বা গোপীগণের সেবা করেন, তা' কৃষ্ণের ভোগ্য-বিচারে। শ্রীমতী রাধিকা ও গোপীগণ অপ্রাকৃত লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণের নিত্য-প্রিয়তম ভোগ্যবস্তু। কৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সম্ভোগের জন্যই—পরমভোক্তা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের পরমভোগ্যের পরস্পর সুখ-তাৎপর্য্যার্থই গৌড়ীয়গণের আত্মবিচারে আপনাদিগকে 'প্রকৃতি' জ্ঞানে মূল-প্রকৃতি-বর্গের অনুগত হ'য়ে লীলা-পুরুষোত্তমের সেবা; এজন্য গৌড়ীয়গণকে 'শুদ্ধশাক্ত' বলা যায়। আর যা'রা পরমেশ্বরে স্ত্রীত্ব, মাতৃত্ব প্রভৃতি আরোপ ক'রে নিজেরা পুরুষ বা 'শিব' (শিবোঽহং) হ'য়ে যেতে চা'ন এবং তাঁ'দের কল্পিত ঈশ্বরের নিরপেক্ষ-ভোক্তৃত্বের মৌখিক পরিচয় প্রদান ক'রে কার্যতঃ ভবানীভর্তা ভোক্তা সেজে বসেন, তাঁ'রা 'বিদ্ধশাক্ত'।

সেব্য বস্তু পুরুষ না হ'লে সেব্য সেবকের সর্বাঙ্গীন পূর্ণসেবা পেতে পারেন না। 'স্ত্রী' সেব্য বস্তু হ'লে জীব-প্রকৃতি আমরা, সর্বাঙ্গের দ্বারা সেব্যের সেবা ক'রতে পারি না। জীব ও পরমেশ্বর উভয়েই যদি প্রকৃতি হন, তা'হলে এক প্রকৃতি আর এক প্রকৃতির সকল কামনা পরিতৃপ্তি ক'রতে পারে না। জীব যদি আপনাকে 'পুরুষ' কল্পনা করে, আর পরমেশ্বরকে প্রকৃতি সাজায়, তা' হ'লেও পুরষাভিমানী জীব সেব্যা প্রকৃতির কামনা পরিতৃপ্তি করতে গিয়ে প্রকৃতিকে কোনও না কোন-ভাবে ভোগ ক'রে ব'সবেন। শাস্ত্র জীবকে 'প্রকৃতি' ব'লেই অভিহিত ক'রেছেন।

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।"

(গীঃ ৭।৫)

পুরুষোত্তমই পরমেশ্বর-শব্দ-বাচ্য এবং তাঁ'রই নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র ভোক্তৃত্ব। গৌড়ীয়দর্শনে এই বিচারই সুস্পষ্ট র'য়েছে।

তটস্থবিচারে মধুর-রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জাগতিক উদাহরণেও দেখা যায়, আদিরসকে অবলম্বন ক'রে যেরূপ ব্যাকুলতা, আকর্ষণ, প্রীতি, মমতা, উদ্দীপনা ও সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টা উদিত হয়, অন্য কোন রসে তাদৃশী চেষ্টা দেখা যায় না। সেব্য-বস্তু লীলা-পুরুষোত্তম না হ'লে কোন রূপেই এই মধুররতি প্রকাশিত হ'তে পারে না। পরমেশ্বর প্রকৃতি হ'লে সেখানে মধুর-রতির অবস্থান থাক্‌তে পারে না। মা'র সঙ্গে সন্তানের চাওয়া ও দেওয়ার সম্বন্ধ আছে। জীব যেখানে আপনাকে সন্তান ব'লে কল্পনা করে, সেখানে তা'র পাওয়ার অধিকার, আর মা'র দেওয়ার অধিকার; সেখানে কেবল দোহন-ক্রিয়া। বিশেষতঃ মাতা ও সন্তানে মধুর-রস অস্বাভাবিক; কিন্তু পুরুষ মধুর-রসের বিষয় হউন, আর বাৎসল্যরসেরই বিষয় হউন, উভয় ক্ষেত্রে পুরুষই ভোক্তা। বাৎসল্যরসের বিষয় হ'য়ে

পুরুষশিশু সমস্ত ভোগ্যবস্তু মাতাপিতৃরূপী সেবকের নিকট হ'তে স্তন্যরূপে দোহন করে। আবার সেই দোহন-ক্রিয়াই মধুর-রসে আরও অধিকতর প্রীতি, ব্যাকুলতা ও সর্বাঙ্গীন হ'য়ে প্রকাশিত হয়।

বিরজার স্নানের পরে গুণত্রয়ের সাম্য অবস্থা বা শান্তরতি প্রকাশিত হয়। শান্তরতিতে মমতা সংযুক্ত হ'লে দাস্যরতি প্রকাশিত হয়। সেই মমতা সমতা ও বিশ্রম্ভে মথিত হ'লে সখ্যরতির উদয় হয়। সখ্যরতিতে পাল্য-বিচার সংযুক্ত হ'লে বৎসলরতির উদয় হয়। বৎসলরতিতে বৎসলরতির আস্পদের কাছে যা' গুপ্ত থাকে, তা'ও সর্বাঙ্গীনভাবে উন্মুক্ত হ'লে অর্থাৎ সর্বতোভাবে সর্বাঙ্গে সেবার উৎকর্য প্রকাশিত হ'লে মধুর-রতি প্রকাশিত হয়।

এই সকলপ্রকার রতিতেই পুরুষই পরমেশ্বর। কোথায়ও প্রকৃতির পরমেশ্বরত্ব নাই। কেন না, পুরুষ-ব্যতীত আর কেহ নিরপেক্ষ-ভোক্তৃতত্ত্ব হ'তে পারেন না। শান্তরসে গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু অজ্ঞাতসারে লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। 'রক্তক', 'পত্রক', 'চিত্রক' দাস্যরসে লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণেরই সেবা ক'রে থাকেন। সুদাম, শ্রীদাম, সুবলাদি সখাও সখ্যরসে লীলা-পুরুষোত্তমের স্কন্ধে আরোহণ ক'রে তাঁ'রই সুখ-সেবা বিধান করেন। নন্দ-যশোদাও লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে তাঁদের পাল্যজ্ঞানে সেবা ক'রে থাকেন। ব্রজগোপীগণও সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা লীলাপুরুষোত্তমের সেবা করেন। অতএব সকল রসেই বিষয় বা সেব্য—পুরুষোত্তম।

ভগবানে মাতৃত্ব আরোপ ক'র্‌লে আমরা আমাদের পরিদৃশ্যমান অস্তিত্বের পূর্ব্ব হ'তে মাতা বা পিতার সেবা কর্‌তে পারি না। পরবর্ত্তিকালে সেবা করা না করাতেও সংশয় থাকে। আর পরবর্ত্তিকালে যদিও সেবা করি, তা'ও কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ বিনিময়-সম্বন্ধে অবস্থিত লৌকিক ব্যবহারযুক্ত পূজা-মাত্র। কিন্তু পুত্র ভুমিষ্ঠ হ'বার পূর্ব্ব হ'তেই মাতা-পিতা পুত্রের সেবা ক'রে থাকেন; সেই সেবা কৃতজ্ঞতা বা বাধ্যতা-মূলক নয়, তা' স্বাভাবিক অনুরাগমূলক।

কৃষ্ণই—পালক; আবার পালক হ'লেও অপ্রাকৃত বাৎসল্য-প্রেমিকের পাল্য। সেই গোপালের সেবাই বাৎসল্যরতির বিষয়।

আমরা জগতের ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট সম্প্রদায়। কাজেই আমরা মনে করি, ক্লেশ হ'তে নিবৃত্তি বা শান্তি-লাভই আমাদের চরম মঙ্গল। কিন্তু যাঁ'রা ক্লেশ হ'তে স্বভাবতঃই পরিমুক্ত অর্থাৎ যাঁ'রা শান্তরসের উদ্দীপক ও উপদেশক উপনিষদের প্রাথমিক পাঠসমূহ বহু পূর্ব্বেই সমাপ্তি ক'রেছেন, তাঁ'রা অপ্রাকৃত-সেবা-রস-বৈচিত্র্য অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য ব্যাকুল হন। সেবার উন্নতিতে দেখা যায়, শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়িতে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণদর্শন, এইটি অপ্রাকৃত স্ফোটবাদ যা গৌড়ীয়দর্শনের রহস্য।

(৫)

'গৌড়ীয় দর্শন' অভ্যন্তরের জিনিষের সন্ধান দেয়। বিশ্বরূপদর্শনের কথা জাগতিক বিভিন্ন-দর্শনের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বরূপ-দর্শনের কথা একমাত্র 'গৌড়ীয়'-দর্শনই বিশেষরূপে বিকশিত ক'রে প্রদর্শন করেন। এ'জন্য 'প্রকাশানন্দ' গৌড়ীয়দর্শনে দীক্ষিত হ'বার পর ব'লেছিলেন,—

''তা'তে ছয় দর্শনে হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে, সেই সত্য মানি।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্বসার।।

একমাত্র গৌড়ীয়দর্শনেই তত্ত্ব-দর্শন হয়। 'তৎ'—'ত্ব' অর্থাৎ সেই বস্তু যা, ঠিক তা'ই—As He is, not as He is conceived by man or many, এঁরই নাম 'স্বরূপ'। সেই স্বরূপ-দর্শন একমাত্র গৌড়ীয়দর্শনেই সম্ভব।

পরতত্ত্ব, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী, অর্চ্চা প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনের তত্ত্বালোচনার অভাবে নির্ব্বিশেষ-দর্শন হয়। নির্ব্বিশেষবাদকে 'দর্শন' না ব'লে 'দর্শনাভাব' বা অন্ধের ন্যায় অবস্থান-মাত্র বলা যেতে পারে। চক্ষুষ্মানের দর্শনে বিচিত্রতার দর্শন হয়। চক্ষুহীন ব্যক্তি দর্শনাভাবে সকলই নির্ব্বিশেষ, নিরাকার ও অন্ধকার ব'লে অনুভব করে।

এই দর্শনাভাবকে বিদূরিত কর্‌বার জন্য শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম—এই চা'রটী বিষ্ণুহস্তস্থিত অস্ত্রের অবতার-স্বরূপ চা'রটী সাত্বত সিদ্ধান্ত বা সু-দর্শন প্রকাশিত হ'য়েছে এবং সকল আচার্য্যের আচার্য্য ও পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁ'র গৌড়ীয়-দর্শনের মধ্যে ঐ চা'র প্রকার অস্ত্রের সমন্বয়, সম্পূর্ণতা ও পরিশিষ্ট বিচার প্রকাশ ক'রেছেন।

পরমেশ্বরে ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকাশিত; মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যের দাস্য ক'র্‌তে প্রস্তুত নয়। ঐশ্বর্য্য-গন্ধ-শূন্য মাধুর্য্যের মহাদানই ঔদার্য্যে প্রকাশিত।

রূপানুগ-গৌড়ীয়ের সঙ্গ-ব্যতীত গৌড়ীয়-দর্শনের দিব্যচক্ষু লাভ হয় না। গৌড়ীয়-দর্শনে সর্ব্বত্রই বিপ্রলম্ভময় অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবা দর্শন হয়।

''পঞ্চভূত যৈছে ভুতের ভিতরে-বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে।।''
''যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্।।''
(ভাঃ ২।৯।৩৪)

''ভক্ত আমা বাঁধিয়াছে হৃদয়-কমলে।
যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা দেখয়ে আমারে।।''
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১২৫)

"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ।।"
(ভাঃ ১১।২।৫৫)

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।"
(ভাঃ ১১।২।৪৫)

"গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীম্।।"
(ভাঃ ১০।৩০।৪)

"যে প্রকার ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ প্রভৃতি মহাভূত-সকল দেব-তির্য্যগাদি উচ্চনীচভূত-সমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্তমান, সেইরূপ আমি ভূতময় জগতে সর্বভূতে (সত্তাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে) প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্ ভগবৎস্বরূপে সকলের অন্তরে ও বাহিরে স্ফুরিত হই।"

"সর্ব-পাপ-বিনাশক হরি অবশে অভিহিত হইলেও যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়-রজ্জু দ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম যাঁহার হৃদয়ে আবদ্ধ আছে, তিনিই ভাগবত-প্রধান।

"একত্র মিলিত গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় এক বন হইতে অন্য বনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং আকাশের ন্যায় বহিঃ ও অন্তঃস্থিত সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের বিষয় বনস্পতিদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।"

গৌড়ীয় এরূপ দর্শন করেন ব'লে তিনি 'গৌড়ীয়'—মহাপ্রভুর আশ্রিত। বাহিরের খোলসে বাহিরের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করায় যে বিভিন্ন দর্শনের উৎপত্তি হ'য়েছে, তা'তে জীবকে মতিচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছে,তা'তে আমরা আচ্ছন্ন হ'ব না, এইটিই হ'ল গৌড়ীয়-দর্শনের কথা। কেহ বাহিরের স্থূল খোলস, সূক্ষ্ম খোলস, কেহ বা সুসূক্ষ্ম খোলস-দর্শনে দার্শনিক হ'য়েছেন। সকলেরই প্রাকৃত বা প্রাকৃত-ব্যতিরেক-সম্বন্ধে দর্শন।

কিন্তু অপ্রাকৃত দর্শন একমাত্র গৌড়ীয়-দর্শন। এই "অপ্রাকৃত" শব্দটি এজন্য গৌড়ীয়-দর্শনেই পাওয়া যায়। অপরাপর দার্শনিকম্মন্য ব্যক্তিগণ এই 'অপ্রাকৃত' কথাটির তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে না পে'রে ঠাট্টা-তামাসা ক'রে থাকেন।

এতে তাঁ'দের কিছু দোষ নাই, তাঁ'দের অজ্ঞতারই দোষ। তাঁ'রা যে প্রাকৃত গবাক্ষের মধ্য দিয়ে অপ্রাকৃত-রাজ্যের বিকৃত ছবি দেখ্‌তে পান, তাতে তাঁ'রা অপ্রাকৃত ব'লে যে একটা ব্যাপার আছে—যা' সমস্ত প্রাকৃত বিচিত্রতার আকর,—এ'কথা ভাব্‌তেই পারেন না।

পদ্মা ছিলেন কংসের জননী, সে ভাব্‌তো বৃন্দাবনে গোপ-গোপিগণ কৃষ্ণকে নিয়ে এত নাচানাচি করে কেন? বোধ হয়, কৃষ্ণের কাছে এরা কিছু ধার ধারে। তাই পদ্মা একটা পরামর্শ দিলেন; ব'ল্লেন—একটা হিসাব নিকাশ হোক। কৃষ্ণ গোপ-গোপীদের গরু চরিয়ে কতটা তাহাদের খেটে দিয়েছে, আর গোপ-গোপীরাই বা কৃষ্ণকে শিশুকাল হ'তে লালন-পালন-খাওয়া পরার বাবত কতটা খরচ ক'রেছে। যদি কৃষ্ণের পাওনা কিছু বেশী থাকে, তবে সেই পাওনার ক-একটা টাকা কৃষ্ণকে দিয়ে তা'র সঙ্গে গোপীদের সম্বন্ধটা চিরতরের জন্য চুকিয়ে দেওয়া যা'ক। এই বুড়ী অপস্বার্থপরতার পরিমিত চস্‌মা চোখে দিয়ে কৃষ্ণকে ও গোপ-গোপীগণকে যে ভাবে দেখেছিল, তা'তে সে ঐরকম ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তে পা'বে না। কৃষ্ণ ও গোপীদের মধ্যে যে নিত্য ও স্বাভাবিক আকর্ষণ, এ কথা সে কি ক'রে বুঝ্‌বে?

পদ্মার এই দর্শন-নীতি নিয়ে যদি আমরা 'গৌড়ীয়' দর্শন করি, তা' হ'লে 'গৌড়ীয়'-দর্শন হ'ল না, 'অগৌড়ীয়' দর্শন হ'য়ে গেল। গৌড়ীয়—আত্মবিৎ, তাঁ'কে অনাত্ম-দর্শনে দেখলে চল্‌বে না। আত্মবিৎ হওয়ার পরে—স্বরূপাবস্থানের পরে যে-সব চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের কথা, সেইটি গৌড়ীয়-দর্শনের কথা।

গৌড়ীয় স্বরূপে অবস্থিত না হ'য়ে অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান বা মোক্ষকামনার জন্য বস্তু দর্শন করেন না।

যাঁরা মুক্ত হন নাই, যাঁরা অনর্থযুক্ত, তাঁ'দের ঐ সমস্ত ব্যাপারে তাৎকালিক প্রয়োজন থাক্‌তে পারে, কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শনের কথা—মুক্ত হ'বার পরের কথা।

প্রথমা হ'তে সপ্তমী পর্যন্ত যতগুলি বিভক্তি, সবগুলির মধ্যেই গৌড়ীয়-দর্শনের সমন্বয় হয়। "গৌড়ীয়-দর্শন, গৌড়ীয়কে দর্শন, গৌড়ীয়-দ্বারা দর্শন, গৌড়ীয়ের প্রতি দর্শন, গৌড়ীয় হইতে দর্শন, গৌড়ীয়ের দর্শন, গৌড়ীয়ে দর্শন,"—এই সমস্ত পদেই গৌড়ীয়দর্শন তাঁ'র অপ্রাকৃতত্ব প্রচার ক'র্‌ছেন।

গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয়—'গৌড়ীয়া-নাথ'; গৌড়ীয়ানাথই—'শ্রীগৌরসুন্দর'। গৌরসুন্দরই—'কৃষ্ণ'। কৃষ্ণই সর্ব-কারণ-কারণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অনাদির আদিও গোবিন্দ।

গৌড়ীয়-দর্শনে যে 'দর্শন' শব্দ, তা'র অর্থ সম্ভোগ নয়, তা' সেবার দ্যোতক। সেবার পরম প্রগাঢ়তায় যে-সব চেতনবৃত্তি সর্বাঙ্গীনভাবে চক্ষুষ্মান হ'য়ে থাকে, সেই সব বৃত্তি-দ্বারাই গৌড়ীয়-দর্শন সম্ভব হয়।

যেমন 'রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাম্‌' ব'লে একটা কথা আছে, তেম্‌নি গৌড়ীয় কর্ণের দ্বারাই 'গৌড়ীয়', 'গৌড়ীয়কে' 'গৌড়ীয়ের দ্বারা', 'গৌড়ীয়ের প্রতি, 'গৌড়ীয় হইতে' গৌড়ীয়ের, 'গৌড়ীয়েতে' গৌড়ীয়া-নাথ দর্শন করেন এবং গৌড়ীয় সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত জিহ্বাতেই গৌড়ীয়-দর্শন, গৌড়ীয়কে দর্শন, গৌড়ীয়-দ্বারা দর্শন, গৌড়ীয়ের প্রতি দর্শন,

গৌড়ীয় হইতে দর্শন, গৌড়ীয়ের দর্শন ও গৌড়ীয়ে গৌড়ীয় দর্শন ক'রে থাকেন।

'গৌড়ীয়' ও 'গৌড়ীয়ব্রুব', 'বিদ্ধগৌড়ীয়' ও 'অগৌড়ীয়'—এক নয়। অকৃত্রিম গৌড়ীয়ের সঙ্গে কৃত্রিম বেশধারী গৌড়ীয় কখনও এক নয়। ভিতরে বাহিরে, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, শয়নে-স্বপনে, আহারে-বিহারে, ইহ-পরলোকে, অর্থে-পরমার্থে, সর্বাঙ্গে, সর্বতোভাবে, সর্বস্থানে, সর্বকালে, সর্বপাত্রে গৌড়ীয় না হ'তে পার্‌লে গৌড়ীয়-দর্শনে প্রবেশ হ'বে না।

দর্শনের পর ক্রিয়া, ক্রিয়ার পর ইষ্টসিদ্ধি। দর্শনকে সম্বন্ধবিচার ক'র্‌লে দর্শনময় অভিধেয় এবং দর্শনময় প্রেম-প্রয়োজন উদিত হয়। যাঁরা দর্শন-রহিত ভজনের ছলনা প্রদর্শন করেন, তাঁ'দের চেষ্টা অন্ধকারে হাত্‌ড়ান-মাত্র। দর্শন বস্তুর বাস্তবতা বিনির্ণয় ক'রে দেয়। তা'রপর বাস্তব বস্তুর প্রতি ভজন হ'য়ে থাকে। দর্শন না ক'রে ভজন 'আন্দাজে ঢিল মারা'। তবে এই রক্ত-মাংসের চক্ষু দিয়ে গৌড়ীয়-দর্শন হয় না। তাই বিল্বমঙ্গল এই দু'টো চোখকে অন্ধ ক'রে অপ্রাকৃত বস্তু দর্শন ক'রে ভজন আরম্ভ করেছিলেন। আবার 'দর্শন' জিনিসটাই—ভজন। যেখানে ভজনে ও দর্শনে ব্যবধান নাই, যেখানে ভজনে ও প্রয়োজনে ব্যবধান নাই, যেখানে দর্শনে ও প্রয়োজনে তফাৎ নাই, সেখানেই গৌড়ীয়-দর্শনের আসন।

ভগবৎপ্রীতি ও নিজের প্রীতি যেখানে একটা জিনিষ, সেখানে কোনও অসুবিধা নাই। সেই অখণ্ড প্রবাহেই গৌড়ীয়-দর্শন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেখানে ঔপাধিক-প্রীতি ভগবৎপ্রীতিকে আচ্ছন্ন ক'রেছে বা মোক্ষাদি-প্রীতি ভগবৎপ্রীতিকে আবৃত ক'রেছে, সেখানে কৃষ্ণপ্রীতির সন্ধান নাই। ঐপ্রকার ত্রিতাপাদি ক্লেশ হ'তে নিবৃত্তিরূপ প্রীতির আকাঙ্ক্ষাই ধর্মপ্রীতি, অর্থপ্রীতি, অনর্থপ্রীতি, কামপ্রীতি, বা মোক্ষপ্রীতি। এ সমস্তই অগৌড়ীয়-দর্শনের কথা। গৌড়ীয়-দর্শনে কৃষ্ণপ্রীতি-ব্যতীত অন্য প্রীতির গন্ধ নাই।

গৌড়ীয় যেভাবে দর্শন করেন, আমরা সেভাবে দর্শন ক'রলেই অভীষ্টলাভ ক'রতে পা'রব—নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ অভিন্ন ব'লে দেখতে পাবো। গৌড়ীয়দর্শন যদি আমাদিগকে আত্মসাৎ না করেন, তা' হ'লে আমাদের মনুষ্য জীবনের সার্থকতা হ'লো না, আমরা দিবান্ধ পেচক হ'য়ে থাকলাম। তাই গৌড়ীয়-দার্শনিক গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব'লছেন,—

"লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।।"

(ভাঃ ১১।৯।২৯)

এ কথা পুনঃ পুনঃই বলা আবশ্যক যে, চর্ম-চক্ষু বা ভোগ-চক্ষু-দ্বারা 'গৌড়ীয়'-দর্শন হয় না। গৌড়ীয়-দার্শনিক মাংসদৃক্ ন'ন,—তিনি বেদদৃক্‌গণের মধ্যে সর্বোত্তম। তাই গৌড়ীয়-দর্শনের আদি আচার্য ব্রহ্মা জানিয়েছেন,—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

প্রেমাঞ্জন-দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষু-বিশিষ্ট সাধুগণই অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্যামসুন্দরকে হৃদয়ে দর্শন করেন। যে ভক্তিচক্ষুতে গৌড়ীয়-দর্শন হয়, তা' কাল্পনিক বা মিছাভক্তিচক্ষু নয়। অনেকে ভাব প্রবণতার নিসর্গ-পিচ্ছিল চক্ষুকে 'ভক্তিচক্ষু' মনে করেন। তাই গৌড়ীয়-দর্শনের অচিন্ত্যত্ব তাঁ'দের দর্শনের বিষয় হয় না।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই—গৌড়ীয়-দর্শন। জীব ভূতশুদ্ধি-দশা লাভ করবার পর—অনর্থমুক্ত হ'বার পর আপনার স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' প্রভৃতি বেদমন্ত্রের স্বরূপ 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের মধ্যে বুঝতে পারেন এবং "কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই শ্রীচৈতন্যবাণীকে প্রকৃত মহাবাক্য জেনে বেদের সার্বদেশিক মহাবাক্যের বিগ্রহ প্রণবের সম্প্রসারিত মূর্তি 'শ্রীকৃষ্ণ'-নামে গৌড়ীয়দর্শনের সম্পুট আবিষ্কার করেন। তখন ঋগ্‌বেদের মন্ত্র পাঠ ক'রতে ক'রতে বলেন,—"ওঁ আঽস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সৎ।"

এই শ্রীনাম-ভজনের কথা পারমার্থিকতার প্রথম পাঠ শ্রুতিমন্ত্রের মধ্যেও নিহিত র'য়েছে। উপনিষদে ভগবদ্ভক্তির যথেষ্ট কথা আছে। বেদান্তের প্রতি-সূত্রের-আদি ও অন্তে শ্রীনাম-প্রভুর অসম্প্রসারিতরূপ প্রণবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত র'য়েছেন। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার চরম ফল—গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয়বিগ্রহ শ্রীনাম বা শব্দব্রহ্মের সেবা—তাহাই বেদান্তের চরম সূত্র কীর্তন ক'রেছেন।

বিভিন্নদেশে বিভিন্ন নাম প্রচলিত আছে। যেমন জিহোবা, জিয়ুস, জুপিটর, অহুর মস্‌দ, আল্লা, গড্, ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি। কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শনের বিষয়—প্রণবের সম্প্রসারিত অখিল রসামৃতমূর্তি—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীনন্দ-নন্দন, শ্রীবৃন্দাবনেন্দ্র প্রভৃতি শ্রীভগবানের মুখ্যনাম-সমূহে যে পরিপূর্ণতম রসমাধুর্য আছে, তা' অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

গৌড়ীয়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-দর্শন, গৌড়ীয়-দর্শনের শক্তিপরিণামবাদ শ্রুতির বহু বহু মন্ত্রে অনুস্যূত র'য়েছে।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি", "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং", "একো দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ" ইত্যাদি বহুবিধ অভেদ-পক্ষীয় শ্রুতি পাওয়া যায়; আবার "ওঁ ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতি পরং", "মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি", "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', " যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা", 'যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ", "যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ", "তেনেদং

পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং", "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ", "তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং", "তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং", "যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ", "নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি", "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত, তদাত্মানং স্বয়ং অকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে", "নিত্যো নিত্যানাং", "সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ, অয়ং আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" ইত্যাদি অসংখ্য বেদ-বচন-দ্বারা নিত্যভেদ সিদ্ধ হয়।

নিত্যভেদ—সত্য, নিত্য অভেদও—সত্য। যুগপৎ উভয় তত্ত্ব সত্য হওয়ায় ভেদ ও অভেদ উভয়নিষ্ঠ শ্রুতি-সকল বিদ্যমান। এই যুগপৎ ভেদাভেদ অচিন্ত্য অর্থাৎ মানব-চিন্তার অতীত। ইহাতে বিতর্ক ক'রতে গেলে প্রমাদ উপস্থিত হয়।

আমাদের বুদ্ধির পরিমাণ অল্প ব'লে বেদার্থের অবমাননা করা উচিত নয়। "নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া", "নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ"। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।।"

এই শ্রুতি-মন্ত্র গৌড়ীয়-দর্শনের কথাই জানিয়েছেন। উপনিষদ্ তারস্বরে ভগবদ্ভক্তির কথা বলেন। সংহিতা-অংশে স্তব-স্তুতি প্রভৃতির মধ্যে দেবগণের অধিকারে যে-সমস্ত কথা উল্লিখিত আছে, তা'ও চরমে বিষ্ণুতত্ত্বেই পর্যবসিত হয়।

যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।।"

পঞ্চরাত্রাদির মধ্যে গৌড়ীয়-দর্শনের অনেক কথা আলোচিত হ'য়েছে। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত কত বড় দার্শনিক মহাগ্রন্থ, মানবজাতি তা' এখনও হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারেন নি। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁ'র পার্ষদ গোস্বামিপাদগণ যদি শ্রীমদ্ভাগবতকে গৌড়ীয়-দর্শনের মূলগ্রন্থ ব'লে না জানা'তেন, তা'হলে হয় ত' শ্রীমদ্ভাগবতের নাম পর্যন্ত আজ কম লোকেই জান্‌তেন। দুঃখের বিষয়, গৌড়ীয়-দর্শনের এই মূল গ্রন্থখানি বর্তমানে জীবিকা-অর্জনের যন্ত্র হ'য়ে প'ড়েছে। কেহ কেহ বা এই গৌড়ীয়-দার্শনিক মহাগ্রন্থের মধ্যে নির্ব্বিশেষবাদের কথাও টেনে বা'র করবার জন্য চেষ্টা ক'রছেন—বৈষ্ণবাচার্য শ্রীধরস্বামিপাদকে তাঁ'রা মায়াবাদী ব'ল্‌ছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২০।৩৬) ব'লেছেন,—

"গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা।।"
"শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে।
সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি, কোথাহ বরিষে।।"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।১৪)

# তৃতীয় অধ্যায়

## বিদ্যা ভাগতাবধি

### (১)

হৃদি শুদ্ধভক্তি ধর, হরিগুণ গাও অবিরত,
ভাগবত হও সর্বমতে।

গীতা—পরমার্থ-বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পুস্তক। এতে পরমার্থে প্রাথমিক প্রবেশার্থীদের জন্য lessons আছে। প্রথমে elementary studies তা'র পর practical studies সর্বশেষে higher studies হ'ল ভাগবত। ভাগবতে comparative studies আছে। comparative study complete করলে ভাগবত হ'তে পারা যায়। যেমন ভৃগু ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও বিষ্ণুর মধ্যে তুলনামূলে কে শ্রেষ্ঠ তা' পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন, পরে জান্তে পারলেন যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ।

আগে গীতা পড়া দরকার। নতুবা comparative study বুঝা যায় না। গীতা না প'ড়লে কর্মবাদ জ্ঞানবাদের সহিত শরণাগতি-মূলা ভক্তির তারতম্য বুঝা যায় না। যেমন চতুর ব্যবসায়ী তা'র দোকানে সব জিনিষই সাজিয়ে রাখে, আর ক্রেতাকে আগে কম দামের জিনিষগুলি দেখাতে আরম্ভ করেও তৎসঙ্গে-সঙ্গে ঐগুলির যে সকল প্রশংসা আছে, তা'ও বলতে থাকে, যখন যে জিনিষটী দেখায় তখন সেই জিনিষটীরই খুব প্রশংসা করে, ব্যবসায়ী তা'তেই বুঝে নিতে পারে, ক্রেতা কোন শ্রেণীর? সবচেয়ে ভাল জিনিষ চায়, না মামুলি জিনিষের প্রশংসা শুনেই আর এগুতে চায় না? সকলের শেষে সবচেয়ে দামী ও উৎকৃষ্ট জিনিষটা দেখায়। সে জিনিষটা পৃথক্ ক'রে তুলে রাখে, কেন না, সকলে ঐ জিনিষের গ্রাহক হ'বে না। গীতাও তাই ক'রেছেন, কর্ম, জ্ঞান, যোগ এক একটি ক'রে প্রত্যেকের প্রশংসা ক'রেছেন; কিন্তু সব শেষে সব চেয়ে দামী জিনিষটা দেখিয়েছেন—একান্ত আত্মীয়কে ঐ জিনিষটার কথা ব'লেছেন,—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।।"
(গীতা ১৮।৬৪)

সেই সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশই ভক্তির উপদেশ, শরণাগতির উপদেশ,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

নমস্কারই শরণাগতি। 'ন' কারের দ্বারা নিষেধ, 'ম' কারের দ্বারা সমস্ত অহঙ্কার লক্ষিত হ'চ্ছে অর্থাৎ সমস্ত অহঙ্কার পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র কৃষ্ণে আত্মসমর্পণই ভক্তির ভিত্তি।

"মা চার্পিতৈব যদি ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত"—
(ভাবার্থদীপিকা ৭।৫।২৪)

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।"
(গীতা ৭।১৪)

প্রভৃতি বাক্যে মায়ার শরণাগতি পরিত্যাগ করে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাগতির কথা ব'লেছেন। জীব-জগৎ মায়াতে শরণাগত, তারা মনে করছে, মায়াতে শরণাগতির দ্বারা তা'দের যোগক্ষেম লাভ হবে, তা নয়, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতি প্রভাবেই মায়া হ'তে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে—যোগক্ষেম লাভ হ'বে,—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।"
(গীতা ৯।২১)

গীতা ব'লেছেন, স্বতন্ত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজা না ক'রে অন্য দেবতার পূজা অবৈধ।

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।"
(গীতা ৭।২০)

"অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।।"
(গীতা ৭।২৩)

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।।"
(গীতা ৯।২৩)

গীতাতে ১৮টী অধ্যায়ে ৭০০ শ্লোক, আর ভাগবতে ১৮০০০ হাজার শ্লোক। শ্রীমদ্ভাগবত বাদরায়ণ সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। যাঁর সূত্র, তাঁরই ভাষ্য। শ্রীমহামুনি নারায়ণ-কৃত শ্লোকাবলীতে জীবের সর্বসিদ্ধি হয়। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত আর ইতর শাস্ত্রের আবশ্যকতা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করিলে সদ্যঃ সদ্যঃই কোন প্রকার

বাধা বিঘ্ন না পাইয়া ভগবান্ ভক্তের ভজনীয় বস্তুরূপে হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন। যাঁহারা ভগবৎকথা শ্রবণ করেন এবং সৌভাগ্যবন্ত, তাঁহারাই ভগবান্‌কে প্রেমে বাধ্য করেন। যশোদা যেকালে কৃষ্ণকে দামদ্বারা বন্ধন করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহাতে দামের ব্যাপকতার অভাবে বৈকুণ্ঠবস্তু কৃষ্ণ সীমাবদ্ধ হন নাই; কিন্তু যেকালে তিনি কৃষ্ণের প্রীতিসেবায় ব্যগ্র হইয়াছিলেন, সেই সময়ই কৃষ্ণ তাঁহার বাৎসল্যপ্রেমাধীন হন। জগতে ঔপাধিক বাক্যসমূহ শ্রবণ করিবার বিশেষ সুযোগ আছে, কিন্তু হরিকথার বিষম দুর্ভিক্ষ। সেইজন্য হরিকথা শ্রবণেচ্ছু জনগণ বিষয় কথার নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া শাশ্বত নিত্য সনাতন বস্তুকেই চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের ভজনীয় বস্তুরূপে প্রাপ্ত হন।

যাঁহারা ধর্মজীবনে উন্নতি লাভ করেছেন, যাঁরা মুক্ত হ'য়েছেন, যাঁদের ক্রিয়া-কলাপ ত্যাগজগৎ বা ভোগজগতে আবদ্ধ নহে, যাঁ'রা বাস্তবমুক্ত—দেহ ও মনের কথাগুলি বা বহির্জগতের কোন কথা যাঁদের পীড়ন করছে না, অপ্রাকৃত সমাধি-লাভের পরে যাঁ'রা উপদেশ প্রদান কর্‌তে ব'সেছেন, সেরূপ মুক্ত পুরুষগণের কথা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই।

যা' মনুষ্য জাতির নিকট প্রচারিত হয় নাই—যেসকল উপদেশ খুব নীতিসমন্বিত উন্নত জগতে গমনের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপদেশের পরেও কথিত হয় অর্থাৎ ভগবানের অহৈতুকী সেবা করবার যে উপদেশ—অবিমিশ্র ভগবদ্ভক্তির যে উপদেশ, তাই শ্রীমদ্ভাগবত যাঁ'রা পরম মুক্ত হ'বার পর আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে উপনিষদের যে উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করেন,তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বিদ্যমান আছে তা অন্যাভিলাষ নহে, কর্ম-জ্ঞান যোগাদির অনুশীলনও নহে; তা' সাক্ষাৎ কৃষ্ণানুশীলনের উপদেশ—উত্তমা ভক্তির উপদেশ।

বর্তমানে কর্মমিশ্রভক্তি ব'লে যে একটি মিশ্রিত উপদেশের কথা শুনতে পাওয়া যায়, সেরূপ মিশ্রিত উপদেশ মুক্তপুরুষগণের কথিত উপদেশ বা শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ নহে। গোদাবরী-তটে শ্রীরায় রামানন্দের সহিত কথোপকথন-কালে বিভিন্ন স্তরের যে-সকল উপদেশের কথা আছে, তা মানব-জাতি এখন ভাল ক'রে আলোচনা করার সুযোগ পান নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতের উপর থিসিস্ (Thesis বা গবেষণা মূলক রচনা) লিখিয়াছেন। শ্রীল সনাতন—বৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীরূপ—সংক্ষেপভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু—সন্দর্ভ সমূহ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর—সারার্থ-দর্শিনী, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ—সিদ্ধান্তরত্ন, সিদ্ধান্ত-তর্পণাদি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ—ভাগবতার্কমরীচিমালা প্রভৃতি প্রবন্ধ বা গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

"পরের সোনা দিও না কানে।
প্রাণ যাবে তোমার হেঁচ্‌কা টানে।।

অনাচারী বাক্যসার বক্তা (platform speaker) অথবা পেশাদার পুরোহিত (profesional priest) ভাগবত অনুশীলন করিতে পারেন না। আমি বিজ্ঞাপনে পড়িলাম, ঝাড়ুদারের কার্যে আমার ভাগবত-পাঠ অপেক্ষা বেশী টাকা পাওয়া যায়, অমনি আমি ভাগবতপাঠকের কার্য ছাড়িয়া ঝাড়ুদারের কার্যের জন্য আবেদন-পত্র পেশ করিব। মানুষ সর্বক্ষণ যদি হরিভজন না করেন, তাহা হইলে ত' তিনি ভগবানের নাম-বলে ইতর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার যত্ন করিতেছেন। এই 'নাম-বলে পাপবুদ্ধি' একটি মহাপরাধ। তাঁহার যেমন দশটা কাজ আছে, দশ মিনিট বেড়াইতে হয়, পনের মিনিট খাইতে হয়, বিশ মিনিট লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার করিতে হয়, তদ্রূপ ভাগবত-পড়াও দশটা কাজের ভিতরে একটা কাজ! ভাগবত-সেবাই যদি তাঁহার কার্য হয়, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক গ্রাসে প্রত্যেক নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত হরিসেবা করিবেন। বেতনভোগী বা চুক্তিকারক কখনই ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে পারে না। পেশাদার গুরু-ব্রুবের নিকট হইতে সর্বাগ্রে তোমাকে দূরে রাখ। দেখিও, ভাগবত-ব্যাখ্যাতা তাঁহার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা নিষ্কপট ভাগবত-সেবায় নিয়োগ করেন, অথবা অন্য কার্য করেন। A stipend holder or a contractor cannot explain Bhagavat. First of all refrain from approaching the profesional priest. See whether he devotes his time fully to the Bhagavat or not.

পরব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তির সমস্ত সময় সেবাময়। শ্রীল রূপ গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন,—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।<br>
শ্রীমদ্ভাগবতার্থনামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।।"

পুরাণতীর্থ হইলেই যে তিনি ভাগবতের আদর্শ অনুসারে তাঁহার জীবন পরিচালিত করিতে পারিয়াছেন, এমন নহে। স্কুল-কলেজের শিক্ষক বা অধ্যাপকের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, ভাগবত-ব্যাখ্যাতার সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধ নহে। যে অধ্যাপক ছাত্রদিগকে মনোরমভাবে পড়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, তিনি উত্তম অধ্যাপক বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁহার জীবন বা চরিত্র যাহাই থাকুক না কেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। ভাগবত-ব্যাখ্যাতার প্রতি সেরূপ দৃষ্টান্ত খাটিবে না। যিনি 'ভাগবত-ব্যাখ্যাতা' হইবেন, তাঁহার নিজের 'ভাগবত' হওয়া চাই। অর্থের লোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ বা কোনরূপ পশ্চাৎটান থাকিলে তিনি লোকচিত্ত-রঞ্জক ভাগবত-পাঠক হইয়াও তিনি 'ভাগবত' হইতে বহু দূরে। তাঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের বাস্তব-সত্যের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না।

অনুস্বার বিসর্গ পড়িয়া ভাগবত কীর্তন বা শ্রবণের অভিনয় দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের মূর্খনাম লোকসমাজে বিদূরিত হইতে পারে, বহির্মুখ সমাজের নিকট হইতে তিনি লোকরঞ্জক 'ভাগবত-পাঠক' বা 'রসিক' খেতাব পাইতে পারেন, কেহ বা রজোগুণ-প্রবল করিয়া তমোগুণের নিরাস, কেহ বা সত্ত্বগুণ প্রবল করিয়া রজোগুণ নিরাস করিতে পারেন; কিন্তু বিশুদ্ধ-সত্ত্বভূমিকায় বাস না করিলে অর্থাৎ মথুরা-বাস না করিলে কৃষ্ণলীলা বুঝা যায় না।

কৃষ্ণের সংসারে থাকিলেই সব সুবিধা, কৃষ্ণ হইতে বিচ্যুত হইলেই জড় সংসার হইয়া যাইবে।

"অহ্ন্যাপৃতার্ত্ত করণা নিশি নিঃশয়ানা নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেবা যুস্মাৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি।।"

এই দেবতা ও ঋষিগণের কথা উল্লেখ করিয়া "জন্মাদ্যস্য"-শ্লোকে "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" বলা হইয়াছে।

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ।।"

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি।।"

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধ লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্।।"

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুস্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।"

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।"

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।"

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্।।

যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা।।"

এই কৃষ্ণভক্তি মথুরা-সেবাদ্বারা লাভ হয়। মহামায়ার সেবক সম্প্রদায় আমুষ্মিক ও পারত্রিক সুখভোগ-লাভের ইচ্ছায় ভগবান্‌কে চাকর করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে; কিন্তু তিনি তাহাদের চাকর হন না, তাঁহাকে কেহ চাকর করিতে পারে না। তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াকে কেহ আমরা চাকর করিতে পারি না, মায়া আমাদের উপর চাপিয়া বসেন। তখন আমরা "ধনং দেহি" প্রভৃতি স্তবস্তুতি করি। আমরা দু' নৌকায় দু' পা প্রদান করিবার ক্লেশের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু আমরা অনেক সময় দুই হাতকে দুই পা করিয়া চতুস্পদও হইয়া থাকি এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের চারিটি নৌকা ধরিতে চেষ্টা করি। আমাদের এইরূপ মৃত্যুজনক প্রয়াস দেখিয়া ভাগবতগণ আমাদের নিকট এই শ্লোকটি কীর্তন করেন,—

"লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।।"
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবের স্থানে পড়িতে হইবে। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন,—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" যে ব্যক্তি নিজে 'শ্রীমদ্ভাগবত' নয়, তাহার মুখে 'শ্রীমদ্ভাগবত' কীর্তিত হন না। সেই ব্যক্তি তাহার মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তিত হইতেছে বলিয়া অপর লোকের বিবর্ত উৎপাদন করে মাত্র। সে নিজে বঞ্চিত, তাই অপরকেও বঞ্চিত করে। বঙ্গদেশে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা মৎস্য ভক্ষণ করেন, ভাগবতনিন্দিত স্ত্রীসঙ্গ, গৃহব্রতধর্ম্ম ও নানা অসদাচরণ করিয়া থাকেন, অথচ 'ভাগবতপাঠী' বলিয়া মুখে বলেন, তাঁহাদের জিহ্বায় কি-প্রকারে অভিন্নভগবদ্‌বস্তু 'ভাগবত' নৃত্য করিতে পারেন? যাঁহার চরিত্র খারাপ, কামের চিন্তা যাঁহার প্রবল, যাঁহার প্রতিষ্ঠা ও অর্থ আবশ্যক, তিনি কখনও শ্রীমদ্ভাগবত পড়েন না,—শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবার ছলে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ করেন মাত্র। অথচ এই শ্রেণীর লোক বলেন,—'যাঁহারা সর্বক্ষণ 'ভাগবত' পড়েন, তাঁহাদিগের হরি-সেবার অর্থ বন্ধ করিয়া দাও, রেলের ভাড়া বন্ধ করিয়া দাও।" পরন্তু ভাগবতদিগকেই সকলে সেবা করিবেন।

যে গুরুদেব সর্বক্ষণ হরিভজন করেন, আমি সৌভাগ্যবান্ হইলে সেই গুরুদেবের চরণ আশ্রয় করিতাম। পণ্ডিত কে? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"পণ্ডিতো বন্ধ-মোক্ষবিৎ।'

আবার আমরা অনেক সময় মনে করি,—'আমাদের ভাগবত পড়িয়া, মন্ত্র দিয়া, ঠাকুর দাঁড় করাইয়া পেটপূজা করাকে যাঁহারা গর্হণ করেন,—যাঁহারা সত্য সত্য ভাগবত পড়েন, ঠাকুর-সেবা করেন, জগতের লোককে "শুদ্ধ বৈষ্ণব' করেন, আমরা কেনই

বা না তাঁহাদের গলা টিপিব, আমাদের গর্হিত-কার্য্য-সমর্থনের কোন উত্তর দিতে না পারিয়া বলিব, তাহারাও ত' ভিক্ষা করে, তাহাদেরও ত' অর্থের আবশ্যকতা হয়!' পরন্তু বিষয়টী তাহা নহে। যাঁহারা সত্য-সত্য 'ভাগবত' পড়েন, ঠাকুর-সেবা করেন, তাঁহাদিগকেই সমস্ত দিতে হইবে, তাঁহাদিগেরই সমস্ত বস্তু, তাঁহারা আমার মত ভোগ করেন না, অথবা ঠাকুর-সেবার ছল করিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাও করেন না।

(২)

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।।"

বিদ্বৎ সমাজে "বিদ্যা ভাগবতাবধি" বলিয়া একটি জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে জানা যায় যে, বেদশাস্ত্রের নিগূঢ় অন্তর্নিহিত সার শ্রীমদ্ভাগবত। এই গ্রন্থের সেবা-ফলে জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ-লাভ-রূপিণী বিদ্যা করতলগতা হন। শ্রীভাগবত সেবা অপেক্ষা আর উচ্চবিদ্যা নাই। ইহাতেই সর্ব শ্রেষ্ঠতা ও পরতমতা মূর্তিমতী। মুণ্ডক শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে ঋক্, সাম, অথর্ব ও যজুঃ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, ইতিহাসও পুরাণাদি অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত এবং যদ্দ্বারা অচ্যুত-বিষয়ের অনুশীলন হয় তাহাই পরা বিদ্যা। ভগবানের স্বরূপশক্তি-রূপা ভক্তিবিদ্যাই শব্দব্রহ্ম—নামেশ্বরের ঈশ্বরী।

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ববেদ-শাস্ত্রের চূড়ামণি। বেদশাস্ত্রের তিনটি শাখা—একটি হেয় সসীম ও ক্ষণভঙ্গুর কর্মফল-শাখা; দ্বিতীয়টী হেয় সসীম ও ক্ষণভঙ্গুর ফলভোগ-প্রতিকূল অহেয় অসীম ও নিত্য ফলত্যাগ-রূপ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানশাখা এবং তৃতীয়টি উপায়ে বৈকুণ্ঠ ও নিত্য-সেবাময় এবং ভোগ ও ত্যাগের প্রতিযোগী শাখাবিশেষ। বেদের প্রাগুক্ত শাখাদ্বয়ের অবলম্বনে কর্মজ্ঞান-প্রাধান্য-সংস্থাপক বহু-শাস্ত্রাদিদ্বারা জগতে কৈতব বহুল রূপে প্রচারিত হওয়ায় নিত্যধর্ম-সম্বন্ধে গ্লানি উপস্থিত হইলে শ্রীভগবান্ বেদের তৃতীয় শাখার নির্য্যাস-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিত্যধর্ম-সম্বন্ধি নিখিল গ্লানি দূরীভূত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতই নিগম-কল্পতরুর প্রপক্কফল। এই গ্রন্থে বেদের অপক্ক ফলের কথা আলোচিত হয় নাই। ইহা বেদের পুষ্প নহে, মুকুল নহে, কলিও নহে। কর্ম ও জ্ঞান শাখা বেদবৃক্ষের ফল নহে। শ্রীমদ্ভাগবতই কর্ম ও জ্ঞানাবরণ-রহিত। উত্তমা ভক্তির অনুকূল ভাবে কৃষ্ণানুশীলন-পর অন্যাভিলাষিতা শূন্য-আশ্রয়।

যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের বশীভূত, যাঁহারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-ফললাভে ব্যস্ত, যাঁহারা অনিত্য বস্তুর উপাসনায় দেহ ও মনকে নিযুক্ত

করিয়াছেন, যাঁহারা অজ্ঞানতাক্রমে স্বীয় কল্যাণ অনুসন্ধান করিতে অসমর্থ ও যাঁহারা ত্রিতাপদগ্ধ নিরীশ্বরবাদী, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অনধিকারী। শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবগণের প্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে পরমহংসগণের একমাত্র অমল-জ্ঞান গীত হইয়াছেন। ইহাতে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল কর্ম্মফল-ভোগবাদ নিরস্ত হইয়াছে। যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ, সুপঠন ও বিচার করেন, তিনি ভক্তিবলে কর্ম্মফল-ভোগ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

বেদশাস্ত্র সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সেই বেদশাস্ত্রের প্রয়োজন-তত্ত্বের কথিত কৃষ্ণ-প্রেম-ফলের স্বরূপ। ফলস্বরূপের অভিজ্ঞানেই বেদকথিত সম্বন্ধতত্ত্বে কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তিলাভ হয়, এবং অভিধেয়-তত্ত্বে কৃষ্ণভক্তি-সত্তাই লক্ষিত হয়। যেখানে প্রপক্ক ফলের বিনিময়ে কষায়-যুক্তফল, পুষ্প, মুকুল ও কলিকা ফলস্বরূপে প্রদত্ত হয় তথায় নির্ম্মৎসর পরমহংস সাধুবৈষ্ণবগণের উপাস্য শ্রীমদ্ভাগবত বেদাতিরিক্ত গ্রন্থ বলিয়া প্রচারিত হন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইহাই বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। বেদমন্ত্রসমূহের অধিকার লাভ করিতে অসমর্থ হওয়ায় শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস জীবগণকে মন্ত্রার্থ বুঝাইবার জন্য যে সূত্রাকারে মীমাংসাগ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার যথা অর্থ প্রকাশ-বাসনায় স্বয়ং এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রের সত্য অর্থ গোপন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মতবাদিগণ কেহ বা বিবর্তবাদ, কেহ বা আরম্ভ-বাদ স্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছেন। তজ্জন্য বাদদ্বয়-নিরাকরণের অভিপ্রায়ে সূত্র-রচয়িতা শক্তিপরিণাম-বাদই যে বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য তাহা সরলভাবে জানাইতে গিয়া এই শাস্ত্রের প্রবর্তন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত জ্ঞানপ্রদীপ। ইনি পুরাণার্ক। ইনি রসময় ফল। ইনি হরিকথাময়ী মোহিনী। এই শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্বব্রহ্ম ভগবান্ আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে পুরাকালে বিস্তার করিয়াছিলেন। 'অহমেবাসমেবাগ্রে' প্রমুখ চতুঃশ্লোকী-দ্বারা উহাই তাঁহাকে অবগত করান। ব্রহ্মসংহিতা-অনুসারে ব্রহ্মা ভগবানের নিকট বেদমাতা গায়ত্রী প্রাপ্ত হন। সমগ্র ভাগবত ভগবান্‌ই ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মা নারদের উপদেশক। শ্রীনারদ হইতে ব্যাস উহা লাভ করেন এবং ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের অধস্তন শাখায় এই শ্রীমদ্ভাগবত আম্নায় পারম্পর্য্যক্রমে সমাগত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের রচিত। বিদ্বেষ-বশে শ্রীধর স্বামীর আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বেই কোন-সমৎসর অবৈষ্ণবদ্বারা রচিত 'দেবী-ভাগবত' বলিয়া একখানি পুঁথি অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইবার চেষ্টা হয়। কিন্তু সাত্বত পুরাণগণ তাদৃশ কাল্পনিক তামস নবীনকে পুরাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যে পুরাণ মহাপুরাণের অন্যতম তাহাতে গায়ত্রীর ব্যাখ্যা প্রথমেই বর্ণিত আছে এবং যাহা ব্রহ্ম-সূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য সেই পুরাণরাজকে বৃত্র-বধ, হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা-সমন্বিত শুকপ্রোক্ত শাস্ত্র বলিয়া পদ্মপুরাণ, মৎস্য-পুরাণ এবং অন্যান্য সাত্বত-

পুরাণে লিখিত আছে। আধুনিক পণ্ডিতম্মন্য কুতর্কপ্রিয় অবৈষ্ণবগণের মধ্যে হিংসামূলে শ্রীমদ্ভাগবতকে বোপদেবাদি কবিগণের রচিতগ্রন্থ বলিয়া গর্হণ করা হয়। বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়া একটি টীকা ও একখানি নিবন্ধগ্রন্থ সতন্ত্রভাবে রচনা করিয়াছেন। দুর্ভাগা হরিবিমুখ কুতার্কিকগণ কল্পনামূলে এরূপ সহস্র যুক্তি সৃষ্টি করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিভা মলিন করিতে সমর্থ হইবেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়াছেন এবং এই গ্রন্থকেই প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুই এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থকে অভিধেয়বিষয়ক গ্রন্থ বলিয়াছেন। সামান্য বৈষ্ণবগণের ধারণানুসারে পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত বৈষ্ণবগণের মধ্যে ভেদ ছিল। কিন্তু শ্রীগৌরহরি বলেন, পঞ্চরাত্রের ও ভাগবতের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন নহে। পঞ্চরাত্রে অভিধেয়-তত্ত্ব বর্ণিত আছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা নাই, এরূপ নহে। তবে বৈশিষ্ট্য এই যে, পঞ্চরাত্রে অভিধেয়-তত্ত্ব অসম্যগ্‌রূপে বর্ণিত এবং শ্রীমদ্ভাগবতে পূর্ণ সম্বন্ধ ও প্রয়োজনসহ তাহা সম্যক্ ও পরিপূর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ বেদব্যাস বেদশাস্ত্রকে চারিভাগে বিভাগ করিবার পরে ইতিহাস-পুরাণাদি রচনা করেন। জীবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলবিধানের জন্য ভারতাদিগ্রন্থে ধর্মার্থকাম ও মোক্ষাদিলাভের পথ-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইসকল অনুষ্ঠানে ব্যাসের নিজচিত্ত প্রসন্ন হইবার পরিবর্তে অবসন্ন হইয়াছিল। তিনি বিষণ্ণচিত্তে স্বীয় কৃতকর্মের বিষয় ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলে তদীয় শ্রীগুরুদেব দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্যাসের প্রশ্নের উত্তরে নারদ কহিলেন,—'তুমি মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য যে-সকল শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছ তদ্দ্বারা তোমার হরি-সেবা হয় নাই। তুমি এক্ষণে হরিলীলা বর্ণন করিয়া হরিসেবার অনুষ্ঠানপূর্বক ভগবানের প্রীতি উৎপন্ন কর এবং নিজের আত্মার প্রসন্নতা সাধন কর। তজ্জন্যই শ্রীব্যাসের শ্রীমদ্ভাগবত রচনায় প্রবৃত্তি। এই শাত্বত সংহিতা যাহা পূর্বে বিশেষ অজ্ঞাত ছিল তাহা অভিজ্ঞ ব্যাসদেব লোকহিতের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত নামে প্রচার করিলেন। ইহা শ্রবণ করিলে পরম পুরুষ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে বদ্ধজীবের শোক-মোহ-ভয় নাশিনী সেবা প্রবৃত্তি উদিত হন।

শ্রীভাগবত-প্রচারিত সত্য অপৌরুষেয় ও নিত্য। শ্রীগুরু-পারম্পর্য্যক্রমে অবতীর্ণ সত্য, অপরাপর অনিত্য অধিরোহবাদীর প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ন্যায় বিবাদযোগ্য নহে। প্রথম শ্লোকের বিবৃতির প্রারম্ভে শ্রীজীবপাদের লিখিত পরমাত্ম-সন্দর্ভের শেষাংশের তাৎপর্য্য লিখিতঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সাক্ষাৎ ভগবান্। এই প্রধান পুরাণে ছয়প্রকার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচিত হইয়াছে। উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা-ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ছয়প্রকার নিদর্শনদ্বারা তাৎপর্য্যোলব্ধি হয়। উপক্রম শ্লোক "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদি-তরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্ তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ। তেজো-

বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গাঽমৃষা ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্য পরং ধীমহি।।'

"শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ"—গরুড় পুরাণের এই উক্তি অনুসারে এই মহাপুরাণই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া ইহাই সূত্র তাৎপর্য্যময় প্রথম অবতার। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' প্রশ্নের প্রথম ব্যাখ্যায় তেজঃ-বারি-মৃত্তাদির পরস্পর বিনিময় হেতু সত্যভাবে দৃশ্য বিশ্বের নশ্বরতা এবং পরে তদুত্তরে ভগবান্‌কে আমরা ধ্যান করি' কথিত হইয়াছে। 'মুক্তপ্রগ্রহ'-যোগবৃত্ত্যনুসারে বৃহত্ত্ব-বশতঃ ব্রহ্ম সর্বাত্মক তদ্বহির্ভূত সমস্ত। সূর্য্য বস্তুটি যেরূপ স্বীয় রশ্মি প্রভৃতি হইএত স্বতঃই শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ মূলরূপ প্রদর্শন জন্য পর-ব্রহ্ম-শব্দে ভগবান্ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই ভগবানের অংশ-বিশেষ অন্তর্য্যামি পুরুষ এবং প্রাকৃত গুণহীন বলিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের মূল-স্বরূপ ভগবান্। শ্রীরামানুজপাদ বলেন,—সর্বত্র বৃহত্ত্ব-গুণ যোগ বশতঃ ব্রহ্ম-শব্দ। ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থে ভগবান্ লক্ষিতব্য। বৃহত্ত্ব যাঁহার স্বরূপ, যাঁহাতে গুণের অবধি নাই এবং যাঁহার গুণ অপেক্ষা অন্যত্র গুণাতিশয্য দেখা যায় না। ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থে ভগবান্ লক্ষিতব্য। বৃহত্ত্ব যাঁহার স্বরূপ, যাঁহাতে গুণের অবধি নাই এবং যাঁহার গুণ অপেক্ষা অন্যত্র গুণাতিশয্য দেখা যায় না, ব্রহ্ম শব্দের তাহাই মুখ্যার্থ। তিনি সর্ব্বেশ্বর। প্রচেতাগণ বলিয়াছিলেন,—যাঁহার বিভূতির অন্ত নাই, তিনিই অনন্ত। অতএব বিবিধ, মনোহর, অনন্ত আকার বিশিষ্ট হইলেও সেই সেই আকার সমূহের আশ্রয় ভগবানের পরমাদ্ভুত মুখ্যাকারই অভিব্যক্ত হইতেছেন। এই প্রকার মূর্ত্তিমত্তা সিদ্ধ হইলে তাঁহার বিষ্ণু প্রভৃতি নিত্যরূপবিশিষ্ট ভগবত্তাই পর শব্দে সিদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্মা ও শিবাদিরও পর (অতীত) বস্তু বলিয়া পর-শব্দে বিষ্ণুই শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছেন। এখানে জিজ্ঞাসার ব্যাখাই ধ্যান, যেহেতু জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্যই ধ্যান। একাদশ স্কন্ধে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—কেবল বেদে পারঙ্গদ হইয়া কেহ পরব্রহ্মের ধ্যান-রহিত হইলে তাহার সমস্ত শ্রমই বিফল হয়। চিরপ্রসূত গাভী-রক্ষণে যেরূপ ফল নাই, সেরূপ অভিধেয়হীন সম্বন্ধ-জ্ঞান বৃথা।' শ্রীরামানুজ-মতে 'ধীমহি' এই শব্দ দ্বারা "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" পদটি নিদিধ্যাসনপর স্বীয়ত্বে অঙ্গীকার করিয়াছেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই সর্ববেদের আদি সার-গ্রন্থ বলিয়া জানা যায়। বহুবচনের প্রয়োগ দ্বারা সর্বকাল ও সর্বদেশ পরম্পরাস্থিত সকলেরই ভগবদ্ ধ্যানে কর্তব্যতা আছে বলিয়া অভিপ্রায়ে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামি পুরুষ সমূহের অংশীভূত বস্তু ভগবানেরই ধ্যান অভিহিত হইয়াছে। বহুবচনের প্রয়োগ দ্বারা একজীববাদের জীবন স্বরূপ বিবর্ত বা শূন্যবাদ নিরস্ত হইয়াছ। ধ্যানের ধ্যেয় বস্তু মূর্তিমান্ ইহা সহজেই বুঝা যায় বলিয়া ধ্যান-ক্রিয়ার অবতারণায় ধ্যেয় বস্তু মূর্তিমান জানা গেল।

সহজ সাধ্য পুরুষার্থোপায় থাকিতে দুঃসাধ্য উপায়ে পুরুষের অপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক অপকার্যতা নিবন্ধ সহজ সাধ্যোপায়ই যুক্ততম নির্ণীত হয়। গীতায় (১২।২।৫) কথিত

হইয়াছে—“যিনি আমাকে ভগবান্ জানিয়া মনোভিনিবেশ পূর্বক নিত্য-যুক্ত হইয়া পরমশ্রদ্ধা সহকারে উপাসনা করেন, তিনি যুক্ততম। আর আমাকে অক্ষয় অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত প্রভৃতি নির্বিশিষ্ট বস্তু জানিয়া উপাসনা করেন তাঁহারা অব্যক্ত শক্ত চিত্ত হইয়া অধিকতর ক্লেশ লাভ করেন।' অব্যক্ত ভাব জীবের দুঃখ উৎপাদন করে। এ বিষয়ে ব্রহ্মা বলিয়াছেন, (ভাঃ ১০।১৪।৪) “হে বিভো, যাঁহারা কেবল-বোধলাভের জন্য মঙ্গলকর ভক্তিপথ ত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্রানুষ্ঠান করেন তাঁহারা অন্তঃকরণ রহিত তুষ হইতে ধান্যান্বেষণের ন্যায় বৃথাক্লেশ মাত্র ফল লাভ করেন।” অতএব ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই ধ্যেয় বস্তু সাধিত হন এবং শিবাদি দেবগণ ধ্যেয় বস্তু নহেন নির্দিষ্ট হয়। 'ধীমহি' এই লিঙ্গের পদদ্বারা পৃথগনুসন্ধানরহিত প্রার্থনা ও ধ্যানের উপলক্ষিত ভগদ্ভজনই পরমপুরুষার্থত্ব প্রকাশ করিতেছে; তাহা হইলে ভগবানেরই তাদৃশ ধ্যেয়ত্ব স্বয়ং প্রকাশিত হইতেছে। ধ্যেয় বস্তুর পরম-মনোহর মূর্তি শাস্ত্রে লক্ষিত হইয়াছে।

'বেদগণের মধ্যে আমি সামবেদ, তন্মধ্যে আমি বৃহৎ সাম।' তথা সামকথিত এই মহিমা বিষয়ে বৃহৎসামে উক্তি দেখা যায়—'বৃহদ্ধাম বৃহৎ-পার্থিব বৃহদন্তরীক্ষ, বৃহৎস্বর্গ বৃহদ্বাম, বৃহৎ হইতেও বাম, বাম হইতেও বাম'। এইরূপেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ব্যাখ্যাত হইল।

'সত্য' এই শব্দে 'অথাতঃ এই সূত্রের ব্যাখ্যা যথাঃ—যেহেতু অর্থ শব্দে 'অনন্তর' অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসাকথিত কর্মকাণ্ড সমাপন করিয়া এবং অতঃ শব্দে হেতু অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিষয়ে হেতুই সত্যজ্ঞান। সেই সত্য সর্ব্বদত্তার দাতা ও অব্যভিচারিসত্তাময়। অনন্ত জ্ঞান ব্রহ্মই পরম সত্য। অন্যান্য সত্তা অন্য ব্যভিচারিসত্তার ধ্যানে আমরা এতাবৎ নিযুক্ত ছিলাম, এক্ষণে তাদৃশ ব্যভিচারীময় ধ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান হেতুমূলে পরমসত্যের ধ্যান করিব।

'ধাম'-শব্দের অর্থ প্রভাব অথবা প্রকাশ বুঝায়। স্বরূপের উদ্দেশক নহে। 'কুহক'-শব্দে এখানে প্রতারণাকারীকে বুঝাইতেছে। উহাই জীবের স্বরূপ আচ্ছাদন ও বিক্ষেপকারী মায়াবৈভব। ভগবান্ নিজের স্বপ্রভাবরূপা বা স্বপ্রকাশরূপা শক্তিদ্বারা সর্বদা মায়াবৈভবের অধীন সত্তাময়কে যে সত্য বস্তু হইতে নিরাস করেন, সেই পরম সত্য ভগবান্‌কে আমরা ধ্যান করি। স্ব-শব্দে স্ব-স্বরূপ ব্যাখ্যাত না হইয়া তাদৃশ শক্তির আগন্তুকত্ব সিদ্ধ হইলে স্ব-শব্দের প্রয়োগ নিষ্ফল হয়। স্ব-স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইলে স্ব-শব্দ ব্যবহারের সফলতা হয়। যে কোন প্রকারেই এইরূপ ব্যাখ্যাত হইলে কুহক-নিরসনী লক্ষণা শক্তি ভগবানে লক্ষিত হয়। উহাই সাধকতম বা করণ লক্ষণ রূপ তৃতীয় বিভক্তির দ্বারা প্রকাশিত। যে বস্তু মায়ার কার্য্য হইতে বিলক্ষণ, স্ব-শব্দ দ্বারা তাহার স্বরূপাধিষ্ঠান জানিতে হইবে। তাহাকেই বিজ্ঞানময় আনন্দময় সত্য বস্তু বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন। স্বরূপশক্তির ক্রিয়া লক্ষিত হইলেই সেই পরম সত্যবস্তুতে ভগবত্তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সত্য বস্তুতে ভগবদ্বিষয় লক্ষ্য না করিয়া যাঁহারা বৃথা প্রয়াস করেন, তাঁহাদিগের অবরোধের জন্য

যুক্তি-প্রদর্শন-কল্পে 'তাঁহাতে ত্রিসর্গ সত্য' প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম বলিয়া সর্বত্রস্থিত ভগবান্ বাসুদেবে অবস্থিত ত্রিগুণাত্মা ভূতেন্দ্রিয় দেবতাত্মক ঈশ্বরের সৃষ্টি-ত্রয় মিথ্যা নহে। শুক্তি প্রভৃতিতে যেরূপ জরতাদির আরোপ অসত্য তদ্রূপ নহে। কিন্তু 'যতো বা ইমানি' এই বেদপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মে উহা সর্বদাই অবস্থিত। ভূতগণের নাম ও রূপের ব্যাখ্যান জীব-কর্ত্তৃক বলিয়াই স্মৃতি নির্দ্দেশ করেন। অতএব নামরূপব্যাকরণ জীবকর্তৃক, এরূপ পূর্ব-পক্ষের নিরাস-কল্পে ব্রহ্মসূত্র (২।৪।২০) উক্ত হইয়াছে। ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ্বরেরই সংজ্ঞা-মূর্তি-কর্ত্তৃত্ব উপদিষ্ট হয় বলিয়া পূর্বপক্ষ অযুক্ত। নাম ও রূপের সৃষ্টি পরমেশ্বরেরই কর্ম, উহা জীবের কর্ম নহে; কারণ উহা পরমেশ্বরের কর্ম বলিয়াই উদ্দিষ্ট হয়। ত্রিবৃৎকরণ ও নামরূপব্যাকরণ এককর্তৃক বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। "সেয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্র দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাহনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরণ বা নীতি।" শ্রুতি-প্রসিদ্ধ ব্রহ্মে ত্রিসর্গ সর্বদা অবস্থিত এবং এক কর্ত্তৃকত্ব বলিয়া নিশ্চয় সত্য। আরও দৃষ্টান্ত দ্বারা সত্যত্ব সাধিত হইয়াছে।

তেজঃ প্রভৃতির পরস্পর অংশ যেরূপ পরস্পরের অংশে অবস্থিতি মিথ্যা নহে, ঈশ্বর নির্মাণ-হেতু সত্য। "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা ত্রিবৃৎ" বেদ-বাক্যে এক কর্তৃকত্ব সিদ্ধ। অগ্নির যেরূপ লোহিত রূপ, তেজের সেইরূপ। শুক্লরূপ জলের এবং কৃষ্ণরূপ পৃথিবীর তাহাই। অন্নের এই অর্থ শ্রুতি-মূলক, অন্যপ্রকার অর্থ কল্পনা-মূলে অবস্থিত; তজ্জন্য তাহা গৃহীত হইতে পারে না। সামান্যতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়া বিবর্তবাদাশ্রয়ে যে অর্থ, তাহাতে ব্রহ্ম হইতে ত্রিসর্গের মুখ্য জন্ম নাই, আরোপদ্বারা জন্ম, ইহাই কথিত হয়। সেই আরোপ ভ্রমহেতু হইয়া থাকে। ভ্রম সাদৃশ্যাবলম্বী। সাদৃশ্য কালভেদে উভয় স্থানেই অধিষ্ঠান করে। রজতেও শুক্তিভ্রম হয়। পরস্পর মিলিত হইয়া বিদূরবর্ত্তি-ধূম পর্বত ও বৃক্ষে অখণ্ডমেঘভ্রমের সম্ভাবনা থাকায় একাত্মকে ভ্রমাধিষ্ঠান হয় না, বহ্বাত্মক-ভ্রম কেবল কল্পিত,—এরূপ নিয়ম নাই। সেই প্রকার প্রকৃতি হইতে অনাদি-কালাবধি ত্রিসর্গ প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে এবং ব্রহ্মেরও চিন্মাত্রতার স্বাভাবিক স্ফুরণ হইতেছে। অতএব অনাদি অজ্ঞানাক্রান্ত জীবের যেরূপ যদ্রূপতা সাদৃশ্যে ব্রহ্মে ত্রিসর্গ-ভ্রম হয়, তদ্রূপ ত্রিসর্গেও ব্রহ্মভ্রম কোন প্রকারে কখনও হইতে পারে না। তাহা হইলে ব্রহ্মের অধিষ্ঠানত্ব অনির্ণীত হইলে সর্বনাশ-প্রসঙ্গ। জড়েরই আরোপকত্ব; চিন্মাত্রের তাদৃশ আরোপণ সম্ভাবনা নাই। বিবর্তবাদি মতে ব্রহ্ম চিন্মাত্র বলিয়া আরোপ মিথ্যা। যেখানে যে দ্রব্য নাই, কিন্তু অন্যত্র সেই দ্রব্যের অধিষ্ঠান দেখা যায়, সেখানেই আরোপ সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে বস্তুতঃ তাহার সহিত অযুক্ত হইলে তাহার সত্তাবলম্বনে অপরের সত্তাস্থাপনে সমর্থ হয় না। তত্তচ্ছক্তিবিশিষ্ট ভগবানের মুখ্যবৃত্তি হইতে ত্রিসর্গের ব্যতিরেকভাবে উৎপত্তি শ্রুত হইলেও সেই সর্বাত্মক ভগবানের তাহাই আছে। তাহা হইলে তাহাতে কেবল আরোপিত হইয়াছে, এরূপ নহে। একদেশস্থিতা অগ্নির জ্যোতিঃ যেরূপ বিভিন্ন

প্রদেশে বিস্তারিত হয়, সেই প্রকার ভগবৎসত্তা হইতেই জগতের সত্তা হয়। তজ্জন্য ভগবান্ মুখ্য সত্য বস্তু এবং ত্রিসর্গও মিথ্যা নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—'ইহাই সত্যের সত্য, তথা প্রাণসমূহ সত্য ইনি তাহাদিগেরও সত্য।' প্রাণশব্দোদিত-স্থূল-ভূতগণের ব্যবহার হইতে সত্যত্বে প্রতিষ্ঠিত বস্তুসমূহের মূলকারণভূত পরমসত্য ভগবান্‌কে নির্দ্দেশ করিতেছে। সেই বস্তুকে তটস্থ-লক্ষণের দ্বারা সেইরূপে প্রকাশ করিয়া এবং এই পরমহংস-সংহিতাকে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম বিস্তৃত অর্থরূপে বুঝাইবার মানসেই জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রকেই প্রথম অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন। 'জন্মাদি' বলিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্তম্ব পর্য্যন্ত অনেক কর্তাও ভোক্তৃ সংযুক্ত, সকল দেশকাল-নিমিত্ত ক্রিয়াফলের আশ্রয়, মনের দ্বারা দুর্ভাবনীয়, বিবিধ বিচিত্র-রচনরূপ এই বিশ্বের স্বয়ং উপাদানরূপ ও কর্তৃ-স্বরূপ যাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে এই বিশ্বের জন্মাদি হয়, সেই পরম বস্তুকে আমারা ধ্যান করি। এস্থলে বিষয়-বাক্য এই—"বারুণি ভৃগু পিতা বরুণের নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—'ভগবন্! আমাকে বেদতত্ত্ব বলুন।' তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—"যাহা হইতে এই ভূতসমূহ জন্মগ্রহণ করিতেছেন, যাঁহাদ্বারা জীবিত রহিয়াছেন, যাঁহাতে ভূতগণ প্রয়াণ করিবেন এবং আশ্রয় পাইবেন, যাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই তেজঃ সৃষ্টি করিয়াছেন।" এস্থলে জন্মাদি উপলক্ষণ, বিশেষণ নহে। সেজন্য তাঁহার ধ্যানবিষয়ে তটস্থ-লক্ষণ প্রবেশ করিতেছে না। শুদ্ধ বস্তুরই ধ্যান অভিপ্রেত। আরও এস্থলে পূর্বোক্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট বিশ্ব-জন্মাদির তাদৃশ হেতু বলিয়া তাঁহার সর্বশক্তিত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব সূচিত হইতেছে। 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ, যাঁহার জ্ঞানময় তপস্যা, যিনি সকলেরবশকারক' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যও আছে। আরও তিনি পরম বলিয়া তাঁহার হেয়-প্রত্যনীক-স্বরূপতা নিরস্ত হইয়াছে এবং জ্ঞানাদি অনন্ত কল্যাণগুণত্ব সূচিত হইতেছে। "তাঁহার কোন জড়কার্য্য ও জড়করণ নাই" ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। যাঁহারা বলেন যে, নির্বিশেষ বস্তু-বিষয়েই জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাঁহাদের মতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রের অসঙ্গতি প্রতিপন্ন হয়। "নিরতিশয় বৃহৎ ও পোষণকারী" এই নির্বিশেষ নিষেধবাক্যে ও 'ব্রহ্মই জগজ্জন্মাদির কারণ' এই বাক্যে নির্বিশেষত্বের অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। এই প্রকার পরপর সূত্রগুলি, উদাহৃত শ্রুতিবাক্য 'ঈক্ষতেঃ' ইত্যাদি অন্বয়ভাবের অনুষ্ঠান-দর্শনে কথিত সূত্রমালা এবং তৎসম্পর্কে উদ্দিষ্ট শ্রুতিবচনগুলি নির্বিশেষ মত-নিরসনে প্রমাণ বলিয়া উহা কার্য্যে লাগিল না। আরও, তর্ক-পন্থা সাধনধর্ম-বিশিষ্ট বস্তুর বিষয় বলিয়া এবং সাধ্যধর্ম অব্যভিচারী বলিয়া নির্বিশেষ বস্তুতে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় না। উপমেয় বস্তু-সহ উপমানের যে সাম্য-সম্ভাবনা, তাহার মিথ্যা-ধারণাকে উৎপ্রেক্ষা বলে। জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গাত্মক ভ্রম যাঁহা হইতে উৎপন্ন, তিনিই ব্রহ্ম—নির্বিশেষবাদীর এরূপ নিজ উৎপ্রেক্ষপক্ষ-স্থাপনেও নির্বিশেষবস্তু সিদ্ধ হয় না। ভ্রমমূল বা ভ্রম অজ্ঞান-উদ্ভূত

এবং অজ্ঞানের দ্রষ্টা ব্রহ্ম—এরূপ বিচার হইতেও নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না। দ্রষ্টৃত্ব প্রকাশের সহিত একরস বলিয়া কথিত। জড় হইতে বিভিন্ন নিজেরও পরের ব্যবহার-যোগ্যতা প্রতিপাদন-স্বভাব-দ্বারা প্রকাশত্ব সাধিত হয়। তাহা হইলে উহাই সবিশেষত্ব। বিশেষধর্মাভাবে প্রকাশের অস্তিত্ব নাই, তুচ্ছতাই থাকে। আরও 'তেজোবারিমৃদাং' প্রভৃতি বাক্য-দ্বারা সবিশেষবাদিগণের কথিতবাক্যই সিদ্ধি লাভ করে, নতুবা 'জন্মদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। অতএব ব্রহ্ম সবিশেষ-ধর্মময় হইলে তাদৃশ বিশেষ শক্তিরূপই স্থির হয়। শক্তি ত্রিবিধ দৃষ্ট হইয়াছে—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। বিকারময় বাহ্যজগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের সাক্ষাৎ হেতুরূপে বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া—তাহাই মায়া শক্তি বলিয়া প্রারম্ভে কথিত হইয়াছে। 'আমরা ধ্যান করি'—এতাদৃশ উক্তি হইতেই ধ্যানকৃদ্‌গণের তটস্থশক্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। যদিও ভগবানের অংশ হইতে উপাদানভূতা 'প্রকৃতি' নাম্নী শক্তি-বিশিষ্ট পুরুষ হইতে বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় হয়, তথাপি ভগবত্তায় আদিকারণ পর্যবসিত। 'সমুদ্রের একদেশে যাহার জন্ম'–এরূপ উক্ত হইলে সমুদ্রেই তাহার জন্ম প্রভৃতি জানিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে—

ভগবান বলিলেন,—"এই অস্তিত্বময় কার্যের উপাদান-রূপিণী যে 'প্রকৃতি' প্রসিদ্ধা এবং তাহার যিনি আধার বা অধিষ্ঠাতা, সেই 'পুরুষ' ও গুণ ক্ষোভের দ্বারা প্রকাশকারী যে 'কাল'—এই তিনটি বস্তুই ব্রহ্মরূপ আমা হইতে পৃথক্ সত্তাত্মক নহে।" "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্র হইতে ভগবানের মূর্তিমত্তা পাওয়া যাইতেছে; যেহেতু মূর্তজগতের মূর্তিশক্তির আশ্রয়রূপ তাদৃশ অনন্ত পরশক্তিসমূহের আশ্রয়রূপ ভগবান্ এবং তাঁহার পরমকারণত্ব স্বীকৃত হওয়ায় ইহাই আক্ষিপ্ত হইতেছে।

সাংখ্যবাদিগণের অব্যক্তের ন্যায় অনবস্থাপত্তিমূলে একের আদিত্বের স্বীকার-হেতু ভগবানের মূর্তি না থাকিলে অপর বস্তু হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে—এরূপ কথার অবতারণা হইতে পারে। "তিনিই কারণ ও কারণাধিপাধিপ, তাঁহার কেহই জনক নাই, কেহই প্রভু নাই"—এই শ্রুতি-নিষেধ-হেতু এবং অনাদি-সিদ্ধ, অপ্রাকৃত, স্বাভাবিক-মূর্তি প্রসিদ্ধ বলিয়া তিনি মূর্তিবিশিষ্ট। একই প্রকারে তাঁহার মূর্তত্ব সিদ্ধ হইলে সেই মূর্তিমান্ বিষ্ণু-নারায়ণ প্রভৃতি সাক্ষাৎ রূপবিশিষ্ট শ্রীভগবদ্বস্তু এবং ভগবদ্ব্যতীত অন্য বস্তু নহেন। কল্পারম্ভে ভূতসমূহ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে যুগাবসানে বিলীন হয়, সেই বস্তু-প্রতিপাদকই ভগবান্। অনির্দেশ্যবিগ্রহ, শ্রীমান্ প্রভৃতি সহস্রনামে উক্ত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে—সেই একমাত্র ঈশ্বর শ্রীহরিই স্রষ্টা, পাতা ও সংহারকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অন্যের স্রষ্টা বলিয়া দারুযোষার ন্যায় কথিত হন না। একদেশে ক্রিয়াবিশিষ্ট বলিয়া তিনি সর্বাত্মাভিধানে কথিত হন। বিষ্ণু হইতেই পরসৃষ্ট্যাদি সমস্ত ক্রিয়া হয়। মহোপনিষদে কথিত হইয়াছে—'তিনি ব্রহ্মাদ্বারা সৃষ্টি করেন এবং রুদ্রদ্বারা তাহার বিনাশ সাধন করেন' ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৭১।৮ শ্লোকে কথিত আছে—"তোমার

যে রূপরহিত কাল বা কালশক্তি, তুমি তাহার নিমিত্তমাত্র।'' ব্যধিকরণেই ষষ্ঠী। এইরূপই ''আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য'' এবং ''যদংশতোঽস্য ক্ষিতি-জন্মনাশাঃ'' ইত্যাদিতেও সেইপ্রকার ভগবান্ মূর্তিমান্ জানা যাইতেছে। এই প্রকারে তটস্থ-লক্ষণ-দ্বারা তাহার ''পরমত্ব'' নিরূপণ করিয়া সেই লক্ষণ ''শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'' এবং ''তত্তু সমন্বয়াৎ'' ব্রহ্মসূত্রের এই সূত্রদ্বয়-দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে।

ব্রহ্মের জগজ্জন্মাদিহেতুত্ব কি প্রকার, তাহা কথিত হইতেছে। যাঁহার তত্ত্বই শাস্ত্রজ্ঞানের কারণ, যেহেতু ''যতো বা ইমানি'' এই শাস্ত্র প্রমাণ হইতে তত্ত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অন্য দর্শন-শাস্ত্রের ন্যায় প্রমাণ-বিষয়ে শাস্ত্রে তর্কের প্রতিষ্ঠার অভাবহেতু তর্ক গৃহীত হয় নাই। ব্রহ্ম অত্যন্ত অতীন্দ্রিয় বস্তু, তজ্জন্য প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের বিষয় নহে। বৈশেষিকগণ ব্রহ্মসূত্রের অবিরোধাধ্যায়ে তর্কদ্বারাই ইহার নিরাকরণ করিতেছেন। এখানে এপ্রকারে তর্কের প্রতিষ্ঠা হয় না। মুক্তাত্মার ন্যায় প্রয়োজন শূন্যহেতু ঈশ্বর কর্তা নহেন এবং ঘটের ন্যায় তনু-ভুবনাদি জীব-কর্তৃক কার্য্য বলিয়া বর্তমান কালের ন্যায় কাল বলিয়া বিমতিবিষয় কাল লোকশূন্য নহে। এইরূপ হইলে দর্শনানুগুণদ্বারা ঈশ্বরানুমান, অপর দর্শনের প্রাতিকূল্য পরাহত এরূপ শাস্ত্রদ্বারা পরব্রহ্ম-ভূত সর্বেশ্বর পুরুষোত্তমই একমাত্র প্রমাণীকৃত। শাস্ত্র ও অপরসকল প্রমাণপরিদৃষ্ট সকল বিজাতীয় বস্তু সর্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্পত্বাদিমিশ্র, অনবধিক, অতিশয় অপরিমিত, উদার, বিচিত্রগুণসাগর নিখিল হেয়প্রত্যনীকস্বরূপ প্রতিপন্ন করে। তাঁহাতে অপর প্রমাণাবসিত বস্তুর সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত দোষগন্ধ নাই। অতএব তাঁহার স্বাভাবিক অনন্ত নিত্যমূর্তিমত্তা সিদ্ধ হইতেছে।

ব্রহ্মের কি প্রকার শাস্ত্র প্রামাণিকতা, তাহাই বর্ণিত হইতেছে। 'তু' শব্দে প্রশক্ত্যাশঙ্কা-নিবৃত্তি বুঝাইতেছে। ব্রহ্মের কি প্রকারে শাস্ত্র-প্রমাণকত্ব সম্ভাবনা আছে জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে বলা যায়, সমন্বয় হইতে তাহার সম্ভাবনা। অন্বয়ভাবে 'সত্য, জ্ঞান, অনন্তই ব্রহ্ম', 'আনন্দই ব্রহ্ম', 'অদ্বিতীয় এক বস্তুই ব্রহ্ম', 'সেই সত্য বস্তুই আত্মা', হে সৌম্য, 'অগ্রে সৎই বর্তমান ছিল' , ''পুরুষই নারায়ণ'' ''অগ্রে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন'', ''বহুপ্রজা সৃষ্টি করিব'' ''এই আত্মা হইতেই আকাশ সম্ভূত'', ''তিনিই তেজঃ সৃষ্টি করিয়া ছিলেন'', ''যাঁহা হইতে এ সমস্ত প্রাণী জন্মিয়াছে'', ''নারায়ণ পুরুষ কামনা করিয়াছিলেন'', ''অনন্তর নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মিয়াছিলেন, ব্রহ্মা হইতে সকল প্রজা ও প্রাণী হইয়াছিল'', ''নারায়ণ পরতত্ত্ব, নারায়ণ পরমসত্য, পরব্রহ্ম, পরমপুরুষ, তিনি কৃষ্ণপিঙ্গল''—শ্রুতিতে এই সকল বাক্য দেখা যায়। আবার ব্যতিরেকভাবে 'কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ জন্মিবে', ''যদি এই আকাশ আনন্দময় না হন, তাহা হইলে কেই বা ভোগ করিবে, কেই বা অনুপ্রাণিত করিবে', 'একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা বা শঙ্কর আদৌ ছিলেন না'—এই শ্রুতবচনসমূহ দেখা যায়। সেখানে ''আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ'' এই সূত্রদ্বারা অন্য বাক্যেরও সমন্বয় বলিতেছেন। তিনিও এরূপ পরমানন্দরূপ-সমন্বিত

হন,—এই উপলব্ধির দ্বারা পরমপুরুষার্থসিদ্ধির প্রয়োজনশূন্যত্বও নাই অর্থাৎ প্রয়োজন আছে। এইরূপ সূত্রদ্বয়ের অর্থ হইলে তদ্দ্বারা ব্যাখ্যা হইতেছে। নানাবিধ বেদবাক্যার্থ আছে বলিয়া অন্বয়মুখে যে কোন একটি বেদবাক্য হইতে এই বিশ্বের জন্মস্থিতিভঙ্গ প্রতীতি হইতেছে, ব্যতিরেকমুখেও তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব শ্রুতি হইতে তাঁহার অন্বয়-ব্যতিরেক-দর্শনদ্বারা পরমসুখ-রূপত্ব ও পরমপুরুষার্থত্ব ধ্বনিত হয়। 'একমাত্র নারায়ণ ছিলেন' এই বেদবাক্য হইতে বিষ্ণুরূপ পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছে।

অনন্তর ''ঈক্ষতের্নাশব্দম্ এই সূত্র 'অভিজ্ঞ'-পদ-প্রয়োগে ব্যাখ্যা হইতেছে। ছান্দোগ্যে এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে—''হে সৌম্য, এই দৃশ্যমান জগতের পূর্বে দ্বিতীয়-রহিত একমাত্র ব্রহ্ম বর্তমান ছিলেন; তিনি দেখিয়াছিলেন, 'বহু প্রজা সৃষ্টি করিব' ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে তেজঃ সৃষ্টি হয়'' এই কথায় জগতের কারণরূপে 'প্রধান' নির্দিষ্ট হইতে পারে না। তজ্জন্যই 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্'' সূত্র। যাহার বৈদিক প্রমাণ নাই, তাহাই অ-শব্দ বা অনুমান সিদ্ধ প্রধান। এস্থলে উহার প্রতিপাদন-যোগ্যতা নাই। কি প্রকারে প্রধানের অ-শব্দত্ব, তৎপ্রতিষেধের জন্য কথিত হইতেছে। ঈক্ষ্ ধাতুর অর্থ সচ্ছন্দ বাচ্য, সম্বন্ধ ব্যাপার-বিশেষবাচক বলিয়া শ্রুত হয়। ''তিনি দেখিয়াছিলেন'' এই দর্শন-কার্য্য অচেতন 'প্রধানে' সম্ভাবনা নাই। অন্য স্থলেও উক্ত হইয়াছে—'এই সৃষ্টি ঈক্ষাপূর্বিকা' অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শনমূলে জগতের সৃষ্টি। ''তিনি দেখিয়াছিলেন'' ''লোকসমূহ সৃষ্ট হইয়াছিল'' ''তিনিই লোক সৃষ্টি করেন''—এখানে 'ঈক্ষণ'' ঈশ্বরের সৃজ্যবিচারাত্মক বলিয়া ''তিনি সর্বজ্ঞ'' এই কথা অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে 'অভিজ্ঞ' শব্দের অবতারণা। সেই কালেও তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব, এই উক্তি হইতে ঈক্ষণ-সাধন সম্ভব হয় না, তজ্জন্যই 'স্বরাট্' শব্দের অবতারণা। 'স্বরাট্' শব্দে নিজ স্বরূপদ্বারা সেই প্রকার বিরাজমান বুঝাইতেছে। ''তাঁহার কার্য ও ইন্দ্রিয় নাই'', ''তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা'' প্রভৃতি শ্রুতি হইতে ঈক্ষণ হেতু তাঁহার মূর্তিমত্তা স্বাভাবিক- ইহাই প্রতিপন্ন হয়। পরে ''তাঁহার নিঃশ্বাস হইতেই জগৎ সৃষ্টি'' এরূপ শ্রুতি-প্রমাণ পাওয়া যাইবে এবং উহাও যথোক্ত। ''শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'' সূত্রের অন্যার্থ ' তেনে' এই পদ প্রয়োগে ব্যাখ্যাত হইতেছে। তাঁহার জগজ্জন্মাদি-কর্তৃত্ব কি প্রকার অথবা অন্যতন্ত্র-কথিত প্রধানের বা অন্যের জগৎকর্তৃত্ব কিরূপে নাই, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন। তাঁহার রূপত্ব হইতে বেদ লক্ষণের কারণ। ''এই মহাভূতের নিঃশ্বাস হইতেই এই সমস্ত ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ব-আঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎসমূহ, শ্লোকাবলী, সূত্রসমূহ, উপসূত্রমালা এবং ব্যাখ্যানসমূহ প্রকটিত হইয়াছে'', এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। সকলপ্রমাণের অগোচর, বিবিধ অনন্ত জ্ঞানময় শাস্ত্র এবং তাহার কারণই ব্রহ্ম বলিয়া শুনা যায়। এই প্রকার. প্রাধান্যই তাঁহার সর্বজ্ঞতা। তাদৃশ সর্বজ্ঞতা ব্যতীত সকলের সৃষ্টিকারিত্ব অন্যে উৎপন্ন হয় না—এই উক্ত লক্ষণে ব্রহ্মই জগতের কারণ, 'প্রধান'

জগতের কারণ নহে। এই বিষয় বিশদভাবে বলিবার জন্য "তেনে ব্রহ্মহৃদা" প্রভৃতির অবতারণা। অন্তঃকরণ দ্বারাই আদি কবি ব্রহ্মার নিকট বেদ আবির্ভূত হইয়াছিল, বাক্য দ্বারা হয় নাই। এস্থলে বৃহদ্বাচক ব্রহ্ম-শব্দ দ্বারা তাঁহার সর্বজ্ঞানময়ত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে। 'হৃদা' এই পদ দ্বারা অন্তর্যামিত্ব ও সর্বজ্ঞানময়ত্ব সূচিত হইয়াছে। 'আদি কবয়ে' এই পদদ্বারা তাঁহারই শিক্ষানিদানত্ব মূলে শাস্ত্রযোনিত্ব সিদ্ধ হয়। এস্থলে শ্রুতিবাক্য যথা-- 'যিনি ব্রহ্মার প্রতি পূর্বে বিধান করিয়াছেন, যিনি পূর্বে বেদ ধারণ করেন, যিনি বেদসমূহ প্রণিধান করেন, মুমুক্ষু আমি সেই আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক দেবতার শরণ গ্রহণ করি।' মুক্তজীব বিশ্বের কারণ নহে, তজ্জন্য 'মুহ্যন্তি'—শব্দের প্রয়োগ। 'যে বেদে শেষাদি সূরিগণ পর্যন্তও মুহ্যমান হন' এতদ্দ্বারা শয়নলীলা-প্রকাশক, নিঃশ্বসিতময় বেদ এবং বিবিধ মুখ ও চক্ষু বিশিষ্ট ব্রহ্মাদির কারণ যে পদ্মনাভ, তাঁহার আদিমূর্তি ভগবান্ই অভিহিত হন। 'প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী' ইত্যাদি ভাগবত-পদ্যেও ইহা বিবৃত হইয়াছে।

'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্রের অন্যার্থ, যথা—শাস্ত্রযোনিত্বে হেতুও দেখা যায়। এস্থলে 'সমন্বয়' শব্দে সর্বতোমুখ অন্বয় অর্থাৎ যাঁহা হইতে ব্যুৎপত্তিবেদার্থপরিজ্ঞান হয়, তাহাই শাস্ত্রনিদানত্ব বলিয়া নিশ্চিত হয়। জীবে সম্যগ্জ্ঞান নাই এবং প্রধানও অচেতন বস্তু। শ্রুতি বলেন,—"তিনি বিশ্বে অভিজ্ঞ; তাঁহাকে জানিবার কাহারও সামর্থ্য নাই।" তদীয় সম্যগ্ জ্ঞান ব্যতিরেকমুখে বুঝাইবার জন্য সকল জীবেরই তদীয় সম্যগ্জ্ঞানের অভাব 'মুহ্যন্তি' এই পদদ্বারা বলা হইয়াছে। 'শেষাদি সূরিগণও যে শব্দব্রহ্মে মোহ লাভ করেন,—স্বয়ং ভগবান্ তাহা বিবৃত করিয়াছেন। 'কং বিধত্তে' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা সাক্ষাৎ ভগবানই অভিহিত হইয়াছেন।

'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' সূত্রের অন্যপ্রকার অর্থ 'অভিজ্ঞ' এই পদদ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। শ্রুতি বলেন,—"তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়"। তাহা হইলে তাঁহার শব্দ-যোনিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়? তাহা হইলেও প্রকৃতব্রহ্ম শব্দহীন নহেন, যেহেতু ঈক্ষণার্থক সূত্রে ও 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' এই বাক্যে বহু হইয়াও শব্দাত্মক ঈক্ষ্ ধাতুর প্রয়োগ-শ্রবণ-হেতু 'অশব্দ'-শব্দের প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ। তজ্জন্যই 'অভিজ্ঞ'-শব্দ প্রয়োগ করায় 'বহু হইব' এই শ্রুতি-বিচার-নিপুণতা দেখা যায়। সেই বস্তুর সেই শব্দাদি শক্তিসমুদয় প্রাকৃত নহে, যেহেতু প্রকৃতি-ক্ষোভের পূর্বেও তাহাদিগের অস্তিত্ব ছিল, জানা যায়। তাহা হইলে ঐ শক্তিসমূহ স্বরূপভূত; তজ্জন্যই 'স্বরাট্' শব্দের প্রয়োগ। এখানে পূর্বের ন্যায় তাদৃশ সমান ধর্মরূপ তাঁহার মূর্তিমত্তাই সিদ্ধ হইল। সূত্রকার শ্রীব্যাসও বলিয়াছেন,—"জীব ও সবিতৃ মণ্ডলের অন্তরে পরমাত্মা অবস্থিত; তাঁহাতে কর্মমার্গীয় পাপসমূহ নাই; তিনি কর্মবিদ্ধ জীব অথবা দেবতা নহেন; তিনি আদ্যানন্তমূর্তিবিশিষ্ট ধ্যেয়বস্তু।" অতএব 'অশব্দত্ব' তাঁহাতে প্রযুক্ত হইলে তাহা প্রাকৃতশব্দহীনত্বকেই বুঝায়। এখানে উত্তর-মীমাংসার চারি অধ্যায়ের অর্থ প্রদর্শিত হইল—'অন্বয়াদিতরতশ্চ'-পদে

সমন্বয়াধ্যায়ের, 'মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ' পদে অবিরোধাধ্যায়ের, 'ধীমহি'-পদে সাধনাধ্যায়ের এবং "সত্যং পরং" পদে ফলাধ্যায়ের উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

গায়ত্রীর অর্থ এবং দশলক্ষণার্থ এই শ্লোকেই নিহিত আছে। এই উপক্রমবাক্যরূপ আদিম শ্লোকটি সকলপদ-বাক্য-তাৎপর্য্যপর। সেই ধ্যেয়বস্তুর সবিশেষত্ব, মূর্তিমত্তা ও ভগবদাকারত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। অন্য স্বরূপবাক্যদ্বারা প্রকাশিত হওয়ায় উহাই যুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৭।৫০ 'যোঽস্যোৎপ্রেক্ষকঃ' ইত্যাদি শ্লোক এবং ১।১।২ "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র" ইত্যাদি শ্লোকেও এইরূপ তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুঃশ্লোকী-বক্তার ভগবত্তা ও ব্যাস-সমাধিতে তাঁহার ধ্যেয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

২। উপসংহার-শ্লোক (ভাঃ ১২।১৩।১৯) যথা—

কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি।।

গর্ভোদকশায়ি পুরুষের নাভিকমলস্থিত ব্রহ্মার নিকট দ্বিতীয়স্কন্ধবর্ণিত তাদৃশ শ্রীমূর্তিবিশিষ্ট মহাবৈকুণ্ঠ-প্রদর্শনকারি-ভগবৎকর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। পূর্ব-পরার্ধের আদিমকালে ব্রহ্মাকর্তৃক তাহাই নারদের নিকট, শ্রীনারদকর্তৃক তাহাই শ্রীব্যাসের নিকট, শ্রীব্যাসকর্তৃক তাহাই শ্রীশুকদেবের নিকট এবং শ্রীশুকদেবকর্তৃক পরীক্ষিতের নিকট, কেবল চতুঃশ্লোকী কেন, শুদ্ধ, বিমল, বিশোক, অমৃত, অখণ্ড সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছিল। 'আরও আপনাদের ন্যায় মুনিগণের নিকট আমি যে সূত, আমাকর্তৃকও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইল।' এইপ্রকারে সমগ্র শ্রীভাগবত-গুরুগণের মহিমা প্রদর্শিত হইয়াছে। সঙ্কর্ষণ-সম্প্রদায়ের প্রসারণও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসকর্তৃক প্রকাশনের অন্তর্ভুক্ত-তজ্জন্য উহা পৃথগ্‌ভাবে কথিত হয় নাই। 'পরং সত্যং'-শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্বকে বুঝায়। সেই শ্রীভাগবত-তত্ত্বই আমরা অনুশীলন করি।

'যত্তৎপরমনুত্তমঃ' এই সহস্র নামে উদাহৃত 'পর'-শব্দে শ্রীভগবান্‌ই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। দ্বিতীয় স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'আদ্যোঽবতারঃ' ইত্যাদি ৪২ শ্লোকে ইহাই স্থাপিত হয়। ব্রহ্মাদি দেবগণের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক বলিয়া অভিহিত হওয়ায় গায়ত্রীর অর্থোপলক্ষিত 'ধীমহি'-পদ। এই গায়ত্রী-পদদ্বারা উপক্রম-শ্লোকের ন্যায় উপসংহার-শ্লোকেও গায়ত্রীর অর্থে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

৩। অভ্যাস-শ্লোক (ভাঃ ১২।১২।৬৬)। যথা—

কলিমলসংহতিকালনোঽখিলেশো হরিরিতরত্র ন গীয়তে হ্যভীক্ষ্ণম্।
ইহ তু পুনর্ভগবানশেষমূর্ত্তিঃ পরিপঠিতোঽনুপদং কথাপ্রসঙ্গৈঃ।।

'কালন'-শব্দে 'নাশন' জানিতে হইবে। অন্য শাস্ত্রে কর্মে ব্রহ্মাদি প্রতিপন্ন হয়। অখিলেশ বিরাড়ন্তর্যামী নারায়ণ ও তৎপালক বিষ্ণু—এরূপ গীত হয় না। কোথাও গীত হইলেও সর্বদা গীত হন না। 'তু'-শব্দ অবধারণে প্রযুক্ত হইয়াছে। সাক্ষাৎ ভগবান্ এই শ্রীমদ্ভাগবতেই পুনঃ পুনঃ গীত হইয়াছেন। নারায়ণাদি অথবা যাঁহাদিগের এখানে বর্ণনা হইয়াছে, তাঁহারা অনেক মূর্তি; এই সকলই যাঁহার অবতার, তিনিই স্বয়ং ভগবান্। সেই রূপেই গীত হয়, অবিবেক-দ্বারা অন্যরূপ গীত হয়। অতএব সেই সেই কথা-প্রসঙ্গে প্রতিপদেই ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া সর্বতোভাবে পঠিত ও প্রকাশিত। এতদ্দ্বারা অপূর্বতাও ব্যাখ্যাত হইল।

৪। ফল-শ্লোক (ভাঃ ২।২।৩৭) যথাঃ—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়-বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্।।

'সতাং আত্মনঃ' অর্থে সাধুগণের প্রাণেশ্বরের। অথবা, আপনার যে ভগবান্ তাঁহার—এরূপ অর্থ হয়। ভগবান্ তাঁহাদিগের মমতাস্পদ বলিয়া 'প্রভু'-জ্ঞান। এখানে 'কথামৃত' বলায় শ্রীমদ্ভাগবতকেই মুখ্যভাবে বুঝায়। 'যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং' শ্লোকেরও এরূপ তাৎপর্য্য।

৫। অর্থবাদ শ্লোক (ভাঃ ১২।১৩।১) যথাঃ—

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈস্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।

বেদস্তবদ্বারা তাঁহারা স্তব করেন। 'ধ্যানাবস্থিত' শব্দে যাঁহার মন নিশ্চল ও তদগত, তৎকর্ত্তৃক।

৬। উৎপত্তি-শ্লোক (ভাঃ ২।২।৩৫) যথাঃ—

ভগবান্ সর্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ।।

প্রথম দ্রষ্টা জীবই লক্ষিত হয়। দৃশ্য বুদ্ধি প্রভৃতি। জড়বুদ্ধি প্রভৃতি দৃশ্যসমূহের দর্শন চেতন বা স্বপ্রকাশ, দ্রষ্টা ব্যতীত সম্ভবপর হয় না—দর্শনক্রিয়ারই অনুষ্ঠান হয় না।

শ্রীজীবপাদ 'ক্রমসন্দর্ভে' যে স্বীয় ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার বিবরণ এবং 'ভাগবত-সন্দর্ভে'র অন্যতম 'কৃষ্ণ-সন্দর্ভের ৮২ সংখ্যায় এবং শেষাংশে ১৮৯ সংখ্যায় যেরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এখানে লিখিত হইল।

মথুরা-দ্বারকা-গোকুল-সংজ্ঞক নিত্যধামে যিনি নিত্যকাল বিরাজমান থাকিয়া কোন উদ্দেশ্যে প্রপঞ্চে প্রাদুর্ভাব নিমিত্ত বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথা হইতে অন্যত্র

সেবানুগত্যক্রমে নন্দগৃহে পুত্রভাবে গমন করেন, যিনি কংসবঞ্চনাদি অথবা ব্রজবাসি-গণের উপযোগি ভাবসমূহে পারদর্শী আরও যিনি নিজজন ব্রজবাসিগণসহ বিরাজ করেন, যিনি ব্রহ্মার বিস্ময়োৎপাদনের জন্য সঙ্কল্পমাত্রদ্বারা স্বীয় অনন্ত চিদানন্দ নিত্য রসময়মূর্ত্তি বৈভব বিস্তার করেন, যিনি তাদৃশ লৌকিক ও অলৌকিক যোগ্যলীলাহেতু ভগবদ্ভক্তগণের প্রচুর প্রেমের উদয় করাইয়া তাঁহাদিগকে বিবশ করেন, যাঁহার তাদৃশ লীলাপ্রভাবে নিস্তেজ বস্তু-সহ চন্দ্রাদি তেজোময় বস্তুর ধর্মবিনিময় সংঘটিত হয়, যেহেতু তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডলশোভায় উজ্জ্বল চন্দ্রজ্যোৎস্নাও নিস্তেজ বা মলিন হয় এবং নিকটস্থ তেজোরহিত বস্তুতে তেজস্বিতা উৎপন্ন হয়, যাঁহার বেণুধ্বনিতে তরল বস্তু কঠিন হয় এবং মৃর্তিকা পাষাণাদি দ্রবীভূত হইয়া স্ব-স্ব ধর্ম পরিবর্তন করে, যে কৃষ্ণে গোকুল-মথুরা-দ্বারকারূপ বৈভবপ্রকাশত্রয় সত্যরূপে অবস্থিত, যিনি স্বরূপাশ্রয় তদ্রূপবৈভব মথুরা দ্বারা সর্বদা মায়াকার্য্যক্ষণ নিরাস করেন, সেই পরব্রহ্ম নরতনু কৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সেই কৃষ্ণে সত্যের স্বরূপ লক্ষণ প্রতিষ্ঠিত। যিনি সত্য হইতে পরম সত্য, সত্য-গোবিন্দ-সংজ্ঞায় যাঁহার পরিচয় এবং কৃষ্ণমূর্ত্তি যাহার একমাত্র অব্যাভিচারী আকার, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।

নিজ পরমানন্দ-শক্তিরূপা শ্রীরাধিকার অনুগমন করিয়া যিনি আসক্ত, সেই পরস্পর সম্বন্ধ বা অন্বয়ই শ্রীকৃষ্ণ। যেরূপ হইতে কৃষ্ণ, সেইরূপ অন্য অর্থাৎ শ্রীরাধা হইতে আদিরস বা শৃঙ্গার-রসের প্রাদুর্ভাব। এই মিথুনই শৃঙ্গার-রসের পরমাশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ বিলাসকলাপে চতুর এবং শ্রীরাধিকাও আত্মারাম-বিলাসিনী। প্রথমতঃ আমি বেদব্যাস তাঁহাদের লীলাবর্ণন আরম্ভ করায় অন্তঃকরণ দ্বারা নিজলীলার প্রতিপাদক শব্দব্রহ্ম এই সমগ্রপুরাণ তাঁহারা আমার হৃদয়ে যুগপৎ প্রকাশ করেন। রাধিকার স্বরূপ-সৌন্দর্যগুণ প্রভৃতির চমৎকারিতা দেখিয়া তিনি কে, ইহা বর্ণন করিতে গিয়া তাঁহাকে নিশ্চয় করিতে শেষ প্রভৃতিও সমর্থ হন নাই। অচেতনগণেরও যে প্রকার পরস্পর স্বভাববিপর্য্যয় ঘটে, সেইরূপ যিনি অলঙ্কারাদি দ্বারা শোভা প্রাপ্ত হন (তৎপদনখান্তিদ্বারা চন্দ্রাদির দীপ্তির বারি ও মৃত্তিকার ন্যায় নিস্তেজস্ত্ব-ধর্ম লাভ, নদ্যাদি জলের তৎসম্পর্কিত বংশিধ্বনিরদ্বারা অগ্নিতেজের ন্যায় স্ফীতিলাভ এবং পাষাণাদি মৃত্তিকার স্তম্ভপ্রাপ্তি—এই সকল ঘটনা কৃষ্ণলীলাবর্ণনে প্রসিদ্ধ), যে রাধিকার শ্রী-ভূ-লীলা শক্তিত্রয়ের প্রাদুর্ভাব অথবা দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবন এই স্থানত্রয়গত শক্তিবর্গত্রয়ের প্রাদুর্ভাব অথবা বৃন্দাবনে রসব্যবহার-বশতঃ সুহৃৎ, উদাসীন ও প্রতিপক্ষ নায়িকারূপ ত্রিবিধ-ভেদবিশিষ্ট-ব্রজদেবীসমূহের প্রাদুর্ভাব মিথ্যা অর্থাৎ রাধিকার সৌন্দর্য্যাদি গুণসম্পৎসত্ত্বে অন্য শক্তিসমূহ, অন্য ধামসমূহ ও অপর ব্রজললনাগণ কৃষ্ণের তাদৃশ প্রয়োজনযোগ্য নহেন, যিনি স্বীয় নিত্যসিদ্ধ প্রভাবদ্বারা স্বীয় লীলার প্রতিবন্ধক জটিলা, কুব্জা প্রভৃতি প্রতিপক্ষ নায়িকার কপটতা নিরসনে সমর্থা এবং পরস্পর বিলাসাদি দ্বারা অনবরত আনন্দবিধানে

কৃতসত্যা বা অচঞ্চলা, অতএব অদৃষ্ট গুণলীলাদি দ্বারা বিশ্বের বিস্ময়োৎপাদনকারিণী সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যেই পরমা শক্তি ও পরমশক্তিমত্তত্ত্ব পরস্পর অভিন্ন হইয়া মহাভাবের আতিশয্যক্রমে একত্র মিলিততনু, সেই রাধাকৃষ্ণের অনুশীলন করি।

এই (জন্মাদ্যস্য) শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে যাবতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় ন্যূনাধিক সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। শ্রীসুদর্শনাচার্যের টীকা, শ্রীমধ্বমুনির তাৎপর্য্য, শ্রীধর স্বামীর টীকা, শ্রীবিজয়ধ্বজের টীকা, শ্রীবীররাঘবের টীকা, শ্রীবল্লভাচার্যের টীকা, শ্রীজীবপাদের পরমাত্ম-সন্দর্ভোল্লিখিত ব্যাখ্যা, 'ক্রমসন্দর্ভ'-লিখিত টীকা, এবং 'কৃষ্ণসন্দর্ভে'র দুই স্থলের বিভিন্ন টীকাদ্বয়, তৎকৃত শ্রীধরীয় অভিপ্রায়, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি-পাদের টীকা, শ্রীশুকদেবের টীকা, শ্রীরাধারমণদাস-গোস্বামীর টিপ্পনী ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর টীকা, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষা, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত কবিতা, শ্রীগৌরপর ব্যাখ্যা এবং এই শ্লোক-বিষয়ক অন্যান্য গবেষণা পর্যালোচনা করিলে অনেক কথাই জানা যায়। ঐ সকল মনীষিবৃন্দের প্রদত্ত বিবিধ ভাবার্থ হইতে শ্রীমদ্ ভাগবতের একাধারে গুরুগাম্ভীর্য ও মাধুর্য্যানুভূতি জীবের চরমকল্যাণপথে অগ্রসর করায়।

নানা মুনির নানা মত। যেখানে নানাত্ব হইতে একের দিকে বিচারধারা অগ্রসর হয়, ব্যাপ্য হইতে ব্যাপকের অভিমুখে অভিযান, প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর ধারণা যে প্রণালীমতে সিদ্ধ হয়, তাহাকে অধিরোহবাদ বা জ্ঞানের প্রয়াস বলে। উহা 'তর্ক' নামে অভিহিত। ইহার বিপরীত ভাব অর্থাৎ যেখানে অদ্বয়জ্ঞান সত্য হইতে নিঃসৃত হইয়া বহুধা পরিদৃষ্ট হয়, আম্নায়-পারম্পর্যে আগত হয়, অবিসংবাদিত সত্য বস্তু নির্ব্বিবাদে প্রদত্ত হয়, অনুগত জনমণ্ডলী যাহা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা লাভ করেন, যাহা ইন্দ্রিয়জ্ঞানমাত্র না হইয়া নিত্য অবিসংবাদিত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত, যাহা ভক্তিদ্বারাই একমাত্র লভ্য, কাল যাহাকে পরিণতহ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে না, সেই অবতরণ-পথকে বাস্তব সত্যপন্থা বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত সেই শেষোক্ত পথের প্রদর্শক।

এই গ্রন্থের আদিম শ্লোকে 'আমরা' এই যে কর্তৃপদের উল্লেখ আছে, তাহা অধিরোহবাদীর সহিত পার্থক্য স্থাপন করিয়া শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত আম্নায়পারম্পর্যাগত ভক্তিপথবাচক। বাস্তব সত্যের অনুকূলে অবতরণবাদী আমরা পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। পরমেশ্বর বস্তুটি কে? তাঁহার নামরূপগুণলীলা কি? যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, ভজনীয়-বস্তু-পর্যায়ে অধোক্ষজ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। বিষ্ণুর অসংখ্য অবতারাবলী, বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি নৈমিত্তিক-স্বাংশ-তদেকাত্মপুরুষ-গুণ-লীলা-মন্বন্তরাবতারভেদে অবতারী গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার স্বরূপলক্ষণে নিত্যসত্তা সত্য বর্তমান। সেই সত্যে কোনপ্রকার বিক্ষেপও আবরণ নাই। তাৎকালিক অবিনশ্বর কাপট্যবর্জিত সত্য নিত্যকালাবস্থিত। ভগবানের স্বীয় বিচরণ-

ভূমিকা জ্যোতিঃ, প্রভাব বা শক্তিসমূহ-সমন্বিত হইয়া স্বরূপলক্ষণ ভগবত্তা। তটস্থলক্ষণে নশ্বর গুণজাত বিচার ও দৃশ্যজগতের বিচিত্রতা উদ্ভূত হইয়াছে। মুখ্যভাবে দর্শন করিতে গেলে সেই রসময়ের রসাবির্ভাবাদি অন্বয় বা সম্ভোগ এবং ব্যতিরেক বা বিপ্রলম্ভ-বৈচিত্র্যে নিত্যরসের পুষ্টি করিতেছে। রাসরসিকবর কৃষ্ণচন্দ্র পরমপ্রেষ্ঠা বৃষভানুনন্দিনীর অনুধাবন করিতে গিয়া তাঁহার অসংখ্য বহুপ্রিয়জনের সঙ্গ পরিহার করিতে বাধ্য। তিনি স্বতন্ত্র হইয়াও পরাধীনের লীলা প্রকাশ করিয়া নিজের অসামান্য স্বতন্ত্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের স্নিগ্ধ পাঠকবর্গ এই সকল কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া কৃষ্ণসেবোন্মুখ হউন।

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।"

প্রত্যক্ষ জড়জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ভোগানুভূতিতে যে ভাবনা তাৎকালিকভাবে উদিত হয়, তাহাকে অতিক্রম করিয়া চমৎকারপূর্ণ ভূমিকাই রস। উহা সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে আত্মবৃত্তি নির্মল-সেবাদ্বারা আস্বাদিত হইয়া উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতা লাভ করে। রসিক জনই এই রসের মালিক। রসময় কৃষ্ণচন্দ্র রসিকচূড়ামণি। তাঁহার পরিকরগণও রসিক। সেই রসিকগণ কৃষ্ণবিষয়-রসকে পাঁচপ্রকারে আস্বাদনে সমর্থ। আশ্রয়জাতীয় শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী-প্রমুখ যুথেশ্বরী-বর্গ ও তদনুগ অনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি প্রিয়নর্মসখীগণ, নন্দ যশোদাদি মাতাপিতৃকূল, শ্রীদাম-সুদামাদি সখাগণ, চিত্রক-বকুলাদি দাসবর্গ, গো-বেত্র-বিষাণ প্রভৃতি নিরপেক্ষ হরিসেবারত আশ্রয়সমূহ, এই পঞ্চভেদে মূল রসিকগণ রসময়ের নিত্য চিদানন্দ-সেবায় অবস্থিত। যে সকল সাধনসিদ্ধ ভক্ত এই নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের একান্ত-ভাবে অনুগত হইয়া সাধনবিষয়ে বদ্ধজীবের আদর্শ হইয়াছেন, তাঁহারাও রসিকানুগত রসিক। এই রসিকভক্তগণের সেবকসম্প্রদায় ও শুদ্ধভক্তগণের দ্বারা রসিক-শব্দে সমাদৃত। শুদ্ধ জীবাত্মার বদ্ধভাবে আবদ্ধাভিমান না থাকিলে তিনি কখনই প্রাকৃত নলাদির ন্যায় ভোগময় বৈরস্যকে 'রস' বলিয়া ভ্রম করেন না।

চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে পাঁচ প্রকার অঙ্গের বিশেষ আছে। সেই পাঁচ প্রকার বিশেষ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নাম-ভজনেরই সর্বশ্রেষ্ঠতা। স্বল্পসম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া সাধুগণ নাম-ভজনে অগ্রসর হইলেই ভাবের আবির্ভাব হয়। তখন তাঁহারা সাধনপথ অতিক্রম করিয়া সিদ্ধির পথে ভাব লাভ করেন। এই ভাব ঘনীভূত হইয়াই প্রেমভক্তিরসে পর্যবসিত হয়। জাতরতি ব্যক্তিই ভাবের অধিকারী, তাহাতে নিষ্ঠার পূর্বাবস্থায় কোন অনর্থাদি পরিদৃষ্ট হয় না। সেই ভাবুকগণ স্থায়ী ভাব-রতিতে সামগ্রী চতুষ্টয়ের যোগে রসে নিমগ্ন হন।

ভাবুক ও রসিকগণ নিত্যকাল এই ভাগবত-রস পান করুন। মুক্ত অবস্থায় রসিক-শেখর কৃষ্ণের প্রেমভক্তি-রসসেবা নিত্য প্রকটিতা। প্রত্যক্ষ ও অনুমানবাদিগণ

দৃশ্যজগতের নশ্বরভাবে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণসেবায় স্ব-স্ব জাতরাগ প্রদর্শন করিতে অসমর্থ। জাতানুরাগ ভাবুক-গণই উন্নত অবস্থায় রসাবলম্বনে রসিকশেখরের সেবা-রস আস্বাদন করিতে সমর্থ। অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব ভাব ও রসের উদ্দেশ্য লাভ করিতে অসমর্থ। তাহারা প্রাকৃত সাহজিক-বিচার অবলম্বনে যে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ হন, তাহাদিগকে নিরাস করিবার অভিপ্রায়েই শ্রীমদ্ভাগবত প্রয়োজনতত্ত্ব-পরিচয়ে ইহার তৃতীয় শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

বদ্ধজীব প্রাকৃত জ্ঞানে ইহাই বিচার করেন যে, মুক্ত অবস্থায় লীলা-বৈচিত্র্য নাই। 'লয়' বলিতে তাঁহারা অচিন্মাত্র বা চিন্মাত্র বুঝেন। হরিরসমদিরামত্ত জনগণের নিত্যবৃত্তিতে যে চিত্তার্পিতোন্মাদ সর্বদা অবস্থিত, ইহা মায়াবাদী বা কেবল-ব্রহ্মবাদী বা কৈবল্যপ্রার্থী যোগী ধারণা করিতে অসমর্থ। ভাবুক ও রসিক ভক্তগণেরই মুক্ত অবস্থার স্বাভাবিক বৃত্তিই রসিকশেখরের সেবামগ্ন হইয়া রসাস্বাদন। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু স্ব-স্ব-অনর্থময়ী দৃষ্টিতে চিদ্‌বিলাস বিচিত্রতার নিত্য প্রাকট্য বুঝিতে পারেন না। এজন্য তাঁহারা বলেন যে, অত্যন্ত মুক্ত-অবস্থায় বিষয়-আশ্রয়-সম্বন্ধরূপ বিভাব সামগ্রীর অধিষ্ঠান নাই। ঐ প্রকার প্রলাপোক্তি আগ্রাহ্য করিয়া ত্রিদণ্ডী বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তন আচার্য্য শ্রীধর স্বামিপাদ সর্ব্বজ্ঞ-সূক্ত উদ্ধার করিয়া বলেন, "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" অনর্থ-যুক্ত বদ্ধানুভূতিতে যে আকারাদি সম্পন্ন বিগ্রহ সেবিত হন, তাহাতে সাধকের দৃষ্টিতে প্রাকৃত-ভাবের সমাবেশ ন্যূনাধিক বর্তমান।

শ্রীমদ্ভাগবত বেদশাস্ত্রের প্রয়োজন-নিরূপক গ্রন্থ। সেই জন্য বেদশাস্ত্রকে বৃক্ষের সহিত উপমা দিয়া সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক বেদবৃক্ষের ফল রূপে শ্রীমদ্ভাগবতকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভক্তসম্প্রদায় ব্যতীত অভক্তগণের বিচারে চারিপুরুষার্থকেই বেদের ফল বলা হইয়াছে। এই মত ভাগবতে নিরস্ত হইয়াছে। আবার উপাস্যের বিভিন্ন পর্য্যায়ের বিষয়-আশ্রয়োত্থ অর্থাৎ সেব্য-সেবক ভাবের উৎকর্ষ বিচারকে পুষ্পিত, মুকুলিত, বর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট ও প্রপক্ক অবস্থার সহিত তুলনা। নিত্যলীলা-বৈচিত্রের বিকৃতফলনরূপ এই জগতে প্রত্যেক জীব অন্যান্য জীবের সহিত পাঁচপ্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া পরস্পর অনুরক্ত। তটস্থ হইয়া স্বাদৃশ সম্বন্ধগুলির তারতম্যবিচারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ রসের মধ্যে তারতম্য-নির্ণয়ের মধুরাভ্যন্তরেই অপর রস-চতুষ্টয় অবস্থিত এবং মধুরের চমৎকারিতা অন্যান্য রস অপেক্ষা অধিকতর উপাদেয় বিচারিত হয়। যদিও বদ্ধজীব জগতে ত্রিতাপদগ্ধ হইয়া বৈকুণ্ঠ-প্রতিফলিত শান্তকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস মনে করেন, তথাপি সচ্চিদানন্দানুভূতি যাঁহাদের ভাগ্যক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারাই মধুর রসের তারতম্য গ্রহণ করিতে সমর্থ। তরুণ, কষায়, পক্ক ও প্রপক্ক- ভেদে পরপর উৎকর্ষ ও উপযোগিতা-বিচারে মধুররসের পরম চমৎকারিণী লীলা-কথা, এই প্রয়োজন-শাস্ত্রে বর্ণিত হওয়ায় ইহাই প্রপক্কফলরূপে কথিত হইয়াছে।

## ৩

### "প্রেমা পুমর্থো মহান্"

পুরুষের অর্থ—'প্রেমা'। মায়িকজগতের চিন্তাস্রোত বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা নিয়ে যাঁরা ব্যস্ত অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞানীপন্থী সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ বিচারমাত্র পরমপুরুষার্থ নহে। পরমপুরুষার্থ—বাস্তব, তাহা নশ্বর অবাস্তব ছায়াবাজী নয়। জড়জগতের দাম্পত্য-প্রেম, বাৎসল্য-প্রেম ইত্যাদি চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ থাকা 'প্রেম' শব্দের লক্ষ্যীভূত বস্তু নয়, অখিলরসামৃতমূর্তি ভগবদ্‌বস্তুর প্রীতি আকর্ষণ করাই 'প্রেম'।

"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠম্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।"

ভাগবত শ্রবণ করে নিজে পাঠ করতে হবে। অমুকে পাঠ করবে, আমি শুনে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করবো, তা নয়। স্মরণাগ্রহে পরিপাক করতে হবে, অবিস্মৃতির বিচার করা দরকার। শুধু বিচার নয়, তৎসহকারে ভক্তি লাভ হলে বিমুক্তি হবে। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি বিমুক্তি নয়।

"মুক্তির্যঃ প্রস্তরত্বায় শাস্ত্রমুচে মহামুনিঃ।
গোতমং তং বিজানীথ যথাবিত্থ তথৈব সঃ।।"

শ্রীমদ্ভাগবত অমল প্রমাণ। ইহাতে মলযুক্ত কথা প্রবেশ করে পুরাণ হয়েছে তা নয়। ইহা বিষ্ণুভক্তের প্রিয়, জগতে অন্য কোন বস্তু তাঁদের প্রিয় নয়; বিষ্ণুপাদপদ্মই একমাত্র প্রিয়। নিত্যত্বের যাঁরা ভিক্ষুক, চেতনের পূর্ণত্বের বিচারকারী যাঁরা, তাঁরা বৈষ্ণব। তাঁরা শ্রীমদ্‌ভাগবতকে একমাত্র প্রমাণ বলে অবলম্বন করেছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের আনুগত্যে বেদশাস্ত্র আলোচনা করতে হবে। ঈশ-কেন-কঠাদি শ্রুতিসকল, ব্রাহ্মণ-সংহিতাদি, শিক্ষাকল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষাদি বেদাঙ্গ আলোচনা করা যাবে—যদি ভগবান্ স্মরণপথে আসেন, নচেৎ অপরা বিদ্যা হয়ে যাবে।

"যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে"

সকল মনুষ্যজাতির চিন্তাস্রোতের জ্ঞান দ্বারা ভাগবত বিদিত হন না। তাহাতে অমল জ্ঞানের কথা আছে। অন্য পুঁথিতে সেরূপ "পরং জ্ঞানের" কথা নেই, যাতে নৈষ্কর্ম্যবাদ আবিষ্কৃত হয়েছে। "বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেৎ" যারা দেখছেন, তাহাদের নৈষ্কর্ম্য হচ্ছে না। জ্ঞানবিরাগভক্তি সহিতই নৈষ্কর্ম্য। ভগবানের সেবা ব্যতীত কিছু করব না। ভক্তিতে যদি নির্বিশেষরাহিত্য এসে যায় তাহলে চিৎসাহিত্য হল না। অজ্ঞব্যক্তি যে ভক্তি করেন, তার কথা ভাগবতে বলেন নি। সর্বপেক্ষা সুচতুর ব্যক্তির যে সেব্যের উপলব্ধি, তাহাই ভক্তি। 'প্রেমা' অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতিসংগ্রহ যাঁদের প্রয়োজনীয় বিষয়, তাঁরাই ভাগবত পাঠের ফল পান। 'প্রেমা' সবচেয়ে বড় জিনিষ বলে আলোচ্য হলে ভাগবত পড়ার আবশ্যক হয়।

আমরা পাঁচ প্রকার ভক্তির অঙ্গ প্রধান বলে মহাপ্রভুর মুখে শ্রবণ করেছিঃ—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ।।"

ঐগুলিই আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়। এই পাঁচের অল্পসঙ্গ হতেই ভজনীয় বস্তুর অনুশীলন করতে পারি। পাঁচের অল্পসঙ্গ-প্রভাবে ভগবদ্‌বস্তু লাভ ঘটে।

অতি প্রাচীনকালে 'হংস' বলে একটি মাত্র জাতি ছিলেন। তাঁরা এই জগতে বাস করে ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যের উপাসনা, পূজ্যের পূজা করতেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরাই 'পরমহংস' অর্থাৎ পরমার্থপথের পথিক বলে অভিহিত হতেন। পূর্বে বৈষ্ণবগণের নাম ছিল পরমহংস। ভাগবত সম্প্রদায়ের অতি পূর্বকালের কথা আলোচনা করলে আমরা এই 'হংস' ও 'পরমহংসের' কথা জানতে পারি। এঁদের পদ্ধতি ছিল--- একায়নপদ্ধতি। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ সেই প্রাগ্‌বৈদিকযুগেরও আলোচ্য বিষয় ছিল বলে শ্রীমদ্ভাগবতকে পারমহংস্য বা পারমহংসী সংহিতা, সাত্বত সংহিতা প্রভৃতি বলা হয়। 'সংহিতা' অর্থে সঙ্কলিত গ্রন্থ, পরমহংসগণের আলোচ্য বিষয় সংগৃহিতী হয়েছে যাতে। একায়নীদিগের মধ্যে পাঁচ জায়গা হতে যে জ্ঞান সংগ্রহ হত, তাকে পঞ্চরাত্র বলা হয়। পুষ্কর, হয়শীর্ষ, নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থ।

ভগবানের উপাসক 'ভাগবত' বলে প্রসিদ্ধ। যে সময়ে শ্রীব্যাস শম্যাপ্রাসে শ্রীশুকদেবকে ভাগবত অধ্যয়ন করান নি, সে-সময়ের কথা বলছি। সে সময়ও 'পারম-হংসী সংহিতা', 'সাত্বত সংহিতা' প্রভৃতি কথা আমরা ব্যাসের লেখনী হতে পাই। বেদের অর্থ পুরণার্থ বেদব্যাস পুরাণ রচনা করেন। পুরাণে প্রাচীন কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতকেও ব্যাসরচিত পুরাণবিশেষ বলা হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত একায়নপদ্ধতির একমাত্র গ্রন্থ, ইহাকে পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থও বলা হয়।

একায়ন-স্কন্ধ ও বহ্বয়ন শাখাগুলি—এই দুই প্রকার বেদের স্কন্ধ-শাখা। চ্যুতগোত্রীয় ঋষিগণ বহ্বয়ন-শাখাবলম্বী, অচ্যুত-গোত্রীয়গণই একায়নপন্থী। বহ্বয়নশাখা একায়ন স্কন্ধ হতে স্বতন্ত্র। একায়ন পদ্ধতিতেই পূর্ণ সমন্বয় বিচার ও একপথের বিচার। সত্যযুগে যে কথা ভাগবত বলেছেন, সেই কথার বিচারক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এলে বেদবিভাগ ও বর্ণবিভাগাদি আরম্ভ হয়। একপাদধর্ম্মক্ষয়ে বেদ বিভক্ত হয়ে ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতি সংহিতা, উপনিষদ্ এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বৃত্তবিচারে বর্ণবিভাগ হয়েছিল। ত্রেতার পূর্বে বর্ণবিভাগ ছিল না, সকলেই এক হংসজাতির অন্তর্গত ছিলেন।

নিষ্ক্রিয় হয়ে যাঁরা পরমার্থপথে অগ্রসর হতেন, তাঁরাই পরমহংস। বৈষ্ণববিদ্বেষী

মত ক্রমশঃ প্রবল হবার সঙ্গে সঙ্গে ঋক্-সামাদি বেদবিভাগ ও হংসজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ আরম্ভ হয়।

শ্রীনারায়ণ ঋষি নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে, ব্যাস আবার শুকদেবকে এই ভাগবতী কথা বলেন। ব্যাসের শম্যাপ্রাস আশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম বৈঠক বসেছিল। শ্রীশুক সেখানে ভাগবতের আলোচনা করেছিলেন। সেই সময় হতেই 'ভাগবত' শব্দের প্রয়োগ, তৎপূর্বে পরমহংস, সাত্বতগণের আলোচ্য পারমহংসী, সাত্বতসংহিতা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার আমরা ইতিহাস অলোচনার সময় পাই।

কেউ বলেন, ভাগবত বোপদেব রচিত। যদি তা হয়, তাহলে যে বোপদেব ভাগবত রচনা করেছেন, তাঁর কত বড় হওয়া উচিত, তা একবার ভাগবতখানি বিচার করে দেখলে হয়। ভাগবতবিরোধীসম্প্রদায়ে শ্রীমদ্ভাগবতকে যে ব্যাসের রচিত গ্রন্থ নয় বলে দোষারোপ করা হয়, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ বা দশম শতাব্দীর গ্রন্থবিশেষ বলে আধুনিকতা প্রমাণ করে গর্হণযোগ্য করা হয়, তার মূল কারণ অনুসন্ধান বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয় হওয়া দরকার। অন্যান্য জিহ্বাগহ্বরের নানা বিতণ্ডা, ভেকজিহ্বার কোলাহল সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হওয়া উচিত। ভাগবতকে যেন পণ্যদ্রব্য করা না হয়। সাংসারিক প্রয়োজনসরবরাহের উপায়রূপে সময় কাটাবার অন্যতম জ্ঞানে বা অর্থ বিনিময়ে ভাগবত শ্রবণের বিচার হলে তাতে ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি বা আশানুরূপ ফল হবে না। শুদ্ধ সারস্বত-শ্রবণ-সদনের যত বৃহত্ত্বলক্ষ্য করব, যত আলোচনা বাড়বে, যত বড় বড় টাউনহল, বড় বড় অট্টালিকা শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভাগবত শ্রবণ-সদন হবে, ততই লোকের মঙ্গল হবে, সকলে হরিকথা আলোচনা করবে, সর্বত্র হরিকথাময় হয়ে যাবে—সেদিনই বিশ্ব পূর্ণসুখময় হবে। প্রাগ্বৈদিকযুগের আলোচ্য অনুসরণ করে বৈদিক পণ্ডিতাভিমানিগণের বর্তমান বিচার থেকে অবসর পাওয়া দরকার। ভগবানের কথাদ্বারাই সব সুবিধা হবে। এক ভাগবত মাত্র বজায় রেখে আর সমস্ত চিন্তা বাদ দিলেও চলবে। "কিংবাপরৈঃ"। শ্রীমদ্ভাগবত পূর্বপক্ষরূপে সমস্ত বিরুদ্ধ কথার অবতারণা করে তার সম্পূর্ণ অকর্মন্যতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছে।

মানুষের ভাগ্য এত খারাপ হয়েছে যে, তারা 'বিদ্যাসুন্দর' পাঠের স্থানে বা বারবণিতাদিগের নর্তনকীর্তন-স্থানে ভাগবত পাঠ লাগিয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার গ্রহণ কর্‌ছে, যে ভাগবতও তাদের ন্যায় অনর্থবৃদ্ধিকারি-জনগণের ঐজাতীয় কর্ণরসায়নের বস্তু! মানুষের ভগবানের সেবা বিচার এতটা কমে গিয়েছে যে, শতকরা ৯৯.৯৯....পর্যন্ত বলিলেও ভ্রম হবে না। ভাগবতের কথাই যেন অনর্থ উৎপাদনের বা অনাদরের বস্তু। কোথায় অন্য সব কথা বাদ দিয়ে শতকরা শতভাগই ভাগবতের কথা—নিত্যমঙ্গলের কথা প্রবল হবে, তা না হয়ে উল্টো বিচার হয়ে উঠেছে। জীবের যাবতীয় সঙ্কীর্ণ বিচার থেমে যাক। ভাগবতের কথা আলোচনা না করলেই আমরা অন্যান্য বিষয়ে মন দিব,

বিশ্ব বলে——সংসার বলে ব্যাপারগুলি উপস্থিত হবে। যারা জন্ম-জন্ম ধরে ভগবৎ প্রসঙ্গ-বিমুখ হয়ে সংসারে দুঃখকষ্ট——অশান্তি ভোগ করছেন, তাঁরা কি এখনও স্বাস্থ্যলাভ করার জন্য চেষ্টা করবেন না? প্রবৃত্তিমার্গে নানা প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে পদে পদে অশান্তি ভোগ করতে হয়, একমাত্র ভগবৎকথাশ্রয়েই পরমা শান্তি লাভ হতে পারে। মনুষ্যজাতির একথা কি এখনও বিচার্য হবে না?

শ্রীব্যাস তাঁর পুত্র শুকদেবকে ভাগবত পড়িয়েছিলেন, যে শুকদেব সংসারে প্রবিষ্ট হন নি। কত উদারতাসহ তাঁকে ভাগবতের কথা বলতে পেরেছিলেন——দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট না থাকায় বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচবোধ করতে হয়নি, এমন একটী শ্রোতা শুকদেব। ব্যাস শুকদেবকে বলবার পূর্বে নারদ আবার নারায়ণঋষি থেকে এই ভাগবত শুনেছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মদেবর্ষিবাদরায়ণ' ক্রমে অস্মদগুরুপারম্পর্যে যে কথা আছে, সেই একই কথা। শ্রীভগবানের নিজ উক্তি হতে আমরা জানতে পারি,——

''কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ।।
কিং দেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভূবঃ।।
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথা প্রকৃতি সর্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি।।''

(ভাঃ ১১।১৪।৩৭৫-৭)

এই ভক্তির কথাই কাল প্রভাবে প্রলয়ে বিনষ্ট হয়েছিল। ভগবৎকর্তৃকই আদিকবি বিরিঞ্চির নিকট বেদনামে পরিচিত ভাগবতধর্ম সৃষ্টি-প্রারম্ভে কথিত হয়েছিল। তাঁদিগের হতে—পিতৃগণ। পিতৃগণ হতে দেবদানব-গুহ্যকগণ, মনুষ্য, সিদ্ধগন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্নর, কিংদেব-নাগগণ, রাক্ষসগণ, কিম্পুরুষগণ লাভ করে স্ব-স্বরজঃসত্ত্বতমো-গুণজাত প্রকৃতিবিচারে বিচিত্র বিচারপুষ্ট বাক্যসকল বলেছেন। বিভিন্ন প্রকৃতির অধিষ্ঠানক্রমে ভূতপতিগণের মধ্যে বিভিন্ন বেদবিচারে বিভিন্নতা এসেছে।

প্রথমে ভাগবতের কথাগুলি শ্রীশুক তাঁর ছাত্রজীবনে শম্যাপ্রাস মঠে আলোচনা করেন। ব্যাস তাঁর অকৃতদার কুমারধর্মী পুত্র শুকদেবকেই ভাগবত বলেছিলেন। তিনি আর সংসারে প্রবিষ্ট না হয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় বিবিধ শ্রোতা পেয়ে তাঁদের সেই কথা বললেন। যিনি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়ে রাজ্য ঐশ্বর্য সমস্ত ছেড়ে দিয়ে গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হয়ে পরমার্থের জন্য পার্থিব শরীর ত্যাগের যত্ন প্রদর্শন করেছিলেন, এমন একজন ব্যক্তিকে শ্রীশুক ভাগবতকথা বলবার শ্রোতৃরূপে পেলেন।

শ্রীব্যাস শুকদেবকে অত্যন্ত সাহসের সহিত সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ "সঙ্গং ন কুর্যাৎ শোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ" প্রভৃতি তীব্র কথা বলতে পেরেছিলেন। আবার শুকদেবও মহারাজ পরীক্ষিৎকে পরম সাহসে সেই কথা বলতে পেরেছেন। আবার শৌণকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষি সূতগোস্বামীর নিকট ভাগবত কথা শুনেছিলেন। সূত চারণ শ্রেণীর লোক। পূর্ব ইতিহাস গান করে বলার জন্য তাঁরা শিক্ষিত হতেন। আজকাল ঘটকেরা যেমন পূর্বপুরুষের কথা বলেন, সেই প্রকার শ্রীসূত শুকপরীক্ষিৎ সংবাদ ষাটহাজার ঋষির কাছে শুকস্থানে শ্রুতবাক্যসকল অভিনয়ের মত গান করেছিলেন।

২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৪ ঘন্টা যাঁরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত, অন্যাভিলাষ—কর্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টা হতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত, ভাগবত তাঁদেরই আরাধ্য, তাঁরাই ভাগবতের আরাধনা জানেন। ভাগবতকে অর্থ-উপার্জন, পুণ্যসংগ্রহ বা দুঃখনিবৃত্তির দাওয়াইখানা মাত্রে পর্যবসিত করা ভাগবতের সেবা নয়।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন জগতের দুঃখ জানলেন, তাঁর পরম প্রিয় সনাতন, রূপ, জীবগোস্বামিগণ যখন জগতের দুঃখে দুঃখিত হলেন, তখন তাঁরা ভাগবতকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করতে বাধা দিলেন। ভাগবতকে কালিদাস, মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভারবী ভর্তৃহরী প্রভৃতি লিখিত বা অন্যান্য কাব্য বা পুরাণগ্রন্থের অন্যতমরূপে, অথবা ভাগবতের আলোচনাকে কালাপহারিণী ব্যবস্থাবিশেষে নিযুক্ত হতে দিলেন না।

শ্রীচৈতন্যদেব জয়দেবের মধুর কোমল কান্তপদাবলীর আদর করলেন। জয়দেব ভাগবতের কথা—তৃতীয় বৈঠকের কথা যাতে লিখিত আছে, তা অবলম্বন করে পরিশিষ্ট কথা বর্ণন করেছেন। অনেকে জয়দেবের কথা বুঝতে না পেরে তাঁকে আদর করতে পারেন নি।

হরিলীলা-শিখরিণী, মুক্তাফল প্রভৃতি ভাগবতের প্রাচীন টীকা আছে, শ্রীমধ্বের নিজলিখিত টীকা আছে, মধ্বসম্প্রদায়ের বিজয়ধ্বজ প্রভৃতি ৮।১০ জন ভাগবতের টীকা লিখেছেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের বীররাঘবাদি আরও দু'জন ভাগবতের ব্যাখ্যা করেছেন। কেবল কেবলাদ্বৈতবাদীরা কেহই ভাগবতের টীকা লেখেন নি। তাঁরা কেবল কপটতার দ্বারা বলে বেড়ান ভাগবতে কেবলাদ্বৈতবাদের কথা আছে। কিন্তু আমরা ত' ভাগবতের কোথায়ও কেবলাদ্বৈতবাদ দেখি না। ভাগবত থেকে শত সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করে, এরূপ ধরণের কোন ব্যক্তি ভাগবতের কথা লিখবে বা জানবে, ইহা কখনই সম্ভব নয়। মধুসূদন সরস্বতী নাকি একজন ভাগবতের পক্ষের লোক বলে অনেকে বলেন, কিন্তু তা নয়; তিনি অদ্বৈতবাদী। অঘবকপূতনাও কৃষ্ণের পক্ষের লোক বলে পরিচয় দিয়েছিল। কৃষ্ণ মাথুরমণ্ডলে অঘবকাদি ১৮টি অসুর নিধন করেন এবং দ্বারকায় বাসকালেও জরাসন্ধাদি আরও ১৮টি অসুর ধ্বংস করেছিলেন। অসুরগণের কৃষ্ণকে ধ্বংস করারই প্রধান চেষ্টা, কিন্তু কৃষ্ণ তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন।

গীতা যদিও বৈষ্ণবদেরই পূজ্য গ্রন্থ, কিন্তু উহাকে পঞ্চায়িতী আখড়ার লোক তাদের প্রধান পূজ্য বস্তু বলে নানা টীকা টিপ্পনী রচনা করে বৈষ্ণবধর্মের সরল বিশ্বাসের প্রতি আক্রমণ করছে। ভাগবতকেও ঐ রকম আপনার করতে গিয়ে তারা বিরুদ্ধ কথা প্রচার করেছে।

চেতনের বিলাসকে জড়বিলাসে পরিণত করে যাঁরা ভাগবতের সঙ্গে আত্মীয়তা দেখাতে যান, ভাগবত উপহার দিতে যান, তাঁরা যাতে ঐ প্রকার দুশ্চেষ্টা হতে নিবৃত্ত হন, ভাগবতকে কদর্থিত করতে প্রবৃত্ত না হন, এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব তাঁদের নিকট থেকে ভাগবতকে রক্ষা করেছেন। শেকস্‌পীয়ার, কালিদাস প্রভৃতি জড় কবির পার্থিব জড়রসের কাব্যসাম্যে ভাগবত নিয়ে খেলা করা, তাঁকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করার দুর্বুদ্ধি অত্যন্ত অপরাধের কার্য্য। কতকগুলি লোক আবার চৈতন্যদেবের অনুগত বলে পরিচয় দিয়েও ভাগবতের উদ্দেশ্য নষ্ট, কলঙ্কিত, কলুষিত করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, তাঁদের নিকট হতে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা সংরক্ষণ করা, উজ্জ্বল ও পুষ্ট করা আমাদের প্রধান কর্তব্য হয়ে পড়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত বিশ্রম্ভভাব-পোষণকারী অনেক গ্রন্থ আছেন, শ্রীরূপ সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত, শ্রীসনাতন বৃহদ্‌ভাগবতামৃত, শ্রীজীব সন্দর্ভ ছয়টি, শ্রীল চক্রবর্তীঠাকুর সারার্থদর্শিনী টীকা, শ্রীবলদেবও দশমের টীকা করেছেন। এইগুলি পরবর্তী সময়ে গৌরানুগত সম্প্রদায়ে আলোচিত হচ্ছে। শ্রীবল্লভের সুবোধিনী, পুরুষোত্তম মহারাজের টীকা এবং ঐ সম্প্রদায়ের আরও ২।৩টি ভাগবত টীকা আছে। পাঁচের অল্পসঙ্গেই কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়। একদিকে ভজনীয় বা সেব্যবস্তু ভাগবত, অপরদিকে ভাগবতের পাঠক ও শ্রোতারূপ সেবক এবং মধ্যবর্তিস্থানে ভক্তি বা ভাগবতকথা-শ্রবণাদি সেবা। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে 'সাত্বতী শ্রুতি' বলে একটি কথা পাচ্ছি। নারায়ণঋষি যখন নারদকে ভাগবত উপদেশ করেছেন, তখন উহাকে 'বেদ সম্মতি' বলেছেন। যেমন শ্রৌতপদ্ধতি অবলম্বন করে বহু দেবতার স্তবকারী সাধারণ শাস্ত্রকেও বেদ বলেছে, সেইরূপ সাত্বতগণ ভাগবতকে বেদের সর্বোত্তম অংশ বলে বিচার করে থাকেন। প্রয়োজন-তত্ত্বনিরূপণে 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শ্লোকে 'নিগম' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। তাছাড়া উপনিষদের অনেক মন্ত্র ভাগবতে যথাযথ প্রকটিত দেখতে পাওয়া যায়। ভাগবতের স্থানে স্থানে শ্রুতিবাক্য ন্যূনাধিক লিখিত হয়েছে—দ্বাদশস্কন্ধ ভগবানের দ্বাদশ অঙ্গ বলে কথিত হয়েছে, কিন্তু এটি বিরাটরূপের কল্পনার ন্যায় নহে। বাস্তব শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবান এতে অবস্থিত আছেন। এটা বিশেষরূপে আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যায়।

অখিলরসামৃতমূর্তি কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে চেতন অচেতন সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তিনি অচেতন-দ্বারা আবৃত অবস্থায় পরিদৃষ্ট হন না। যদি ভাগবতের মধ্যে আষাঢ়ে গল্প—Archaeological research or chroniclers—ঐতিহ্যবিদ্‌গণের

কোন কোন অংশ আছে, বিচার হলে ভাগবত অধ্যয়ন হল না। গৌরসুন্দর যে প্রণালীতে ভাগবত আলোচনা করতে বলেছেন, তদনুসারে আলোচনা না হলে আগাছা রেখে মূল গাছ উৎপাটন করে দেওয়া হবে। তজ্জন্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে যেন শ্রবণ-কীর্তন বিচার হতে বিচ্ছিন্ন না হই। যেখানে যত চেষ্টা আছে, তা পরিত্যাগ করে পরম প্রয়োজনের জন্য যত্ন করা দরকার। তাকে বাদ দিয়ে যতরকম ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র বা সাত্ত্বিক শাস্ত্রকে standard মনে করি, সমস্ত বাদ দিয়ে রজস্তমো বিধানে কাজ চলুক, তাহলে রাজসিক তামসিক ব্যাপারে ইউরোপ আমেরিকার যে দুর্দশা এসেছে, সেইটা আমাদেরও আক্রমণ করবে। রজস্তমোগুণতাড়িত হয়ে সত্ত্বগুণকে ধ্বংস করার প্রবৃত্তির ফল ভগবান্ পদে পদে দেখিয়ে দেন। যখন আমরা মৎস্যধর্ম নিয়ে বঁড়শীতে টোপ খাই, বঁড়শীর angle-এ চামড়া বিঁধিয়ে নিয়ে মৎস্যভোজীরা আমাদের মাংস খায়, তখন বুঝতে পারি যে আমাদের বিনাশের জন্যই তারা এত দয়া করেছিল। ভাগবত ১১শ স্কন্ধ আলোচনা করলে জানা যায়, রজোগুণের দ্বারা তমোগুণকে বিনাশ করে সত্ত্বের দ্বারা রজের প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করতে হবে এবং বিশুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মিশ্রসত্ত্বকেও নিরাস করতে হবে।

"যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধস্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্।।"

একমাত্র শরণ্য বাসুদেবের পাদপদ্মাঙ্ঘ্রি বিলাসগতলীলারূপ ভগবদ্ভক্তিযাজনক্রমে সাধুগণ বদ্ধভোগীজীবের কর্মাগ্রহিতা যেরূপ উন্মুলিত করেন, পূর্বসঞ্চিতকর্মবীজদূরীকরণ কার্য-শূন্যবিচার-রত সংযমনপটু যতিগণের অনুষ্ঠান দ্বারা সেরূপ সিদ্ধ হয় না। অতএব সেই বাসুদেবের সেবা করাই বিহিত।

বাসুদেবের কথা সকলেই জানেন। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং 'বসুদেব' শব্দিতং।" যে বাসুদেব বিশুদ্ধসত্ত্ব, অন্যের ন্যায় রজোগুণে যাঁর সৃষ্টি হয় নি, তমোগুণে যাঁর বিনাশ হবে না, সেই অধোক্ষজতত্ত্বকে আমি ভজনা করি। 'অরণ' শব্দে শরণ্য। একমাত্র বাসুদেবের শরণ নিতে হবে। রজোগুণ বা জড়সত্ত্ব সংরক্ষণ করতে হবে না, কিন্তু যে সত্ত্ব কালের দ্বারা বিনষ্ট হবে না, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বে বাসুদেবের জন্ম। তিনি পুরুষোত্তম বস্তু, ত্রিগুণকে বিতাড়িত করেছেন, তাঁর শরণ নিতে হবে। 'রিক্তমতি' মানে vacant—সব ছেড়ে দিয়ে tabularasa অর্থাৎ নির্বিশেষ করে দাও—এরূপ বুদ্ধি নেই যাঁদের, তাঁরা ভজন করছেন। 'নিরুদ্ধস্রোতোগণাঃ'—স্রোতসকল নিরুদ্ধ করার চেষ্টা—ইন্দ্রিয়বেগ সংযত করার চেষ্টায় যাঁরা আছেন, তাঁরা সুবিধা পান না।

"যৎপাদপঙ্কজ-----সন্তঃ" অর্থাৎ ভগবানের পাদপদ্মের অঙ্গুলিসকলের কান্তি স্মরণ করতে করতে ভক্তগণ পূর্বসঞ্চিত কর্মবাসনাময় হৃদয়গ্রন্থিকে অনায়াসে ছেদন করেন। 'পলাশ' অঙ্গুলি, তাতে যে বিচিত্রতা অর্থাৎ বিলাসের যে সেবা-সাহচর্য; যেমন বজ্রাঙ্গজী রাঘবেন্দ্রের সীতা-বিমুক্তিকালে যে সাহচর্য করেছিলেন। ইহা ভগবানের বিলাস,

ভক্তের পক্ষে সেবা। ধর্মজগতে যত রোগ হয়েছে, এ সকলেরই চিকিৎসাপ্রণালী ভাগবতে আছে। ভাগবত সব রোগ বিনাশ করে রোগের মূল আকর পর্যন্ত উপড়ে দেবেন— antitheistic চিন্তাস্রোতকে থুৎকারে উড়িয়ে দেবেন যদি মানুষের শ্রবণের কাণ হয়। যদি empericicism এর কাণ হয়, তবে বহির্জগতের চিন্তাস্রোত আমাদিগকে আক্রমণ করবে। সেটা dismantle করার ব্যবস্থা শ্রীমদ্ভাগবত করেছেন।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ।।
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা।।
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্।।

ভগবদ্বস্তু যাহা, ভগবানের ভাবসমূহ যাহা, ভগবানের রূপ যাহা, গুণসমূহ যাহা এবং বিক্রমসমূহ যাহা, সেই সমস্তই ভগবদনুগ্রহক্রমে প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্তজীবের অনুভবের বিষয় হয়। কৃপার অযোগ্য ভগবদ্বিরোধী অবজ্ঞাপরায়ণ ব্যক্তি অবৈকুণ্ঠ বস্তুতে, ভোগ্য ভাবাদিতে, ভোগ্য রূপ ভোগপর গুণ এবং জড়ানন্দপর বিভ্রান্তি-সমূহে অবস্থিত থাকায় অহঙ্কারবিমূঢ়তা-হেতু মায়াবাদী হয়ে পড়েন।

কালের খণ্ডধর্মানুভূতির পূর্বে ভগবানের অধিষ্ঠান এবং পরেও তাঁরই অধিষ্ঠান। জড়সত্তা ও জড়ভোগাতীত অনধিষ্ঠান হতে তিনি পৃথক বস্তু হয়েও ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হতে পৃথক নন।

ভগবদ্বস্তুর প্রতীতির অভাবে যাহা অনুভূত হয়, ভগবদ্বস্তু ব্যতীত যার অনুভূতিগত অস্তিত্ব নেই, পরমাত্মবস্তুতে যার অনুভূতি নেই তাই মায়া। মায়ার পরিচয় দ্বিবিধ— জীবমায়া আলোকময়ী ও অন্ধকারময়ী গুণমায়া। শক্তিমদ্বস্তু ও শক্তির বিচারে ভ্রান্তিনিরসনার্থ এই সংজ্ঞা।

অভিধেয়-বিচারে জিজ্ঞাসার উদয়। অতাত্ত্বিকের জানবার চেষ্টা নেই। অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবদ্বয় দ্বারা সর্বদা সকল স্থানে সেই ভগবদ্বস্তুর শ্রবণাদি বিধেয়।

যেরূপ মহাভূতসকল নীচোচ্চ প্রাণিসমূহে প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্ট-প্রতিম হয়, সেইপ্রকার ভক্তহৃদয়ে নিত্য প্রবিষ্ট হয়েও ভগবদধিষ্ঠানের স্বতন্ত্রতারক্ষণ দ্বারা প্রেমভক্তির

নিত্য প্রাপ্তির বিষয়ে অজ্ঞান ও বিজ্ঞ-ভেদে অনধিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠিত এই উভয় পরিচয়-বৈশিষ্ট্য।

বাস্তবিক অভক্তগণ কখনই ভাগবত পড়তে পারে না। তারা ভুক্তি ও মুক্তিপিপাসু-কর্মী ও জ্ঞানী।

কর্মীজ্ঞানীর বিচারে ভক্তির স্বরূপনির্ণয়ে ব্যাঘাত উপস্থিত হবে। প্রেয়ঃপন্থী মনোধর্ম-চালিত হয়ে এই ভাল, এই মন্দ বিচারে ব্যস্ত। 'দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম।' জড়নির্বিশেষ, জড়সবিশেষ পরিত্যাগ করে যুগপৎ চিন্নির্বিশেষ ও চিৎসবিশেষ বিচারই গ্রাহ্য, উহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচার।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-মোহ-ভয়াপহা।।

"ভক্তিযোগপ্রভাবে স্তব্ধীভূত মন সম্যগ্‌রূপে সমাহিত হলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তিসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁর পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে জীব সত্ত্ব-রজস্তম-গুণত্রয়াত্মক জড়াতীত হয়েও আপনাকে জড়দেহ ও মনোবুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমান হতে জাতকর্তৃত্বাদিমূলে সংসার-বাসনা লাভ করে।

শ্রীব্যাসদেব দেখলেন যে, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হলে সংসার-ভোগদুঃখ নিবৃত্ত হয়। এই সমুদয় দর্শন করে সর্বজ্ঞ বেদব্যাস এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করেলেন। এই পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়-নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।"

সাত্বতসংহিতা ভাগবত না পড়া পর্যন্ত জীব আধ্যক্ষিক থাকে। ভাগবত—পারমহংসী সংহিতা। পরমহংসগণ—পরমমুক্ত নিষ্কিঞ্চনগণ কি বলছেন, তা জানতে হলে, আলোচনার ইচ্ছা থাকলে দশম স্কন্ধ আলোচনা করতে হবে। দশম স্কন্ধ আলোচনার পরে একাদশ স্কন্ধ না পড়লে অধঃপতন হবে। সেজন্য ভাগবত-শ্রবণই আমাদের একমাত্র কার্য, ভাগবত শ্রবণেই অন্যান্য চারটি অঙ্গ—সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, শ্রীমূর্তির অঙ্ঘ্রিসেবা, মথুরাবাস হবে। মথুরা—জ্ঞানভূমিকা, পূর্ণজ্ঞানে বাস, অচেতন ভূমিকায়

বাস না করার নাম মথুরাবাস। 'নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ' প্রভৃতি পঞ্চরাত্রের অঙ্ঘ্রিসেবার পদ্ধতি সমূহও ভাগবতে আছে। ভগবানের আরাধনা করতে শিখলে, মায়ার প্রভু হবার জন্য ব্যস্ত না হয়ে—মেপে নেওয়া ধর্ম থেকে ত্রাণ পেয়ে ভগবানকে ভজন করলে দুর্ভোগ বা সুখভোগ হতে অবসর-লাভ ঘটে। জড়ভোগময় ইন্দ্রিয়জ ধর্মে মেপে নেওয়া বিচার—যেমন জাহাজে চড়ার সময় তিন বাম, তিন হাত প্রভৃতি মাপ করা। আমরা কার কত ইঞ্চি চিত্তের উদারতা, কতটা রজঃসত্ব প্রভৃতি, সর্বক্ষণ মাপছি; এতে যতদিন ব্যস্ত থাকবো, ততদিন জগদ্দর্শন। যখন ভাগবত পড়ি, তখন এটাকে কেন গৌণ বলেছে, তার অনুসন্ধান করি এবং পরমেশ্বর কেন সত্য প্রভৃতি বিচার বুঝতে পারি। সত্ত্বাদি ত্রিসর্গ অসত্য, বিশ্ব পরিবর্তনশীল—বিকারযোগ্য, সচ্চিদানন্দই স্থায়ী। যখন মেপে নিতে যাই, তখন বিশ্বদর্শন, ইহা ভগবানের গৌণভাবে সৃষ্ট ব্যাপার; যখন মাপ দিতে যাই, তখন তিনি যদি আকর্ষণ করেন, তবেই আকর্ষককে কৃষ্ণ জানব, তিনি ভবানীভর্তামাত্র নন অর্থাৎ তিনি ভবানী রচিত জগতের নিয়ামকমাত্র নন।

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্ দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্ ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।

এই বিচার হওয়া উচিত। ভক্তের নিকট সব জিনিষ আপনা থেকে এসে যায়। "জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।'

"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে"—আদিকবি ব্রহ্মার কবিত্ব অনুসারে এই জগৎ রচিত হয়েছে। তাঁর হৃদয়ে যিনি বেদ বিস্তার করেছেন। 'বেদ' অর্থাৎ অভিজ্ঞান—মাধুর্যবিগ্রহ কৃষ্ণ, ঐশ্বর্যবিগ্রহ নারায়ণ, বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ, সঙ্কর্ষণ হতে প্রকটিত নারায়ণতা—কারণাদিপুরুষাবতারত্রয়ের অভিজ্ঞান যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বিন্যাস করেছেন অর্থাৎ ভাগবতের কথা জানিয়েছেন। যখন ব্রহ্মাণ্ড রচিত হয় নি, তখন জানিয়েছেন।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।

প্রভৃতি শ্লোকে বাস্তববিজ্ঞান জানিয়েছেন। ব্রহ্মা আধিকারিক দেবতা, জগতের সৃষ্টিকর্তা; রক্ষাকর্তা—বিষ্ণু, রুদ্র—বিনাশকর্তা। ত্রিবিধ বিচার তাঁতেই অবস্থিত।

"মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ"—সূরিগণ—মহাপণ্ডিতগণ যৎ যস্মিন্—যাঁতে মূঢ়তা লাভ করেন। আধারবিচারে ভূর্ভুবঃ স্বঃ—ব্যাহৃতিত্রয় পর্যন্ত যেয়ে আটকে থাকেন। শক্তির পরিচয়-বিচারে অসম্পূর্ণতা লাভ করেন।

'লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্' অজ্ঞানত মূঢ়স্য বিজ্ঞানার্থম্—অজ্ঞান লোককে জ্ঞানপ্রদানের জন্য বিদ্বান্ বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন। এটি তাঁরই উক্তি। তিনি বলছেন, এস সকলে ধ্যান করি। মুখ্যগুণবিশিষ্টবিগ্রহ যিনি, যাঁর গৌণগুণে জগৎ রচিত হয়েছে—তাঁর ধ্যান করি। তিনি মূঢ়দের মোহন জন্য রাজস-

তামস পুরাণাদি করেছেন। ভাগবত ব্যতীত অপর পুরাণাদিতে বিমোহনের কথা আছে। এটা তিনি নিজে লিখে দিয়েছেন।

ভাগবত আলোচনা করার নাম পরিপঠন, তৎপূর্বে সংশ্রবণ; তারপর বিচারণপরতা। সর্বক্ষণ স্মৃতিপথে থাকুক এইটিই বিচারণপরতা। তাতে লক্ষ্য করি, ভাগবত-শ্রবণ-পঠন-চিন্তন—ভক্তির প্রধান সাধন; ভাগবত বলতে ভগবান্ ও তদনুগত ভক্তকে বুঝায়।

এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র।।

শব্দব্রহ্ম গ্রন্থাকারে শ্রীমদ্‌ভাগবত; আর তিনি যখন ভক্তের আচরণে—কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে চেষ্টার মধ্যে আসেন, তখন তাঁর পূজা করেন যাঁরা, তাঁরা ভক্ত-ভাগবত। সুতরাং আমাদের বিচার—শব্দব্রহ্মের উপাসনাই ভাগবতের কীর্তন। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বস্তু; তাঁতে ভগবদবতারসমূহের লীলাতারতম্যে কৃষ্ণলীলাই সুষ্ঠুভাবে কীর্তিত হয়েছে। সুতরাং ভাগবতের অঙ্ঘ্রিসেবা প্রয়োজন। অর্চাবিগ্রহরূপে শ্রীমদ্ভাগবত-অর্ক উদিত। এই সূর্যের উপাসনা হওয়া দরকার। কৃষ্ণলীলা-কীর্তন-মুখেই ভাগবত-সূর্যের পুজা—তাঁর অঙ্ঘ্রিসেবা। পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে প্রধান অঙ্গ কীর্তন। নাম-রূপ-পরিকর-লীলা-কীর্তন ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের সেই ভাগবতের বর্ণনটিই আদরের বিষয়।

"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।।"

তজ্জন্য ভাগবত বলেন—তাঁর পাঠক সাধু, নির্মৎসর। এতে পরমধর্মের কথা আছে, কোন ইতর ধর্মের কথা নেই। সাধুগণের—মৎসরতাহীন মহাপুরুষদিগের পরমধর্ম ভাগবতে কথিত। ভাগবত ভোগে আচ্ছন্ন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ জীবের জন্য প্রস্তুত করা খাদ্য নন। কেবলাদ্বৈতদবাদিগণ বলেন—"ভাগবত বড় খারাপ জিনিষ, একে বাদ দিয়ে বেদান্ত উপনিষদ পড়া যাক। কারণ ভাগবতশ্রবণকারীতে ব্যভিচার উৎপন্ন হয়ে তাকে নরকে নিয়ে যাবে।" কিন্তু যারা ভাগবতকে ঘৃণা করে, তারাই অসাধু ও মৎসর। তাহলে অজ্ঞতাবশতঃই হোক বা রজস্তমো-গুণপ্রাবল্য-হেতুই হোক এতে যাদের বিরাগ, সেই ভাগবত-বিরোধিসম্প্রদায় ঐরূপ বিচার করতে গিয়ে অসৎ পাপিষ্ঠের অন্যতর হয়ে সাংসারিক ভোগ হেতু নরক প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ভাগবতবিরোধি-সম্প্রদায় ভগবদ্রসকে নিজ-ভোগবিরোধী জেনে মঙ্গলের পথ থেকে উল্টো রাস্তায় যাচ্ছেন।

ভাগবতে কৈতবহীন পরমধর্মের কথা কথিত হয়েছে। বাস্তববস্তুকে জানাই সেই পরমধর্ম, তা শিবদ--মঙ্গলপ্রদ, তদ্দ্বারা ত্রিতাপ উন্মূলিত হবে—ত্রিতাপের মূল উৎপাটিত হবে, আর বাড়তে পারবে না, একেবারে নামগন্ধ থাকবে না।

কৈতব শব্দে ছলনা। শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন—"প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। 'প্র' শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" ধর্ম অর্থ কাম সাধারণ ব্যাখ্যা, আর মোক্ষ বলে জিনিষটা সবচেয়ে বেশী কপটতা। বুভুক্ষায় 'ফেল কড়ি মাখ তেল'—এটা বেশ ধরা পড়ে যাচ্ছে। জ্যোতিষ্টোম সৌত্রামণি যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করে ভোগ করবে। এ তিনটিতেই যে ছলনা তা নয়। মোক্ষের দুরভিসন্ধি বড় ছলনা—তাতে হবে কি, কৃষ্ণলীলা বন্ধ হবে। উহাতে রুদ্রের দ্বারা বিষ্ণুর সংহার-প্রবৃত্তি। কিন্তু বিষ্ণুর সংহার হয় না, রুদ্রের হওয়া সম্ভব। যেমন বৃকাসুর রুদ্রের কাছে বর নিয়েছিল, সে যার মাথায় হাত দেবে সেই ভস্ম হয়ে যাবে। পরিশেষে শিবের নিকটে বর লাভ করে তাঁরই মাথায় হাত দিয়ে রুদ্রকে সংহার করতে চায় কিন্তু বিষ্ণু তাঁকে রক্ষা করেন। ইহার তুল্য কপটতা আর নেই। জপ তপ করা, গোপাল ধ্যান, শেষে আমি সুবিধা করে নেব, ভগবান্ ধ্বংস হয়ে যাবেন। নির্বিশেষ ব্রহ্ম হয়ে যাব, শোকমোহ থাকবে না। কাজটা হাসিল করার জন্যই ভগবান্। কাজের সুবিধা হলে ভগবানের দরকার নেই। ভোগবৃদ্ধির জন্য ভগবানের সৃষ্টি, ত্যাগ হলে পুঁছে ফেলবে। এই ত্যাগের অকর্মণ্যতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এবং অন্যান্য আচার্যগণ দেখিয়েছেন। ধর্মার্থকামমোক্ষ যাদের প্রয়াস, তারা অভক্ত। ভাগবত-শ্রবণ তাদের ভাল লাগে না, পরম ধর্মের কথা ছাড়া অন্য কথা ভাল লাগে। সাধুদের নিত্যত্ব বিচার। তাঁরা গুণজাত ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন না। বাস্তব বস্তুকে জানতে হবে।

বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞানই শিবদ অর্থাৎ মঙ্গলদাতা। বাস্তব বস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন রাধাকান্ত আর বাদবাকী সব অবাস্তবমিশ্র প্রতীতিতে ভরা। রাধাগোবিন্দ, রাধা-মদনমোহন, রাধা-গোপীনাথের সেবা ব্যতীত সবই অবাস্তব মিশ্র বস্তু জ্ঞান, ঘুমের ঘোরে সম্পত্তিলাভের ন্যায়। ঘুম ভাঙ্গলে বাস্তব বস্তু জানবে। কে জানবে? —ভক্ত, নির্মৎসর যাঁরা। পরমধর্ম জানলে ফল কামনা থাকবে না। আমি ফল পাব, কৃষ্ণ বঞ্চিত হবেন—এটা ভোগী মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাব এবং কৃষ্ণবিমুখতা হতে জাত। কৃষ্ণসেবাবঞ্চিত হয়ে অপ্রয়োজনীয় বস্তু (rubbish) মাথায় করছি। বাস্তব বস্তুবিজ্ঞান লাভ হলে—positive মঙ্গল পেলে secondary অমঙ্গল 'হেলোদ্ধুলিতখেদয়া'-বিচারে কোথায় চলে যাবে। যেমন দ্বারকায় কৃষ্ণ এলে চতুর্মুখ ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য দ্বারদেশে গিয়ে কৃষ্ণকে......নিষ্পন্দ হয়ে গেলেন।

"শুনি' হাসি' কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইলা ততক্ষণে।।

দশ-বিশ-শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-বদন।
কোট্যর্বুদ মুখ কারো না যায় গণন।।
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি-বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি-নয়ন।।
দেখি চতুর্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা।''

সনকপিতা চতুর্মুখ ব্রহ্মা নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্রজ্ঞানে এক কোণে বসে থাকলেন। ব্রহ্মা নিজের ভ্রম বুঝে তখন বলছেন,—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ।।

'যাঁরা বলেন, আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব জানি', তাঁরা জানুন, কিন্তু আমি অনেক উক্তি করতে ইচ্ছা করি না। প্রভো, আমি এই মাত্র বলি যে, তোমার বৈভবসকল—আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর।'

ব্রহ্মা বললেন অন্যে যা বলে বলুক, আমি আর ঐরূপ অবিবেচনার কথার মধ্যে ঢুকবো না। তখন থেকে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হলো। একমাত্র ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ, তাঁতেই সকল জীবাত্মার সর্বতোভাবে ভক্তি প্রযুক্ত হতে পারে। কৃষ্ণ সকল অবতারের অবতারী। আর অন্যান্য অবতারে রসের অপূর্ণতা ও স্বল্পতা, কিন্তু পূর্ণ সকল রসের অভিব্যক্তি একমাত্র তাঁতেই আছে।

যদি ভগবানে স্থিরতরা ভক্তি হয়ে থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্‌বস্তু পুরুষোত্তম উরুক্রমের সান্নিধ্য লাভ হবে—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনের দর্শন পাবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না—যদি সেবা প্রবৃত্তি থাকে। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" তিনি ত অচেতন-পদার্থ নন, আমাদের প্রাপ্যবিষয় নিশ্চয়ই হবেন, যদি আমাদের ভক্তি—সেবা চেষ্টা থাকে; তাহলে তিনি সেবাও নিশ্চয়ই নেবেন, অন্য কিছু দিয়ে প্রবঞ্চনা না করে ধরা দেবেন, বলবেন—আমাকে যদি চাও সেবা কর, তুমি bonafide servitor, আমি এসেছি সেবা কর। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর নিজ- সেবার ইচ্ছা করলে তাঁকে পাওয়া যায়, তিনি চেতন—"ত্রেধা নিদধে পদম্"—তিনি আপনা হতেই এসে উপস্থিত হন। সেবক ঐকান্তিকী ইচ্ছা করলে—ব্যবহিত-রহিত সেবাবিধানে ব্যগ্রতা থাকলে সেব্য বসে থাকতে পারেন না, এগিয়ে আসেন।

তিনি স্বয়ং কৃপা ক'রে প্রকৃত সেবকের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করেন, সঙ্গোপন করেন না। যদি বাস্তবিক আর্ত্তিসহকারে কেউ ডাকে, তিনি চুপ করে ঘুমান না। পরমকমনীয়—পরমরমণীয়—পরমসৌম্যমূর্তি কৃষ্ণ বার্দ্ধক্যজনিত জড়কালক্লিষ্ট শ্লথচর্মবিশিষ্ট নহেন, তিনি নবীনকিশোর চিন্ময়ী মূর্তি নিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত

হন। তখন আমরা তাঁর সকল প্রকার সেবা করতে পারি—পত্নীসূত্রে পতিজ্ঞানে, পিতামাতাসূত্রে পুত্রজ্ঞানে, সখাসূত্রে সখাজ্ঞানে, ভৃত্যসূত্রে প্রভুজ্ঞানে এবং নিরপেক্ষসূত্রে বিরোধাচরণে নিরস্ত হয়ে।

ধর্মার্থকাম—যার জন্য মানুষ আকাশপাতাল আলোড়ন করে একটি, দুইটি বা তিনটি লাভ করেন, তারা ভৃত্যসূত্রে হাত যোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে; যে গুলোর জন্য পরিশ্রম করে জন্মজন্ম পরে সুফল পায়, তারা কখন আজ্ঞা করবেন, এজন্য মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁবেদারের ন্যায় অপেক্ষা করে। আর মুক্তি—সমস্ত বন্ধন হতে মোচনপ্রাপ্তিরূপ যে অবস্থা, সেটি হাত যোড় করে দাসীর ন্যায় অপেক্ষা করে। যম, নিয়ম প্রভৃতি অবলম্বন করে—কত তীব্র তপস্যা করে সমাধি লাভের জন্য যে চেষ্টা—কৃচ্ছ্র সাধন, তদ্দ্বারা যে বস্তু লাভ হয়, তা ভগবদভক্তের নিকট দাসীর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। ভক্তি আশ্রয় করার দরুণ কর্ম-জ্ঞানের জায়গায় পৌঁছান যাবে না, তা নয়, ওগুলো বা ওদের চরমফল ভক্তিদ্বারা লাভ হয়ে যাবে।

প্রয়োজন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভাগবত-শ্রবণ সকল লোকের ভাগ্যে হয় না। যাঁরা ভাবুক, ভাবের মর্য্যাদা জানেন, ভোগে ব্যস্ত নন, সেবাভাবে বিভাবিত, তাদেরই প্রয়োজনপ্রাপ্তি হয়ে থাকে, তাঁদের সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়ে রুচি ও প্রয়োজনে সিদ্ধিলাভ হয়। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় যাকে-তাকে দেওয়া হয় না, অনর্থযুক্তকে দেওয়া হয় না। অপ্রয়োজন বিচারে যারা স্নিগ্ধ, তাদের বিচার—"আমাদের কৃষ্ণভজনে রুচি নাই, আমরা আসবসেবায় ব্যস্ত, রসলাভে রুচি নাই, প্রভুত্ব করতে আনন্দ পাই—অন্যের চাকরী করতে চাই না।" অনর্থযুক্ত অবস্থায় অবিদ্যাগ্রস্থ জীবের এইরূপ অভিমান থাকে। জড়ভোগে ব্যস্ত লোকের প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না। তারা বলে, আমাদের এই সব বিষয়েই রুচি। তারা ভগবদ্‌ভক্তিরসের কথায় মন দেয় না, তাদের ভাগবত-শ্রবণে রুচি হয় না। কিন্তু ভাগবতরচয়িতা বলেছেন,—"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্।" ভাগবত কিসের ফল? কল্পতরুর ফল। যেমন আম, লিচু, কাঁঠাল যেরকম গাছ; সেরকম গাছের ফল নয়; কিন্তু কল্পতরু—যে যা চায়, তাকে তাই দেয়—সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদ। বেদ—কল্পতরু অর্থাৎ সুষ্ঠুজ্ঞানময়—চেতনময়। অচেতনের উপযোগী জ্ঞান ভাগবতে নাই। সেবাযুক্ত চিত্তের ধর্মই চেতনের ধর্ম, বহির্মুখ চিত্ত অভক্তিযুক্ত, তাতে মলিনতা আছে, ঐগুলি কর্ম-জ্ঞান-শব্দে কথিত। ভাগবত কিরূপ ফল? কাঁচা, কষা বা ডাঁসা নয়; তা পাকা, আবার পাকার পরেও গলিত—রসপরিপূর্ণ, তাকে চিবুতে হয় না; যার দাঁত নাই সেও গিলে খেতে পারে, এমন তরল গলিত ফল। ভাগবতবিরোধি-বিচারে যে রস, সেটা কষায়। ভাগবত শুকমুখ থেকে গলিত, যিনি সংসারে অপ্রমত্ত সংসারের ক্লেশ পান নাই, তিনিই আস্বাদন করেছেন। ভোগে প্রমত্ত হলে বিপথগামী হ'তে হয়।

শুকের মুখের পাকা ফলটি—শুকপাখী খেয়েছেন, তাঁর মুখ হতে অন্যে আস্বাদন

করবে বলে উচ্ছিষ্ট রেখেছেন, শুক নিজে খেয়ে অনুগত ব্যাক্তিদের তা খাওয়াচ্ছেন, বলছেন—বড় ভাল, তোমরা সকলে আস্বাদন কর। শুকের পঠনকার্য বাবার কাছে যা পড়েছেন, সেইটি আউড়ে দিচ্ছেন। যেমন শুকপাখীকে পড়ায়—"পড় পাখী আত্ম রাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।" যা পড়েছেন হুবহু বলে দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদনও করেছেন। আস্বাদনে ভাল লাগার দরুণ জিনিষটাকে বিমর্দিত—বিপর্যস্ত না করে ঠিক ঠাক বলেছেন।

নিগম অর্থাৎ বেদ—বৃক্ষস্বরূপ; শুক তার গলিত অর্থাৎ পরম প্রপক্ক ফলের সুস্বাদ পাওয়ার দরুণ অন্যলোককে তাঁর অবশেষে দিয়েছেন। "কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম। ভক্তোচ্ছিষ্ট হইলে হয় মহামহাপ্রসাদাখ্যান।"

'অমৃত' অর্থে যা মরে না, নষ্ট হয় না, যা খেলে মানুষ মরে না,—সুধা। যে বস্তুটি দ্রব–অতি মসৃণ, একটুও কঠিন (stiff) বা খস্‌খসে নয়, সহজে গ্রহণীয় যাহা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপ যাঁর বিচারে লিখেছেন,—

"সম্যঙ্ মসৃণিতঃ স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।।"

সেই বস্তুটি প্রেমা। অমৃতদ্রবসংযুত গলিত ফল 'পিবত' অর্থাৎ পান কর। ভগবানের বিষয়, তাঁর প্রবন্ধ পান করে আস্বাদন কর—আলোচনা কর। তাতে জীবের ভোগের কোন কথা নাই, ভগবানের ভোগের কথাই বলা হয়েছে। জীবের ভোগে নানা বাধা; ভোগ্য বিষয়ের বহুত্ব-হেতু একের সুখে আর একজন সুখী হতে পাচ্ছেন না। কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র বিষয় হলে সেখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ।" "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

—প্রভৃতি বিচার হলে কৃষ্ণকে একমাত্র একল অদ্বিতীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অসমোর্ধ বিষয়-জ্ঞানে ভোগের বিচার থেমে গিয়ে সেবার বিচার আসবে।

'আলয়'-অর্থে বাড়ী। রসশাস্ত্র আলোচনা কর। আলয়—জগৎ ধ্বংস হয়ে গেলেও যাঁর বিনাশ নাই, সেই বস্তুর আলোচনা হোক—যেকাল পর্যন্ত আনন্দের পূর্ণতা না হয়। জড়রসশাস্ত্রে পণ্ডিত হলে বিদ্যাসুন্দর, সাবিত্রী সত্যবান্ প্রভৃতির অলোচনা হয়ে যাবে। ভাগবতে যে গোপীনাথের রসের কথা আলোচনা করেছেন, জড়রসের সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য থাকলেও সমান নয়। ছায়াকে বস্তু জ্ঞান করলে মূঢ়তার পরিচয়ই দেওয়া হয়। ভগবান্ সেব্য, সেব্যবিষয়ের রসজ্ঞান আত্মানুভূতিতে হওয়া দরকার। রসিক ভাবুক হতে হলে ভাগবতরস পান কর।

ভুবি—পৃথিবীতে, ভাবুকাঃ—ভগবদ্‌ভাবে ভাবুক, সেবানিপুণ, রসনিপুণ, ভাগবতগণ, রসিকসম্প্রদায় ভগবানের লীলাপূর্ণ ভাগবত পাঠ করুন।

অন্যান্য পুঁথিতে অনেক কথা বর্ণিত আছে। মহাভারতে মথুরেশ, দ্বারকেশের কথা

আছে; কিন্তু বৃন্দাবনের ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা সুষ্ঠুভাবে নাই। জগতের মধ্যে যাঁরা থাকতে চান, বাইরে যেতে চান না, তাঁরা মহাভারত পড়ুন; কিন্তু জন্মজন্মান্তরের—নিত্যকালের কৃত্য যাঁদের আলোচনার বিষয় হবে—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বাধাপ্রাপ্ত না হলে কি কৃত্য থাকে, এটা যাঁদের বিচার তাঁরা ভাগবত আস্বাদন করুন। যেমন জয়দেব বলেছেন,—

"বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূলোকমুদ্বভ্রতে
দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।।"

সেই কৃষ্ণ দশপ্রকার বিভিন্ন আকার ধারণ করে বিভিন্ন রসের লীলা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেই রসপূর্ণতা আছে। তিনি অখিলরসামৃতমূর্তি। তাঁ' হতে আংশিক ভাবসমূহ বিভিন্ন অবতারের মধ্যে কিছু কিছু আছে।

রস-বিচারটি সুষ্ঠুভাবে হওয়া দরকার। রসময় রসিক-শেখর কোন্ রস কি ভাবে প্রকাশ করে রসাস্বাদন করছেন এটি বিচার করলে আমরা জানব—'রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।' সব রস কৃষ্ণের পাদপদ্ম থেকে বেরিয়েছে, তার কতক স্বাংশগণ আছে, এঁদের নিজ নিজ বৈকুণ্ঠ আছে। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, রাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কি—এঁরা কোন কোন্ রস কি ভাবে আস্বাদন করেছেন তা জানা দরকার। করুণাবতারের কথা বুঝতে না পেরে যে অমঙ্গল, তা হতে রক্ষা পাবার জন্য ভাগবত শুনা দরকার। অনেকের বিচার—কৃষ্ণ অপেক্ষা বুদ্ধতে ভাল গুণ। ভোগীর ভোগ তাদের জন্য রেখে দিয়ে তিনি নিজে নির্ভোগ হয়েছেন। এটি ভাল। স্ত্রী, পুত্র ছেড়ে গাছতলায় বসে তপস্যা করেছেন, আর কৃষ্ণ কামদেব হয়ে নিজ বহু কামনার তৃপ্তি করেছেন। তাই বুদ্ধ ও কৃষ্ণ আসামীদ্বয়ের মধ্যে বুদ্ধকেই রায় দিলাম। তার উত্তর নারদঋষি দিয়েছেন,—

'আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।

কৃষ্ণের লীলা বুঝতে না পেরে বুদ্ধকে তপস্বিমাত্র বুঝলে—কৃষ্ণের অবতার জ্ঞান না করলে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার বিচারটারই বহুমানন হয়। বুদ্ধ আবেশাবতার, স্বাংশ নহে, জীববিশেষ, তাঁতে করুণ রসটি আছে। কৃষ্ণ নিরাকার বুদ্ধ হয়ে জঙ্গলে যান; কিন্তু বুদ্ধিমান্ নারদ বলেছেন, হরির আরাধনায় জগতের সব দ্রব্য লাগিয়ে দেওয়া হোক, নচেৎ তপস্যা, ধর্মকর্ম প্রভৃতির নামে শয়তানেরই প্রশ্রয় দেওয়া হবে, হরি আরাধনাই মূল বস্তু। যেমন—এক সংখ্যার ডাইনে শূন্য বসালে দশ গুণ বৃদ্ধি হয়ে যায়, কিন্তু সংখ্যা বাদ দিলে সব শূন্য; তদ্রূপ ভগবানের সেবা বাদ দিয়ে যা কিছু করা যায়, সবই নিরর্থক হয়ে যায়।

"যস্যালীয়ত শল্কসীম্নি জলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং
দংষ্ট্রায়াং ধরণী নখেদিতিসুতাধীশঃ পদেরোদসী।
ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ শরেঃ দশমুখঃ পাণৌ প্রলম্বাসুরঃ
ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্মিককুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ।।

সেই কোন এক পুরুষোত্তম বস্তুকে নমস্কার করি, যিনি স্বীয়-লীলা-বৈচিত্র্য প্রদর্শন কল্পে জলধিকে স্বীয় শল্ক-সীমায় লীন করিয়াছিলেন (মৎস্যাবতার), যাঁর পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডল সংলগ্ন হয় (কূর্মাবতার), যাঁর দন্তে পৃথিবী (বরাহাবতার), যাঁর নখে হিরণ্যকশিপু বিলীন হয়েছে ('ত্রেতা নিদধে পদম্' বিচারে বামনদেব), যাঁর ক্রোধে ক্ষত্রপ্রকৃতি ব্যক্তি সকল বিনষ্ট হয়েছিল (পরশু রামাবতার), যাঁর শরে দশানন রাবণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল (রামাবতার), যাঁর পাণিতে প্রলম্বাসুর নিহত হয়েছিল (শ্রীবলদেব), বিশ্ব যাঁর ধ্যানে বিলীন (বুদ্ধাবতার), আর যাঁর অসিতে অধার্মিককুল বিনষ্ট হবে (কল্কি)। সেই মৎস্যকূর্মাদি অবতারের অবতারী ভগবান্‌কে নমস্কার করি।

যেমন বুদ্ধ তপস্যা, ধ্যান প্রভৃতি করে সমগ্র বিশ্বের সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েছিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণের করুণামূর্তির প্রকাশবিশেষ হয়ে শোকরতির সামগ্রীযোগে সর্বত্র সমদৃষ্টি হয়ে পশু-হিংসাদি বাধা দিয়েছিলেন, সেই প্রকার স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব বলদেব প্রলম্বাসুরকে ধ্বংস করেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে ধ্বংস করেছিলেন, বরাহদেব পৃথিবী ধারণ করেছিলেন, কূর্ম্মদেব মন্থনদণ্ড মন্দার পর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করে কণ্ডুয়ন জন্য সুখানুভূতিক্রমে নিদ্রালু হন, নৃসিংহদেব নখদ্বারা হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন। সেই দেবতাটি কৃষ্ণই; নিমিত্ত উপলক্ষণে বিভিন্ন রস প্রকট করে ভিন্ন ভিন্ন নৈমিত্তিক অবতারোচিত বৈভব-লীলা প্রকাশ করেছেন। হয়গ্রীবাসুর কর্তৃক অপহৃত বেদ জলধিগর্ভে নিমজ্জিত ছিলেন, মাছের আঁইসে জলধি জল শুকিয়ে গেল, তাতে বেদ উদ্ধার হল। সত্যব্রত রাজার সময়ে কৃতমালা নদীর ধারে দক্ষিণ দেশে মৎস্যাবতারে প্রকট-লীলা রাজাকে ওষধি ও নৌকাদানে প্রলয় হতে রক্ষা করেন। অর্থাৎ স্বর্গ প্রমুখ বিশ্ব জড়রসে নিমগ্ন ছিল, তাকে পৃষ্ঠে ধারণ করে দেবপ্রাপ্য দ্রব্যাদি দান করেছেন।

"পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডুয়না-
ন্নিদ্রালোকঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসনিলাঃ পান্তুবঃ।
যৎসংস্কারকলানুবর্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্ণাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি।।"

(ভাঃ ১২।১৩।২)

পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দর-গিরির প্রস্তরাগ্রঘর্ষণজনিত-সুখ-হেতু নিদ্রালু কূর্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ুসমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুক। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির

সংস্কারলেশ অদ্যাপি অনুবর্তনবশতঃ ক্ষোভচ্ছলে সমুদ্রজলরাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্তমান রয়েছে—কখনও নিবৃত্ত হচ্ছে না।

ভাগবত ১২শ স্কন্ধের সেই বিচারে মন্দার-রূপ জগন্মণ্ডলকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। জগৎ আলাদা ছিল না, ভগবৎপৃষ্ঠে লীন হয়েছিল, বামনদেব দ্যাবাপৃথিবীকে পদদ্বারা আক্রমণ, রামচন্দ্র রাবণকে শরদ্বারা আঘাত করেছিলেন; আর কল্কি অধার্মিককুলকে অসি দ্বারা বিনাশ করবেন। চার যুগে এই দশ অবতার। অবতারী—স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র।

'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।

এই বিচারে সেই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের কথা পাই। তাতে বিশেষ রস মধুররসের বিচার পাই। তদন্তর্গত সকল রস। অন্য কোন লীলায় এই রসটি পাই না। বৎসল রসের বিচার কিছু কিছু পাই রামচন্দ্রে। যেমন দশরথ রাজা পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করার ব্যবস্থা করেছিলেন, কৌশল্যা প্রধানা মহিষী হলেও তিনি কৈকেয়ীর প্রতিজ্ঞা রক্ষণার্থ বাৎসল্য-রসসেবা হতেও ন্যূনাধিক বঞ্চিত হলেন; কিন্তু নন্দের বাৎসল্য কি প্রকার। নন্দ স্বীয় নন্দন কৃষ্ণের কিরূপ আসক্তি ও সেবা–প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। দশরথের রামসেবা আর বসুদেব-নন্দের এই দুইটির তুলনা করলে দেখা যায়, দশরথ স্বীয় প্রতিজ্ঞা—নিজবাক্য-রক্ষণার্থ প্রিয়পুত্র স্বয়ং বিষ্ণু রামকে রাজ্য হতে অবসর দিয়ে বনে পাঠিয়েছিলেন,—

"যঃ সত্যপাশপরিবীতপিতুর্নির্দেশং স্ত্রৈণস্য চাপি শিরসা জগৃহে সভ্যার্যঃ।
রাজ্যং শ্রিয়াং প্রণয়িনঃ সুহৃদো নিবাসং ত্যক্ত্বা যযৌ বনমসূনিব মুক্তসঙ্গঃ।।"

কিন্তু নন্দ তা করেন নি। যখন অক্রূর কংসবধের জন্য কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গেলেন, সেই সময় নন্দ কৃষ্ণকে ফিরিয়ে নেবার জন্য কতই না যত্ন করেছিলেন। কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় গিয়েছিলেন নন্দ কৃষ্ণকে ব্রজে ফিরিয়ে আনার জন্য কিরূপ ব্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু দশরথ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয়ে কৈকেয়ীর বাক্যানুসারে রামকে বনে পাঠিয়ে দিলেন। অবশ্য দশরথ রামের জন্য নিজ প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু বৎসল-রসের কি পরিমাণ ক্ষতি হল, সাধুগণ বিচার করুন। নন্দের ও দশরথের বাৎসল্য আলোচনা করলে দেখা যায়—দশরথ বিধিবাধ্য হয়ে রামকে সিংহাসন হতে অবতরণ করিয়ে বনে পাঠালেন, আর নন্দ ব্রজে বাৎসল্যরসে সর্বতোভাবে পুত্র-সেবায় যত্ন করলেন। তাহলে রামচন্দ্রের উপাসনাকারী দশরথ রামসেবায় বিচলিত হন, কিন্তু নন্দের কৃষ্ণসেবায় আদৌ বিচলন দেখা যায় না।

কৃষ্ণ দ্বাদশরসের একমাত্র আশ্রয়। কেউ বলেন, রামই ত' কৃষ্ণ, তখন রামের উপাসনাতেই কাজ মিটবে; কিন্তু দেখুন, দণ্ডকারণ্যবাসী ষাট হাজার ঋষি বহুকাল তপস্যা করে রামের অপূর্ব রূপলাবণ্য ও অগণিত গুণগণ দর্শনে প্রোৎসাহান্বিত হয়ে যখন

বিচার করলেন, এমন সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষকে আলিঙ্গন করাই কর্তব্য—মধুররতি-বিশিষ্ট হয়ে তাঁকে পেতে পারলেই ভাল, তদুত্তরে সর্বরসাশ্রয় রামরূপী কৃষ্ণ বললেন—'আমি একপত্নীব্রতধর, আমার দ্বিতীয়পত্নী গ্রহণের উপায় নেই, কেননা সীতা একপতিব্রতা'। সীতা রাবণের যত্ন-মধ্যে প্রবিষ্ট হন নি। শূর্পনখা প্রভৃতি যখন রামের নিকট সেই রকম বিচারে আগ্রহান্বিত হয়েছিল, তখন রামচন্দ্র তাদিগকে স্বীকার করেন নি, কেননা তাঁর (রামচন্দ্রের) একমাত্র পত্নী সীতা, সুতরাং দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণকে তাঁর প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল। তখন পুরুষশরীর তাপসগণ জন্মান্তরে স্ত্রীদেহ—গোপীগর্ভে জন্ম লাভ করে কৃষ্ণসেবায় অধিকার লাভ করেছিলেন।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'

যদি কোন আত্মা ঐ প্রকার বিচারে ভগবানের সঙ্গে মধুররতিতে আগ্রহান্বিত হন, তাঁর নিত্যা সুপ্ত প্রকৃতি উদিত হয় যে, ভগবান্‌ই একমাত্র পতি, তাঁকেই পাওয়া দরকার, তবে পুনরায় ফিরে গিয়ে গোপীগর্ভে নিত্যজন্মলাভ করে কৃষ্ণপাদপদ্ম পেতে হবে,— তাপসদেহ বা অন্য কোন অনিত্য দেহে তাঁকে পাবার উপায় নাই।

যেমন মৎস্যাবতারে দেখতে পাওয়া যায়—'শল্কসীম্নি জলধিঃ অলীয়ত।' 'শল্ক' মানে আঁইস। তাতে জলধি লয় প্রাপ্ত হয়েছে। মৎস্যাবতারে ভগবান্ জুগুপ্সারতি প্রদান করেছেন। সত্যব্রতরাজা কৃতমালা নদীতে তর্পণ করছিলেন। তাঁর হাতে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য এসে উপস্থিত হল। তাতে অপবিত্রবোধে জুগুপ্সারতির উদয় হল। 'আমিষস্পর্শ হল' এই বিচারে সেটি ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু বিষ্ণু বললেন,—আমি ক্ষুদ্র নই, বৃহদ্বস্তু—মূল বস্তু। সুতরাং সত্যব্রত তাঁকে নিজের কমণ্ডলুতে রাখলেন। তখন বিষ্ণু তাঁর ব্যাপকতা-ধর্ম দেখাবার জন্য ক্রমে ক্রমে বৃহৎ হতে থাকলেন। তখন সত্যব্রত তাঁকে রাখতে না পেরে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন, ক্রমে বৃহৎসমুদ্রেও কুলায় না। তখন সত্যব্রত রাজা তাঁর প্রভাব দেখে তাঁকে নারায়ণ জেনে স্তব করতে থাকলেন। সত্যব্রতের হিতকামনায় ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁকে বললেন,—"অদ্যাবধি সপ্তমদিবসে লোকত্রয় প্রলয়সমুদ্রে নিমগ্ন হবে, তখন আমার প্রেরিত এক বিশাল নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হবে। তুমি সমস্ত ওষধি, বীজরাশি, সপ্তর্ষি এবং সমস্ত প্রাণিগণের সহিত মিলিত হয়ে ঐ নৌকায় আরোহণ করে প্রলয়সমুদ্রে নির্ভয়ে বিচরণ করবে। যখন প্রবল বায়ুবেগে ঐ নৌকা অতিশয় কম্পিত হবে, তখন উহাকে আমার শৃঙ্গে বেঁধে দেবে। আমি ব্রাহ্মী নিশা অবসান পর্যন্ত প্রলয়সমুদ্রে বিচরণ করবো।"

ব্রাহ্মী নিশায় হয়গ্রীব অসুর বেদজ্ঞান হরণ করায় মৎস্যদেব তাকে বিনাশ করে বেদ উদ্ধার করে 'হয়গ্রীব'-নাম ধারণ করেছিলেন। এটি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হয়েছিল। আর সত্যব্রতের সঙ্গে লীলা চাক্ষুষ মন্বন্তরে।

মৎস্যাবতারে জুগুপ্সারতির পরিচয় পাওয়া যায়। জুগুপ্সারতি দুই প্রকার,—একটি প্রায়িকী আর একটি বিবেকজা। জুগুপ্সারতিতে সামগ্রী সম্মেলনে বীভৎস রসের উদয় হয়েছে।

কূর্মের অবতারের কথায় আমরা জানি—"এক সময় দুর্বাসা দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্মান করে একটি মালা প্রদান করেন, তিনি সেটি ঐরাবতের স্কন্ধে স্থাপন করেন। ঐরাবত মদমত্ততা হেতু সেই মালাটি নিয়ে পদদলিত করে ফেলে। তা দেখে দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে অভিসম্পাত প্রদান করে বলেন—"তোমার স্বারাজ্যলক্ষ্মী বিদূরিত হোক"। তখন দেবগণ শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পরমেষ্ঠীর নিকট সকল বৃত্তান্ত জানালেন। ব্রহ্মা দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন করে সমাহিতচিত্তে বিবিধ বৈদিক বাক্য-দ্বারা ভগবানের স্তব করতে থাকলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের সমক্ষে আবির্ভূত হলেন এবং দৈত্যগণের সহিত কৌশলে সন্ধিস্থাপন করে মন্দর-পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকীকে রজ্জু করে ক্ষীর-সাগর মন্থন করবার উপদেশ দিলেন। দেবগণ ভগবানের উপদেশানুসারে দৈত্যরাজ বলির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে দেব-দানব মিলিত হয়ে মন্দরপর্বত নিয়ে সমুদ্রের দিকে চললেন। কিন্তু অত্যন্ত গুরুভারবশতঃ পর্বত বহন করতে না পেরে পথিমধ্যেই সেটি পরিত্যাগ করলেন। তাতে অনেক দেব-দানবের প্রাণ বিনষ্ট হল। তখন পরম করুণ ভগবান্ গরুড়ধ্বজ্ সেখানে আবির্ভূত হয়ে কৃপাদৃষ্টি-দ্বারা মৃতব্যক্তিগণকে পুনর্জীবিত করে একহাত দিয়ে অবলীলাক্রমে মন্দরপর্বত তুলে নিয়ে সমুদ্রে স্থাপন করলেন। তখন বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করে মন্দরপর্বতের চতুর্দিক বেষ্টন করা হল। শ্রীহরি কৌশলে মদোন্মত্ত দৈত্যগণ বাসুকির অগ্রভাগ এবং দেবগণ পুচ্ছদেশ ধারণ করলেন। মহা উদ্যমে মন্থনকার্য আরম্ভ হল; কিন্তু পর্বত আধারশূন্য হওয়ায় নিম্নগামী হয়ে সলিল-মগ্ন হয়ে গেল। তখন কূর্মদেব নিজপৃষ্ঠে মন্দরকে স্থাপন করলেন। পুনরায় মন্থন চলতে থাকলে প্রথমে হলাহল বিষ উঠলো। তখন সকলে মিলে সদাশিবের শরণাপন্ন হলেন। আশুতোষ লোকপাবনার্থ সেই হলাহল পান করে 'নীলকণ্ঠ' নাম ধারণ করলেন। তাঁর কথায় আছে,—

"নৈতৎসমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্।।"

বিষটি তিনি গ্রহণ করলেন, তাতে তাঁর কোন অসুবিধা বা কোন অমঙ্গল হয় নি। বিষপান যেমন নীলকণ্ঠেই সম্ভব—অন্যের পক্ষে মৃত্যুর কারণ, তদ্রূপ ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা—কৃষ্ণচরিত্র যদি অসমর্থ অবিবেচক-সম্প্রদায় আলোচনা করেন, তবে তাঁদের অসুবিধা হবে। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ঐরকম ভোগবুদ্ধি করলে সর্বনাশের মধ্যে পতিত হবেন। অরুদ্র হলে—হরিভক্তিলাভের যোগ্যতা অর্জন না করে ভক্তি পেয়েছি

বিচার করলে দুর্দৈব জানতে হবে। অনেকে বিচার করেন, মহাদেব যখন ভবানীভর্তা, তখন তিনি ভোগী—যেরূপ বিচার চিত্রকেতু করেছিলেন। মহাদেবের ক্রোড়ে দেবীকে বসে থাকতে দেখে চিত্রকেতু উপহাস করেছিলেন। তাঁর বিচারে ভুল হওয়াতে অপরাধ হয়েছিল। মহাদেব ভোগী নন। কিন্তু যাঁরা অরুদ্র—ঈশ্বর নন, তাঁরা রুদ্রের অনুবর্তন করলে অসুবিধা হবে। মহাদেবের ন্যায় সংযত না হলে কৃষ্ণচরিত্রকে ব্যভিচারপূর্ণ মনে করবে। মন যদি সেবা করার বদলে সেবা গ্রহণ করে বসে, তাহলে সর্বনাশ। এজন্য বলেছেন যে, মনের দ্বারাও কদাপি ওরূপ কথায় প্রবিষ্ট হবে না। কেন না, অরুদ্রের মন দুর্বল---সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। এজন্য রাগাগোবিন্দের কথা ভাগবতে আবরণ করে রেখেছেন। রাধিকার নাম বা গোপীর নাম বর্ণন করেন নি, কেবল ক্রিয়াকলাপ বলেছেন মাত্র—ভোগিসম্প্রদায়ের ওটা জানা হলে, তারা অসুবিধায় পড়বে এই জন্য।

মহাদেব যে বিষ পান করেছিলেন, সেটা এত তীব্র যে, তাঁর পানকালে হাত থেকে কিঞ্চিৎ বিষ পড়ে গিয়েছিল, সেটাই গ্রহণ করে বৃশ্চিক, সর্প, দন্দশূকাদি এত তীব্র বিষধর হয়েছে। তারপর সমুদ্র থেকে কতকগুলি বস্তু উঠলো। সুরভিগাভী উঠলে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যজ্ঞের হবির নিমিত্ত উহা গ্রহণ করলেন। তারপর উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব উঠলে ভগবানের শিক্ষানুসারে ইন্দ্র উহা বলিকে প্রদান করলেন। ক্রমে ঐরাবতাদি অষ্টদিগ্‌গজ, অভ্রমু প্রভৃতি অষ্টদিগ্ হস্তিনী, কৌস্তুভমণি, পারিজাত, অপ্সরাসকল এবং রমাদেবী আবির্ভূত হলেন। কৌস্তুভমণি ও লক্ষ্মীদেবীকে ভগবান্ বিষ্ণু গ্রহণ করলেন। বারুণিনাম্নী সুরা উঠলে অসুরেরা উহা গ্রহণ করলো। ঐরাবত, পারিজাত, অপ্সরা প্রভৃতিকে ইন্দ্র গ্রহণ করলেন। পরিশেষে বিষ্ণু-অংশ-সম্ভূত ধন্বন্তরী অমৃতকলস হাতে নিয়ে উঠলেন। দেব-দানব-মধ্যে অমৃত নিয়ে কলহ উপস্থিত হলে ভগবান্ মোহিনীরূপ ধারণ করে অসুরগণকে বঞ্চনা করে দেবগণকে অমৃত বন্টন করে দিলেন। তাতে বিস্ময় রতি। অদ্ভুত-রসোদয় দেখা দিল। বিষ্ণুর মোহিনী মূর্তি বিস্ময়রতির কারণ। কেবল রাহু দেবচিহ্ন ধারণ করে চন্দ্রসূর্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে অমৃত পান করছিল। ভগবান্ উহা জানতে পেরে চক্রদ্বারা রাহুর শিরশ্ছেদন করলেন। কিন্তু অমৃত-পানহেতু তার মস্তক অমরত্ব-প্রাপ্ত হল। শরীর মস্তক থেকে ভিন্ন হয়ে পড়ে গেল। কোন কোন পুরাণের মতে ঐ শরীরটি 'কেতু' হল।

ভাগবতের শেষাংশে কূর্মদেবের একটি প্রণাম-মন্ত্র আছে—

"পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়না-
ন্নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তুবঃ।
যৎ সংস্কারকলানুবর্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনির্ধেনাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি।।"

(ভাঃ ১২।১৩।২)

পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্রঘর্ষণজনিত সুখহেতু নিদ্রালু কূর্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ু-সমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুক। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির সংস্কারলেশ অদ্যাপি অনুবর্তনবশতঃ ক্ষোভচ্ছলে সমুদ্রজলরাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্তমান রয়েছে, কখনও নিবৃত্ত হচ্ছে না এই কূর্মদেবের লীলায় অদ্ভুতরসের পরিচয় পাওয়া যায়।

কূর্মদেবের নিঃশ্বাস হতে বেদ সংরক্ষিত হয়। অর্থাৎ আধ্যক্ষিকতা-দ্বারা বৈদিকজ্ঞানের অপব্যবহার হলে কূর্মদেব তা থেকে রক্ষা করেন। কূর্মদেবের বিচিত্রতা সকলের বুঝা কঠিন। অসুরগণ বুঝতে পারে না। তারা ভোগরত। দেবতারা যা ভোগ করেন, সেটা স্বীকার করেন ভগবৎসেবাকে মুখ্য জ্ঞান করে। লক্ষ্মীকে তাঁরা নারায়ণ ভোগ্যজ্ঞানে নারায়ণকেই দান করেছিলেন।

বরাহদেব-ব্রহ্মার নাসা হতে উদ্ভূত। তিনি ভয় রতিতে ভয়ানকরসের প্রকাশ-মূর্তি। স্বায়ম্ভুব মনু নিজভার্যা শতরূপার সঙ্গে জন্মগ্রহণ করে জন্মদাতা ব্রহ্মাকে নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তাহা মনুকে তদীয় পত্নীতে প্রজা উৎপাদনের আদেশ দিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রলয়জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করায় ব্রহ্মা তদ্বিষয়ে চিন্তা করছিলেন। এমন সময় তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ একটি বরাহমূর্তি প্রকাশিত হয়ে ক্ষণমধ্যে হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করে গর্জন করতে করতে জলমধ্যে প্রবেশ করে দন্তদ্বারা পৃথিবীকে রসাতল হতে উদ্ধার করলেন। ইনি হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করেছেন। 'হিরণ্য'-মানে সুবর্ণ; যারা সর্বদা ধন-সংগ্রহে ব্যস্ত---lucre hunter, তারা হিরণ্যাক্ষ। আর 'হিরণ্যকশিপু' কনক-কামিনী দুটিই সংগ্রহে ব্যস্ত। তাকে বধ করবার জন্য নৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইনি বৎসলরসের প্রকাশমূর্তি। যাঁরা ভগবদ্ভজনে প্রয়াসবিশিষ্ট, তাঁদের বিঘ্ন উৎপাদনকারী শুভাশুভ কর্মসকল নৃসিংহদেব বিনাশ করে দেন। নৃসিংহদেব ভক্তবৎসল, তিনি প্রহ্লাদের যাবতীয় ভজনবিঘ্ন বিনাশ করে সর্বদা রক্ষা করে থাকেন। প্রহ্লাদ বৈষ্ণবজগতে গুরুর কার্য করেন।

আলম্বন-বিচারে বিষয় ও আশ্রয়—দুটি কথা আছে। সেবক প্রহ্লাদ---আশ্রয়, আর নৃসিংহদেব---বিষয়। মাদ্রাজে পার্থসারথির মন্দিরে পার্থসারথীর আশ্রয় গরুড়কে, রামচন্দ্রের আশ্রয় মারুতিকে এবং নৃসিংহদেবের আশ্রয় প্রহ্লাদকে অনেকটা দূরে স্থাপন করেছে। তথায় বিষয়-আশ্রয় অনেক ব্যবধান আছে। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়-আশ্রয়-বিবেক দশমে পাই। ভগবান্ বিষয় ও ভক্ত আশ্রয়। তাঁরা সমান আশ্রয়যুক্ত। যেমন বার্ষভানবী কৃষ্ণের সঙ্গে একসিংহাসনে অবস্থান করছেন, কিন্তু গৌরববিচারে বিষয়ের স্থান পরমোচ্চ। অন্যত্র বিষয়াশ্রয় সম্ভ্রমজন্য দূরে (respectable distance-এ) অবস্থিত। মাদ্রাজে লক্ষ্য করেছি—কৃষ্ণ অর্জুনের সারথী, কিন্তু এটা ঐশ্বর্য প্রধান বিচারে লোক-ভ্রান্তির জন্য। নৃসিংহদেবের যে বাৎসল্যবিচার, তাতে ঐশ্বর্যপ্রাধান্য থাকলেও বৎসলরসের প্রকাশমূর্তি নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে প্রচুর পরিমাণে নিকটে

এনেছিলেন। প্রহ্লাদের নির্ভরশীল সেবায় স্বীয় সেবনযোগ্যতার অভাব নেই। তা হলেও এটি গৌরববিচারযুক্ত। কিন্তু শ্রীদামাদি সখাগণ কৃষ্ণের স্কন্ধে পদস্থাপন করে তাল পেড়ে থাকেন, কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট দেন। সমান ও শ্রেষ্ঠতা বিচার করতে গিয়ে সেবার বৈক্লব্য-সাধন কর্তব্য নয়। সেবার সুষ্ঠুতা দেখা দরকার। সম্ভ্রমবিচারে সেব্যকে ন্যূনাধিক বঞ্চনা করা হয়। মধুররস মুখ্যতম, বৎসলরস মুখ্যতর আর সখ্য মুখ্য। এই গুলিতে বিপ্রলম্ভের বিচার প্রবল। আর শান্ত, দাস্য, গৌরবসখ্যে গৌরবভাব মিশ্রিত। সেবক যদি বেশী স্বতন্ত্রতা (latitude) না পান তবে সেব্যের পূর্ণসেবা করতে অসমর্থ হন। বেশী ঘনিষ্ঠতা না থাকলে সব রকম সেবার যোগ্যতা হয় না।

নৃসিংহদেবে বৎসলরতিতে বাৎসল্যরস; প্রহ্লাদের বাৎসল্যরসে নৃসিংহাবির্ভাব; উহা মুখ্যরসের অন্তর্গত। কিন্তু মৎস্য-কূর্ম-বরাহের রস গৌণ। কিন্তু গৌরসুন্দর রাম, কৃষ্ণ ও নৃসিংহদেবের ভুজষটক গ্রহণ করেছিলেন। গৌররাম, গৌরকৃষ্ণ ও গৌরনৃসিংহ হয়েছিলেন। অন্যপ্রকারবিচারে কৃষ্ণ, বলদেব ও নিজের ভুজষটক প্রকাশ। দুবার দেখিয়েছেন। এর বিশেষত্ব আছে। এজন্য মুখ্যরস।

শ্রীবলদেবের হাস্যরতিতে হাস্যরস। বামনে সখ্যরতি ও সখ্যরস। বামনদেব বলিরাজার নিকট ত্রিপাদ্‌ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি জগতের সহিত বন্ধুত্ব করবার জন্য এসেছিলেন। এক সখা অপর সখার কিছু উপকার করেন। কিন্তু কামদেব স্বয়ং সখ্য স্থাপনে আসছেন। এটা বলি আগে বুঝতে পারেন নি। তিনি দান করতে বসেছেন; কিন্তু শুক্রাচার্য, যিনি অসুরদের পুরোহিত ছিলেন, তিনি দান করতে নিষেধ করলেন,—

"ত্রিবিক্রমৈরিমাল্লোঁকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি।
সর্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূর বর্তিষ্যসে কথম্।।"

তিনি বলিকে বলছেন, ভগবান ভিক্ষুক-সজ্জায় এসেছেন, তাঁকে বুঝতে পাচ্ছ না। কিন্তু দ্যাবা পৃথিবী—তোমার যা সম্পত্তি আছে, তাতে কুলোবে না, সব চলে গেলে বেকার হবে। যখন পা বিস্তার করবেন, তখন দুই পায়ে সব গ্রহণ করে নেবেন, তৃতীয় চরণের স্থান দিতে পারবে না। তোমার সব গেলে থাকবে কোথায় অর্থাৎ বলির সব গেলে শুক্রাচার্যকেও বেকার হতে হবে। এজন্য বলছেন—দান করে কাজ নেই। বামনদেব—সখ্যরসযুক্ত। তিনি বলিকে কেবল স্বর্গ মর্ত্য দেখিয়ে উপকার করছেন না, বৈকণ্ঠপর্যন্ত নিয়ে যাবেন। সেখানকার যা কৃত্য, তাও করাবেন।

বলি দুই প্রকার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বস্তু—পার্থিব ও আমুষ্মিক সম্পত্তি, যাতে ভোগময়ী চিন্তা প্রবল—সব দিয়ে দিলেন। তখন ভগবান্ তৃতীয় পদ দেখালেন। সেখানে উপাধি নেই। নিরুপাধিক হয়ে হরিসেবা কর। কামদেব সেবা নিতে বক্ষে তৃতীয়পদ দিলেন। অনাত্মবস্তুতে যে অধিকার, যাতে ষষ্ঠী ও প্রথমার প্রয়োগ—সব নিলেন। ভগবান্ দুটি

পা দিয়ে ঐগুলি চাপা দিয়ে তৃতীয় অবস্থার নিজত্ব—আত্মা পর্যন্ত নিয়ে পদসেবায় নিযুক্ত করলেন। এখানে সখ্যরসের সুনির্মলতা এ রকম সখার ভাব অন্য জায়গায় নেই, এখানেও মুখ্যরসাশ্রয়।

পরশুরাম ক্রোধরতিতে রৌদ্ররসের প্রকাশিমূর্তি। দশটি অবতারের মধ্যে সাতটিতে গৌণরস আর তিনটি অবতারের মুখ্যরস। নৃসিংহদেব বৎসল, বামনদেব সখ্য আর বুদ্ধ শান্তরস প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধের শান্তরস জড়ে ভোগবুদ্ধিরহিত হয়ে যাওয়া। এটিও মুখ্যরসের অন্তর্গত, তবে রসের মূর্তি নেই। নিজের চেষ্টায় সেবা না করে অজ্ঞতামুখে সেবা। ভৃত্য বেশ বুঝতে পারে—সেবা করছি। কিন্তু শান্ত-রতির সেবক বুঝতে পারে না, অথচ সেবা করে। আমি সেবক—এ উপলব্ধি অস্ফুট। এ জন্য শান্তকে রসশ্রেণীর মাঝামাঝি বলা হয়। মুখ্যের আদিম অবস্থা দাস্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে, গমনপথে এই শান্তরস। কিন্তু শোকরতি থেকে যে কারুণ্য, সেটি রামচন্দ্রে অত্যন্ত প্রবল। শান্তরতিতে জগতের অহিংসার জন্য করুণাপ্রকাশ, তাতে শোকরতির আমেজ সূক্ষ্মভাবে পাওয়া যায়। যেমন শাক্যসিংহ তিন পা ওয়ালা (একটি মাথা ও দুটি পা—এই তিনটি) একটি বৃদ্ধকে দেখলেন। বৃদ্ধটি চলতে পারে না, তাতে একটু শোক হল—আমি পৃথিবীতে থাকতে পারবো না, এ অভাব দূর হয় কিসে? পার্থিবভোগ ত্যাগ করে অহিংসা হয়ে তপস্যা করলে শোকরহিত অবস্থা হয়। এখানে অহিংস-নীতির প্রচার করলেন। কেউ কেউ এখানে জুগুপ্সারতিতে জাত বীভৎস-রসও বিচার করেন।

পরশুরামের ক্রোধরতিতে রৌদ্ররস। গাধিতনয় বিশ্বামিত্র বলেছিলেন,—"ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য হওয়া উচিত, politics জিনিষটা intelligence-এর উপরে উঠবে। যাদের জড়জগতের জ্ঞানে বীতস্পৃহ হবার চেষ্টা, তাদের জব্দ করে দিতে হবে, তাদের দরিদ্রতা দেখিয়ে বড় হব। ক্ষাত্রধর্ম ব্রহ্মণ্যধর্মের উপর থাকবে।" কিন্তু ব্রাহ্মণগণ—মাথা—বুদ্ধি। তাঁদের বুদ্ধি না নিলে বাহুর (ক্ষত্রিয়ের) দুর্গতি হয়।

কার্তবীর্যার্জুন আরা জেলার সাসারাম নামক স্থানে রাজ্য করতো। তার হাজার বাহু ছিল। সহস্ররাম (হাজার রকমের ভোগবুদ্ধি) হতে 'সাসারাম' হয়েছে। কার্তবীর্যার্জুন জমদগ্নির কামধেনু কেড়ে নিয়েছিল। তাতে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে একুশবার ক্ষত্রকুল ধ্বংস করেছিলেন। তখন বিচার হয়েছিল,—

"ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্"

রামচন্দ্রের শোকরতিতে করুণরস। বলদেবের হাস্যরস। প্রলম্বাসুর মনে মনে অহঙ্কার করেছিল, কৃষ্ণ ও বলদেবকে মেরে ফেলবে। সে গোপরূপ ধারণ করে রামকৃষ্ণের গোচারণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। সর্বদর্শী ভগবান্ তার উদ্দেশ্য জানতে পেরেও তাকে বধ করবার ইচ্ছায় বন্ধু বলে স্বীকার করে ক্রীড়া আরম্ভ করলেন। সেই ক্রীড়ায় বিজেতৃগণ

পরাজিতের স্কন্ধে আরোহণ করতেন। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে শ্রীদামকে এবং প্রলম্বাসুর বলদেবকে বহন করতে থাকলেন। প্রলম্বাসুরের মতলব হয়েছিল, বলদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অগোচরে নিয়ে গিয়ে সংহার করবে, কিন্তু বলদেব বজ্রমুষ্টিতে তার মস্তকে আঘাত করে তার প্রাণ সংহার করলেন। প্রলম্বাসুর—কপটতা। ধর্মের নামে গোপনে ব্যভিচার, অর্থ-সংগ্রহ, কপটতাক্রমে সাধুত্বপ্রচার প্রলম্বাসুরের কৃত্য। বলদেব সেটা বিনাশ করে থাকেন। সুতরাং এখানে হাসির কথাই বটে। যাঁর রূপবৈভব হতে মৎস্যাদি অবতারসকল উদ্ভূত, তাঁতে জড়জীব মনে করে মারবে। অভক্ত প্রলম্বাসুর ভক্তের সজ্জা নিয়ে বলদেবকে সংহার করে কংসের উপকার করবে মনে করেছিল। তাতে হাস্য রসের উদয় হয়। যার যা ক্ষমতা নেই, সেটা প্রকাশের চেষ্টায় হাস্য উদিত হয়।

কল্কির উৎসাহরতিতে বীররস। তিনি অধার্মিককুলকে ধ্বংস করেন। অধার্মিকগণের বিচার—ধর্ম নাশ করবে, ধর্মের প্রসার ধ্বংস করবে—খাবে দাবে নরকে যাবে। তখন উৎসাহরতির দরকার হয়।

"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্যাত্তত্তৎকর্মপ্রবর্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তোঃ যড়্ভির্ভক্তি প্রসিধ্যতি।।"

উৎসাহরতিযুক্ত হয়ে কল্কিদেব অধার্মিককুল বিনাশ করেন। উৎসাহরতির দ্বারা বীররসের আবাহন করে থাকেন। অধর্মকেধ্বংস করতে উৎসাহ প্রয়োজন। ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আরাধ্য। যিনি সকল অবতারাবলীর মূল আশ্রয় অর্থাৎ বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি, চতুর্ব্যূহ, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার এবং মৎস্যকূর্মাদি বৈভবাবতারসমূহ যাঁর অংশ-কলা, ইহাদের সকলের ভগবত্তা যাঁ হতে, সেই অখিল রসামৃতমূর্তি কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র আরাধ্য-বস্তু। বৃন্দাবনে তাঁর লীলার পরম চমৎকারিতা ও পূর্ণতা প্রকাশ হয়েছে। যাঁরা সাধারণ কাব্যামোদী বা দর্শনামোদী, তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টায় আবদ্ধ না থেকে বৃন্দাবনে গোপীনাথের ক্রীড়াগুলি আমাদের আলোচনা হোক। অগ্রজ বলদেব, শ্রীদামাদি সখাগণের সেবা-বিচার যাঁর প্রতি বিহিত, রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদির সেবাগ্রহাতিশয্য যাঁর জন্য, গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-যামুনসৈকত-কদম্ব প্রভৃতিরও সেব্য যিনি সেই নন্দনন্দনের ক্রীড়াগুলিই আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হোক।

"যৎকিঞ্চিৎ-তৃণ-গুল্ম-কীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকুলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ প্রকটীতং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সংস্পৃহেণ তদিদং সর্বং ময়া বন্দ্যতে।।"

কৃষ্ণের লীলার অনুকূল মুকুন্দদয়িত বস্তুসকল আমাদের পরমপূজ্য হোক, প্রকৃত তৃণ-গুল্ম-বিচারের হেয়ত্ব আমাদিগকে গ্রাস না করুক, বহির্জগতের বস্তুদর্শনের দ্রষ্টৃ

হিসাবে তাহাদের ভোগকর্তা আমি,—এই প্রকার যে সকল চেষ্টা আমাদিগকে সর্বক্ষণ গ্রাস করেছে, অহঙ্কার-বিমূঢ় করে যে দুর্দৈবে আবদ্ধ রেখেছে, তা হতে পরিত্রাণ নিজ চেষ্টায় হয় না। কারণ "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ক্রীড়াক্ষেত্র—শ্রীধামবৃন্দারণ্য সেই জিনিষটা কৃপা করে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেই আমাদের মঙ্গল। সেখানে সেব্য বিষয় এক, আর তাঁর পাঁচ প্রকার আশ্রয়জাতীয় সেবক। ইহজগতে সেবাবিমুখ হয়ে নিজে সেব্যভাবে বিরাজমান হেতু কর্মাগ্রহিতা, কিন্তু তার মূল্য অর্ধকপর্দক। কর্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয় পরিচালনায় নানা দোষযুক্ত অবস্থা এসে আমাদের সর্বনাশ করে। যাঁদের করুণায় আমাদের সকলের সর্বপ্রকার মঙ্গল ঘটে, তাঁদের করুণার আশ্রয় ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উপায় নেই। পঞ্চ প্রকার সেবকের সর্বক্ষণ অখিলরসামৃতমূর্তির নবনবায়মান সেবা ব্যতীত ইতর চেষ্টা নেই। পঞ্চরসরসিক ব্যতীত তাঁর সেবা আর কেউই বুঝেন না। এমন কি, স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব, যিনি সকলব্যূহ, অবতার, অন্তর্যামী প্রভৃতির একমাত্র মালিক মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত চতুর্ব্যূহতত্ত্ব, কারণ-গর্ভক্ষীরবারিতে অবস্থিত পুরুষাবতারত্রয় এবং মৎস্যাদিবৈভব অবতারসমূহ যাঁর অংশ, সেই বলদেব প্রভুরও সেব্য—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। যার ভগবত্তা হতে অন্যের ভগবত্তা প্রকাশিত হয়, সেই মূল পদার্থ স্বয়ং ভগবানই আমাদের একমাত্র আরাধ্য হউন।

ভগবানের পঞ্চপ্রকার সেবকগণের মধ্যে "ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা"—ব্রজবধূগণ যে সেবা করেছেন, তাই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁদের মত সেবা আর কেউ করেননি। যেমন উদ্ধব বলেছেন,—

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।"

শ্রুতিগণ বিশেষরূপে যাঁকে অনুসন্ধান করেন, সেই যে মুকুন্দ-পদবী পরম মুক্তাবস্থায়ও যিনি সেব্য, তাঁকে সেবা করবার জন্য গোপীসকল স্বজন পরিত্যাগ করতেও প্রস্তুত হয়েছিলেন। ব্রজের গুল্ম-লতা-ওষধি-সমূহের মধ্যে অবস্থান করলে গোপীপদরেণু লাভ ঘটে। বৃন্দাবনের তৃণগুল্মাদি চিন্ময়; সে সব আত্ম জগতের কথা অনাত্মজগতের কথা নয়। বৃন্দাবনের চিন্ময় ব্যাপারে ইহজগতের ব্যাপারের সাদৃশ্য থাকলেও উহা তা নয়। ইহজগতের ভোক্তৃ ভোগ্যাভিমানে যে জগদ্দর্শন হচ্ছে, তাতে বৃন্দাবনের চিন্ময় বস্তুগুলিকে দর্শন করতে গেলে প্রাকৃত সহজিয়ার ধর্ম হবে, অপ্রাকৃত সহজধর্ম হবে না।

"রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা"—ব্রজবধূগণ যেরূপে কৃষ্ণসেবা করেছেন,—তটস্থ হয়ে বিচার করলে জানা যায়, সেইটিই সর্বোত্তম।

ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোক "ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং" আমাদের আলোচ্য হোক। ভাগবতেই সকল শাস্ত্রের আলোচনা হয়েছে—ভাগবত

ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রয়োজন নেই, ভাগবতেই সব আছে, তাতেই সব পাব। "শুশ্রূষুভিঃ" বলে একটি বিষয় বলেছেন।

ভাবনাবর্ত্ম—মনোধর্মকে অতিক্রম করে যে অবস্থা, তাতে যে রসের উদয়, সেটি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে আস্বাদ্য। গুণজাত জগতকে অতিক্রম করে যে আস্বাদন, তাকেই রস বলে। তাতে পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা রসিক বা ভাবুক। নির্গুণ জগতের যে আংশিক ভাব, সেটি নয়। রসিকগণের কৃত্য ভাগবত আলোচনা করা। ভাবনাবর্ত্মকে অতিক্রম না করায় মনোধর্ম-জীবীর চিন্তাস্রোতে রজস্তমোগুণের মিশ্র ক্রিয়া প্রবলা থাকে। তাতে বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান হয় না। ভগবানের রস আস্বাদন ভাগবত না হলে হয় না। যিনি নির্বৃত, পরমানন্দে অবস্থান যাঁর, তাঁর হরিকথা ব্যতীত অন্য কার্য নেই। সর্বক্ষণই হরিকথা, নিদ্রাকালেও হরিকথা, জাগ্রতকালে আরও হরিকথা। 'কো নির্বৃতঃ' বিচারে উদাসীন হওয়া উচিত নহে। এমন কোন্ মূঢ় আছেন, যিনি হরিকথা পরিত্যাগ করে ইতরকথায় নিবিষ্ট থাকবেন। ভক্তিপথই কৈবল্যসম্মত পথ। ভক্তিরস-ভাগবত পড়া হলে আর অভক্ত থাকবে না, জড়রস থাকবে না, উজ্জ্বলরসে অধিকার হবে। শ্রীমদ্ভাগবতের মত পুঁথি জগতে আর নাই। এই একটা গল্পের কথা নয়; মানুষ যদি সত্য সত্য নিরপেক্ষ বিচারক হইয়া ইহার অনুধাবন করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, ভাগবতের মত গ্রন্থ জগতে হয় নাই ও হইবে না। আমরা যে কথা বলিয়া থাকি, সেই সংশয় নাস্তিক্য-নির্গুণ-ক্লীব-পুরুষ-মিথুন-স্বকীয়-পারকীয় বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষের কথা এই ভাগবত গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণলীলার কথা বিবৃত রহিয়াছে; কিন্তু তৎপূর্বে আর নয়টি স্কন্ধ রচনা করিবার কি প্রয়োজন ছিল? যে গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়—কৃষ্ণ-লীলা, সেই গ্রন্থ স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বেচ্ছাচারিতার কথা বলিবার জন্য তৎপূর্বে নয়টি স্কন্ধ স্থাপন করিলেন। তাহাতে সংশয়, নাস্তিক্য, নির্গুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয় বিচার প্রদর্শন করিয়া অপ্রাকৃত পারকীয় বিলাসের কথা দশম স্কন্ধে গোপীগীতা প্রভৃতিতে স্থানে স্থানে প্রদর্শন করিলেন। ভাগবত মহাপ্রভুর প্রকট-কালের পূর্বেও ত অনেকে পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা রূপানুগবর কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়া ভাগবত পাঠ করিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য—শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, ব্যবসায়ী যে ভাগবত ব্যাখা করেন, তাহাতে শ্রীরূপানুগ-পন্থায়—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উদ্দিষ্ট পন্থায় ভাগবতপাঠ আবৃত হয়। আমরা সেইরূপভাবে দশমস্কন্ধের বিবৃতি লিখিবার জন্য প্রস্তুত নই। অসংখ্য সহজিয়া সেইরূপ ভাবের ব্যাখ্যা বিবৃতি লিখিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন-পূর্বক পরের ও নিজের নরকের পথ পরিষ্কার করিতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত নিগম-কল্পতরুর গলিত ফলঃ—

নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃত-দ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।

'নিগম' শব্দে বেদ; সেই বেদ—কল্পতরু অথাৎ কল্পনা, সঙ্কল্পিত বা আকাঙ্ক্ষিত ফল প্রসবকারী। অভক্তগণ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কামনা বা সংকল্প করিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহাদের ভুক্তি-মুক্তিকাম নিরস্ত হইয়াছে—যাঁহারা ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা বা সংকল্প ঐরূপ কুরস বা নীরসযুক্ত বস্তু নহে। অন্যাভিলাষী কর্মী—বিকৃতরসের প্রার্থী আর নির্ভেদজ্ঞানী নির্বিশেষ নীরসের প্রার্থী; ভাগবত সেইরূপ কুরস বা নীরস যুক্ত ফল প্রসব করেন না। ভাগবতে বিষয় আশ্রয় ভাবের—সেব্য-সেবক ভাবের বিচার কিরূপে অত্যন্ত সঙ্কুচিত, ঈষৎ মুকুলিত, পুষ্পিত, বর্ধিত, পরিপুষ্ট ও প্রপক্ক অবস্থা লাভ করিয়া উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়। সেই সংশয়, নাস্তিক্য, নির্গুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয়, পারকীয় বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ পল্লবিত হওয়ায় ভাগবত কল্পতরুর ন্যায় সৌন্দর্য পিপাসাতুর ব্যক্তিগণের সঙ্কল্পের ফলপ্রদানকারী আর অন্য কোন প্রকার বৃক্ষ চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডে এমন কি, বিরজা ব্রহ্মলোকের অতীত বৈকুণ্ঠে পর্যন্ত নাই। যাহা পারকীয় বিচারের তারতম্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আমরা অপ্রাকৃতরূপের সেবা-পিপাসুগণের—রসিক ভাবুকগণের ভাগবতাস্বাদনের মধ্যেই দেখিতে পাই। যাঁহারা স্থায়ী ভাবভূমিকায় অবস্থিত আছেন, তাঁহারাই ভাবুক। স্থায়ী ভাবের সহিত চতুর্বিধ সামগ্রীর সম্মেলনে যে অপ্রাকৃত রসের উদয় হয়, সেই রসে যাঁহারা অভিষিক্ত—প্রাকৃত ভাবনার পথ বিশেষভাবে অতিক্রম করিয়া এক অপ্রাকৃত মহা চমৎকার প্রাচুর্যের ভূমিকায় বিশুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে যে রস আস্বাদিত হয়, সেই রসের যাঁহারা রসিক, তাঁহারাই এই নিগমকল্পতরুর ফল আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ অখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণ। 'আলয়ং'—লয়মভিব্যাপ্য—মুক্তাবস্থায়ও এই ভাগবত-রস আস্বাদ্য। মুক্তকুলই এই শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। মুক্তকুলশিরোমণি পরমহংস বৈষ্ণবগণের মুখে ভাগবত শ্রবণ না করিয়া যাঁহারা অনর্থযুক্ত ও অনর্থরক্ষণশীল ভৃতক ব্যক্তিগণের মুখে কেবল কাব্য, সাহিত্য, অনুস্বার, বিসর্গ প্রভৃতির বাহ্য বিচারে প্রমত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষ-হেতু ভাগবত শ্রবণের অভিনয় করে, সেই সকল প্রাকৃত সহজিয়া ভাগবতের নির্মলরস আস্বাদন করিতে পারে না; উহারা বিরস বা কুরসকেই 'রস' বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকে। শুকদেবাদির ন্যায় মুক্ত পরমহংস যখন ভাগবত কীর্তন করেন, তখন পরীক্ষিতের ন্যায় জীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় ব্যক্তি ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের রসে নিত্য রসিক হইয়া পড়েন।

আত্মবৃত্তি—পঞ্চবিধ-রত্যাত্মিকা। পঞ্চবিধ রতির দ্বারা পঞ্চবিধ রস প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণসেবা করাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চরস। শান্ত-রসটী প্রতিকূলভাব-বিহীন একটী নিরপেক্ষ অবস্থান-মাত্র। দাস্য-রস—কিয়ৎপরিমাণে মমতা-যুক্ত; সুতরাং তারতম্যবিচারে দাস্যরস শান্তরসের গুণ ক্রোড়ীভূত করিয়া শান্তরস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সখ্যরস আরও উন্নত; ইহাতে দাস্যরসের সম্ভ্রমরূপ কন্টক নাই। বরং উহাতে বিশ্রম্ভরূপ প্রধান অলঙ্কার বিরাজমান। বাৎসল্য রস—দাস্য-রস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; তাহাতে এতদূর মমতাধিক্য ঘনীভূতাকারে বর্ত্তমান যে, পরম বিষয়বস্তুকেও 'পাল্য' বা 'আশ্রিত' বলিয়া জ্ঞান হয়। মধুর-রস সর্বশ্রেষ্ঠ; তাহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য,—এই চারি রসের চমৎকারিতা পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত। এই পঞ্চবিধ-রতিতে শ্রীকৃষ্ণসেবাই আত্মার অপ্রতিহতা অহেতুকী নিত্যা বৃত্তি। জীবের আত্ম-স্বরূপবিচারে আমরা শুনিয়াছিঃ—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

শ্রুতিমন্ত্রে যে 'আত্মরতিঃ', 'আত্মক্রীড়ঃ' প্রভৃতি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই আত্মার নিত্য কৃষ্ণসেবা বৃত্তি সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। 'রন্‌জ'-ধাতু হইতে 'রতি'-শব্দ নিষ্পন্ন। 'রন্‌জ'-ধাতুর তাৎপর্য্য—'অনুরাগ' বা 'টান'। 'আত্মা' শব্দে 'আমি'; 'পরমাত্মা'-শব্দে 'পরম-আমি' অর্থাৎ প্রাভব ও বৈভব-শক্তিপূর্ণ কর্ত্তৃসত্তাধিষ্ঠানে কৃষ্ণের পক্ষেই সমগ্র পরম আমিত্বের নিত্যাভিমান। বিষয়বিচারে কৃষ্ণেরই 'পরম-আমি'-বিচার, আশ্রয়-বিচারে বিভুচৈতন্যের অধীন প্রভু-বাধ্য অনুচিৎ 'ক্ষুদ্র আমি'। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতি তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। বাস্তব-বস্তু—এক অদ্বিতীয়; তাহাই 'অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব' অর্থাৎ চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যযুক্ত অদ্বয়-তত্ত্ব। 'পরম-আমি'র বা বিষয়তত্ত্ব 'আমি'র স্বার্থ পূরণ করাই নিত্যাশ্রিত অস্মিতার নিত্য-বৃত্তি।

যেদিন ভূলোক হইতে আমাদের চিন্ময়ী ইন্দ্রিয়বৃত্তি গোলোকে নীত হইবে, যেদিন আমরা স্বরূপে মধুর রতিতে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিব, যেদিন সেই মুরলীধ্বনিতে আমাদের শুদ্ধচিত্ত আকৃষ্ট হইবে, সেদিন আমরা কেবল শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে ব্যাকুল হইয়া অপ্রাকৃত রাসস্থলীতে গমন করিব। তখন প্রাজাপত্য-ধর্ম আমাদিগকে টানিয়া রাখিতে পারিবে না এবং লোক-ধর্ম, বেদ-ধর্ম, দেহ-ধর্ম, দেহসুখ, আত্মসুখ, দুস্ত্যাজ্য আর্য-পথ, নিজ-স্বজনপরিজনাদির তাড়ন-ভর্ৎসন প্রভৃতি কিছুই আমাদিগের আকর্ষণের বস্তু হইবে না। আমরা জগতের যাবতীয় প্রতিষ্ঠাকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, স্বর্গসুখাদিকে আকাশ-কুসুমের ন্যায় নিরর্থক মনে করিয়া, মুক্তিকে শুক্তির মত জ্ঞান করিয়া অকিঞ্চনা গোপীর ঐকান্তিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। তখন ভগবানের শ্রীনাম-মধুরিমা শ্রীগুরুবাক্যের দ্বারা আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে; চেতন চক্ষুদ্বারা

ভগবানের শ্রীরূপ আমাদের নয়নপথের পথিক হইবে; সেই পরমাশ্চর্য্যরূপে আকৃষ্ট হইয়া আমরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইব—ভগবানের কথামৃতে লুব্ধ হইয়া ভগবানের সেবায় আকৃষ্ট হইব;—বাহ্যজগতের ভেজাল কথা, পচা কথা, পুরাতন কথা, হেয়ধর্মযুক্ত কথা আমাদিগকে আর প্রমত্ত করিবে না। আমরা নিত্যবৃত্তি লাভ করিয়া স্থায়িভাব রতিতে আলম্বন ও উদ্দীপনরূপ বিভাব এবং অনুভাবাদি সামগ্রীর মিলনে কৃষ্ণভক্তিরস প্রকটিত করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ করিতে সমর্থ হইব। সর্ববিধ অনর্থ নিবৃত্ত হইলে যে পরম পীঠ লাভ হয়, তাহাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম।

নিত্যসত্য—বাস্তবসত্য,—পরম-সত্য একমাত্র কৃষ্ণদাস্যেই আবদ্ধ। রসময় রসিক-শেখরের পাদপদ্মসেবায় প্রমত্ত জনগণের শ্রীচরণে কোন ভাগ্যবলে একবার চিরবিক্রীত হইতে পারিলে আমরাও সেই দুর্ল্লভাদপি-দুর্ল্লভ সেবায় অধিকার পাইব। সেদিন আমাদের কবে হইবে?
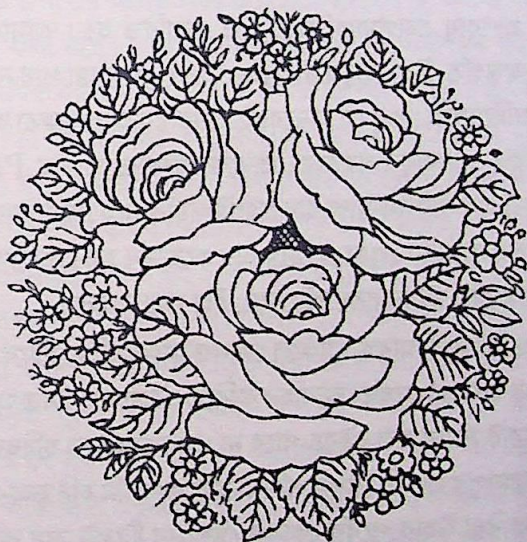
# চতুর্থ অধ্যায়

## ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে

### ১

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।

(শ্রীমদ্ভাগবত)

সাধন প্রণালীর মধ্যে ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়ামের কথা শুনা যায়। ধ্যানকার্যটী বিচারপুষ্ট অবস্থা। হিন্দী ভাষায় একটি কথা সচরাচর পারমার্থিকগণের মধ্যে শ্রুত হয়—"শোচ্না চাহিয়ে" অর্থাৎ চিজ্জগতের বিষয়ে ধারণা বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। শ্রৌতবাণী গ্রহণের যোগ্যতা আবশ্যক, ইহাকে 'ধারণা' বলা যায়। প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণবায়ু সংযমন ও প্রসারণ করা। প্রাণবায়ু যোগমার্গে সংযত ও প্রসারিত হয়। আমাদের নাসিক্যবায়ু পঞ্চমহাভূতের অন্তর্গত; উহা বায়ুর all-pervasive অবস্থা পায় না। বিষ্ণুই জীবের মুখ্যপ্রাণবায়ুর অধিদেবতা। শুধু যে মানবেরই প্রাণবায়ুর আবশ্যকতা আছে, তাহা নহে; জলচর প্রাণীদেরও প্রাণবায়ুর দরকার। প্রাণকে প্রাশ্চাত্ত্য ভাষায় Pneuma বলে। প্রাণ ধারণের জন্য শুধু নাসিকা-দ্বারা বায়ু গ্রহণই পর্যাপ্ত নহে। আমাদের জীবন ধারণের জন্য বায়ু ব্যতীতও অন্যান্য materials-এর প্রয়োজন হয়। সুতরাং বিষ্ণুর ইচ্ছা ও কৃপাতেই যে আমাদের জীবনধারণ হইতেছে, ইহা বলা বাহুল্য।

"মেপে নেওয়া" ধর্মে আবদ্ধ থাকিলে কোনও কালে সুবিধা হইবে না। চিজ্জগতের ব্যাপারে এই জড় জগতের মূর্খতা আবাহন করিতে হইবে না। "যত মত তত পথ" বা সকল প্রকার যাত্রাই সমান ফল হইতে পারে না। হাওড়া হইতে হরিদ্বারে যাইতে পথে লক্সার ও সাহারাণপুর প্রভৃতি ষ্টেশন পড়িয়া যাইবে। আমি যদি ভুল-ক্রমে হরিদ্বারের টিকেট ক্রয় না করিয়া উহার পূর্বের কোনও ষ্টেশনের টিকেট ক্রয় করিয়া বসি, তাহা হইলে মনে হরিদ্বারের কথা চিন্তা করিলেও ফল-কালে শেষ গন্তব্য ষ্টেশনে হরিদ্বারে পর্যন্ত যাওয়া যাইবে না বা পৌছান হইবে না।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।

যদি নিত্য বস্তুর সেবা না করি, তা' হ'লে অকিঞ্চিৎকর মানবজীবনের অপব্যবহার হ'য়ে গেল। আর ভগবৎসেবা করলে তার যথার্থ সার্থকতা হ'ল।

কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্তি, তাঁ'তে কোন রসেরই অভাব নেই। কৃষ্ণের সেবক জগতের অন্যান্য দেবতা কিম্বা বিষ্ণুর অবতারাবলীর যাবতীয় কথা সকলই পূর্ণভাবে জানেন। সেই কৃষ্ণ একমাত্র ভক্তের দ্বারাই সেবিত হন। কাল্পনিক জ্ঞানের দ্বারা সেই বস্তু পাওয়া যায় না। যাঁরা 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য'' শ্লোক শ্রবণ ক'রেছেন, তাঁ'রা জানেন—ঐরূপ জ্ঞানের দ্বারা অনন্ত কোটি জীবনে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-রাজ্যের দর্শন-লাভ ঘট্‌বে না। কায়মনোবাক্যকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করব না, নিজের স্বতন্ত্রতার অপব্যহার করব—এরূপ একটা বিষম ব্যাধি মানবজাতিকে গ্রাস ক'রেছে। তা' হতে মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

পূর্ণের অসম্যক্ বা অপূর্ণ-প্রতীতিকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা বলা হ'য়েছে। পরমাত্মার মধ্যে ''বুরা'' সত্য ও অসত্য সমস্ত সংশ্লিষ্ট করে ব্যাপক-বিচারে গ্রহণ করা হ'য়েছে। কিন্তু ভগবত্তার মধ্যে ''বুরা'' ঢোকান হয় না।

কেবল অসুবিধার হাত হ'তে ছুটি পাওয়াই মুক্তির লক্ষণ নহে। আরও বেশী কিছু চাই। মিথ্যা হ'তে ছুটি পাওয়াই যে মুক্তির কথা নয়। আমরা Positive accretion চাই। জড় জগতের অনভিজ্ঞতা ও অপ্রয়োজনীয়তার হাত হ'তে মুক্তি পাওয়াই আমাদের চরম কথা নহে। যিনি নিত্যলীলাময় বস্তু—বিলাসময় বস্তু, তাঁ'র বিলাসে রুচি না হ'লে আমরা ইহজগতের বিলাসে মত্ত হ'য়ে পাপ-পুণ্যে রত হই। যারা বদ্ধাবস্থা হ'তে মুমুক্ষু তা'রা ইহ জগতের অসুবিধাটুকুর হাত হ'তে কেবল মুক্তি পাবার জন্য চেষ্টান্বিত। কিন্তু মুক্ত কুলের আলোচ্য বিষয়ে প্রতীতি হয় না বলেই নানা মত ও নানা পথের বিচার এসে উপস্থিত হয়। অবিচারের হাত হ'তে মুক্ত হ'তে না পারা পর্যন্ত ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা—এই দোষ-চতুষ্টয়ে দুষ্ট হ'য়ে জীব মুক্ত-পুরুষগণের কথায় অধিক আস্থা স্থাপন ক'রতে পারে না। কেবল দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তির লক্ষণ যা'রা মনে ক'রেছে, তা'রা জগতের ত্রিতাপতাড়িত বদ্ধাবস্থার ধারণার বিচার করতে বসেছে। তা'দের দৃষ্টি অতি ক্ষুদ্র। আমরা কেবল তা'দের কথায় পড়িয়া জগতের পরপারে Absolute-এ যে সকল Positive বিচিত্রতা আছে, তা'র আলোচনা যদি না করি তা' হ'লে কি লাভ হ'ল? শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের এই শরীরের কথা বা মানসিক চিন্তাস্রোতের কথা আলোচনা করেন নাই। এই দুই শরীরের অতীত রাজ্যে যে নিত্য শরীরী পরিপূর্ণ বস্তুর সহিত পাঁচপ্রকার সম্বন্ধ বিশিষ্ট, সেই বিচিত্রতার বিষয়ের কথাই আলোচনা ক'রেছেন। ইহ জগতে থাক্‌তে থাকতেই আমরা সেই সকল কথা আলোচনা করব। তাতে প্রত্যেক চেতনই vitally interested। এ জগতে সকলেই সেব্য হইতে চায়—তাহাই অবৈষ্ণবতা। সেব্য ও সেবকের সহিত যোগসূত্রই সেবা বা ভক্তি।

অবৈষ্ণবতার মধ্যে ভক্তি আশ্রয় পান না। অবৈষ্ণব বিষ্ণুর সেবা করে না। অন্যাভিলাষিতায় থাকিবে, কৃষ্ণেতর বস্তুর কার্য লইয়া দিন কাটাইবে এবং ঐগুলিকেই ব্রহ্মবস্তু বলিয়া অভিমান করিবে---ইহা যেন অভক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিজ্ঞা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করিতে হইলে অপ্রাকৃত কাম- দেবের যে-কামনা তাহার অনুকূলে কার্য করিতে হইবে। কৃষ্ণ কাহারও পাল্কীর বেহারা নহেন। ঐ সকল কার্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপরই দেওয়া হইয়াছে। 'আমি কর্তা হইয়া শ্রবণ করিব, দর্শন করিব, কীর্তন করিব, স্মরণ করিব ও তপস্যা করিব' প্রভৃতি কর্মীর বিচার—অভক্তের বিচার। যখন নিজ কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্বক সকল কর্মের যাবতীয় চেষ্টা ভগবানের সেবার প্রতি নিযুক্ত হয়, তখনই সুবিধা হইবে।

ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।।

আমরা ধর্মকামী হইয়া সূর্যের, অর্থকামী হইয়া গণেশের, কামকামী হইয়া শক্তির এবং মোক্ষকামী হইয়া রুদ্রের উপাসনা করি। ঐসকল দেবতা আমাদের কামনায় যোগান দিবেন; সুতরাং তাঁহাদের সেবার নামে আমাদিগকেই সেব্য করিবার চেষ্টা হইতেছে। ভক্তির নামে তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিবার এই যে চেষ্টা তাহা অভক্তি। ভগবান্ কাহারও সেবা করেন না, তিনি সেব্য—সকলেরই সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন—পূর্ণমাত্রায় সেবা গ্রহণে একমাত্র তাঁহারই অধিকার। সকলেই কৃষ্ণের গোলাম।

কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে (সর্ব) নাশ।।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।

ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যাবার জন্যে সাযুজ্য বা সারূপ্যাদি মুক্তিবিচার মাটিয়াবুদ্ধিযুক্ত লোকের। এ'রা কৃষ্ণভক্তির কোন কথা বুঝ্‌তে পারে না। অভক্তি আর ভক্তি—এই দু'টো জিনিষ আলাদা। ভক্তি বা সেবা আত্মার বৃত্তি, তা'তে কোন প্রকার মল প্রবিষ্ট হয় না। বহির্ম্মুখদের এ সমস্ত শুন্‌তে বুঝ্‌তে অনেক দেরী। পারমার্থিক শিক্ষা-লাভের যোগ্যতার জন্য শ্রদ্ধারূপ elementary knowledge দরকার, যেমন এম. এ. পাশ না করলে Doctorate Thesis লিখতে দেওয়া হয় না তদ্রূপ। ভারতীয় সন্ন্যাস বিধিতে বিরজা-হোম করবার পরে সমস্ত দেবতা, পূর্বপুরুষ ও নিজের সমস্ত প্রাকৃত অভিনিবেশের শ্রাদ্ধ করবার পরে অধোক্ষজের সেবা লাভের যোগ্যতা হয়, বিরজা পার হ'য়ে যেতে হয়; নচেৎ অভক্তিকে 'ভক্তি' ব'লে ভ্রান্ত বিচার হ'য়ে যা'বে, দুধ আর চুণগোলা—ধান আর শ্যামাঘাস—শ্রৌত আর অশ্রৌত—বেদবিরোধি-

পন্থাকে একপ্রকার ব'লে মনে হ'বে। ''আমার বুদ্ধি বেশী, অন্যকে regulate ক'রবো—এটা বেদবিরুদ্ধ তর্কপথ। Challenging or assailing mood নিয়ে কোন কথা বলতে গেলে নিজের position-টাকে strong ক'রতে হয়। বহির্জগতের সকল বিচারের মূল্য শূন্য--অন্ধকপর্দ্দক, এটা না বুঝ্‌তে পারলে ভক্তির কথায় প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। এক একজন লোক রোজ ১০ গ্যালন ক'রে রক্ত খরচ ক'র্‌তে পারলে তবে হয়ত একজনকে ভক্তির কথা বোঝান' যায়। আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায় জগৎকে যা' দিচ্ছে, তা'তে জগতের কোন উপকারই হচ্ছে না। ভক্তি-জিনিষটা আধ্যক্ষিকগণের এত সহজে বুঝে ফেলবার জিনিষ নয়।

ভগবদ্‌ভক্তি বা ভগবদ্‌ভক্তের কৃপালাভ সামান্য জ্ঞানের কার্য্য নয়। ভক্তের সঙ্গে অভক্তকে সমান জ্ঞান ক'র্‌তে হ'বে না। মূর্খ-অমূর্খ মুড়ী-মিছরী 'পঠিতং অপঠিতঃ বা'—সব সমান নয়। যাঁ'রা এ দু'টোকে সমান জ্ঞান ক'র্‌তে যান, তাঁ'রা ভক্তি-অভক্তি বা ভক্ত-অভক্তের বিচার কখনও বুঝে উঠ্‌তে পার্‌বেন না। 'সবজান্তা'—শ্রেণীর লোকদের বহু তর্ক-বিতর্ক শোন্‌বার দরকারও আছে আবার একেবারে তা'দের বাদ দেবারও আবশ্যকতা আছে। পরজগতের কথা জান্‌বার—ভক্তি-লাভে যোগ্যতা পা'বার Passable mark পা'বারও ব্যক্তি ভারতবর্ষে, আজকাল দুষ্প্রাপ্য হ'য়েছে।

জগতের লোক যে standard-এ আছেন, সে standard-এ থেকে তাঁরা যা' করেন করুন, তা'তে অমঙ্গল হ'বে তা' ব'লছি না, তবে আমাদের ঠিক সে-রকম ধরণের Altruism—যেটা অতি সংকীর্ণ তাৎকালিক অনিত্য, সেরকম ধরণের পরার্থিতা দেখাবার সময় নাই। সোনা দিয়ে গর্ত পু'রাতে হ'বে না। খৃষ্টানধর্মাবলম্বী একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক (Mr. Mac Donald) Calcutta University-তে lecture দিলেন যে, Altruism খৃষ্টান-ধর্মের প্রতিপাদ্য বিশেষত্ব। কিন্তু আরও বিস্তৃত ও প্রসারিত—Extended Altruism ও Theism আবশ্যক। সঙ্কীর্ণ Altruism-এর বিচার কর্‌তে গেলে দেখা উচিত—মানুষের কোন অংশটার উপকার ক'রবে? উপকার ব'লে ২৪ ঘন্টা কাটান গেল, কিন্তু তা'তে উপকারটা কি হ'ল, তা' দেখা দরকার। খোসার উপকার না আর কিছু হ'লো? নিত্যকালের উপকারকে কিভাবে ক'রতে পারে সেটাই দেখা দরকার। অনিত্যের প্রতি মন দেওয়ার সময় কোথায়? তাই আমাদের হরিভজন ছাড়া অন্য কাজের জন্য অনুক্ষণ ভগবানের কথা স্মৃতি পথে না থাকলেই জড়ের ভোগ হ'য়ে যা'বে। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে ভগবানের কি সম্বন্ধ না জানলে প্রেমই প্রয়োজন হ'বে না। দুর্বুদ্ধি-যুক্তের প্রার্থনীয় বিষয়ই প্রাকৃত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। শ্রীগৌরসুন্দরের কথার মধ্যে এগুলো Infant Education-এর শিশু-শিক্ষার কথা, কিন্তু Higher ও Highest Education-এর উচ্চতর ও উচ্চতম শিক্ষার কথা তিনি ব'লেছেন। উপনিষদ্‌, গীতা—এসব Infant class-এর

পাঠ্য, Higher study দরকার—শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা আবশ্যক। বহু জন্ম পরে মানুষ-জন্ম পেয়েছি। বিবর অবর শ্রেণী যে-রকম Instinct-এর বাধ্য হ'য়ে ভোগ-ত্যাগ-ধর্ম্মে আবদ্ধ আছে, আমরাও যদি সেরকম ভোগত্যাগের বাধ্য হ'য়ে যাই, তা' হ'লে মানুষ না হ'য়ে পশু হ'লেই ত' হ'ত! Animalism বিস্তারের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে so-called Intelligentsia মনুষ্য-জীবনের অপব্যবহার ক'রছেন। যাবতীয় intelligence (চেতন)-এর মূল আশ্রয় ও অংশী পূর্ণতম চেতন সর্ব্বকারণ-কারণের অনুসন্ধানেই বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত পরিচয়। সকলেরই এ'তে vitally interested হওয়া কর্তব্য। ভগবদ্ ভজনের কথাটী স্মৃতিপথে থাকলে কোন অসুবিধা হয় না। ভক্ত ভোগীর ভোগবিচারকে মল-মূত্রের ন্যায় বিসর্জন ক'রে থাকেন। ভক্ত ভোগ করেন না; মুক্তকুলই ভগবদ্ ভক্ত—একথা মাথায় ঢুকলে মানুষ 'ভুক্তি' কা'কে বলে বুঝলে—সকলেরই মঙ্গল হ'বে। অমুক লোক ভজন ক'রতে পারেন, অমুক পারেন না,—এমন কথা নয়। ভগবদ্ভক্তিতে (ব্রহ্মা হ'তে 'ইন্দ্রগোপ' নামক কীট পর্য্যন্ত) সকলেরই অধিকার আছে, সব সময়েই ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা যায়। হায়, আমাদের বাস্তব সত্যে—ভগবন্নামানুশীলনে অনুরাগ হচ্ছে না। আমরা Phenomenal Existence-এর —জগতের খেলা-ধূলায় দিন কাটালাম! নিজেদের মঙ্গল অনুসন্ধানই প্রয়োজন, বহির্জগতের চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন থাকা প্রয়োজনীয় নয়। বহির্জগতের চিন্তা প্রবল থাকলে দ্বারের ভিতর গৃহে-প্রবেশের সম্ভাবনা হ'বে না। ভক্তের বাহিরের দিকটার বিচারে সতর্ক হ'তে হবে—'তৃণাদপি' ভাবটা বাইরের দিকে দেখা'বার বিষয় নয়, বাইরে আঁকু-পাঁকু-ভাব দেখান' কপটতা। কপটতা পরিহার ক'রলে তবে ভক্তি। আমার মনে যতক্ষণ "বাস্তবিক আমার মত মূর্খ, অযোগ্য আর কেহই নাই"—এ রকম ক্ষুদ্রত্ব প্রতিভাত না হ'বে, ততক্ষণ আমার সত্যের উপলব্ধি হ'বে না। সমস্ত relativity-র মধ্যে থেকে Absolute-এর আলোচনা কি ক'রে করতে হয়, বুঝতে পারা যাবে—একটু সহিষ্ণুতা একটু বিশ্রাম স্বীকার ক'রলে।

কোন একটী কাজ করতে হ'লে কত সময় লাগে, কত পরিশ্রম ক'রতে হয়। জগতের তুচ্ছ-বিদ্যা অর্জনের জন্য কত প'ড়তে হয়! উকিল মহাশয়েরা জানেন—এক ওকালতি পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাঁ'দের Preliminery, Intermediate ও Final এই তিনটে পরীক্ষা দিতে হ'য়েছিল। Elementary knowledge দরকার, একটু আলোচনা দরকার—একেবারেই এত বড় একটা জিনিষ গায়ের জোরে বুঝে নেওয়া যায় না। ভগবদ্ভক্তি নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ নয়। যা'রা "নিজের দাঁড়ে ছোলা" ন্যায় অবলম্বন ক'রে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণরত বা তা'তে অভিলাষযুক্ত হয়, সে-রকম লোক 'ভক্তি'র কোন কথা বুঝতে পারবে না–Plus ও minus বুঝবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষালাভ ক'রলে বুদ্ধিমান হওয়া যায়। তা' হ'লেই বুঝতে পারা যায়—সাধারণ মানবজাতি কত পণ্ডিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ক'রলেই মনুষ্যজাতির বুদ্ধি-শুদ্ধি ভাল হ'ত, স্থূলতুষাবঘাত থেকে যেতো। বাস্তব বস্তুর জ্ঞানলাভ না হ'লে অবাস্তব বস্তু এসে মানুষকে উৎপীড়ন ক'রবেই ক'র্‌বে। অধোক্ষজ সেবা না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ অক্ষজসেবায় প্রবৃত্ত হ'য়ে ভক্তির বিপরীত রাস্তা ধ'রবে।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।

শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য সত্য আলোচনা হ'লে বাস্তব বস্তু-সম্বন্ধে অভিজ্ঞান লাভ হয়, নতুবা 'আমি জড়ের ভোক্তা' এই দুর্ব্বুদ্ধি মানুষের সর্বনাশ ঘটায়। ভগবদ্ভক্ত যে ভোগ করেন না, তাঁ'র কোন কার্য্য যে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের উদ্দেশ্যে নয়—এ কথা সাধারণ মনুষ্য বুঝতে পারে না। ভগবদ্ভক্তের ঐশ্বর্য্যে আমার ভোগের বাধা হ'য়ে যাচ্ছে—আমি ভোগ ক'রবো—ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষের recipient সূত্রে আমি, এই রকম বিচার এসে মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃত ক'রে দিচ্ছে। কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তি অন্য ব্যাপার। ভক্ত চতুর্বর্গ চান না, তাঁ'র সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিচার এই প্রকার,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।

মনুষ্যজাতির বুদ্ধি কম, ভোগা-দেওয়া কথায় মানুষ দিন কাটায়। ভগবৎ-সেবাবিমুখ মনুষ্য-জাতির কথায় আমরা কর্ণপাত ক'রবো না, তা'রা ভোগ-তৎপর। ভগবান্‌ই অধোক্ষজ ও সর্বভোক্তা, সকল জিনিষই তাঁ'র ভোগের উপকরণ, সকলেই তাঁ'র সেবা ক'রছে—এটা জান্‌তে পারলেই মঙ্গল। যদি আমরা কেবল বাহিরের কথায় থাকি, তবে ভক্তির কোন কথাই কোনদিন বুঝতে পারবো না। সে-রকমভাবে বৃথা সময় নষ্ট করা কর্তব্য নয়।

অনাত্মধর্ম যে আত্মধর্ম নয়, একথা সাধারণ মনুষ্য বুঝতে পারে না। মানুষ চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়-দ্বারা তন্মাত্র—রূপ-রসাদি সসীম বিষয় ভোগ ক'রছে, আবার তা' থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে তা'দের নির্বিশেষ অবস্থালাভের চেষ্টা হ'চ্ছে। এ' দুটোই প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। জীবের যে-সব বৃত্তি, যেসব activity এখন আছে, এগুলো মুক্তির পর কোথায় যা'বে? যখন phenomenal world cease ক'রবে (বহির্জগৎ থেমে যাবে), স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ ভঙ্গ হ'বে, তখন ওগুলো যাবে কোথায়? shuffling of dice-এর মত এগুলোর utility-র কি একটা methodic principle নাই?

বঙ্গদেশের একজন প্রসিদ্ধ কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—

সুখের লাগিয়া, এঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে, সকলি করল ভেল।।

জগতে যতকিছু কল্পনা-জল্পনা (speculations) সব আলেয়ার মত বৃথা। একমাত্র ভগবদ্ভক্তিই লাভ করিতে হইবে। ভগদ্ভক্তি বাহির হইতে সঞ্চয় করা যায় না। তাহা আত্মার নিত্যসিদ্ধ বৃত্তি।

আমরা কোন ঘটনার মধ্য মাত্র দেখিতে পাই, তাহার আদি ও অন্ত্য আমাদের চক্ষের অন্তরালে থাকে। আমরা হয়ত একসঙ্গে কতকগুলি লোককে নৌকাডুবিতে মরিতে দেখিয়া কিম্বা বন্যায়, দুর্ভিক্ষে মৃত্যুগ্রাসে পতিত দেখিয়া ভগবানকে দোষারোপ করি, কিন্তু ঐ ঘটনা-সমূহের আদি আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত থাকে। যাহারা একমাত্র নৌকাডুবিতে বা বন্যাতে মৃত্যুগ্রস্ত হইতেছে, তাহারা একসঙ্গে এমন কোন দৌরাত্ম্যজনক কার্য্য করিয়াছিল, যাহার প্রতিফল তাহারা একসঙ্গেই পাইতে বসিয়াছে। আর সেইরূপ কর্ম্মবিপাক ভোগের দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যতে যদি কোন মঙ্গল লাভ হয়, তাহাও আমাদের চক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে। আমরা আমাদের আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণকেই দয়া মনে করি এবং অপরের আপাত-ইন্দ্রিয়-তর্পণকে পরোপকার নামে অভিহিত করিয়া থাকি। ভগবান কখনও আমাদের ইন্দ্রিয় তর্পণ করিবেন না, আমরা ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিব। ভগবানের দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইবার চেষ্টাকে ভগবানে ভক্তি বলা যায় না, উহা ভক্তির বিপরীত ভোগ বা আত্মবিনাশের পথ। মায়া আমাদিগকে অধিকতর ক্লেশসাগরে পাতিত করিবার জন্য আপাত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি প্রদানের ছলনায় আমাদের প্রতি যে হিংসা করিয়া থাকে, তাহা কখনও আমাদের নিত্যমঙ্গলের উপায় নহে।

বাহ্যজগতে ভগবান্ আপাততঃ দৃষ্ট হন না বলিয়া আমরা ভগবান্‌কে জানিতে পারি না। তিনি আমাদের বশ্য নহেন অর্থাৎ তিনি আমাদের অক্ষজজ্ঞানগম্য বা ইন্দ্রিয়ের অধীন বা দৃশ্য চাকর নহেন। ভগবদ্ভক্ত প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সেবা করেন, আর অভক্ত সেবার ভানে ভগবানের নিকট হইতে সেবা আদায় করে। ভগবানের ছলনায় ভৃতকপাঠকের পাঠ ও গায়কের গান সাধারণের বেশ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর হয়। ভোগের বিচার প্রবল হইলে বিদ্যাসুন্দর-নাটকে আরও আনন্দ হয়। ক্লাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে যাওয়া, তাস পাশা-দাবা-খেলা, গ্রাম্য বাজে খবরের কাগজ পড়াও পরচর্চা—এ সকলে আমরা মস্‌গুল হইয়া পড়ি। যেখানে ভগবানের কথার স্থান হয়, সেখানে বাজে কথা আলোচিত হইলে তাহাও জড়-জগতের আড্ডা বিশেষ। কেহ কেহ বলেন—'আমি নির্জনে হরিনাম করি'।" কিন্তু নির্জন কোথায়? আমি যেখানে যাইব, সেখানেই যে আমার মনের মলিনতা বহন করিয়া লইয়া যাইব। গ্রাম্যকথা বলিতে ও দম্ভাহঙ্কার প্রকাশ করিতে মহাপ্রভু বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন।

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না বলিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।।
অমানি-মানদ-হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।।

বাস্তবে সত্যের আলোচনা হওয়া দরকার। গ্রাম্যকথা ইতে অবসর পাওয়া আবশ্যক। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণীয়,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

হরিকথা শ্রবণ-কীর্তনেই পাপসমূহের যুপকাষ্ঠে বলি হয়। গোপনে অত্যাচার প্রকাশ্য পাপাপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণ্য ও দণ্ডনীয়। শ্রীল জগদানন্দ প্রভু 'প্রেমবিবর্তে' লিখিয়াছেন,—

লোক-দেখান গোরা-ভজা তিলক মালা ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি।।

লোকে বলে—"ডুব দিয়ে জল খেলে একাদশীর বাবাও টের পায় না"। কিন্তু কে কে গোপনে কি কি অন্যায় কার্য করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ, তাহা সমস্তই জানেন। যেহেতু তাঁহারা অন্তর্যামী। লোক পাপকে গোপন রাখিতে পারে না। লঘু ব্যক্তির নিকট বড় কথা শুনিলে পরচর্চার প্রবৃত্তির উদয় হয়। প্রকৃত গুরুর নিকট শ্রবণ না করিলে পরছিদ্রানুসন্ধান আসিয়া উপস্থিত হয়। মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছেন— "পরচর্চা" হইতে দূরে থাকিবে।

"পরচর্চকের গতি নাহি কোন কালে।" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগুরুদেব বলেন—'লোকের যে অজ্ঞতা আছে, সেটা দূর করা দরকার; যদি তাহা না করিয়া পরচর্চা করি, তাহা হইলে গুরুর কার্য হইল না।' আমরা নিজে অজ্ঞ থাকাকালে বলি—শ্রীগুরুদেব পরের দোষ দেখাইয়া ও অন্যকে শাসন করিয়া কেন পরচর্চা করেন? কিন্তু গুরুদেব যে শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতে পারেন। তিনি অন্যের দোষ দেখাইয়া দেন—উহার সংশোধনের জন্য। পিতামাতা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইয়া বালকের দোষ-প্রদর্শন ও তাহাকে শাসন করেন, তাহাতে কি পরচর্চা হয়? তবে নিজে নির্দোষ না হইয়া অপরের দোষ দর্শন নিষিদ্ধ।

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।।

বিশ্বদর্শক পরের স্বভাব আলোচনা করিবেন না। কৃষ্ণভক্তই তাহার নিত্যমঙ্গল বিধানের জন্য তাহা করিবেন। গুরুর কার্য করিতে গিয়া অপরের মূর্খতা নিরসন করিতে

হইলে তাহার ভ্রমজনক কার্যের দোষ প্রদর্শন করিতেই হইবে। যিনি বৈষ্ণব, তিনি ত গুরু—তিনি নিন্দার অতীত।

মহাভাগবত জগতের কোন অমঙ্গল চিন্তা করেন না। তাহা হইলেও মহাভাগবতের অবস্থায় উন্নত না হইলে মহাভাগবতের চরণে অপরাধী হইলে আমার কিছু মহাভাগবতত্ব লাভ ঘটিবে না। মহাভাগবতের নিকট গিয়া তাঁহার সেবার ছলনা করিতে গেলে তিনি আমার অন্যায় কার্য সমর্থন করিবেন—এইরূপ বিচার মূর্খতামাত্র। কনিষ্ঠাধিকারী থাকিতে মহাভাগবতাভিমান, নিরয়প্রাপক দম্ভমাত্র। নিজে কাঁচা চাউল অর্থাৎ অপক্ক বা সাধকাবস্থায় থাকিয়া জুড়ান ভাত অর্থাৎ পরিপক্ক বা সিদ্ধের অভিমান করিতে হইবে না। সাধনভক্তি ব্যতীত ভাবভক্তি হয় না। সাধনভক্তাবস্থায় চিত্তদর্পণ মার্জনাদিকার্য করিতে হয়।

শ্রীগুরুদেবের পদাশ্রয়পূর্বক বৈধভক্তির যাজন আবশ্যক। শ্রীগুরুদেব জানাইয়া দেন যে, সাধনভক্তি ব্যতীত ভাবভক্তি হয় না এবং ভাবভক্তি না হইলে প্রেমভক্তি লাভ হয় না। "বৈধভক্ত্যধিকারস্তু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ।" বিধি ভক্তি—যাহা সেবা-প্রগতির প্রথমার্ধের কথা, তাহাতে অবজ্ঞা করিলে গুরুপদাশ্রয় হয় না। গুর্ববজ্ঞার ফলে অনর্থের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ক্ষুদ্র জীব নিজের সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধির বাহাদুরী দেখাইয়া যতই ঊর্দ্ধে উঠুক না কেন, গুর্ববজ্ঞা করিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন,—

বৈধী ভক্তি ও গুরুবৈষ্ণবানুগত্য পরিত্যাগ করিলে কোনও কালে বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান লাভ হয় না এবং বদ্ধ ভূমিকা হইতে উন্নত প্রদেশে অভিযানের আগ্রহও হয় না। ভক্তিকে অক্ষের তর্পণে নিযুক্ত করিলে বিচার হইবে যে, অক্ষজ-পদার্থ মাত্রই আমাদের ভোগ্য। কিন্তু বস্তুতঃ বিশ্ব ভগবানের ভোগ্য। এই বিশ্ব জীব-ভোগ্য—ইহাই জড়ভোগবাদ বা কর্মকাণ্ড। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি সকলই বিশ্বদর্শনের অন্তর্গত ও অক্ষজবিচার। অধোক্ষজ ভগবানের সেবাই জীবের পরমার্থ। ভগবদ্-ভোগ্যবস্তুকে স্বীয় ভোগ্য জ্ঞান করিলে অনর্থ উপস্থিত হয়। জড়বস্তুই সকলের মূল—ইহা অভক্তের চিন্তাস্রোত। গুরুকৃপা না হইলে বস্তু দর্শন হয় না। জীব বদ্ধাবস্থায় কর্তৃত্বাভিমানী হইলেও ভগবানের ইচ্ছা না হইলে কিছুই করিতে পারে না। ভগবানের জীব-নিয়ন্তৃত্বের কথা উপনিষদে রহিয়াছে। সাম-বেদীয় কঠোপনিষদে মনোবুদ্ধি প্রভৃতির ভগবদধীনত্ব এইরূপ কথিত হইয়াছে—"কেনেশিতং মনঃ" অর্থাৎ মনোবুদ্ধি প্রভৃতি কাঁহার দ্বারা চালিত হয়?

"অহং ব্রহ্মাস্মি", "সোহং" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের জীবব্রহ্মৈক -বিচার বিবর্তবাদের বিচার। শ্রীমদ্ভাগবতে বিবর্তবিচার এইরূপ লিখিত—"তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ"। দেহে আত্মবুদ্ধিই বিবর্তবাদের স্থান। সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার সহিত সমান

মনে করাই বিবর্তবাদ। We are not to err God with Phenomena. মৃত আত্মারাম সরকার একজন প্রসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক ছিলেন। জড়মন্ত্রশক্তি দ্বারা তাঁহার ন্যায় ঐন্দ্রজালিকেরাও একবস্তুতে অন্যবস্তুর ভ্রম উৎপাদন করিত, জড় মন্ত্রশক্তির যদি এত কার্যকারিতা হয়, তাহা হইলে ভগবানের মন্ত্রের ফল ফলিবে না কেন? কৃষ্ণনাম মন্ত্রের উপাসনার ফল ফলিবেই।

সিদ্ধের ভূমিকায় আরোহণের ভানে সাধন পরিত্যাগ করা পাষণ্ডতা ও গুরুদ্রোহ ব্যতীত কিছুই নহে। "সৎপথের বিপরীত দিকে গমন করিলে বেশি কাম বা সুখ লাভ হইবে, আমি গুরুবৈষ্ণব হইতেও বেশি বুঝি, গুরুবৈষ্ণব আমার বুদ্ধি ও পরামর্শ না লইয়া এক পাও চলেন না, আমি নরকে যাইয়া সুবিধা করিয়া লইব এবং আমার গোঁড়ামি বজায় রাখিব"—এই বিচারে বিধি বা সাধন পথটাকে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া পরমহংসের অধিকার লাভ হইয়াছে মনে করা—পাষণ্ডতামাত্র। শ্রৌতবাণীর কীর্ত্তন না হইলে স্মরণ হয় না। বদ্ধজীব অস্থির, চঞ্চল জড়মনের দ্বারা কৃষ্ণের বা শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মধ্যান বা স্মরণ করিতে যাইয়া শুকপক্ষীর ঠোঁট চিন্তা করে। আবার পাখীর কথা মনে করিলে পাখীর মারণাস্ত্র বন্দুকের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণচিন্তা করিতে যাইয়া জড়ের ধ্যান করিয়া বসিলে কৃষ্ণসেবা বাধাপ্রাপ্ত হইল। এদিকে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—"সাধন-স্মরণলীলা, ইহাতে না কর হেলা, কায়-মনে করিয়া সুসার"। অর্থাৎ জড়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে অপ্রাকৃত সেব্যবস্তুর কীর্ত্তনের সঙ্গে স্মরণ কর। পূর্ণ বৈধমার্গে থাকিয়া সর্বদা কৃষ্ণচিন্তা করা দরকার। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন প্রকার অবৈধকার্য্যের প্রশ্রয় দেন না। এক সময়ে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানকালে একদিন জ্যোৎস্নাবতী রাত্রিতে দূর হইতে গুর্জ্জর রাগিণীতে গীত কৃষ্ণের লীলাগান শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহ্যস্মৃতিরহিত হইয়া কন্টকাকীর্ণ বন অতিক্রমপূর্ব্বক কৃষ্ণানুসন্ধানে ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রধাবিত হইতেছিলেন, কিন্তু তদীয় সেবক গোবিন্দ মহাপ্রভুকে অগ্রসর হইতে বারণ করিয়াছিলেন, কারণ একটি স্ত্রীলোক ঐ সঙ্গীত করিতেছিল।

প্রভু কহে,—"গোবিন্দ, আজ রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হইলে আমার হইত মরণ।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৮)

বিধিভক্তি উল্লঙ্ঘন করিলে অকালপক্ক সাধকের চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির অনুকরণে প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িতে হইবে। মহাপ্রভু সেইজন্যই সন্ন্যাসলীলায় বৈধভক্তির নিয়ম অটুটভাবে পালন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন পুরুষোত্তমে ছিলেন তখন শ্রীমায়াপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী পরমেশ্বরী মোদক তাঁর স্ত্রীর শ্রীমন্মহাপ্রভু-দর্শন করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্কুচিত হইলেন। শ্রীল সেন শিবানন্দের সঙ্গে গৌড়দেশ হইতে মহিলা-

ভক্তগণ পুরষোত্তমে আসিলেন। "স্ত্রীভক্ত দূর হইতে কৈলা প্রভুর দরশন।" বিষ খাইয়া মরিয়া যাওয়া ভাল, তথাপি হরিভজন করিতে আসিয়া গোপনে পাপে প্রবৃত্ত হওয়া ভীষণাদপি ভীষণতর অপরাধ। শাস্ত্র বলেন,—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।।"

দুর্বলতাবশতঃ পাপাচরণকারীর বরং নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু যাহারা জ্ঞাতসারে পাপ করে, তাহারা অত্যন্ত পাষণ্ড। স্ত্রীলোক মাত্রেই নিন্দনীয়া নহেন। নারীদেহ বা নারীর আকার মাত্রকেই ভোগ্য যোষিৎ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না। শিখিমাহাতির ভগিনী মাধবীদেবী পরমা বৈষ্ণবী ছিলেন। তাঁহাকে প্রাকৃত স্ত্রীবুদ্ধি করিলে অপরাধ। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রাকৃত পুরুষাভিমানরহিত ছিলেন বলিয়া যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গ স্পর্শে তাঁহার বিকার উপস্থিত হইত না। ইন্দ্রিয়পরায়ণ বদ্ধজীব তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া মৃত্যুই বরণ করিবে।

বহু বৎসর পূর্বেকার কথা। বৃন্দাবনের চিড়িয়াকুঞ্জে বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে একটি ব্রাহ্মণ যুবক থাকিত। সে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' পড়িত। সেইস্থানে হরিনামপরায়ণ কয়েকজন শুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস-নামক একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব তাঁহার শিষ্য ঐ যুবকটিকে উপদেশ করিয়া ছিলেন,—"প্রত্যেক দুইদিন অন্তর একদিন উপবাসান্তে তবে 'উজ্জ্বলনীলমণি' পড়িতে পাইবে।" কিন্তু দুর্ভাগা যুবকটি গুরুর বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া ছোট হরিদাসের অনুকরণে প্রত্যহ গোবিন্দজীব মন্দিরে কৃষ্ণসেবার ছলনায় আরতি দর্শন করিতে যাইত এবং যুবতী স্ত্রীলোক দর্শন করিত। সেই যুবকটির কপটতা বুঝিতে পারিয়া গুরুদেব তাহাকে গোবিন্দজীর দর্শনে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বৈষ্ণবদিগের ত্যাজ্য হইয়াছিল। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের কপট শিষ্যনামধারীগুলিও এরূপভাবে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অধঃপতিত হইয়াছিল।

বর্তমানকালে ছোট হরিদাসের অনুকরণকারীরা হয় মায়াবাদী, না হয় অধঃপতিত। অপরাধযুক্ত অবস্থায় জড়জিহ্বায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হন না।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২ লঃ ১০৯)

"প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণং অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি।" (ভক্তিসন্দর্ভ ও ক্রমসন্দর্ভ-টীকা) শ্রবণ-কীর্তন বাদ দিয়া নিজেই গুরু হইব, সাধন পথটা ছাড়িয়া দিয়া সিদ্ধের ন্যায় আচরণ করিব—এ সকল পাষণ্ডতামাত্র।

প্রাকৃত সহজিয়াদিগের সহিত বিষয়গন্ধযুক্ত দ্রব্যাদির আদান প্রদান করিলে হরিভজন খর্ব হইবে। তোতাপাখীর বুলির মত হরিনামাক্ষর উচ্চারণ করিলে বহু জন্মেও কোন সুবিধা হইবে না।

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।।
ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।

যোষিৎসঙ্গী ও অভক্তের কোনও সদ্গুণ থাকিতে পারে না। যাবতীয় সদগুণ হরিভক্তকেই আশ্রয় করে।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।

যাহারা সচ্চিদানন্দ ভগবান অধোক্ষজের কথা স্বীকার বা শ্রবণ-কীর্তন করে না, তাহাদের মঙ্গল হইবে না। মৎসরতার দ্বারা হরি-সেবা হয় না। জগতে তথাকথিত পরোপকারী ব্যক্তির কার্যও প্রশংসনীয় নহে। তাহাদের দয়া—"গরু মেরে জুতা দান।" কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কোন প্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ ও অমঙ্গল হয় না।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো।।
(ভাঃ ১০।২।৩৩)

অভক্ত অসৎ বলিয়া হরিভক্তির ও হরিভক্তের বিদ্বেষী। অভক্ত পরমার্থী নহে। সে প্রাকৃত অর্থী। অভক্ত স্মার্ত নানা দেবদেবীর পূজা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ফল আদায় করে। বহির্ম্মুখ সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী। শ্রীমদ্ভাগবতবাণী নির্ভীকভাবে কীর্তন করিতে হইবে। হরিভক্তির কথা আমাদের আলোচ্য প্রচার্য। হরিভক্তি ব্যতীত পঞ্চোপাসনার কথায় লোক 'পাষণ্ডী হিন্দু' হইয়া পড়িতেছে। হরিভক্তির কথা প্রবল হইলে সকল দিকেই সুবিধা হইবে।

নববিধা ভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদন পূর্বক শ্রবণ-কীর্তনের সাহায্যেই অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠেয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিগণের কার্য-সর্বক্ষণ হরিকীর্তন। অনর্থ নিবৃত্তি হইলে শ্রীনামের মাধুর্যাস্বাদন হয়। কীর্তনপ্রভাবেই স্মরণের উদয় হয়। "হে হরে মাধুর্যগুণে হরি' লবে নেত্রমনে, মোহন মূরতি দরশাই" ইত্যাদি বিচার স্বয়ংস্ফূর্তি হয়। বদ্ধাবস্থায় সিদ্ধের অনুকরণ করিতে নাই। আগে সাধন হউক—আগে কাঁচা চাউল সিদ্ধ হউক, তত্ত্বজ্ঞানাভাব দূর হউক, ক্রিয়াদাক্ষ্যের বাহাদুরীর গরমভাব (অহঙ্কার) চলিয়া যাউক, তারপর সিদ্ধ অন্নই (নির্মল আত্মাই) কৃষ্ণসেবায় আপনা হইতে উপায়ন হইবে।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।।
(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

রুদ্র না হইয়া বিষপান করিলে যেরূপ আত্মবিনাশ হয়, তদ্রূপ বদ্ধ ও অনধিকারী অবস্থায় মুক্ত ভাগবত পরমহংসগণের আলোচ্য রাসলীলাদি শ্রবণ-কীর্তন বা স্মরণ করিলে সর্বনাশ হইবে। আবার উচ্চস্তরে অর্থাৎ মুক্ত ভূমিকায় অবস্থিত হইয়াও যদি রাসলীলা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সর্বনাশ অর্থাৎ বদ্ধ বা অনর্থযুক্ত-অবস্থায় বিচ্যুতি লাভ হইবে। এখন আমি যদি দণ্ড বা বেষ মাত্র গ্রহণ করিয়া নিজেকে গুরু বা নমস্য মনে করি, তাহা হইলে আমি অভক্ত মায়াবাদী হইয়া পড়িলাম। মায়াবাদীদের বিচার "দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ"। "অনর্থমুক্ত হইয়া রাধাকৃষ্ণেরই গীতি কীর্তন করিতে হইবে। বাস্তবগুরু অন্যকে শিষ্যজ্ঞান করেন না। শিষ্যকে গুরু করিতে না পারিলে সুবিধা হয় না। নিজেই নিজের মনে 'গুরু গুরু' করিলে অর্থাৎ 'হামবড়াভাব' পোষণ করিলে গুড়্‌গুড়ে-নদীতেই স্নান হইবে। কিন্তু গঙ্গাস্নান হইবে না; অর্থাৎ অন্তরে মলিনতা বা অনর্থের নিবৃত্তি হইবে না। লঘুব্যক্তি হরিভজন রহিত হইয়া নিজেকে গুরু বলিয়া জাহির করিতে গিয়া বলে—'আমি গুরু অতএব আমায় নমস্কুরু।'

কিন্তু "ম"কারের অর্থ "অহঙ্কার"; "ন" কারের অর্থ "নিষেধ"। যদি আমরা জড়জগতের সেবা—নেশার সেবা পরিত্যাগ করি, একান্তভাবে একমাত্র ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হই, তবেই আমাদের মঙ্গল। অতিরিক্ত জ্ঞান সংগ্রহ ক'রলে অতিরিক্ত ভোগলালসা বৃদ্ধি পায়। যা'দের গায়ে জোর বেশী আছে, তা'দেরই কি সত্য উপলব্ধি হ'বে? প্রাকৃতবিজ্ঞানবিৎ কি মনোবিজ্ঞানবিৎ হ'লেই কি ভগবত্তত্ত্ব বুঝতে পারবে? তা' নয়। 'ভবদীয় বার্তা' অর্থাৎ শ্রীহরির কথা শ্রবণ না করা পর্যন্ত, জীবের মঙ্গল হ'তে পারে না। যা'তে ভগবানের ইন্দ্রিয়ের সুখ হয়—এরূপ কথার নামই 'হরিকথা'। জটাজুট ধারণ করলে, ত্যাগী সাজলে, বা বড় গৃহস্থ হ'লেই তা'কে 'সাধু' বলা যায় না; সর্বক্ষণ হরিকথা-নিরত ব্যক্তির নামই সাধু, সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত ব্যক্তিই সাধু। নিত্যকাল সর্বক্ষণ যিনি সকল চেষ্টার মধ্যে কৃষ্ণের জন্য ব্যস্ত আছেন সকল চেষ্টাই যাঁহার ভগবানের সেবার জন্য, তিনিই সাধু।

মূর্খও তাঁ'কে (অজিত ভগবানকে) সেবাদ্বারা জয় করতে পারে, পণ্ডিতাভিমানী তাঁ'কে জয় করতে পারে না। ভগবদ্ভক্ত শ্রুত বাক্যের অনুসরণ করেন, তিনি অনুকরণ মাত্র করেন না। অনুকরণ করাটা খুব সোজা। আমরা অনেক-সময় সাধুর অনুকরণ করি; সাধুর অনুসরণ না ক'রে কেবল তাঁহার অনুকরণ করা—তাঁহাকে ভেঙ্গ্‌চানো মাত্র। সাধুর অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা দশায় পড়ি—অশ্রু, কম্প, পুলক দেখাই এবং আরও কত কি ক'রে থাকি! আমরা আবার গৌরসুন্দরের ও গৌরভক্তগণের

অনুকরণ করতে গিয়ে ওলাউঠা ভাল করা উদ্দেশ্য নিয়ে কীর্তন করি, ব্যবসায়ী ভাগবত (?) কথক-পাঠক হ'য়ে পড়ি, শূদ্রসজ্জায় কখনও বা মন্ত্রদাতা গুরু হ'য়ে বসি ইত্যাদি।

'হরিকীর্তন' জিনিষটি অত ক্ষুদ্র নন; যাঁহার প্রাপ্তিতে সর্বার্থ-সিদ্ধি হয়, জীবের পরম-প্রয়োজন প্রেম-লাভ হয়, সেই জিনিষ কখনও ক্ষুদ্র ভোগ বা মোক্ষের জন্য অথবা বণিকের পণ্যের মত ব্যবহার করা যে'তে পারে না। কৈতব বা ছলনা-রাজ্যের প্রধান অধিবাসিনী—"মুক্তি"। প্রকৃত মুক্তি লাভ কে করবে? সেই মুক্তি পাওয়াটা—বদ্ধাবস্থা হ'তে উত্তীর্ণ হওয়া—স্বভাবকে লাভ করা; যা'কে আশাপাশ আবদ্ধ করেছে, তা'র সেই পাশ হ'তে বিমুক্ত হওয়াই যথার্থ মুক্তি।

একটা গল্প আছে। এক সময় একজন কাঠুরে বন হ'তে একটা খুব বড় কাঠের বোঝা মাথায় ক'রে আসছিল; বোঝাটা অত্যন্ত ভার বোধ হওয়ায়, মাত্র দুটি ভাতের জন্য প্রত্যহ এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ অসহ্য মনে ক'রে সে সেইটে মাটিতে ফে'লে আক্ষেপ ক'রে বলছিল—"পোড়া যমও আমাকে ভুলে আছে! এখনি আমায় এসে' নেয় ত' বাঁচি।" অমনি সত্যি-সত্যি যম এ'সে হাজির। এ'সে বললে—"আমি যম, এই এসেছি; আমাকে ডাকলে কেন?" কাঠুরের তখন চক্ষুঃস্থির, বৈরাগ্য শুকিয়ে গেছে, সেই দেহটার উপরেই বিষম মমতা এসে পড়েছে। সে থতমত খেয়ে বললে—"এই—এই—বলি যম-ঠাকুর, এমন কিছু নয়,—তবে এই বোঝাটা তুলে' দেবার জন্যেই তোমাকে ডে'কেছিনু।"

অধিকাংশ ফল্গুত্যাগীর অবস্থাই এইরূপ। তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাসী হবে না।

বলদেবপ্রভুর বল যদি সঞ্চয় করতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল হ'বে,—তবেই আমাদের প্রকৃত-প্রস্তাবে বর্ণাশ্রম ও পারমহংস্য-ধর্মের সার্থকতা হ'বে। বাহ্য-জগতে নিষ্কিঞ্চনতা-ধর্ম এ'সে পড়বে,—'বাহ্য-জগতের কোনও মর্যাদা, বা কোনও কথার মধ্যে আমি সংশ্লিষ্ট নই'—এইরূপ বুদ্ধির উদয় হ'বে। যাঁহারা সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, সেইসকল সাধুর প্রসঙ্গ হ'তেই আমরা ভগবানের শক্তিসমূহ অবগত হ'তে পারি। কায়মনোবাক্যে বীর্যবতী হরিকথা শ্রবণ করতে করতে আমাদের আত্মায় ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির আবির্ভাব হয়। বাহ্য-জগতের বিক্রমসমূহ আমাদি'কে আর পরাভূত ক'রতে পারে না।

মুক্ত হলেই কি চলবে? মুক্ত হওয়ার পরে কৃত্য কি? যে মুক্তিতে ভগবৎসেবাই চরম প্রয়োজন নয়, সেরূপ মুক্তির মূল্য কি? সেরূপ মুক্তি কতক্ষণ আপনাকে মুক্ত রাখতে পারে?

> ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
> মহত্তমান্তহৃর্দয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণায়ুতমেষ মে বরঃ।।
>
> (ভাঃ ৪।২০।২৪)

হে নাথ, যে মোক্ষপদে মহত্তম ভাগবতগণের অন্তর্হৃদয় হ'তে মুখমার্গ দ্বারা বিনিঃসৃত ভবদীয় পাদপদ্ম সুধার যশোগান শ্রবণ করবার সম্ভাবনা না থাকে, আমি সেই মোক্ষপদও প্রার্থনা করি না। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার গুণ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করবার জন্য আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন,—ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বর, আমি অন্য কিছুই চাই না।

যাঁরা যে স্তরে আছেন, তা'তেই তাঁদের মঙ্গল হ'বে,—যদি তাঁরা সাধুগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল থাকেন। যাঁ'রা অভিধেয় ও প্রয়োজন-নির্ণয়ে বিচার ভুল ক'রেছেন, হরিকথা শ্রবণে তাঁদেরও মঙ্গল লাভ হ'তে পারে,—

স উত্তমঃশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃত-তত্ত্ববর্ত্মনাং কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ।।

(ভাঃ ৪।২০।২৫)

হে উত্তমশ্লোক, মহাজনগণের মুখনিঃসৃত ভবদীয় পাদপদ্ম-মকরন্দকণা সম্পৃক্ত অনিল কুযোগিগণেরও পুনরায় তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া থাকেন। অতএব আমার আর অন্যবরে প্রয়োজন কি?

মায়ার জিনিষগুলি মানুষকে ভোগ ও ত্যাগ শিক্ষা দেয়। ভোগী কুযোগী কম্বলের লোভে কম্বলভ্রমে ভালুক ধরতে যায়। যখন ভালুক তা'কে আক্রমণ করে, তখন সে কম্বল ত্যাগ করতে চায়; কিন্তু সে ত্যাগ করতে চাইলে কি হ'বে? কম্বলরূপী ভালুক যে তা'কে ছাড়ে না। হরিসম্বন্ধি বস্তুজ্ঞান হ'লে সেরূপ ভোগ ও ত্যাগ কিছুই করতে হয় না।

ধীর ব্যক্তি নিজের শ্রেয়ঃপ্রার্থী। শ্রেয়ঃপ্রার্থনা আমাদের প্রত্যেক বহির্ম্মুখ হৃদয়েই রয়েছে। আমরা প্রেয়েতে লুব্ধ হ'য়ে যাঁতাকলে প্রাণ হারাই। যা'তে ক'রে নিত্যমঙ্গল হ'বে, এখন তা শুন্‌তে গা দিচ্ছি না। যে-কাল পর্য্যন্ত পার্থিব চিন্তাস্রোত বহমানন করবার প্রবৃত্তি রয়েছে, সে কাল পর্য্যন্ত হরিকথা কানে যায় না।

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ।।

(ভাঃ ৬।৩।২৫)

জৈমিন্যাদি ঋষিগণের যে প্রস্তাব, সেই প্রস্তাবের পুষ্পিত পথ গ্রহণ করলে আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হ'বে না। যে জিনিষটা পরিবর্তিত হ'বে, তার উপর দাঁড়িয়ে কি মীমাংসা হ'তে পারে?—"পঙ্কে গৌরিব সীদতি।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মানবজাতির একমাত্র পরম শিক্ষক। কৃষ্ণভজন না ক'রে যখন জীব অন্য পথ গ্রহণ ক'রছে, তখন গুরুর সজ্জায় তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন—পরমেশ্বরের উপাসনা।

ভজন জিনিষটা ধার করা ব্যাপার নয়। ইহা অনুকরণও নয়। স্বরূপের উদ্বোধন হ'লে তবে ভজন হয়। রজোগুণের দ্বারা তমোগুণের বিনাশ, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণকে বিনাশ, আবার সত্ত্বগুণের বিনাশ ক'রে নির্গুণ অবস্থায় অধোক্ষজ তত্ত্বের অনুভূতি হয়। সেই অধোক্ষজ-সেবাই ভক্তি,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈত্যুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।। (ভাঃ ১।২।৬)

অধোক্ষজ জিনিষটা অপরোক্ষ নয়। মূল কথায় আসলে সকলেরই মঙ্গল হ'বে—মোটকথা—কানু ছাড়া আর গতি নাই।

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।"

শ্রীভগবান—অধোক্ষজ বস্তু। তাঁহার সেবা ব্যতীত জীবের আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই বা হইতে পারে না। "অধোক্ষজ-বস্তুর সেবা" কথাটীতেই গোলমাল বাধিতেছে। প্রকৃত গুরুর নিকট প্রকৃতপক্ষে গমন না করিয়া, "আমরা গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি" —এই কপট অভিমান হইতেই যাবতীয় অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান—লাভ করিবার পর ইতর বিষয়ে অভিনিবেশ কি-প্রকারে থাকিতে পারে? আত্মম্ভরি-ব্যক্তিগণ সত্য-সত্য গুরুর নিকট না গিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ বা সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত না হইয়াই "গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি" এইরূপ নিরর্থক বাক্য বলিয়া থাকে। আমরা গুরুদেবকে 'গুরু' জ্ঞান না করিয়া কার্য্যতঃ আমাদের 'শিষ্য' বা শাসনযোগ্য বস্তুতে পরিণত করি,—তাঁহাকে নিজ-ভোগ্য বা অক্ষজজ্ঞান-গম্য মনে করিয়া গুরু-বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হই। 'অক্ষ' শব্দে 'ইন্দ্রিয়', সুতরাং 'অক্ষজ' অর্থে ইন্দ্রিয়জ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন—এই ছয়টী ইন্দ্রিয় যখন ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য-কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তখনই আমাদের শুদ্ধাভক্তি আবৃত হয়। ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিদ্বারা অধোক্ষজ ভগবান্ সেবিত হন না, তাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতে পারে। যেমন বালক ক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকিলে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞান আমাদিগকে অসত্য-পথে ধাবিত করায়,—তখন "আমরা দীক্ষা লাভ করিয়াছি" মনে করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত হই। তখন দ্যূত, পান, স্ত্রী, মৎস্য-মাংস, প্রতিষ্ঠা ও অর্থসংগ্রহের স্পৃহা আমাদিগের নাকে দড়ি দিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে থাকে। কোনও ভক্ত বলিয়াছেন,—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে।।"

ষড়্‌রিপুকে 'প্রভু' সাজাইয়া এ হেন কার্য্য নাই—যাহা আমরা করি নাই। কিন্তু এত সুদীর্ঘকাল উহাদের অকপট সেবা করিয়াও আমি মনিবের মন পাইলাম না! আমার লজ্জাও হইল না! এতদিন কার্য্যের পরেও ইহারা আমাকে অবসর পর্য্যন্ত দিতেছে না! হে যদুপতে, আমার আজ সদ্ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে; আমি আর রিপুগণকে 'প্রভু' করিয়া তাহাদের সেবা করিব না।

হে কৃষ্ণচন্দ্র, আমাকে সেবকত্বে গ্রহণ কর। ভগবানের সেবকাভিনয়ে বাহ্যজগতের যে সেবা করিয়াছলাম তাহা আর করিব না।'

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানে এইরূপ আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহান্ত গুরুরূপে আবির্ভূত হন। মহান্তগুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। আবার, অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত আত্মপ্রসাদ-লাভ অসম্ভব। অক্ষজ-বস্তুর সেবায় মনেন্দ্রিয়ের তর্পণ হয়, আত্মপ্রসাদ-লাভ হয় না।

শ্রীব্যাসদেব যখন বহু পুরাণ ও মহাভারতাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তখন একদিন শ্রীব্যাসের অবসাদ দেখিয়া শ্রীনারদ আসিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীব্যাসদেব বলিলেন,—'আমি কৃষ্ণকথা আলোচনা করিয়াছি, তবুও কেন হৃদয়ে প্রসন্নতা-লাভ হইল না?' সেই প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপ বর্ণিত আছে, (১।৭।৪-৭)—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা।"

ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যক্‌রূপে সমাহিত হইলে শ্রীব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত বহিরঙ্গা মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হওয়ায় জীব, বস্তুতঃ সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক জড়ের অতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক কর্তৃত্বাদি-বশতঃ অভিমান সংসার-ব্যসন লাভ করে। জড়েন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিতা ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলেই সংসার-ভোগ-দুঃখ নিবৃত্ত হয়,তাহাও দর্শন করিলেন। এইসকল ব্যাপার দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত-নামক

'পারমহংসী সাত্বত-সংহিতা' রচনা করিলেন—যে পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রবণ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতিই অভক্তিযোগ। উহারা কখনও অপ্রতিহতা অহৈতুকী মুকুন্দসেবা নহে। 'চব্বিশঘন্টার ভিতরে চব্বিশঘন্টাকাল কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন কর্ত্তব্য হইতে পারে না'—জীবের যখন এইরূপ উপলব্ধি হয়, তখনই তিনি ব্যাসদেবের ন্যায় জ্যোতিরভ্যন্তরে শ্যামসুন্দর পূর্ণপুরুষকে দর্শন করিতে পারেন। পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণে যাহার পূর্ণ বিশ্বাস, তিনি স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেব-দেবীর পূজা করেন না। তিনি "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ ভুজোপশাখাঃ"—এই ভাগবতীয় বাক্যটী জানেন। অপূর্ণ বস্তুর পূজা দ্বারা অন্য অপূর্ণ বস্তুর ঈর্ষা উপস্থিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণে পরমপরিপূর্ণতা বিরাজমান। শ্রীসঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নাদি অথবা মূল-প্রকাশবিগ্রহ বলদেব হইতে প্রকটিত সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রে অবস্থিত। মায়াও কৃষ্ণে অবস্থিত—গর্হিত ভাবে পশ্চাদদেশে। অসুরমোহনার্থ ভগবান শাক্যসিংহের 'প্রকৃতিতে নির্ব্বাণ' বলিয়া যে নাস্তিক্যবাদ-প্রচার বা 'ঈশ্বরকৃষ্ণের' সাংখ্যকারিকা-লিখিত 'প্রকৃতিলয়' প্রভৃতি যে সমস্ত কথা তাহা কুদার্শনিকের মতবাদ। মায়া বা প্রকৃতি পূর্ণপুরুষত্বের কোনরূপ হানি করিতে পারে না, কিন্তু 'মায়া' বলিতে পূর্ণপুরুষকে লক্ষ্য করে না। পূর্ণপুরুষ কখনও জীবকে সম্মোহন করেন না। মায়া স্বীয় বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণীরূপা বৃত্তিদ্বয়ী-দ্বারা জীবকে আচ্ছাদন করেন। মায়া সর্বদা পূর্ণপুরুষের প্রসাদ-প্রদানার্থ প্রস্তুত, কিন্তু যাহারা নিষ্কপটভাবে পূর্ণ পুরুষের প্রসাদগ্রহণে অনিচ্ছুক, মায়া তাহাদিগকেই অভিভূত করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিত্য-কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের অন্য কোনও চেষ্টা নাই। কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই জীবের দেহাত্মাভিমান উদিত হয়। জীব তখন 'আমি নিত্য-কৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলিয়া গিয়া স্থূল ও লিঙ্গদেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া মায়ার দাস্য করিতে ধাবিত হয়। স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও নিজকে অবৈষ্ণব-বুদ্ধি করিবার যোগ্যতা তাহার আছে।

হৃদয়ের সুপ্ত সিদ্ধভাবকে উন্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা সাধন করিয়া প্রকট বা পরিস্ফুট করিতে হয়। জাতরতি ব্যক্তি পাঁচপ্রকার-রতিবিশিষ্ট হইয়া স্বারসিকী রতির দ্বারা বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামাদি-লাভের জন্য যে ঈশ্বরারাধনার অভিনয়, তাহা কৃষ্ণসেবা নহে। ধর্ম্মকামী ব্যক্তি সূর্য্যের উপাসনা, অর্থকামী ব্যক্তি গণেশের উপাসনা, কামকামী ব্যক্তি শক্তির উপাসনা এবং মোক্ষকামী ব্যক্তি শিবের উপাসনা করিয়া থাকেন। দেবগণকে খাজাঞ্চি করিয়া লইয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইবার চেষ্টা হইতেই পঞ্চোপাসনার উৎপত্তি। কিন্তু কৃষ্ণসেবা তাদৃশী নহে; কৃষ্ণসেবা—অপ্রাকৃত শ্রীকামদেবের সেবা—শুদ্ধচেতনের অস্মিতার দ্বারা

শ্রীশ্যামসুন্দরের পাদপদ্মের নিত্যা অহৈতুকী অপ্রতিহতা সেবা—অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের ও অপ্রাকৃত মনের কার্য্য। জড়-মনের যাবতীয় কার্য্য-সমূহ বহির্জ্জগতের আশ্রয়ে সংঘটিত হয়। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ)—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়।।"

আরোপের বা অন্তশ্চিন্তিত কাল্পনিক মনোময় দেহের দ্বারা নশ্বর চেষ্টার অনুরূপ তথা-কথিত কৃষ্ণসেবার কথা গোস্বামিপাদগণ কখনও বলেন নাই। আমরা যে আবহাওয়ায় আছি, তাহাতে লোককে বুঝান যায় না বলিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে মনোবৃত্তির ক্রিয়ার আধারকে পরিবর্ত্তন করিয়া সিদ্ধ দেহের ভূমিকায় নিয়োগাভিপ্রায়ে (চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ)—

"মনে নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।।"

প্রভৃতি বাক্য বলা হইয়াছে। ইহ-জগতের স্থূল ও লিঙ্গ দেহের দ্বারা অপ্রাকৃতবস্তুর সেবা হয় না। যখন আমাদের অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণবস্তুর সেবা হইতে থাকে, তখন বাহ্য-দেহে তাহার স্পন্দন-ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র।

সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার জন্য লুব্ধ হই, তখন আমাদের বাহিরের দেহও মায়ার পূজা না করিয়া সর্বদা বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণে উৎকণ্ঠিত হয়। তখন (ভাঃ ১০।৩৫।৯)—

"বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।"

অর্থাৎ 'পুষ্পফলাঢ্যা বনলতা, বিটপীসকল ও ভারাবনত কৃষ্ণপ্রেমোৎফুল্লতনু বনস্পতিরাজি, আত্মগত শ্রীকৃষ্ণকে প্রকট করিয়া মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন।' (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ),—

"স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি।।"

মহাভাগবত এইরূপ মনে করেন,—'সকলেই বিষ্ণুর উপাসনায় মত্ত, কেবল আমিই বিষ্ণু-বিমুখ, আমি প্রাণপ্রভুর সেবা করিতে পারিলাম না!'—যেমন শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন ( চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ ৪৫ শ্লোক),—

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা।।"

হায়, কৃষ্ণে আমার লেশমাত্রও প্রেমগন্ধ নাই! তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য। বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রানন-দর্শন বিনা আমার প্রাণপতঙ্গধারণ বৃথাই হইতেছে মাত্র। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ পঃ),—

"প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ'।।

শ্রীবল্লভাচার্য্য যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আড়াইল-গ্রামে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন শ্রীবল্লভ-ভট্টের বিচার প্রণালী দেখিয়া মহাপ্রভু স্বীয় ভাব সম্বরণ করিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ),—

"কৃষ্ণকথায় প্রভুর মহা-প্রেম উথলিল।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল।।
দেশ-পাত্র দেখি' মহাপ্রভু ধৈর্য্য হৈল।"

আবার একদিন রায়-রামানন্দের সহিত মিলনে মহাপ্রভুর প্রেমোল্লাস হইলে বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের বিচারপ্রণালী দেখিয়া মহাপ্রভু ভাব সম্বরণ করিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)—

"বিজাতীয় লোক দেখি' প্রভু কৈল সম্বরণ।"

"আপন-ভজন কথা না কহিবে যথা-তথা"—ইহাই আচার্য্যগণের আদেশ ও উপদেশ।

অত্যন্ত গুহ্যাদপি গুহ্য রাইকানুর রসগানের পদাবলী যদি আমাদের মত লম্পট-ব্যক্তি হাটে-বাজারে ঘাটে-বাটে-মাঠে যা'র-তা'র কাছে গান বা বর্ণন করে, তবে কি উহা দ্বারা জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হয় না? বাহ্য-জগতের প্রতীতি প্রবল থাকিতে আমরা যে যাজন করিতেছি বলিয়া অভিমান করি, তাহা নিরর্থক। আমার কি লেশমাত্রও ভগবানের জন্য অনুরাগ হইয়াছে?—একবার নিষ্কপটে অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে বুঝা যায়।

ইহা-দ্বারা বলা হইতেছে না যে, ভজনের ক্রিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। বলা হইতেছে যে, অধিকারানুযায়ী ক্রমপথানুসারে অগ্রসর হইতে হইবে,—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।"

সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নৈরন্তর্য্য ও রুচি হইতে পারে না। যেদিন আমরা সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে

পারিব, সেই-দিনই আমাদের শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-লাভ হইবে। সেইদিন আমরা আমাদের বিভিন্ন সিদ্ধ স্থায়ী আত্মরতিতে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিভৃতসেবা করিতে থাকিব। তৎকালে ব্রহ্মানুসন্ধান-পর্য্যন্ত আমাদের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে,—মহান্ত-গুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজ-জন বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা-কথা আমাদের শুদ্ধ নির্মল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। তখন শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর চম্পকাভা-দ্বারা উদ্ভাসিত, শ্রীমতীর উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদি-চেষ্টা-দ্বারা প্রফুল্লিত শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ-দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে।

ঈশ্বর—বিভু; জীব—অণু। অণুস্বরূপ লৌহময় জীবে অয়স্কান্তরূপ বিভুর যে আকর্ষণ, তাহাই ভক্তি। সে কর্ষণ জীবের নিত্য-সহচর হইলেও জীব জড়গুণে অস্মিতার বিরূপে কর্দম-লেপিত লৌহের ন্যায় অয়স্কান্তের আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত। জীব ভক্তির কর্ষণে জীবগত মায়িক সত্ত্ব-রজস্তমগুণ বিচ্ছিন্ন করিয়া পরসত্ত্বে নীত হয়। তখন সত্ত্ব-মার্জিত লৌহের ন্যায় আপাত জ্ঞান ও মায়িক আনন্দের আবরণ-মুক্ত সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-সন্ধান প্রাপ্ত হয়।

বিভু স্ব-শক্তিতে অধিষ্ঠিত। সেই স্বরূপ-শক্তির তিন বৃত্তি। সন্ধিনী বৃত্তিতে তিনি সৎ স্বরূপ, সম্বিতে তিনি চিৎ-স্বরূপ, হ্লাদিনীতে তিনি আনন্দ স্বরূপ। তাঁহার লীলাময় ভাবে হ্লাদিনী বৃত্তিই প্রধান। সন্ধিনীর শুদ্ধশক্তির বিলাসরূপ প্রেমবৃত্তিতে সম্বিৎ অপেক্ষা আনন্দেরই প্রাচুর্য্য-ভাব হইলেও সম্বিৎ 'শূন্য' নহে। মায়িক প্রকৃতিও সর্বকালেই ত্রিগুণা। অতএব কর্ষণ-রূপ প্রেম যখন তিন বৃত্তিতেই সংঘটিত, তখন কখনও সম্বিৎ 'শূন্য' হইতে পারে না।

সেই ভক্তিই প্রেম-স্বরূপ। তবে যে তাহার গাঢ়-অবস্থাকে প্রেমরূপে নির্দেশ করা হয়, তাহার কারণ, পৌর্ণমাসীর ন্যায় ভক্তি নিত্য-পূর্ণ-প্রেমস্বরূপ হইলেও তাহার কলা-নির্দেশে ভক্তি, ভাব ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হয়। প্রেম নিত্য-আবরণশূন্যস্বরূপ; যখন শুদ্ধ-সত্ত্ব রজস্তম আবরণে আবৃত হয়, তখন ঐ আকর্ষণ বিপরীতমুখী হইয়া চিদ্‌বিলাস সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ত্যাগ করিয়া মায়িক বিলাসে ক্রিয়া করিতে থাকে, তাহাই মায়িক কামরূপে নির্দিষ্ট। এই কামেরই বিলাস-কলা-বিশেষ মায়িক-ভক্তি। বৈষ্ণব প্রেমের বা ভক্তির আদর করেন বটে; কিন্তু যাহা এই মায়িক কামগত, তাহা বৈষ্ণবে সম্পূর্ণ বর্জিত। কারণ, তাহা পরা ভক্তি নহে। পরা ভক্তিই বৈষ্ণবের পূজনীয়। অর্থাৎ বৈষ্ণব যেমন রজস্তম-আচ্ছন্ন সম্বিৎরূপ আপাত-জ্ঞানকে বর্জন করেন, তেমনি ঐ মায়িক ভক্তিকেও বর্জন করেন। বৈষ্ণব যেরূপ মায়িক জ্ঞানকে বর্জন করেন, তদনুরূপ মায়িক-প্রেমকেও (?) বর্জন করেন। যিনি অন্তর্মুখী সম্বিৎরূপ জ্ঞানকে মাথায় করেন, তিনি তদনুসঙ্গী প্রেমকেও মাথায় করেন। ফল কথা, বৈষ্ণবের শুদ্ধসত্ত্বগত সম্বিৎ ও প্রেমই পূজনীয়, মায়িক জ্ঞান বা প্রেম বর্জনীয়।

আত্ম-প্রতীতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই শ্রীহরির সেবা করেন। যখন আমাদের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইবে, তখন আমাদের নির্ম্মলা অস্মিতা-দ্বারা আমরা ভগবানের সেবা-বৈচিত্র্য উপলব্ধি ও প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন-দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীশ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করিয়া আর শ্যামসুন্দরের নিত্যসেবা ছাড়িব না,—আরও নব-নবায়মানভাবে সেবা করিতে থাকিব।

অনেক সময় আমাদের মনে হয়,—"দূর্ ছাই! ভগবানের সুখ হইলে আমার কি হইবে? 'সেবা'-শব্দে যখন কেবল ভগবানের সুখ-সন্ধান মাত্র, তখন ওসব ছাড়িয়া দিয়া ধ্যান-ধারণা-দ্বারা আত্ম-সুখানুসন্ধানই ভাল; ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া গেলেই আমাদের সকল দুঃখ থামিয়া যাইবে।" আমরা অনেক-সময় এইরূপ আত্মবিনাশকেই নিজের 'মঙ্গল' বলিয়া বরণ করিতে গিয়া নির্ব্বেদ-জ্ঞানী হইয়া পড়ি। যদি কোন ব্যক্তির কোন অঙ্গে স্ফোটক হয় এবং ডাক্তার যদি তাহার গলায় ছুরি দিয়া বধ সাধনপূর্ব্বক স্ফোটকের যন্ত্রণা হইতে চিরনিষ্কৃতি দিবার পরামর্শ দেন, তাহা হইলে এরূপ কার্য্যও পণ্ডিতাভিমানী কোনও কোনও অবিবেচক-সম্প্রদায়ে বহুমানিত হইলেও মূর্খতারই জ্ঞাপক। অসুরমোহনকল্পে বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ বা শঙ্করাবতার আচার্য্য-শঙ্কর এইরূপ আত্ম-বিনাশের দ্বারা আত্যন্তিকদুঃখ-নিবৃত্তির কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণকারী মহাবদান্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সেই প্রকার বিচারহীনতার কথা বলেন নাই।

শক্তিমান ও শক্তি-সম্বন্ধ-জ্ঞানই 'পর জ্ঞান'; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞান 'অপর জ্ঞান' বলিয়া নির্দিষ্ট। অন্য কথায় ভগবত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব যথার্থভাবে অবগতিই জ্ঞান। জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব ব্যতীত আর কোন ক্রিয়া নাই। এখানেই জ্ঞানের শেষ-সীমা। জ্ঞানবাদী আর অধিক দূর যাইবার অধিকারী নহেন। যাঁহার অনন্ত শক্তির একটীমাত্র বহিরঙ্গা শক্তি লইয়া জ্ঞানবাদিগণ অহঙ্কারশৈলের পরমোচ্চ-শৃঙ্গে আরোহণ করিতেছেন, সেই অনন্ত শক্তিমান্ সম্বিদ্-বিগ্রেহের শক্তির এক কণ লাভ করিবামাত্রই লব্ধ-জ্ঞান ও উদ্বুদ্ধ-স্বরূপ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানকে খদ্যোত-ময়ূখ জ্ঞান করিয়া প্রেম-কণা পাইবার জন্য জীব উন্মত্ত হন। এরূপ অবস্থায়ও যদি জ্ঞানবাদী পরব্রহ্মের সহিত আপনাকে সমজ্ঞান করিয়া জ্ঞানের সাহায্য অবলম্বন করাইবার পরামর্শ দেন, তাহা হইলে তাঁহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। জ্ঞানবাদী সম্বন্ধ-জ্ঞানেই আবদ্ধ। তাঁহার উদ্দেশ্য প্রয়োজন-সিদ্ধি নহে।

ধর্ম্মের প্রবেশিকা পরীক্ষাই জ্ঞানের সুদৃঢ় শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হওয়া। মানব যে-কাল-পর্য্যন্ত কর্ম্ম-গতে পতিত থাকেন,তৎকাল-পর্য্যন্ত তাঁহার ভোগবাসনা প্রবল থাকে। যখন তিনি কর্ম্ম-চক্রে ক্লান্ত হন, তখন কর্ম্মের বিরামই তাঁহার পক্ষে উপাদেয় হইয়া পড়ে। তিনি যে উপাদানে গঠিত, তাহাতে তাঁহার জ্ঞানের অনুশীলনই বাড়িয়া যায়। কর্ম্ম-আবরণ উন্মুক্ত হইলে জ্ঞানময় জীব জ্ঞানের চক্রে পড়িয়া থাকেন। জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত

দুর্দম কর্মচক্র হইতে মুক্তি নাই। জ্ঞানের চরম ফল—কর্মের বিনাশ। কর্ম-রাহিত্য জ্ঞানের গৌণ লভ্য বিষয়। জ্ঞানানুশীলন চরমে সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত পরিচয় করাইয়া নিরস্ত হয়। এতদূর্দ্ধে জ্ঞানের চলৎশক্তির আর অধিক গতি নাই। জ্ঞান কিছু প্রাপ্যবস্তু নহে। ইহার সাহায্যে অভীষ্ট লাভ হয়। জ্ঞান কেবল উপায়মাত্র, ইহা উপেয় নহে। জ্ঞান লাভ হইয়াছে বলিয়াই যে অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না; তবে অভীষ্ট-সিদ্ধির পথ নির্দিষ্ট হইয়াছে মাত্র। জীবের স্বরূপ জ্ঞানময়, এজন্য জ্ঞান একটি মুখ্য পদার্থ বলিয়া পরিচিত; কিন্তু জ্ঞান মুখ্য পদার্থ হইলেও উদ্দিষ্ট প্রাপ্য-পদার্থ নহে, উদ্দেশ জ্ঞান নহে, ইহা অপর বস্তু; ইহাই ভক্তি বা প্রেম। ভক্তি বা প্রেম উপায় হইয়াও তাহাই উপেয়। উপায়-জ্ঞানের সাহায্যে উপেয়-বস্তু লাভ হইলে জ্ঞানী-জীব কখনই আর জ্ঞান আলোচনা করিবেন না; তাঁহার জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন নাই। আমার লক্ষ মুদ্রা আছে বলিলেই দুই কড়া, চারি কড়া আছে,—এরূপ পৃথক্ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই, তবে জ্ঞানবাদীর সম্পত্তি সর্বশুদ্ধ এক কড়া; তিনি উহার অধিক গণনা করিতে শিখেন নাই। সুতরাং লক্ষপতির সম্পত্তির পরিমাণ করিতে সক্ষম না হইয়া অপগণ্ড শিশুর ন্যায় মধ্যে মধ্যে কুবাক্য বলিয়া ফেলেন। জ্ঞানানুশীলন পরিপক্ক হইলে অভিজ্ঞতা লাভ হয়। জ্ঞানীর অভিজ্ঞতা-লাভই প্রেমানুশীলন।

শিশু-জ্ঞানবাদী নিজ জ্ঞান-কাচকেই অধিক মূল্যবান জ্ঞান করতঃ প্রেমচিন্তামণিকেও সমজ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত নহেন। অভিজ্ঞ ভক্তগণ জানিয়াছেন যে, ক্ষুধাবশ-যোগ্য মানবের সুখাদ্য ভোজন-দ্বারাই ক্ষুন্নিবারণ করা কর্তব্য। এই ক্ষুন্নিবারণ-ব্যাপারে যদি অনধিকারী জ্ঞানবাদী আসিয়া বলেন যে, ক্ষুধাটা কি, কেবল তাহার আলোচনা করাই কর্তব্য, আস্বাদন না করিয়া কেবল আলোচনা করিলেই কার্য সম্পন্ন হইবে, তবে তাহা জ্ঞানের নামে অজ্ঞানতা ব্যতীত আর কি? যে-কাল-পর্যন্ত আলোচনা ভোজন-প্রবৃত্তি হইতে ন্যূন থাকে, সেইকাল পর্যন্তই ব্রহ্ম-জ্ঞান, সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রভৃতি কথায় সময়-ক্ষেপ ভাল লাগে। জ্ঞানানুশীলন বা আলোচনাই যদি কেবল ধর্ম হয় এবং আলোচনায়ই যদি তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানবাদী ও ভক্তের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্থপতিগণের উদ্দেশ্য—প্রাসাদ-প্রস্তুতকরণ এবং রাজন্যবৃন্দের উদ্দেশ্য—উহাতে অবস্থিতি। মোদকের উদ্দেশ্য—মিষ্টান্ন-রন্ধন, ক্ষুধিতের উদ্দেশ্য—উহার আস্বাদন বা ভোজন। জ্ঞানবাদী ও ভক্তের যদি উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়,তাহা হইলে জ্ঞান-সেবককে ভক্তের সহিত সমীকরণ-প্রয়াস ত্যাগ করিতেই অনুরোধ করি।

ভক্ত—বুভুক্ষু (অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের আস্বাদক); তিনি যে-কোন প্রকারেই হউক না কেন, তাঁহার অভীষ্ট-খাদ্য-সম্বন্ধে প্রয়োজনমত জ্ঞানসংগ্রহ অবশ্যই করিয়াছেন; তিনি ভোজনকালে হরিদাস মোদক বা রামদাস মোদকের পূর্ব-পুরুষ জাতিতে নরসুন্দর ছিল, বা শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় মোদকত্ব লাভ করিয়াছে, এই প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডাকে

ভোজনের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন না। ভোজনের পূর্বে তিনি এই আশ্বাস পাইয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বে মহাজনগণ ঐ খাদ্য লাভ করিয়া অভীষ্টপ্রীতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা মায়াবাদ-বিষ ভক্ষণ করিয়া আত্মবিনাশ সাধন করেন নাই। কেবল-ব্রহ্মজ্ঞান, নির্বিশেষ-জ্ঞান, কপিলের প্রকৃতি-জ্ঞান প্রভৃতি শিশু-প্রমোদকারী বিষময় লড্ডুক তাঁহাদের গ্রহণীয় বিষয় নহে। আত্মজ্ঞান, আত্মানুভূতি, শক্তিমত্তত্ত্ব, শক্তি প্রভৃতির সম্বন্ধজ্ঞান প্রেমিকের আস্বাদনীয় পদার্থের চমৎকারিতা সাধন করে। অমৃতময় ও বিষময় খাদ্যের ভেদ-বিচারে তাঁহাদের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। কত ছানা ও কত মিষ্ট লাগিয়াছে এবং কি প্রকারে কাহার দ্বারা কিরূপ ভাবে খাদ্য প্রস্তুত হইল, তাহাতেও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই, এ কথা বলিয়া অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা অপগণ্ড জ্ঞানবাদীর পক্ষেই শোভা পায়। শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানবাদীর বিষময় লাড্ডুর আমূল-প্রস্তুত-করণপ্রণালী বিষয়ে ও তদাস্বাদনে যে আত্মবিনাশ লাভ হয়, তদ্‌বিষয়ক বিচারের উপদেশ করিতে সমর্থ অনেক ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তাঁহারা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া জ্ঞানবাদী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানে জ্ঞানী বলিয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেন না। জ্ঞানবাদীর উপকারের জন্য আচার্যবর শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী তদীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ভক্তি-সম্বন্ধে যাহা কীর্তন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া নতশিরে গ্রহণ করাই জ্ঞানীর পক্ষে মঙ্গল। ক্ষুদ্দহনই জ্ঞানীর জ্ঞান-চেষ্টা, তাহাই যদি অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে ধর্ম আর কি হইল?

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৫)

(ভুক্তি-স্পৃহা ও মুক্তি-স্পৃহা,—এই দুইটি পিশাচী; যে-পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্তমান থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তি-সুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।)

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

(ভাঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

(অনুকূল-ভাবে কৃষ্ণ-বিষয়ক অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই; তাহা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতিদ্বারা আবৃত নহে।)

ভক্তিকে যিনি উপাদেয় বলিয়া স্বীকার করিলেন, তিনিই পরম-জ্ঞানের অভীষ্ট-ফল লাভ করিলেন। জ্ঞানময় জীবের যে-কোন উপায়দ্বারা উপেয় ভক্তি লাভ করাই উদ্দেশ্য। উপেয় নির্দ্দিষ্ট হইলে পুনরায় উপেয় নির্দেশ করিতে গিয়া বিকৃত মস্তিষ্কের ন্যায় জ্ঞানমল মৃক্ষণ করা কর্তব্য নহে। যদি জ্ঞানের সাহায্য তখনও আবশ্যক হয়, তাহা হইলে

ভক্তির উদয় হয় নাই, বলিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান সম্যক্ লাভ হইলে যে ভাবপ্রাপ্তি হয়, তাহা এত ক্ষুদ্র যে, তাহাকে 'ভক্তি' বা 'প্রেম-কণা' সংজ্ঞা দেওয়া তাহার প্রশংসা-মাত্র। শ্রীপাদ তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি।।
(ভঃ রঃ সিঃ ১।১।২৫)

(যদি ব্রহ্মানন্দ-সুখকে দ্বিপরার্দ্ধ-সংখ্যার দ্বারাও গুণ করা যায়, তাহা হইলেও ঐ ব্রহ্মানন্দ-সুখ ভক্তি-সুখ-সাগরের পরমাণু-তুল্যও হইতে পারে না।)

জ্ঞান সাধন করিয়া, খাদ্যদ্রব্য পাক করিয়া, মুচি হইয়া পাদুকা প্রস্তুত করিয়া যদি ভক্তির উপাদেয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান না হয়, ভোজন-সুখোদ্দেশ্য সিদ্ধি না হয় ও পাদুকার ব্যবহার না হয়, তাহা হইলে এই জ্ঞান সাধন করিয়া, খাদ্য পাক করিয়া এবং চর্মকার-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমস্তই বৃথা পরিশ্রমে পর্য্যবসান করাই জ্ঞানবাদীর উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। চর্মকার-বৃত্তির আমূল-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলেই কি পাদুকাধারীর অভীষ্ট লাভ হইবে,—না পাদুকা পরিধান করিলে অভীষ্ট পাওয়া যাইবে? ভক্তের জ্ঞানালোচনার আবশ্যক কি? ঐ প্রকার বাল-চাপল্যের দিনে অর্থাৎ ভক্ত হইবার পূর্বে তিনি ত' নিজের পাণ্ডিত্য বিকাশ করিয়া তাহার অকর্মণ্যতা বুঝিয়াই ছাড়িয়াছেন। তবে কেন আবার তাঁহাকে বৎস্যের দলে প্রবেশ করিতে অনুরোধ?

জ্ঞানবাদীই সংস্কার-কুসংস্কার প্রভৃতি অবস্থার দাস। লব্ধ-জ্ঞান হইলে সুসংস্কার বা কুসংস্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের সিদ্ধান্ত হয়, তখন আর পুনরায় জ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানবাদিগণ নিজের নিজের সম্প্রদায়ের সভ্যগণের মনোগত ভাবের তালিকা সংগ্রহ করিলে তাঁহারাই পরস্পর একজন অপরকে কুসংস্কারে আবদ্ধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিবেন। হাক্সলি, চার্বাক, ডারউইন (Darwin) প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞানবাদী আধুনিক বৈদান্তিক জ্ঞানবাদীকে কুসংস্কারাপন্ন হেয় জ্ঞান করিবেন ও নানা আবর্জনা-কূপে বদ্ধ মনে করেন।

হে সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িক-উন্নতিশীল জ্ঞানবাদিন্! তোমার আবর্জনাগুলি জ্ঞানাতীত ভক্তের পূত-কলেবরে নিষিক্ত করিবার কেন প্রয়াস পাও, জানি না। তোমার আবর্জনার পূতি-গন্ধে দিক্‌সকল আপূরিত করিবার প্রয়াসই অজ্ঞান অনুশীলনের পরিচয়। যেহেতু তোমার জ্ঞান লাভ হয় নাই। যদি তোমার জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা বাস্তবিক কোন উপকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়া তোমারই মত কোন এক কুসংস্কারের আবর্জনার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছ। তোমার আবর্জনা পরিষ্কারের আর উপায় নাই। তোমার দ্বিহৃদয়-বাক্যে নিতান্ত অশ্রদ্ধা উৎপাদন করাইতেছ। সিদ্ধান্ত হইয়া গেলে আর জ্ঞানানুশীলনের আবশ্যকতা থাকে না।

জ্ঞানের-লভ্য, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় বিষয়রূপে যদি ভক্তি বা প্রেম স্বীকৃত হইল, তবে আবার তাহাকে কি নিমিত্ত মলযুক্ত করিবার প্রয়াস হয়? যাত্রা-দলের বৈষ্ণব-সজ্জায় সজ্জিত নায়ককে 'বৈষ্ণব' অভিধান করা কতটা জ্ঞানের কার্য, জ্ঞানবাদীই তাহা বলিতে পারেন। যাত্রা-দলের জ্ঞানবাদী বা ব্রহ্মবাদী সাজিয়া ঐ নামে পরিচিত হইলে যাত্রাওয়ালার অন্য সময়ের ব্যবহার বা তাহাতে জ্ঞানবাদীর বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিয়া জ্ঞানবাদের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই বা কি প্রকার প্রবৃত্তির পরিচয়, বুঝা যায় না। জ্ঞানবাদী সাজিয়া অজ্ঞানবাদকে জ্ঞান বলিয়া পরিচয় দিবা-মাত্রই যে অন্ধবিশ্বাস-বশে তাহাকে লব্ধজ্ঞান ঋষি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ ত' যথার্থ-জ্ঞানবাদী স্বীকার করিবেন না। জ্ঞানবাদের অধীনেও যে এইপ্রকার নীচ-হৃদয়গণ আশ্রয় লাভ করে নাই বা করিবে না, এরূপ কে আশ্বাস দিতে পারে? এই শ্রেণীর লোকের জন্য মহাজনগণ অদূরদর্শী জ্ঞানপ্রিয় ব্যক্তির নিকট উপহাসিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। প্রেমধর্মে জ্ঞানরূপ মল প্রবিষ্ট হইয়াই নানা উপধর্মের সৃষ্টি করিয়াছে। ভক্তিদেবীকে আহত করিয়া, নিজ সঙ্কীর্ণ জ্ঞানকে প্রবেশ করাইয়া, কপট ভক্ত সাজিয়াই ভক্তিতেও মায়াবাদ-বিষ আরোপণ করিবার প্রয়াস অনেক বারই হইয়াছে। ভক্তিকে জ্ঞানাধীন করিতে গিয়াই নিজ-অপরিণাম-দর্শিতার প্রতি লক্ষ্য কম হইয়াছে; তাহাতেই বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি ভক্তিবিরুদ্ধ অপধর্ম-সকলও পবিত্র-ধর্মের অন্তর্গত বলিয়া অর্বাচীনগণের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি নাম ত্যাগ করিয়াও আজকাল কতকগুলি ঐ প্রকার জ্ঞানী ভক্ত-সম্প্রদায় মায়াবাদমূলে ভক্তি প্রচার করিয়া মূর্খদিগকে হিতাহিতবোধ-রহিত করিতেছে। এই প্রকার সম্প্রদায়েরও আজকাল বড়ই প্রতিপত্তি দেখা যায়।

যাত্রার দলের বৈষ্ণব বা জ্ঞানীর স্বগত চরিত্র হইতেই তত্তদ্ধর্ম্মের আচার্য্যগণের অদূরদর্শিতার আরোপ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই স্বার্থপরের মুখে শোভা পায়। জ্ঞানকঙ্কর ভক্তি-ক্ষীর-নবনীতের মধ্যে নাই বলিয়াই যে উহা পচিয়া যাইবে, এই ভয়ে কেবল জ্ঞানকঙ্কর আস্বাদন করিতে হইবে,—এরূপ নহে। বিশুদ্ধ ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া তাহাই সেবন করা কর্তব্য। জ্ঞান-কঙ্করে মিশ্রিত করিলেই ক্ষীর বা নবনীত নিশ্চয়ই বিকৃত হইবে। নবীন প্রস্তাবকের কুমত সমর্থন করিয়া সনাতন-জৈবধর্ম পরিবর্ত্তন করিতে গেলে বাউলিয়া, কর্তাভজা, নবগোরা, থিয়সফি, নবযুগীয় ব্রাহ্ম, তান্ত্রিক, বৈদিক-নামধারী সুবিধাবাদি-সম্প্রদায়সমূহ সৃষ্ট হইবে। ভক্তি জগতে লোপ পাইবে। জ্ঞানবাদিগণ যতই কেন পোষাক পরিয়া ভক্তের নিকট মনোগত ভাব অব্যক্ত রাখিবার চেষ্টা করুন না, তাঁহার হৃদেয় মায়াবাদ-বীজ ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিবেই করিবে। এই জন্যই কলিপাবন অকৃত্রিমদয়াধার শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র মায়াবাদীর সঙ্গ-ত্যাগই ভক্তি-বৃদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। এই জ্ঞানি-দলে কোথাও মায়াবাদ সুপ্ত অবস্থায়, কোথাও

বা মূর্তিমান্ হলাহলরূপে বিরাজিত। অভক্ত মায়াবাদিগণ বিভিন্ন স্তরে স্থাপিত হইলেও ব্রহ্মবিরোধী, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। পবিত্র ভাস্কর-স্বরূপ প্রেমকে সামান্য ব্রহ্মজ্ঞানরূপ খদ্যোত-ময়ূখে অধিক আলোকিত করিবার প্রয়াসই কুকর্ম। এই কুকর্মটা অপরিণামদর্শী জ্ঞানবাদীর দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকের অনুগ্রহ কম হইলেই সাধারণে ভক্তির বিশুদ্ধতা অধিক উপলব্ধি করিবে।

"বৈকুণ্ঠ-ভগবানের সেবাই জীবের নিত্যধর্ম। জগতে অবৈকুণ্ঠ রাজ্যে যে সকল বস্তুর পশ্চাতে জীবসকল ধাবিত হয়, সে সকলই জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গাধীন। অসতে-অনিত্যে 'সত্য-নিত্য' বুদ্ধি করিয়া সুখের বিনিময়ে দুঃখই মানবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে; কিন্তু মানব যখন বুদ্ধিমান্ হয়, তখন সাধুসঙ্গে সেই অশোক, অভয়, অমৃতাধার ভগবানের পাদপদ্ম-সেবায় জীবন উৎসর্গ করে। শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবাই জীবের সাধ্য-পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর আপামরকে সেই সেবাশ্রী-প্রদানের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীনামাশ্রয়দ্বারা সেই কৃপা লব্ধ হয়, এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'ভোগ ও ত্যাগ' উভয়কেই বর্জন করিতে বলিয়াছেন। চক্ষু, কর্ম, নাসাদির দ্বারে জড় রূপ, শব্দ ও গন্ধাদির গ্রহণই ভোগ। এই ভোগে আপাততঃ ক্ষণিক সুখ থাকিলে পশ্চাতে দুঃখের পরিমাণ সুখ অপেক্ষা অনেক বেশী। এই কারণে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগেরই আদর।

"ত্যাগ বা বিরাগ বড়ই ভাল। কিন্তু যে বিরাগে—ত্যাগে—'নেতি' 'নেতি' করিয়া ত্যাগ করিতে করিতে শেষে পরমেশ্বর পর্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছেন, সে ত্যাগ ঐ ভোগেরই আর একটা দিক্। জগৎকে যাঁহারা 'মিথ্যা' বলেন, কাকবিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করেন, তাঁহাদের বিচার ভ্রান্তি-পরিপূর্ণ। কেননা, তাহাতে সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সৃষ্ট্যাদি শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। বিশ্ব—সত্য, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই নশ্বর ধর্মযুক্ত—এই বিচারই বেদান্তবিদ্গণের একমাত্র সুষ্ঠু বিচার।

ভোগ যেমন বস্তুতে ভগবানের আন্তর অবস্থান দেখিতে দেয় না, ভোগীকে ভোগ দিয়া ভোক্তা সাজায়, ত্যাগও সেই প্রকার সকল বস্তুই যে ভগবানের সেবোপকরণ, তাহা বুঝিতে অবসর দেয় না; ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা আনয়ন করে। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবারাণসীক্ষেত্রে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে শিক্ষাদানকালে 'ভোগ ও ত্যাগ' সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও সুকৌশলপূর্ণ দুইটি শ্লোক বলিয়াছেন;—তাহাই শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।১।।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।২।।

বিষয়সমূহই বিশ্বের বৈভব। সেই রূপাদি বিষয়সমূহ আবার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গতি। সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকল গ্রহণে কখনই পরাঙ্মুখ হইবে না বা বিরতি লাভ করিবে না। যদিও মাঝে মাঝে বাহ্য ইন্দ্রিয়কুল সংযত করিয়া বিরাগবিশিষ্ট জনগণ বাহিরে বৈরাগী সাজিয়া থাকেন, তথাপি ইন্দ্রিয়বর্গের রাজা মন, তাহার মানস ইন্দ্রিয়দ্বারে সকলের অজ্ঞাতসারে বিষয়ভোগেই বিভোর হইয়া থাকে। আবার যদি কেহ বৈরাগ্য-লাভের জন্য বিষয়গ্রহণের দ্বার-স্বরূপ ইন্দ্রিয়সমূহের বিনাশ-সাধনে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে বৈরাগ্য-লাভের পূর্বেই ইন্দ্রিয়বিয়োগ-দুঃখ ঐ বৈরাগীকে ব্যথিত করে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারে বিষয়ীর ও বিষয়ের স্বরূপ-বিষয়ক বিজ্ঞানেরই আদর দেখা যায়।

আমার দেহী। আমরা দেহ নাহি,—দেহ আমাদের সম্পত্তি। সেই দেহ দুই প্রকার,—স্থূল ও সূক্ষ্ম। ক্ষিত্যপাদি-নির্মিত বাহিরের দেহ—স্থূল; আর মনো-বুদ্ধি-অহঙ্কার-নির্মিত ভিতরের বাসনাময় দেহ—সূক্ষ্ম। দেহী বা যাহার দেহ, সেই আত্মা, ঐ দুই প্রকার আবরণের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সেই আত্মা জড় দেহ বা সূক্ষ্ম দেহের ন্যায় জড় বস্তু নহে—চৈতন্য বস্তু। আমি পরম চৈতন্যপূর্ণ বিভু-চৈতন্য ভগবানের অণুমিত অংশমাত্র। সেই অণুচৈতন্য আত্মা যখন নিজের কথা—স্বরূপের কথা স্মরণ রাখেন, তখন তিনি এই জড় জগতের জড় বিষয়ভোগে প্রমত্ত হন না। বরং বস্তুর অভ্যন্তরে—বিষয়ের অন্তরে স্বীয় প্রভুকে বিরাজিত দেখিয়া কৃষ্ণকার্ষ্ণময় দর্শনে মহাভাগবতের লীলা করেন। আর যখন দুর্ভাগ্যক্রমে—দুর্দৈব-বশতঃ স্বরূপের রূপে আকৃষ্ট না হইয়া বিরূপকে—বাহ্য দেহদ্বয়কে 'আমি' বলিয়া অভিমান করেন, তখনই সেই বদ্ধ আত্মা ইন্দ্রিয়-সমাবিষ্ট জড় দেহদ্বারে জড় বিষয়ভোগে ভোগী হইয়া পড়েন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীরূপ প্রভুকে শিক্ষা দিবার পরে বারাণসীতে শ্রীল সনাতনপ্রভুকে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব বিজ্ঞান বলিয়াছেন। কাশী তখন জ্ঞানকাণ্ডীয়—শুষ্ক জ্ঞানালোচনাকারিগণের বসতিস্থল। সকলেই নিত্য, শুদ্ধ, সনাতন আত্মার ধ্বংস-চেষ্টায় ব্রহ্মৈক্যবাদ-বিতণ্ডায় বিব্রত। এ হেন বিপদের—মহাবিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পরমোদার শ্রীগৌরসুন্দর প্রথমে 'আমি'র বিচার—আত্মার বিচার—জীব-স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে পরস্বরূপ বা ভগবৎস্বরূপের বিচার উত্থাপন করিলেন। এই বিচারে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে সকলের সকল বিচার কুবিচারে পরিণত হইয়া সর্বানর্থ—অনর্থ হইতেও অনর্থের উৎপত্তি হয়।

সম্বন্ধ-বিচার বলার পর মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে অভিধেয়তত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করিলেন। আমরা চেতন, কর্মই আমাদের স্বরূপের চৈতন্য-বিষয়ক চৈতন্য দান করে। কিন্তু যে

কর্ম বর্তমানে আমাদিগকে চৈতন্য আত্মার জ্ঞান লোপ করাইয়া চেতন রাজ্যের বিপরীত অজ্ঞানের দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহারই দিক্ পরিবর্তন করিয়া—উদ্দেশ্য স্থির করিয়া বলিলেন,—

'লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।'

জড় ইন্দ্রিয়ের সুখের আশায় আশান্বিত হইয়া আমরা কার্য করি; কিন্তু আমাদের স্বরূপের—আত্মার প্রভু সেই শ্রীভগবানের সেবার জন্য যদি আমাদিগের লৌকিকী, বৈদিকী এবং সকল ক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেই কর্ম জড়-সুখ-দুঃখ-ভোগদায়ক না হইয়া অচ্যুতের সেবা-অনুষ্ঠান-বিধায় অচ্যুতে ভক্তি প্রদান করে।

সুতরাং কৃষ্ণভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে জীবনধারণকালে যাবতীয় বস্তু ভগবানের সেবোপকরণ-জ্ঞানে ভজনের অনুকূলে বিষয়-গ্রহণই 'বিরাগ'। সেই বিরাগ-বিশিষ্ট বস্তু পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে রাগ বা রতি উৎপন্ন করাইয়া ভোগ্যজ্ঞানে বিষয়ভোগে বিগত রাগ বৈরাগ্য আনয়ন করে।

যাঁহারা হরিসেবানুকূল বস্তু বা বিষয়সমূহের প্রাপঞ্চিকতায় বিরক্ত হইয়া নিজ নিত্য হরিসেবক আত্মার হরিদাস্যের প্রতিও বীতরাগ হন স্বয়ং এবং অপরের দ্বারা সেব্যের সেবা সংহার করবার প্রয়াস করেন, তাঁহারা আত্মবিনাশী ফল্গু বৈরাগী বা ত্যাগী।

ত্যাগ বা ভোগ আত্মার বৃত্তি নয়, ভগবদ্-ভাগবত সেবাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। মুক্ত আত্মা বৈকুণ্ঠে নিজ সেব্যের সেবা-বিভোর, আর বদ্ধাত্মা বদ্ধাবস্থা হইতে শুদ্ধ বা মুক্তাবস্থায় যাইবার জন্য ভগবৎপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়গুলি ভোগানুকূলে গ্রহণ করেন না, ত্যাগানুকূলে ত্যাগও করেন না, কেবল সেবানুকূলে গ্রহণ ও প্রতিকুলে ত্যাগ করেন। তিনি শ্রীরূপানুগবর্য শ্রীগুরুদেবের দয়া উপলব্ধি করিয়া বলেন,—

'বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রাখে কি কারণ?'

আর সাধনাবস্থায় সিদ্ধির অনুকূলে শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রার্থনা করিয়া বলেন,—

'(কবে) দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া।'

ফল্গুত্যাগিগণ কামক্রোধাদি যে রিপুবর্গকে বিজয় করিবার জন্য লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া—অভ্যাস-অনাহারাদির দ্বারা কঠোর পরিশ্রম করিয়া সময়ান্তরে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর সমাগমে প্রবল বেগে পরিত্যক্ত বিষয়ে প্রসক্ত হইয়া পড়েন, ভোগিগণ যে রিপুষট্‌কের হস্তে লাঞ্ছিত পদতাড়িত হইয়া দুঃখ—অতিদুঃখ-নিষ্পেষিত হয় এবং বিষয়ান্তর বা গত্যন্তর না পাইয়া উচ্ছিষ্ট—চর্বিত বস্তু পুনশ্চর্বণে নিযুক্ত হয়, শ্রীরূপ-

শিক্ষায় সুশিক্ষিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগ্রহভাজন, ভোগ-ত্যাগে উদাসীন ভক্তিযোগিগণ সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা—হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা-ফলে হৃদয়ে ভক্তিসাম্রাজ্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীগুরুবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহারা বলেন,—

"কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদ-মাৎসর্য-দম্ভ-সহ
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব।।
'কাম' কৃষ্ণ-কর্মার্পণে 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা।।
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার' ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।।
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভ-মোহ এই ত' কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ।।
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন।।"

ভোগবার্তা-প্রচারকের কোন বিপদ নাই, অসুবিধা নাই। কিন্তু ভগবানের সেবার কথা—আত্মার নিত্যবৃত্তির কথা—জীবের জীবন-সর্বস্ব ভক্তির কথা—প্রচার করিতে গেলে প্রতিপদে বিপদই লাভ হইবে—পদে পদে অসুবিধা আসিয়া নিরুৎসাহ করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু জানিতে হইবে যে সেই বিপদ—সেই অসুবিধা আমাদের প্রভুভক্তির প্রভুসেবা-বুদ্ধির পরিমাণ পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে এবং আমাদিগকে উত্তরোত্তর সেবাপথে অগ্রসর হইবার সহায়তা করিতেছে। এই সময় নামাচার্য ঠাকুর হরিদাস ও ভক্তরাজ প্রহ্লাদের সেবা-সহিষ্ণুতা-সুমেরুর আদর্শ আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। মানুষ মোহগ্রস্ত হইয়া অনিত্য বস্তু লাভ করিবার জন্য শত শত জন্ম বঞ্চিত হইতেছে।

সহস্র সহস্র উদাহরণ দেখিয়াও মানুষ যদি এক ঘেয়ে ভাবে তুচ্ছ জিনিষের জন্য বাধা-বিপত্তিতে বিহ্বল না হইয়া জীবনপর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে কি বুদ্ধিমান্ জনগণ, আদি, মধ্য, অন্তে সত্য—ত্রিকাল সত্য—নিত্য সত্যের জন্য নিত্য জীবনের নিশ্চলা চেষ্টা নিযুক্ত করিতে পারিবেন না?

ভগবানের সেবা করেন যাঁহারা—ভগবানের ভক্ত যাঁহারা, তাঁহাদের সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। ভক্তগণ ভগবানের সেবা সার করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ এবং ভগবানের লীলাকথাকেই জীবন-সর্বস্ব করিয়া সর্বদা সেই সকলের আলোচনা করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভগবানের যে আলোচনা হয়, আর ভক্ত-মণ্ডলীতে যে আলোচনা হয়, তাহার মধ্যে পার্থক্য ত' আছেই; পরন্তু একেবারেই বিপরীত। সাধারণ্যে অনেকেই ঐহিক এবং পারলৌকিক সুখের জন্য ভগবান্‌কে সুখ-দাতা জানিয়া ভজন করেন, আবার বেশী বুদ্ধিমান্ বাহিরে ত্যাগী হইয়াও অন্তরে ভোগিশ্রেষ্ঠ সর্বভোক্তা ভগবানের সমান হইয়া তাঁহার সঙ্গে মিশিবার জন্য ভগবদুপাসনার ভান করেন; আর মধ্যম লোকেরা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে উপাসনা করেন। ইহাতে উপাসনার অভিনয় থাকিলেও উপাস্য ভগবানের নিত্য-নাম-রূপাদি স্বীকৃত হয় নাই; তাঁহারা সর্বপ্রভু পরমেশ্বরকে কর্মাধীন জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ এই শ্রেণীর উপাসকগণ (?) ভগবানের সেবার জন্য—সুখের জন্য সেবা করেন না; প্রভুকে দিয়া নিজেদের সেবা করাইয়া লইবার যত্নবিশিষ্ট।

ভক্তগণের ভাব পৃথক্। তাঁহারা ইহলোকের, পরলোকের, দেহ-গেহাদির সুখের সিদ্ধির, এমন কি মানুষের মহামৃগ্য মুক্তিরও অপেক্ষা রাখেন না—প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁহারা স্বভাবে—ভাবে ভাবে—হৃদয়-ভবনে ভগবানেরই সেবা করেন। সেই সেবা-প্রবৃত্তি কোন বাধা মানে না। সাগরের অভিমুখে অতিদ্রুত প্রবাহিণী গঙ্গা-ধারার ন্যায় উঁচু-নীচু সকল স্থান ডুবাইয়া—সম্মুখের সব বাধা বিদূরিত করিয়া ছুটিতে থাকে। সেই ভক্তি-প্রবাহের বাধা নাই—বিপত্তি নাই—বিরাম নাই; তাহা প্রাণারামের রমণের জন্য—নয়নাভিরামের নয়নে নব-নবায়মান রমণীয়রূপে স্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহারই কোটিচন্দ্রসুশীতল পদতল বিধৌত করিয়া সেই পদতলেই অবস্থান করে। ভক্তগণ ভগবানের সেবায় সতত যুক্ত। অন্যত্র অন্যবিষয়ে অন্য কার্যে যুক্ত—প্রবণচিত্ত, সেই নিত্যযুক্ত যোগিগণের বিক্রীতাত্মস্বরূপে বৃত্ত রচনার সুযোগ পায় না। ভগবানের ভক্তগণ—সেবকগণ ভগবানের সেবায়, ভগবানের ভক্তের সেবায় প্রীতিযুক্ত—নিত্য প্রীতিযুক্ত। দেহ ও দৈহিক স্ত্রীপুত্রাদিতে, গেহ ও গৃহসম্বন্ধীয় স্বজনে, পাল্য পশুপক্ষী প্রভৃতিতে এবং বৃত্তি-কুলাদিতে প্রীতি প্রয়োগের প্রাণ তাঁহাদের নাই। প্রাণের প্রাণ—সর্বপ্রাণ—প্রাণ-পরেশের প্রীতিতে পড়িয়া তাঁহারা প্রাণপণে প্রপন্ন। এহেন ভক্তগণ—

ভাগবতগণ ভগবান্‌কেই সার করিয়াছেন এবং ভগবানও ভক্তগণের ভাবে আবদ্ধ হইয়া সারাৎসার হইয়াও তাঁহাদিগকে সার করিয়াছেন।

ভক্তগণ যে ধর্মের কথা বলেন, তাহার সন্ধান ভাগবতে আছে। সেই ধর্ম লৌকিক ধর্ম নয়—পারলৌকিক ধর্ম নয়—সেই ধর্ম কোন বর্ণ-বিশেষের কিম্বা আশ্রমবিশেষের পালনীয় ধর্ম নয়—সেই ধর্ম জগতের কোন দেশ-বিশেষের অধিবাসীর জন্য মাত্র নির্দিষ্ট নয়—সেই ধর্ম বালক-বৃদ্ধ-যুবা-স্ত্রী-পুরুষভেদে—পশু পক্ষী-কীট-পতঙ্গভেদে নয়, পরন্তু সেই ধর্ম সার্বদেশিক, সার্বকালিক এবং সার্বজনীন—সেই ধর্ম দেহের নয়, মনের নয়—আত্মার। সেই ধর্মই নিত্য ধর্ম, সনাতন ধর্ম এবং জৈব ধর্ম।

সেই ধর্ম—কৈতবরহিত। কৈতব—ছলনা বা কপটতা। সেই ধর্মে ধর্মযাজনকারীর দেহসুখ, মনঃসুখ অর্থাৎ ভুক্তি বা ভোগ, সিদ্ধি অথবা মুক্তি বা মোক্ষলাভের লোভ দেয় না। যেই ধর্ম ভোগা দিয়া প্রথমে ধার্মিককে, ধন-জন-অর্থাদি-কামীকে ধনজনাদি-প্রদানে সাময়িক সুখে প্রমত্ত করিয়া পরে পুনরায় সেই সুখ-নেশার বস্তুগুলি ধার্মিকের হাত হইতে ছিনাইয়া লয়, এইধর্ম সেইরূপ কপট ধর্ম নয়। আবার যেই ধর্ম সিদ্ধিকামীকে সিদ্ধি-সংগ্রহের সুযোগ দিয়া শেষে ঋদ্ধি-সিদ্ধি-ভোগে প্রমত্ত করিয়া এবং পরিশেষে ঋদ্ধি-নেশার অবসানে পুনরায় পূর্ব হইতে অধিক দুঃখ প্রদান করে, এইরূপ পরিণামে সিদ্ধিনাশক ধর্ম—ভাগবত-ধর্ম নয়। অথবা যেই ধর্ম আদিতে সাধককে 'নেতি নেতি' নীতি-নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া ভোগসিদ্ধির পরপারে ভগবান্ হইবার ইচ্ছা প্রবল করিয়া ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছায়—বৃক্ষ-প্রস্তরাদি স্থাবরদেহলাভে লোভ-লাস্যের পরিচারিণী করে, এই ধর্ম ঐ প্রকার বিষকুম্ভপয়োমুখ-ধর্ম নয়; পরন্তু ইহা সেই মুক্তি-স্পৃহা-পিশাচি-পরিত্যাগকারী একমাত্র পরমহংসগণের পরিপালনীয় পরম-পুরুষ-প্রণীত পরম ধর্ম। এই ধর্ম শুধু তাপত্রয়-ত্রাতা নহেন, উহা ত্রিতাপোন্মুলনকারী শিবদ বা নিত্য মঙ্গলপ্রদ। এই ধর্মে ধার্মিকগণ—সাধকগণ ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-লোভে লুব্ধ না হইয়া লোভ-মোহের পরপারে পরম পুরুষের সেবা লাভ করেন; আবার কেবলমাত্র সেই সর্ব-স্বরূপের স্বরূপ ঈশ্বরস্বরূপের সেবায় সন্তুষ্ট না হইয়া—সংপ্রীত না হইয়া সেই সর্বসেব্য ভগবান্ যিনি সেবা-বিগ্রহগণের সেবা-লোভে লুব্ধ হইয়া, বিমুগ্ধ হইয়া সেব্যপদবীর পরমোচ্চ পদবী হইতে পদপ্রান্তে পতিত পতি-পরিজন-পরিত্যক্ত গোপ-ললনাগণের ললিত রমণ হইয়া, গোপ্য হইয়া, পাল্য হইয়া, সেবক হইয়া লাল্য হইয়া সেবকের সেবক হন, সেই অহৈতুকী নির্মলা সেবায় বাধ্য, ভক্তিবাধ্য, ভক্তের ভক্ত ভগবানের ভজন-রহস্য প্রদান করিয়া থাকেন।

সহজে এক কথায় বলিতে হইলে আমরা মহাপ্রভুর মহোপদেশে দেখিতে পাই,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

অতএব ভক্তসঙ্গে সর্বস্বের সেবায় সর্বস্ব সমর্পণকারী, ভাগবত-স্বরূপ ভক্তগণের সঙ্গে ভাব-স্ফূর্তি ভাগবতের আলোচনা ও উভয়বিধ ভাগবত-সেবার দ্বারাই সহজে ভগবানের সেবা লাভ হয়।

গীতায় শ্রীভগবান্ সকল প্রকার ধর্ম্ম ছাড়িয়া তাঁহার চরণে শরণ-গ্রহণের কথা বলিয়াছেন। যেই ভগবান্ গীতার অন্যত্র স্বয়ং উপদেশ করিয়াছেন যে, স্বধর্ম ছাড়িয়া পরধর্ম গ্রহণ করিলে কোনও শুভোদয় হয় না—স্বধর্মে থাকিয়া নিহত হওয়া ভাল, তবুও ভয়াবহ পরধর্ম যাজন করা উচিত নয়, সেই ভগবান্ আবার বলিয়াছেন,— তোমাদের যাবতীয় ধর্ম পরিত্যাগ কর। এই উভয়বিধ ভগবদ্‌বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? মানব নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, পারদর্শিতার প্রভাবে পুরুষোত্তম ভগবান্‌কে জানিতে পারে না। ভগবানেরই কৃপায় লোকে ভগবান্‌কে জানিতে পারে। আমরা যদি সেই কৃষ্ণচন্দ্রের ঔদার্যময়-লীলা প্রকটকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর—যিনি কৃষ্ণ হইয়া কৃষ্ণের কথা— নিজের কথা চৈতন্য বা জ্ঞান দিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহার কথা আলোচনা করি, তবে এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সুষ্ঠুভাবে পাইতে পারি। মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করিতেছেন। বাংলার বাদশাহ হোসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী সাকরমল্লিক বা শ্রীসনাতন প্রভু তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর নিকট তিনি প্রশ্ন করিলেন,—

'কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়?
ইহা না জানি—কেমনে হিত হয়।।'

ইহার উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।।
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার দুঃখ।।'

শ্রীচৈতন্যদেব সম্মুখে উপস্থিত ব্যক্তিকে কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ দেখিলেন না— বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী দেখিলেন না—প্রৌঢ় পুরুষ বলিয়া দেখিলেন না—পণ্ডিত বলিয়া বুঝিলেন না। বাহিরের কোনও কথা, কোনও বিচার গ্রহণ না করিয়া তিনি 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস' বলিয়া বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু—পরিপূর্ণ চৈতন্যের স্বরূপ মহাপ্রভু—সকল চেতনের চেতন মহাপ্রভু সনাতনকে বাহ্য অনিত্য দেশ, কাল ও পাত্র অর্থাৎ জড়ীয় দেহ মনের পরিচয়ে পরিচিত না করিয়া তাঁহার নিত্যস্বরূপের—আত্মার পরিচয় প্রদান করিলেন। গীতায় যে দেহ ও মনকে ভগবান্ তাঁহার অপরা প্রকৃতি, জড়া প্রকৃতি, বিশ্বপ্রসবিনী মায়া-শক্তির জাত পদার্থ বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন এবং সেই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ে আবৃত পরা

প্রকৃতির অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য আত্মার কথা বলিয়াছেন, জীব যদি অজ্ঞানাবৃত জ্ঞানে অর্থাৎ মোহবশে পুনরায় সেই নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি না করিয়া, নিত্যে উদাসীন হইয়া, বিমুখ হইয়া, অনিত্যকে নিত্য বুদ্ধি করে, তবে দোষ কাহার? আবার যে ভগবান্ কৃপা করিয়া প্রাপ্তোদ্দেশ জীবকুলকে অনিত্যে নিত্য-বুদ্ধি বিদূরিত করিয়া নিত্যবস্তুর—আত্মার আত্মা পরমাত্মার ভজনের কথা, এমন কি কত না করুণা করিয়া চরম ভজনের কথা বলিয়াছেন তাহার পর অবশেষ বুঝিবার কথা, ভাবিবার কথা থাকে কি? সব অজ্ঞান—সব অসুবিধা, সব মোহ দূর করিতেই এই শ্লোকের অবতারণা।

জীব পরম চৈতন্যের ভেদাংশ চৈতন্য—একথা গীতায়ও গীত হইয়াছে। সেই ভেদাংশ চৈতন্য বা অণুচৈতন্য জীব বৃহচ্চৈতন্য সেব্য-ভগবানের সেবকসম্বন্ধে নিত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রভু ও দাস-সম্বন্ধ উভয়ের অন্তরে বিদ্যমান। সেই চৈতন্য বস্তুর কথা, আত্মার কথা ভুলিয়া যখন আমরা দেহ ও মনকে 'আমি' বা 'জীব' বলিয়া বিবেচনা করি, সেই কালে যত অসুবিধা, যত বিভ্রাট্। তখন আমার দেহের উৎপত্তি যে কুলে, যে দেশে সেই কুল ও দেশকে আমার বলিয়া থাকি। তখন আমি নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ, পুরুষ, স্ত্রী অভিমান করিয়া থাকি। আবার দেহের পরিবর্তন বা অবস্থা ভেদে আপনাকে বালক, বৃদ্ধ, যুবা বলিয়া জানিয়া থাকি। সেই দেহকে 'আমি' জানিয়া 'আমি ভারতবাসী', 'আমি ল্যাপল্যাণ্ডবাসী', 'আমি বাঙ্গালী', 'আমি হিন্দুস্থানী', 'আমি পাঞ্জাবী' বলিয়া অভিমান করি। আবার আশ্রমীর অভিমানে আপনাকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসী বলিয়া অভিমান করি। এই অবস্থায় ধর্মভেদ বা বহুধর্মের অবতারণা-কল্পনা সৃষ্ট।

গীতার বক্তা ভগবান্। তিনি কোন গানই বাকী রাখেন নাই—সবই গাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন আত্মা নিত্য, অপরিবর্তনীয়; দেহ—অনিত্য এবং হ্রাস-বৃদ্ধি যুক্ত। যাহারা দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপরিবর্তনশীল আত্মার পরিবর্তন বা জন্ম মৃত্যু স্বীকার করে, তাহারা মূর্খ! সুতরাং 'সর্বধর্ম' শব্দে বদ্ধজীবের দেহ-মনকে আত্মবুদ্ধি করিয়া যতপ্রকার ঔপাধিক ধর্ম স্বীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-বর্ণধর্মসমূহ, ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস-আশ্রম-ধর্মসমূহ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত অন্ত্যজাদি ধর্ম, লৌকিক, নিজভোগ বা ত্যাগপর পারলৌকিক ধর্ম এবং সবিশেষভাবে বলিতে হইলে চতুর্দশ ভুবনান্তর্গত ধর্মসমূহ।

ধর্ম—বস্তুর নিত্যসহচর। ধর্মকে ছাড়িয়া বস্তু এবং বস্তুকে ছাড়িয়া ধর্ম থাকিতে পারে না। বস্তু অর্থাৎ নিত্য সত্তা। তবে আত্মার উপর অনিত্য, পরিণামী, আদি-মধ্য-অন্তবিশিষ্ট সত্তা বা দেহ ও মন বর্তমানে আসিয়া পড়িয়াছে। উহার ধর্মকে—অনিত্য ধর্মকে ত্যাগ করিয়া, শুধু ত্যাগ করিয়া নয় পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ দেহ-মনের স্মৃতিতে

বিস্মৃতি আনিয়া—(যাহা গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে যত্নের সঙ্গে আলোচনা করিতে করিতে আপনিই আসিয়া যায়)—নিত্যাত্মার নিত্যধর্ম পরমাত্মা অর্থাৎ আমার ভজনা কর,—এই কথা শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন। কিন্তু এই সহজ সত্যের কথা ভ্রান্ত জীব হঠাৎ গ্রহণ করিতে পারে না। তাঁহার প্রমাণ পরবাক্যে ভগবান্ বলিয়াছেন,—"অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি"। অনিত্য জড় দেহ মনোধর্ম ছাড়িয়া নিত্য ধর্ম গ্রহণ করিতে হইলে জীব পূর্বাসক্তির বশে—মোহাবেশে যে বস্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছাড়িয়া যাইবে—চলিয়া যাইবে—বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, সেই অনিত্য ধর্মত্যাগে পাপ হইবে বলিয়া বিচার করিয়া থাকে। হায়! হায়! যে নিত্যধর্মের অপালনই মহাপরাধ, আজ সেই নিত্যে উদাসীন, অনিত্যে নিত্যবুদ্ধিকারী বদ্ধজীব অনিত্যধর্মের অপালনকে পাপ বলিয়া বুঝিতেছে। আবার শুধু পাপে বুদ্ধি করিয়া ক্ষান্ত নাই—শোক করিতেছে। সেইজন্য "মা শুচঃ" ভগবদুক্তি।

শোক—শূদ্রের স্বভাব বা ধর্ম। বেদ-বিদ্যাদি সুপারঙ্গত পরব্রহ্ম জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিষ্ণাত গুরুসেবা, ব্রহ্মচর্যাদি পালন, শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে অনধিকারী ব্যক্তিগণই শূদ্র। কিন্তু আবার যদি বেদাদি-শাস্ত্রপাঠী বর্ণশ্রেষ্ঠ, আশ্রমশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ দেহে আত্মবুদ্ধি করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও শূদ্র ব্যতীত অপর কিছুই নহেন। অতএব জড়দেহাভিমানী পাপ-পরায়ণ জনগণকে আত্মাভিমানে পরমাত্মা ভগবানের সেবার উপদেশ ভগবান্‌ই স্বয়ং প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু গীতার এত বড় বাক্যকেও "এহো বাহ্য আগে কহ আর" বলিয়া রায় রামানন্দপ্রভুকে বলিয়াছেন। কেননা ভক্তি আত্মার সহজ বৃত্তি; তাহাতে ভগবান্‌কে বলিয়া কহিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র দিয়া ভক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না।

পিতাকে যদি সাধনা করিয়া পুত্রকে স্বভক্ত করাইতে হয়, তাহা হইলে পুত্রের মহিমা বা পুত্রের কৃতিত্ব বুঝিতে সাধারণের বাকী থাকে কি? কোথায় ভক্ত আপনা হইতে আপনভাবে আপন প্রভুর সেবা করিবে, তাহা না হইয়া বিপরীত হইতেছে না কি? এইস্থলে ভক্ত শুধু ভগবান্‌কে ভুলে নাই, নিজেকেও ভুলিয়াছে, নিজের নিত্য স্বরূপ--নিত্য অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া অনিত্যের প্রভু হইয়া অনিত্যের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। আবার নিজের নিত্যপ্রভু আসিয়া হাতে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া গুহ্যতম উপদেশ বলিলেও জীব শুনিতেছে না—বুঝিতেছে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এত বড় ধারণাকে খুব ছোট দেখাইয়া ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ধারণা—বাহ্য জগদনুভূতির কথা জানাইয়া ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজা, বিরজার পর ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোকের পর বৈকুণ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠের ঊর্ধ্বার্ধ লোকের কথা—নিজ নিত্যবিহারস্থলীর ভক্তগণের কথা জানাইয়াছেন। কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্তি। কৃষ্ণপাদপদ্মে সকল রসেরই কথা পূর্ণভাবে দেখতে পাই। অনেক সময় বিশ্ব হতে গৃহীত বিচারে বাসুদেবকেই পরতত্ত্ব বলিয়া বিচার করা হয়। বাসুদেবের

সহিত মহালক্ষ্মীর, সীতা-রাম প্রভৃতির উপাসনার কথাও প্রচারিত আছে। কিন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা ব্যতীত রসের পরিপূর্ণতা কোথাও পাওয়া যায় না। শান্ত, দাস্য এবং গৌরবসখ্যার্দ্ধের দ্বারা ভগবানের উপাসনা অপেক্ষা যেখানে নিকটসম্বন্ধে বিশ্রম্ভাবস্থায় ব্রজবালকগণ সর্বারাধ্য বস্তুর স্কন্ধে পদ-বিক্ষেপ করেন, তালগাছ হইতে তাল সংগ্রহ করেন এবং সেই তালের উচ্ছিষ্টানুচ্ছিষ্ট কৃষ্ণকে প্রীতিভরে প্রদান করেন, সেইরকম প্রীতিময়ী চেষ্টাই অধিকতর সেবাময়ী। কেহ কেহ আরাধ্য বস্তুকে মাতৃপিতৃরূপে বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু মাতাপিতার নিকটে আমরা দ্রব্যাদি আকাঙ্ক্ষা করি, আমাদের নিরুপায় অবস্থায় তাঁহারা আমাদের সেবা করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের পূজনীয় বলিলেও এবং আমাদিগকে তাঁহাদের সেবক বলিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাদিগের দ্বারা আমাদের অধিকতর সেবা করাইয়া থাকি। আমাদের জন্মের পূর্ব হইতে, জন্মের পরে শৈশব, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবনাদি অবস্থায়ও নানাভাবে মাতাপিতার দ্বারাই সেবা করাইয়া থাকি। কিন্তু ভগবানের পুত্রত্ব বিচারে মাতাপিতা নিত্যকাল ভগবানের বিশ্রম্ভসেবা করিতে পারেন। মাতাপিতা পুত্রের জন্ম গ্রহণের পূর্ব হইতেই এবং জন্মের পরমুহূর্ত হতেই পুত্রের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবানের পিতৃত্ববিচারে সেরূপ সেবা-সৌন্দর্য্য ও রসমাধুর্য্য নাই।

'শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।।'

ভবভীত ব্যক্তিগণের অনেকে বেদশাস্ত্র পড়েন পড়ুন, স্মৃতি-শাস্ত্র পাঠ করিয়া নীতি-শিক্ষা করেন করুন; আমি কিন্তু যাঁহার বারেন্দায় পরব্রহ্ম হামাগুড়ি দিতেছেন, সেই নন্দকে বন্দনা করি।

আবার গোপীগণ সর্বাঙ্গ দিয়া সর্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলনের যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সকল রসের যুগপৎ পূর্ণাবস্থান প্রকটিত হইয়াছে।

'আহুশ্চ তে নলিননাভ-পদারবিন্দং যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।।'

যখন বিরহবিধুরা গোপললনাসকল কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা অগাধ-বোধ যোগিগণের ন্যায় ধ্যান করিয়া কৃষ্ণকে দূর হইতে দর্শন করিতে চাহেন না। দূরের জিনিষকেই লোকে ধ্যান করে। যে জিনিষ একমাত্র গোপীর নিজস্ব—করায়ত্ত—সহজ সুলভ, সে জিনিষের ধ্যান তাঁহারা করিবেন? গোপীসকল গৃহ ত্যাগ করিয়া কঠোর বৈরাগ্য-তপস্যাদিদ্বারাও তাঁহার ভজন করিতে চাহেন না। তাঁহারা কৃষ্ণগৃহব্রতা। কৃষ্ণকে লইয়া তাঁহাদের সংসার। তাঁহারা সর্বাঙ্গ দিয়া কান্ত কৃষ্ণের ভজনা করেন। এই সর্ব্বাঙ্গীণ, সার্ব্বকালিক, সর্ব্বরসে কৃষ্ণানুশীলন একমাত্র

গোপললনাগণের আরাধনেতেই ব্যক্ত হইয়াছে। বালকৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা কিশোর কৃষ্ণের উপাসনা অধিকতর চমৎকারিতাময়ী।

সাধারণ আধ্যক্ষিক নৈতিক বিচারে—জাগতিক প্রত্যক্ষ দর্শনের অনুমানোত্থ জ্ঞানের প্রতিফলনে যে রাধাগোবিন্দের উপাসনা অতীব হেয় বলিয়া দৃষ্ট হয়, সেই বিকৃত, প্রতিফলিত হেয় বিচারকে বিনষ্ট করিয়া যাঁহারা রাধাগোবিন্দের উপাসনার একমাত্র বাস্তব পরমোপাদেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই রাধাগোবিন্দের উপাসনার আলোচনা যাঁহারা করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতীত অপরোক্ষ বা চিন্মাত্র ত' সন্ত কথা। শান্তরসকে "অপরোক্ষ জ্ঞান" বলা যাইবে। 'অপরোক্ষ' হইতেই শান্তরস আরম্ভ হইল, দাস্যরস আরম্ভ হইল 'অধোক্ষজজ্ঞান' হইতে। তটস্থ বিচারে অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে অধোক্ষজ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। যদি কেহ বলেন যে রৌপ্য একটি বহুমূল্যবান্ বস্তু, তদ্দ্বারা সত্যতার কিছু হানি হয় না; কিন্তু স্বর্ণের মূল্য রৌপ্যের সহিত তুলনায় অনেক বেশী। কোনও একটি ছাত্র প্রবেশিকা—পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছেন, তখন যে সে সর্ব্বোচ্চ উপাধি-পরীক্ষার দিকে অভিযান করিতেছে না, তাহা নহে। অপরোক্ষজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইলে অধোক্ষজের দিকেই অভিযান হয়। এজন্য অপরোক্ষজ-জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি অপরোক্ষজ্ঞানকে প্রগতিশীল না করিয়া স্তব্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাই নির্ব্বিশেষজ্ঞানে পরিণত হয়। তাহা বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান নহে। অধোক্ষজ-জ্ঞানের অন্তর্গত অপরোক্ষ জ্ঞান। অপ্রাকৃত জ্ঞানে অপ্রাকৃত প্রত্যক্ষ, অপ্রাকৃত পরোক্ষ, অপ্রাকৃত অপরোক্ষ ও অপ্রাকৃত অধোক্ষজ জ্ঞান অন্তর্নিহিত আছে।

চেতনময় জগতে ও দর্শনে সবই শ্রীকৃষ্ণ। সেখানে অপর বিরোধিনী শক্তির বিক্রম নাই। তিনি একমাত্র বন্ধু, প্রভু, একমাত্র পতি, একমাত্র পুত্র। আমাদের এখানে যে সকল পুত্র হয়, তা' বেশীদিন থাকে না। নিত্যপুত্রের সেবার অভাবে এখানে অনিত্য পুত্রের বিয়োগ জনিত দুঃখ উপস্থিত হয়। তাঁকে না পাওয়ার দরুণ পুত্রৈষণা, আবার তৎসঙ্গে নানাবিধ শোক-ভয়-মোহ উপস্থিত হয়। তিনিই আমাদের একমাত্র প্রভু—ইহা বিস্মৃত হওয়ার দরুণই নানা অসুবিধা হ'চ্ছে। এখানে পতিপত্নী-সম্বন্ধ, পিতাপুত্র-সম্বন্ধ, বন্ধুর সম্বন্ধ, দাসপ্রভু-সম্বন্ধ ও নিরপেক্ষ সম্বন্ধ উপস্থিত হয়েছে। তিনি আমাদের পত্নী হ'তে পারেন না। আমাদের স্বরূপ-জ্ঞানের উদ্বোধনে যদি আত্মায় নিত্যসিদ্ধা মধুর রতি থাকে, তা' হলেই তিনি যে আমাদের একমাত্র নিত্য পতি, তা' উপলব্ধির বিষয় হয়। কাল তাঁ'কে ধ্বংস ক'র্‌তে পারে না। ঐ পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ একমাত্র নিত্য অদ্বয়জ্ঞানের সঙ্গে থাক্‌লেই শোক-ভয়-মোহ হয় না—অশান্তি আসে না। এক বস্তু ছাড়া বস্তুর বহুত্ব

বুদ্ধির জন্যেই অশান্তি, শোক, ভয় ও মোহ। একের অধিক বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসের জন্যেই এই অসুবিধা। নিত্য একের সঙ্গে সম্বন্ধ হ'লে এ অসুবিধা হয় না।

যেখানে জাগতিক সম্বন্ধ, সেইখানেই বিশ্রম্ভ বিচার বা মাতা, পিতা ও পুত্র কিংবা কান্তের বিচার হেয়তা সংশ্লিষ্ট করিবে। কিন্তু যেখানে প্রাকৃত সম্বন্ধের বা প্রাকৃত বিষয়-আশ্রয়ের সমাবেশ নাই, যেখানে প্রাকৃত বিভাব, অনুভাবাদি সামগ্রীর কোন প্রসঙ্গ নাই, যেখানে অস্থায়ীভাব বা বিরতি নাই, সেখানে কখনই হেয় রসের প্রসঙ্গ উত্থাপিতই হইতে পারে না। বিম্বে যে বস্তু যত উপাদেয় ও চমৎকার, প্রতিবিম্বে সেই বস্তুই তত অনুপাদেয় ও অশোভন। সুতরাং স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের সহিত যেখানে সম্বন্ধ, সেখানে বিকৃত প্রতিবিম্বজাত কোন হেয় রসের প্রসঙ্গ নাই। বিকৃত প্রতিফলিত প্রতিবিম্বে যাহা অত্যন্ত অবনত, তাহাই অবিকৃত অপ্রাকৃত বিম্বে উন্নত উজ্জ্বলরূপে সম্প্রকাশিত।

যদি প্রাকৃত সম্বন্ধে পঞ্চবিধ রসের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়, তবে অপ্রাকৃত সম্বন্ধে মাত্র আড়াই প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার করিলে অপ্রাকৃতের বিচিত্রতা অপেক্ষা প্রাকৃতের বিচিত্রতার সংখ্যাধিক্য মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু ইহা শ্রুতির বিরুদ্ধ কথা। অখণ্ড, অনন্ত, নিত্য নবনবায়মান অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যের খণ্ড, সান্ত, অনিত্য, একঘেঁয়ে প্রতিফলনমাত্র—প্রাকৃত বৈচিত্র্য। বিম্বে যাহা আছে, প্রতিবিম্বে তাহাই বিকৃতরূপে প্রতিফলিত, ইহাই নিত্যসিদ্ধ সত্য।

আমাদিগকে অবিমিশ্র চেতনের সংস্পর্শ ও সন্ধান লাভ করিতে হইবে—যে চেতনের জগতের সহিত কোন মিশ্রণ নাই—সে চেতন আবরণ-রহিত হইয়া তাঁহার নিত্য সিদ্ধা বৃত্তিতে জাগরূক আছেন—সে চেতন বিশ্রম্ভভাবে পূর্ণ চেতনের পূর্ণ সেবায় তৎপর হইয়াছেন। কিন্তু যদি কেবল আমরা কৃত্রিম অনুকরণপ্রিয় হই, তবে কোন দিনই মঙ্গলের পথে আরূঢ় হইতে পারিব না। যাঁহাদের সর্ব্বকালিকী সর্ব্বাঙ্গময়ী চেষ্টা পূর্ণতম চেতনের সুখতাৎপর্য্যে, অবিচ্ছিন্ন অহৈতুকীভাবে নিযুক্ত, তাঁহাদের অনুসরণের দ্বারাই মঙ্গল লাভ হইবে। কারণ,—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।।

অপ্রাকৃত রস ভাবনার পথ মনকে অতিক্রমপূর্ব্বক শুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল চেতনে চমৎকারাতিশয়ের ভাণ্ডার স্বরূপ স্থায়ী ভাবরূপে সঞ্চারিত হয়। তাহা কৃত্রিমতা বা অনুকরণের দ্বারা লাভ করা যায় না। অনুকরণকারী বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

ভগবানের কান্তত্ব-বিচারও একদিন আমাদের ন্যায় পতিত জীবের নিকট প্রচারিত হইয়াছিল—কত বড় কথা প্রচারিত হইয়াছিল। আমাদের নির্ম্মল চেতনের নিকটই তাহা প্রকাশ করা হইয়াছিল। 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ও 'ব্রহ্মসংহিতা' নামক দুইখানি গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশ হইতেই আহরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব একদিন

উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের পরিশিষ্ট বিচার শ্রীরায় রামানন্দের শ্রীমুখে স্বয়ং বক্তা হইয়া দক্ষিণদেশে রাজমহেন্দ্রীর নিকট কব্বুর নামক স্থানে প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ও তাঁহার অনুগবর্গের হৃদয়ে সেই সকল পরিশিষ্ট কথা প্রকাশিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়াছেন, সমস্ত প্রাকৃত বিচারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া একমাত্র উদ্বুদ্ধ নির্ম্মল চেতনস্বরূপের অপ্রাকৃত সহজ প্রীতিময় সর্ব্বাঙ্গীন ভজনের দ্বারাই অখিলরসামৃত-মূর্ত্তির নিকটতম প্রদেশে যাইতে হইবে। অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃত রাজ্যের চিন্তাস্রোত বা অনুমান বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে না, ইহা যেন সর্ব্বদাই স্মরণ থাকে। নতুবা আস্তিকতার প্রথম সোপানের দ্বারেও প্রবেশাধিকার পাওয়া যাইবে না।

যখন দণ্ডকারণ্যবাসী ষষ্টি-সহস্র ঋষি শ্রীরামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলিঙ্গন কামনা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগকে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণলীলার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। ইহা হইতেও আমরা জানিতে পারি যে সর্ব্বপ্রকার নৈতিক উপদেশ জগতের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ আছে। অপ্রাকৃত চেতনরাজ্যে প্রাকৃত নীতি ও দুর্নীতির স্থান নাই, দুর্নৈতিক তাহার পশুত্ব ভাব লইয়া ধর্মরাজ্যের—পরমার্থ রাজ্যের দ্বারেই প্রবেশ করিতে পারে না। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ তাহাদের মাতা পিতা হইতে যে শরীর লাভ করিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তাহা গ্রহণ করিলেন না। পূর্ণচেতন পরমেশ্বর বস্তু প্রাকৃত পুরুষ বা প্রাকৃত স্ত্রীদেহ আকাঙ্ক্ষা করেন না। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ 'স্ত্রীভেক' গ্রহণ করিতে পারিতেন, স্ত্রীসজ্জায় সজ্জিত হইতে পারিতেন, কিন্তু ঐরূপ কৃত্রিমতা দ্বারা কখনও পূর্ণচেতনের প্রীতির সঞ্চার হইতে পারে না। ভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু—পূর্ণচেতনবস্তু—অপ্রাকৃত চেতন জীবের অপ্রাকৃতা প্রীতিময়ী সেবায়ই তাঁহার আদর। অক্ষজ কখনও অধোক্ষজের প্রীতির বা আকর্ষণের বস্তু হইতে পারে না। কৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু—কৃষ্ণনাম অধোক্ষজ বস্তু। "অধঃ কৃতং অক্ষজং বদ্ধজীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন স এব অধোক্ষজঃ।" যিনি বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান ও ইন্দ্রিয় তর্পণ সর্ব্বতোভাবে নিরস্ত করেন, তিনিই অধোক্ষজ বাস্তব বস্তু।

ইন্দ্রিয় সমূহ বহির্জগতের কার্য্যোপযোগী করণ বিশেষ। ইন্দ্রিয়সমূহের গতির নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। বহির্ম্মুখিনী ইন্দ্রিয়বৃত্তি কখনও অপ্রাকৃত সন্ধান করিতে পারে না। বহির্ম্মুখিনী মেধার দ্বারা চিন্তনীয় বিষয় হয়, যাহা ধ্যান করা যায়, যাহা স্থির সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা সকলেই—প্রাকৃত—মনোধর্ম্মবিশেষ। একমাত্র অপ্রাকৃতের চরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণই ইন্দ্রিয়কে উন্মুখ করিবার উপায়। সেইরূপ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শ্রীনাম স্বয়ংই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন এবং সেবোন্মুখতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাকৃত শ্রীনাম তাঁহার অপ্রাকৃত রূপ, অপ্রাকৃত গুণ, অপ্রাকৃত পরিকর ও অপ্রাকৃত লীলা সমূহ প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

অধোক্ষজ বস্তু আমাদের বর্তমান করণের দ্বারা উপলব্ধির বিষয় নহেন। ইহা পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদিগকে জানাইয়াছেন---শ্রীমদ্ভাগবত জানাইয়াছেন। এখানেই লোকের বিবর্ত উপস্থিত হয় বলিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া এই কথাটি আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। যাবতীয় জাগতিক সিদ্ধান্ত—সঙ্গতি কখনও আমাদিগকে অপ্রাকৃত রাজ্যের সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতির সম্মুখে লইয়া যাইতে পারে না, বরং সেগুলি অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশের মহা বিঘ্ন স্বরূপ হয়। জাগতিক ধারণা, ন্যায়, সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে অপ্রাকৃত রাজ্যে চালনা করার নামই---তর্কপথ। আর অপ্রাকৃত কথার অবতরণ হইলে তাহাতে কর্ণ নিয়োগ এবং ঐরূপ সেবোন্মুখতার দ্বারা অর্থাৎ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা বৃত্তির সহিত অপ্রাকৃত রাজ্যের বার্তার অনুসন্ধান করাই শ্রৌত পথ। সুতরাং ইন্দ্রিয়জ বিচার জগতের কার্য্যোপযোগী হইলেও আমাদিগকে অপ্রাকৃত রাজ্যে লইয়া যাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদিগকে জানাইয়াছেন---

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, সব-মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ---এই সব ভ্রম।।"

(চৈঃ চঃ অঃ ৪র্থ পঃ)

দ্বিতীয় অভিনিবেশের রাজ্যে---বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের বিচার-পথে যাহা ভাল বা মন্দ বিচার করা যায়, তাহা সকলই মনোধর্ম্ম।

এই জড় জগতে আমরা সকল বস্তুকেই সম্ভ্রমযুক্ত আধারে স্থাপন করিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করি, কাজেই যখন আমরা দেখি সেই সম্ভ্রমযুক্ত অবস্থা অতিক্রম করিয়া বিশ্রম্ভ ভাবের অবতারণা হয়, তখনই আমরা তাহাতে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার রক্ষা করিতে পারি না, মনে করি অপ্রাকৃত বস্তুও বোধ হয় সম্ভ্রমতা রহিত হওয়ায় শ্রেষ্ঠত্বের পদবী হইতে বিচ্যুত হইলেন।

কিন্তু যেখানে যাবতীয় কুণ্ঠাধর্ম্ম নিরস্ত হইয়াছে, তাহা বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ কখনই জাগতিক ধারণা ও ধৃতির কবলে কবলিত হইতে পারেন না। জাগতিক ধারণা তৃতীয়মানের রাজ্যের অন্তর্গত। আমরা তুরীয়কে তৃতীয়মানের ধারণায় আক্রমণ করিতে পারি না।

যাহারা বৈকুণ্ঠ-বিচিত্রতা স্বীকার করেন না, তাহারা নাস্তিক, কপিল ও বৌদ্ধের পতাকা-বাহক ব্যতীত আর কিছুই নহেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমানই তাঁহাদের সিদ্ধান্তের প্রমাণ; জড়জগতের বিচিত্রতার নশ্বরতা ও হেয়তা অনুমান করিয়া থাকেন, সকল প্রকার বিচিত্রতার স্তব্ধভাবকেই তাহারা বহুমানন করেন।

কিন্তু পরব্রহ্ম নিত্য শক্তিযুক্ত। তাঁহার শক্তির বিচিত্রতা আছে। তিনি পুরুষোত্তম। বিষ্ণুতেই পূর্ণ বাস্তব জ্ঞান বিরাজিত। তাঁহাকে পূর্ণতম প্রতীতির প্রীতিময়ী উপাসনা ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর নাই।

ডাঃ রাম গোপাল ভাণ্ডারকার লক্ষ্মী-বিরহিত একল বাসুদেবের উপাসনার কথা বলেন। কিন্তু চিচ্ছক্তির বিচার ব্যতীত পুরুষোত্তমের প্রতীতির পূর্ণতা সাধিত হইতে পারে না, তাহা অৰ্দ্ধবিচার মাত্র। বিষ্ণুর সিংহাসন, বিষ্ণুর শঙ্খ, বিষ্ণুর গদা প্রভৃতির নপুংসকত্ব স্বীকৃত হয়। শত সহস্র লক্ষ্মী-সেব্যমান পুরুষোত্তম বিষ্ণুই পূর্ণ প্রতীতিতে বৈকুণ্ঠে বিরাজিত। শত সহস্র সেবক চিচ্ছক্তি-সমন্বিত বিষ্ণুর উপাসনা করেন।

নির্ব্বিশেষবাদী ইহা তাহার দ্বৈতজ্ঞানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ-যুক্ত ভদ্রাভদ্রের বিচারে স্বীকার করিতে পারে না। সন্দেহবাদী, নাস্তিক্যবাদী, সগুণবাদী, ক্লীব ব্রহ্মবাদী, সকলেই চরমে এক নাস্তিকতায়ই আত্মবিলীনতা আকাঙ্ক্ষা করে। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতির উপাসনা—সগুণ উপাসনার অন্তর্গত। অন্তর্য্যামী দর্শনের ব্যভিচার সগুণ উপাসকগণের দ্বারা সাধিত। বস্তুতঃ অনিরুদ্ধ বিষ্ণুই সকল দেবতা, মনুষ্য ও জীবের নিত্য অন্তর্য্যামী। অন্তর্য্যামী পুরুষ অনিত্য বা নির্ব্বিশেষ নহেন। তিনি নিত্যনামী, নিত্যরূপী, নিত্যগুণী, নিত্যলীলাময় ও নিত্য পরিকর-বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অন্তর্য্যামী, ব্যূহ, পরতত্ত্ব, অর্চ্চা প্রভৃতির বিচার সুন্দররূপে লোকাচার্য্যপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

সগুণ উপাসনা—জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের অন্তর্গত। সগুণ উপাসনাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই তথাকথিত নির্গুণ উপাসনার কল্পনা হইয়াছে। সগুণ উপাসনা করিতে করিতে চরমে উপাসক, উপাসনা ও উপাস্যের ত্রিপুটী থাকিবে না ইহাই তথাকথিত নির্গুণ উপাসনার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু এই উভয় প্রকার আরোহবাদই প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত উভয় মতই নাস্তিকতার নিদর্শন—উভয়ই পৌত্তলিকতা-দোষে দুষ্ট। পুতুল গড়া ও পুতুল ভাঙ্গা—উভয়ই পৌত্তলিকতা। আস্তিক সম্প্রদায় iconographer or iconoclast নহেন।

শ্রীরামানুজাচার্যপাদ 'চিৎ', 'অচিৎ' ও চিদচিতের ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, 'কেবল চিদ্'-বৃত্তি ভগবানের নিজস্ব; যখন আমাদের অভ্যন্তর হইতে অনর্থ নিষ্কাশিত হয়, তখনই আমাদের বিশুদ্ধ চেতন-বৃত্তির ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শক্তিপরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন। অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদেই আস্তিকতার সম্প্রসারিত সৌন্দর্য্য সম্প্রকাশিত হইয়াছে। জড়সবিশেষকে কখনই চিৎ সবিশেষের সঙ্গে গোলমাল করা উচিত নহে। চিৎ সবিশেষসিদ্ধান্তে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর আবির্ভূত হন।

পাশ্চাত্য লেখকগণও ভারতীয় মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের বিকৃত মতবাদধ্বনিকে প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। স্যার্ নিকল সাহেবের 'Indian Theism' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনা অপেক্ষা শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ-উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার প্রাকৃতিক নৈতিক বিচারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। আধ্যক্ষিক লোকগণের ঐ সকল মত গ্রহণ করিবার পূর্বে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিব। অপ্রাকৃত, অদ্বিতীয় ভোক্তৃ-তত্ত্ব স্বরাট্ পুরুষোত্তমকে প্রাকৃত নীতির নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া ও আধ্যক্ষিকতার সংকীর্ণতাকে

বড় করিয়া তুলিয়া আমরা যেন অপ্রাকৃত বিশ্রম্ভ সেবার প্রতি অনাদরযুক্ত না হই বা বিশ্রম্ভ সেবার অপব্যবহার না করিয়া বসি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই জন্যই তাঁহার বাণী শ্রবণ করাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী কোন জাতিগত, দেশগত, সমাজগত বা কালগত নহে। তাহা সকল দেশের, সকল কালের, সকল চেতনের জন্য একমাত্র অমোঘ কল্যাণকর। শ্রীচৈতন্যের বাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া সকল অকপট সত্যানুসন্ধিৎসুর নিত্য মঙ্গল বিধান করিবে। শ্রীচৈতন্যবাণীর মত এতবড় কথা আর কোথাও নাই। এতবড় উদার মধুর আদেশ পৃথিবীতে আর কোনও কালে প্রকাশিত হয় নাই। এই বাণীতে আস্তিকতার পূর্ণপল্লবিত মহামহীরুহ প্রকটিত হইয়াছে—এই বাণী জীব মাত্রেরই উন্মুক্ত কর্ণে একবার প্রবিষ্ট হইলে অভিনন্দিত না হইয়া পারে না। আমাদের নির্ম্মল চেতনের যাহা পূর্ণতমা আকাঙ্ক্ষার অবধি, তাহা একমাত্র শ্রীচৈতন্যের বাণীই প্রদান করিতে পারেন। আমাদের যাবতীয় মনোধর্ম্মকে নিষ্কাশিত করিয়া শ্রীচৈতন্যের বাণী—যাহা শ্রীমদ্ভাগবতেরই বাণীকে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই বাণী-শ্রবণে অনুক্ষণ কোটী ইন্দ্রিয়যুক্ত করা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিলে আমরা অপ্রাকৃত শ্রীনামেই সর্ব্বশক্তি, সর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও সর্ব্ব চিদ্‌বিলাস দর্শন করিতে পাই।

(২)

খামের সহিত যখন তদভ্যন্তরস্থ লিখিত পত্র ডাকঘর হইতে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন আমরা সমগ্র বস্তুটিকেই 'পত্র বা চিঠি' বলিয়া থাকি, অথবা যখন শিশির অভ্যন্তরে তরল ঔষধ ঔষধালয় হইতে আনীত হয়, তখন শিশির সহিত তদভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থকে সংযুক্ত করিয়াই আমরা 'ঔষধ' বলিয়া থাকি; বস্তুতঃ খাম ও শিশি প্রকৃত পত্র বা ঔষধ নহে। অনেক সময় আমরা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ভাবে দর্শন করিতে না পারিয়া আত্মার সহিত স্থূল ও শূক্ষ্মদেহকে 'আত্মা' বলিয়া মনে করিয়া থাকি। অনেক সময় আত্মা ও পরমাত্মার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হই। এই জন্য উপনিষদে "হিরন্ময়েণ পাত্রেণ" শ্লোকের অবতার হইয়াছে।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামিগণের আরাধ্য যথাক্রমে সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও রুদ্রদেবতা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকামী মানবের যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন, যখন তাহা সমস্তই নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন কামনার বস্তু আর কি থাকিল? সুতরাং বিষ্ণুদেবতার স্থান কোথায়? বিষ্ণু কি কামনা পূর্ণ করিবেন? বিষ্ণু—কামনার দেবতা নহেন। তাহার স্বয়ংরূপ স্বরূপ স্বয়ংই কামদেব। তিনি কাহারও কাম চরিতার্থ করেন না। সকল জীব, সকল চেতন, নিখিল শক্তি তাঁহার কাম চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত। অপ্রাকৃত কামদেবের দ্বারা জীব স্ব-স্ব কার্য্য চরিতার্থ করিবার ইচছা করিলে সেই কামদেব

জীবের নিকট সেই সকল আবৃত স্বরূপের মধ্যে কোন না কোন একটি স্বরূপ অর্থাৎ জীবের কামানুসারে সূর্য্য, গণেশাদি স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ যে বিষ্ণুদেবতার উপাসনা করেন, তাহা পঞ্চোপাসনার বিষ্ণু নহেন বা দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম নহেন। বৈষ্ণবগণ যে বিঘ্নবিনাশনের উপাসনা করেন, তাহা অর্থকামী গণসমষ্টির দেবতা 'গণেশ' নহে, গণেশ যাঁহার শ্রীচরণদ্বয় তাঁহার মস্তকে ধারণ করিয়া জাগতিক বিঘ্নবিনাশের শক্তিলাভ করেন, বৈষ্ণবগণ সেই নৃসিংহ দেবের উপাসক।

পঞ্চোপাসনার পঞ্চদেবতার প্রত্যেকেই সমান, তন্মধ্যে বদ্ধজীব তাহার বদ্ধরুচির অভিলাষানুসারে কোন একটী দেবতাকে সাময়িক প্রাধান্য প্রদান করিয়া সেই দেবতার সাময়িক উপাসনা করেন এবং পরে আপনাকে সেই দেবতার সমান কল্পনা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সেই দেবতাই হইয়া যান, ইহা ভক্তি নহে, ভক্তি শব্দের ব্যভিচার।

সহিস যেরূপ কুকুরের প্রতি ভক্তি করে, বিদ্যার্থী যেরূপ সরস্বতী দেবীকে ভক্তি করেন, সেরূপ ভক্তি, শুদ্ধভক্তি বা হরিসেবা নহে। উহা উপাস্য বস্তু (?) দ্বারা স্ব-স্ব কাম চরিতার্থ করাইবার চেষ্টা মাত্র। "ধনং দেহি, দ্বিযোজহি" প্রভৃতি ঐহিক আমুষ্মিক প্রার্থনা ইহ জগতে বা পর জগতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষ মূলে যে ভক্তির ভান কিংবা চরমে ভক্তি বিনাশ করিবার জন্য মাঝপথে যে ভক্তির অভিনয়, তাহা ভক্তি নহে। 'বুঝিয়াও বুঝিব না', 'জাগিয়া ঘুমাইয়া থাকিব'—এইরূপ সম্বন্ধ-যুক্ত ব্যক্তিগণ সত্য গ্রহণ করিতে পারে না। 'আমার ভোগের জিনিষের মধ্যে যদি ভগবান্ ভাড়া খাটিতে আসেন, আমি যদি তাঁহার ঘাড়ে চড়িতে পারি, তিনি যদি মালি সাজিয়া আমাকে উত্তম উত্তম পুষ্প ঘ্রাণ করাইতে পারেন, তবেই আমি তাঁহাকে (আমার ইন্দ্রির ভোগ্য কল্পনাকে) স্বীকার করিব',—এইরূপ কপটতাই অধিকাংশ স্থলে 'ভক্তি' নামে জন-সমাজে ও সাহিত্যে প্রচারিত রহিয়াছে। তাহা 'ভক্তি' নহে। বাহিরের দিকে কপটতা করিয়া আমি ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু অন্তরে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা যদি আড্ডা গাড়িয়া থাকে, তবে আমার ত্রিদণ্ড গ্রহণ হয় নাই।

ইংরাজী ১৮৮৩ সালে 'নিমাই সন্ন্যাস' অভিনয় দেখিবার জন্য লোকের খুব ঝোঁক হইয়াছিল; কিন্তু 'বারনারীর মুখে নিমাই-সন্ন্যাস কীর্ত্তিত হইতে পারে না'। যে সকল মহাত্মা এইরূপ বিচার সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারা তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিলেন, এইরূপ 'নিমাই-সন্ন্যাস, অভিনয়ের দ্বারা নিমাই সন্ন্যাস লীলার শিক্ষা প্রচারিত হইবে না—তদ্দ্বারা জগতের অপকার ব্যতীত উপকার হইবে না। কপটতা ও কৃত্রিমতা দ্বারা কখনও ভক্তিলাভ হয় না।

বর্ত্তমান Indian Nationalism এর part ও parcel হইয়া পড়িয়াছে—পঞ্চোপাসনা; আর তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে চিজ্জড় সমন্বয়বাদ ও নির্ব্বিশেষ

মতবাদ। সংসার যাহাদের ভাল লাগিয়াছে, তাহারা কখনও সংসারের উন্নতি-কামনা ছাড়া অন্য কথা শুনিবে না। তাই আমরা বাস্তবসত্যের কথা শুনিতে চাই না। যাঁহারা আমাদের পূর্ব্বের অভিজ্ঞান ও বদ্ধ রুচিতে 'ditto' (সায়) দিতে পারেন, তাহাদিগকেই আমরা 'ধার্ম্মিক' ও 'মহাপুরুষ' বলিয়া থাকি এবং গণমতের মুখেই আমরা ঝাল খাই। আমরা অনেক সময় ডাক্তার ডাকি বটে, কিন্তু আমরাই রোগযুক্ত রুচির অনুযায়ী ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহাকে হুকুম দেই। ইহা ডাক্তার ডাকার প্রণালী নহে,—শ্রীগুরুপাদপদ্ম অনুসরণের প্রণালী নহে।

শব্দব্রহ্মের সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তাই বেদান্তের চরম সূত্রে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—এই উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে 'ছু'চোর কীর্ত্তন'কেই সাধারণে 'হরিকীর্ত্তন' বলিয়া ভ্রম করিতেছেন। বস্তুতঃ হরিকীর্ত্তনের দ্বারা হরির ইন্দ্রিয় তর্পণ হয়। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টি কাহারও বাস্তব উপকার হয় না।

আমরা জন্মে জন্মে বিষয় পাইব। ভোক্তা হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে পারিব। সুপ্তি ও সুষুপ্তির সুখভোগ করিতে পারিব। এই সকল ভোগের জন্য বহু বহু জন্মান্তর রাখিয়া দিয়া যে কার্য্যটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় পড়িয়া গিয়াছে—যে কার্য্যটী মনুষ্য জন্ম না হইলে অপর জন্মে হয় না, তাহারই জন্য আমাদের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। আমরা যদি দেবতা হইতাম, তাহা হইলে আমাদের হরিকথা শুনিবার অধিকার বা সময় হইত না। যাহাতে আমাদের স্বার্থপরতার পূর্ণসিদ্ধি হয়, তজ্জন্য যত্ন করাই উচিত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি—এসকল আমাদের প্রকৃত পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, এই সকলের দ্বারা আমাদের স্বার্থপরতার পূর্ণসিদ্ধি হইতে পারে না। ভোগি-সম্প্রদায়ের ন্যায় ভুক্তি-কামনা বা ত্যাগিসম্প্রদায়ের ন্যায় হরিসেবাহীন মুক্তিকামনা—এরূপ ক্ষুদ্র লাভাশা লইয়া পরিপূর্ণ স্বার্থপর পুরুষগণ ভগবৎ সেবা করেন না। যাঁহারা পরম প্রয়োজনের কথা শ্রবণ করিয়াছে, তাঁহারা কৃষ্ণসেবার জন্য লালায়িত হন।

শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা ব্যতীত আর যত কথা, সব আত্মার নিত্যবৃত্তিকে ঢাকিয়া ফেলিবার কথা। হরি সব হরণ করিয়া থাকেন। কি হরণ করেন? চামড়া মাংস তিনি হরণ করেন না। তিনি চান 'আমাকে'—আত্মাকে; সেই আত্মা পাঁচ প্রকার রসে তাঁহার সেবা করেন। মানুষের এই পচা-চক্ষু-কর্ণাদি তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারে না। যদি এই চক্ষু কর্ণাদির বিষয় তিনি হইতেন, তাহা হইলে তিনি এই জগতেরই ভোগ্য বস্তু মাত্র হইয়া পড়েন। সত্ত্বোজ্জ্বলা চেতন বৃত্তিতে তাঁহার আস্বাদন হয়।

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্।।"

অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন না করার দরুণ অন্য চেষ্টা উদিত হয়। প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলনের চেষ্টা হতে মুক্ত লাভই প্রকৃত মুক্তি। ধর্ম্মার্থ-কাম হতে মুক্তিলাভ— নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান হতে মুক্তিলাভ হলেই ভগবদ্ভক্তি আরম্ভ হয়। জড়ে বৈজ্ঞানিকগণ 'Electron theory' ও 'Molecular theory' নামে দুইটী বিষয় বিচার করেন। তিনটী atom এ একটী molecule, একটী atom কে ভাঙ্গিলে নয়টী electron পাওয়া যায়। Positive electron একটী ভিতরে থাকে এবং অপর আটটী বাহিরে থাকে। ভগবান্ মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত, আর তৎসঙ্গে একটী Positive electron ভিতরে থাকে, আটটী (প্রোষিত ভর্ত্তৃকা, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি) সেই একটীর ভাবই পুষ্টি করিবার জন্য কায়ব্যূহরূপে বাহিরে আছে।

গুণনাম-ভজনে সংস্কৃত কর্ণ সনিত্য-চিদানন্দময় নাম, সনিত্যচিদানন্দময় রূপ, সনিত্যচিদানন্দময় গুণের দ্বারা নিত্যানুশীলনে নিত্য স্বয়ংনামী, নিত্য স্বয়ংরূপী, বা নিত্য স্বয়ংগুণীর সচ্চিদানন্দ নাম-রূপ-গুণ-কীর্ত্তনাখ্য-ভজনে নিযুক্ত থাকায় চিন্ময় ভগবৎ পরিকরবৈশিষ্ট্য বৈকুণ্ঠের উন্নত প্রদেশ দর্শনের যোগ্যতাক্রমে বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতির আশ্রয় তত্ত্বসমূহের আনুগত্য লাভ করিয়া ভজন-সম্পত্তিতে রুচি বিশিষ্ট হয়। তখন পরিকর বৈশিষ্ট্যের পাঁচ প্রকার স্থায়ি ভাববিশিষ্ট রত্যাশ্রয় সমূহের আনুগত্য রূপ ভজন মর্য্যাদা পথকে শ্লথ করিয়া ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমা বিশ্রম্ভসখ্য বাৎসল্য ও মধুর তাৎপর্য্যে চিত্তার্পিতোন্মাদে প্রতিষ্ঠিত করায়। পরিকরবৈশিষ্ট্যের আংশিক দর্শনে অপুষ্ট রসমর্য্যাদা রাগাত্মিকা আশ্রয়ভেদ বোধে চিদ্ বিচিত্রতার পরম নিত্যতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মর্য্যাদা-গতি-বিশিষ্ট অবৈধ রাজ্যাতিক্রান্ত বিধি সেবায় রাগসেবার উৎকর্ষ গ্রহণে অসমর্থ থাকিলে জীব গোলোকপরিদর্শনাভাবে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না।

পরমবিভু যেকালে পরা প্রকৃতির সহিত বিচিত্রলীলায় প্রবিষ্ট হন, সেই কালে অচিচ্ছক্তি পরিণত জগতের অপূর্ণতা ও আপেক্ষিকতা কৃষ্ণের দ্বারকালীলা বুঝিতে দেয় না, শ্রীরামচন্দ্রের সাকেত লীলায় যবনিকা টানিয়া দেয়, মূল-স্থানে (মূলতানে) শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্তবাৎসল্য লীলা দর্শনের পথে কন্টক আরোপণ করে, সেকালে জীব স্বীয় অণুচিৎ প্রকৃতিকে অহঙ্কার বিশিষ্ট করিয়া গুণজাত জগতের অভিমানে অভিমানী বা ভোগী করাইয়া থাকে, তখন তাহার অদৈব স্বভাব যজ্ঞেশ্বরের গৌণপ্রকাশ পরম-বিভুর সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। দ্বারকালীলায় ভগবদবতরণ নানাস্থানের অদৈব প্রকৃতি ভোগিসম্প্রদায়ের দুর্দ্দমনীয় অস্তিত্বের পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক অভক্তি-বিচার-পরায়ণ অচিচ্ছক্তি পরিণত বদ্ধজীব হৃদয়কে শোধিত করে।

নিত্য অণুচিৎ সেবকগণ সেবা-সুষ্ঠুতা প্রদর্শনের জন্য বিধিপথে দ্বারকালীলার পার্ষদের কার্য্য করিয়া থাকেন। দ্বারকালীলা-প্রবেশের চিত্তবৃত্তি বদ্ধ জীবের বিবর্ত্তবাদ ও

বস্তুবিচারবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া জীবকে লীলাপুরুষোত্তমের সহিত প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ করায়, তখন বিরোধী ভাব সমূহ লীলা পুরুষোত্তমের দ্বারা বিদ্ধস্ত হয়।

শ্রীমহাভারতের কৃষ্ণলীলার অনুসরণকারিগণ মহিষী বিবাহাদিতে কৃষ্ণভক্তগণের নানাপ্রকার কর্তৃত্বানুষ্ঠানের কথা অবগত আছেন। দ্বারকাকে শ্রীহরির পূর্ণাভিব্যক্তি বলা হয়। ইহাতে অন্যাভিলাষীর সংহার ও কর্ম্মিকুলের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করিয়া একমাত্র বিষয় ভগবান্ কৃষ্ণের সেবায় জ্ঞান বিমুক্ত ভক্তিনিষ্ঠ ভক্তগণের পূর্ণাভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়। আমরা সেখানে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ভূজ ব্যূহচতুষ্টয়ের জড়বিচারের দ্বিভুজপ্রসারণ স্তব্ধ হইয়াছে' বলিয়া জানিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দ্বারকালীলার চতুষ্পাদ বিচারের একপাদ-খণ্ডনে বামনের ত্রিপাদ-বিভূতির কথা জানাইয়াছেন। আর দ্বারকেশ, তদগ্রজ, পুত্র ও পৌত্রের প্রত্যেকের ত্রিপাদের কথার পরিবর্ত্তে দ্বিপাদ ও দ্বিহস্ত বিচারের কথা দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন। যেকালে বদ্ধজীব চতুষ্পদের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না থাকিয়া দ্বিপদ ও সিদ্ধ দ্বিভুজের বিচার অবলম্বন করেন, সেইকালে তাহার জড়বিচার ভুজ-পদবিন্যাস রহিত হইয়া চিদনুভূতি দ্বিভুজ-প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপ শিশুপালাদির বিচারে প্রতিদ্বন্দ্বিজনে বিভু ও অণুর সমত্ব প্রয়াস বিচারিত হয়, তখন উহাদের অনাত্ম-প্রতীতির সংহার দর্শকবৃন্দের লক্ষ্য করিবার অধিকার হইয়া থাকে। ভৌমজগতে বা প্রপঞ্চে অভক্তগণেরই অবস্থান। দ্বারকেশের লীলার কথায় অসুর-বিনাশ ও ভগবদ্ বিরোধ-চেষ্টায় ভোগিকর্ম্মীকে অসমোর্দ্ধ ভগবৎসহ সমোর্দ্ধ বিচারের অচিচ্ছক্তি পরিণামের কথা জানাইয়া দেয় এবং চিচ্ছক্তি পরিণত জগতে ঐরূপ ভাবের অধিষ্ঠান না থাকিলেও বস্তুগত চিচ্ছক্তি-পরিণতির নিত্যস্থায়িত্ব নিত্যলীলারূপে বুঝিবার অবকাশ নাই—ইহাও অনুভবের বিষয় করায়। এইজন্যই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সবিশেষ পরতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের চতুর্ব্ব্যূহ-বিচার, বৈভব বিচারের প্রকাশ ভেদ এবং বদ্ধজীবের নিকট অন্তর্য্যামিত্ব ও অর্চ্চাত্বলীলা প্রকটিত করিয়া দ্বারকালীলারই পূর্ণপ্রাকট্য সংস্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মাথুরলীলাকে পূর্ণতর প্রকাশ বলিয়াছেন, মথুরাজ্ঞানভূমিকা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই জ্ঞান ভূমিকায় প্রকৃতিবাদীর অধস্তনগণ বৌদ্ধ ও জৈন বিচারের বিবিধ বৈচিত্র্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তম বিচারকে সংকীর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় বলিবার অবকাশ পান নাই। কেবলাদ্বৈতী মায়াবাদী উহাদের বিজেতৃ সম্রাটরূপে মায়াবাদ প্রচারের বিজয়-পতাকা হস্তে ধারণ করিয়াছেন। এই মাথুর জ্ঞানভূমিকায় শ্রীহরির পূর্ণতর বিচার শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীমদ্ভাবতের শ্লোকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যাত ও অভিব্যক্ত হইয়াছে। মাথুর লীলায় শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ-বলদেবের সহিত জড়-নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরঙ্গমঞ্চে অচিচ্ছক্তি পরিণত আদর্শবীর কংসের সংহারে উদ্যত হইয়াছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৩।১৭) বলিয়াছেন,—

'মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।'

শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় অগ্রজ বলদেবের সহিত কংসসভায় প্রবিষ্ট হইলেন, তখন বিভিন্ন ব্যক্তিগণের দর্শনে সেই এক বস্তুই বিভিন্ন রসের বিষয়-বিগ্রহ-রূপে পরিজ্ঞাত হইলেন। মল্লগণ তাঁহাকে বজ্র, মানবগণ তাঁহাকে রাজেন্দ্র, কামিনীগণ তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, গোপগণ তাঁহাকে নিজ-জন, অসৎভূপতিগণ তাঁহাকে তাঁহাদের শাসনকর্ত্তা, মাতাপিতা তাঁহাকে শিশু, কংস তাঁহাকে যম, অনভিজ্ঞ জনগণ তাঁহাকে বিরাট পুরুষ, যোগিগণ তাঁহাকে পরতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণ তাঁহাকে কুলাধিদেবতা বলিয়া জানিতে পারিলেন।

এই মাথুর ভূমিতে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহের কথা নাই। এখানে স্বয়ংরূপ ও স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব মায়াবাদ নিরসনের জন্য পুরুষোত্তম বিচারের নিত্যপ্রতিষ্ঠা জানাইয়াছেন, মায়াবাদ বা প্রকৃতিবাদের বিবিধস্তরে কপটভক্তি বা অভক্তি বিরাজমান। আত্মম্ভরিতা ও অহঙ্কার চিন্ময়ী নিত্যা বুদ্ধির বিলোপ সাধন করিয়া দেদীপ্যমান। সুতরাং সম্বিদধিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ ও সন্ধিনী-অধিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীবলদেব বিগ্রহদ্বয় রূপ-প্রকাশ-ভেদে শংখ-চক্র-গদা-পদ্ম-যোগে কেবল জ্ঞানের বিকাররূপ সচ্চিদানন্দানুভূতি-রহিত বিচারের হেয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত কামদেব পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কামবিলাসের তারতম্যের অভিব্যক্তি--অনুসারে হরি পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম নামে প্রকাশিত।

অন্যাভিলাষী অভক্ত, সৎকর্ম্মবাদ বা কেবল জ্ঞাননিষ্ঠার কোন ধার না ধারিয়া অচিদ্ ভোগ-বিলাসে স্বীয় বুদ্ধি তাৎপর্য্যকে নষ্ট করায় যে অহঙ্কারের উদয় হয়, তাহাই গোকুলে বিংশ অসুর-হননের আদর্শ, ভৌম বৃন্দাবনের প্রাপঞ্চিক অসুরগণ যে কুতর্ক-অস্ত্রের দ্বারা পুরুষোত্তম-ভক্তিকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবমান, সেই অন্যাভিলাষময় নশ্বর অনিত্য পঞ্চরসাশ্রিত ক্ষণভঙ্গুর অভিমান প্রণোদিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও তৎ-স্থাপন-প্রয়াসের অবিনাশ-ব্যতীত ব্রজগোপ-গোপীগণের সহিত চিন্ময়ী নিত্যলীলা-বিহার-প্রীতি পূর্ণতর ও পূর্ণের লীলামালাকে ন্যূনাধিক ক্ষীণপ্রভ করিয়া প্রেমনিষ্ঠ ভক্তহৃদয়ে নিত্য পঞ্চরসের অন্যতম এক এক প্রকার রস উদয় করাইয়া থাকে। ভেদাংশজাত অণুচিৎকণশক্তি বিভুচিৎশক্তির শক্তিমানের সহিত পরস্পর নিত্যসম্বন্ধজ্ঞান যুক্ত। বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতে নিত্যজাত বাসুদেবের প্রাকট্যের পূর্ণতমতার অভিব্যক্তিকল্পে পুরুষোত্তমের অখিলরসামৃত মূর্ত্তিত্বের সৌন্দর্য্য ব্যতিরেক ভাবে প্রকাশ করিবার জন্যই কৃষ্ণের কামকৈবল্য বিরোধী অন্যাভিলাষের প্রতীক-স্বরূপ ভৌম ব্রজে অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি অসুর-বধ লীলা প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণজ্ঞান বিরোধী নির্ভেদজ্ঞানীর প্রতীক কংস-

চাণুর-মুষ্টিক রজকাদি অসুর বধ জ্ঞানভূমিকা মথুরায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহা পূর্ণতর হরি মথুরানাথের সৌন্দর্য্য, ব্যতিরেকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

জ্ঞানভূমিকা মথুরায় কৃষ্ণের জন্ম বা প্রাকট্য। মথুরালীলায় যেরূপ মুমুক্ষু নির্ভেদজ্ঞানী অসুরগণের বধ হইয়াছিল, দ্বারকালীলায় তেমনি কৃষ্ণকর্ম অর্থাৎ কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-বিরোধী বুভুক্ষু কর্ম্মী অসুরগণের বধ হইছয়াছে। ইহা-দ্বারা ব্যতিরেক ভাবে পূর্ণহরি দ্বারকেশের ঐশ্বর্য্য-শোভাই পরিপুষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কথা শ্রীরূপগোস্বামী-প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া সৌভাগ্যবন্তজনগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং উপদেশামৃতের প্রবাহে তাহা প্রচার করিয়াছেন,—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী।।

কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরির প্রিয়, তাঁহা হইতে জ্ঞানমুক্ত পরমা ভক্তির আশ্রিত ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে ব্রজবাসিনী কান্তাগণের শ্রেষ্ঠতা এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা বৃষভানুতনয়া। তাঁহার কুণ্ড তৎসদৃশ, সুতরাং কুণ্ডতীরাশ্রয়কারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হ্লাদিনী-সারসমবেতো মহাভাববতী সরসীর আশ্রয়-গ্রহণ সর্ব্বাপেক্ষা বরণীয়, এই সার্ব্বজনীন ভজনোপদেশই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্য বিচার।

বদ্ধজীবের কৃষ্ণবিমুখতার বিভিন্ন স্তর হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণবিহার-ক্ষেত্র শ্রীকুণ্ডতীরে নিত্যস্থান ও নিত্যানুভূতি প্রদান-পূর্ব্বক "রসো বৈ সঃ" মন্ত্রের উদ্দিষ্ট অখিলরসামৃতমূর্ত্তিত্ব—প্রকাশই শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট, ইহা শ্রীল রূপপাদ জানাইয়াছেন। অধিকার-বিচারে জীবের সেবোন্মুখতার যোগ্যতায় জীব কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারী নামে বিদিত। রসতারতম্যভেদে জীবের নিত্য গঠনে অনুচিৎ এর নাম, রূপ, গুণ, নিত্য বন্ধুবর্গের সেবা; সেবকভেদ-নিরপেক্ষতা প্রভৃতি চিদ্‌বিচিত্রতার উদাহরণমালা যোগ্য জনগণের নিকট প্রচার করিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগ জীবপ্রভু আধ্যক্ষিক ন্যায়শাস্ত্রবিদ্‌গণের কুযুক্তি প্রণোদিত বস্তুদ্বৈতবিচারের মূলে অদ্বৈতব্রুবের দ্বৈতবিচারের অকর্ম্মণ্যতা জানাইয়াছেন, ভোগময় রাজ্যে ত্যাগের অভিনয়-কার্য্যে দার্শনিক পঞ্চক ব্যস্ত থাকায় শ্রীচৈতন্যদেবকে বাস্তবদ্বৈতবাদী বলিয়া স্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় মায়াবাদ তমিস্রে প্রবিষ্ট আপনাকে আধ্যক্ষিক বলিয়া প্রমাণ করিয়া থাকেন। শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবগোস্বামীপাদ শক্তিপরিণাম-বিচারকালে পরমাত্মসন্দর্ভে সেই সকল কথার অজ্ঞতা অপসারণ-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য জানাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীসনাতন—সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য। তিনি 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত'-গ্রন্থের মধ্যে সম্বন্ধবিষয়ক কথা বিচার করিয়াছেন। ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইলে ভগবানের ভক্তের

আশ্রয়ব্যতীত আমাদের ভগবৎসেবা লাভ ঘটে না। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীরূপগোস্বামী, যাঁহার (শ্রীরূপের) অনুগত বলিয়া শ্রীদাসগোস্বামী আপনাকে পরিচয় দিয়াছেন, যাঁহা হইতে ভজনবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—আমাদের কবিরাজ গোস্বামী, সেই শ্রীরূপপ্রভু অত্যন্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির, এমন কি উদ্ধবাদিরও দুর্ল্লভ একমাত্র গোপীগণ-প্রাপ্য ভক্তি-কথা শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট শুনিবার অভিনয় করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণপ্রেম বল্‌বার, বোঝাবার মত জিনিষ নয়। যাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ কৃপাক্রমে ইহা উন্মেষিত হয়, তিনি বল্‌তে পারেন—জান্‌তে পারেন। কৃষ্ণপ্রেম হ'লে এ জগতের চিন্তাস্রোত আমাদিগকে কাবু কর্‌তে পারে না—দুর্ব্বল আমাদিগকে পেয়ে আক্রমণ কর্‌তে পারে না। যখন তা' আমাদের উদ্দীপনার বিষয় হয়, তখন এ জগতের রূপ-রস-গন্ধ আমাদিগকে দুর্ব্বল পেয়ে প্রবলতা লাভ কর্‌তে পারে না—বিবর্ত্ত জনিত দর্শন আমাদিগকে ব্যস্ত করে না—আমরা কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-লীলা দর্শন কর্‌তে পারি—তিনি কি বস্তু, তা' প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারি,—

'যাবনহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।"

যাঁর প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ হয়, তিনি ভগবদ্দর্শনে সমর্থ হন। তিনি যাঁকে দেখা দেন, তিনিই দেখতে পান।

তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর বস্তু। যখন বহির্ম্মুখ বাহ্য চক্ষু, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য থেমে যায়, যখন উদ্বুদ্ধ আত্মার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ লৌল্যপরায়ণ হন, তখন সেই সকল আত্মেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁ'র রূপ দর্শন হয়, গুণ-শ্রবণ হয়, অঙ্গ-গন্ধ গ্রহণ করা যায়, তাঁ'র গুণ কীর্ত্তন হয়, তাঁ'র কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণ স্পর্শ করা যায়—সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তাঁ'র সেবা করা যায়। এই অবস্থাকে জীবন্মুক্তাবস্থা বলা হয়—ইহাই স্বরূপ-সিদ্ধির অবস্থা। তখন অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর বৈশিষ্ট্য ও লীলার আকর্ষণে আমাদের আত্মা আকৃষ্ট হয়।

ভগবদ্রূপরস—রসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ শান্ত রসে প্রতিষ্ঠিত আছেন। পরবর্ত্তীকালে যেমন ঔড়লোমী ঋষি, সনক-সনাতন-সনন্দন ও সনৎকুমারের ধারা শান্তরসের সুষ্ঠু বিচার দেখিয়ে গেছেন অর্থাৎ ত্রিতাপ-মুক্ত মহাপুরুষের ভূমিকা। গৌ-বেত্র-বিষাণ-বেণু যেরূপ গোলোকে কৃষ্ণ সেবা করেন। নন্দের বাড়ীর চাকর রক্তক, পত্রক, চিত্রক, বকুলাদি আর একপ্রকার সেবা করেন—তাঁদের দাস্যরসে সেবা। যেমন তাঁরা গোষ্ঠ সম্বন্ধীয় সেবা কার্য্য করেন, ঘড়া পূর্ণ ক'রে জল এগিয়ে দেন, নীরাজন কার্য্য করেন—যে দাসগণের ধারা অবলম্বন ক'রে বর্তমান ১৬ প্রকার, ৩২ প্রকার, ৬৪ প্রকার অর্চ্চন করেন। তদুন্নত অবস্থায় দেখি—গোপালসকল—শ্রীদাম সুদাম। এঁদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা—বিপ্রলম্ভ সেবার কথা জগতের লোক বুঝে উঠতে

পারে না—এমন কি, এত বড় বৈষ্ণব-দিক্‌পাল শ্রীরামানুজাচার্য্য পর্য্যন্ত বুঝে উঠ্‌তে পারেন নাই। এঁদের কথা সম্পূর্ণ নূতন রাজ্যের কথা। শাস্ত্রে এই সব কথা বর্ণিত হ'য়েছে বটে, কিন্তু সাধারণ লোক বুঝতে পারেন না।

সখ্য দুই প্রকার—গৌরব সখ্য ও বিশ্রম্ভ সখ্য। গৌরব সখ্যেতে সম্ভ্রম-জ্ঞান প্রবল; যেমন মোসাহেবগণ, অমাত্যবর্গ রাজার সেবা করেন, যেমন ভীম অর্জ্জুন কৃষ্ণসেবা করেন। গীতার বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুন হাত যোড় ক'রে র'য়েছেন—বন্ধু এক বড় বস্তু—এইরূপ বিচার হ'য়েছে! বিশ্বের বৃহত্ত্ব-দর্শনে—কৃষ্ণকে বিশ্বমাত্র-দর্শনে কৃষ্ণস্বরূপ দর্শনের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে। বিশ্বের বিরাট্ দর্শন-দ্বারা নিজের ক্ষুদ্রতা মাত্র উপলব্ধি হয়—অচিৎ প্রতীতিতে ছোট বড় বিচার হয়। তা'র চেয়ে একটু ভাল বিচার অর্জ্জুনের ছিল, যখন কৃষ্ণকে দিয়ে রথ চালান হচ্ছিল। তা'ও গৌরব সখ্য; বিশ্রম্ভ সখ্য এরূপ নহে। "কাঁধে চড়ে, কাঁধে চড়ায়, করে ক্রীড়া রণ।" যেমন তাল পাড়্‌তে গিয়ে কৃষ্ণের কাঁধে শ্রীদাম, শ্রীদামের কাঁধে সুদাম, সুদামের কাঁধে বসুদাম চ'ড়ে তাল পাড়্‌লেন, বসুদাম তাল পেড়ে প্রথম খেয়ে দেখ্‌লেন তাল মিষ্টি কি না, তারপর দিলেন সুদামকে, সুদাম আবার দিলেন শ্রীদামকে, শ্রীদাম তাল খেয়ে, মিষ্টি দেখে সেই উচ্ছিষ্টানুচ্ছিষ্ট তালটী কৃষ্ণকে খেতে দিলেন। এটা ঠিক বদ্ধাভিমানী পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনকারীর ফুল তোলার সময় নাক বদ্ধ ক'রে ফুল তুলে কৃষ্ণকে দেবার পদ্ধতির মত নয়। এটা পরম মুক্ত অপ্রাকৃত রাগাত্মিক উদার পথ। সকলে বুঝ্‌তে পারে না—ব্রজের উদার গোপালগণের বিশ্রম্ভ সেবা। এই ঔদার্য্যময়ী বিশ্রম্ভ সেবার কথা নৃলোকে সম্ভ্রমবুদ্ধিযুক্ত লোক বা উচ্ছৃঙ্খল লোক বুঝ্‌তে পারে না। ব্রজের উদার গোপালগণ এই বিশ্রম্ভ সেবা-দ্বারা কিরূপে কৃষ্ণকে তাঁদের একচেটিয়া সম্পত্তি ক'রে নিয়েছেন, তা' সাধারণ লোক বুঝ্‌তে পারে না। গোপালগণ কিরূপে উচ্ছিষ্ট দিয়ে কাঁধে চ'ড়ে কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রীতিময়ী সেবা করেন, তা মর্য্যাদাপথের পথিকের গৌরবময় মেধা ধারণা কর্‌তে পারে না।

আবার তদুন্নত রসে গোপললনাগণ যে নন্দ-নন্দনের সেবা করেন, তা সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। তাঁ'রা লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম, আর্য্যপথ নিজ পরিজন—সব পরিত্যাগ ক'রে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে কৃষ্ণানুশীলন করেন,—

লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম-কর্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ-সুখ, আত্মসুখ-মর্ম।।
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ, নিজ-পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন।।
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন।।

ইহাকে কহয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ।।
এতসব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ।।

এই বিচার অবলম্বন ক'রে গোপীকুল কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে রাসস্থলিতে আকৃষ্ট হয়েছেন। ইহা আরো বড় কথা; শ্রীগৌরসুন্দর এ সকল কথা জগতে জানিয়েছেন। এসব কথা যা'তে শোন্‌বার একটা সুযোগ পাই—যোগ্যতা লাভ কর্‌তে পারি, তা'র জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা যা'তে হয়, তজ্জন্য কার্ষ্ণগণের সেবা করা আবশ্যক। কৃষ্ণকথা ছাড়া সে-সব মহাজনের অন্য কিছু আলোচ্য নাই। তাঁরা চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারা শতকরা শত পরিমাণ কৃষ্ণসেবা ছাড়া আর কিছু করেন না। এরূপ কৃষ্ণসেবার জন্য যাঁদের উৎকণ্ঠা হ'য়েছে, তাঁদের শ্রীনাম ভজনই একমাত্র কৃত্য।

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ এ দরিদ্র জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।।"

কৃষ্ণ—অখিল রসামৃতমূর্ত্তি; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর পঞ্চ মুখ্য রস ও তাহাদের পরিপোষণ সপ্ত আগন্তুক গৌণ রস কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ণরূপে অবস্থিত।

এই জড়জগতেও নশ্বর জড়ীয় সম্বন্ধে ঐ সকল রসের হেয় প্রতিফলন দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রেও এই সকল রসের আলোচনা শ্রুত হয়। আমাদের প্রত্যেকেই উক্ত পঞ্চ রসের কোন না কোন একটিতে অপরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। প্রথমটিতে নিরপেক্ষ অবস্থান দ্বিতীয়টিতে প্রভু ও ভৃত্যের অবস্থান, তৃতীয়টিতে বন্ধু ও বন্ধুর অবস্থান। চতুর্থটিতে মাতা-পিতা ও পুত্রের অবস্থান, পঞ্চমটিতে পতি-পত্নীর অবস্থান। বন্ধু ও বন্ধুর অবস্থান দুই প্রকার। একটি সম্ভ্রম বা গৌরবের সহিত, আর একটি বিশ্রম্ভের সহিত বন্ধুত্ব। বিশ্রম্ভবন্ধুত্ব কোন কোন বিচারক গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাহারা শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ অর্থাৎ গৌরব সখ্য পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিচারানুসারে আমরা বিষ্ণুর নিকট যুক্তকরে দূর হইতে দণ্ডবৎ-প্রণাম ও পূজা-মাত্র করিতে পারি। কিন্তু তাঁহাকে অত্যন্ত আপনার জ্ঞানে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইয়াও তাঁহার প্রীতি সুখ ও শ্রেষ্ঠ সেবা করা যায়—একথা অনেকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

কেহ কেহ পরমেশ্বরকে পিতৃত্বে স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু পরমেশ্বরকে পুত্রত্বে স্থাপন করিয়া তাঁহার আবির্ভাবের মুহূর্ত্ত হইতে কিরূপে অখিল ভুবনপতি পরমেশ্বরকেও লাল্য-পাল্য-বিচারে অত্যন্ত বিশ্রম্ভ-সেবা করিতে পারা যায়, তাহা অনেকে গ্রহণ করিতে

পারেন নাই। আবার যাঁহারা পরমেশ্বরের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরমেশ্বররূপেই দেখিয়াছেন। কিন্তু পরমেশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য যেখানে তাঁহার পুত্রত্বের পূর্ণপ্রভাব সঙ্কোচিত করিতে পারে নাই, সেইরূপ পুত্রত্বের বিচার অনেকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরী যে নিত্যপুত্র পরমেশ্বরকে পাল্য-জ্ঞানে বন্ধন করিয়া থাকেন, পরমেশ্বরও নিত্যপুত্ররূপে তাঁহাদের অলিন্দে জানুচংক্রমণ করেন। "আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার"—এইরূপ একনিষ্ঠ না হইলে কৃষ্ণোপাসনা হয় না, তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে।"

"কৃষ্ণের আমি, আমার কৃষ্ণের সব"—এরূপ অকিঞ্চনা ভক্তি যাঁহার আছে, তাঁহারই কৃষ্ণোপাসনা সম্ভব।

আমি, তুমি ও তিনি—এই তিনটি পুরুষের মধ্যে 'আমি'—এই প্রথম পুরুষের সহিত আমার সম্বন্ধ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের মধ্যে আমার 'আমি'র কথা যে পরিমাণে আছে সেই পরিমাণে আমার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ, নতুবা আমার তাঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। আমি চাই—সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা, আমার স্বার্থের বিষয়—একমাত্র কৃষ্ণ এবং আমি কৃষ্ণের; ইহা ব্যতীত কৃষ্ণেতর স্বার্থে আমার কোন সহানুভূতি নাই।

যাঁহারা কৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব দেন, তাঁহারা কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব লাভ করিতে পারেন। যাঁহাদের কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য পুরুষদ্বয়ে কিছু দিবার আছে, তাঁহারা কৃষ্ণ কি বস্তু, কৃষ্ণপ্রীতি কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারেন না। সেই জন্য তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা—ভিন্ন নানা কার্য্য পড়িয়া যায়। দেশ সেবা, মনুষ্য সেবা, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির সেবা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সেবার কথা কেবল তখনই আসিয়া পড়ে। তখন আমরা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্ম-সেবা-সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হই। গুরু কৃষ্ণের সেবা ব্যতীত আমার আর কোন স্বার্থ নাই, এই বিচারে প্রকৃত স্বার্থপর হওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য।

'কৃষ্ণ' এই নামটিতেই ভগবত্তার পরিপূর্ণ পরিচয় আছে। অন্যান্য মানবকল্পিত নামে চিদচিৎ এর সহিত সম্বন্ধ থাকায় কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধির বিষয় হয় না, আংশিক দর্শনকে মাত্র বহুমানন করিয়া সম্যগ্ দর্শন-লাভে বঞ্চিত হইতে হয় এবং তদ্দ্বারা মতবাদের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দনই গৌরসুন্দররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবের পূর্ণ সৌভাগ্য-লাভের সুযোগ দিয়াছেন। ভগবান্ দশটি পাঁচটী তত্ত্ব নহেন, ভগবৎপ্রীতির পরিপূর্ণতা না থাকায় আমরা শ্রীভগবানকে নিত্যচিদ্‌বিলাসময় বা সচ্চিদানন্দময়—বিগ্রহরূপে দর্শন করিতে পাই না, প্রীতির আংশিকত্ব-হেতু ভগবদ্দর্শনেরও বিভিন্ন আংশিক প্রকাশ লক্ষ্য করি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-ব্যতীত জীব তাঁহার পূর্ণ সৌভাগ্য লাভে চিরকালই বঞ্চিত থাকিবেন।

দ্রাবিড় দেশে মহাভূতপুরীতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কেবলাদ্বৈত নির্ব্বিশেষবাদের হেয়ত্ব-প্রদর্শন-কল্পে এবং ব্যাসদেবের শক্তি পরিণামবাদের সুষ্ঠুত্ব বিচার সংস্থাপন উদ্দেশে যিনি জগদ্গুরু আচার্য্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, যিনি উপাস্য উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব সংস্থাপন-পূর্ব্বক মর্য্যাদা বা বিধি-মার্গে সার্দ্ধাদ্বিতয় রসে বৈকুণ্ঠপতির আরাধনার বিষয় লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়াছিলেন, তাঁহারও সিদ্ধান্তের পূর্ণতা-বিধানের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর বিশ্রম্ভ বা রাগমার্গে অবশিষ্ট পঞ্চার্দ্ধ রসের বিচার প্রদর্শন করেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী ও শ্রীমন্নিম্বার্কেরও বিচার সমূহের সুষ্ঠুতা ও পূর্ণতা সম্পাদন-পূর্ব্বক মহাপ্রভু নিজ ভজনমুদ্রা-দ্বারা অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিষয়ের প্রতি আশ্রয়ের এবং আশ্রয়ের প্রতি বিষয়ের কিরূপ নব-নবায়মানভাবে অনন্তগুণে পরিবর্দ্ধিত হইতেপারে, তাহা ভাগ্যবান নির্ম্মৎসর জনগণের গোচরীভূত করিয়াছেন, সুতরাং এমন মহাবদান্যাবতারী অমন্দোদয়া দয়াবারিধি গৌরহরি ব্যতীত আর কে আমাদের শরণ্য হইতে পারেন। সে ভগবান্ নিজে আচরণ করিয়া তাঁহার নিজ ভজন জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন।

আমার প্রভুর প্রভু গৌরসুন্দরের শিক্ষা—কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার শতকরা শত অংশ সেবা আমারই; অন্য কাহাকেও তাহার অংশীদার জানিয়া আমার সেবা-শ্রম-লাঘবের চেষ্টা হইতে কৃষ্ণে কখনও আমার পূর্ণ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে না। "আমি কৃষ্ণের পূর্ণসেবাবিধানে অসমর্থ হওয়ায় অপর কেহ তৎপূর্ণতা বিধানে সমর্থ হইলে আমি আমার আংশিক সেবা দ্বারা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য করিব—কৃষ্ণকে পূর্ণসেবা লাভে বঞ্চিত করিয়া আমার ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিব অর্থাৎ নিজেও সম্পূর্ণ সেবা করিতে পারিব না, অন্যে করিলেও তাহা দেখিতে পারিব না", ইহা আদৌ সেব্যের প্রতি সেবকের প্রীতিমূলক সেবাধর্ম নহে, উহা মৎসরতা বা সেবাধর্ম্মের বিপর্য্যয় মাত্র।

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ সেবা করিতে সমর্থা বলিয়া স্বসুখ প্রধানা চন্দ্রাবলী বা শৈব্যার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ সমৎসর বিধায় বৃষাকপিতনয়া বা তাহার গণ কখনও বহুমানন করেন না। শ্রীবার্ষভানবীরগণে—রূপানুগ-গণে গণিত হইলেও কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা-লাভে সমর্থ হওয়া যায়; সেখানে সেই সেবাই সৌন্দর্য্য-ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। মাৎসর্য্যের তথায় অবকাশ নাই। শ্রীবার্ষভানবীদেবী তদনুগজনকে নির্ব্ব্যলীকভাবে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা দেখিলে তাঁহাকে কৃষ্ণ-সেবাধিকার দিয়া কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। 'তুমি' 'তিনি' দের বিচার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অকপটে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ না হইয়া তর্ক পন্থাবলম্বনে কৃষ্ণ সেবাধিকার আদায় করিতে গেলে ভুক্তি ও মুক্তি পিশাচীদ্বয়ের কবলে পতিত হয়।

আমাদের সকলেরই হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দের প্রার্থনা রহিয়াছে। 'তুমি' ও 'তিনি' কে পাইয়া সেই আনন্দের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। আনন্দ পাইতে চায়—কৃষ্ণের 'আমি' ও আমার কৃষ্ণকে'; তাহা না হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না—আশা পুরিবে না। আনন্দ চায়—কৃষ্ণের 'আমি' আমাকে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ বিধান করাইতে; 'তুমি'র মধ্যেও চাহে 'আমি' কে বসাইতে। যে 'তুমি', 'তিনি'র মধ্যে তাহার 'কৃষ্ণের আমি' নাই, সেই 'তুমি', 'তিনি'র সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই। যেদিন আমরা আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়ের সকল চেষ্টা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৎপর করিতে পারিব, 'যেদিন কৃষ্ণ আমার', আমি কৃষ্ণের'—ইহা ছাড়া আর ইতর দর্শন থাকিবে না, সেই দিনই আমার সত্য সত্য কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ সদ্‌গুরু পদাশ্রয়ে সত্য সত্য কৃষ্ণ কথা শ্রবণ দ্বারা সত্য সত্য কর্ণবেধ সংস্কার লাভ হইবে, সেই দিনই আমাদের কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতারূপ কর্ণমল মধুকৈটভাসুর বিনষ্ট হইবে। তখন শ্রুত বিষয়ের কীর্তন ও কীর্তন-প্রভাবে স্মরণের সুষ্ঠুতা ক্রমে শ্রবণ-দশা, বরণ-দশা, স্মরণ-দশা অতিক্রমপূর্ব্বক স্বরূপ-সিদ্ধির ও তৎপরে বস্তু-সিদ্ধি লাভ হইবে। সুতরাং 'আমি'র বিচার ঠিক হওয়া দরকার। 'আমি' ঠিক সব ঠিক, 'আমি' বেঠিক—সব বেঠিক।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন,—'আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি' মানি।'' সেই শুদ্ধ মনে স্থায়ীভাব রতির সহিত বিভাব, অনুভাব সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর সম্মিলনে রসের উদয় হয়। সেই রস পঞ্চমুখ্যরস ও তৎপুষ্টিকারক সপ্ত গৌণরসরূপে ভাবনার পথ অতিক্রম পূর্ব্বক চমৎকার প্রাচুর্য্যের ভূমিকাস্বরূপে সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিয়া থাকে। সেই সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ই 'বন' নামক আধার, তাহা দ্বাদশ রসের আলয় স্বরূপ। যে যে স্থানে রসক্রীড়া উদিত হয়, সেই সেই স্থানে রসে মাখা-জোখা হইয়া প্রেম প্লাবিত হইয়া পড়ে। যদি এনিকাটের (Annicut) মত রসের প্লাবনে কোনপ্রকার অন্যাভিলাষের রুদ্ধ কপাট ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে আর রসের উৎস সেরূপভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না, অচেতনের আধারে ভাবনাবর্ত্ম মনোধর্ম্মে যে প্রাকৃত রসের উদয় হয়, তাহারই বিশ্লেষণ ও বিবৃতি ভাবপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ বা ভরত মুনির রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। নৈষধ-চরিত, সাবিত্রী-সত্যবান, শনির পাঁচালী, ওথেলো-ডেস্‌ডেমোনা, লয়লা-মজনু প্রভৃতি প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার চরিত্র পাঠে হৃদয়ে যে সকল রসের উদয় হয় তাহা অস্থায়ী ভাবভূমিকার রসোদয় মাত্র। তাহাতে রসের বিষয় অদ্বিতীয় অসমোর্দ্ধ-বস্তু নহে। কিন্তু দ্বাদশ বনে যে রস, তাহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি-অদ্বয়-জ্ঞান—একমাত্র রসের বস্তু। শান্ত প্রেম, দাস্য প্রেম, সখ্য প্রেম, বাৎসল্য প্রেম, মধুর প্রেম—এই পঞ্চপ্রেমের বিষয় একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ।

"সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে, নিবেদিব চরণে ধরিয়া।"—যাঁহারা ব্রজে বাস করেন, তাঁহারা কৃষ্ণকথা জানেন; কারণ, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ অপ্রতিহত ও অহৈতুক-ভাবে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। গোগণ, গোবৎসসকল কৃষ্ণের সেবা করেন, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের ক্রীড়ামৃগ হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বর্দ্ধন করেন, কৃষ্ণের দোহন ক্রীড়ার ক্রীড়নক হ'ন। নন্দনন্দনের সেই গো সকলের সেবা, নন্দনন্দনের সেবা, নন্দনন্দনের পিতৃমাতৃসেবা, চিত্রক, পত্রক, রক্তক, বকুলাদি ভৃত্যবর্গ করিয়া থাকেন। তাঁহারা দ্রবব্রহ্মগাত্রী কালিন্দীর চিন্ময় সলিলের দ্বারা কৃষ্ণের পাদ-পদ্ম ধৌত করিয়া দেন। কৃষ্ণ যখন উত্তর গোষ্ঠে ফিরিয়া আসেন, সর্ব্বাঙ্গে ব্রজের ধূলায় ধূসরিত হইয়া আসেন, তখন রক্তক-চিত্রক-পত্রকাদি যমুনার জলের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণের গরুগুলি সাক্ষাৎ মহা মহা ঋষি,—যাঁহারা বহুজন্ম তপস্যাদি করিয়া—বেদপাঠ করিয়া ভগবানের সেবা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন—তাঁহারাই ব্রজের গোধন হইয়াছেন—কৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত দুগ্ধ দিতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা তথাকথিত বেদান্তপড়া মুনি ঋষি নহেন।

প্রত্যেকেরই ব্রজবাসীর আনুগত্যে ব্রজে বাস করা দরকার। আমরা শুনিয়াছি, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"তন্নামরূপচরিতাদি-সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্।।"

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর বৈশিষ্ট্য ও লীলা সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে তদনুস্মৃতি-ক্রমে প্রেয়ঃ ও শ্রেয়োবিচারে অভেদ হইয়া, মনঃ কল্পিত চেষ্টাকে সংযত করিয়া, ব্রজজনের কোন একের ভাবের অনুগমন করিয়া শ্রীব্রজভূমিতে অবস্থান পূর্ব্বক অখিলকাল যাপন করাই বিধেয়। ইহাই উপদেশসার। 'ব্রজবাসী' বলিতে চিন্ময় বিচার সম্পন্ন হরিসেবকগণকেই বুঝায়। হরিভজন বিরোধী ইতর বিষয়ভোগীকে লক্ষ্য করে না।

যদি চিত্রক পত্রক বকুলের আনুগত্য না করি, যদি কৃষ্ণের অনুগামী না হই, যদি চক্ষু কর্ণাদির বিষয়ের আনুগত্য করিয়া জড়ের ভোক্তা হই, তাহা হইলে ত ব্রজবাস হইল না, অনুরাগও হইল না।

আমি ভোগ করিতেছি, দৃশ্য আমাকে ভোগ করাইতেছে—ইহার নাম জড়ভোগ বা কৃষ্ণের সেবা বৈমুখ্য। দাস্য রসের আশ্রয় চিত্রক-রক্তক-পত্রক, সখ্যরসের আশ্রয় শ্রীদাম-সুদাম, বাৎসল্য রসের আশ্রয় নন্দ যশোদা এবং মধুর রসের আশ্রয় শ্রীরূপ-মঞ্জরী প্রভৃতিতে যদি অনুরাগ-বিশিষ্ট না হই, তাহা হইলে ব্রজবাস কিরূপে হইবে? তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী।

"সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে"—যাঁহার যে প্রকার রস, তাঁহাকে সেইরসের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আমাদের যদি মধুর রসের জিজ্ঞাসা হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে মধুর রসের ব্রজবাসীর নিকট যাইতে হইবে। যাঁহাদের ললিতা বিশাখার সঙ্গে দেখা নাই বা শ্রীরূপ-মঞ্জরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত নল দময়ন্তীর রস বা রাবণের সীতাহরণের রসের কথা বলিয়া বসিবেন।

ব্রজবাসীগণের কৃপাব্যতীত আমাদের ব্রজবাস হইতে পারে না। তাঁহারা আমাদের সঙ্গে কথা বলিবেন কেন ? অক্ষজ চক্ষু দিয়া কিরূপে তাঁহাদিগকে দর্শন করিব ? আমরা মদ-মৎসরতায় আচ্ছন্ন হইয়া আছি, তাই ব্রজবাসীগণ আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন না—তদনুরাগী না হওয়ার দরুণ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না। নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট যে সকল ব্রজবাসী আছেন, তাঁহারা কেন আমাদের সঙ্গে কথা বলিবেন। তাঁহারা আমাদিগকে বলেন—'তোমরা বিষয় অন্বেষণ কর; কৃষ্ণ কি তোমাদের বিষয় হইয়াছেন ? শ্রীরূপ-মঞ্জরী শ্রীরতি-মঞ্জরীর আনুগত্য-ব্যতীত ব্রজের কথা জানা যায় না। প্রভু-নিত্যানন্দ যেইদিন কৃপা করিবেন, সেই দিন শ্রীরূপ মঞ্জরী ও শ্রীরতি-মঞ্জরীর কৃপা বুঝিতে পারিব।

# পঞ্চম অধ্যায়

## হরের্নামৈব কেবলম্

### (১)

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।"

বর্ত্তমান-কালে বিক্ষিপ্ত-চিত্তবৃত্তিতে—কলিকল্মষ-পূর্ণ-হৃদয়ে ধ্যেয়-বস্তু সর্ব্বদা নিজ-রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছে। যে সকল বিষয় আমরা আমাদের জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা দেখি, তাহাই আমরা ধ্যান করি। আমাদের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহই আমাদের ধ্যেয়বস্তু হয়, নিত্যবাস্তব অধোক্ষজ সত্যবস্তু আমাদের ধ্যানের গোচরীভূত হন না। সত্যযুগে বাস্তব-সত্যবস্তু ধ্যানের বিষয়ীভূত হইতেন; কিন্তু বর্ত্তমান বিবাদযুগে সত্য অনেকটা তিরোহিত হইয়াছেন; সুতরাং সত্যের সাধনপ্রণালী কলিযুগের বিক্ষিপ্ত-চিত্তের পক্ষে কার্য্যকরী হন না। বিক্ষিপ্ত-মনের দ্বারা প্রকৃত ধ্যেয়বস্তুর ধ্যান হয় না—অন্যবস্তুর ধ্যান হইয়া যায়। আমরা কর্ম্মমার্গের পথিকসূত্রে যেসকল বিষয় ধ্যান করি, তাহা ধ্যান করিলে আমাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তিই বাড়িয়া যাইবে। কলিকালে আমাদের যোগ্যতার—নিষ্পাপ নির্ম্মল অবিক্ষিপ্ত চিত্তের অভাব-নিবন্ধন ধ্যান-ক্রিয়া অসম্ভব।

ত্রেতা-যুগে বিষ্ণুর যজনকার্য্য যজ্ঞদ্বারা সাধিত হইত। ত্রেতা-যুগের অনুশীলনের বিষয় 'মখ' বা 'যজ্ঞ'। যজ্ঞকার্য্যে ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু, উদ্‌গাতা ও হোতা—চতুর্ব্বিধ পুরুষের এবং সমিধ্, আজ্য, অগ্নি প্রভৃতি যজ্ঞোপকরণের আবশ্যকতা। ত্রেতা-যুগে অসুরকুল যজ্ঞবিধির প্রতি প্রথমতঃ তত আক্রমণ করে নাই; পরে এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন নানা-ভাবে যজ্ঞ ক্রিয়া আক্রান্ত হইতে থাকিল।

ত্রেতা-যুগে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমন্ত লোকগণ যজ্ঞের দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা বিষ্ণুরই আরাধনা করিতেন এবং যজ্ঞেশ্বরের অবশেষ-দ্বারা দেবতা-বৃন্দের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেন। অপরাপর লোকসমূহ যজ্ঞদ্বারা পিতৃ ও দেবতাগণের আরাধনা করিত; ক্রমশঃ ইতরলোকগণ যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা না করিয়া ইতর দেবতাগণকেও বিষ্ণুর সম-পর্য্যায়ে গণনা করিতে লাগিল।

চার্ব্বাক-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পিতৃযজ্ঞে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। চার্ব্বাক-ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'ধূর্ত্তপ্রতারকগণই পিতৃশ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা করিয়া এবং রাজন্যবর্গকে

যাগাদিতে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহাদিগের নিকট হইতে বিপুল অর্থ সংগ্রহ ও তদ্দ্বারা নিজ-নিজ-পরিজনবর্গ প্রতিপালন করিবার জন্যই ঐরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে পশুকে হনন করা যায়, সে স্বর্গলোকে গমন করে;—যদি ইহাই সত্য হয় এবং এইসকল বাক্যে যদি যজ্ঞকারিগণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তবে তাহারা যজ্ঞে আপনাপন পিতা-মাতা প্রভৃতির মস্তক ছেদন করে না কেন? তাহা হইলে ত' অনায়াসেই পিতামাতা প্রভৃতির স্বর্গলাভ হইতে পারে এবং তাহাদিগকেও আর পিতা-মাতার স্বর্গ-লাভের নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি করিয়া বৃথা কষ্ট ভোগ করিতে হয় না! আর শ্রাদ্ধ করিলেই যদি মৃতব্যক্তি তৃপ্ত হয়, তবে কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দিবার প্রয়োজন কি? বাড়ীতে তাহার উদ্দেশ্যে কোনও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই ত' তাহার তৃপ্তি জন্মিতে পারে! আর যদি এই পৃথিবীতে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? যাহা-দ্বারা কিঞ্চিদুচ্চে স্থিত ব্যক্তিরই তৃপ্তি হয় না, তদ্দ্বারা আবার কিরূপে অত্যুচ্চ-স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হইবে? অতএব পিতৃশ্রাদ্ধাদি—কেবল ধূর্ত্তগণের উপজীবিকামাত্র; বস্তুতঃ, উহা-দ্বারা কোনও ফল লাভ হয় না' ইত্যাদি।

যখন ত্রেতা-যুগে যজ্ঞকার্য্যের বিধান আক্রান্ত হইল, তখন দ্বাপরের প্রবৃত্তিকাল। তখন অর্চ্চন-দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা ব্যবস্থিত হইল। বিষ্ণুর আরাধনায় পশুবধ উদ্দিষ্ট হয় না। উষঃ, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানগ্রাহ্য দেবাদির বা পিতৃকুলের পূজা-প্রণালী—যাহা ত্রেতা-যুগে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহাই দ্বাপরে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিষ্ণুর পরিচর্য্যা ক্রিয়ায় পরিণত হইল। সাত্বতগণ যে-ভাবে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুকে আরাধনা করিতেন, তাহাই বিষ্ণুপরিচর্য্যা-প্রণালী। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ব্যতীত রবি, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি অক্ষজজ্ঞানগম্য নানা-দেবতাগণের পরিচর্য্যাদিই অসাত্বত-সম্প্রদায়ে প্রচলিত হইল।

দ্বাপরান্তে কলিপ্রারম্ভে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ও দৈব ও পিত্র্য-কর্ম্মের এবং বিষ্ণুর উপাসনার ব্যাঘাত করিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বকালেই অনাদিবহির্ম্মুখ জীবকুল সাত্বতগণের বিষ্ণুপরিচর্য্যা-প্রণালীকে বিকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বিষ্ণুপূজা উপলক্ষ্য করিয়া দেবল-সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হইল। এইসকল দেবলসম্প্রদায় বিষ্ণুপূজার ছল করিয়া উদরভরণাদিকার্য্যে লিপ্ত হইল—বিষ্ণুপূজার পরিবর্ত্তে ভোগে লিপ্ত হইল। কলিতে দ্বাপরের বিষ্ণুপরিচর্য্যা যাইবার পরিবর্ত্তে উদর পরিচর্য্যা, স্ত্রী-পুত্র-সেবা বা দেহসেবা হইতেছে দেখিয়া সাত্বতগণ অন্য ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলেন।

শ্রীমদাচার্য্য আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বমুনি স্ব-কৃত মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীনারায়ণ-সংহিতার এই সাত্বত-বচন-প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলিলেন,—

"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।।"

দ্বাপরযুগের অধিবাসিগণ কেবলমাত্র পাঞ্চরাত্রিক-বিধানানুসারে বিষ্ণুর অর্চ্চন করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীনামরূপী ভগবান হরির পূজা হইয়া থাকে।

দ্বাপরযুগের বিষ্ণুপরিচর্য্যা-প্রণালীর ব্যভিচারের 'ছিট্' বর্ত্তমানকালেও আসিয়া পড়িয়াছে। দ্বাপরের সাত্বতগণের বিষ্ণুপরিচর্য্যার সহিত পাল্লা দিবার জন্য যেরূপ অবান্তর পূজা-প্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল এবং বিষ্ণুপূজার পরিবর্ত্তে যেরূপ উদরপূজা আরম্ভ হইয়াছিল, বর্ত্তমান-কালে তাহারই নিদর্শনাবশেষ রহিয়াছে। এখন বিষ্ণুপূজার পরিবর্ত্তে অক্ষজ-জ্ঞানগম্য নানাবিধ দেবদেবীর পূজা-রূপ দেবলবৃত্তি চলিতেছে। এখন শ্রীনারায়ণপূজার পরিবর্ত্তে 'শালগ্রাম দিয়া বাদামভাঙ্গা'র কার্য্য অবাধে চলিতেছে! বাহিরের দিকে অর্চ্চন-প্রণালী শিক্ষা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়া লওয়া হইয়াছে; তদ্দ্বারা স্ত্রী-পুত্র-প্রতিপালন ও নানাবিধ ভোগ চলিতেছে!

কলিকালে দ্বাপরীয় অর্চ্চন হইবার উপায় নাই;—কলিকালে শ্রীনাম দ্বারা ভগবানের অর্চ্চন হইবে অর্থাৎ কলিকালে শ্রীনাম-কীর্ত্তন-মুখে বিষ্ণুর অনুশীলন হইবে। কিন্তু কলিতে যেরূপ সাত্বতগণ-যাজিত দ্বাপরীয় অর্চ্চনপ্রণালীর ব্যভিচার করিয়া মানুষ উদরের পূজা করিবার জন্য 'দেবল' হইয়া পড়ে, কলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও তদ্রূপ ব্যভিচারে অবস্থিত হইয়া তাহারা নামবিক্রয়ী হইয়া পড়ে। তাহারা 'নাম' (?) করিয়া অর্থ—লয় উদর ভরণ করে; কীর্ত্তনীয়া হয়, উদ্দেশ্য—কীর্ত্তন নয়, হরি-সেবা নয়, ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগ। যদি অন্যকার্য্যে বেশী পয়সা পায়, অধিকতর প্রতিষ্ঠা পায়, তাহা হইলে কীর্ত্তন ছাড়িয়া দিয়া অন্যকার্য্য সম্পাদন করিতে প্রস্তুত। যদি কেহ বলেন,—'ভাগবত পাঠ করিয়া পয়সা পাইবে না', তখন পাঠ ছাড়িয়া দেয়, তখন তাহারা বলে,—'ভাগবত আর দুধ দেয় না।' কেহ যদি বলেন,—'কীর্ত্তন করিয়া পয়সা পাইবে না—মন্ত্র-দিয়া পয়সা পাইবে না—বক্তৃতা দিয়া অর্থ পাইবে না', তখন কীর্ত্তন ছাড়িয়া দেয়, মন্ত্র দেওয়ার ব্যবসায় ছাড়িয়া দেয়, বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করে। কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা পাইলে কপট-সেবার অভিনয়টুকুও বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং হরিনাম-কীর্ত্তন (?), ভাগবত-পাঠ (?) কলিসহচর কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি-প্রাপ্তির জন্যই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ঐসকল অভিনয় কখনও নামকীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ বা বক্তৃতা নহে। ঐসকল চেষ্টা—নামাপরাধ, ঐসকল চেষ্টা—ব্যবসায় বা বণিগ্‌বৃত্তি-মাত্র। বণিগ্‌বৃত্তি কখনও 'সেবা' নহে—"ন স ভৃত্যঃ, স বৈ বণিক্।" ঠাকুর দেখিয়া যদি কেহ ভেট না দেয়, তবে ঠাকুর-পূজা ছাড়িয়া দেয়; 'উদরভরণের জন্যই ত' ঠাকুর পূজা (?) ভাগবত-পাঠ (?), বা

নামকীর্ত্তন (?)!' এইরূপ কার্য্য কিন্তু মহাপ্রভুর সময়ে প্রচলিত ছিল না—মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ এইপ্রকার জঘন্য কদর্য্য ব্যবসায় করেন নাই। পরযুগে লোকে ভাগবতবিক্রয়ী, মন্ত্রবিক্রয়ী, নামবিক্রয়ী হইবে অর্থাৎ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপ ভাগবত, সাক্ষাৎ নামিকৃষ্ণস্বরূপাভিন্ন শ্রীনাম, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ ভগবৎস্বরূপ শ্রীভগবন্মূর্ত্তিকে দাঁড় করাইয়া তদ্দ্বারা স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়তর্পণরূপে সেবা করাইয়া লইবে,—এই ঘৃণিত উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাস বা ষড়গোস্বামিগণ কখনও জগতে হরিনাম প্রচার বা ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করেন নাই বা কাহাকেও তাহা শিক্ষা দেন নাই।

প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের জীবনেও চারিযুগের কৃত্য অর্থাৎ ধ্যান, যজ্ঞ, পরিচর্য্যা ও কীর্ত্তন ন্যূনাধিক উদিত হইয়া থাকে। যখন জীব আত্মবৃত্তির অনুশীলন-দ্বারা শুদ্ধ-হরিসেবোন্মুখ হয়, তখনই ঐসকল কৃত্য শুদ্ধভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন জীব মনোধর্ম্মে অভিভূত থাকে, তখন তত্তৎ সাধনপ্রণালীরও ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। মনোধর্ম্মের বশে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কেই 'ধ্যান' করি, ইন্দ্রিয়ের ভোগানলে আহুতি-প্রদানকেই আমরা 'যজ্ঞকার্য্য বলিয়া মনে করি, শ্রীমূর্ত্তির নিকটে নৈবেদ্য দেওয়ার সময় মনে মনে চিন্তা করি,—'জিনিষগুলি কোন্ সময়ে বাড়ী লইয়া গিয়া স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনকে দিব এবং নিজে ভোগ করিব', কীর্ত্তন করিবার সময় সুর-তাল-লয়-মানের অহঙ্কারে আবদ্ধ থাকিয়া চিন্তা করি,—'কিসে আমার কীর্ত্তন শ্রোতৃবর্গের চিত্তের অনুকূল হইবে, তাহাদের কর্ণাভিরাম হইবে' ইত্যাদি। তখন ভগবান্ স্মৃতিপথ হইতে চলিয়া যান,—'আমরা কৃষ্ণকর্ণোৎসব-বিধানের পরিবর্ত্তে জড়কর্ণোৎসব বিধান করিয়া থাকি; তখন আমার কীর্ত্তন-দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয় না, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণই অর্থাৎ কামাগ্নিতেই ইন্ধন প্রদত্ত হইয়া থাকে।

কলিকালে বিক্ষিপ্তচিত্তে ধ্যান অসম্ভব। 'বিক্ষিপ্তচিত্তকে প্রত্যাহারাদি দ্বারা সংযত করিয়া পরে ধ্যান করিব'—এরূপ আশাও নিষ্ফল; কারণ, মনোধর্ম্মি-জীবের ব্যবহিত ধ্যান-দ্বারা নিত্য বাস্তব-চিদ্বিগ্রহ ধ্যাত হইতে পারেন না। মনোধর্ম্ম্যনুষ্ঠিত ধ্যান 'ধ্যান' নহে; নির্ম্মল আত্মবৃত্তির দ্বারাই ধ্যান সম্ভব। কলিকালে যজ্ঞবিধিরও সম্ভাবনা নাই; কারণ, বহুদ্রব্যসাধ্য যজ্ঞাদিতে কলির জীবের ক্ষুদ্র পরমায়ু নষ্ট করিবার সময় নাই। কলিকালে দুর্ব্বলজীবের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে পরিচর্যাও সম্ভবপর নহে। পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিয়া কিছুক্ষণ আসনে বসিলেই পিঠের দাঁড়া ব্যথা পায়; বিশেষতঃ, অনেক-স্থলে এবং অনেক-সময়েই কাল, স্থান, পাত্র ও নৈবেদ্যাদির শুদ্ধ্যশুদ্ধি-বিচার সম্ভবপর নহে; অথচ শৌচাশৌচাদি-বিচার পরিচর্য্যা-কালে বিশেষ আবশ্যক,—কালাকাল বিচারও আবশ্যক।

কিন্তু হরিনাম-কীর্ত্তনে স্থানাস্থান, কালাকাল, পাত্রাপাত্রের বিচার নাই,—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ-কাল নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়।।"
"কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত' কৃষ্ণ বলহ বদনে।।" (চৈঃ ভাঃ মধ্য)

এমন কি, মলমূত্রাদি-ত্যাগকালেও শ্রীহরিনাম গ্রহণ করা যায়। বাহ্য-ক্রিয়া-সমূহ অভ্যাসেই হইয়া থাকে। হরিনাম করিতে কোন বাধা নাই। নিদ্রা-কালে, জাগ্রতাবস্থায়, শয়ন-কালে আমরা হরিনাম গ্রহণ করিতে পারি। আভিজাত্যসম্পন্ন থাকিয়া বা নীচকুলোদ্ভূত হইয়া যে-কোন অবস্থায় হরিনাম গ্রহণ করা যায়। শূদ্র, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ, স্ত্রীপুরুষ, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সকলেই হরিনাম-গ্রহণের অধিকারী। নির্জ্জনে হরিনাম গ্রহণ করা যায়, গণ্ডগোলে হরিনাম গ্রহণ করা যায়, একা হরিনাম গ্রহণ করা যায়, বহুলোক একত্র মিলিয়া হরিনাম গ্রহণ করা যায়, হেলায় শ্রদ্ধায় হরিনাম গ্রহণ করা যায়।

তথাপি এই ভগবন্নাম কীর্ত্তন না করিয়া যদি আমরা আর কিছু করিয়া বসি,— লোককে দেখাইবার জন্য গাত্রাবরণীর ভিতরে ঝুলিটী রাখিয়া বাহিরে আমার কপট দৈন্য, তৃণাদপি সুনীচতার বা প্রতিষ্ঠাশা-হীনতার বিজ্ঞাপন প্রচারেচ্ছা; অথচ, অন্তরে লোক-দেখান বৈষ্ণবতা (!) পরিপূর্ণ-মাত্রায় থাকে,—কপটতা করিয়া, অহং-মমাদি বুদ্ধি লইয়া, অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' জানিয়া, বৈষ্ণবকে 'অবৈষ্ণব' বলিয়া সাধু-নিন্দা প্রভৃতি নামাপরাধ করিয়া, অসাধুকে বহুমানন করিয়া, নাম-বলে পাপপ্রবৃত্তি প্রভৃতি নামাপরাধের প্রশ্রয় দিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ফল লাভে বঞ্চিত হইলাম! গৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।"

নামী-শ্রীভগবান্ অহৈতুক-কৃপা-পরবশ হইয়া নিজনামসমূহের বহু-সংখ্যা প্রকট করিয়াছেন এবং সেই অভিন্ন নামসমূহে তাঁহার সকল প্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। 'বহু-সংখ্যা' শব্দে ভগবানের মুখ্য ও গৌণ নামসমূহ। তন্মধ্যে মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকান্ত, গোপীজনবল্লভ, যশোদানন্দন, নন্দকুমার প্রভৃতি এবং ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ বাসুদেব, নারায়ণ, নৃসিংহ, বিষ্ণু প্রভৃতিই মুখ্য নাম; আর, আংশিক বা অসম্যক্ আবির্ভাবাত্মক 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্ম', 'ঈশ্বরাদি' নামসমূহই ভগবানের গৌণ নাম। ভগবানের মুখ্য নাম-সমূহ—নামীর সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন; তাহাদের মধ্যে সকল শক্তি একাধারে সম্পূর্ণভাবে অর্পিত আছে; পরন্তু গৌণ নামসমূহে বিবিধ শক্তি আংশিক ও ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধযুক্তভাবে বর্ত্তমান।

জগতের সকল-শ্রেণীর লোকেরই হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনে অধিকার। শ্রীল নিত্যানন্দ-প্রভু ও ঠাকুর শ্রীল হরিদাস, উভয়েই শ্রীনামাচার্য্য। নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে একথা বলেন নাই,—"তুমি যবনের ঘরে জন্মিয়াছ, সুতরাং তুমি ব্রাহ্মণের ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণের কৃত্য হরিনাম করিও না।" তিনি শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে বলিলেন,—'তোমরা উভয়েই সমভাবে জগতের প্রতি দ্বারে-দ্বারে গিয়া হরিনাম-প্রেম প্রচার কর।' পূর্ব্ববিধি-অনুসারে কোন ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণেতর-জাতির সহিত কোনপ্রকার ব্যবহার করেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণতা হইতে পতিত হইয়া যান। কিন্তু শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু প্রপঞ্চে উপাধ্যায়-কুলে অবতীর্ণ হইয়াও নিখিল পতিতগণের পাবন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-নবশাখ কিম্বা সুবর্ণবণিক্, প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় বা কুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণকে হরিনাম প্রদান করিলেও পতিতপাবন শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু কিছু পতিত হন নাই।

নিত্যানন্দপ্রভু কখনও উদরভরণ-চেষ্টায় বা অর্থাদির লোভে কাহাকেও নামাপরাধ প্রদান করেন নাই। তিনিই চৈতন্যরসবিগ্রহ শুদ্ধ-হরিনাম বিতরণ করিতে সমর্থ। তাই তিনি পতিতপাবন—জীবোদ্ধারণ। আর যাঁহারা-'অহং মম-ভাব' লইয়া অর্থবিত্তাদির লোভে হরিনাম-প্রদানের ছলে 'নামাপরাধ' প্রদান করেন, তাঁহারা নীচজাতির সংসর্গ-ফলে পতিত হইয়া যান। হরিদাস ঠাকুরও আচার্য্যের কার্য্য করিতে অযোগ্য ন'ন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস-ঠাকুরকে নামাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সর্ব্বজীবকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, আভিজাত্য বা সামাজিক মর্য্যাদার সহিত পারমার্থিক উচ্চাবচ-ভাবের সম্বন্ধ নাই। পারমার্থিকই প্রকৃত আভিজাত্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণোত্তম, এবং অ-পারমার্থিকের সামাজিক মর্য্যাদা—ছলাভিজাত্য-মাত্র; উহা হরিনামগ্রহণের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের (১।৮।২৬) ও কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ) ভাষায় উক্ত হইয়াছে,—

"জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমান-মদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্।।"
'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন-পণ্ডিত-ধনীর বড় অভিমান।।
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার।।"

'শৌক্র-ব্রাহ্মণেতর জাতির মুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে নাই—নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তির হরিনাম কীর্ত্তন করিবার অধিকার নাই'—এরূপ কথা মূল-পুরুষের আচরণের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের দাস—কুলীনগ্রাম বাসী বসু-রামানন্দপ্রভু

বিশেষ-মর্য্যাদা-যুক্ত কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও সুবর্ণবণিক্-কুলে অবতীর্ণ উদ্ধারণ-ঠাকুরকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রপঞ্চে যে-কুলে মহাভাগবত অবতীর্ণ হন, সেই কুলের উর্দ্ধতন ও অধস্তন 'শত-পুরুষ' উন্নত হইয়া থাকেন, মধ্যম ভাগবত আবির্ভূত হইলে ঊর্দ্ধ ও অধস্তন 'চতুর্দ্দশ পুরুষ' উন্নত হন, আর কনিষ্ঠ ভাগবত আবির্ভূত হইলে ঊর্দ্ধ ও অধস্তন 'তিনপুরুষ' উন্নত হইয়া থাকেন। বৈষ্ণব কখনও কর্ম্মফলের বাধ্য নহেন। 'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্' প্রভৃতি বিধি ভগবদ্‌ভক্তের পক্ষে প্রযুজ্য নহে। অনেক সময়ে জীবের পাপফলে কুষ্ঠরোগীর ঘরে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া জন্ম-লাভ হয়; আবার পুণ্যফলে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট সামাজিক আভিজাত্য-লাভ হয়; কখনও বা শ্রীমানের ঘরে যোগভ্রষ্ট হইয়া কর্ম্মফলবশতঃ জীব জন্ম গ্রহণ করেন।এইসকলই প্রাক্তন-ফল—কর্ম্মমার্গের কথা; কিন্তু বৈষ্ণবের পক্ষে সেরূপ কথা নহে। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু বলেন (শ্রীনামাষ্টকে ৪র্থ শ্লোক),—

"যদ্‌ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ।।"

অবিচ্ছিন্ন-তৈলধারাবৎ ব্রহ্মচিন্তা-দ্বারাও ফলভোগ ব্যতীত যে-সকল প্রারব্ধ কর্ম্ম বা পাপ-পুণ্যের ফলাফল বিনষ্ট হয় না, নামস্ফুর্ত্তিমাত্রেই সেইসকল ফল সম্পূর্ণভাবে অপগত হয়—এই কথাই বেদ তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন।

তবে যে প্রপঞ্চে দেখিতে পাওয়া যায়,—ভগবদ্ভক্ত নীচকুলে আবির্ভূত হন, প্রাপঞ্চিক চক্ষে 'মূর্খ' 'রোগগ্রস্ত' প্রভৃতিরূপে প্রতিভাত হন, তাহারও মহদুদ্দেশ্য আছে। সাধারণ লোক যদি দেখিতে পায় যে, ভগবদ্ভক্ত কেবল উচ্চকুলেই আবির্ভূত হন, বলিষ্ঠ বা জড়বিদ্যায় পণ্ডিতরূপেই বিরাজিত থাকেন, তাহা হইলে তাহারা নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িবে। তাই ভগবান্ গৌর-কৃষ্ণ সকল-লোকের নিত্য-মঙ্গল বিধান করিবার জন্য বিভিন্ন-শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে তাঁহার ভক্তগণকে আবির্ভূত করাইয়া অন্যান্য দীন অযোগ্য জীবের প্রতি পরমদয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার এই ক্রিয়াটী—পালিতা শিক্ষিতা হস্তিনী প্রেরণ করিয়া 'খেদা'র মধ্যে বন্যহস্তী ধরিবার ব্যবস্থার ন্যায় জানিতে হইবে। ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনও বলিয়াছেন, (চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ ও মধ্য ৯ম অঃ),—

"শোচ্য-দেশে, শোচ্য-কুলে আপন-সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব, সবারে করেন ত্রাণ।।
যেই দেশে, যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে'।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে।।"
"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ,—সেই পরানন্দ-সুখ।।

বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে।।"

ভগবদ্ভক্ত নীচকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে করিতে হইবে না যে, 'ঐ ব্যক্তি পাপযোনি লাভ করিয়াছেন,—কর্মফলবাধ্য হইয়া নীচ-শূদ্র ম্লেচ্ছাদি-কুলে উদ্ভূত হইয়াছেন'; পরন্তু জানিতে হইবে যে, তিনি নীচকুলাদি পবিত্র করিয়াছেন। আমরা আলাপচ্ছলেও জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি,—'আপনি কোন্ কুল পবিত্র ক'রেছেন?' কোন মহাপুরুষ যদি কলিযুগের একমাত্র সাধন প্রণালী শ্রীনামকীর্ত্তনে সিদ্ধি লাভ করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ,—সন্দেহ নাই।

আমরা শ্রীশিক্ষাষ্টক-মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাসার প্রাপ্ত হই। মহাপ্রভু অর্চ্চন শিক্ষা করিবার কথা বল্লেন না, পরন্তু শিক্ষাষ্টকে শ্রীনামভজনের কথাই শিক্ষা দিলেন। প্রথমেই তিনি বলেন,—'শ্রীকৃষ্ণের নাম সম্যগ্‌রূপে কীর্তন করা আবশ্যক।' নাম-নামী অভিন্ন,—এ কথাও তিনি বলে দিলেন। যখন কোনও বস্তুর সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করা হয়, তখন সেই বস্তুটীকে বিশ্লেষণ করে দেখা'ন হ'য়ে থাকে। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা এই পঞ্চধা বস্তুটি—"শ্রীনাম"। ভগবদ্‌বিগ্রহ-শ্রীনামের অভ্যন্তরেই সকল (নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি) বিরাজমান। গ্রহণকারীর পক্ষে পরস্পরের মধ্যে ('নাম' ও 'রূপে'র মধ্যে, 'নাম' ও 'গুণের' মধ্যে, 'নাম' ও 'লীলা'র মধ্যে ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকিলেও বস্তুটী স্বতন্ত্র নয় (অর্থাৎ 'নাম' হইতে 'রূপ', কিংবা 'নাম' হইতে 'গুণ', কিংবা 'নাম' হইতে 'লীলা', কিংবা 'নাম' হইতে 'পরিকরবৈশিষ্ট্য' ভিন্ন নহেন)।

যদি কেহ মনে করেন,—'আমি ভগবানের রূপ দর্শন করিব' তা'হলে তাঁর জানা উচিত,—এ জড়চক্ষু ভগবানের রূপ দর্শন করতে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণীয় যে রূপ, তা' ভোগের বস্তু। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র—ভোক্তা; তিনি ভোগ্য বস্তু ন'ন। ভোগ্য-বস্তুদ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—ভগবদ্বস্তু এই চক্ষুর্দ্বারা দ্রষ্টব্য নহে; যে জিনিস এই চক্ষুর্দ্বারা দেখা যায়, তাহা 'ভগবানের রূপ' নহে।

'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'কৃষ্ণনাম'—দুইটি পৃথক্ বস্তু ন'ন। বিভিন্নভাবে প্রতীত ও বিভিন্নভাবে গ্রাহ্য হ'লেও কৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা, সকলই—শ্রীনাম!

জড়জগতের বস্তুগুলির মধ্যে নাম ও নামীর পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম সম্বন্ধে তাহা নহে। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বল্লেন,—"শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র 'অভিধেয়' হউক।"

শ্রীকৃষ্ণ+সংকীর্ত্তন=শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ=শ্রী+কৃষ্ণ; শ্রী—লক্ষ্মী অর্থাৎ সর্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী শ্রীমতী গান্ধর্ব্বা; সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিতে গান্ধর্ব্বার সহিত গিরিধর ব্রজেন্দ্রনন্দন। সকলে মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই 'সংকীর্ত্তন', অথবা

'সম্যক্ কীর্ত্তন' অর্থে 'সংকীর্ত্তন' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সকল কথার কীর্ত্তন অথবা নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা-কীর্ত্তনের নাম—'সংকীর্ত্তন'। সেই সংকীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

আমরা সাধনভক্তি পর্য্যায়ে (১) শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন (৩) স্মরণ, (৪) পাদসেবন, (৫) অর্চ্চন, (৬) বন্দন, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য ও (৯) আত্ম নিবেদন—এই নবধা ভক্তির কথা জানি। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে যে চৌষট্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, সেসকল এই নবধা ভক্তিরই বিস্তৃতি। উক্ত চৌষট্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে পাঁচটি শ্রেষ্ঠ সাধনরূপে উক্ত হ'য়েছে (চৈঃ চঃ মধ্য, ২২শ পঃ ১২৫-১২৬),—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ।।"

এই শ্রেষ্ঠ সাধন-পঞ্চক বিচার করিলেও দেখা যায় যে, তন্মধ্যে 'শ্রীনাম ভজনই' সর্ব্বমূল ও সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। শ্রীনামপরায়ণ বা শ্রীনাম কীর্ত্তনকারী সাধুগণের সঙ্গফলে শ্রীনামভজনে রুচি উদয় করাইবার উদ্দেশ্যেই 'সাধুসঙ্গে'র কথা বলা হ'য়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একমাত্র শ্রীনাম-ভজনকেই 'পরধর্ম্ম' বলিয়া কীর্ত্তিত হ'য়েছে (ভাঃ ৬।৩।২২ ও ১২।৩।৫১-৫২),—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।।"
"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।।
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।"

শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কথাই পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হয়েছে। 'মুথরাবাস' অর্থাৎ শ্রীধামবাস-মূলেও নাম-ভজনের উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে। নামাত্মক অস্মিতায় বাস বা যে-স্থানে সংকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সমাগম হয়, সেই স্থানে বাসই 'শ্রীধামবাস'। ভগবন্নামাত্মক মন্ত্রের দ্বারাই এবং ভগবন্নাম-কীর্ত্তনমুখেই শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয়, সুতরাং শ্রীনামকীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বসিদ্ধ হয়,—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম,' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি।।

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'নাম-সংকীর্ত্তন'।
নিরপরাধে 'নাম' লৈলে পায় 'প্রেমধন'।।"

সাত্বতস্মৃত্যুক্ত সহস্র-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বা চৌষট্টিপ্রকার ভক্তি মধ্যে শ্রীনামসংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারাই সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হয়। নাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। অভিধেয়বিচারে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত- প্রচার-লীলা-ভিনয়কারী জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্গত অভিপ্রায় এই যে, 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন'ই একমাত্র অভিধেয়।

যিনি কীর্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ সাধন করেন, তাঁহারই সকল মঙ্গল সাধিত হয়। যিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবেন, পূর্বে তাঁহার শ্রবণ করা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনের অন্তর্ভুক্তই যে সকল প্রকার সাধন-প্রণালী,—ইহা যাঁহার সুদৃঢ়া নিষ্ঠার বিষয় হইয়াছে, তিনি জানেন,—'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনই সাধন-শিরোমণি'। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সাধন-প্রণালী অন্তর্ভুক্ত। নবধা ভক্তির মধ্যে ভক্তি সন্দর্ভে ২৭৩ সংখ্যায়—'যদন্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা, তদা কীর্তনাখ্য-ভক্তিসংযোগেনৈব কর্তব্যা।' (চৈঃ চঃ মধ্য ২২ শ পঃ ১২৯-১৩০)—

"এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।।
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।।"

বহু-অঙ্গ-সাধনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ। যেখানে শাস্ত্র একাঙ্গ সাধনের কথা ব'লেছন, সেখানেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ই লক্ষিত বস্তু। 'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন' বাদ দিয়ে 'মথুরা-বাস,' 'সাধুসঙ্গ' প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন করি, তা' হ'লে তা-দ্বারা মথুরাবাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবনের ফল ও ভাগবত-শ্রবণের ফল, সকলই লাভ হয়। নাম-ভজনে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি। একাঙ্গ নাম সংকীর্তনের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি-লাভ হয়। "পাঁচের অল্পসঙ্গে'র যে-কোন একটিতে শ্রীনাম-সংকীর্তনের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণের বসতিস্থল শ্রীধামবাসে শ্রীনাম-সংকীর্তন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই। সাধুসঙ্গে শ্রীনাম-সংকীর্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—'নাম-সংকীর্তন'। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্তন-দ্বারা জীব অনর্থমুক্ত ও পরম-প্রয়োজন-লাভের অধিকারী হন। মুক্তকুলেরও শ্রীনাম-সংকীর্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্তন-চিন্তন-ফলে জীব মুক্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্তন-ফলে জীব 'হরিসংকীর্তন' করিতে শিক্ষা করেন, অর্চ্চনের দ্বারা (অর্চ্চনে যে নামাত্মক মন্ত্রের ব্যবস্থা আছে এবং মন্ত্র-মধ্যে

নামের সহিত যে চতুর্থ্যন্ত বিভক্তি প্রযুক্ত আছে, তদ্দ্বারা) জীব 'সংকীর্তন' কর্‌তে শিক্ষা লাভ করেন। যিনি মন্ত্রোচ্চারণকারী, তিনি নিজকে শ্রীনামের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। যেদিন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেইদিন তাঁহার মুখে হরিনাম সর্ব্বদা নৃত্য কর্‌তে থাকেন (হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭ সংখ্যা-ধৃত শাস্ত্রবাক্য),—

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।।"

হে ভরতবংশাবতংস, যিনি শত-শত পূর্ব্ব-জন্মে বাসুদেবের সম্যগ্‌রূপে অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নাম-সমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

খাওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই,—পান করার কোন আবশ্যকতা নাই, যদি, কৃষ্ণভজন না করি। মনুষ্যজন্ম-লাভে যে যোগ্যতা হ'য়েছিল, সেটিও না হওয়াই ভাল ছিল, যদি 'হরিভজন' না হ'ল। যদি পশুর ন্যায় খাওয়া দাওয়া, বিলাস প্রভৃতিতেই মানুষের জীবন কেটে' যায়, তা'হলে যে যোগ্যতা লাভ হ'য়েছিল, সেটিত' হারাণ হ'লই, তা' ছাড়া জন্মজন্মান্তরের অত্যন্ত অসুবিধার ভেতর পড়তে হ'লো। "কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।" পশুরা মানুষ হয় হরিভজন করবার জন্য।

কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন—'সংকীর্তন'। আর সব 'সাধন' যদি কৃষ্ণ-কীর্তনের অনুকূল বা সহায় হয়, তবেই তা'দিগকে 'সাধন' বলা যাবে, নতুবা ঐ সকলকে 'কুযোগিবৈভব' বা সাধনের ব্যাঘাত-মাত্র জান্‌তে হ'বে।

হরিনাম ব্যতীত অন্য কোন গতি বা পন্থা নাই। বর্তমান-সময়ে হরিনামের মহা-দুর্ভিক্ষ উপস্থিত! —এখন হরিনামের দ্বারা, কৃষ্ণের দ্বারা উদরভরণ, প্রতিষ্ঠাশা, কামিনীসংগ্রহ, রোগ-নিরাময়, দেশের সুবিধা, সমাজের সুবিধা করিয়া লইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত! কিন্তু হরিনাম—জড়-ভোগের যন্ত্র বা মুক্তিলাভের যন্ত্র নহেন। বর্তমান-কালে কৃষ্ণে ভোগ-বুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তিগণ নামাপরাধ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত! অষ্টপ্রহর নাম-কীর্তনের পর আবার খাওয়া-দাওয়া-থাকার কথা, আবার বাদ-বিসম্বাদের কথা, আবার ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা হইলে তাহাকে আর 'অষ্টপ্রহর' বলা যায় না। নিরন্তর হরিনামগ্রহণই 'অষ্টপ্রহর',—নামাপরাধ-গ্রহণ কখনও 'অষ্টপ্রহর' নহে। নামাপরাধের ফল—ভুক্তি। বর্তমানের বিকৃত 'অষ্টপ্রহর'-রীতিতে হরিনাম বা বৈকুণ্ঠ-নাম কীর্ত্তিত হয় না,—মায়ার নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শুদ্ধনামকীর্তনের ফলে কৃষ্ণে প্রীতির উদয় অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান-কালে মায়ার সংকীর্তনকে 'কৃষ্ণ-সংকীর্তন' বলিয়া জগতে প্রবঞ্চনা বা জুয়াচুরি চলিয়াছে।

যা'রা হরিভজন করে না, তা'দের এ-সকল বুদ্ধি বা বিচার কিছুতেই আসে না। হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা

হউক; স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক; পণ্ডিত হইক, মূর্খ হউক; ধনী হউক, দরিদ্র হউক; রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক; যে যে- অবস্থায় থাকে থাকুক, তা'দের জন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, 'সাধন'—একমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন'।

"বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্—বহুলোকে একত্র হ'য়ে যে কীর্ত্তন, তা'র নাম—'সংকীর্ত্তন'। কতকগুলো বাজে লোকে মিলে' যদি ' হো হা' কর্‌তে থাকি, যদি চিৎকার ক'রে পিত্ত বৃদ্ধি করি, তাহ'লে কি 'সংকীর্ত্তন' করা হবে? যাঁরা শ্রৌতপথ আশ্রয় ক'রেছেন, তাঁ'দের সহিত যদি কীর্ত্তন করি, তবেই 'হরি-সংকীর্ত্তন' হ'বে। ওলাউঠার উপশম বা ব্যবসায়-বৃদ্ধির জন্য যে কীর্ত্তন কিংবা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির জন্য যে কীর্ত্তনের অভিনয়, তা' 'হরিসংকীর্ত্তন' নয়—উহা মায়ার কীর্ত্তন।

হরির সেবক বলেন,—'হরির সেবা কর, অন্য কিছু করো না। হরিসেবার নামে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করো না; মনে রেখো,—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের নাম—'সেবা'। তোমার নিজ বহির্ম্মুখ-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি যা'তে হয়, সেটি 'সেবা' নয়। সেটিকে 'সেবা' মনে কর্‌লে তুমি আত্মবঞ্চিত হ'লে।

আমরা যদি হরির সত্যি-সত্যি সেবক বা কীর্ত্তনকারীর সঙ্গে যোগ দেই, তবে আমাদেরও 'সংকীর্ত্তন' হবে। শ্রবণ হ'লেই সংকীর্ত্তন হ'বে। সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করাই আমাদের আবশ্যক। কৃষ্ণ সম্যগ্ বস্তু, তিনি হেয়, খণ্ড, অনুপাদেয়, 'অসম্যক্' বা 'আংশিক' বস্তু ন'ন। 'অমুক কামার গড়েছে, আমার চোখে বেশ ভাল লাগ্‌ছে', এর নাম—'আমার ভোগের কৃষ্ণঠাকুর' ইহা—'কৃষ্ণ' নহেন। মায়া আমার চক্ষে ঠুলি দিয়ে আমাকে কৃষ্ণ দেখ্‌তে দিচ্ছে না, আমার মনগড়া—আমার ভোগের বস্তু 'পুতুল' দেখিয়ে বল্‌ছে,—এই কৃষ্ণঠাকুর। এই মায়ার বঞ্চনায় পড়ে' কখনও প্রকৃত কৃষ্ণদর্শন হয় না। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনকারীর সহিত যেকাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন না করি, সেকাল পর্য্যন্ত মায়া আমাকে নানা-ভাবে বঞ্চনা ক'রে থাকে। যা'দের হৃদয় নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল চায় না, যা'রা নিজকে নিজে বঞ্চনা করতে চায়, তা'দের অনুগত হয়ে কীর্ত্তন কর্‌লে কোন মঙ্গল হবে না, উহা মায়ার কীর্ত্তনই হ'য়ে যাবে। মালা-তিলক ফোঁটা লাগিয়ে ব'সে আছে, 'হো হা' কর্‌ছে—পিত্তবৃদ্ধি কর্‌ছে,—গুরুর নিকট শ্রবণ করে নাই—কীর্ত্তন কর্ত্তে জানে না,—তা'দের অনুগত হ'লে সংকীর্ত্তন হবে না।

আরও সংকীর্ত্তনের প্রতিবন্ধক-কারী আছেন। তাঁরা ব'লে থাকেন,—"বেদান্ত-বাক্যেষু সদা রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"; কেহ কেহ বা পতঞ্জলি ঋষির অনুগত হ'য়ে রেচক-পূরকাদি ক'রে প্রাণকে আয়াম বা সংযম কর্‌বার বিচারে আবদ্ধ হন, এই বিচারেও তাঁ'রা বাহ্যজগতেই আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন। মনে করি,—'নিবৃত্ত হব', কিন্তু সাধুর জীবনলাভ আমার ভাগ্যে হ'য়ে উঠে না! জগৎ হ'তে তফাৎ হ'তে ইচ্ছা

করি, 'যোগ-পথ', 'বেদান্তপাঠ' প্রভৃতিতে মঙ্গল হ'বে মনে করি, কিন্তু ঐপ্রকার ত্যাগীর কল্পনা বা প্রচ্ছন্ন-ভোগ পিপাসা আমাদের নিঃশ্রেয়স আনতে পারে না ব'লে ঐ সকল চেষ্টা—'অভিধেয়' শব্দবাচ্য হ'তে পারে না। তাই, যাঁ'রা অবঞ্চক হ'য়ে লোকের কাছে নিরপেক্ষ সত্যকথা বল্‌ছেন, সেইসকল মহাপুরুষগণ বলেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, কেবলি বিশের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে', কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।।"

'কর্ম্মী' বা 'জ্ঞানী' হওয়া—জীবের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। 'কর্ম্ম' বা 'জ্ঞান' জীবাত্মার ধর্ম্ম নহে। 'শ্রীকৃষ্ণসেবা'ই জীবের নিত্যধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন-কর্‌লেই জীবের নিত্যমঙ্গল হ'বে। মঙ্গলের ছায়া-লাভে জীবের প্রকৃত মঙ্গল-লাভ হবে না। কৃষকসূত্রে আমাদের দরকার—ধান-গাছের মঙ্গল সাধন করা, শ্যামা-গাছকে উপ্‌ড়ে ফেলে' দিতে হ'বে; শ্যামা-গাছকে ফেলতে গিয়ে ধানকে যেন উপ্‌ড়ে না দেই। কর্ম্ম ও জ্ঞানে ভগবানের সেবা নাই। কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই—স্বার্থপর। কুকর্ম্মী ত' অত্যন্ত পাপিষ্ঠ। সৎকর্ম্মীর পুণ্য কার্য্যের পুরস্কারও একপ্রকার দণ্ডই—উহা মূর্খতার দণ্ডমাত্র। অত্যন্ত রূপবান্ হওয়া, অধিক অর্থশালী হওয়া, অতি পণ্ডিত হওয়া—এক-একটা দণ্ডেরই প্রকার-ভেদ। পাপের দণ্ডটা আমরা বেশ বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু পুণ্যের দণ্ডটা ভাবি-কালে হয় ব'লে, তখন-তখনই বুঝা যায় না। ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন,—

"পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপিজন,
তা'রে, মন, দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তা'র না লইও নাম,
'পুণ্য', 'মুক্তি'—দুই ত্যাগ করি।।
প্রেমভক্তি-সুধা-নিধি, তাহে ডুব' নিরবধি,
আর যত—ক্ষারনিধি-প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিলুঁ উপায়।।"

ভগবদ্ভজন-বঞ্চিত ব্যক্তিদের হৃদ্‌গত ভাব—অর্চ্চা-মূর্ত্তিটি কামারের গড়া একটি পুতুল। বাহ্যভাব তা'দিগকে এতদূর আচ্ছন্ন করেছে,—তা'রা দেহ ও মনোধর্ম্মের দ্বারা এতদূর পরিচালিত হচ্ছে যে, বাহ্য মূর্ত্তি তা'দের চক্ষে প্রবল থাকায় তা'রা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন কর্‌তে পাচ্ছে না; শ্রীমূর্ত্তিকে তা'রা তা'দের ভোগের বস্তু মনে কর্‌ছে। তা'রা রাধাগোবিন্দের নামকে 'অক্ষর'-মাত্র মনে কর্‌ছে। অর্থাৎ নামাপরাধ কর্‌তে কর্‌তে

ভোগরাজ্যে ধাবিত হচ্ছে। সেইসকল পাষণ্ডিদিগকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য 'পাষণ্ডদলন-বানা' নিত্যানন্দপ্রভুর একটা প্রধান কার্য্য পড়ে' গেছ্‌লো।

'সত্যকথা' আবরণ করাই বর্ত্তমানে একটা মহা-পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যা'রা "সত্যং পরং" এই ভগবানের স্বরূপ-লক্ষণ হ'তে তফাৎ হ'য়ে আমদানী-রপ্তানীর কার্য্যে ব্যস্ত তা'রাই কর্ম্মকাণ্ডী। যা'রা ভগবানের কথা বিশ্বাস করে না, সংকীর্ত্তনকেই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য এবং মুক্তকুলের উপাস্য-বস্তুরূপে জানে না, সেই জরাসন্ধাদি-তুল্য ব্যক্তিগণ জ্ঞানকাণ্ডী; একজন ভোগী, অন্যজন ফল্গুত্যাগী বা প্রচ্ছন্নভোগী।

'কৃষ্ণসংকীর্ত্তন' হ'লে আমাদের সংসারের উন্নতি কর্‌বার বুদ্ধি হ'তে (লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির আশার প্রাকৃত চেষ্টা হ'তে) সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি হয়। কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-চন্দ্রিকা হ'তে জীবের মঙ্গল-কুমুদ প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠে। নাম ভজনকারী ব্যক্তিরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য-লাভ হয়। একমাত্র নাম কীর্ত্তনকারীরই পূর্ণমাত্রায় সর্ব্বপ্রকার পাণ্ডিত্যে অধিকার আছে। চৈতন্যরস বিগ্রহের আনন্দ-প্লাবনে হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে গেলে বাহ্য-জগতের চিন্তা-স্রোতে ব্যস্ত বা নশ্বর-সুখের লোভে মত্ত থাক্‌বার চেষ্টা হ'তে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়—সর্ব্বপ্রকার উগ্রতা প্রশমিত হয়—মায়াবাদ গ্রহণীয় নয়, একথা জানা যায়।

দ্বিতীয় কথা,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অধিকারী সকলেই। কৃষ্ণে সর্ব্বশক্তি আছে—নামেও সর্ব্বশক্তি আছে। 'পুরুষ হরিভজন কর্‌বে, স্ত্রী কর্‌তে পারবে না; সুস্থব্যক্তি হরিভজন কর্‌বে, রুগ্নব্যক্তি কর্‌তে পারবে না; যে তিন বেলা স্নান কর্‌তে পারে না, সে হরিভজন কর্‌তে পারবে না; যা'র গায় খুব জোর নেই, সে হরিভজন কর্‌তে পার্‌বে না; নীচ-কুলে জাত ব'লে হরিভজন কর্‌তে পার্‌বে না'—এরূপ বিচার শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে নাই। 'ও বালক, আমি বৃদ্ধ হ'য়ে ওর সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌বো না; আমি পণ্ডিত, মূর্খের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌বো না; আমি কুলীন, নীচকুলজাত ব্যক্তির সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌ব না'—এরূপ মনোধর্ম্মের বিচার আত্মধর্ম্ম কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে নাই। 'মলমূত্র পরিত্যাগ-কালে অথবা পাপযুক্ত হৃদয়ে হরিনাম কর্ত্তে পারি না',—এরূপ বিচারও শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে নাই। মলমূত্র-ত্যাগকালে 'হরিনাম' করা যায়, পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও হরিনাম কর্‌তে পারে; কিন্তু যা'রা 'হরিনাম ক'রে পাপ হজম—কর্‌ব'—এরূপ কপটতার আশ্রয় করে, তা'রা 'হরিনাম' কর্‌তে পারে না; নাম-বলে পাপ-কর্‌বার প্রবৃত্তি থাক্‌লে 'হরিনাম' হয় না।

মূর্খের অর্চ্চনাধিকার নাই। কিন্তু কাল—কলি। ব্রাহ্মণ ছেলেকে বল্‌ছেন,—'যখন লেখাপড়া শিখ্‌লি নে, তখন পূজারীগিরি কর্‌গে।' কিন্তু এটা (অর্চ্চন)—সর্ব্বাপেক্ষা

পাণ্ডিত্যের কার্য্য। (ভাঃ ১০।৮৪।১৩),—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।"

যিনি এই স্থূল-শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃণ্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি, এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে 'গাধা' অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

অব্রাহ্মণদের বিচার—'আমার স্ত্রীপুত্র, এ দেহটা আমার, আমি উৎকৃষ্ট-কুলে জন্ম গ্রহণ করেছি, আমার রক্ত-মাংস-চামড়াগুলি পরম পবিত্র',—এরূপ বিচার নিয়ে ভগবদ্ভক্তের কাছে যাওয়া যায় না—ভগবদ্ভক্তের কৃপার অভাবে 'হরিনাম' হয় না, এরূপ প্রমত্ত থাক্‌লে শ্রীবিগ্রহের দর্শন হয় না—শ্রীবিগ্রহকে 'পুতুল' দেখে,—ঠাকুরকে ভাস্করে গড়েছে—কাদা, মাটি, পাথর, কাঠ, পেতল দিয়ে ঠাকুর হয়েছে—এরূপ মনে হ'য়ে থাকে। যে যে-অবস্থায় আছে, সে যদি সাধুর কথা শুনে, তবে তা'র পৌত্তলিকতা দূর হয়।

'লেখাপড়া শিখেছি'—এ বুদ্ধিটা প্রবল হ'লে 'হরিসেবা' কর্ত্তে পারা যায় না, 'পৌত্তলিক' হ'য়ে যেতে হয়। মানুষের লেখাপড়া শিখ্‌বার আদৌ আবশ্যকতা নাই, যদি সেই লেখাপড়া হরিভজনের প্রতিবন্ধক হয়। ও রকম লেখাপড়া শিখে' মানুষ পৌত্তলিক হ'য়ে যায়; হরিসেবার বদলে তা'রা অহঙ্কারের পূজা করে। মূর্খ কর্ম্মকাণ্ডী যেমন হরিসেবা কর্ত্তে পারে না, অতিজ্ঞানী জ্ঞানকাণ্ডীও তমোধর্ম্মে আসক্ত হ'য়ে পড়ে (ঈশাবাস্যে ৯) —

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভুয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।"

এই পৃথিবীতে হাজার হাজার, লাখ লাখ সাধন-প্রণালীর কথা লোকে বল্‌ছে। কেউ বল্‌ছে,—'হরিনাম করাটা মূর্খেরই কার্য্য; পণ্ডিতের কার্য্য—হরিনাম না ক'রে 'বাহাদুর' হ'য়ে যাওয়া।' তাই গৌরহরি বিদ্বম্মন্য সমাজকে শিক্ষা দিবার জন্য বল্‌ছেন,—"হে হরিনাম! তোমাতে আমার রুচি দিলে না—তোমার নামে আমার অনুরাগ হোল না!' 'শূদ্রেরা—মূর্খেরা 'হরিনাম' করে করুক; আমি পণ্ডিত, আমি ব্রাহ্মণ—আমি বেদ অধ্যয়ন কোর্‌বো, আমি অর্চ্চন কোর্‌বো; মহাপ্রভু বলছেন,—বদ্ধজীবের ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়, তাই তিনি লোক-শিক্ষকের লীলা-প্রদর্শনচ্ছলে বল্‌ছেন,—'হায়, ভগবানের নাম ব্যতীত অন্য কার্য্যে আমার রুচি হচ্ছে, সাক্ষাৎ (ব্যবধান-রহিতা) উপাসনায় আমার অরুচি!!'

তিনি নামসম্বন্ধে তৃতীয় কথা বল্‌ছেন,—'হে জীবগণ, তোমরা কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু কোর না, সর্ব্বক্ষণ 'কীর্ত্তন' কর্‌বে। 'অমানীমানদ', 'তৃণাদপি সুনীচ' না হ'লে কীর্ত্তন হয় না। তুমি বড় ওস্তাদ,—বড় বুদ্ধিমান্—এসকল বিচারে প্রমত্ত হ'য়ো না'। আমি গৌরসুন্দরের নিকট হ'তে 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়ার উপদেশ পেলাম; আমাকে যদি কেউ আক্রমণ করে, তখন আমার তাহা সহ্য ক'রে হরিনাম করা উচিত—আমার তখন জানা উচিত যে, আজ ভগবান্ আমাকে কৃপা ক'রে অমানী ও সুনীচ' হওয়ার অবসর প্রদান করেছেন, এরূপ জেনে' আমার হরিনামে আরও উৎসাহান্বিত হওয়া উচিত। কিন্তু কেউ যদি আমার গুরুবর্গের উন্নত পদবীর অমর্য্যাদা করে, তবে তা'কে বল্‌ব,—"ওরে পাষণ্ডী, তুই বৈষ্ণবের সুনীচতা বুঝ্‌তে পারছিস্‌নে, ভগবানের বক্ষে—স্কন্ধে—মস্তকে রাখ্‌বার বস্তু যে বৈষ্ণব', তাঁকে তুই তোর চেয়েও নীচ মনে কর্‌ছিস? তোতে যে ঘৃণ্য ব্যাপার আছে, তা' তুই বৈষ্ণবে আরোপ কর্‌ছিস্ কোন্ সাহসে? পাষণ্ডী কর্ম্মী তুই, জানিস্‌নে—সমস্ত মঙ্গলমূর্ত্তি হাত যোড় ক'রে যে বৈষ্ণবদের সেবা-প্রতীক্ষায় সতত দণ্ডায়মান, সেই বৈষ্ণবদের নিন্দা কর্‌লে তোর অমঙ্গল যে অবশ্যম্ভাবী! বৈষ্ণবের বিদ্বেষ কর্‌লে জীবের পরম অমঙ্গল ঘটে।

বৈষ্ণব-নিন্দককে সমুচিতভাবে দণ্ডিত কর্‌তে হ'বে,—ইহাই 'তৃণাদপি সুনীচতা', 'সহিষ্ণুতা'; কিন্তু যখন কেউ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে গালি-গালাজ কর্‌তে থাক্‌বেন, তখন আমি জান্‌বো,—যে সকল লোক অসুবিধায় পড়বেন, ভগবান্ তাঁ'দের দ্বারা আমার মঙ্গল বিধান ক'রে দিচ্ছেন। ভগবান্ যখন আমাকে দয়া করেন, তখন অসংখ্য মুখে অসংখ্যপ্রকার কটু কথা বা'র ক'রে আমাকে সহ্যগুণ শিক্ষা দেন। ভগবান্ আমাকে জানান,—দুনিয়ার নিন্দা সহ্য কর্ত্তে না শিখ্‌লে 'হরিনাম' কর্‌বার অধিকার হয় না।

কৃষ্ণকীর্ত্তন কর্‌তে হ'লে 'মানদ' হ'তে হ'বে। আমাদের গুরুদেবকে মূর্ত্তিমান 'মানদ' দেখেছি; তিনি বহির্ম্মুখ লোকদিগকে ভোগা দিতেন—বাজে কথা ব'লে বিদায় দিতেন; কারণ, তা'রা নিজেরাও করে না, অপরকেও হরিভজন কর্‌তে দেয় না।

সকলকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর্‌তে হবে; তাই ব'লে মায়াকে 'হরি' সাজাতে হ'বে না। আমার ভোগের উপাদানকে, 'আমার খাবার দৈ'কে 'ভগবান্' বল্‌তে হবে না। ভগবানের প্রসাদকে 'ভগবান্' বল্‌তে হ'বে।

'আমাকে লোকে সেবা করুক'—এর নাম 'কর্ম্মকাণ্ড'। 'হরিকে দিয়ে নিজের ভজন করিয়ে নেবো—হরি চাকর থাক্‌বে—আমাদের ভোগের বস্তুর সরবরাহকারিরূপে সর্বদা দাঁড়িয়ে থাক্‌বে'—আমাদের এইরূপ কর্ম্মকাণ্ডীয় কু-বুদ্ধি!

হরিসেবা-প্রবৃত্তি-বৃদ্ধির জন্য যে সকল কথা আলোচনা করা যায়, তাহাই 'হরিকথা'। কিন্তু ভোগ-প্রবৃত্তির বৃদ্ধির জন্য যে-সকল কথা আলোচনা করা যায়, তাহা 'হরিকথা' নয়—মায়ার কথা।

কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন কর, তা'হলে লোকে জানুক,—'মায়ার কীর্ত্তন' কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন' নহে। সেবার অনুকূল যে-সকল কার্য্য, তাহাই 'ভক্তি'। কর্ম্মের সঙ্গে তাহা গোলমাল (confound) ক'রে ফেলা উচিত নয়।

কর্মকাণ্ডে 'তৃণাদপি সুনীচতা' নাই; কপটতা ক'রে 'আকু পাঁকু ভাব' দেখানটা 'তৃণাদপি সুনীচতা' নহে। সে-জন্যই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেছেন,—'চৈতন্যচরণে নিষ্কপট-অনুরাগবিশিষ্ট পুরুষ ব্যতীত অপরের তৃণাদপি সুনীচতা সম্ভব নহে; (যথা চন্দ্রামৃতম্ ২৪),—

"তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ সুধা-মধুরভাষিতা বিষয়গন্ধ-থূথূৎকৃতিঃ।
হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা ভবন্তি কিল সদ্গুণা জগতি গৌরভাজামমী।।"

অর্থাৎ, তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিমানশূন্যতা, স্বাভাবিকী স্নিগ্ধ-কমনীয়-মূর্ত্তি, অমৃতের ন্যায় মধুরভাষিতা, কৃষ্ণচৈতন্য-সম্বন্ধরহিতবিষয়গন্ধে থূৎকারিতা, হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা,—এইসকল সদ্গুণ জগতে একমাত্র গৌরভক্তগণেরই হইয়া থাকে।

'হরিকথা' ব্যতীত জগতে আর অন্য কথা কিছু নাই। একমাত্র হরিকথা দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়; কেবল সুর, মান, তাল, লয়—এ-সকল 'কীর্ত্তন' নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে ভাল 'কালোয়াত' হ'তে বল্লেন না। তিনি বল্লেন,—সর্বক্ষণ 'হরিকীর্ত্তন' কর। 'খোলে রকমারি বোল উঠা'তে পার্‌লে বা লোক ভুলা'তে পার্‌লেই 'কীর্ত্তনকারী' হওয়া যায় না। নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণটা 'হরিকীর্ত্তন' নয়—যা' দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, সেটিই 'হরিকীর্ত্তন'। নিজে লীলা-প্রবিষ্ট না-হওয়া-পর্য্যন্ত কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন কর্‌তে পারা যায় না।

মহাপ্রভু শ্রীনাম-সাধন-প্রণালীর কথা ব'লে নামকীর্ত্তনকারীর সর্ববিধ কৈতব বা অন্যাভিলাষ-বর্জনের কথা জানা'লেন। ভাগবত-ধর্ম বা 'পরধর্ম' একমাত্র নামকীর্ত্তন-মুখেই সাধিত হয়, তাহা 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' ধর্ম্ম। ধন-জন-পাণ্ডিত্য-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার অনুসন্ধানের জন্য বা মুক্তি-লাভের জন্য আমাদের প্রয়াস কর্‌তে হ'বে না। ধর্ম্মার্থকাম বা কর্ম্মফলবাদ ও মোক্ষ—যা'র জন্য জগতের তথা-কথিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শতকরা শতজনই লালায়িত, শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লেন,—সে-সকলই কৈতব বা ছলনা। ঐসকলের প্রয়াস যা'দের আছে, তা'দের মুখে 'হরিনাম' বেরোবে না। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-বাসনার জন্য আমরা যেন নামাশ্রয়ের অভিনয় দেখিয়ে নামের চরণে অপরাধ না করি। নিজ-নিজ ভোগের বা শান্তির প্রার্থনা ভবানের চরণে কর্‌তে হবে না। নিজের সুবিধার জন্য ভগবানকে কখনও 'চাকর' কর্‌বো না—খাটাবো না। যা'রা ধর্ম্মার্থকাম ইচ্ছা করেন, তা'দিগকে কর্ম্মকাণ্ডী, আর যা'রা কর্ম্মফল ত্যাগের বিচার করেন তা'দিগকে 'জ্ঞানকাণ্ডী'

বলা হয়; তা'রা উভয়েই স্বার্থপর—ভগবান্‌কে চাকর কর্‌বার জন্য ব্যস্ত!—ভোক্তৃতত্ত্ব ভগবানকেও তা'দের ভোগের বস্তু করবার জন্য ব্যস্ত! কিন্তু শুদ্ধ-ভক্ত বলেন (মুকুন্দমালা-স্তোত্রে ৪)

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্।।"

"হে হরে! আমি বিষয়-সুখের জন্য, অথবা গুরুতর কুম্ভীপাক কিংবা অন্য নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য তোমার চরণযুগল বন্দন করি না, কিংবা নন্দনকাননে সুন্দরী সুরকামিনীগণের সুকোমল তনুলতা-সমূহের যোগে সুখ লাভ করিবার জন্যও তোমার চরণযুগল বন্দন করি না; কিন্তু কেবলাভক্তির প্রতি-স্তরে আশ্রিত হইবার জন্যই হৃদয়মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি।"

আমি নিজ-কার্য্যের জন্য শান্তি বা অশান্তি কিছুই চাই নে। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা—এসকল মনের ধর্ম্ম, শরীরের ধর্ম্ম, তাৎকালিক ধর্ম্ম। চতুর্বর্গকে যা'দের প্রয়োজন জ্ঞান হ'য়েছে, তা'দের দ্বারা 'হরিভজন' হ'তে পারে না—'হরিনাম' হ'তে পারে না। আমদানী-রপ্তানীকারি-দলের মুখে কখনও 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন' হয় না। আমদানী হ'লেই রপ্তানী হয়।

যদি আমরা নন্দনন্দনের সেবার অধিকার প্রার্থনা করি, তাহ'লে আমাদের কনকামিনী প্রতিষ্ঠা-চেষ্টার হাত হ'তে উদ্ধার পাওয়া আবশ্যক;—

'তোমার কনক ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।।
প্রতিষ্ঠাশা-তরু জড় মায়ামরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।।"

'নিখিল-শ্রুতিমৌলি রত্নমালা-দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।।"

সেই রূপানুগ চৈতন্যশিক্ষা আচরণ করবার জন্য—চব্বিশ ঘন্টা হরিনাম করবার জন্য আমরা উপদেষ্টা হ'য়েছি। ধর্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষ-বাঞ্ছার কপটতা থাকাকালে

হরিনাম করবার যে অভিনয়, তা' শুদ্ধ হরিনাম-কীর্ত্তন নয়। নাম কীর্ত্তনের সহিতই লীলা-কীর্ত্তন সম্ভব। শ্রীরূপ একাদশটি শ্লোক রচনা ক'রেছেন এবং শ্রীনামাষ্টক লিখেছেন। সেই নামাষ্টকেরই প্রথম শ্লোক—"নিখিল-শ্রুতি মৌলি" ইত্যাদি। মুক্তকুলের বাণী-শ্রবণে সেবোন্মুখতা উপস্থিত হ'লে হরিনাম জিহ্বাতে উদিত হন।

আমি সম্যগ্‌রূপে হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করব। বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করা কর্তব্য। কিন্তু শ্রীহরিনাম প্রভুর কীর্ত্তনের সহিত তাহা করা আবশ্যক।

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্‌গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।।"

শ্রুতি দেবী যাঁ'র চরণ-নখ অর্চ্চন করেন ভগবদ্ভক্ত সেই অপ্রাকৃত শ্রীনামের অনুশীলনে প্রীতি যুক্ত।

শ্রীনামপ্রভুর পাদপঙ্কজান্তের আরতি ক'রছে যে বেদ-বেদান্তশাস্ত্র সেই শ্রীনামৈক ভজনের অর্থ বিশেষরূপে নির্ণীত হ'য়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে। ঈশ, কেন, কঠাদি দশোপনিষৎ বা শ্বেতাশ্বতরের সহিত একাদশ উপনিষৎ, তদুন্নতাধিকারে নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী এবং সর্বোন্নতাধিকারে গোপালতাপনী উপনিষৎ প্রকাশিত। গোপাল তাপনী শ্রুতি বহু তপস্যা প্রভাবে মদনগোপাল ও গান্ধর্ব্বার দাস্যলাভ ক'রেছেন। শ্রুতিগণ গোপীর আনুগত্য লাভের জন্য তপস্যা করেছিলেন।

ভগবদ্ভক্তির যত প্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনই একমাত্র প্রধানতম ও পরম প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ-নামের সেবা প্রকৃত প্রস্তাবে ও সর্বতোভাবে সাধন করিতে হইলে আমাদিগকে শ্রীনামপরায়ণ মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণনামে সকল জিনিষই পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণনামে সর্বশক্তি, সর্বশোভা, সর্ব আকাঙ্ক্ষার পরিস্ফূর্তি এবং সর্বসাধনের চরমফল ও সিদ্ধি নিহিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকর, ধাম, লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাম সর্বতোভাবে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের নাম-সেবা দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর—সকল বিষয়েই জীবের চেতনের বৃত্তিতে প্রকাশিত হয়। অপ্রাকৃত শ্রীনামই—নামী, রূপী, গুণী, লীলাময়রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম শ্রীকৃষ্ণের নাম সেবাদ্বারাই পরিপূরিত হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের নামে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াভিনিবেশ, যাবতীয় প্রবৃত্তি, যাবতীয় চিন্তা, যাবতীয় ধারণা—সকলই নিয়মিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের নাম আমাদের জিহ্বাগ্রে উদিত হইলে আমরা নশ্বর জগতের যাবতীয় কৃত্য, কর্তব্যবুদ্ধি, নশ্বর জগৎ ভোগ করিবার প্রবৃত্তি এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক সুবিধা-অসুবিধা অনায়াসেই পরিত্যাগ করিতে পারি। আমরা এখন আমাদের নিখিল চেষ্টাকে শ্রীকৃষ্ণের কাম-সেবায় নিযুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের

অপ্রাকৃত নাম-শ্রবণ ও কীর্তন করিতে করিতে জীবন যাপন করিতে পারি।

কৃষ্ণেতর বস্তুর নাম—জাগতিক আভিধানিক শব্দসমূহ আমাদের সম্মুখে আমাদের নিত্যানন্দলাভের পথে যে সকল অর্গল আনিয়া দেয়, শ্রীকৃষ্ণনামেই সেই সকল অর্গলও অনায়াসে তিরোহিত হইয়া যায়। সেই শ্রীকৃষ্ণ-নাম আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ, নিখিল-চেষ্টা, সর্বপ্রকার অভিনিবেশ, অধ্যবসায়—সকলের উপরে বিজয় লাভ করুন। সকল সাধনের শিরোদেশে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণনাম কেবলমাত্র সাধন ব্যাপার নহেন, তাহা সাধনের ফল সাধ্যবস্তুও বটে। এইজন্য যাঁহাদের সর্ববিধ জাগতিক তৃষ্ণা সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই সকল মহামুক্ত মহামহিমগণও একায়ন পদ্ধতিতে এই শ্রীকৃষ্ণনামেরই নিরন্তর উপাসনা করেন। সমস্ত বেদের শিরোভাগ ও সারভাগ যে শ্রুতিসমূহ, তাহারাও শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রভুর নখশোভাকে নিরন্তর আরতি করিয়া থাকেন।

হরেকৃষ্ণ নাম—Predominating Agent আর কর্ণ Predominated agent অর্থাৎ হরেকৃষ্ণ নাম নিয়ামক বা প্রভু, আর কর্ণ নিয়ম্য বা বশ্য। কর্ণ যেখানে নিয়ামক বা প্রভু হইতে চাহে, সেখানে নাম-শ্রবণ বা কীর্তন হয় না। হরিকীর্তনকে যে কর্ণ ভোগ করিতে বা মাপিয়া লইতে চাহে, সেইরূপ কর্ণের বৃত্তির দ্বারা হরিকীর্তন বা হরিনাম শ্রুত হয় না। সেই বৃত্তির নামই—"অপরাধ"।

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ"

কুণ্ঠানামগ্রহণ দ্বারা এক ইঞ্চিও progress করিতে পারিব না। যদি আমরা অনন্তকাল ধরিয়া ঘিনি বাজাই, চেঁচাই, হরিবোল বলি, তাহাতে আমাদের অসুবিধা যাইবে না। কাহাকে কুণ্ঠানাম বলে, আর কাহাকেই বা অকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠ নাম বলে, তাহা গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিতে হয়। নামদাতা গুরু বলেন, যে নাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে গিয়া শব্দের সহিত শব্দীর ভেদ উৎপাদন করে তাহা কখনও 'নাম' নহে—বিষ্ণু বস্তু নহে। বিষ্ণু-ব্যতীত শব্দকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু-শব্দ ব্যবহার করিলে চলিবে না। মায়াধীশ বিষ্ণু ও বিষ্ণুমায়া-রচিত বস্তু এক নহে। 'হরি'-শব্দে 'মসূর ডাল', 'সিংহ' প্রভৃতি বুঝায়; সুতরাং উহার সম্বোধনে 'হে হরে' বলিতে যদি 'হে মসূরিকে' কিম্বা 'হে সিংহ' এই প্রকার বিচার হইয়া পড়ে, তাহা হইলে হরিশব্দের স্বার্থকতা হইবে না; রাধামনোহর বিচার মনে না আসিলে 'হরি' শব্দের বিকৃতার্থ গ্রহণ হইয়া যাইবে, সেই জিনিষটির বদলে অন্য কোন জিনিষের অনুশীলন হইয়া পড়িবে, তাহাতে কিছুমাত্র সুবিধা হইবে না। যেমন আনাড়ী (অনভিজ্ঞ) কৃষক ধান্যক্ষেত্র পরিষ্কার করিতে গিয়া ধান্য ও শ্যামাঘাসের পার্থক্য না জানায় শ্যামাঘাসকে রাখিয়া ধান গাছই উপড়াইয়া ফেলে—নিড়ান দিয়া ধান্যকেই weed out করিয়া দেয় তাহাতে কিছুদিন পরে

ধান্যক্ষেত্রের পরিবর্তে শ্যামাক্ষেত্রই হইয়া পড়ে, শ্যামার বীজ পড়িয়া জমি নষ্ট হইয়া যায়, পরে আবার অনেক অর্থ ও সময়-ব্যয়ের আবশ্যকতা হয়। সেইরূপ সকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ শব্দকেও চিনিতে না পারিলে দুর্গতির সীমা থাকে না। জহুরী না হইলে জহর কিনিতে গিয়া ঠকিয়াই আসিতে হইবে, গিল্টিকে আসল বলিয়া কিনিয়া আনিলে তদ্দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যায় না।

"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্‌"—ঋগ্বেদের এই আচমনীয় মন্ত্র অর্চন-পথের পথিকগণ আবৃত্তি করেন; আর ভজন-পথের পথিকগণ কীর্তন করেন, —"ওঁ আঽস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্‌ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ"। আচমনীয় মন্ত্রের দ্বারা জিহ্বার মল-সমূহ বিনষ্ট হয়, তারপর শুদ্ধ জিহ্বায় শ্রীনাম কীর্তিত হন। যেমন জিবছোলা দিয়ে জিহ্বার ময়লা পরিষ্কার করে, তারপর জিহ্বায় সন্দেশ দিলে তা'র সুষ্ঠু আস্বাদন হয়, তদ্রূপ আচমন-মন্ত্রের দ্বারা জিহ্বার বহির্মুখতা রূপ মল বিনষ্ট হ'লে সেবোন্মুখ জিহ্বায় ভজনীয় মন্ত্র উচ্চারণ হন। সংসারের প্রচণ্ড বিপদ্‌ নিরীক্ষণ করিয়া ঋষিগণ কিয়ৎ পরিমাণে তাহা হইতে বিরত হইবার বাসনায় শ্রীসূত-গোস্বামীকে বলিতেছেন, আমরা চতুর্দশভুবন ভ্রমণকালে শুনিয়াছি যে মহাকাল পর্যন্তও সর্বসংহারকারী হইয়াও প্রপঞ্চাগত ভগবন্নাম হইতে স্বয়ং ভয়প্রাপ্ত হন। কিন্তু আরও শুনিয়াছি যে, কালশায়িত সংসারাসক্ত বদ্ধজীবকুল স্ব-স্ব আসক্তিতে আবদ্ধ হইয়া নিজের স্বতন্ত্রতা নষ্ট হইলে ভগবানের নাম-প্রভাবে ভোগাসক্তি হইতে মুক্ত হন। তাদৃশ ভগবদ্ভক্তের মহিমা বিষ্ণুচরণামৃত-গঙ্গোদক অপেক্ষাও অধিক। গঙ্গোদকে পাপাদি বিনষ্ট হয়, শ্রীভগবন্নামে পাপ বিনষ্ট হইয়া সেবা-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ঘটে। নামাভাসেই পাপ ধ্বংস হয় এবং নামপ্রভাবেই হরি-প্রীতিলাভ ঘটে। শ্রীনাম কোন ভোগ্য বস্তুর সংজ্ঞা না হওয়ায়, অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেব্য বস্তু হওয়ায়, নামী বস্তুর সহিত তাহার কোন ভেদ নাই। তজ্জন্য প্রপঞ্চাগত নামের উচ্চারণই ভজনের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। ভগবানের নামোচ্চারণকারী ভক্ত গঙ্গাদির জল অপেক্ষা বদ্ধ জীবের পক্ষে অধিক উপযোগী। সেই নামনামি-অভিন্ন বস্তুর সান্নিধ্যে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অনুমানাদি হইতে বদ্ধজীবের যে বিপদ্‌ উপস্থিত হয়, তাহা প্রশমিত হয়।

ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশে অক্ষজ-বিলাসচতুর ব্যক্তিগণ ভোক্তৃবুদ্ধিতে যে নামোচ্চারণ করে, তাহাতে দশবিধ নামাপরাধের সম্ভাবনা আছে। তাদৃশ নামাপরাধ দ্বারা কর্ম্মমার্গীয় তুচ্ছফল লাভ ঘটে। আর সম্বন্ধজ্ঞানরহিত অপরাধবর্জিত নামোচ্চারণের নাম নামাভাস। তদ্দ্বারা বিষয়-বন্ধন হইতে জীব মুক্ত হইয়া তটস্থ ভাব লাভ করেন। তটস্থভাবে অবস্থানকালে, তাঁহার শ্রীনাম-গ্রহণে কৃষ্ণপ্রেম উদিত হন। প্রাকৃত বিচারে নামের সেবা

করিতে গেলেই নামাপরাধ হয়। প্রাকৃত ভাব-নির্মুক্ত অবস্থায় নামীর বিচিত্রবিলাসের অনুভূতির অভাবে নামাভাস এবং শুদ্ধ চিদ্‌বিলাস নামীর বিচিত্র লীলাস্ফূর্তিতে হরিসেবাজনিত প্রেমার উদয়। তাহাতে ভোগ বা ত্যাগের গন্ধ নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তানুসারে **শ্রীনাম-সংকীর্তনই মুখ্যভজন**। শ্রীনামসংকীর্তনই ভক্তি-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, স্মরণাদিও কীর্তন বা শ্রীনাম-সংকীর্তনেরই অধীন। শ্রীনাম-কৃপা না হইলে কখনও লীলা-স্ফূর্ত্তি হয় না। পরিপূর্ণ অখণ্ড রস শ্রীনাম-কলিকা স্বল্পস্ফুট হইতে হইতেই অপ্রাকৃত শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনস্থ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্যাম-সুন্দরাদি মনোহররূপ বিকশিত হয়। কুসুম-সৌরভবৎ স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্ঠি গুণ-সৌরভ অনুভূত হয়। শ্রীনাম-কুসুম পূর্ণ বিকচিত হইলে চিল্লীলামিথুনের চিন্ময়ী অষ্টকাল-নিত্য-লীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও শ্রীনামকীর্তনকারীর শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বলীকৃত হৃদয়ে উদিত হয়। কীর্তন ছাড়িয়া পৃথগ্‌ভাবে স্মরণাদি-চেষ্টা জড় প্রতিষ্ঠাসত্তার মাত্র। সন্দর্ভ, ভাগবতামৃতাদি যাবতীয় সংস্কৃত গোস্বামিগ্রন্থের পরম নির্যাসস্বরূপ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নামক গৌড়-ভাষায় লিখিত গ্রন্থে প্রবেশাধিকার না থাকায় অনেকে গোস্বামিগণ-বিরচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি পড়িয়াও বিদ্বজ্জনানুগত্যাভাবে প্রকৃত গোস্বামি-সিদ্ধান্ত ধরিতে পারেন না। কল্পিত বা রচিত ছড়া-কীর্তন ‘‘শ্রীনাম-সংকীর্তন’’ নহে; উহা নামাপরাধ-কীর্তন, উহা ‘কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ’ বা ‘ভজন’ নহে; ‘আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ’ অথবা ভজনের নামে ভোগ—অপরাধ মাত্র। শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্‌গীর্ণ শ্রীনামের সংকীর্তনই ভজন; তাহাই সদ্য প্রেমসম্পত্তি-উৎপাদনে সমর্থ এবং ভজন-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সর্বসাধুজন-নির্ণীত। সেই স্বয়ংপ্রকাশ নামামৃত সেবোন্মুখ একটি ইন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় মধুররসে সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম প্লাবিত করিয়া থাকে। কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এই সিদ্ধান্তই কীর্তন করিয়াছেন—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষ্বাবির্ভূয় তাননায়াসেনৈব তত্তদ্‌যুগগত-মহাসাধনানাং সর্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি। যত এব কলৌ ভগবতোবিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি। অত্র কলিপ্রসঙ্গেন কীর্তনস্য গুণোৎকর্ষ ইতি বক্তব্যম্। ভক্তিমাত্রে কালদেশাদিনিয়মস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ সর্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎ-কীর্তনস্য সমানমেব

সামর্থ্যম। কলৌ তু শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্গ্রাহ্যম্ ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্তৎপ্রশংসেতি স্থিতম্। অতএব যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস ইতি। তত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ । কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথেত্যাদৌ। (১)

শ্রীসনাতন প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলেন,—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারের্বিরমিতনিজধর্মধ্যানপূজাদিযত্নম্।

কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।। (২)

(বৃঃ ভাগবতামৃত ১।১।৯)

---

(১) কলিযুগে স্বভাবতঃ অতি দরিদ্র জীবগণের মধ্যে কীর্তনাখ্যা ভক্তি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া অনায়াসেই তাঁহাদিগকে পূর্ব পূর্ব যুগোচিত মহা-মহা-সাধন-লভ্য সমস্ত ফলই প্রদানপূর্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন; যেহেতু কলিযুগে এই সংকীর্তনদ্বারাই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ জন্মে। এস্থলে কলিযুগমাহাত্ম্যবর্ণন-প্রসঙ্গে কীর্তনেরই গুণোৎকর্ষ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ-গুণ-বর্ণন অভিপ্রেত; যেহেতু কেবলমাত্র এই কীর্তনাখ্য ভক্তির বিষয়েই কাল-দেশাদি নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব যুগেই শ্রীযুক্তা কীর্তনাখ্যা ভক্তির সামর্থ্য সমান, কিন্তু কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্বক তাহা গ্রহণ (প্রচারার্থ স্বীকার) করিয়াছেন, এই নিমিত্তই কীর্তনের সেই সকল প্রশংসা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কলিযুগে যদি অন্যান্য (নয় প্রকার বা চতুঃষষ্টি প্রকার বা সহস্র প্রকার) ভক্তি অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কীর্তনের সহযোগেই যে সেই সকল ভক্তি সাধন করিবে, ইহাই কথিত হইয়াছে; যথা—সুমেধা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিযুগে সংকীর্তন-প্রধান-যজ্ঞ (ক্রিয়া) দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে (অনধিকারীর রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্তনাদির নিমিত্ত অবৈধ অক্ষরাদি-সংযোগপূর্বক গান অপেক্ষা) কেবল স্বতন্ত্র শুদ্ধনামকীর্তনই অতিশয় প্রশস্ত। "কেবলমাত্র হরিনাম, হরিনাম এবং হরিনামই কর্তব্য, এতদ্ব্যতীত কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই, নাই, নাই" ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই শ্লোকোক্ত দৃঢ়-প্রমাণসমূহ কেবলমাত্র শুদ্ধ-নাম-কীর্তনেরই পরম প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছে।

(২) যাহা হইতে বর্ণাশ্রমাদি নিজধর্ম, ধ্যান ও অর্চনাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাস মাত্রেই) প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন। ইহা পরম অমৃতস্বরূপ, ইহাই আমার একমাত্র জীবন ও ভূষণ।

শ্রীল সনাতন প্রভু আরও বলেন,—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেবঃ সমর্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।। (৩)

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭ সংখ্যাধৃত শাস্ত্রবাক্য)

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর—"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি।।" (ভাঃ ২।৮।৩)—শ্লোকের টীকায় বলেন,—"সোঽপি স্মরণ-প্রযত্নঃ---শ্রবণ-কীর্তনরতো ভক্তস্য নাবশ্যক ইতি। শ্রবণকীর্তনাধীনমেব স্মরণমিতি।" (৪)

প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত। সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকর-বৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম-রূপ-গুণ-পরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ, এবং কীর্তন-স্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্। (৫)

অথ কীর্তনাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেদেতন্নির্বিদ্যমানানাম্ ইত্যাদ্যুক্ত—ত্বান্নামকীর্তনা-পরিত্যাগেন স্মরণং কুর্যাৎ। (৬)

---

(৩) হে ভরত-বংশাবতংস, যিনি শত শত পূর্ব জন্মে সম্যগ্‌রূপে বাসুদেবের অর্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

(৪) শ্রবণ-কীর্তনকারী ভক্তের স্মরণপ্রযত্নের আবশ্যকতা নাই। শ্রবণকীর্তনের অধীনই স্মরণ।

(৫) অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নামশ্রবণই অপেক্ষণীয় (আবশ্যক)। নামশ্রবণ-ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপ-বিষয়িণী কথা শ্রবণ-দ্বারা শ্রীরূপের উদয়যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্‌ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণসকলের স্ফূর্তি সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীগুণের স্ফূর্তি হইলে পরিকরগণের বৈশিষ্ট্য-হেতু সেবকের সিদ্ধ পরিচয়-বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। অতঃপর নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর,—এই সমুদয়ের সম্যক্ স্ফূর্তি হইলে লীলার স্ফূর্তিও যে সম্যগ্‌ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইল। কীর্তন এবং স্মরণ-বিষয়েও এইরূপ ক্রম জানিবে।

(৬) অনন্তর কীর্তনাদিদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে "হে নৃপ, বিরক্ত অকুতো-ভয়াভিলাষী যোগ্য ব্যক্তিগণও হরিনামই অনুক্ষণ কীর্তন করিয়া থাকেন", ইত্যাদি বচনানুসারে নাম-কীর্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ কর্তব্য।

কৃষ্ণস্য নানাবিধ কীর্তনেষু তন্নামসংকীর্তনমেব মুখ্যম্।
তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্‌শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ।। (৭)

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতমাত্মহৃদ্যং প্রেম্না সমাস্বাদনভঙ্গিপূর্বম্।
যৎ সেব্যতে জিহ্বিকয়াঽবিরামং তস্যাঽতুলং জল্পতু চ কো মহত্ত্বম্।। (৮)

একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ।
আপ্লাবয়তি সর্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিজৈঃ।। (৯)

মুখ্যো বাগিন্দ্রিয়ে তস্যোদয়ঃ স্বপরহর্ষদঃ।
তৎপ্রভোর্ধ্যানতোঽপি স্যান্নাম-সংকীর্তনং বরম্।। (১০)

নাম-সংকীর্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ।। (১১)

তদেব মন্যতে ভক্তেঃ ফলং তদ্‌রসিকৈর্জনৈঃ।
ভগবৎপ্রেমসম্পত্তৌ সদৈবাব্যভিচারতঃ।। (১২)

সল্লক্ষণং প্রেমভরশ্য কৃষ্ণে কৈশ্চিদ্‌রসজ্ঞৈরুত কথ্যতে তৎ।
প্রেম্নোভরেনৈব নিজেষ্টনাম সংকীর্তনং হি স্ফুরতি স্ফুটার্ত্যা।। (১৩)

নাম্নাস্ত্ত সংকীর্তনমার্তিভারান্মেঘং বিনা প্রাবৃষি চাতকানাম্।
রাত্রৌ বিয়োগাৎ কুররীরথাঙ্গীবর্গস্য চাক্রোশনবৎ প্রতীহি।। (১৪)

---

(৭) বেদ-পুরাণাদি পাঠ, কথা, গীত, স্তুতি প্রভৃতি ভেদে বহু প্রকার কৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে কৃষ্ণের নাম-সংকীর্তনই মুখ্য; কেননা, একমাত্র নাম সংকীর্তনই অবিলম্বেই কৃষ্ণেপ্রেম-সম্পৎ আবির্ভাব করাইতে স্বয়ং অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ হইয়াই সমর্থ। এই জন্যই ধ্যানাদি হইতেও নাম-সংকীর্তনের শ্রেষ্ঠতা। নামসংকীর্তনই সর্ববিধ ভক্তি-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম; সজ্জনগণ ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন।

(৮) জিহ্বা-দ্বারা প্রেম-সহযোগে ভক্তিভরে স্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নামামৃত—যাহা সম্যগ্‌রূপে অবিরাম আস্বাদিত হয়, সেই নামামৃত আস্বাদনের কোন তুলনা নাই, কেই বা তাঁহার মহত্ত্ব বর্ণন করিতে পারে?

(৯) শ্রীনামামৃত একটি ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় মধুর রসে সমগ্র ইন্দ্রিয়কেই প্লাবিত করিয়া থাকে।

(১০) নিজের এবং পরের অর্থাৎ কীর্তনকারীর ও শ্রোতার হর্ষপ্রদ নামসংকীর্তন সাক্ষাদ্‌রূপে বাগিন্দ্রিয়েই উদিত হইয়া থাকে। অতএব প্রভুর ধ্যান হইতেও নাম সংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ।

ধ্যানং পরোক্ষে যুজ্যেত ন তু সাক্ষান্মহাপ্রভোঃ।
অপরোক্ষে পরোক্ষেঽপি যুক্তং সংকীর্তনং সদা।। (১৫)

মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের অবস্থিতি-ক্ষেত্রে চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া সব জিনিষটার ছবি উঠে। আমাদের চিত্তরূপ দর্পণটি পাংশুরাশিতে আবৃত হওয়ায় Absolute Integer-এর সঙ্গে Absolute infinitesimal জীবে যে প্রয়োজন—যে সম্বন্ধ, তাহা অর্থাৎ আমাদের স্বরূপের নিত্যবৃত্তি প্রতিফলিত হয় না। Absolute এর সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ, non Absolute-এর সঙ্গে নহে; কিন্তু তাহাতে আমরা বিমুখ। কৃষ্ণসংকীর্তন আমাদের চিত্ত পরিমার্জিত করেন—সকল বিমুখতা দূর করিয়া দেন। 'Universe-রূপ যে emporium উহার সহিত association করিয়া দেখি না কেন',—এই প্রকার বুদ্ধি আসিয়া আমাদের চিত্তদর্পণ নানা আবর্জনায় আবৃত হইয়া আছে। Tantalising mood লইয়া আমরা এখানকার tentative exploitation-এ বড়ই ব্যস্ত। এই জড় জগতের research laboratory-তে বসিয়া আমাদের sense-গুলিকে লইয়া জগদ্ব্যাপারের সহিত উহাদিগকে associated করিবার যে যত্ন করি, তাহা সমূহ অমঙ্গল প্রসব করে। ঐ সকল অসৎসঙ্গ প্রবল থাকায় বাস্তব বস্তুর reflection বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। Object সমূহের বিচিত্রতা প্রকৃতভাবে reflected হইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণ কি জিনিষ তাহা যখন cognitional fac-

---

(১১-১৩) শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্তনই পরমাকর্ষক মন্ত্রের ন্যায় প্রেম-সম্পত্তির বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অহো! শ্রীনাম-সংকীর্তনকে শ্রেষ্ঠ সাধনই বা বলি কেন? রসিকজন শ্রীনাম-সংকীর্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া বিচার করেন, কারণ, ভগবানে প্রেম-সম্পত্তি আবির্ভাব করাইতে সর্বদা 'নাম-সংকীর্তনই' অব্যর্থ; তজ্জন্য নাম-সংকীর্তনকেই 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কোন কোন রসজ্ঞ পুরুষগণ নাম-সংকীর্তনকেই প্রেমের স্বরূপ বলিয়া বিচার করেন। নাম-সংকীর্তনই শ্রীকৃষ্ণে প্রেমপ্রাচুর্যের সদুৎকৃষ্ট লক্ষণ, যেহেতু নিজ ইষ্টের নাম-সংকীর্তনই হৃদয়ের আর্তির সহিত প্রেমের ভরেই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়। অতএব নাম-সংকীর্তন ও প্রেমের পরস্পর কার্য-কারণতাসম্বন্ধ-হেতু অভেদই সিদ্ধ হইল।

(১৪) বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতক-কুলের আর্তস্বরে 'প্রিয়' 'প্রিয়'—এইরূপ আহ্বানের ন্যায় রাত্রিকালে পতি-বিরহ-বিধুরা কুররী ও চক্রবাকীবর্গের ন্যায় ভক্তসকল বিরহজ প্রেমের সহিতই নাম-সংকীর্তন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ পরমার্তিসহকারে বিচিত্র-মধুর-গাথা-প্রবন্ধে ভগবানের নাম-সংকীর্তনই কর্তব্য।

(১৫) মহাপ্রভুর ধ্যান পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়, সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তিযুক্ত হয় না; পরন্তু সংকীর্ত্তন অপরোক্ষ ও পরোক্ষ সর্বদাই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

ulty-র বিষয় হয়, তখন চিত্তদর্পণ পরিমার্জিত হয়। মানুষ বর্তমানে যে সমস্ত জিনিষ লইয়া ব্যস্ত আছে, তাহার কেবল direction-টি পরিবর্তন করিতে হইবে, function নষ্ট করিতে হবে না।

"ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং"—আগুনে পুড়িয়া মানুষ consumed হইয়া যাইতেছে, সংসার-দাবাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মানুষ বিশ্বদর্শন করিতে গিয়া পতঙ্গের ন্যায় জ্বলিতেছে। যখন কৃষ্ণ-সংকীর্তনে মানুষের lending ear হয়, তখন ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হইবে—শ্রেয়ঃ-কুমুদ প্রকাশিত হইবে। আমরা অনেক জিনিষ পড়িয়া থাকি, কিন্তু Absolute এর কথা আদৌ আলোচনা করি না—non absolute-এর কথা লইয়াই দিন-রাত কাটাইয়া দিই। কৃষ্ণসংকীর্তনদ্বারা ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হইলে আমাদের abnormal অবস্থা দূরীভূত হয়। এইগুলি negative way-তে হইয়া যাইতেছে। কিন্তু positive something ও acquisition হইতেছে।

"শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং"—'শ্রেয়ঃ'—individual interest অর্থাৎ বাস্তব মঙ্গল। আর 'প্রেয়ঃ'—আমার তাৎকালিক সুবিধা হইবে মনে করিয়া যাহা স্বীকার করি। Veterinary surgeon যেমন ঘোড়ার মুখব্যাদান করাইয়া ঔষধ খাওয়াইয়া দেন, ঘোড়া বুঝুক আর নাই বুঝুক তদ্দ্বারা তাহার উপকার লাভ হয়; সেইরূপ পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি গুরুদেব কৃষ্ণকথামৃত পান করাইয়া আমাদের নিত্যমঙ্গল বিধান করেন।

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সু মন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।।

"কৈরবচন্দ্রিকা"—strong light নয়, চাঁদের আলো। আমরা রোগগ্রস্ত হইলে কুপথ্য চাহিয়া লই; ডাক্তার ডাকি বটে, কিন্তু তাঁহাকে প্রকারান্তরে বলি যে 'সব শুদ্ধ আমারই flatterer হইয়া যাও'; তাহাতে সুচিকিৎসার অভাবে আমরা বঞ্চিত হই। যদি ডাক্তারের dictation না লই, ডাক্তারকেই dictate করিবার বিচার গ্রহণ করি, তাহা হইলে we need not call for a doctor, , আমরা নিজের বুদ্ধির দোষে অসুবিধায় পতিত হই। কৃষ্ণকথাবর্ণনা-শ্রবণে সকল অসুবিধা দূর হইয়া আমাদের নিত্য শ্রেয়ঃ লাভ হয়। মানুষ দুনিয়াদারীতে যে সকল কথা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে মঙ্গলের কথা কিছুই নাই। আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের function-গুলি properly adjusted হওয়া আবশ্যক। মনের চিন্তা করা দোষের নয়, কিন্তু যাহা চিন্তা করা উচিত নয়, তাহাই হইতেছে; এই প্রকারে যাহা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শ করা উচিত নহে, তাহা করিতে যাইয়া নানাপ্রকার দুঃখ বরণ করিয়া অমঙ্গলের আবাহন হইতেছে। আপাত সুবিধা বোধের চেষ্টাই প্রেয়ঃ পন্থা। হিম লাগাইতে ভাল

লাগে তাই হিম লাগাই, কিন্তু উহার পরিণাম চিন্তা নাই—ইহাই প্রেয়ঃ বিচার। 'শ্রেয়ের' বিচার-হিম লাগাইও না, কিন্তু প্রেয়ঃপন্থী আমি বলি—মুক্ত বায়ু দরকার, ফলে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

'প্রেয়ঃ'-পথেই সমস্ত জগৎ ধাবমান, শ্রেয়ের দিকে কেহ যাইতে চাহে না। কৃষ্ণকে কালো দেখিয়া সকলেই আলোর দিকে ছুটিতে চাহিতেছেন, কিন্তু কালোর আলো বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকার অসুবিধা বরণ করিতেছেন। জগতে মনুষ্যজাতির স্বকপোলকল্পনা হইতে যে সকল কথা উদ্ভূত হইতেছে, তাহার সবগুলিতেই অসুবিধা, "মাধব হাম্ পরিণাম নিরাশা"।

"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।" ভাঃ ১১।১৯।১৮

কতকগুলি লৌকিক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, আর কতকগুলি—অদৃষ্ট দৃষ্টবৎ। আমরা প্রাকৃত জগতের positive side-টা দেখিতেছি, negative side চিন্তা করিলে সেইটিও ঐ জাতীয় কালক্ষোভ্য বলিয়া বুঝা যায়। 'বিপশ্চিৎ' অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তি ঐ উভয়কেই 'নশ্বর' বলিয়া জানেন। ভগবান্ Absolute—নিত্য। তাঁহারা সেবাবুদ্ধির পরিবর্তে অনিত্য বস্তুকে preference দেওয়াই যাবতীয় অসুবিধার মূলীভূত কারণ।

"বিদ্যাবধূজীবনং"—আমরা জগতে যে সকল বিদ্যা সংগ্রহ করিয়া তাহার পতিত্ব করিতে যাইতেছি তাঁহাতে কেবল অসুবিধা। বিদ্যাকে বধূ জ্ঞানে নিজেকে তাহার পতি করিতে হইবে, এইরূপ বিচার নহে। কৃষ্ণসংকীর্তনই বিদ্যারূপা বধূর জীবন। 'বিদ্যা ভাগবতাবধি'—ভাগবতসম্বন্ধিনী বিদ্যা প্রয়োজন, কৃষ্ণসংকীর্তনই বিদ্যারূপা বধূর জীবন। কৃষ্ণসংকীর্তনেই তাহা সম্ভব হয়। "সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়।।"

"আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং"—'আ'—সম্যক্, 'নন্দ' অর্থাৎ সুখলাভ। কৃষ্ণসংকীর্তন দ্বারা আনন্দের অম্বুধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

"প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং"—প্রতিপদে পূর্ণ অমৃত আস্বাদন হয়। সুধাজাতীয় জিনিষ বড়ই প্রয়োজনীয়—covetable, কৃষ্ণসংকীর্তনদ্বারা উহা লাভ হয়।

"সর্ব্বাত্মস্নপনম্"—আমি এই প্রাকৃত অস্মিতা লইয়া যে misconception করিতেছি, স্বরূপজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া যে question of all-existance, all-knowledge and incessant bliss neglected হইতেছে, তাহার কারণ আমার যে অসুবিধা হইতেছে তাহা সংকীর্তন দ্বারাই দূরীভূত হইবে—আত্মা সর্ব্বতোভাবে স্নিগ্ধতা লাভ করিবে।

সাধুসঙ্গ হইতে তফাৎ থাকিলে আমার একটা দল, উহার একটা দল—এইরূপ দলাদলি বাড়িয়া যায়, বাস্তব সত্য লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। "যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ

সংসরন্তি'' বিচারটী বিশেষভাবে আলোচ্য হওয়া আবশ্যক। ভগবদ্ভক্তেরা সংসারে থাকিলেও তাঁহাদের ইন্দ্রিয়চালনা সাধারণ লোকের মত নহে। 'শ্রেয়ঃ'-পথের পথিক হওয়াই দরকার।

অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা—শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণনাম নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত। নাম-নামী অভিন্ন। অনেক সময় কৃষ্ণনামের সহিত শব্দ-সামান্যের তুলনা-মূলে আমরা ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি। এই ভ্রমবশতঃই আমাদের নাম ও নামাপরাধে অভেদ বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। নাম—কিছু নামাপরাধ নহে। নামাপরাধও নাম নহে। নাম—নির্ম্মল, ভাস্কর; নামাপরাধ গাঢ়—অন্ধকার-সদৃশ। নাম—পূর্ণ ও অখণ্ড বস্তু। আমরা ইন্দ্রিয়চালন-ব্যাপারে অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া থাকি, কিন্তু কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম স্বতন্ত্র বস্তু। কৃষ্ণনাম-উচ্চারণে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা স্বয়ং প্রকাশিত হয়। জড় জগতের শব্দ-উচ্চারণে তৎসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞানলাভের জন্য আবার ইন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের সাহায্য আবশ্যক করে, কিন্তু কৃষ্ণ-নাম-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য স্বয়ং স্ফূর্তিলাভ করে। কৃষ্ণনামের সহিত দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ইতর প্রাণীর জড়ীয় নামের তুলনা করিতে হইবে না। কৃষ্ণনাম কোন আভিধানিক শব্দ নহেন বা ধাতু নিষ্পন্ন সংজ্ঞা নহেন। কৃষ্ণনাম কোনও মায়িক বস্তুদ্বারা আবৃত হইবার বস্তু নহেন। কৃষ্ণনাম—স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময়। জড়ব্রহ্মাণ্ডের শব্দ ও শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত মায়িক ভেদ থাকে। কিন্তু বৈকুণ্ঠধামে শব্দ ও শব্দীতে, নাম-নামীতে, স্বরূপ ও বিগ্রহের মধ্যে কোনও মায়িক ব্যবধান নাই।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে চিত্ত-দর্পণ মার্জিত হয়, ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হয়, হৃদয়ে চিরশান্তি-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যত বাধাবিঘ্ন থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণনাম অশেষ-বাধা-বিঘ্ন-হর। যতই হৃদয়ে কুসংস্কাররূপ আবর্জনা থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণে হৃদয় বিশাল হয়। সমস্ত ভুল প্রতীতি বিদূরিত হয়। অবশ্য নাম উচ্চারণ-কালে প্রথম অবস্থায় হৃদয়ে জন্মজন্মান্তরের আবিলতা ও অনর্থরাশি অবস্থানের দরুণ শুদ্ধ নাম উচ্চারিত হয় না বটে, কিন্তু অবিশ্রান্ত নাম উচ্চারণের প্রভাবে সেই সমস্ত অনর্থ ক্রমশঃ দূরীভূত হয়।

বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া আমাদের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ-সংক্রান্ত অনেক জাগতিক বিষয় মানসপটে অঙ্কিত আছে। সেই অঙ্কিত চিত্রগুলি ত্রিগুণ-তাড়িত চিত্তকে কলুষিত করিয়া বিপথগামী করায়। নাম-উচ্চারণ প্রভাবে নামের কৃপায় জড় বিষয়ের প্রভাব খর্বিত হইয়া চিৎ-প্রভাব বিস্তার করে। সাধু-গুরু-মুখে নাম উচ্চারণের প্রাক্কালে দশবিধ অপরাধের বিষয় শ্রবণ করা কর্তব্য। দশ অপরাধ বর্জিত নাম উচ্চারণ না করিলে আমরা চিন্ময়ধামে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারি না। যদি আমরা শুদ্ধ নামোচ্চারণকারী সাধু গুরুবর্গের প্রতি মর্ত্যবুদ্ধিবশতঃ অসূয়া প্রকাশ করি, কিম্বা

তাঁহাদিগকে আমাদেরই মত ভ্রান্ত জীব মনে করি, অথবা যাহারা ঐরূপ সাধু নিন্দা করে তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেই তবে আমাদের সাধুনিন্দারূপ প্রথম নামাপরাধ হইবে। যদি কৃষ্ণকে অন্যান্য আধিকারিক দেবতাবৃন্দের সহিত সমান জ্ঞান করি এবং কৃষ্ণনামের সর্বোত্তমতা স্বীকার না করিয়া অন্য দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁহাদের নামের সহিত কৃষ্ণ নামের সামঞ্জস্য করি, তবে আমাদের দ্বিতীয় নামাপরাধ হইবে। কৃষ্ণ-নাম —সর্ব-শক্তিমান, সর্বজ্ঞাপক, নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, নাম-নামী অভিন্ন। কৃষ্ণনামের সহিত অপর কোনও নামের তুলনা হইতে পারে না। কৃষ্ণনাম ব্যতীত অপর নামের নিত্যত্ব, শুদ্ধত্ব, পূর্ণত্ব ও মুক্তত্ব নাই। সেই সকল নাম আপেক্ষিকধর্ম্মযুক্ত, কিন্তু কৃষ্ণনাম স্বতন্ত্র ও স্বরাট্। নামশ্রবণে অন্তঃকরণের শুদ্ধিলাভ ঘটে। শুদ্ধ অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের রূপ স্ফূর্তিলাভ করে। রূপের সম্যক্ স্ফূর্তি হইলে গুণের স্ফূর্তিলাভ হয়। গুণের সম্যক্ স্ফূর্তি হইলে পরিকরবৈশিষ্ট্যের এবং তৎপর লীলার সম্যক্ স্ফূর্তি হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে দ্বিতীয় নামাপরাধ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আমাদের কৃষ্ণনামের সহিত অপরাপর নামের সামঞ্জস্যরূপ অপরাধ করা উচিত নহে। কৃষ্ণনামেই সর্বশক্তি আছে, সর্ব সুবিধা আছে, আনন্দ আছে। অপর নামে সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা, অসম্পূর্ণতা থাকার দরুণ আংশিক খণ্ডজ্ঞান ও আংশিক আনন্দ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণনাম—অখণ্ড, পূর্ণানন্দ, পূর্ণজ্ঞানময়। দধি-দুগ্ধের সমজ্ঞান আমাদের নির্বুদ্ধিতার জ্ঞাপক। দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু দধি কিন্তু দুগ্ধ নহে, কিংবা দুগ্ধ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থও নহে। তদ্রূপ কৃষ্ণনাম ত্রিগুণ তাড়িত হৃদয়ে উদিত না হওয়ার দরুণ বিভিন্ন সংজ্ঞায় বিভিন্ন বস্তু পরিদৃষ্ট হয়। নির্গুণ হৃদয়ে কৃষ্ণনাম উদিত হন। সগুণ হৃদয়ে সগুণ দেবতা উদিত হইয়া থাকেন, কৃষ্ণনামের উদয় হয় না। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র উপাস্য বস্তু, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমের ঠাকুরের উপাসনা হয়। ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে প্রেমময় কৃষ্ণের সেবা হয় না।

গুর্ববজ্ঞাই তৃতীয় নামাপরাধ। গুর্ববজ্ঞা সর্বতোভাবে পরিবর্জনীয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত মানব জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুতশ্রীর প্রভাবে অহংকারবিমূঢ়াত্মা, সুতরাং ভগবৎপাদপদ্মসেবালাভে অসমর্থ। শ্রীগুরুদেব স্বয়ংরূপ ভগবানের স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ। তিনি আশ্রয়জাতীয় সেবক-ভগবান্, অথচ বিষয়জাতীয় সেব্য ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র নহেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম লীলাপুরুষোত্তম শ্রীনন্দনন্দন হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ববিশিষ্ট। সূর্যালোকের সাহায্যে যেরূপ সূর্য্যদর্শন সম্ভব—কৃত্রিম আলোকে সূর্য্যদর্শন সম্ভবপর নহে, তদ্রূপ গুরুকৃপাবলে বিষয়ানল সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হইলে কৃষ্ণসাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। আধ্যক্ষিক জ্ঞান অতি বড় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইলেও মেপে নেওয়ার ধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া বৈকুণ্ঠ প্রতীতির ত্রিসীমানায় পৌঁছিতে অসমর্থ। অতএব তুরীয় অধোক্ষজজ্ঞান গুরু-কৃপা-ব্যতীত লভ্য নহে। আমরা অধোক্ষজ বস্তুর জ্ঞান-লাভে যতই

চেষ্টা করি না কেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকণা ব্যতীত সমস্ত চেষ্টা স্থূল তুষাবঘাতের ন্যায় পণ্ডশ্রম-মাত্র। শাস্ত্রজ্ঞানে অধিকার-লাভ গুরুকৃপালোকসাপেক্ষ। অক্ষজ জ্ঞানে শাস্ত্রজ্ঞানলাভের চেষ্টা—ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল। জড় নয়নের সাহায্যে আকাশার্ধ দৃষ্ট হয়, অপরার্ধ অস্বচ্ছ পৃথ্বী দ্বারা আবৃত। জড় চক্ষে ৩৬০ ডিগ্রীর চতুর্থাংশ ৯০ ডিগ্রী পর্যন্ত কোনজ-দর্শন সম্ভব; অপর তিনের-চার অংশ গোচরীভূত হয় না; তদ্রূপ মানব-জ্ঞানে তর্কপন্থা একের-চারি অংশ বলিয়া অধোক্ষজজ্ঞানের পরিপন্থী। অধোক্ষজ জ্ঞান বাস্তব সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং পরিপূর্ণ। মানবজ্ঞান সসীম, খণ্ড ও অসম্পূর্ণ বলিয়া অধোক্ষজ-জ্ঞান জড়েন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। কিন্তু যখন মানব খণ্ডজ্ঞানের অকর্মণ্যতা উপলব্ধি করিয়া গুরুকৃপা-লাভের জন্য সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা গুরুমুখপদ্মবাণী অহরহ পান করেন, তখনই শ্রীনামপ্রভু শব্দব্রহ্মরূপে শুশ্রূষুর কর্ণরন্ধ্র-পথে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হৃদয়ের সর্ববিধ অনর্থ দূর করিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন।

শাস্ত্রের শাব্দিক অর্চামূর্তির উপর আমাদের নির্ভর করা উচিত। তাহা আমাদের অক্ষজ জ্ঞানগম্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। শাস্ত্রবাক্যে বা গুরুবাক্যে আমাদের অনাস্থা প্রদর্শন করা উচিত নহে। ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। শাস্ত্রবাক্যে অনাদরই চতুর্থ নামাপরাধ।

বৈকুণ্ঠ নামসকল—অঘহর। শ্রীহরিনামে প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, সর্ব্বপাপবীজ অবিদ্যা (স্বরূপভ্রম) দূরীভূত হয়। নাম অশেষ পাপহর বলিয়া যদি আমরা নামবলে পাপাচরণ করি, তাহা হইলে আমাদের পঞ্চম নামাপরাধ হইবে। এই অপরাধ মার্জনীয় নহে। অন্য শুভকর্ম যথা—যাগ, যজ্ঞ, দান, ব্রত, তপস্যা, অষ্টাঙ্গ-যোগ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সহিত নামের তুলনা ষষ্ঠ নামাপরাধ। হরিনামকীর্তন কালে অনবধান—সপ্তম নামাপরাধ। অশ্রদ্ধধানে হরিনামোপদেশ—অষ্টম নামাপরাধ। হরিনামে অর্থবাদ—নবম নামাপরাধ। অহংমম বুদ্ধিবশতঃ নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামগ্রহণে অপ্রীতি—দশম নামাপরাধ। যাঁহারা হরিনাম আশ্রয় করিয়া ভজন প্রয়াসী, তাঁহারা দশবিধ নামাপরাধ সর্বতোভাবে বর্জন করিবেন।

নামভজনকারী অষ্টপ্রকার বিধি পালন করিবেন (১) শ্রীগুরুবাক্যে এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসী—শ্রদ্ধা। (২) নামপরায়ণ সাধু সঙ্গ। (৩) সাধুমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণ ও কীর্তনই ভজনক্রিয়া। (৪) তৎকালে সর্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তি; সাধনরাজ্যে সাধকের এই চতুর্বিধ প্রাথমিক ভজন প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। তৎপরে (৫) নাম-ভজনকারীর শ্রীনামে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক। 'নিষ্ঠা'-অর্থে নৈরন্তর্য (৬) সারসিকী রুচির সহিত নামগ্রহণ। (৭) নামে আসক্তি, (৮) ভাবভক্তি অর্থাৎ প্রেমের প্রাগ্‌ভাব; ইহাকে স্থায়ী রতি বলে। যাঁহার নামে স্থায়ীরতি বা প্রীত্যঙ্কুর জন্মিয়াছে, তাঁহার এই নয়টি লক্ষণ, যথা (১) ক্ষান্তি, (২) অব্যর্থকলাত্ব (৩) বিরক্তি, (৪) মানশূন্যতা,

(৫) আশাবন্ধ, (৬) সমুৎকণ্ঠা (৭) নামগানে সদা রুচি; (৮) তদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি, (৯) তদ্‌বসতিস্থলে প্রীতি।

ভাবভক্তিতে বা স্থায়ী রতিতে চারটি সামগ্রী-সংযোগে রসের উৎপত্তি। এই রস হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে মনোধর্ম হইতে মুক্তিলাভ হয়। তখন হৃদয়ের এমন একটি অবস্থা হয় যে সর্বক্ষণই কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা করিবার ইচ্ছা জন্মে। মন তখন ত্রিগুণতাড়িত না হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার অভিলাষ করে। প্রাকৃত জগতে যে পঞ্চবিধ রস আছে তাহা জড়রস। চিন্ময়রসের সহিত উহার সামঞ্জস্য করিতে হইবে না। যেহেতু চিন্ময় রস অত্যন্ত উপাদেয়, নিত্য নব-নবায়মান্ এবং জড়রস অত্যন্ত হেয় ও পূতিগন্ধময়।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই প্রেম। আর আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছাই কাম। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনে পূর্ণমাত্রায় নববিধা ভক্তি হয়। ভাবভক্তির ঘনীভূত অবস্থাই প্রেমভক্তি; ইহাই জীবের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু।

পঞ্চবিধ রসের যে কোন একটি রসে স্বরূপস্থ হইয়া আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তম ভক্তির লক্ষণ। তবে বিচার্য এই যে, কৃষ্ণসেবা করিয়া কৃষ্ণের নিকট হইতে আমাদের কোনবস্তু আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নহে। হে কৃষ্ণ! আমি ধন চাহি না, আমি জন চাহি না, সুন্দরী ভার্যা চাহি না। পাণ্ডিত্য চাহি না, এমন কি, মুক্তি পর্যন্ত চাহি না, যে কোন জন্ম হউক না কেন, তোমার চরণে অহৈতুকী ভক্তি চাই। কৃষ্ণের নিকট কোন বস্তু চাওয়া, কৃষ্ণের ভোগের জিনিষকে ভোগবুদ্ধি করা—ইহা 'মস্তবড় অপরাধ; সুতরাং শুদ্ধভক্ত অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণের আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত রাখিবেন। ইহাই নিষ্কপট আদর্শ সেবা। শুদ্ধসত্ত্বে এই সেবা উদিত হইলে জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়।

"অশ্বিনীবাবুর ভক্তিযোগে হরের্নাম হরের্নামৈব" শ্লোক উদ্ধৃত হইলেও শ্রীনাম-ভজনের সহিত অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি অভক্তিযোগকে সমান স্তরে স্থাপিত করা হইয়াছে। নিরপরাধে শ্রীনামভজনে—ভক্তিযোগ; আর অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞানাদি—অভক্তিযোগ। অভক্তিযোগের সহিত মিশ্রিত করিয়া বা উহার সহিত চিজ্জড় সমন্বয় করিয়া যে 'হরের্নামৈব কেবলম্' শ্লোকের উল্লেখ, তাহা শ্রীনামের চরণে সর্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ বা অভক্তিযোগের চরম। ইহা দশনামাপরাধ প্রসঙ্গে শাস্ত্র ও শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন। অশ্বিনীবাবুর ভক্তিযোগে 'ঢকি' ভজিতে ভজিতেও 'প্রেম মধু' পাওয়া যায়—অন্যাভিলাষী শান্তিরাম গাঁজার ভজন করিতে করিতেও গোলোকের কৃপা লাভ করিতে পারে, কাহারও গৃহে বিসূচিকা রোগ উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি কর্তব্যের অনুরোধে বা কর্তব্যকে ভক্তিযাজন অপেক্ষা বড় মনে করিয়া হরিনাম সঙ্কীর্তন পরিত্যাগ করিয়াও আত্মীয়ের বিসূচিকা রোগের শুশ্রূষা

অধিকতর সমীচীন বিচার করেন, কর্ম্মজ্ঞানাদি যাজন করিতে করিতে অশ্বিনীবাবুর বিচারে ভক্তিযোগ লাভ হয়,—এইরূপ কোনও কিছুর অবতারণা আছে। বস্তুতঃ সেরূপ ভক্তিযোগের ছলনা নির্বিশেষবাদোত্থ অভক্তিযোগের আদর্শমাত্র। ইহা আধ্যক্ষিক ও জগতের অন্যাভিলাষী গণমতের রুচিতে খাপ খাইয়াছে বটে; কিন্তু ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিযোগ নহে—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত ভক্তিযোগ নহে—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ভক্তিযোগ নহে। জগতের লোকের হরিভক্তের সম্বন্ধে ধারণা এই যে, সাধু বা হরিভক্তগণ কেবল নানা কৃচ্ছ্রতার কসরৎ দেখা'বে আর আমরা খাব-দাব, থাক্‌ব। হরিভক্তগণ জঙ্গলে চ'লে যাবে সব বিষয়ের ভার আমাদিগের উপরে রেখে; যেন আমরা বিনা বাধায় যথেচ্ছ ভোগ করতে পারি। আমরা তমোগুণ ও রজোগুণকে প্রবল ক'রে সত্ত্বগুণকে ধ্বংস করব, এরই নাম নাকি যুগধর্ম।

তথাকথিত পরার্থী বলবেন—"হরিভক্তগণ বেগুন গাছে জল না দিয়ে তুলসী গাছে কেন জল দিচ্ছেন? তা'তে সময় শক্তি ও জলের অপব্যবহার হ'চ্ছে। বহির্ম্মুখ জীবের সেবা অর্থাৎ তাহাদের ভোগ্য সামগ্রী যুগিয়ে না দিয়ে কেন ভগবানের সেবা ক'রতে যাচ্ছেন? তথাকথিত সমন্বয় বাদী বলবেন—"বেগুন গাছে জল দেওয়াও যা', তুলসী গাছে জল দেওয়াও তা', প্রণালী মাত্র ভেদ, উভয়েরই ফল এক; জীবের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিও যা', পরমেশ্বরের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বা সেবাও তা' জীবকে পরমেশ্বর কল্পনা ক'রে নিলেই হ'ল।।" জীবন মরণে কৃষ্ণের কথা কীর্তন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন গতি বা কৃত্য নাই। যিনি কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন করেন, তাঁহার সকল আত্মা সেবা-রসে স্নাত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণকথা কীর্তন ব্যতীত অন্য কৃত্যের দ্বারা চিত্তদর্পণ নানা আবরণযুক্ত থাকে, তাই আমরা নিজ স্বরূপ দর্শন করিতে পারি না। আকর্ষকের কথা কীর্তন করিলে তাঁহার অনুগ্রহ রসে আমরা অতি সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি।

"কৃষ্ণ বর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।" (ভাঃ ১১।৫।৩২)

সুমেধাগণ কৃষ্ণকথা কীর্তনকারী আর কুমেধাগণ অন্যাভিলাষ—জ্ঞান-কর্ম-যজনকারী। বার্ষভানবী সর্বদাই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন। তিনি কৃষ্ণত্বিট্ নহেন, আবার কৃষ্ণ ব্যতীত ও অন্য কিছু নহেন। চণ্ডীদাসের পদে শ্রীরাধার উক্তি শুনিতে পাই,—

"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মন প্রাণ।।"

সুমেধাগণের সর্বশ্রেষ্ঠা বার্ষভানবী, সুমেধাগণের মূল পুরুষ গৌরসুন্দর।

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ-সর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।"

আমরা কৃষ্ণ কি জিনিষ, তাহা জানি না, তাই কৃষ্ণ নিজ সর্বশক্তি কৃষ্ণ-নামে অর্পণ করিয়া শ্রীনামরূপে জগতে অবতীর্ণ। গৌণ নামে শব্দ ও শব্দীর মধ্যে কিছু ভেদ আছে; কিন্তু মুখ্য নামে শব্দ ও শব্দী অভেদ। নাম-গ্রহণে যোগ্যতার বিচার নাই, কিন্তু ঠাকুরপূজায় যোগ্যতার বিচার আছে। যেমন দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, স্নান করিতে হইবে, ইত্যাদি। দেশগত বিচার, কালগত বিচার ও পাত্রগত বিচার হরিকীর্তন-সম্বন্ধে নাই।

কীর্তন উচ্চ স্বরেই বিধেয়। হরিকথা উচ্চ স্বরে কীর্তন না করিয়া বাচালতায় পঞ্চমুখ হইলে কালসর্পের কবলে কবলিত হইতে হয়। হরিকীর্তনে যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ার নিদর্শন আছে, তাহা যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—

'মালাজপে শালা, কর জপে ভাই।
যো আপ্না মন্ মন্ জপে, উসকো বলিহারী যাই।।'

হরিকথা উচ্চারণ করিও না, মনে মনে জপ কর, এই উপদেশপ্রদান করায় লোকে কেবল বাজে কথা বলিবে, কারণ বাজে কথা বলিবার জন্যই লোকে সর্বদা উদগ্রীব হইয়াছে। মহাপ্রভু ইহা নিষেধ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর উক্তি 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'; 'নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষণং তু কীর্ত্তনম্'। যিনি উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করেন তিনি দানবীর, তিনি পরহিংসা করেন না। যিনি মৌনী হইয়া থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণকীর্তন করেন না, তাঁহার অব্যক্ত বাগ্‌বেগ নিজের ও পরের অমঙ্গল সাধন করে। তিনি মনে মনে বিষয়চিন্তা করেন; তিনি আত্মহিংসক ও পরহিংসক। তাই মহাপ্রভুর উপদেশ—সর্বদা কীর্তন কর। যাঁহারা সেই কীর্তন শ্রবণ করিবেন তাঁহারা যদি তোমার বন্ধু হয় তাহা হইলে তোমার ভুল কীর্তন সংশোধন করাইয়া দিবেন। আবার অকপট ভাবে কীর্তন করিতে করিতে চৈত্ত্যগুরুও তোমার কীর্তনে ভুল থাকিলে তাহা সংশোধিত করিবেন। কপটতা ও প্রতিষ্ঠা কামনা হৃদয়ে থাকিলে লোকে তথাকথিত মৌনধর্ম অবলম্বন করে। 'বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ'। কপটতা দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা মৌন-ধর্ম অবলম্বন করে তাহারা অকস্মাৎ কোন পাপ করিয়া বসে। মৌনী ও ধ্যানী হইয়া নিজের স্বার্থ-পোষণের জন্য তাহারা অপরের দ্রোহ আচরণ করে। কৃষ্ণকথা-কীর্তন না হইলে জগতে কুণ্ঠধর্মই অধিকতর প্রবল হইবে। দেশ-কাল-পাত্রকে কৃষ্ণের অনুগ্রহ প্রসাদ প্রদান না করিয়া উহাদের প্রতি যদি নির্দয়তা করা হয় তবে তদ্দ্বারা আত্মঘাতী হইতে হয়। দুই প্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণকীর্তন করেন না, (১) যাঁহারা মহামূর্খ—অর্থাৎ মায়াবাদী, অপরাধী, তথাকথিত ধ্যানী, তথা কথিত মৌনী প্রভৃতি, আর (২) যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে, কৃষ্ণকীর্তন করেন না, অথচ মনে করিয়া থাকেন,—আমরা কৃষ্ণকীর্তন করি।'

হরিকীর্তনব্যতীত আর বাদ বাকী সবই 'কিচির-মিচির' শার্গালা উক্তি মাত্র। কৃষ্ণ-উক্তি ব্যতীত অন্য-উক্তি শ্রবণ-রন্ধ্রে প্রবেশ করান' উচিত নহে। এজন্য শ্রবণ করিতে হইবে—'গৌরবিহিত শ্রবণ'; তাহা হইলেই 'গৌর-বিহিত কীর্তন' হইবে। মৌনী হইলে

শ্রবণও—স্মরণের দ্বারও রুদ্ধ হইয়া যায়। যাহারা হরিস্মরণকে হেলা করিয়া থাকে, তাহারাই নির্জনতা-প্রয়াসী ও মৌনী হইয়া শ্রবণ-কীর্তনের পথ রুদ্ধ করে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি।।" (ভাঃ ২।৮।৪)

'বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্তনম্'—বহু লোক মিলিয়া যে কীর্তন, তাহাই সঙ্কীর্তন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বর্তমানে কি করিতেছেন? বহু প্রচারক রকম রকম ভাবে হরিকথা কীর্তন করিতেছেন, কেহ সুর-তালের সহিত, কেহ নৃত্য করিয়া, কেহ ছায়াচিত্রে বক্তৃতা দিয়া, কেহ গ্রন্থাদি রচনা করিয়া হরিকীর্তন করিতেছেন। সুর-তাল-লয়-মান-যোগে লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে উচ্চ-চীৎকারই যে সঙ্কীর্তন, তাহা নহে। বস্তুতঃ তাহা কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন নহে। 'কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন' বলিতে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নামের কীর্তন, অপ্রাকৃত রূপের কীর্তন, অপ্রাকৃত গুণের কীর্তন, অপ্রাকৃত পরিকর-বৈশিষ্ট্যের ও অপ্রাকৃত লীলার কীর্তন বুঝায়। আবার সুর-তাল-মান-লয় ত্যাগ করিলেই যে কৃষ্ণকীর্তন হইবে, তাহাও নয়। সুর-তাল-মান সমস্তই কৃষ্ণকীর্তনেই লাগিবে। ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী কৃষ্ণকীর্তনের সেবক। কায়মনোবাক্যে হরিকীর্তন বিধেয়। কায়িক কীর্তন, বাচনিক কীর্তন মানসিক কীর্তন যুগপৎ করিতে হইবে। মন যদি কৃষ্ণকীর্তন না করে, অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন হয় না। নারদ কি করেন? সর্বেন্দ্রিয়ে সর্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্তন করেন। পঞ্চমুখে শিব কি করেন? কৃষ্ণকীর্তন করেন। চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা কি করেন? কৃষ্ণকীর্তন করেন। ব্যাস, শুক, চতুঃসন, শেষ—ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণকীর্তন করেন। আমাদের গুরুবর্গ সকলেই কৃষ্ণ কীর্তনকারী; তাঁহারা কেহই তথাকথিত মৌনী নহেন। ভাগবত-ধর্ম তথাকথিত মৌনী থাকার ধর্ম নহে,—তাহা কীর্তনের ধর্ম—সঙ্কীর্তনের ধর্ম। শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাঁহারা গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, প্রবন্ধ লিখিতেছেন, সাময়িক পত্র প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা কৃষ্ণসঙ্কীর্তনই করিতেছেন। প্রদর্শনী দেখাইয়া কৃষ্ণ কীর্তন করিতেছেন। নিজের আদর্শ আচরণের মধ্যে কৃষ্ণ কীর্তন করিতেছেন। হরিকীর্তন যাহাতে বাতাসে মিশিয়া না যায় তজ্জন্য তাহা গ্রন্থে সংবদ্ধ হইতেছে, পরবর্তী যুগের লোকেরাও এই কৃষ্ণ কীর্তন শুনিতে পাইবে। কিন্তু যে কেবল নির্জনে ধ্যান করে, মৌনী হইয়া থাকে, সে নিজের উপকারও খুব কম করিতে পারে এবং অপরের উপকার বর্তমানেই করিতে পারে না, পরবর্তী কালে ত' দূরের কথা।

কীর্তন জিনিষটি শ্রবণের উপর নির্ভর করে। কেবল সুর-তাল-মান-লয়ের কসরৎ, যাহা লোকের ইন্দ্রিয়মাত্র তৃপ্ত করে—তাহা 'কীর্তন' নহে। 'কীর্তন' ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রত্যেক তন্ত্রীতে আপনাকে ঐকতানে ঝঙ্কৃত করিবে। যিনি সব ভেজাল জিনিষগুলিকে

চুরি করিয়া মানুষের মঙ্গল করেন, তিনিই হরি। সেই হরিকীর্তনেরই জগতে দুর্ভিক্ষ। পরা বিদ্যার মূল মালিক অপরা বিদ্যার হরণকারী। হরির কথা যত শুনা যাইবে, ততই সুবিধা হইবে। হরি কখনও অনিত্য বস্তুকে আত্মসাৎ করেন না। তিনি ভেজাল জিনিষকে সরাইয়া দিয়া নির্মল চিদানন্দ-সত্তাকে আত্মসাৎ করেন।

একটা কাঠিকে যে কেহ সহজে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। দুইটি কাঠি একত্রিত হইলে তাহাতে আরও একটু শক্তি হয়। অনেকগুলি কাঠি একসঙ্গে থাকিলে তাহার শক্তি অনেক বাড়িয়া যায়। যিনি একাকী নির্জন ভজন করেন, তিনি সহজেই নানা বাধাবিঘ্নদ্বারা আক্রান্ত হইতে পারেন। তাঁহার দুর্বলতা-প্রকাশে অধিক যোগ্যতা আছে। কিন্তু যখন বহুলোক মিলিয়া ভজন অর্থাৎ হরিকীর্তন হয়, তাহার যে একটা congregational effect হয়, তাহার শক্তি অনেক বেশী। "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্তনম্।" এজন্য সাধারণ দুর্বল জীবের পক্ষে নির্জন ভজন অপেক্ষা শুদ্ধ সঙ্কীর্তনাচার্যের আনুগত্যে সঙ্কীর্তন-যজ্ঞে যোগদানে অধিক সেবা-শক্তি লাভ হইতে পারে। ইহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথা। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম-সঙ্কীর্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণ নাম-ধনে।।

যেরূপ শাস্ত্রে করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, সুবর্ণা ও পদ্মরাগা— এই সপ্তজিহ্বাযুক্ত অগ্নির কথা রহিয়াছে, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দর চেতোদর্পণমার্জানাদি সপ্তজিহ্বাশালী সংকীর্তনাগ্নির কথা কীর্তন করিয়াছেন। সঙ্কীর্তনাগ্নি প্রজ্জ্বলিত না হইলে কখনও ভবের মূলোৎপাটন এবং অপুনর্ভবের চরমফল প্রেমা উদিত হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর এই সংকীর্তনাগ্নির সপ্তজিহ্বাকে সাতটি উপমা দ্বারা উপমিত করিয়াছেন। চিত্তকে দর্পণের সহিত, ভবকে মহাদাবাগ্নির সহিত, শ্রেয়ঃকে কুমুদের সহিত জ্যোৎস্না বা শুভ্রত্বের সহিত, বিদ্যাকে বধূর সহিত, আনন্দকে সাগরের সহিত, প্রেমকে অমৃতের সহিত, কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তিকে অবগাহন-স্নানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'প্রতিপদং' ক্রিয়াবিশেষণটি এই সাতটি বিশেষণের প্রত্যেকটির পূর্বেই ব্যবহৃত হইবে। এই কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনাগ্নি জগতের যাবতীয় অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত ও তপঃ সমুদয়কে ভস্মসাৎ ও আত্মসাৎ করিয়া সর্বোপরি বিজয় লাভ করিবে এবং বিশ্বের যেখানে যত সুমেধা হইয়াছেন ও হইবেন, সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্তনের সর্বোপরি বিজয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কুমেধাগণই অন্য সাধন ও সাধ্যের স্বীকার করেন; কিন্তু সুমেধাগণ সঙ্কীর্তনযজ্ঞে অকৃষ্ণবরণ পুরটসুন্দরদ্যুতি রুক্মবর্ণ মহাপুরুষের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণম্', 'ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহম্', 'ত্যক্ত্বা

সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিত-রাজ্য-লক্ষ্মীম্' প্রভৃতি শ্লোকে প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা করিয়াছেন। সুমেধোগণের সপ্তজিহ্বযুক্ত সঙ্কীর্তন-যজ্ঞাগ্নি শ্রীচৈতন্যমঠে নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকুক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসঙ্কীর্তন হইলেই সত্যযুগের মহাধ্যান, ত্রেতার মহাযজ্ঞ, দ্বাপরের মহার্চ্চন যুগপৎ সাধিত হইবে। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম পূর্ণভাবে থাকিলেও ধ্যানমাত্র হইত, ত্রেতায় ত্রিপাদধর্ম্মে যজ্ঞমাত্র হইত, দ্বাপরে দ্বিপাদধর্ম্মে অর্চনমাত্র হইত; কিন্তু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবে সঙ্কীর্তন আবিষ্কৃত হইলে যুগপৎ মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চন সাধিত হইবার সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। সঙ্কীর্তনব্যতীত শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনুর সেবা হয় না, অর্চনের দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয় না; মহার্চন সঙ্কীর্তন আবশ্যক। যোগিগণের সাধন—ধ্যানে গোপিকাগণ তৃপ্ত হইতে পারেন না। দূরের জিনিষ—অপ্রাপ্ত জিনিষ—আবৃত জিনিষ ধ্যানের যোগ্য। আপনার হইতে আপনার জিনিষ সহজ সর্বস্ব জিনিষ, নিত্য-আলিঙ্গিত বস্তু দূরের বস্তুর ন্যায় ধ্যানের যোগ্য নহে,—

"চিত্ত কাঢ়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নারি কাঢ়িবারে।
তা'রে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে।।
নহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার,
ধ্যান করি' পাইবে সন্তোষ।"

আমাদের পূর্বাচার্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন,—

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারের্বিরমিত-নিজ-ধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদি-যত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।।"

যে কৃষ্ণনামের সেবায় বর্ণাশ্রমাদি নিজ ধর্মযাজন, ধ্যান, পূজাদি-চেষ্টা সহজেই বিরত হইয়া যায়, এইরূপ অপ্রাকৃত আনন্দকন্দস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে কোনও রূপে গৃহীত হইলেই অর্থাৎ নামাভাসমাত্রেই প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ নামই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহাই জীবের জীবন—চেতনের পরমভূষণ।

আমাদের পূর্বাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর মুখেও আমরা শুনিতে পাই,—

"যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ।।"

অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মধ্যানের দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ-কর্ম ভোগ-ব্যতীত বিনষ্ট হয় না, কিন্তু কৃষ্ণনামের আভাস মাত্রেই সেই সকল

প্রারব্ধ কর্ম অনায়াসে নির্মূল হইয়া যায়। ইহাই বেদ পুনঃ পুনঃ তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন।

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নামই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ নামের এমনই স্বভাব যে, উহা একবার কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে তিনি জীবের জিহ্বাকে দ্বার করিয়া স্বয়ং আপনাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাইবেন। শ্রীকৃষ্ণ নামের আবৃত্তিতে আমরা শতপ্রকার ফল পাইয়া থাকি।

আমাদের চিত্ত মুকুরের ন্যায় স্বচ্ছ ও বস্তু-প্রতিফলনের যোগ্যতাবিশিষ্ট হইলেও তাহা বর্তমানে জাগতিক অসংখ্য আগন্তুক ধূলিকণার দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। আমরা আমাদের চিত্তদর্পণে অধিকৃত নিত্যবস্তুর দর্শন পাইতেছি না। আমাদের চিত্ত সর্বতোভাবে মার্জিত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই মার্জন-কার্য্যে কেহ কেহ অষ্টাঙ্গ-যোগাদির প্রণালী অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, কেহ বা প্রায়শ্চিত্তাদি কর্মপ্রণালীর ব্যবস্থা দিয়াছেন, কেহ বা নানাপ্রকার কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্রত-তপস্যাদির, কেহ বা জ্ঞান-চর্চাদির দ্বারা চিত্তের ধূলিরাশি বিদূরিত করিবার উপায়-সমূহ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা সহিষ্ণু ও নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিতে পারেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, ঐ সকল প্রণালীগুলি—সকলই কৃত্রিমতা ও অসম্পূর্ণতা-দোষ-দুষ্ট; চেতনের দর্পণকে নিরজীকৃত করিবার বা চেতন পর্যন্ত পৌঁছিবার সামর্থ্য ঐ সকল কৃত্রিম সাধন প্রণালীর কোনওটিরই নাই। প্রাণায়ামাদিদ্বারা চিত্তকে নির্মল করিবার প্রণালীতে চিত্ত বিষয়মলশূন্য হয় না; কেবল সাময়িক শুদ্ধভাব প্রকাশিত হয় মাত্র। সুতরাং ঐরূপ চিত্ত বহুক্লেশ-কৃচ্ছ্রতা প্রভৃতির দ্বারা সাময়িক শুদ্ধভাব অবলম্বন করা সত্ত্বেও পুনরায় কোন কারণে ঈষৎ বিক্ষুব্ধ হইলেও যাবতীয় রোগ আরও দ্বিগুণতর বেগে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করে। ঐ সকল উপায় কেবল বৃথা কালক্ষেপণ করিবার হেতুমাত্র। উহার দ্বারা কখনও চিত্তের মল তিরোহিত হইতে পারে না। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবত অসংখ্য স্থানে অসংখ্যভাবে কীর্তন করিয়াছেন,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি।। ভাঃ ১।৬।৩৬

যুঞ্জানানাভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্।। ভাঃ ১০।৫১।৬০

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষেপণহেতবঃ।। ভাঃ ১১।১৫।৩৩

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।। ভাঃ ১০।১৪।৩

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।। ভাঃ ১০।২।৩২

শ্রীকৃষ্ণনামের আভাসেই অনায়াসে চিত্তদর্পণের যাবতীয় মলিনতা বিনষ্ট হয়। যে-সকল আগন্তুক আবরণ আমাদিগের স্বরূপের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা নিরাকরণে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামের আভাসই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন।

কৃষ্ণনাম-কীর্তনের দ্বারা অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণের অপ্রাকৃত কামের সেবাই স্বরূপনির্ণয়ের ফল। কৃষ্ণনামসংকীর্তনে চিত্তদর্পণ পরিমার্জিত হইলে জীবের চেতনস্বরূপ বিকশিত হয়।

এই জগৎ আমাদিগের নিকটে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে আমরা সকলেই ন্যূনাধিক ঐ তিক্ত অভিজ্ঞতার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য কোনও না কোনও রূপ ব্যগ্র। জগতের ত্রিবিধ ক্লেশে হরিবিমুখ জীবমাত্রেই নিয়ত তপ্ত হইতেছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ক্লেশের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য ঈশ্বর কৃষ্ণ ও পতঞ্জলি প্রভৃতি যে সকল ব্যবস্থা দিয়াছেন, তদ্দ্বারা জীবের চেতনতা-বিনাশেরই ব্যবস্থা হইয়াছে। চেতনতা-বিনাশের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর দণ্ড, ভীষণ ক্লেশ আর কি হইতে পারে? চেতনতা বিনষ্ট হইলে জীবের জীবত্ব ধ্বংস হইল। চেতনতাই স্বাধীনতার মূল। চেতনতা বিনষ্ট হইলে স্বাধীনতাকেও যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হইল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবের ক্লেশমোচনের নামে সর্ব্বাপেক্ষা ক্রূরতাপূর্ণ ক্লেশে ও নিষ্ঠুরতম দণ্ডেদণ্ডিত করিবার কপটতা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—জীব পূর্ণচেতন শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ; জীবের নিত্যসত্তা, নিত্যচেতনতা, এবং নিত্য আনন্দের পরিপূর্ণ বিকাশ নবনবায়মানভাবে সাধিত হইতে পারে। অন্য উপায়ে জীবের চেতনতা এবং স্বাধীনতা স্তব্ধ ও বিনষ্টই হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ-নামের আভাসেই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—ত্রিতাপ অচিরে অনয়াসেই সমূলে নির্মূলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনকারীই বিশ্বকে নিত্য ও পূর্ণ সুখের আগাররূপে অনুভব ও দর্শন করিতে পারেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনের আভাসেই মহাদাবাগ্নিতুল্য এই সংসারনল নির্বাপিত হইতে পারে। অন্যান্য যাবতীয় অভক্তি-উপায়ের আশ্রয়ে ভবমহাদাবাগ্নি কোনমতেই বিনষ্ট হয় না, অপিচ কোনও না কোনও ভাবে লুপ্ত তুষাগ্নির ন্যায় অন্তরে দহ্যমান থাকিয়া পরিণামে জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করে।

শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ প্রস্ফুটিত হয়। আমরা শ্রুতিতে "শ্রেয়ঃ" ও "প্রেয়ঃ" এই দুইটি শব্দ শুনিতে পাই। যাহাতে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ নিহত এবং যাহাতে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পরিপূর্ণতা এবং আমার বহির্মুখতার আপাত অপ্রিয়তা তাহাই

শ্রেয়ঃ। যাঁহাদের "শ্রেয়ঃ" ও "প্রেয়ঃ" পৃথক্ নহে, তাঁহারাই মুক্ত। তাঁহাদের জিহ্বাতেই শ্রীকৃষ্ণের নাম নিরন্তর নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্তন ব্যতীত তাঁহাদের পৃথক্ কোন প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ বিচার নাই।

আমাদের বাস্তব সুখের দ্বারাই সমৃদ্ধ হওয়া উচিত। জগতে যে সুখের কল্পিত সন্ধান হয়, তাহাতে কেবল ক্লেশের তীব্রতাকে সাময়িকভাবে হ্রাস করিবার চেষ্টা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। কিন্তু কেবল কষ্টের সাময়িক মোচন বা কষ্টের তীব্রতা লঘুকরণ বাস্তব সুখের স্বরূপ হইতে পারে না। প্রকৃত-সুখ অবসান-রহিত, অপরিবর্তনীয় এবং নিরবচ্ছিন্ন।

শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রেয়ঃ কুমুদ-বিকাশিকা চন্দ্রিকা বিতরণ করিয়া থাকেন। তীব্র সূর্যালোকে কুমুদের কোমলতা বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ সূর্যের তীব্ররশ্মি চক্ষুর পীড়াদায়ক। কিন্তু চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না কুমুদবিকাশের অনুকূল এবং ইন্দ্রিয়ের স্নিগ্ধকারক । শ্রেয়ঃ কুমুদ ইতর তীব্রসাধন-প্রণালীদ্বারা মলিন হইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনের স্নিগ্ধ চন্দ্রিকায় শ্রেয়ঃ কুমুদ বিকশিত ও সম্বর্দ্ধিত হয় । শ্রেয়ঃ-কুমুদের সহিতশ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের স্নিগ্ধ চন্দ্রিকার যেরূপ পরম অনুকূল সম্বন্ধ, শ্রেয়ের সহিত অপর সাধন-প্রণালীর সেরূপ সম্বন্ধ নাই। এই জন্যই শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকা-শব্দের উল্লেখ। যদিও আমাদের আলোক প্রয়োজন, তথাপি তীব আলোক বা তাপ প্রয়োজন নহে। অনুকূল স্নিগ্ধালোকই প্রয়োজন। ইতর সাধন-প্রণালীগুলি আলেয়ার মত আলোক-প্রদানের ছলনাযুক্ত অথবা হরিসেবাবিমুখ-কৃচ্ছ্রতার তীব্রতাপযুক্ত। উহাতে শ্রেয়ঃ-কুমুদ কখনই বিকশিত হয় না। পরন্তু শ্রেয়ঃ লুপ্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন—বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ। আমরা জ্ঞানার্জ্জনের জন্য আকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট। অভিজ্ঞতার প্রণালী জাগতিক জ্ঞানার্জনের সেতু, কিন্তু এই অভিজ্ঞতার প্রণালী নানা দোষদুষ্ট ও অসম্পূর্ণ। অভিজ্ঞতার প্রণালীদ্বারা আমরা যে জ্ঞানার্জন করি, তাহা চিরস্থায়ী ফল প্রসব করিতে পারে না। যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়, তখন আমাদের আহৃত প্রচুর জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের আহৃত থাকে না। অভিজ্ঞতার প্রণালী কিয়ৎকাল পরেই অসম্পূর্ণতাদোষে দুষ্ট বলিয়া মনে হয়। অবিজ্ঞতার প্রণালী অবলম্বনপূর্বক অর্ধশতাব্দীর সাধনার পর আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি, সেই জ্ঞানভাণ্ডার শতাব্দীর সাধনার পর অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক বলিয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু অপরিবর্তনীয় ও সম্পূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডারই সুবুদ্ধিগণের কাম্য। যখন আমাদিগের স্বরূপ-নির্ণয় হয়, তখন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে জাগতিক অভিজ্ঞতা দ্বারা সংগৃহীত ও সঞ্চিত শত শত শতাব্দীর জ্ঞানভাণ্ডারও কত দরিদ্র, অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক। ঐ সকল অসম্পূর্ণ জ্ঞান আমাদের কোন কোন সাময়িক প্রয়োজন সাধন করিতে পারে। কিন্তু তাহারা কখনই আমাদিগের নিত্য আকাঙ্ক্ষা, নিত্য-মঙ্গল-সাধনে সমর্থ নহে। আমরা কেবল যদি বর্তমানের আপাত-প্রয়োজনীয়তাকেই বড় মনে করি এবং তাহা পরিপূরণেই বিব্রত

থাকি, তাহা হইলে আমাদিগকে নিত্য প্রয়োজনের জন্য মনোযোগী হইতে হইবে। আমরা আমাদেরর সর্বশক্তি, চেষ্টা, সমস্ত যোগ্যতা—নিত্যপ্রয়োজনের পরিপূর্তিসাধনেই নিয়োগ করিব। আমাদের চেতনের বিকাশ-সাধনা ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় চেষ্টা নশ্বর। তাহারা কিয়ৎক্ষণের জন্য আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হইলে অল্পকালের মধ্যেই আত্মগোপন করে।

শ্রুতি এইগুলিকে অপরা বিদ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন। আত্মার অপ্রতিহতা আকাঙ্ক্ষাময়ী বৃত্তিই পরাবিদ্যা। সেই পরা বিদ্যা নিখিল সদ্‌জ্ঞানের জননী। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন সেই পরা বিদ্যার জীবাতু-স্বরূপ। পূর্ণজ্ঞান একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনে লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম—পূর্ণতম সম্বিদ্‌বিগ্রহ। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান, বাসুদেবজ্ঞান, লক্ষ্মীনারায়ণজ্ঞান, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ অনিরুদ্ধের জ্ঞান, রামনৃসিংহাদি অবতারের জ্ঞান, বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের যাবতীয় জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণনামেই অনুস্যূত রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণনাম ব্যতীত ইতর শব্দ ইতর ব্যোমে বিচরণ করিয়া বহির্মুখ জীবরে নিকট আবৃতজ্ঞান প্রকাশ করিতেছে। ঐ সকল শব্দ আমাদের কর্ণ ব্যতীত চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্—এই চারিটি পরীক্ষকের পরীক্ষার পাত্রত্বে পরিণত হইয়াছে। ইতর ব্যোম হইতে যখনই কোন শব্দ আগত হয় তখনই ঐ চারিটি পরীক্ষক ঐ শব্দের সত্যতা বিরূপণে নিযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু পরব্যোমগত শব্দ ঐ সকল পরীক্ষকগণের অধীন নহেন। তাঁহার ব্যক্তিগত এমন একটি স্বতন্ত্রতা আছে, যাহা ঐ শব্দ সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণ করিয়া শব্দ শ্রবণকারীর যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করিয়া দিতে পারেন। ইতরব্যোমে শব্দ অপরের ভোগের জন্য কল্পিত। কিন্তু পরব্যোমের শব্দ স্বয়ং ভোক্তা ও সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র এবং পরিপূর্ণ শক্তিমান্। সেই বৈকুণ্ঠ শব্দোচ্চারণই কৃষ্ণসংকীর্তন, তাহা কৃষ্ণেতর সংকীর্তন নহে।

শ্রীকৃষ্ণনাম—পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ সৎ ও পূর্ণ আনন্দস্বরূপ। অতএব আমরা শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত জড়জগতের মলিনতা মিশ্রিত করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিব না। কৃষ্ণনামের প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্য আমাদিগের যাবতীয় জ্ঞানের আকর সমূহের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত যে-সকল জ্ঞান বিজ্ঞান আছে, তাহাতে আমাদের ইন্দিয়ের প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন ব্যতীত অন্যান্য সাধন প্রণালীগুলি আরোহবাদের অহমিকার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অধোক্ষজ বস্তুর সমীপে উপনীত হওয়ার প্রণালী একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্তনে প্রতিষ্ঠিত।

জড়মিশ্র শব্দ কখনই আমাদিগকে অধোক্ষজ-শব্দের নিকটে লইয়া যাইতে পারে না। যখন জড়মিশ্র শব্দের সহিত অবিমিশ্র পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-শব্দের একাকার করিবার চেষ্টা প্রদর্শিত হইবে, তখন সেইরূপ অবৈধ প্রাকৃত মতবাদকে আমরা সর্বতোভাবে

বর্জন করিব। অধোক্ষজ অবিমিশ্র শব্দ আমাদিগের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়মিত, সংযমিত, এবং পূর্ণসচ্চিদানন্দের সেবার যোগ্য করিয়া তুলিবে। আমরা তখন পরা বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইব।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন—চেতনের আনন্দাম্বুধিবর্ধনকারী। আমরা অনেক সময়ই ক্ষণিক অকিঞ্চিৎকর এবং পরিণামে দুঃখদায়ক সুখের মায়ামৃগ হইয়া পড়ি। কিন্তু আমাদের চেতনের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই নিত্য, পূর্ণ, অখণ্ড চিদানন্দ-সমুদ্রের জন্য বর্তমান রহিয়াছে। একমাত্র কৃষ্ণনামই আমাদিগকে নিত্যানন্দ-সাগরের সন্ধান-প্রদান এবং আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করাইতে পারেন।

অন্য সাধনপ্রণালী বাস্তব আনন্দ-প্রদানে অসমর্থ। ইতর সাধনের দ্বারা সাময়িক দুঃখনিবৃত্তি বা দুঃখের স্তব্ধভাবমাত্র আমাদের নিকটে উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু কেবল-স্তব্ধভাব বাস্তবতার পর্যায়ে পরিগণিত হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণনাম আমাদিগকে প্রতিপদে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন করাইয়া থাকেন। অমৃত কঠিন বস্তু নহে, তাহা তরল সুস্বাদু সঞ্জীবক ও অমরত্বসাধক। শ্রীকৃষ্ণনাম অখিলরসময়। শ্রীকৃষ্ণনামে পঞ্চবিধ মুখ্য চিন্ময়রস ও সপ্তবিধ আগন্তুক গৌণ চিন্ময়রস পরিপূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। জাগতিক অভিধানগত নাম বিরস ও কুরস বহন করিয়া থাকে। এমন কি, ব্রহ্ম-পরমাত্মা-নারায়ণাদি-নামেও অখিল চিদ্‌রস নাই। ঐ সকল অসম্যক আংশিক ও তটস্থ বিচারে অখিলরসের ন্যূনতা-জ্ঞাপক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনামরস শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের ন্যায় অখিলরসবিগ্রহ।

আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ রসের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেনঃ—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।"

প্রাকৃত ভাবনার পথ বা তথাকথিত আধ্যাত্মিক ভাবনার পথ অতিক্রম পূর্ব্বক অপ্রাকৃত চমৎকারাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধ সত্ত্ব, পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া বিবেচিত।

রস—আস্বাদনের বস্তু। সেই আস্বাদন—চিদাস্বাদন; চিদাস্বাদন তখনই সম্ভব, যখন আমরা জাগতিক আবর্জনাগুলি সম্পূর্ণভাবে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি। যখন আমরা শ্রীগুরুকৃপায় আবর্জনা ও আবরণ-মুক্ত হই, তখনই অখিলরসামৃতবিগ্রহ শ্রীনাম আমাদিগের নির্মল চেতন-স্বরূপে তাঁহার অপ্রাকৃত রসময় স্বরূপ প্রকটিত করেন। আমরা তখন অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় অপ্রাকৃত নামরস আস্বাদন করিয়া শ্রীনামপ্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে পারি। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যাপারটী—আস্বাদন নহে। তাহা 'ভোগ' বা 'কাম'। অপ্রাকৃত নামপ্রভু জীবের কাম সহ্য করেন না। যাহারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকে

'আস্বাদন' বলিয়া মনে করে, তাহাদের নিকটে অপ্রাকৃত রসনিকেতন শ্রীনাম তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না। তাঁহারা নামাপরাধকেই 'নাম' মনে করিয়া মনঃকল্পিত বিকৃতরসের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের সপ্তম ফল—সর্ব্বাত্মস্নপন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনই সর্ব্বাত্মদ্বারা অপ্রাকৃত কামদেবের সেবার উপায় ও উপেয়। ব্রজবধূগণ—ব্রজবধূ-শিরোমণি শ্রীবার্ষভানবী সর্ব্বাঙ্গদ্বারা অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীনন্দনন্দনের যে অপ্রাকৃত কামসেবা করেন, সেই অপ্রাকৃত কামসেবা যাঁহারা ব্রজবধূগণের আনুগত্যে লালসা করেন, শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন তাঁহাদেরই মুখ্যসাধন ও সাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনে তাঁহাদের সর্ব্বাত্ম-স্নপন বা সর্ব্বাত্মদ্বারা শ্রীকামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণ সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়। কৃষ্ণ-কাম-সেবা-রসামৃতসিন্ধুতে যাঁহারা সর্ব্বাত্মস্নপিত করিয়াছে, সেই মুকুন্দপ্রেষ্ঠা বার্ষভানবীর কুণ্ডে সর্ব্বাত্মস্নপন যাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনকেই একমাত্র সাধনরূপে বরণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ব্যতীত পৃথগ্‌ভাবে স্মরণ প্রযত্নাদি দ্বারা শ্রীবার্ষভানবীর কুণ্ডে এবং অখিলরসামৃতসিন্ধুতে কাহারও সর্ব্বাত্মস্নপন হয় না। পৃথগ্‌ভাবে স্মরণ প্রযত্নাদি প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কৃত্রিম ও আনুকরণিক অবৈধ চেষ্টা মাত্র। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনেই সর্ব্বাত্ম স্নপিত হয়। সর্ব্বাত্মাদ্বারা অপ্রাকৃত কামদেবের অপ্রাকৃত কামসেবার যোগ্যতা লাভ হয়।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## রসো বৈ সঃ

(১)

যং ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।

(ভাঃ ১২।১৩।১)

আমি সেই দেবতাকে নমস্কার করি—যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও নিঃশক্তিমান্ একাধারে এই দুই ব্যাপারে যিনি অচিন্ত্য অর্থাৎ মানব-চিন্তার বহির্ভূত। যিনি সুরাসুর উভয়ের বন্দ্য---যাঁকে—ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতাদি দেবগণ-দিব্য ভাষায় স্তব করেন—উপনিষদের সহিত বেদসমূহ এবং সামগানকারী ব্রাহ্মণগণ যাঁর কীর্তি-গাথা গান করে, যোগিগণ যাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষা হন সুরাসুরগণের কেহই যাঁর অন্ত জানতে পারেন না তথা, অথচ জানবার জন্য উৎসুক হন, তিনি বলদেব বস্তু, তাঁকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীবলদেব স্বয়ং প্রকাশ তত্ত্ব। পরমেশ্বর বস্তু প্রকাশিত না হলে তাঁকে কেহ জানতে পারে না। কৃষ্ণচন্দ্র অখিলরসামৃতসিন্ধু। সেই কৃষ্ণচন্দ্রের স্বয়ং প্রকাশবিগ্রহ অভিন্ন-বস্তু বলদেব; তিনিও ব্রজরাজকুমার বলে প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে সকল কথা আছে, তাঁতেও তাই আছে; তবে তাঁকে কৃষ্ণ বলা হয় না, বলরাম বলা হয়। নিখিল বিষ্ণুতত্ত্ব যাঁহাতে প্রকাশিত হয়েছেন—দেবাসুরগণ যাঁর উপাসনা করেন, তিনিই স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। সুরাসুরগণ স্বয়ংরূপ বস্তুর উপাসনা না করে স্বয়ংপ্রকাশ বস্তুর উপাসনা করেন, যেহেতু স্বয়ংরূপ বস্তু স্বয়ংরূপ প্রকাশের দ্বার ব্যতীত স্বয়ং নিজের পরিচয় দেন না। সেই স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেব প্রভু। মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহরূপে তিনিই প্রকাশিত আছেন; একই বস্তু চার প্রকারে প্রকাশিত। সেখানে স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহের রূপ পূর্ণ আছে। রূপ-শব্দের অর্থ পূর্ণ, ভগ্নাংশ নয়। এই রূপবিশিষ্ট বস্তুই সঙ্কর্ষণদেব—স্বয়ংরূপের বৈভব—যাঁর চারটি প্রকাশবিগ্রহ মহাবৈকুণ্ঠে প্রকাশিত। একই বস্তু চার প্রকারে প্রকাশিত হলেও সেই চার বস্তু এক। বাসুদেব—প্রাভব-বিলাস; সঙ্কর্ষণ—বৈভব-বিলাস; প্রদ্যুম্ন—প্রাভব-প্রকাশ; অনিরুদ্ধ—বৈভব-প্রকাশ।

বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কারণসমুদ্র। তদ্রূপবৈভবের কারণ সঙ্কর্ষণ প্রভুর অংশ কারণনার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। তিনি বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের কারণ—সকলের কারণ। বৈকুণ্ঠ—অবিনশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড—নশ্বর। বৈকুণ্ঠ, গোলোক—ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি-প্রকটিত বস্তু—সম্পূর্ণ উপাদেয়, অপরিচ্ছিন্ন, অসীম প্রভৃতি শব্দ একাধারে যার সার্থকতা সম্পাদন করছে। অবিনশ্বর আধার-বৈকুণ্ঠ, উহা সৃষ্ট পদার্থ নহে, নিত্য-প্রকাশশীল। আর ব্রহ্মাণ্ড নশ্বর, কালক্ষোভ্য আধার; উহা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিদ্বারা নির্মিত। ব্রহ্মার অণ্ড ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ সৃষ্ট-পদার্থ। বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্ত্তা মহাবিষ্ণু সঙ্কর্ষণব্যূহ হতে নিঃসৃত হয়ে কারণসমুদ্রে কারণার্ণবশায়িরূপে বিরাজিত। এই কারণশায়ী মহাবিষ্ণু হতে দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী নিঃসৃত, যাঁকে ঋক্‌সমূহ 'সহস্রশীর্ষপুরুষঃ' প্রভৃতি বলে স্তব করেছেন, যোগিগণ যাঁকে পরমাত্মরূপে লক্ষ্য করেন—যিনি ভূমা, সর্ব্বব্যাপী—যাঁকে খণ্ডিত করা যায় না—যাঁর নাভিনালে জন্ম ও মরণের মূল—ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি ও প্রলয়কারী হিরণ্যগর্ভ ও রুদ্রদেব আছেন। এই দ্বিতীয় পুরুষাবতারকে স্বয়ংরূপ ভগবানের অংশকলা বলা হয়েছে।

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।।"

—প্রভৃতি মহাজন বাক্য বলে এই গর্ভোদকশায়ী অন্তর্যামী মহাবিষ্ণুর পূজা করেন। ইনি আমার বলদেব প্রভুর অংশাংশ-পরমাত্মা—শব্দবাচ্য-ব্যপকতা ধর্ম্ম আশ্রয় করে ইঁহার উপাসনা বর্তমান। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মবাচক শব্দ, জীব-বাচক নন। ব্রহ্ম বৃহৎ ও পালনকারী।

মানবজ্ঞানে যা জানা যায়, তা সঙ্কীর্ণ—বলদেবের বলের কিঞ্চিৎ আভাসময় অংশ মাত্র। বলদেব প্রভু সর্ব্বশক্তিমান্, সকল বল যাঁর পদনখে অবস্থিত—যে সর্ব্বশক্তিমত্তা হ'তে দূরে অবস্থান করে কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংরূপের লীলা প্রকাশ করেছেন। মর্যাদাপথে ভগবান্‌কে জানবার ইচ্ছা হলে আমরা বলদেব প্রভুর পাদপদ্ম পর্যন্ত পৌঁছিতে পারি, তার অতিরিক্ত আমরা দর্শন করতে পারি না। এখানে যা অতি দুর্লভ, এখানে যা আংশিক, চিজ্জগতে তার আকর বস্তু সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত। বলদেব প্রভুর বলে আমরা তা আলোচনা করতে সমর্থ হই। আমরা মায়িক জগতের অন্তরালে অবস্থিত—আমাদের কথা খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। সে বল আমাদিগকে অভিভূত করে। আমরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করি। আমরা দুর্বল, সামান্যশক্তিলাভের জন্য আমরা যত্ন করি। গৌরসুন্দর বঁলেছেন, তৃণ হতেও সুনীচ হও, বৃক্ষের ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন হও, নিজের চেষ্টায় বলবান্ হবার দুর্বুদ্ধি না করে যিনি বল-প্রদাতা, সেই বলদেব প্রভুর আশ্রয়

গ্রহণ কর। যাঁর বল, তিনি বলদেব প্রভু। কৃষ্ণচন্দ্র বলদেবের অনুগত জনকর্ত্তৃক সেবা গ্রহণ ইচ্ছা করেন। বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত কৃষ্ণসেবা পাওয়ার উপায় নাই। যাঁরা বলদেব প্রভুর সেবক হতে পারেন, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে বলবান্ হন।

আমরা দুর্ব্বল জীব; ৫০টা গুণ অতি অল্প পরিমাণে আমাদের আছে। ৬০টি গুণসম্পন্ন বিষ্ণুবস্তুর আনুগত্য ব্যতীত আমরা তত্তদ্গুণবিশিষ্ট হয়ে বাস করব মাত্র, কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হলে পূর্ণতা লাভ করব। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁর আনুগত্য ব্যতীত আমরা বলবিহীন হয়ে থাকব। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্—যাঁ হতে মানব পূর্ণবিচারশক্তি লাভ করে কৃষ্ণদর্শনের সুযোগ প্রাপ্ত হন—যিনি সুরাসুর-বন্দ্য—সকল বেদ যাঁকে স্থিরনিশ্চয় করতে পারে না, তিনিই বলদেব। তাঁরই বাহ্য অঙ্গ হতে এই জগৎ প্রকাশিত হয়েছে। বাহ্য অঙ্গ পরিবর্ত্তনশীল অন্তর অঙ্গ নিত্য। সন্ধিনী-সৎ-বর্ত্তমান। সেই বলদেব প্রভু একমাত্র পালনকারী--সকল মঙ্গলের মূলবিধাতা, তাঁর মূল বস্তু কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, স্বয়ং প্রকাশ বলদেব প্রভুর সেব্য। তিনি সখা, ভাই, শয়ন, ব্যজন, আবাহন, গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, ভূষণ, আসন প্রভৃতিরূপে কৃষ্ণের সেবা করেন। বলদেব, বলভদ্র, বলরাম প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাঁর সকল প্রকারের বলের কথা বলা হয়েছে। তার অন্তরঙ্গ শক্তি হতে বৈকুণ্ঠ, গোলোক, বৃন্দাবনাদি প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর বহিরঙ্গাশক্তি-পরিণাম—এই জড়ব্রহ্মাণ্ড, আর তাঁর তটস্থাশক্তি-পরিণতি--অনন্ত জীবগণ।

যে প্রভুর কিঞ্চিৎ বল পেলে এই জীবকুল তাঁর আনুগত্যে পারমার্থিক বলে বলীয়ান হন—কৃষ্ণসেবা লাভ করেন, সেই বলদেব প্রভু—সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ, কৃষ্ণচন্দ্র—সম্বিদ্-বিগ্রহ, তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, তন্মধ্যে সন্ধিনীশক্তি। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিচার সুষ্ঠু হওয়ার জন্য মধ্যবর্তী যা থাকে তা সৎ। সচ্চিদানন্দবস্তু—বলদেবপ্রভু, সচ্চিদানন্দবস্তু—কৃষ্ণচন্দ্র, সচ্চিদানন্দবস্তু—বার্ষভানবী—এঁরা সকলেই সচ্চিদানন্দময়বস্তু। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন। সর্ব্বশক্তিমান্ বলদেব প্রভুতে সকল বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ আছে। চিদ্বস্তু যখন সচ্চিদানন্দময় বস্তুর জ্ঞান গ্রহণের জন্য ব্যস্ত থাকেন, তখন বহির্জ্জগতের অন্যান্য কথার সহিত তাঁর সামঞ্জস্য করা সঙ্গত নয়। এরূপ কর্‌লে আমরা নানারূপ অমঙ্গলের মধ্যে পড়ে যাব।

আমরা জড়জগতে আছি—তটস্থাশক্তি-পরিণত জীবকুল আমরা কৃষ্ণ-বৈমুখ্যবশতঃ এখানে এসে পৌছেছি। বলের অভাবহেতু এখানে আমরা প্রত্যেকের দ্বারা আক্রান্ত, জড়সম্বন্ধ আমাদিগকে নানাভাবে বিক্ষিপ্ত কর্‌ছে। বলদেব প্রভুর আনুগত্য ব্যতীত আমাদের গতি নাই। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র" শ্লোকে যে বাস্তবসত্যের কথা কীর্ত্তন করেছেন, তা পরিত্যাগ করে আমরা যদি ভগবানের গুণময়ী মায়ায় অভিভূত হয়ে পড়ি, তা'হলে শ্রীবলদেব

প্রভুর পদনখের শোভা দর্শন করবার সৌভাগ্য আমাদের হবে না। বলদেব প্রভু চেতনময় বলের প্রদানকারী। অচিৎ এর নিকট হতে আমরা যে বল—যে জ্ঞান লাভ করি, তা যিনি ধ্বংস করতে পারেন, তাঁর নিকট হতে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের যে বোধশক্তি, যে বল আছে বিচার করছি, তলবকার উপনিষদে উমা-হৈমবতী সংবাদে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, পবন প্রভৃতি দেবগণের সেরূপ বলের নিরর্থকতা ভগবান্ প্রদর্শন করেছেন। এ সমস্তই অচিৎ বলমাত্র। বলদেবের বলে বলীয়ান না হলে এ সমস্ত বল ব্যর্থ হয়ে যায়—ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের সমস্ত বল ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, বলদেবের বল লাভ না করায়।

আমাদের বর্ত্তমান বল প্রতিমুহূর্ত্তে নষ্ট হচ্ছে। বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধানের জন্য বলদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা অবাস্তব বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য অপরের নিকট হতে যে সমস্ত পরামর্শ প্রাপ্ত হই, তার মূল্য অন্ধ-কপর্দ্দক মাত্র। যা পরিবর্ত্তনশীল, নশ্বর, এরূপ জ্ঞানের প্রতি কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আস্থা স্থাপন করেন না। আমরা মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করি—অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির প্রার্থী হই, তা প্রাকৃত বুদ্ধির পরিচয় মাত্র, ফুটো হাঁড়িতে জল রেখে কি লাভ হবে?

আমরা যখন বলদেব প্রভুর আনুগত্যে কার্য্য করি, তখন কৃষ্ণ সেবা হয়। বলদেব প্রভুর একমাত্র কৃত্য—কৃষ্ণ-সেবা। সেব্য-সেবকের পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় কান্ত-কান্তা, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় পুত্র-পিতামাতা, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বন্ধু, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় সেব্য-সেবক, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় নিরপেক্ষ শান্ত। সেবক যখন সেব্যের দিকে অগ্রসর হন, তখন তাঁকে বলদেব প্রভুই সাহায্য করেন। বলদেব প্রভুর বল লাভ না করলে আধ্যক্ষিকতা প্রবল হয়ে নানারূপ মতবাদ সৃষ্টি হয়। তখন 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।'—তখন আমাদের বিচার-প্রণালী দুষ্ট হয়ে পড়ে। তখন অহংগ্রহোপাসনা দ্বারা আমরাই সেই বস্তু মনে করি। নিজে অমানী-মানদ হওয়াই আমাদের স্বাস্থ্য, তাতেই আমাদের নাম ভজনের যোগ্যতা হয়, নতুবা আমাদের যোগ্যতা থাকে না।

নামের বদলে শব্দ উচ্চারণ করে আমরা যে অমঙ্গল বরণ করি, তা হ'তে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের জন্য নির্দ্দেশ করেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর গয়া হতে এসে নবদ্বীপের পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের বাড়ীতে ছাত্রগণকে ব্রাহ্মীভাষায় যে ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাতে সকল শব্দকেই কৃষ্ণরূপে বর্ণন করেছেন। স্ফোটের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি ও অবিদ্বদ্‌রূঢ়ি বলে দু'প্রকার বৃত্তি আছে। বিদ্বদ্‌রূঢ়িতে যাবতীয় শব্দ কৃষ্ণপাদপদ্মকে লক্ষ্য করে; আর অবিদ্বদ্‌রূঢ়ি দ্বারা ভগবদিতর বস্তু লক্ষিত হয়। কৃষ্ণজ্ঞানের দুর্ভিক্ষে

—নানাপ্রকার কাল্পনিক চিন্তাস্রোতে কৃষ্ণবৈমুখ্যধর্ম্ম উৎপন্ন হয়েছে। আমরা বলদেব প্রভুর কৃপায় পুনরায় কেবল জ্ঞানে জ্ঞানী হতে পারি—কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি—ভাগবতকে বেদান্তসার বলে জানতে পারি। সেই বলদেব প্রভুর সর্ব্বতোভাবে অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। এই বলদাতা প্রভুর আনুগত্য করা—তার নিকট হতে চিদ্‌বল সঞ্চয় করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। সেই বলদেব প্রভুর বল ব্যতীত আমাদের কোন সম্বল নাই।

আমরা ত অচিদ্‌বল লাভের জন্য অনেক যত্ন করলাম, কিন্তু তা সমস্তই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেন নষ্ট হয়ে যায়? তার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বলদেব প্রভু বিরুদ্ধশক্তি হতে উদ্ধার করেন; যেমন প্রহ্লাদকে করেছিলেন। মনোধর্ম্মের পিপাসা তিনি মুষলের দ্বারা উৎপাটন করেন। তাঁর কিঞ্চিৎ অনুগ্রহে সমস্ত মঙ্গল হয়ে যায়। তাঁর আবার আবির্ভাব কিরূপ? নিঃশক্তিক থাকবার যোগ্যতা তাঁর আছে, কাল্পনিক নিঃশক্তিক নহে সর্ব্বশক্তিমত্তা বিচার দূরে রেখে কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ লীলাবিশিষ্ট হয়ে থাকেন। যখন সেই বস্তু জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত হন, তখন আমরা ক্রম বুঝতে পারি—বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, রামসীতা, রুক্মিণী দ্বারকেশের সেবার ক্রম। জন্ম স্থিতি—স্বীকার রামচন্দ্রের সেবা দ্বারা বুঝতে পারা যায়। রুক্মিণীশের সেবালাভে-দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলে সর্বত্রই বলদেব প্রভু আমাদিগকে সাহায্য করেন। তাঁর কৃপায় মানবোচিত ভাবসমূহ ঈশ্বরে আরোপ করে কদর্থ করার হাত হতে আমরা রক্ষা পাই। এরূপ কদর্থ গ্রহণযোগ্য? প্রাকৃত সাহজিক সমাজ এটাকে ধর্ম্ম বলে মনে করে। সেখানকার (চিজ্জগতের) বিকৃত প্রতিফলনে এখানকার সমস্ত উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু সেই বস্তু যাঁর বহিরঙ্গাশক্তি হতে উদ্ভূত হয়ে সত্যের প্রতিফলনকে সত্য বলে অনুভূত করাচ্ছে, সেই মূল আকর বস্তু আমাদের আলোচ্য হউক, নচেৎ বৌদ্ধবিচার, অর্হৎ-বিচার ইত্যাদি অবলম্বন করে অষ্টবসুর অন্যতম উপরিচরবসুর বিচার অবলম্বন না করলে অক্ষজ বিচার হবে। কিন্তু বলদেব প্রভু অধোক্ষজ বস্তু। তিনি অন্তর্যামিসূত্রে অবিচার ধ্বংস করেন। কৃষ্ণের কথা আলোচনাকালে সব সুবিধা হবে। তখন কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহের বিষয় উপলব্ধি হবে। ক্রম-উপলব্ধি হয়ে উন্নত হতে পারব। রাবণের সিঁড়ি বাঁধা ছেড়ে দেবো। জগতের জ্ঞান হতে Inductive process রূপ কাল্পনিক পথ অবলম্বন করব না। সূর্য্যের আলোক অক্ষিতে আসলে তদ্দ্বারা সূর্য্যকে দেখ্‌ব। আলোকে সূর্য্য কল্পনা করা Apotheosis. আমরা কপটতা করে একটা মানুষকে ভগবান্ সাজাতে দৌড়াব না। ভগবান্ বলেছেন,—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণ কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।

আমার স্বরূপ, আমার রূপ, গুণ ও লীলা যে প্রকার সেই সকলের তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি প্রাপ্ত হও।

ভগবৎকৃপাক্রমে সেই ভগবদ্বস্তু প্রকাশিত হন। অক্ষজ জ্ঞানে তাঁকে জানতে পারা যায় না। বলদেব প্রভু ভিন্ন অন্য কেহ তাঁকে জানতে পারে না। আমরা নিজ চেষ্টায় সেই বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে অসমর্থ,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।

একমাত্র ভক্তি বলেই সর্বসিদ্ধি হতে পারে,—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।

পরাভক্তি ব্যতীত আমাদের উপায় নাই—বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত মঙ্গলের পন্থা নাই। আর সমুদয় বিচার অক্ষজ-মানব-জ্ঞান-কল্পিত।

"Creator (স্রষ্টা) ও created (সৃষ্ট) বলিয়া দুইটি কথা আছে। created কখনও Creator" নহে। ব্রহ্মাকে জগতের সৃষ্টিকর্তা—কারণ বলা হয়, তিনিও তাহার কারণ যিনি, তাহার কার্যস্বরূপ। মহেশ্বরের প্রলয়সাধিনী শক্তিও সেই মূল কারণ হইতে লব্ধ। ভগবান্ সর্বকারণকারণ। 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।।" এই ব্রহ্মসংহিতা-বাক্যটি বিশেষরূপে প্রণিধান-যোগ্য। তিনি অধোক্ষজ বস্তু, তাহার কথার আলোচনার অভাবে আমরা অক্ষজজ্ঞান দৃপ্ত হইয়া নানা ইতর কথার প্রশ্রয় দিতেছি। বাস্তব সত্যের (Absolute truth-এর) সঙ্গে অবাস্তব সত্যকে (non-absolute truth-কে) আমরা একাকার করিয়া ফেলিতেছি! Absolute-এর মধ্যেই যাবতীয় প্রতীতি non-absolute ও অনুস্যূত আছে। Non-absolute-এর রাজ্যে absolute-এর সন্ধান মিলিবে না। প্রত্যক্ষ পরোক্ষ এবং অপরোক্ষেরও অতীত অধোক্ষজতত্ত্ব; আবার অধোক্ষজ অপেক্ষাও অপ্রাকৃততত্ত্বে লীলাচমৎকারিতা বিদ্যমান। সূর্যের স্ব-প্রকাশ বস্তুর দরকার নাই বলিলে ঈশোপনিষদের "অসূর্যানাম্ তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ"—অবস্থা আসিয়া যাইবে; "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ"—এই মুণ্ডকশ্রুত্যুক্ত দৃষ্টান্তে ভগবানের সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রত্ব—স্বেচ্ছাময়ত্ব সর্বকারণকারণত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়। তিন-এর dimension-এর (আয়তনের) মধ্যে চার-এর dimension-কে পুরিবার চেষ্টা করিতে হইবে না, চারের

আয়তনের মধ্যেই তিনের কথা আছে। আবার পাঁচ, ছয়, সাতের রাজ্যের কথায় পূর্ব পূর্ব কথা সব আছে। Cubical expansion-এ যে 'to the infinity' বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাতেও finitudinal reference আছে; কিন্তু প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভূমিকা অতিক্রম করিয়া যে infinityর রাজ্য, তাহাতে যে অধোক্ষজ ও তাহা হইতে চিদ্বিলাস চমৎকারিতা পূর্ণ অপ্রাকৃতের কথা আছে, তাহাতে এখানকার কোন "অনয়া মীয়তে" বা মাপিয়া লওয়ার বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা 'অনয়ারাধিতঃ' বিচারের রাজ্য।

ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতে পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি।।
(ভাঃ ১।৭।২৩)

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে ভগবান্ কৃষ্ণ! তুমিই সর্ব-কারণকারণ, তুমিই প্রকৃতির অতীত পুরুষ। তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর অতএব—নির্লিপ্ত বা অধিকারী। তুমি স্বরূপশক্তি প্রভাবে বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে দূরে রাখিয়া কেবল স্বরূপে অবস্থান কর। Transcendental relativity-তে তৃতীয় মানের কোন কথা নাই, তাহা তুরীয় অতিক্রম করিয়া পঞ্চম মানের রাজ্যে অবস্থিত। স্বরাট্ শ্রীকৃষ্ণ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপ্রাকৃত পরিচ্ছিন্ন মধ্যমাকার। শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ও বিদ্বদ্রূঢ়ি বিচার ভুক্তি ও মুক্তিকামী সম্প্রদায়ের মস্তকে প্রবিষ্ট হয় না বলিয়া তাঁহারা transcendence-এর relativity বুঝিতে পারেন না। এই transcendent পাশ্চাত্য মনীষীদার্শনিকের 'transcendent' নহে, উহা ত' Phenomena-রই রূপান্তর, উহা দ্বিতীয় গুলিখোরের একটুকু অধিকতর হস্তপ্রসারণ-ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ রূঢ়িতে 'ব্রহ্ম' শব্দে নির্বিশেষ ভাব বুঝায়; কিন্তু শ্রীমন্মধ্বাচার্য বেদান্তের সাঙ্কর্ষণ সূত্রে এবং শ্রীগৌরসুন্দর সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দের সহিত বিচারে জানাইয়াছেন যে 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থ—একমাত্র ভগবান্।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও অপ্রাকৃত বিষয়ের অন্তরালে দেশ-কাল-পাত্রের বৈশিষ্ট্যের বিলোপ-সাধনোদ্দেশে ভেদবিচারের অভাবে বস্তুর যে একতা আত্মবিকাশ করে, উহাকেই প্রাকৃত বস্তুর ধর্মাভাবমাত্র বিচারে স্থিরকরিতে গেলে অপ্রাকৃত বস্তুর অন্বয়-পরিচয় সুষ্ঠুভাবে প্রদত্ত হয় না। প্রাকৃত ব্যতিরেকের সাহায্যে যে অধিষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়, তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত অন্বয় প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্মপরিচয় দিতে সমর্থ হয় না।

প্রাকৃত ও প্রাকৃতেন্দ্রিয়জ-জ্ঞানগ্রাহ্যাতীত, উভয় রাজ্যেই অধিষ্ঠানগত সত্তায় তৎপুরুষতা আছে। এই তৎপুরুষই 'কারক' বলিয়া অভিহিত হয়। কারকের সংখ্যাগত বিচারে একত্ব, দ্বিত্ব ও বহুত্ব সংশ্লিষ্ট। কারকগুলি বিভিন্ন ভাবের ব্যঞ্জক। প্রাকৃত

রাজ্যে পুরুষ-বিচার অহঙ্কার-বিমূঢ়তা-মূলক বলিয়া আত্মবিদ্‌গণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গুণজাত বিচার যখন আত্মাকে আশ্রয় করে, তখনই ঔপাধিক দেহদ্বয় তাহাদের নিজ নিজ সত্তায় আত্মাভিমান করিয়া থাকে, কিন্তু আত্মা ব্যতীত প্রকৃতির ত্রিবিধগুণ কর্মসমূহের উৎপত্তি করায়। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ঐ গুণগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া পুরুষত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। জগতের বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া জীবকুল তাৎকালিক পরিচয় জ্ঞাপন করে। স্বতঃকর্তৃত্ব ধর্মই 'পুরুষকার' বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। অনেকস্থলে এতাদৃশ পুরুষকার অপরিচিত শক্তি প্রকাশ করিয়া পুরুষকারের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে সেইকালে বিষম দ্বন্দ্ব প্রতিভাত হয়। পুরুষ-চেষ্টা প্রবল হইয়া দৈবকে করতলগত করিতে চেষ্টা করে। কাহারও বিচারে দৈবপরাক্রম প্রবল হওয়ায় পুরুষকার দুর্বলতায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে।

যখন চেতনশক্তি ক্রিয়াবতী হইয়া চেতনহীনের উপর আধিপত্য করে, তখন আমরা প্রবলশক্তির অধিষ্ঠানকে 'পুরুষ' এবং নির্জিত শক্তিরূপে পরিচিত বস্তুকে শক্তি-পরিচালনে অক্ষম 'ক্লীব' বলিয়া থাকি। কারকতায় নিমিত্ত ও উপাদান ভেদে চেতনশক্তির অধিষ্ঠানে 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি' শব্দদ্বয়ের আবাহন হইয়া থাকে। অনেকস্থলে প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পর ভেদ বিলুপ্ত হইয়া 'পুরুষ'-শব্দে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্তি জ্ঞাপিত হয়।

ভোগ্যবিচারে অভিমানের ভোক্তৃত্বই পুরুষের প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা প্রকৃতিপুরুষ হইতে বৈষম্য স্থাপন করে। পুরুষ-সহায় শক্তি কোন কোন স্থলে পুরুষের অনুকূলা, কোথাও বা প্রতিকূলা। যেখানে প্রকৃতি প্রতিকূলা, সেখানেই পুরুষের দুর্বলতা। এই বিচার প্রবল হওয়ায় একদিন ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধমনীষী অগস্ত্য কম্‌তি ভোগ্যা প্রকৃতির বিচারকে বহুমানন-পূর্বক পুরুষের একমাত্র কৃত্য প্রকৃতিপূজার উপদেশ-ঝঙ্কারে দিগ্ দিগন্ত মুখরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাস্তববাদ-বিচার অনেকের নিকট অনুকূল হওয়ায় নারীপূজাই সভ্যতার অনুমোদিত প্রকৃষ্ট সোপান বলিয়া গৃহীত হয়। ইহা যে কেবল ফরাসী দেশেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা নহে; ভারতেও শাক্তেয় মতবাদের বিচারে, বৌদ্ধ-সাহিত্য এবং তামস তান্ত্রিক সাহিত্যের মধ্যে ঐ মতের অভাব দেখা যায়।

সাত্বত-তন্ত্রসমূহ এই শাক্তেয় বিচারের সুষ্ঠুতা গ্রহণ করিয়া প্রকৃতির অতীত রাজ্যের নিত্যা-প্রকৃতিকে সচ্চিদানন্দবস্তুরই প্রকৃতি বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন। যাঁহাদের সচ্চিদানন্দানুভূতি কালক্ষোভ্য গুণত্রয়ের দ্বারা অপ্রতিহত রহিয়াছে, তাঁহারা প্রকৃতিপতির ত্রিশক্তির কথা বলিয়া থাকেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বিচিত্রশক্তিসমূহের নিত্য পরিণতি প্রকাশ করিয়া শুদ্ধচেতন-ধর্মে মলিনতা বা নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় কাল প্রগতিতে বহির্বিপত্তি আনয়ন করেন না। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে নিত্য অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশিত জগতের বিকৃত ভাবের ছায়া কালধর্মের নশ্বরতা উপলব্ধি করাইবার অবসর পাইয়াছে। বৈচিত্র্যদর্শনে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে যে

অসংখ্য বস্তুর স্বতন্ত্রতা দেখা দিয়াছে, ঐগুলি দর্শকের প্রকৃত স্বাস্থ্যের পরিচয় না হইলেও তাহাতে তাৎকালিক প্রতীতিগত সত্তার কোন ব্যাঘাতই দেখা যায় না। যিনি এই প্রকার দর্শকসূত্রে বস্তুবৈচিত্র্য দর্শন করিতে গিয়া অদ্বয়জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধনিরূপণে অসমর্থ, তাঁহারই সেবা-বৈমুখ্যধর্মে ভোগধর্মের বৃত্তি আসিয়া নিত্যবৃত্তিকে তাৎকালিক আচ্ছাদনে আবৃত রাখে। এতাদৃশ দর্শকের স্থান বাস্তব বস্তুর নিত্য ও অনিত্যশক্তির অন্তরালে অবস্থিত। নিত্যের আলোচনায়—অদ্বয়জ্ঞানের অনুশীলনে—চিদানন্দের অব্যাহত গতিশীলতায় দর্শকের সহযোগিতা উপস্থিত হইলেই তাঁহার আর অনিত্য-অজ্ঞান-মিশ্র আনন্দের প্রতিবন্ধকতার সহিত মিত্রতা করিবার রুচি থাকে না।

বহিরঙ্গা শক্তি পরিণত জগদ্‌বৈচিত্র্যের ভোগ যাঁহাকে গ্রাস করে, তিনি গুণত্রয়ের দ্বারা অভিভূত হইয়া জ্ঞানহীন অনিত্য জগৎ কর্তৃত্বকেই বহুমানন করিতে করিতে তাৎকালিক সুখেচ্ছায় চালিত হন। সুতরাং পুরুষার্থনিরূপণে তাঁহার যে রুচি দেখা যায়, উহা বিভিন্ন অপ্রাকৃত রুচি হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ে। যাঁহাদের প্রাকৃতগুণসংগ্রহই ঐহিক ও আমুষ্মিক পুরস্কার বলিয়া ধারণা এবং তাঁহাদের সহিত একমত না হইয়া অনিত্য ভোগের পরিণাম বিষময় বলিয়া যাঁহারা ধারণা করেন, তাঁহাদের বিচার পৃথক হইয়া পড়ে। পরিণামশীল জগতের ভোক্তৃসূত্রে স্বতঃকর্তৃত্বধর্মবিশিষ্ট জীবগণ তদধীন সহযোগিসংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন; তাদৃশ অনুগতজনগণ ন্যূনাধিক প্রকৃতিগত গুণসাম্যে যে সেবা করিয়া থাকেন, উহাও যোষিদ্‌ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। যোষিদ্‌ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সেবকের বৃত্তির পরিবর্তে অনুক্ষণ সেব্যাভিমান ফুটিয়া পড়ে। তখন অনুগতা যোষা নায়কের আনুগত্য বাহিরে স্বীকার করিলেও ভোক্তৃত্বাভিমানেই দিনপাত করে। ইহাও পুরুষ-পর্যায়ের অন্তর্গত। অপ্রাকৃতদেশে অপ্রাকৃত শক্তির অভিব্যক্তিতে এই প্রাকৃত পুরুষকার বিভিন্ন অধিষ্ঠানে লক্ষিত হয়। যে-কালে পুরুষকার একমাত্র পুরুষোত্তমকে সেব্যজ্ঞান না করে, সে-কাল পর্যন্ত তাহার ভোগচেষ্টা প্রবলা থাকে। পুরুষকারের সর্বোত্তমা চেষ্টা একপুরুষোত্তমের সেবায় আত্মনিয়োগ; সেখানে পুরুষকার ভোগ্য যোষা-সংগ্রহে ব্যস্ত নহে। যেখানে কেবলা ভক্তির অভাব, তাদৃশ পুরুষকারই জগতের সুখ ও দুঃখ ভোগ করে এবং যেখানে পুরুষকার সেবোন্মুখ, তথায় সেব্যকে সেবক বলিয়া ধারণা করিতে হয় না; এরূপ না হইলেই চেতনের বৃত্তি ভোগোন্মুখ হইয়া জড়ের ভোক্তৃত্বকে নিজের শ্রেয়স্কর কৃত্য বলিয়া মনে করে। অদ্বয়জ্ঞান-সেবা বিমুখজনগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের আস্বাদ্য-বস্তুর বহুত্বের আনুগত্যে বিমুগ্ধ হইয়া পুরুষার্থনিরূপণে ভ্রমে পতিত হয়।

আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সেব্যের ভাব গ্রহণ করিয়া জড়জগৎ সেবক ও জড়জগতে সমাগত চেতনমিশ্র জড়-শরীরধারী জীবকুলও সেবক এবং উহাদের সহিত তাঁহার সর্বতোভাবে প্রয়োজন নিরূপণ করিয়া যখনই জীব ধর্ম, অর্থ ও কামের অবস্থানের

অন্যতম কোন একটিকে নিজ প্রাপ্য বলিয়া নির্ণয় করেন তখন সে 'ভোগি'-সংজ্ঞার প্রতিষ্ঠানকে পরম প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করে। ইন্দ্রিয়সমূহের তর্পণমূলে যে সুখোদয় ঘটে, সেই ইন্দ্রিয়গুলি কালক্ষোভ্য, অপটু, প্রতারিত হইবার যোগ্য ও আসক্তি-জন্য প্রমত্ত হওয়ায় তাহাদের প্রেয়োঽভিলাযে ক্লেশসমূহ আসিয়া উপস্থিত হয়। উহাই এই পরিবর্তনশীল জগতের বৈশিষ্ট্য।

তাই সাত্বত—শাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন,—অধোক্ষজ-বস্তু সকলেই স্বতন্ত্র ও স্বরাট্ বস্তু,—অন্যের দ্বারা সৃষ্ট ও লালিত-পালিত হইয়া সম্বর্দ্ধিত হন না। 'শ্রীগোবিন্দ'—স্বতঃপ্রকাশ 'চিদুদয়' বাস্তব-বস্তু, অন্য আলো জ্বালিয়া তাঁহাকে দেখিতে হয় না।

'গাং বিন্দতি ইতি গোবিন্দঃ'—'গো' অর্থে 'বিদ্যা' 'ইন্দ্রিয়', 'পৃথিবী' ও গাভী ইত্যাদি। (ঈশোপনিষৎ—১৮) "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্‌বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো, ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম।।"

—এইসকল বেদোক্ত স্তবে আমাদিগের ইন্দ্রিয়-তর্পণোপযোগিনী বস্তু ধারণায় গোবিন্দের বাহিরের দিকের 'চেহারা' বর্ণিত হইয়াছে। এইসকল স্তব-দ্বারা আমরা গোবিন্দের বিভেদাংশের কথা—কুণ্ঠ-ধর্ম্মের কথা বলিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের পরিতৃপ্তি সাধন করি। কিন্তু তিনি—স্বতন্ত্র। তিনি পঞ্চরূপে প্রকাশিত হন—(১) স্বরূপ বা স্বয়ংরূপ, (২) পরস্বরূপ, (৩) বৈভবরূপ, (৪) অন্তর্যামিরূপ ও (৫) অর্চ্চা-রূপ।

(১) স্বরূপ বা স্বয়ংরূপই ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার রূপ নশ্বর পরিবর্ত্তনীয় রূপ নহে—কাল্পনিক রূপ নহে; বা তিনি আমার বিচারের বা ধারণার কারখানায় গঠিত একটী দ্রব্যবিশেষ নহেন। তিনি—স্বতঃস্বরূপবিশিষ্ট। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনম্' —মনোধর্ম্মজীবিগণের এরূপ কাল্পনিক বিচার আদৌ স্বতঃসিদ্ধ-স্বরূপবিশিষ্ট অধোক্ষজ-গোবিন্দে প্রযুজ্য নহে। গোবিন্দই সমস্ত বহিঃপ্রজ্ঞা-গ্রাহ্য দেবতাগণের পোষ্টা,—শ্রীগোবিন্দই অগ্নিকে দাহিকাশক্তি, সূর্য্যকে তেজঃশক্তি ইত্যাদি অধিকার প্রদান করিয়াছেন। তিনিই সকলের মূল—পরাৎপর বস্তু। শ্রীব্রহ্মসংহিতা গোবিন্দকেই 'পরমেশ্বর', 'সর্ব্বকারণকারণ', 'অনাদি', 'আদি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।।"

কাল-সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে গোবিন্দ বর্তমান ছিলেন, গোবিন্দ হইতেই কালের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে 'বিবর্তবাদী' হইয়া মনে করি,—কালের মধ্যে 'গোবিন্দ' সৃষ্ট হইয়াছেন। আবার, কখনও বলি বা বিচার করি,—আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানজ সামাজিক-কারখানায় আমরা দয়া করিয়া গোবিন্দকে গড়িয়াছি!' 'আমাদের কারখানার গোবিন্দ'—'আমাদের মনের ছাঁচে গড়া গোবিন্দ'—প্রকৃত অধোক্ষজ গোবিন্দ বা স্বরূপতত্ত্বের সহিত 'এক' নহেন। আমাদের মনগড়া বিচার-দ্বারা আমরা গোবিন্দের

শ্রীবিগ্রহকে কলঙ্কিত করিতে পারিব না। তিনি—স্বতন্ত্র। কাল তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারিবে না,—তাঁহা হইতেই কাল প্রসূত হইয়া তদ্ব্যতীত তাঁহার বহিরঙ্গা প্রসূত অন্যবস্তুর পরিচ্ছেদ সাধন করে। অধোক্ষজ গোবিন্দ জীবের মনঃকল্পিত নহেন (not a concoction of human mind) 'গোবিন্দই একমাত্র পরমেশ্বর অধোক্ষজ-বস্তু'—ইহাই সত্য অর্থাৎ গোবিন্দই নিত্যচিন্ময়বিগ্রহস্বরূপ; সুতরাং 'জড়েন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে দৃশ্য-জগতের অন্যতম বস্তু বলিয়া অচিৎ এর হেয়তা, জড়ের জাড্য ও অস্বতন্ত্রতা স্বরাট্পুরুষ গোবিন্দের পাদপদ্মে আরোপিত হইতে পারে না,—এই-নিত্যসত্য যিনি আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া জানাইয়া দেন, তিনিই আমাদের পরমহিতকারী দিব্য-কৃষ্ণজ্ঞান প্রদাতা বৈষ্ণবঠাকুর শ্রীগুরুদেব।

এই জড়জগৎ—গোবিন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন, অক্ষজজ্ঞানের অভ্যন্তরে গোবিন্দই অন্তর্যামিরূপে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। বেদোক্ত বহু-দেবতা জড়েন্দ্রিয়ের অগোচর আবৃত বিষ্ণুর জীবেন্দ্রিয়োপযোগী বাহ্যপরিচয়ই প্রদান করেন। যখন আমরা বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা প্রভৃতি দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের এষণা-দ্বারা আচ্ছন্ন হই, তখনই বিষ্ণুমায়া আমাদের নিকট তত্তৎফলদাত্রী দেবতারূপে প্রকাশিত হন। শ্রীগোবিন্দ যে প্রকৃত্যতীত চিচ্ছক্তি বিশেষরূপে গ্রহণ করিতেছেন, অর্থাৎ তিনি যে সম্বিদ্বিগ্রহ, তাহা আমরা আমাদের জড়েন্দ্রিয়তর্পণ-পর জড়ধর্ম্ম থাকা-কালে উপলব্ধি করিতে পারি না। তিনি স্বয়ং অবিমিশ্র পরমানন্দ বিগ্রহ (Unceasing Love and Bliss-Incarnate); তাঁহাতে কোনও মিশ্র বা কেবল চিদ্বিপরীত অচিৎ সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। কিছুকালের জন্য যাহা আমাদের অক্ষজজ্ঞানে 'সত্য' বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা—তাৎকালিক সত্যমাত্র (Apparent truth বা Local truth),—উহা নিত্যসত্যবস্তু (Positive বা Absolute Truth) হইতে পারে না। অনাদি-কালের বিচারে গোবিন্দের আদিতে কোনও বস্তু ছিল না। গোবিন্দসেবা-বিমুখ জনগণের দণ্ডের জন্যই জড়জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। অখণ্ড-কালও গোবিন্দ হইতেই প্রকটিত হইয়াছে; —মানবজ্ঞানের অজ্ঞেয় জড়ের, অনুভব-রাজ্যের অতীত ব্রহ্মার অহোরাত্র বা সম্বৎসর বা কল্পাদি-মাত্রও নহে —এইরূপ অখণ্ড-কালও গোবিন্দ হইতেই প্রকাশিত।

'কার্য্যের—ব্যক্তের—পরিণামের পিতা-মাতা কে?—কারণ কে?—আবার, তাহারও কারণ কে?' ইত্যাদি বিষয়ে যখন আমরা অনুসন্ধান করি, তখনই দেখি,—তাহা শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম। 'কারণ'কেই যখন 'কার্য্য বলিয়া উপলব্ধি করি, তখন দেখি,—সকল-কারণের কারণ সেই 'গোবিন্দ',—ইহাই স্ব-স্বরূপের পরিচয়।

(২) 'পরস্বরূপ' বা 'পরতত্ত্বস্বরূপ' বলিতে বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম-নাথ শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ। বেদাদি নিখিলশাস্ত্র বিষ্ণুকেই 'পরতত্ত্ব' বলিয়া কীর্ত্তন করেন। দিব্যসূরিগণ নিত্যকাল অপ্রাকৃত ভক্তি-লোচনে বিষ্ণুর পরম পদই দর্শন করেন।

(৩) বৈভবপ্রকাশ মূল-নারায়ণ বলদেবপ্রভু—আমার গোবিন্দেরই প্রকাশমূর্ত্তি। সকল-বিষয়ের মূলকারণ—স্বয়ংরূপের বৈভব—Individuality Propagating Prime Cause-ই অর্থাৎ Personal Godhead-এর All pervading Function-holder ই বলদেব; তিনি স্বয়ং-প্রকাশ। তাঁহার বর্ণ—শ্বেতবর্ণ—কৃষ্ণ হইতে পৃথক্। কৃষ্ণের বাঁশী অপেক্ষা অধিক শব্দ করিবার জন্যই তিনি শিঙ্গা-ধৃক্। 'প্রকাশ' অর্থে তদ্বস্তুপরতা, এবং 'বিলাস' অর্থে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা, 'প্রভুতা' অর্থে নিগ্রহানুগ্রহ-সামর্থ্য, 'বিভূতা' অর্থে সর্ব্বালিঙ্গন-যোগ্যতা; শ্রীবলদেব—তাদৃশ গুণবিশিষ্ট (Fountain-head or Prime-source of All embracing, All-pervading, All-extending Energy)। এই সকল পরিভাষা পরিমিত-রাজ্যের ভাষা-দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও উহাদের প্রকৃত অর্থ কখনই সম্যগ্ রূপে বুঝা যাইবে না। 'বিভু' ও 'প্রভু'—পরস্পর অন্যোঽন্যাশ্রিত। বৈভব-প্রকাশরূপে যিনি—প্রকাশমান, তিনিই 'বিভু'; আর যাঁহা হইতে তিনি প্রকাশমান, তিনিই 'প্রভু'। 'বিভু'তে ও 'প্রভু'তে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। 'প্রভু'—বাসুদেব; 'বিভু'—সঙ্কর্ষণ। 'বিভুর' ও 'প্রভু'র একদিক্—তৃতীয়দর্শন প্রদ্যুম্ন; 'বিভু'র ও 'প্রভু'র অন্যদিক্—চতুর্থদর্শন অনিরুদ্ধ। দ্বারকায় সকল-চতুর্ব্যূহের অংশিস্বরূপ—আদি-চতুর্ব্যূহ, এবং পরব্যোমে বা বৈকুণ্ঠে তাঁহাদেরই দ্বিতীয়-প্রকাশ—দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহ। ইঁহারাও আদি-চতুর্ব্যূহের প্রকাশানুরূপ তুরীয় ও বিশুদ্ধ। কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বলদেব—মূলসঙ্কর্ষণ; পরব্যোমে সেই শ্রীবলরামের স্বরূপাংশই মহা-সঙ্কর্ষণ। তাঁহা হইতেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপী প্রথমপুরুষাবতার। তিনি-রাম-নৃসিংহাদি অবতারের কারণ, গোলোক-বৈকুণ্ঠের কারণ, ভূমার কারণ ও বিশ্বের কারণ। গৌরসুন্দরের বৈভববিচারে ভ্রান্ত ব্যক্তিগণই ব্রহ্মাণ্ডে 'বিদ্ধ-বৈষ্ণব' আখ্যায় পরিচিত হইয়া আউল, বাউল, সহজিয়া, গৌরনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়।

(৪) অন্তর্যামিরূপ—ত্রিবিধ,—(ক) প্রকৃতির অন্তর্যামী কারণার্ণবশায়ী, (খ) হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি জীবের অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী, (গ) ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ জীবের অন্তর্যামি-পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী পরমাত্মা।

(৫) অর্চ্চা—অষ্টবিধ (ভাঃ ১১।২৭।১২) —

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।।"

শ্রীগোবিন্দ অর্চ্চা-রূপে অবতীর্ণ হন বলিয়া জড়বদ্ধ লোকসকল অর্চ্চার দেহ ও দেহীতে ভেদ-বুদ্ধি করিয়া বঞ্চিত হয়। Henotheism অর্থাৎ পঞ্চোপাসনা বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদ—পৌত্তলিকতা বা বুৎপরস্তের চরম সীমা। গণদেবতাপূজা হইতে বৌদ্ধ শাক্যসিংহ-বাদ প্রসূত হইয়াছে। 'ললিত-বিস্তর'-গ্রন্থে তেত্রিশ-কোটি গণদেবতার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে শাক্যসিংহকে বর্ণন করা হইয়াছে। জড়জগতে বর্ত্তমান-সময়ে

কৃষ্ণ-জ্ঞানহীন বদ্ধজীবগণ—মাটিয়াবুদ্ধিতে মাটির পূজায় ব্যস্ত। অধিকাংশ লোকই মাটিয়া (materialist) বা জড়োপাসক এবং পঞ্চোপাসক (Henotheist) অর্থাৎ চিজ্জড়সমন্বয়বাদী।

ভগবানের অর্চ্চা-মূর্ত্তির কৃপাই সমস্তবাহ্যজ্ঞানের কবল হইতে জীবকে অপসারিত করিতে পারেন। বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান-হীন পূজা-বঞ্চিত ব্যক্তিই অর্চ্চক। ভগবানের পূজা অপেক্ষা ভক্তের পূজা, রামচন্দ্রের পূজা অপেক্ষা বজ্রাঙ্গজীর পূজা—বড়। গুরুকে লঙ্ঘন করিয়া—বৈষ্ণবকে লঙ্ঘন করিয়া বিষ্ণুপূজার আবাহন করিলে কয়েকদিন পরে চিজ্জড়নির্ব্ভেদবাদী অথবা ব্যুৎপরস্ত বা 'পৌত্তলিক' হইয়া যাইতে হয়। 'অর্চ্চন'—বাহ্য উপচার-মুখে এবং 'ভজন'—ভাবপথে কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হয়। যাঁহাদের নামভজনের বিষয়ে উপলব্ধি নাই, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তের পূজার বিধেয়ত্ব বুঝিতে পারে না।

বিষ্ণুর পূর্ব্বোক্ত পঞ্চস্বরূপ, সকলেই সমানধর্ম্মা—মূলদীপ হইতে যেরূপ বহু দীপের প্রজ্বলন, তদ্রূপ; মূলদীপ—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ। যেমন,—প্রথম দীপ হইতে প্রজ্বলিত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমাদি যে-কোনও একটী দীপ স্বমস্তবস্তুকে দগ্ধ করিতে সমর্থ, তদ্রূপ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বিষ্ণু বিগ্রহের যে-কোনও একটী স্বরূপের সহিত অপর বিষ্ণুবিগ্রহের তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই, কেবল লীলা-গত বৈচিত্র্য-ভেদমাত্র। কিন্তু বিষ্ণু হইতে বিকৃত হইয়া যদি ভগবদ্বস্তু প্রকাশিত হন, তবে তাদৃশ বহির্দ্দর্শনকে 'আবরণ' বা 'গুণাবতার' জানিয়া তাঁহাকে আর বিষ্ণুর সহিত সমতত্ত্বে গণনা করা যাইতে পারে না; যেমন, দুগ্ধ বিকৃত হইয়া দধি হইলে, দধিকে আর দুগ্ধের সহিত সমান জ্ঞান করা যাইতে পারে না, তদ্রূপ ক্ষীরোদকশায়ি-পর্য্যন্ত দুগ্ধোপম অর্থাৎ বিষ্ণু-তত্ত্ব। ক্ষীরকে অম্ল-সংযোগে বিকৃত করিবার চেষ্টা অর্থাৎ যে-স্থলে বিষ্ণুত্বের সহিত মানবের কাল্পনিক জ্ঞান মিশাইবার চেষ্টা প্রদর্শিত হয়, সেস্থানেই Henotheism বা পঞ্চোপাসনা।

ভগবানের শ্রীরূপ দর্শন করিতে হইলে, আমাদের রূপবিশিষ্ট হইতে হইবে। যদি তাঁহার সর্ব্বমোহন রূপ দর্শন করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের শ্রীরূপানুগ হওয়া চাই,—তাহাতে তিনি প্রীতি লাভ করেন। শ্যাম দেখেন শ্যামার রূপ, শ্যামা দেখেন শ্যামের রূপ—উভয়ের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান পরস্পরের রূপের দর্শন-লাভ ঘটে। আমরা যদি গুণী হই, তাহা হইলে ভগবানের গুণও উপলব্ধি করিতে পারিব।

শ্রীল রূপ গোস্বামীপ্রভু বলিয়াছেন (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে),—

"অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধ-তারকা-পালিঃ।
কলিতশ্যামা-ললিতো রাধা-প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি।।"

১। শ্যামা, ২। ললিতা, ৩। বৃন্দাবনেশ্বরী, এবং শ্যামার অনুগা, ললিতার অনুগা, শ্রীরাধার অনুগা—পরপর পর্য্যায়। রূপের সেবায় যদি তাদৃশ আনুগত্য আসে—যদি আমাদের উত্তরোত্তর সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হয়—আমরা যদি সর্ব্বসৌন্দর্য্যাকর শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমাদের উত্তরোত্তর অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারি, তবে আমরাও তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইব।

বর্ত্তমান-কালে অনর্থময় অবস্থায় দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণের ন্যায় আমাদের রামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য পর্য্যন্ত দর্শন করিবার অধিকার হয় না। আমাদের কুরূপ কোথা হইতে আসিল? আমাদের স্বরূপে ত' কুরূপ নাই! বাহিরের অনর্থ আসিয়াই আমাদের নিজের সুরূপ আবৃত করিয়াছে;—যে রূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতি বিধান করিব, আমাদের সেরূপ এখন আচ্ছাদিত হইয়াছে।

প্রেমভক্তি—সাধারণী শুদ্ধভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠা। ভগবানের শ্রীরূপ-গুণ-লীলায় পৌছিতে হইলে, আমার একটী কৃত্য আছে, কিন্তু আমি তাহাতেই অযোগ্য! কি-প্রকারে জীবগণ ভগবদ্ভজনের রাজ্যে অগ্রসর হইবেন, শ্রীগৌরসুন্দর তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আমার অযোগ্যতাই বড় ভরসা, আর ভরসা,—"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।"

শ্রীরূপানুগগণও বলেন,—আমার প্রভুই শ্রীরূপ। আমি যতই অযোগ্য হই না কেন, তবুও আমার দাস্য-নামে একটী কৃত্য আছে। শ্রীরূপানুগ শ্রীঠাকুর নরোত্তমও গাহিয়াছেন,—

"শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণ-ধন সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন।।
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছা-সিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র-জপ,
সেই মোর ধরম-করম।।
অনুকূল হবে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই-নয়নে।
সে রূপ-মাধুরীরাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে।।
তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহী,
চিরদিন তাপিত জীবন।

হা হা প্রভো! কর দয়া, দেহ' মোরে পদ-ছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ।।"

আমি অযোগ্য হইলেও পরম-ভাগ্যবান্! পূর্ব্বে বৈষ্ণবেরা তাঁহাদিগের কৃত্য বলিয়াছেন। আমার কৃত্য-পরিচয়ে বলি যে, আমিও যখন রূপানুগাভিমানিগণের ভৃত্য, তখন আমারও রূপানুগগণের পদানুসরণরূপ একটী কৃত্য আছে। শ্রীরূপানুগগণ—প্রচারক। শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী ও আজ্ঞা আমি শ্রবণ করিয়াছি (চৈঃ ভাঃ মধ্য ও চৈঃ চঃ আদি ও মধ্য),—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।"

☆ ☆ ☆ ☆

"যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার অজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।।
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ।।"
"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।।"

জগতে মায়ার কথা প্রবলবেগে চলিতেছে, হরিকথার বড়ই দুর্ভিক্ষ! হরিকথার শ্রবণে বা কীর্ত্তনে লোকের আদৌ উৎসাহ নাই! ইন্দ্রিয়সুখে আসক্তি হইলে 'পরম-ধর্ম' হইবে না, ইন্দ্রিয়-সুখকে নষ্ট করিলেও 'পরমধর্ম' হইবে না; (ভাঃ ১১।২০।৮),—

"ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।"

—বেশী বৈরাগ্যেও হইবে না, কম বৈরাগ্যেও হইবে না; পরন্তু, যুক্তবৈরাগ্যাশ্রয়ে ভগবানেরই সেবা করা চাই।

এই জগতে বিমুখ-জীবকুলের ভাগ্যের দোষে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা অপ্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যাহাতে তিনি সুপ্রাপ্য হন, তজ্জন্য শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন, —নামাশ্রয়ই একান্ত আবশ্যক। নামাশ্রয়দ্বারাই ক্রমশঃ ভগবানের রূপ-গুণ-লীলার স্ফূর্ত্তি-লাভ হয়। সেই শ্রীরূপেরই প্রিয়কিঙ্কর প্রভুপাদ শ্রীল জীব-গোস্বামী বলিয়াছেন, (ভক্তিসন্দর্ভে সংখ্যায়),—

"প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণ-পরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তন-স্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্।"

শ্রীনামই প্রেমের কলিকাস্বরূপ, ক্রমশঃ বিকশিত ও পূর্ণ বিকশিত হইয়া রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা-স্বরূপে প্রকাশিত হন এবং বস্তুসিদ্ধিকালে স্বরূপবিলাস প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীনামগ্রহণ-ব্যতীত আর অন্য কোন সাধন-পথ নাই; (ভক্তিসন্দর্ভে সংখ্যায়)— "যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি-সংযোগেনৈব কর্ত্তব্য।" 'নাম' করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হইবে—'নামাপরাধ' করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হয় না। অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভগবানের রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা শুদ্ধচিত্তে স্বয়ং প্রকাশিত হন। আমরা তখনই উন্নতোজ্জ্বলরস-প্রার্থী হইয়া 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'-পাঠের সুষ্ঠু অধিকার লাভ করিতে পারি।

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।।"

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে।।

'নমসা' এই পদ হ'তে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভক্তি ব্যতীত তাঁ'র কাছে পৌছান যায় না। কেউ বলতে পারেন,—'আমি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক; পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তার্কিক। আমি সমস্ত দর্শন অধ্যয়ন ক'রে ফেলেছি; আমি কেন বাসুদেবকে বুঝবো না! যা'রা আমাদের মত সুখে লালিত পালিত হয় নাই, আমাদের ন্যায় রাসায়নিক লেবোরেটারীতে (গবেষণাগারে) প্রবেশ করে নাই, আমাদের মত তর্কশাস্ত্র পড়ে নাই, তা'রা বুঝতে পারবে, আর আমরা তা' পারবো না!' কিন্তু বাসুদেব অধোক্ষজ বস্তু। তিনি নদীর জল ন'ন, গাছের ফল ন'ন, বা এইরকম রক্তমাংসের শরীরধারী নায়ক-নায়িকা ন'ন। তিনি নিজকে নিজে না জানালে কেউ তাঁ'কে জানতে পারে না। এ শক্তিটা তিনি স্বয়ং তাঁ'র নিজ হা'তে রেখে দিয়েছেন। যে বস্তুকে চোখ কাণ দিয়ে বুঝে' নিতে পারা যায়, সে জিনিষ তিনি ন'ন। বাহ্যজগতের পরমাণুবাদ প্রভৃতির ন্যায় তাঁ'কে যদি বিচার-গবেষণা-বিশ্লেষণ-দ্বারা বুঝে' নিতে পারা যে'তো তবে তিনি বাহ্যজগতেরই অন্যতম বস্তু হ'তেন। বাহ্য বিষয়ের অভিজ্ঞান হ'তে যে জ্ঞান উদিত হয়, সেই জ্ঞান-দ্বারা যে বস্তুটি বুঝা যা'বে, তিনি 'ভগবান্' ন'ন,—ভোগের বস্তু মাত্র। যাহারা ভগবদ্ভক্তিকে কর্মরাজ্যের একটি প্রকার-ভেদ মাত্র মনে করেন, তাঁরা অক্ষজজ্ঞানে প্রতারিত হ'য়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবান্ যে বস্তু, সত্য যে বস্তু, তা' গ্রহণ করতে পারেন না। অধোক্ষজবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করা আবশ্যক। আনুগত্যধর্ম-দ্বারা তাঁ'কে বুঝা যায়। কেবল অনুকরণবৃত্তি ত্যাগ ক'রে যদি মহাজনের পথ গ্রহণ করি, তাঁ'র অনুসরণ

করি, তবেই মঙ্গল হ'বে। ভগবান্‌কে খাজাঞ্চী করতে চেষ্টা করলে আমাদের কখনও মঙ্গল হ'বে না। যে দিন খাজাঞ্চী আমার মনের মত জিনিষগুলি যোগাতে না পারবে, সেই দিনই তাঁ'কে বরখাস্ত করবো। এরূপ বিচার হ'তেই নাস্তিক্যবাদ উপস্থিত হয়।

কৃষ্ণ শব্দটি রূপকত্বকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় না। অবিদ্বদ্‌রূঢ়িবৃত্তি পারমার্থিকের ভাবিত কৃষ্ণশব্দে আশ্রয় লাভ করিতে পারে না। যে সকল শব্দ চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বক, ও মনের দ্বারা সঙ্কীর্ণতা লাভ করিয়া ব্রহ্মেতর, পরমাত্মেতর বা ভগবদিতর বস্তুকে লক্ষ্য করে, কৃষ্ণ-শব্দে সেরূপ অভিজ্ঞান উদ্দিষ্ট হয় নাই। 'অধোক্ষজ', 'অপ্রাকৃত' ও 'অতীন্দ্রিয়', প্রভৃতি শব্দ সমূহ 'নেতি' ধারণায় প্রচারিত হওয়ায় মানবের মনঃকল্পিত তুলিকায় চিত্রিত ব্যাপারগুলি বাস্তব-সত্য হইতে পার্থক্য লাভ করিবার অজ্ঞতা-শক্তি সংরক্ষণ করে। ভূতাকাশের মিশ্রভাব যে-শব্দকে বিপন্ন করে, সেই শব্দ বাস্তব বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়া সাপেক্ষিতা ও সংখ্যাগত ধারণায় বস্তুসমৃদ্ধিকারী। বৃহদারণ্যক কথিত পূর্ণের 'সঙ্কলন', 'ব্যবকলন', 'গুণন', 'বিভজন' প্রভৃতি ব্যাপার-সমূহ একত্বের বিনাশক নহে।

বিষয় ও আশ্রয়ভেদে বৈচিত্রসমূহ অবস্থিত। নির্বিশিষ্ট-বিচারে যে বৈশিষ্ট্য মনোধর্ম্মদ্বারা সমাধান লাভ করে, তদ্দ্বারা জড়ত্রিপুটির বিনাশ-সম্ভাবনা নাই। ভগবত্তত্ত্ববস্তু অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়িত্বের ব্যাঘাত করে না। রৌদ্র ও ব্রাহ্মবিচার বৈষ্ণবতা হইতে যে জড়বৈষম্য প্রকাশ করে, উহা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত করে। সেই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে চিত্ত-বৈক্লব্য-রহিত হইয়া আলোচনা না করিলে ধ্যেয়, ধ্যাতা ও ধ্যানে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আবার বিঘ্ন-বিনাশের জন্য তাৎকালিক সাহায্যের প্রয়োজন লাভ করিতে গিয়া আবৃত-চেতনকে আশ্রয় করাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাহা হইলে সুরমূর্তির কালচক্রে ভ্রমণ-বিচার আমাদিগের কৈবল্যজ্ঞানে বাধা দিবে। 'কৃষ্ণ' শব্দের পরিচয় ত্রিগুণ-পরিচালিত কোন ভাষায় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচারে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দুর্বলা চিন্তা নাম নামীর-বাচক বাচ্যের অচিন্ত্য বৈচিত্র্য বুঝিতে দিবে না।

আমার প্রাপ্য চেতনকে নিঃশক্তিক করবার জন্য একটা চেষ্টার উপায় হ'য়ে থাকে। যা'কে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভাষায় 'বহিরঙ্গা শক্তি' বলে, সেই বহিরঙ্গা শক্তিরহিত বস্তুকে নির্ভেদজ্ঞানিগণ 'ব্রহ্ম' ব'লতে চান। তাঁ'রা Radio activity, Molecular theory হ'তে যে শক্তির পরিচয় পে'য়েছেন—চিদচিন্মিশ্র জগৎ হ'তে যে শক্তির পরিচয় পেয়েছেন, সেই শক্তিকে নিরাস ক'রে ব্রহ্মের কল্পনা করেন। কিন্তু যাঁ'রা বৃহৎ-এর সমগ্রতা দেখতে পান, তাঁ'রা 'ব্রহ্ম' শব্দে ভগবান্‌কেই জানেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় ব'ল্‌তে গেলে,—

'ব্রহ্ম' শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান'।

সাঙ্কর্ষণ-সূত্র 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা বিষ্ণুকে লক্ষ্য করেন। ভাগবতের শেষে* আমরা একটি শ্লোক দেখতে পাই,—

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্।।

শব্দ মাত্রেরই দ্বিবিধ বৃত্তি—বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি ও অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি। যে শব্দের বৃত্তি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শ্রীচৈতন্যদেব হ'তে তফাৎ হ'য়ে অন্য কিছু উদ্দেশ্য করে, তা'—শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ি। বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে সকল কথাই কৃষ্ণবাচক—কৃষ্ণোদ্দেশক। যে সকল শব্দ আমাদের ভৃত্যগিরি করে—আমাদের ভোগের কাজ চালিয়ে দেয়, সেই সকল ভোগসাধক শব্দ ভগবদ্বস্তু হ'তে পৃথক্ হ'য়ে অবিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি প্রকাশ ক'রে থাকে। 'কৃষ্ণ' শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদ্দিষ্ট হয়—গুণজাত জগতে 'কৃষ্ণ' শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়—'কৃষ্ণ' শব্দ দ্বারা গণগড্ডলিকা যা' বুঝেন, তা' কৃষ্ণ শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় নয়। ভাষান্তরে 'গড্', 'আল্লা' প্রভৃতি শব্দ, এমন কি, সংস্কৃত ভাষায় 'ঈশ্বর' 'পরমাত্মা' প্রভৃতি শব্দ কৃষ্ণ হ'ত মিশ্রিত একটা মহের (মহঃ অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জের) বাচক মাত্র। তাঁ'রা 'কৃষ্ণ' শব্দের পূর্ণমুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি ধারণ ক'রতে পারেন না। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।।

কৃষ্ণ যাঁ'কে দয়া করবেন, তিনিই তাঁ'র আবির্ভাব উপলব্ধি ক'রতে পারবেন। দয়া দুইপ্রকার—(১) সাধনাভিনিবেশজ, (২) কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণপ্রসাদজ। ভক্তের নিজের সম্পত্তিই কৃষ্ণ। ভক্তই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। কৃষ্ণ সেবোন্মুখব্যক্তির আত্মবৃত্তিতেই উদিত হন,–

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"

কৃষ্ণের ভক্ত কৃষ্ণকে দ্বারে-দ্বারে বিতরণ করেন—তাঁ'রা এতবড় বদান্য! কৃপণ লোক যেমন দুর্গোৎসব করে না, পাড়ার লোক জোর ক'রে বাড়ীতে প্রতিমা ফেলে' যায়, তখন বাধ্য হ'য়ে তা'র প্রতিমার পূজা করতে হয়, আমরাও সেরূপ কৃষ্ণভজনোৎসবে রুচিবিশিষ্ট না হ'লেও কৃষ্ণভক্তগণ সকল-লোকের দ্বারে-দ্বারে গিয়ে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ 'শ্রীনাম' বিতরণ করেন। ঠাকুর-পূজার জন্য কোন বাড়ীতে ঠাকুর ফেলে' যাওয়ার ন্যায় শ্রীগৌরসুন্দর সর্বচেতন-বস্তুর মৃগ্য বাস্তব-বস্তু শ্রীনাম সকলের দ্বারে-দ্বারে বিলিয়েছেন। তৃণ হ'তেও সুনীচ না হ'লে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা যায় না। 'নাম-সংকীর্তন' মানে—কৃষ্ণপ্রাপ্তি—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ছেড়ে' দেওয়া—নারদের "ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ"—বিদেহমুক্তি—জীবদ্দশায় মুক্তি—স্বরূপের সিদ্ধি। কৃষ্ণ যখন

* ভাঃ ১২।১৩।১২

বিদেহমুক্তি প্রদান করেন, তখনই তিনি বিশেষরূপে আকর্ষণ ক'রছেন, জানতে পারা যায়। অচিৎ এর ভোগে ব্যস্ত থাকলে তাঁহার আকর্ষণ উপলব্ধির বিষয় হয় না। দেহে আত্মবুদ্ধিই বিবর্তের স্থান। দেহে আত্মবুদ্ধি লইয়া আমরা মায়িকতত্ত্বকে 'কৃষ্ণতত্ত্ব' মনে করি। কৃষ্ণ—মানুষ, কৃষ্ণ—লম্পট, কৃষ্ণ—রাজনীতিজ্ঞ, কৃষ্ণ—ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কৃষ্ণ—আমাদের ভোগবুদ্ধিজাত ধারণায় স্বার্থপরতাযুক্ত,—এইসকল বিচার কৃষ্ণবিষয়ে অভিজ্ঞানের অভাব ও ভাগ্যহীনতার পরিচায়ক। কৃষ্ণই পরমপুরুষ, কৃষ্ণই পরম-সত্য, কৃষ্ণই বাস্তব বস্তু, কৃষ্ণই নিখিল-বেদ প্রতিপাদ্য বিষয়, কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা।

কৃষ্ণ—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অর্থাৎ তিনি কালাধীন অসৎ অচিৎ তত্ত্ব নহেন; তিনি নিত্য সদ্‌বস্তু, কাল তাঁহার অধীন। কালবিচারে তিনি—অনাদি; ব্রহ্মের প্রতীতি বা ধারণা—তাঁহার পরবর্তিনী ধারণা; তাঁহার আদিতে আর কেহ নাই। তিনি—গোবিন্দ; 'গো' অর্থে—পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, বিদ্যা, গাভী প্রভৃতি। এইসকলের মূল পালনকর্তা যিনি, তিনিই গোবিন্দ। সবিশিষ্ট চিদাকাশ-পরমাত্মা ও নির্বিশিষ্ট চিদাকাশ-ব্রহ্মকেও যিনি পালন করেন, তিনি—গোবিন্দ।

কতিপয় মানবের বুদ্ধিবৃত্তিকে নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচার, পরমাত্মা-বিচার, মানুষের হিতকারি গ্রাম্যদেবতা-বিচার প্রভৃতি আসিয়া স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে অর্থাৎ কতিপয় ব্যক্তি ঐসকলকেই চরমতত্ত্বরূপে মনে করিয়াছেন, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জৈবজ্ঞানের বিচারে তাদৃশ চরমতত্ত্ব (!) নহেন। তিনি পরিপূর্ণ সত্য ও চেতনময় বস্তু, তিনি বদ্ধজীবের জ্ঞানাতীত নিত্যানন্দ বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়া আছেন। তিনি নিঃশক্তিক-ব্রহ্ম-মাত্র নহেন। সমস্ত বৈচিত্র্য-ভাবসমূহের অস্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় তাঁহাতেই অবস্থিত; আবার, অভাবসমূহের অস্তিত্বও গৌণভাবে তাঁহাতেই অবস্থিত; সুতরাং ভাবাভাবরাজ্যের ভাববসমূহ তাঁহাতেই অবস্থিত। 'সৎ' বলিলে তাঁহাকেই বুঝায়। শুদ্ধচিদনুভূতির আনন্দবাধক বস্তুই 'অসৎ'; আর, নিত্যকাল আনন্দময় বস্তুই 'সৎ'।

তিনি—চিৎ অর্থাৎ পরিপূর্ণ-চেতনময়। অজ্ঞানী—জীবগণ তাঁহাদের ক্ষুদ্রজৈবজ্ঞানে মূর্খতা-ক্রমে যাহাকে 'শেষপ্রাপ্য' বলিয়া মনে করিয়াছেন, সেটি—অচিৎ, সেস্থানেও চেতন আবৃত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ণজ্ঞান—মূর্খ অভিজ্ঞানবাদিগণের (empericist দের ) বিচারের দ্বারা গম্য,—এইরূপ কথা হইতেই নির্বিশেষবাদ (impersonality ) উপস্থিত হয়। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববস্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ মাপিয়া লইবার বস্তু নহেন—তাঁহাকে মাপিয়া লওয়া যায় না; কারণ, তিনি মায়িক বস্তু নহেন। যাঁহাকে মাপিয়া লওয়া যায় না, সেই অদ্বয়তত্ত্বই জীবের অসম্যক্-প্রতীতিতে 'ব্রহ্ম', আংশিক প্রতীতিতে 'পরমাত্মা', পূর্ণপ্রতীতিতে 'বৈকুণ্ঠ বা শ্রীভগবান্'। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত

বলেন,—যাহা কিছু মাপিয়া লওয়া যায়, কখনও উহার অনুশীলন করিও না—উহা ভোগমাত্র।

> যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
> আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।
> তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
> ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো।।

'হে কমললোচন কৃষ্ণ, যাঁহারা সাধন করিতে করিতে 'আমরা মুক্ত হইয়াছি, অতএব আর ভগবচ্চরণসেবার আবশ্যকতা নাই—সেব্য, সেবক ও সেবার নিত্য পৃথক্ পৃথক্ অবস্থানের প্রয়োজন নাই',—এইরূপ বুদ্ধি করিয়া তোমার শ্রীচরণে অনাদর করেন, তাঁহারা যোগাদি নানাপ্রকার কৃচ্ছ্র সাধ্য সাধন-দ্বারা অনেক উন্নত পদবী লাভ করিয়াও ভগবচ্চরণে অপরাধহেতু সেই উচ্চ পদবী হইতে অধঃপতিত হন। কিন্তু হে মাধব, যাঁহারা তোমার নিত্য সেবা-প্রার্থী ভক্ত, তাঁহারা তোমাতে পরিনিষ্ঠিতবুদ্ধি হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে তোমার সহিত ঘনিষ্ঠ প্রেমযুক্ত, সুতরাং তাঁহারা সর্বদা তোমা-কর্তৃক রক্ষিত হন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের বিঘ্ন হওয়া ত' দূরের কথা, তাঁহারা বিঘ্নবিনাশকগণের মস্তকে পদার্পণপূর্বক নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।' ভক্তের বিনাশ নাই,—ভক্ত পরানন্দময়, সুতরাং কোন কালে ''ভক্তের বিনাশ নাই''—ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি''—ইহা গীতার বাক্য। পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান যাঁহার হৃদয়ে সর্বদা বিশ্রাম করেন তিনিও আনন্দময়।

পরিপূর্ণ আনন্দবিগ্রহ ''রসো বৈ সঃ''—শ্রুতি প্রতিপাদ্য রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় নিত্যধামে পঞ্চরসের বিষয়বিগ্রহরূপে সেবিত হন। যখন তিনি শান্তরসের বিষয়, তখন তাঁহার আশ্রয়—গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, যমুনা-পুলিন প্রভৃতি ; ইঁহারা অজ্ঞাতভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। ইঁহারা জানেন না—'আমরা কাহার সেবা করিতেছি।' শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন, গাভী হইতে দুগ্ধ পাইতেছেন, বেত্রদ্বারা গাভীপালকে তাড়ন করিতেছেন, কখনও বা বেণুবাদন করিতেছেন, কখনও যমুনার সৈকতরাশির উপরি পাদবিক্ষেপ করিয়া চলিতেছেন—তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সহায়ক হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। ''কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণা ত্যাগ—শান্তের দুই গুণে।'' জীবের যখন প্রাকৃত তৃষ্ণা-ত্যাগ হয় এবং 'কৃষ্ণ আছেন' এইরূপমাত্র অনুভূতি হয়, তখন শান্তরস। মুনিগণ শান্তরসের উপাসক,—তাঁহারা উপনিষদাদি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ''ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা'' হন। কিন্তু তাঁহাদের প্রাকৃত অভিনিবেশ দূর হইয়া চৈতন্যনিষ্ঠা-লাভের প্রাক্কালে শুদ্ধজীবানুভূতির সময়ে ভগবানের সহিত জীবের সমজাতীয়তার উপলব্ধিতে তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে ভগবানের সহিত সমবুদ্ধি হন, কিন্তু তখনও মমতার উদ্রেক না হওয়ায় অনেক সময় নিত্য আশ্রয়বিগ্রহ বা বিষয়বিগ্রহের

সহিত নিজকে একীভূত মনে করিয়া বসেন। যেমন, কোন দ্রষ্টা কোন পুরুষকে দূর হইতে নানাজাতীয়-বৃক্ষাদি-পরিশোভিত পর্বতমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কল্পনা করেন যে, ঐ ব্যক্তি অরণ্যের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেমন ঐ পর্বতপ্রবিষ্ঠ পুরুষ পর্বতে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষাদির শোভা পরিদর্শন করেন এবং সে সময় ঐ পুরুষের ঐ সকল হইতে একটি পৃথক্ অবস্থানও বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন-ব্যাপার অপগত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মলোকের অধোভাগে দেবীধামে স্থিত বহির্দ্দর্শী তর্কপন্থী লোকসমূহ বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা ধারণা করিতে না পারিয়া অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে, নির্বিশেষ, নিরাকার প্রভৃতি কল্পনা করিয়া থাকেন। সুতরাং শান্তরসটী ব্রহ্মসম্বন্ধে প্রথম রস অর্থাৎ জীবের সংসারতাপ-নিবৃত্তির পর পরব্রহ্মে অবস্থানমাত্র। ঐ অবস্থায় কিয়ৎ পরিমাণে জড়ব্যতিরেক-সুখ ব্যতীত স্বাধীন ভাব কিছু নাই। তখনও পরব্রহ্মের সহিত সাধকের কোনও সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই।

দ্বিতীয় রস—দাস্যরস; ইহাতে মমতা বিদ্যমান। 'আমি দাস ও ভগবান্ আমার নিত্য প্রভু' এবং প্রভুর ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য জীবাত্মার স্বাভাবিকী দাস্য-প্রবৃত্তি,—ইহাই দাস্যরসের লক্ষণ। দাস্যরসের আশ্রয়—রক্তক, পত্রক, চিত্রক, বকুল প্রভৃতি।

তৃতীয় রস—সখ্যরস। সখ্য দুইপ্রকার—গৌরব-সখ্য ও বিশ্রম্ভ-সখ্য। দাস্যরসে ও গৌরবসখ্যে সম্ভ্রমরূপ কন্টক বর্তমান। সম্ভ্রমের স্বভাব এই যে, উহা বিষয়কে আশ্রয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রাখে। বিশ্রম্ভসখ্য-রসের রসিক গোপবালক সখাগণ কৃষ্ণের ঘাড়ে চড়িতে, কৃষ্ণকে নিজের উচ্ছিষ্ট ফল খাওয়াইতে, তাঁহার সঙ্গে মারামারি করিতে কোনও দ্বিধা বোধ করেন না। বড়ই আপনার ভাব।

আবার দাস্য হইতে সখ্য যেমন শ্রেষ্ঠ—সখ্য হইতে বৎসল রসও তদ্রূপ আরও শ্রেষ্ঠ। জগতেও দেখা যায়, সমস্ত সখাগণ অপেক্ষা পুত্রই অধিকতর প্রিয় ও আনন্দোৎপাদক। নন্দ-যশোদা—সেই বৎসলরসের রসিক।

ঐশ্বর্য্যরসের বিষয়—শ্রীপতি নারায়ণ; আর মাধুর্য্য রসের পরম বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ। ঐশ্বর্য্যদ্বারা শিথিল প্রেমে কৃষ্ণের প্রীতি নাই; কেননা, ঐশ্বর্য্যরসের রসিকগণ বিচার করেন যে, বিশ্রম্ভভাব-দ্বারা বুঝি তাহাদের ভগবৎসেবা শ্লথ হইয়া পড়িবে। প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়,—বিশ্রম্ভ-সেবায় সেবার গাঢ়তা ও মমতার আস্পদের প্রতি আরও আপনার হইতে আপনার জ্ঞান অধিকতর বর্তমান।

নারায়ণ-পূজা ও শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রণালী একজাতীয় নহে। কৃষ্ণ গোপবালকের বিশ্রম্ভসখ্য-প্রেম আস্বাদন করিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পাল্যরূপে কখনও সখাগণকে স্কন্ধে বহন ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ভগবানের প্রেম-সেবা কেবলমাত্র পূজ্য-পূজক-বুদ্ধিতেই আবদ্ধ নহে। বিশ্রম্ভসখ্য ও বৎসল-রসের সেবা-প্রণালী অর্চনমার্গের অর্চকগণের বোধগম্য নহে। কান্তাগণের কথা, কান্তাগণের মধ্যে আবার সর্বকান্তা-

শিরোমণি বৃষভানুনন্দিনীর কথা আরও চমৎকারময়ী। কান্তাগণ কৃষ্ণের বংশীধ্বনির আহ্বান-শ্রবণে আত্মবিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণসমীপে ছুটিলেন—কোনও দিকে দৃষ্টিপাত নাই, —ঘরের সমস্ত কাজ পড়িয়া থাকিল,—যেমন অবস্থায় ছিলেন, ঠিক তেমন অবস্থায়ই উন্মাদিনী হইয়া কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে ছুটিলেন (ভাঃ ১০।২৯।৪-৮)

"নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোঽন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ।।
দুহন্ত্যোঽভিযযূঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ।।
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্।।
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ।।
তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ।।"

সেই গোপনারীগণের চিত্ত পূর্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত ছিল। সম্প্রতি কৃষ্ণের কামোদ্দীপক-বংশীসঙ্গীত-শ্রবণে, গোপবধূগণ পরস্পরের অগোচরে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ যেস্থানে আছেন, যত্নপূর্বক তথায় গমন করিলেন। গমনকালে বেগে তাঁহাদের কর্ণভূষণ কুণ্ডলগুলি দুলিতেছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণগীত-শ্রবণে নিজ-কার্য্য পরিত্যাগপূর্বক ঔৎসূক্যভরে যাত্রা করিলেন, কেহ কেহ চুল্লীর উপরিস্থিত দুগ্ধপাত্র বা গোধূম-কণের অন্ন না নামাইয়াই গমন করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ পরিবেশন, কেহ বা শিশুকে স্তন্য প্রদান, কেহ বা পতির শুশ্রূষা, কেহ বা ভোজন, কেহ বা অঙ্গরাগ সম্পাদন, কেহ শরীর মার্জন এবং কেহ বা লোচন যুগলে অঞ্জন প্রদান করিতেছিলেন। তাঁহারা তৎকালে নিজ নিজ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়াই ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিপরীতভাবে বসন-ভূষণাদি পরিধানপূর্বক কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পতি পিতা, ভ্রাতা এবং বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে বহু নিষেধ করিতে থাকিলেও তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন না, কারণ, তাঁহাদের চিত্ত গোবিন্দে আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহারা মোহিত হইয়াছিলেন।

আমাদের আত্মবৃত্তি যদি পরিস্ফুট হয়, তবেই আমরা ব্রজের কান্তা, ব্রজের পিতা-মাতা ও ব্রজের সখাগণের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবায় অধিকার পাইব।

এইসকল বাণী—অধোক্ষজ-বস্তুর সেবার কথা। কৃষ্ণকে 'সেবা' করিতে হইবে, কিন্তু কৃষ্ণে 'ভোগবুদ্ধি' করিতে হইবে না। 'ভোগবুদ্ধি' কিছু 'সেবা' নহে;—প্রাকৃত-সহজিয়ার 'কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি' কিছু 'অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা' নহে। ইন্দ্রিয় দ্বারা অধোক্ষজ-

কৃষ্ণকে ভোগ করা যায় না; এইজন্যই বলা হইয়াছে যে, 'জড়েন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহাকে সেবা করা যায় না'। কৃষ্ণের 'সেবা' কখনও জীবের ভোগ্য-ব্যাপার নহে।

''যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ ধন্যাতিধন্য-পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্রদুর্গমগতির্মধুসূদনোঽপি তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো দিশেঽপি।।''

'যে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর বস্ত্রাঞ্চল-সঞ্চলন-স্পৃষ্ট অনিল ধন্যাতিধন্য হইয়া কৃষ্ণের গাত্র স্পর্শ করায় যোগীন্দ্রগণেরও অতি-দুর্লভ শ্রীনন্দনন্দন আপনাকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর উদ্দেশে আমাদের প্রণাম বিহিত হউক'—এই কথাটী 'শ্রীরাধারসসুধানিধি'-গ্রন্থে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ স্বয়ং একজন যূথেশ্বরী; তিনি কৃষ্ণলীলায় তুঙ্গবিদ্যা। আমরাও শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের অনুগমনেই বৃষভানুকুমারীর অভিমুখে প্রণাম করিতেছি।

জগতে শোভা-সৌন্দর্য্য ও গুণের আধারস্বরূপ নানা প্রকার বস্তু বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—অখিল রসের ও শোভা-সৌন্দর্য্যাদি গুণের মূল সমাশ্রয়। তিনি—সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও জ্ঞানের মূল আশ্রয়তত্ত্ব। আবার, সেই পূর্ণতম ভগবান্—যাঁহার 'আশ্রয়' ও 'বিষয়', সেই স্বরূপটী যে কত বড়, তাহা মানবজ্ঞানের, এমন কি, অনেক মুক্তপুরুষগণেরও ধারণার অতীত। যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে সমস্ত জগৎ লালায়িত ও মোহিত, যিনি নিজের মাধুর্য্যে নিজেই মোহিত, সেই ভুবনমোহন মদনমোহনও যাঁহাদ্বারা মোহিত হন, তিনি যে কত বড় বস্তু, তাহা ভাষা-দ্বারা অপর-লোককে বুঝান যায় না।

যদিও কৃষ্ণ বিষয়তত্ত্ব, তথাপি তিনি আশ্রয়েরই 'বিষয়'। জড়-জগতে যে-প্রকার পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বস্তুতঃ পার্থক্য ও জড় সম্বন্ধ রহিয়াছে—উচ্চাবচ ভাব রহিয়াছে—পরস্পর ভেদ রহিয়াছে, শ্রীমতী রাধিকার ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সেই প্রকার ভেদ ও সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণাপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনী অশ্রেষ্ঠা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই 'আস্বাদক' ও 'আস্বাদিত'রূপে নিত্যকাল দুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন। যে কৃষ্ণের অপূর্ব সৌন্দর্য্যে তিনি স্বয়ংই মুগ্ধ হন, সেই কৃষ্ণ অপেক্ষা যদি শ্রীমতী রাধিকার সৌন্দর্য্য বেশী না হয়, তবে মোহনকার্য্য হইতে পারে না। শ্রীমতী রাধা—ভুবনমোহন-মনোমহিনী, হরিহৃদ্ভৃঙ্গ-মঞ্জরী, মুকুন্দ-মধুমাধবী, পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমা স্বরূপিণী এবং কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি-স্বরূপা অংশিনী। বৃষভানুনন্দিনীর তত্ত্ব জীবের বা জীব সমষ্টির ভাষায় বুঝান যায় না। সেবকের এরূপ ভাষা নাই,—যাহা সেব্য বস্তুকে সম্যক্ বর্ণন করিতে পারে। কিন্তু সেবকের তত্ত্ব বর্ণন করিতে সেব্যই সমর্থ; তাই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং আমাদিগকে শ্রীমতী রাধারাণীর তত্ত্ব জানাইতে পারেন। আর একজন আছেন, তিনিও গোবিন্দানন্দিনীর তত্ত্ব আমাদের

শুদ্ধাত্মার উপলব্ধির বিষয় করাইতে সমর্থা—যিনি বৃষভানুসুতা ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জন শ্রীগুরুদেব বা গৌরশক্তিগণ। যে কৃষ্ণচন্দ্র "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত-তনু" হইয়াছেন অর্থাৎ রাধিকার ভাব ও দ্যুতি গ্রহণ করিয়াছেন, সেইকৃষ্ণচন্দ্রই প্রপঞ্চে শ্রীমতীর মহিমার কথা প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার প্রিয়তম দাসগণও সেই পরম তত্ত্ব বলিতে পারেন, তদ্ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই সমর্থ নহেন।

পূর্বে জগতে যেরূপ বৃষভানুরাজকুমারীর কথা প্রচারিত হইয়াছিল অর্থাৎ আচার্য্য নিম্বার্কপাদ ও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতিকে শ্রীরাধাগোবিন্দের যেরূপ সেবা-প্রণালীর কথা বলিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমতীর মহিমা প্রপঞ্চে তত সুসমৃদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মাধ্যাহ্নিক-লীলায় যাঁহাদের আদৌ প্রবেশাধিকার ছিল না, তাঁহাদের নিকটই শ্রীরাধাগোবিন্দের ঐরূপ নৈশ লীলা কথা বহুমানিত হইয়াছিল। কলিন্দতনয়া-তটে নৈশ-বিহারের কথা—যাহা শ্রীনিম্বার্কপাদ কীর্তন করিয়াছেন, তাহা হইতে শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রিয়তম শ্রীল রূপপাদ ও তদনুগগণ-কথিত শ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক-লীলা-মধুরিমার উৎকর্ষের কথা তারতম্যবিচারে অনেক উন্নত ও সুসম্পূর্ণ। দ্বৈতাদ্বৈত-বিচার হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারাশ্রিত রসের উৎকর্ষের কথা, গোলোকের নিভৃত স্তরের কথা, রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জের নিকটবর্ত্তী চিন্ময়-কল্পতরুতলে নবনবায়মান অপূর্ব বিহার-কথা গৌরসুন্দরের পূর্বে কোন উপাসক বা আচার্য্যই সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা কেহ কেহ রাসস্থলীর লীলার কথা-মাত্র অবগত ছিলেন; কিন্তু মধ্যাহ্নকালে বৃষভানুনন্দিনী কি-প্রকার কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ করিয়া থাকেন, পূর্বে কাহারও সেই মাধুর্য্য- সৌন্দর্য্যসেবায় অধিকার ছিল না। বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অনূঢ়া ও পরোঢ়া প্রভৃতি বহু বহু কৃষ্ণসেবিকা রাসস্থলীতে যোগদানের অধিকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরূপ-কথিত 'দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্ক-পূজাদি-লীলৌ'-পদ নির্দ্দিষ্ট লীলা-পরা-কাষ্ঠায় প্রবেশ-সৌভাগ্যের কথা মধুর-রস-সেবী গৌরজন গৌড়ীয় ব্যতীত অন্যের যে লভ্য নহে; —এ কথা নিয়মানন্দ-সম্প্রদায়ের কাহারও জানা নাই।

শ্রীমতীর পাল্যদাসীর উন্নত-পদবী-সন্দর্শন মানবজ্ঞানের অন্তর্গত নহে। বার্ষভানবীর নিত্যকাল অন্তরঙ্গ-সেবা-নিরত নিজ জন ব্যতীত এ-সকল কথা কেহ কখনও কোনক্রমেই জানিতে পারেন না। যে-দিন আপনাদের কোনরূপ বাহ্যজগতের অনুভূতি থাকিবে না, তুচ্ছ নীতি, তপঃ, কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদির চেষ্টা থুৎকারের বস্তু বলিয়া মনে হইবে, ঐশ্বর্য্য প্রধান শ্রীনারায়ণের কথাও ততদূর রুচিকর বোধ হইবে না, রাসস্থলীর নৃত্যও তত বড় কথা বলিয়া বোধ হইবে না, সেইদিনই আপনারা এইসকল কথা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার কথা এদেশের ভাষায় বলা যায় না। 'স্বকীয়া', পারকীয়া শব্দগুলি বলিলে আমরা উহা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ধারণার সহিত মিশাইয়া

ফেলি। এইজন্যই শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলা-কথা বলিবার, শুনিবার ও বুঝিবার অধিকারী বড়ই বিরল,—জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

একশ্রেণীর প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরূপপাদ পারকীয়া সেবায় উন্মত্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীজীব সেরূপ নহেন। সেই অক্ষজধারণাকারিগণ ভোগপরতা ক্রমে বিচার করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করেন, প্রকৃত কথা সেরূপ নহে। শ্রীরূপানুগ প্রবর শ্রীজীবপাদ শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর স্থানেই আচার্য্য-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীজীবপাদ 'গোপালচম্পূ'-গ্রন্থে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিবাহ-কথা বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া এবং সন্দর্ভাদি-গ্রন্থে তিনি বিচার প্রধান মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়াই প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায় শ্রীজীব-পাদ-কর্তৃক শ্রীরূপ-প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ পারকীয় বিচার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মিথ্যা কল্পনা বা আরোপ করেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে, ঘটনা তাহা নহে। আমরা দুই-তিন-শত বৎসর পূর্বের প্রাকৃত-সাহজিকগণের ঐতিহ্যে এইরূপ কুবিচার লক্ষ্য করি। আজও প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্রদায়ে সেই উদ্‌গার প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীজীবপাদ—শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়গণের আচার্য্য; তিনি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবগণকে কুপথ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রুচিবিকৃতি যাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে, অপ্রাকৃত চিদ্বৈচিত্র্যের কথা বুঝিবার সামর্থ্য যাহাদের নাই, সেইসকল জড়স্তব্ধ লোক যাহাতে মহা-অসুবিধার মধ্যে না পড়িতে পারে, তজ্জন্যই শ্রীজীবপাদ ঐরূপ সুসিদ্ধান্ত-বিচার দেখাইয়াছেন। যাঁহারা নীতির পরা-কাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অতি কঠোর বৈরাগ্য ও বৃহদ্‌ব্রতধর্মযাজনের পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন—এইরূপ ব্যক্তিগণও যে আশ্চর্য্য-লীলার এক কণিকাও বুঝিতে সমর্থ নহেন, সেইরূপ পরম-চমৎকারময়ী চিন্ময়ী পারকীয়া লীলা অনধিকারি জনগণ বুঝিতে অসমর্থ হইবে বলিয়াই শ্রীজীবপাদ কোনও-কোনও-স্থলে তত্তদধিকারীর যোগ্যতানুসারে নীতিমূলক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা কৃষ্ণ-ভজনে কোনপ্রকার দোষ আসে নাই। গোপালচম্পূ-বর্ণিত রাধাগোবিন্দের বৈধ-বিবাহ—তাঁহাদের পারকীয় ভাবের প্রতি আক্রমণ নহে। পারকীয়রসের পরমশ্রেষ্ঠা নায়িকা বৃষভানুসূতা মায়িক অভিমন্যুর সহিত প্রাজাপত্য-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে পতিবঞ্চনা করিয়া, সর্বক্ষণ অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রাকৃত বিচার-পরিপূর্ণ-মস্তিষ্কযুক্তসহজিয়াগণ মনে করিতে পারেন যে, শ্রীমতী রাধিকা প্রাকৃত-জার-রতা ছিলেন; কিন্তু অরুন্ধতী অপেক্ষাও বৃষভানুনন্দিনীর পাতিব্রত্য অধিক;—বার্ষভানবী হইতেই সমগ্র পাতিব্রত্যধর্ম উদ্ভূত হইয়াছে। যাবতীয় সুনীতির মূলবস্তু বৃষভানুনন্দিনীর পাদপদ্মেই আবদ্ধ; (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ),—

"যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম বাঞ্ছে' অরুন্ধতী।"

শ্রীকৃষ্ণ—সকল বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী; শ্রীমতীও সকল মহালক্ষ্মীর অংশিনী। অংশী অবতারিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রাভব, বৈভব ও পুরুষাদি অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ অংশিনী শ্রীমতী রাধিকাও লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণকে বিস্তার করেন। শ্রীকৃষ্ণই সর্বপতি এবং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই তাঁহার নিত্যকাল পরিপূর্ণতম-সেবাধিকারিণী; সুতরাং তিনি নিত্যকান্তাশিরোমণি ব্যতীত অন্য কিছু নহেন।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'বিষয়'; স্থায়ি-রতিবিশিষ্ট যাবতীয় জীবাত্মা—সেই ভগবত্তত্ত্বেরই 'আশ্রয়'। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পঞ্চপ্রকার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতি বা স্থায়িভাব—জীবাত্মার স্বরূপসিদ্ধ। এই স্থায়িভাবস্বরূপা রতি স্বয়ং আনন্দরূপা হইয়াও সামগ্রীর মিলনে রসাবস্থা লাভ করেন। সামগ্রী চারিপ্রকার—(১) বিভাব, (২) অনুভাব (৩) সাত্ত্বিক, (৪) ব্যভিচারী বা সঞ্চারী। রত্যাস্বাদনহেতু-রূপ বিভাব দুই-প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুইপ্রকার—বিষয় ও আশ্রয়। যিনি—রতির বিষয় অর্থাৎ যাঁহার প্রতি রতি ক্রিয়াবতী, তিনি 'বিষয়' রূপ আলম্বন অর্থাৎ বিষয়রূপ আলম্বনই রতির আধেয় এবং যিনি—রতির আধার অর্থাৎ যাঁহাতে রতি বর্তমান, তিনিই 'আশ্রয়রূপ আলম্বন।

বৈকুণ্ঠাদি-ধামে ত্রিবিধ কালই যুগপৎ বর্তমান। বৈকুণ্ঠাদি লোকের হেয় প্রতিফলন-স্বরূপ এই জড়-জগতে যেমন ভূত-কাল বা ভাবি-কালের সৌভাগ্য বর্তমানকালে অনুভূত হয় না, মূল আকর-স্থানীয় অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদি ধামে তদ্রূপ নহে; তথায় সমস্ত সৌভাগ্য একই কালে যুগপৎ অনুভূত হইয়া থাকে।

গোলোকে অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'বিষয়' ও অনন্তকোটি জীবাত্মাই তাঁহার 'আশ্রয়'। আশ্রয়গণ কিছু 'বিষয়' হইতে পৃথক্ বা দ্বিতীয় বস্তু নহেন; তাঁহারা—অদ্বয়জ্ঞান বিষয়েরই 'আশ্রয়'। বস্তুত্বে 'এক' ও শক্তিত্বে 'বহু',—ইহাই বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। অক্ষজ-ধারণাকারী সাহজিকগণ এই বিষয় ও আশ্রয়ের কথা বুঝিতে অসমর্থ। নির্বিশেষবাদিগণের নিকট বিষয় ও আশ্রয়গণের স্থান নাই। শ্রীল নরহরিতীর্থের পূর্বাশ্রমের অধস্তন বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্য-দর্পণ'-নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা এতদূর সুষ্ঠুভাবে বলিতে পারেন নাই; এমন কি, 'কাব্যপ্রকাশ'-কার বা ভরত-মুনিও তাহা বলিতে অসমর্থ হইয়াছেন। শ্রীল রূপপাদের লেখনীতে অপ্রাকৃত বিষয় ও আশ্রয়ের কথা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান বিষয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনে অনন্তকোটি জীবাত্মা আশ্রয়রূপে বিরাজমান থাকিলেও মূল আশ্রয়তত্ত্ব (বিগ্রহ)—পাঁচটী; মধুর-রসে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, বাৎসল্য-রসে নন্দ-যশোদা, সখ্য-রসে সুবলাদি, দাস্য রসে রক্তকাদি, এবং শান্তরসে গো, বেত্র ও বেণু প্রভৃতি। শান্তরসে সঙ্কুচিত-চেতন চিন্ময় গো, বেত্র, বেণু, কদম্ববৃক্ষ এবং যামুনসৈকত প্রভৃতি অজ্ঞাতভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর সেবা করিতেছেন।

যাঁহাদের বহির্জগতের কথায় সময় নষ্ট করিবার অবসর আর নাই, তাঁহারাই এইসকল কথার মর্ম বুঝিতে পারেন। শ্রীল রূপপাদ ইহা দেখাইবার জন্যই বিষয়ত্যাগের অভিনয় করিয়া শুষ্ক রুটী ও চানা চিবাইয়া এক-এক বৃক্ষতলে এক-এক রাত্রি বাস করিয়া 'কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগে'র আদর্শ দেখাইয়া এইসকল কথা বুঝিবার অধিকার ও যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন। আমরা যে-স্থানে ও যে-ভূমিকায় অবস্থান করিতেছি, তাহাতে কৃষ্ণপ্রণয়মূর্তি শ্রীরাধার তত্ত্বকথা আমাদের স্থূল-জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে না। বৃষভানুনন্দিনী—আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবস্তু। যে-রাজ্যে স্থূলজগৎ সূক্ষ্মজগৎ বা নির্বিশেষ চিন্মাত্রের অনুভূতি নাই, যে-অপ্রাকৃতধামে চিদ্বিলাস চমৎকারিতা পরিপূর্ণরূপে বর্তমান, শ্রীরাধিকা তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বর্তমান। তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণবক্ষে আরোহণ করেন, তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণকে তাড়ন ও ভর্ৎসন পর্য্যন্ত করেন। এইসকল কথা সামান্য মানব-যুক্তির উন্নতস্তরে অধিরোহণ করিবার কথা নয়, নির্বিশেষবাদীর চিন্মাত্র-পর্য্যন্ত কথা নয়; পরন্তু যাঁহার কৃষ্ণসেবার জন্য, লৌল্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই কেবল আত্মবৃত্তিতে এইসকল কথার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীমতী রাধিকা—স্বয়ংরূপ-শ্রীকামদেবের স্বয়ংরূপা কামিনী। স্বয়ং শ্রীরূপ-গোস্বামী—যাঁহার অনুগত, সেই বৃষভানুনন্দিনী—যাবতীয় অপ্রাকৃত নারীকুলের মূল আকর-বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অংশী, শ্রীমতীও তদ্রূপ অংশিনী; শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর স্বরূপ-বর্ণনে পাই—"কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি-সখী আশ-পাশ"। সহস্র-সহস্র গোপীর যুথেশ্বরীগণ, মূল অষ্টসখীর সহস্র-সহস্র পরিচারিকা-বৃন্দ বৃষভানুনন্দিনীর সর্বক্ষণ সেবা করিতেছেন। মনোবৃত্তিরূপা সখীগণ আটপ্রকার—(১) অভিসারিকা, (২) বাসকসজ্জা, (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) খণ্ডিতা, (৫) বিপ্রলব্ধা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিতভর্তৃকা এবং (৮) স্বাধীনভর্তৃকা।

বৃষভানুনন্দিনী বিভিন্ন সেবিকাগণের দ্বারা সেব্যের বিপ্রলম্ভ সমৃদ্ধ করিয়া চিদ্বলাস-চমৎকারিতা উৎপাদন করেন। বৃষভানুনন্দিনীর আটদিকে আটটী সখী। বার্ষভানবী—যুগপৎ অষ্টসখীর অষ্টভাবে পরিপূর্ণা। কৃষ্ণ যে ভাবের ভাবুক, যে-রসের রসিক, যে-রতির বিষয়, কৃষ্ণ যখন যাহা যাহা চা'ন, সেইসকল ভাবের পরিপূর্ণ উপকরণরূপে কৃষ্ণেচ্ছাপূর্তিময়ী হইয়া অনন্ত-কাল শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবা-রসে নিমগ্না।

শ্রীকৃষ্ণে চতুঃষষ্টি গুণ পরিপূর্ণরূপে শুদ্ধচিন্ময়-ভাবে সর্বদা দেদীপ্যমান। শ্রীনারায়ণে ষষ্টি গুণ বর্তমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে তাহা আরও অত্যদ্ভুতরূপে বিরাজমান। আবার, শ্রীকৃষ্ণ যে অপূর্ব চারিটী গুণের নায়ক, তাহা শ্রীনারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ—সর্বলোক-চমৎকারিণী লীলার কল্লোল-বারিধি; তিনি—অসমোর্দ্ধরূপশোভা-বিশিষ্ট; তিনি—ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষি-মুরলী-বাদনকারী; তিনি—শৃঙ্গার রসের অতুল প্রেম-

দ্বারা শোভা-বিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডলের সহিত বিরাজমান; অর্থাৎ তিনি ক্রীড়া (লীলা) মাধুরী, শ্রীবিগ্রহ (রূপ) মাধুরী, বেণুমাধুরী ও সেবক-মাধুরী—এই চারিটি অসাধারণ গুণ লইয়া নিত্যধামে বিরাজমান। এই চারিটি গুণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত নারায়ণে পর্য্যন্ত নাই।

এই জড়-জগৎ চিদ্ধামেরই বিকৃত প্রতিফলন। চিদ্ধামে একজন সেব্য, সকলেই তাঁহার সেবক; আর, অচিজ্জগতে সেব্য ও সেবকের সংখ্যা বহু। চিদ্ধামে একমাত্র সেব্য-বস্তুর সুখতাৎপর্য্যই সেবকগণের নিত্য-চিন্ময় স্বার্থ। সেই চিদ্ধামেরই বিকৃত প্রতিফলন এই অচিজ্জগতে বহু সেব্য ও বহু সেবক ছিল, আছে ও থাকিবে। এই জড়জগতে সেবক ও সেব্যের স্বার্থ—পরস্পর ভিন্ন। এখানে সেবক নিজের সুখের বিঘ্নকর হইলেই সেব্যের সেবা পরিত্যাগ করিয়া থাকে; অর্থাৎ এককথায়, এইস্থানে সেব্য ও সেবকের নিঃস্বার্থপরত্ব নাই এবং এইস্থানে সমস্তই এক-তাৎপর্য্যের অভাব বা ব্যভিচার-দোষ দুষ্ট। পত্নী পতির সেবা করিয়া থাকে—নিজের অনিত্য স্বার্থের জন্য, এবং পতি পত্নীকে ভালবাসিয়া থাকে--নিজের ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অর্থাৎ পতির স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ—এক নহে। এইস্থানে যত-বড় সতী স্ত্রী বা যত নীতিপরায়ণ স্বামীই হউন না কেন, দেহধর্ম ও মনোধর্মে তাঁহারা আবদ্ধ থাকেন বলিয়া তাঁহাদের চেষ্টা—হৈতুকী, অনৈকান্তিকী ও অব্যবসায়াত্মিকা। আত্মধর্ম একমাত্র কৃষ্ণসেবা ব্যতীত কোথাও অব্যভিচারিণী সেবা নাই। এই জড় প্রপঞ্চের পুত্রের প্রতি পিতামাতার যে স্নেহ, মাতাপিতার প্রতি পুত্রের যে শ্রদ্ধা দেখা যায়, তন্মধ্যেও স্থূল বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়তর্পণ-স্পৃহা বা ব্যভিচার। দেহ ও মনের রাজ্যেই পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধ, সুতরাং শুদ্ধ-সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না।

যে-স্থানে অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দন একটীমাত্র শক্তিমান্ পুরুষ বা বিষয়তত্ত্ব—যেস্থানে আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই, সেস্থানে আর ব্যভিচার হইতে পারে না। সেস্থানে 'বিষয়' এক 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'; শক্তি অনন্ত অর্থাৎ শক্তিমত্তত্ত্বে ও শক্তিতত্ত্ব-বিচারে অদ্বয়জ্ঞান বিষয়ের বা বস্তুর একত্ব, আশ্রয় বা শক্তির অনন্তত্ব। শ্বেতাশ্বতর (৬।৮) বলেন,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।।"

অদ্বয়জ্ঞান শক্তিমৎ-তত্ত্ববস্তু 'এক' হইলেও শক্তি বিবিধ হওয়ায়, শক্তিবিচারে বিশেষ-বিশেষ ধর্ম বর্তমান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শক্তিবৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছেন অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে বস্তুর অদ্বয়ত্ব ও শক্তির বৈশিষ্ট্য স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাতে আশ্রয়জাতীয়ত্ব-রহিত কেবলাদ্বৈতপর বিচার নাই।

এই দেবীধামে ভোগ্যবস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায়। সেই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্যে অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের অধীশ্বরী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীও তাঁহার পরিকরগণের অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ-রসের রসিক আশ্রয়তত্ত্বসমূহের সহিত বিষয়তত্ত্বের কেহ

যেন গোলমাল না করিয়া ফেলেন। আলঙ্করিকের পরিভাষা 'বিষয়' ও 'আশ্রয়'—দার্শনিক-ভাষায় 'শক্তিমান্' ও 'শক্তি', ভক্তের ভাষায় 'সেব্য' ও 'সেবক' বলিয়া উক্ত হন; আমরা যদি নিত্য আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে পারি, তাহা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়ের সন্ধান পাইব। বৃষভানুনন্দিনীর 'সুদুর্লভাদপি সুদুর্লভ' চরণাশ্রয়—বিভিন্নাংশ জীবের পক্ষে যে কত বড় লোভনীয় ব্যাপার, তাহা শ্রীগৌরলীলার পূর্বে এরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় নাই। 'রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত' 'অনর্পিতচর-প্রেম-প্রদাতা' 'মহাবদান্য' শ্রীগৌরসুন্দরই এই গুহ্যতম কথা জগজ্জীবকে সুষ্ঠুভাবে জানাইয়াছেন।

আচার্য্য নিম্বার্কপাদ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর উপাসনার কথা বলিলেও তাহাতে ততদূর সুষ্ঠুতা প্রদর্শিত হয় নাই; কারণ, তাহাতে স্বকীয়বাদের কথা উল্লেখ থাকায় বস্তুতঃ তাহা রুক্মিণীবল্লভের উপাসনা-তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৪৭-৪৮; ম ৮।২২৯),—

"পরকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।।
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তাঁ'র মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি।।"

☆ ☆ ☆ ☆

"গোপী-আনুগত্য বিনা, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে।।"

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের আনুগত্যবিচারে লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল কৃষ্ণকর্ণামৃতগ্রন্থে মধুর-রসাশ্রিত লীলার কথা কীর্তন করিলেও তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত বৃষভানুসুতার মাধ্যাহ্নিক-লীলার পরম-চমৎকারিতা প্রদর্শিত হয় নাই; এমন কি, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থেও উহা কীর্তিত হয় নাই।

শ্রীজয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে শ্রীমতী বার্ষভানবী রাসক্রীড়া-কালে 'সাধারণী' বিচারে অন্যান্য গোপীগণের সহিত সম-পর্য্যায়ে গণিতা হওয়ায় অভিমানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাসস্থলী পরিহারপূর্বক শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সঙ্গলাভাশায় কৃষ্ণকর্ত্তৃক একমাত্র তাঁহারই অনুসন্ধান-কার্য্যের দ্বারা, শ্রীমতী যে কিরূপ কৃষ্ণাকর্ষিণী, তাহাই প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

বৃষভানুনন্দিনীর গূঢ় কথা শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিতরূপে উক্ত হইয়াছে। শ্রীমতী রাধিকার কথা অতীব গোপনীয় ও গুহ্য ব্যাপার বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব অর্বাচীন বহির্ম্মুখ পাঠকগণের নিকট ঐরূপ অস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীবার্ষভানবী—জগন্মাতা; তিনি—যাবতীয় শক্তিজাতীয় বস্তুসমূহের জননী; তিনি—বিভিন্ন শক্তি-পরিচয়োত্থ ধর্ম ও সংজ্ঞা-সমূহেরও আকর; তিনি—স্বয়ংরূপ-পরমেশ্বর-

কৃষ্ণের পরমেশ্বরী 'পরা-শক্তি'। 'শক্তিমদ্বস্তু' বলিতে যাহা বুঝায়, 'শক্তি' বলিতেও তাহাই বুঝায়। শ্রীমতী—বলদেবাদিরও পূজ্যা; শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী-পর্য্যন্ত শ্রীমতী রাধিকার সেবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। এই শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীই শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব প্রভুর অভিন্নবিগ্রহ ঈশ্বরী বলিয়া বিখ্যাত।

যাঁহারা বার্ষভানবীর শ্রীচরণাশ্রয়কে পরম-লোভনীয় বলিয়া জ্ঞান না করেন, তাঁহাদের বিচারে ধিক্। বার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণই পরমধন্য। সেই বার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণের সুমহান্ আশ্রয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের পরম-মঙ্গল হইবে। অতএব,—

"দিব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।।"

'অপ্রাকৃত জ্যোতির্ময় বৃন্দাবনে চিন্ময় কল্পতরুর তলে রত্নমন্দিরস্থিত সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং সেবা-পরা শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি ও শ্রীললিতাদি প্রিয় নর্মসখীগণের দ্বারা পরিবৃত শ্রীরাধাগোবিন্দকে আমি স্মরণ করিতেছি।' যাঁহার জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলা, যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রধানা নায়িকা—যিনি আশ্রয়তত্ত্ব বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, তাঁহারই নাম শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে উল্লেখ নাই কেন?—ইহা অনেকেরই হৃদয়ে প্রশ্ন হইয়া থাকে। শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়াই লীলার পরমগোপনীয়ত্ব-বিচারে শ্রীব্যাসদেব অনধিকারি-সাধারণ শ্রোতা ও পাঠকদিগের নিকট হইতে গোবিন্দ-প্রেমিক গণের পক্ষেও পরম-দুর্লভ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাস্য শ্রীরাধাতত্ত্ব গোপন রাখিবার জন্য সেই তত্ত্বের উল্লেখ প্রকাশ্যভাবে করেন নাই। মর্কটের নিকট মুক্তার মালা প্রদান না করিয়া গোপন রাখা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে? আবার, পরমহংস ভক্তকুলের জন্য যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে শ্রীরাধার বিষয় কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই তাহাও নহে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে শ্রীগৌরাবতারের কথা ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর কথাও অতিগোপ্য রহস্যভাবে উক্ত হইয়াছে; —১০।৩০।২৮ (ভাঃ)

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।।"

ষোড়শসহস্র গোপী শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলীতে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্তা। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিবলে দুই-দুইটী গোপীর মধ্যে এক-একটি মূর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক গোপীমণ্ডলমণ্ডিত হইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত। শ্রীমতীর অভিমান হইল,— তবে কি আমি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা সেবিকা নহি? আমাকে না হইলেও কি শ্রীকৃষ্ণের চলিতে পারে? ষোড়শ সহস্র গোপিকাই ত তাঁহার সেবা সম্পূর্ণভাবে করিতে পারেন? সেই ষোড়শ সহস্র সেবিকা, যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের জন্য লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম,

কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ, আর্য্যপথ, নিজেদের পরিজন-প্রীতি, স্বজন তাড়ন, ভর্ৎসন, ভয়—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব-দ্বারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতেছেন, যদি আমার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেও ত্যাগ করিতে পারেন, তবেই বুঝিব যে, 'আমি শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ সেবিকা' সেইরূপ মনে করিয়া শ্রীমতী রাধিকা রাসস্থলী পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের রাস বন্ধ হইল। যাঁহার জন্য সব—যাঁহার জন্য রাস, যিনি না হইলে রাসোৎসব আরম্ভই হইত না, তাঁহার অনুপস্থিতিতে বন্ধ হইবে না কেন? গোবিন্দও সেই প্রিয়তমা ও প্রধানা নায়িকার অনুসন্ধান করিবার জন্য রাসস্থলী পরিত্যাগ করিলেন। তখন গোপীগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—'হে সহচরি, আমাদিগকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন।'

শ্রীরাধিকা বিনা অন্যসমস্ত গোপী একত্র মিলিয়াও কৃষ্ণের সুখের কারণ হইতে পারেন না। রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারস বৃদ্ধি করিবার জন্যই আর সব গোপীগণ রসোপকরণ-স্বরূপা। শ্রীজয়দেব-গোস্বামিপাদ শ্রীগীতগোবিন্দে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ।।

কংসারি কৃষ্ণ সম্পূর্ণসাররূপা রাসলীলা-বাসনাবদ্ধা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া ব্রজসুন্দরীগণকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া গেলেন।

অনূঢ়া গোপীগণ—কাত্যায়নী পূজারত গোপীগণ—পরোঢ়া গোপীসকল, গোপীগর্ভে আবির্ভূত দণ্ডকারণ্যবাসী ষাট হাজার ঋষিগণ বংশীধ্বনি শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া যমুনাতটে রাসনৃত্যে আগমন করিয়াছিলেন। যমুনাতটের এই নৈশরাসে সর্ব্বপ্রকার গোপীর সমাবেশ হইয়াছিল। তাহাতে বৃষভানু নন্দিনীর কোনও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হইতে পারে নাই। তাই কৃষ্ণ বৃষভানুনন্দিনীকে তাঁহার নিজস্ব অনুচরীগণের সহিত লইয়া গিয়া রাধাকুণ্ডতটে মাধ্যাহ্নিক-রাসে বিহার করিয়াছিলেন।

শ্রীরামাবতারে দণ্ডকারণ্যস্থিত ষষ্টিসহস্র ঋষি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কোটিকন্দর্প-বিজিত অপ্রাকৃত মনোমোহন রূপ সন্দর্শন করিয়াও গোপীদেহ লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া গোপীর আনুগত্যে বহুবৎসরব্যাপী তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় গোপীদেহ লাভ করেন। গোপীদেহ প্রাকৃত রক্তমাংসের থলি নহে, তাঁহাদেরও শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় সচ্চিদানন্দময় তনু। সেই তাপস ঋষিগণের জটাজুটমণ্ডিত মস্তক, সাধনক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ প্রাকৃতবিচারযুক্ত দেহ শ্রীভগবানের নয়নোৎসব বিধান করিতে পারে না এবং তাঁহার শান্ত, দাস্য বা গৌরব-সখ্যে ভগবানের যে সেবা করিয়াছেন,

তাহাতে গোপীভজনের চমৎকারিতা ও মাধুর্য্য নাই বলিয়াই তাঁহারা নিত্যচিদানন্দময়ী গোপীতনু লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। গোপীগণের সচ্চিদানন্দময় দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতি অংশ, প্রতি হাব-ভাব শ্রীগোবিন্দের সেবানুকূল।

দাস্য-রসের রসিক রক্তক, পত্রক, চিত্রক যে রসের আস্বাদন করিতে পারেন না, সখ্যরসে—শ্রীদাম, সুদাম,দাম, বসুদামাদি গোপবালকগণ যে রসের মধুরিমা আস্বাদন করিতে পারেন না, সখ্যরসে—শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদামাদি গোপবালকগণ যে রসের মধুরিমা আস্বাদন করিতে পারেন না, বৎসল-রসের রসিক—শ্রীনন্দ-যশোদা যে রসের পরমোৎকর্ষ ধারণা করিতে পারেন না, উদ্ধবাদি শ্রেষ্ঠগণ যে রসের জন্য নিত্য লালায়িত, সেই মধুর-রসের রসিক গোপিকাবর্গ-মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা—সর্ব্বোত্তমা, রূপে-গুণে-সৌভাগ্যে-প্রেমে সর্ব্বাধিকা।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ উপদেশামৃতের শ্লোকে সেই শ্রীমতী রাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব-বর্ণনে বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী।।"

পরের অপকার, চৌর্য, মিথ্যা, ব্যভিচার, লাম্পট্য প্রভৃতি অসৎকার্য্যরত ব্যক্তি হইতে যাঁহারা দেশের উপকার, দান, ধ্যান, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি করেন, যাঁহারা কেবলমাত্র নিজেদের ইন্দ্রিয়ের স্বার্থান্বেষী নহেন সেইরূপ সৎকর্ম্মী শ্রেষ্ঠ; কারণ, অসৎকর্ম্মের প্রাবল্যে জগতে মনুষ্যজাতির পক্ষে বাস করাই অসম্ভব হয়। কিন্তু এইরূপ সৎকর্ম্মীর আদর্শই চরম নহে। সৎকর্ম্মিগণ কুকর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীবগণকে উচ্ছৃঙ্খলতার কবল হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের অসৎকর্ম্ম সঙ্কোচ করিবার জন্যই সৎকর্ম্মের ব্যবস্থা। কিন্তু কর্ম্মিগণ বুভুক্ষু, তাঁহারা ইহকালে অভ্যুদয় ও পরকালে সুখের জন্য ব্যস্ত। যাঁহারা আপনাদিগকে নিষ্কাম-কর্ম্মী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও প্রচ্ছন্নভোগী। নিজেদের অন্তঃস্থলের গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিই নানাকারে স্বদেশ-প্রীতি, দরিদ্রকে অন্নদান, বস্ত্রদান, দাতব্যচিকিৎসালয়-নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী-খনন, জলছত্র-স্থাপন, অতিথি-সৎকারাদি সৎকার্য্যরূপে প্রকাশিত হয়।

কর্ম্মিগণ তাহাদের কপটতা নিজেরা ধরিতে পারেন না। সেই বুভুক্ষু কর্ম্মী হইতে মুমুক্ষু জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা তাত্ত্বিক, কর্ম্মিদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিয়াও পাছে তাহাদিগকে সৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে গেলে নিজেরা অসৎকর্ম্মাসক্ত হইয়া পড়েন, এইজন্য জ্ঞানিগণ গীতার বাক্য স্মরণ করিয়া থাকেন—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্" অর্থাৎ অজ্ঞতা-বশতঃ কর্ম্মে আসক্ত কর্ম্মসঙ্গী মূর্খব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে

না। তাহা করিলে তাহারা অসৎকর্ম্মাসক্ত হইয়া পড়িবে। কর্ম্মিগণ মূর্খ; অমূর্খ জ্ঞানিগণ বিচার করেন—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" কর্ম্মিগণ সৎকর্ম্মজনিত পুণ্যফলে দিব্য দেবভোগসকল প্রাপ্ত হন; পরে সেই প্রভুত-সুখ-জনক স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন। সুতরাং জ্ঞানীরা কর্ম্মীর মূর্খতা পরিত্যাগ করিয়া অমূর্খের বিচারে চির-আনন্দের প্রয়াসী হইয়া মুমুক্ষু হন। তাঁহাদের বিচার এই যে, অস্তিত্বই যখন ক্লেশদায়ক, তখন চিদ্ রাহিত্য, অচিৎনির্ব্বাণ বা চিৎসাহিত্য ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই শ্রেয়স্কর। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকই নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-তৎপর জ্ঞানী, মায়াবাদী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। ইঁহাদিগের আশা কত ক্ষুদ্র! ইঁহারা মূর্খ কর্ম্মীর উপর পাল্লা দিতে গিয়া, নিজেরা অমূর্খ সাজিতে গিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে মূর্খই হইয়া পড়িলেন, আত্মবিনাশ সাধন করিলেন।

যে নিত্যানন্দ লাভের আশায় জ্ঞানী ত্যাগী সাজিলেন, ভোগীকে ঘৃণা করিলেন, তাঁহার ভাগ্যে সেই নিত্যানন্দলাভ হইল না!

"জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু, করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।।"

এইজন্য সর্ব্ব-প্রকার জ্ঞানী হইতে শুদ্ধভক্ত শ্রেষ্ঠ—ভক্তের পদবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী। মূর্খ ভোগী কর্ম্মিগণ মনে করেন,—ভক্তগণ, বুঝি তাঁহাদের মতই কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের মতই ঘন্টা নাড়েন, ঈশ্বরপূজা করেন, 'জীবে দয়া' করেন, তীর্থে গমন করেন, সাধুগুরুর সেবা করেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কর্ম্মীর ভালমন্দ-বিচার—চক্ষু-কর্ণাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; কিন্তু ভক্তের সেবা—অধোক্ষজসম্বন্ধিনী অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ধারণা করিতে অসমর্থ। ভক্তের নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি নাই, আছে কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি।

জ্ঞানী মনে করেন,—ভক্ত বুঝি তাঁহারই মত কোন অনিত্য বস্তুর,—যে বস্তু পরে আর থাকিবে না, যে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, যাহার ত্রিপুটী বিনষ্ট হইবে,—সেইরূপ বস্তুরই অন্ধবিশ্বাসমূলে ভজন করেন। জ্ঞানিগণ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবানের চিন্ময় হাত, পা, মুখ, চোখ, নাক, ঠোঁট সব কাটিয়া, তাঁহার হাতে হাতকড়ি, পায় বেড়ী দিয়া অবশেষে তাঁহারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিয়া তাঁহাকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ করিতে প্রয়াসী। ভগবান্—যিনি অদ্বিতীয় ভোক্তা, তিনি ভোগ করিতে পারিবেন না, তিনি হাত-পা-ছাড়া বস্তু হইবেন! আর যত নশ্বর জড়ভোগের জন্য হাত-পা, ভোগি কুলের থাকিবে—তাহারা হিমালয়ের মুক্ত বায়ুতে, অরণ্যানীর নির্জ্জন সৌন্দর্য্যে, ভাগীরথীর রমণীয় কূলে বসিয়া ত্যাগের নামে প্রচ্ছন্ন ভোগ করিয়া লইবেন! ভক্তগণ সেইরূপ প্রচ্ছন্ন-ভোগী নহেন। যে মুক্তির জন্য জ্ঞানিগণ লালায়িত, তাহা ভক্তগণের নিকট ত্যক্তনিষ্ঠীবনের ন্যায় বস্তু—অগ্রাহ্য পরিত্যাজ্য বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের লেখক শ্রীল বিল্বমঙ্গল গোস্বামী বলিয়াছেন,—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।

যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার নিকট মুক্তি স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন, শুদ্ধভক্ত তাঁহার দিকে একবার ফিরিয়াও চান না, আর ধর্ম্ম, অর্থ, কামসকল কোনসময় শুদ্ধভক্তের সেবা করিবার সুযোগ পাইবে এই আশায় সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মীর প্রার্থনীয় ধর্ম্মার্থকাম ও জ্ঞানীর লোভনীয় মোক্ষ—ভক্তগণের থুৎকারের বস্তু।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেন,—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ।।

জ্ঞানিযোগিগণের মৃগ্য কৈবল্যসুখ—শুদ্ধভক্তের নিকট নরকতুল্য কর্ম্মীর লোভনীয় ইন্দ্রপুরীর সুখ—তাঁহার নিকট আকাশকুসুমের ন্যায় অবাস্তব। যাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেম উদিত হইয়াছে, বিশ্বামিত্রপ্রমুখ তাপস-কুলের ন্যায় তাঁহার পতনাশঙ্কা নাই; শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষের এইরূপই প্রভাব! সুতরাং সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়তর। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ-মধ্যে আবার প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের অধিকতর প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তের মধ্যে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের আরও অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা অবার কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা—তাঁহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আর প্রিয়তম কেহ নাই। যেরূপ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়তমা, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা। সেই শ্রীরাধার দাস্যই আমাদের পরম লোভনীয় বিষয়।

এমন দিন কবে হইবে,—যেদিন আমরা অন্য অভিলাষ, স্মৃত্যুক্ত তুচ্ছ কর্ম্ম, অকিঞ্চিৎকর নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, তপ ও যোগাদি—সমস্ত কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার দাস্যে নিযুক্ত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য পরম-চমৎকার মাধুর্য্যময়ী সেবার অধিকার পাইব! অনর্থযুক্ত অবস্থায় শ্রীরাধার দাস্য সৌভাগ্য লাভ ঘটে না। যাহারা অনর্থযুক্ত অনধিকার অবস্থায় পরমপ্রেষ্ঠসেবিকা শ্রীরাধার অপ্রাকৃত লীলার আলোচনায় তৎপর হন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়ারামী, প্রচ্ছন্ন-ভোগী, প্রাকৃত-সহজিয়া। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা শ্রীগোবিন্দের এইরূপ স্তব করিয়াছেন,—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

প্রেমবিভাবিত সমাধিচক্ষেই সেই অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্রীশ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির দর্শন-লাভ হয়। অনর্থমুক্ত প্রেমিক ভক্তগণ সেই শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং যে সকল পরম সুকৃতিবিশিষ্ট অনর্থমুক্ত পুরুষ শ্রীরাধার দাস্যে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহারাই শ্রীরাধাকুণ্ডে অবগাহন করিতে পারেন,—তাঁহারাই অষ্টাকাল শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহারাই ধন্য—ধন্যাতিধন্য।

ভাগবতে দশম স্কন্ধ ভাল করিয়া আলোচনা হওয়া অবশ্যক,—ভাল করিয়া ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিবৃতি লেখা আবশ্যক। রাস-পঞ্চাধ্যায়, ভ্রমরগীতা, গোপীগীতা-প্রভৃতি রূপানুগ-গৌড়ীয়-বিবৃতি লেখা কর্তব্য। জগতে রূপের কথা নাই, কুরূপের কথা আছে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ 'এঁ চড়ে পাকামি' করিবার জন্য ভ্রমরগীতা, গোপী-গীতা প্রভৃতি লইয়া যে ছিনিমিনি খেলিতে চায়, সেই সকল দুর্বুদ্ধি অপসারিত করিয়া ভ্রমরগীতার, গোপী-গীতার প্রকৃত বিবৃতি লেখা আবশ্যক। অনুকূল গ্রহণমাত্র হইলেই হইবে না, কৃষ্ণানুশীলন হওয়া চাই, নতুবা মৃগী-ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় অনুকূলমাত্র গ্রহণ করিয়া পথে চলিতে চলিতে সময় সময় মাঝ পথে অকস্মাৎ এক একটা মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে ফেলিয়া দিবে। প্রতিকূল কিছু আসিলেই আমরা হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইব—হয়ত এক ভাণ্ড কুরস খাইয়া ফেলিব। অনুকূল ক্রিয়াতে জন্মজন্মান্তরে সুবিধা হইবে বটে, কিন্তু এই জীবনেই বিদেহ মুক্তি, সিদ্ধিলাভ বা প্রকৃত হরিভজন হইবে না। কৃষ্ণের রূপ-গুণে মুগ্ধ না হইলে কৃষ্ণ হইতে অনেক দূরে থাকিতে হইবে। রূপের জন্য যাঁহাদের লৌল্য জন্মিয়াছে—যাঁহারা সৌন্দর্যপিপাসু, তাঁহারাই কৃষ্ণের সন্নিধানে যাইতে পারিবেন। শ্রীরূপের আনুগত্যই যাঁহাদের সকল আশা-ভরসা—শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদপদ্মই যাঁহাদের ভজন-পূজন,—শ্রীরূপ পাদপদ্মে সিদ্ধিই যাঁহাদের একমাত্র লালসা, সেইরূপ সৌন্দর্য্যপিপাসু ব্যক্তিগণই হরিভজনের কথা বুঝিতে পারিবেন। এই সৌন্দর্য্যপিপাসু ব্যক্তিগণের জন্যই দশমস্কন্ধের ভাগবত-বিবৃতি লেখা আবশ্যক। আমরা প্রাকৃত সহজিয়াগণের ভ্রমরগীতা, গোপীগীতার পাঠ-ব্যাখ্যাগুলির অনুমোদন করি না, কিন্তু ঐ সকলের যথার্থ ব্যাখ্যাও তৎসঙ্গে প্রদান করা কর্তব্য। কেবল 'ইহা নহে—ইহা নহে' বলিবার সঙ্গে সঙ্গে 'ইহা হয়' বলাও আবশ্যক। অতন্নিরসন ব্যাপারটী কেবল ঋণ-জাতীয় (negative)—ধন জাতীয় (positive side) নহে। অতন্নিরসন করিয়া কেবল 'তৎ' এর সন্ধান বলিলেও হইবে না, 'সঃ' এর—Absolute Personality-র (বাস্তব বস্তুর—পরম সবিশেষ বস্তুর) নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য লীলায় প্রবেশ করিতে হইবে। যাঁহারা ইহ জগৎকেই ভূমিকা করিয়া অতন্নিরসন করিতে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা 'তৎ' পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন। 'তৎ-সৎ'—সেই বস্তু সত্তাবান্ এই পর্যন্ত বলেন; কিন্তু যাঁহারা ইহ জগতের প্রতিবিম্বিত মূল অবিকৃত বিশ্বস্বরূপ নিত্যধাম হইতে দর্শন করেন, তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞান বস্তুকে 'সঃ'

অর্থাৎ নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময় সবিশেষ তত্ত্বরূপে দর্শন করেন—তাঁহাকে 'রসো বৈ সঃ' রূপে দর্শন করেন। তিনি অখিলরসামৃত-মূর্তি। যেমন, শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"অখিলরসামৃতমূর্তিঃ প্রসৃমররুচি-রুদ্ধতারকা-পালিঃ।
কলিতশ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি।।"

কর্মি-জ্ঞানি-অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় বলিবে,—তোমরা লবণ তৈয়ারী কর না কেন? —চরকা ঘুরাও না কেন?—লাঙ্গল চাষ কর না কেন? কলেরারোগীর মেথরের কাজ কর না কেন?—মরা ফেল না কেন?—অর্থাৎ তাহারা কৃষ্ণসেবাকে তাহাদের কোন না কোন একটা ইন্দ্রিয়-তর্পণের কার্যে জুড়িয়া তাঁহাদের উপরে চড়িতে পারিলেই তাহাদের কার্য সিদ্ধি হইল মনে করিবে; কিন্তু আমরা তাহাদিগের অপেক্ষাও চতুর—কৃষ্ণভক্ত সয়তানের সয়তান; তাহাদিগকে আমরা কিছুতেই ঘাড়ে লইব না; একক গৌরসুন্দর, রাধাগোবিন্দ ও তাঁহাদের জন ব্যতীত কেহই আমাদের ঘাড়ে চাপিতে পারিবে না। যে ঘাড়ে আমরা গৌরসুন্দরকে চড়াইয়াছি—যে স্কন্ধদ্বয়ে রাধাগোবিন্দকে ধারণ করিয়াছি এবং তাঁহাদের নিজজনকে বসাইয়াছি, সেখানে কিছুতেই ইতর লোককে আসিতে দিব না। আমরা শ্রীরূপের উপদেশামৃত অনুসরণ করিব—প্রতিকূল ত্যাগ করিয়া অনুকূল গ্রহণ করিব। অনুকূলমাত্র গ্রহণ করিয়াই আমরা ভক্তি স্তব্ধ করিব না, আমরা পতিত হইব না—মৃগীরোগীর ন্যায় মাঝে মাঝে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইব না—আছাড় খাইব না—আমরা পরমোৎসাহভরে কৃষ্ণ-নাম-চরিত অনুশীলন করিব—মথুরা ও ব্রজে বাস করিব—শ্রীরূপের আনুগত্য করিতে করিতে কৃষ্ণকীর্তন করিব, তাহা হইলেই আমাদের স্মরণ হইবে—আমরা রাধাকুণ্ডতটে, নিরন্তর স্বসেব্য কুঞ্জে থাকিয়া আশ্রয়ানুগত্যে বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয়ে বার্ষভানবীদয়িতের অষ্টকালীয় সেবায় পরিচর্যা করিতে করিতে আমাদের সকল আশার পরাকাষ্ঠা লাভ করিব। ইহা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন অভিলাষ নাই—ইহা ব্যতীত অতিমুক্তের আর কিছু অভিলাষ থাকিতে পারে, ইহাও আমাদের ধারণায় নাই।

শ্রীগুরু, শ্রীনাম, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দর—সকলেই অভিন্ন তত্ত্ব। আমরা কৃষ্ণেতর পঞ্চোপাসনা করিয়া অন্যাভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানী হইব না। আমরা কৃষ্ণের পঞ্চোপাসনা করিব—আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবের উপাসনা করিব—অপ্রাকৃত শব্দাবতার নাম-কৃষ্ণের উপাসনা করিব—ভাগবত কৃষ্ণের উপাসনা করিব, রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিব—গৌরকৃষ্ণের উপাসনা করিব—আমরা কৃষ্ণকে পঞ্চরসে উপাসনা করিব এবং শ্রীরূপানুগ হইয়া পঞ্চরসের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার মধুর রসে কৃষ্ণোপাসনা করিব। আমরা প্রতিকূল ত্যাগ-মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইব না, অনুকূল গ্রহণ মাত্র করিয়া ভক্তি স্তব্ধ করিব না, আমরা কৃষ্ণানুশীলন করিব। শ্রীচতন্যদেব যে অনর্পিতচর

উন্নতোজ্জ্বল রস প্রদান করিয়া ঔদার্যবিগ্রহরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন, আমরা সেই ঔদার্য-সিন্ধুতে অবগাহন করিব—উন্নতোজ্জ্বল রসের অধিকারী হইব, আমরা শ্রীস্বরূপ দামোদরের আনুগত্য করিতে করিতে বলিব,—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।

ব্রহ্মসংহিতায় এক একটি উপমাদ্বারা পঞ্চোপাস্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে; যেমন, শম্ভুতা বা রুদ্রত্ব বুঝাইতে গিয়া দুগ্ধের বিকৃতি দধির উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন; গোবিন্দ —দুগ্ধস্থানীয়, রুদ্র—দধিস্থানীয়; দধি কিছু দুগ্ধ নয়, দুগ্ধ কিছু দধি নয়; উভয়ের সঙ্গে একাকার হয় না, তথাপি দধি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নহে—শম্ভু কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ আর একটি ঈশ্বর নহেন, শম্ভুর ঈশ্বরতা গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। দুর্গা বা শক্তিতত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া ব্রহ্মসংহিতা আর একটি উপমা দিয়াছেন; যেমন—বিম্ব ও প্রতিবিম্ব—কায়া ও ছায়া। স্বরূপশক্তি—কায়াস্বরূপিণী, আর বিরূপশক্তি—ছায়াস্বরূপিণী। দুর্গা সেই চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা—প্রাপঞ্চিক জগৎ-দুর্গের বা সংসার-দুর্গের রক্ষয়িত্রী। এই জড় জগৎ বিম্বরূপ চিজ্জগতের হেয়, অসম্পূর্ণ, বিকৃত প্রতিবিম্ব। আবার যেমন —গোবিন্দ ও ব্রহ্মার স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া সূর্য ও সূর্যকান্তমণির উপমা দিয়াছেন। কৃষ্ণ—সূর্যসম, সূর্য যেমন নিজ তেজঃ সূর্যকান্তাদি মণিসমূহে কিয়ৎ পরিমাণে বিকীর্ণ করিলে অন্য বস্তুসমূহ দগ্ধ হয়, সেই রকম কৃষ্ণের শক্তিতেই রজোগুণাবতার ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার নিজের কোন স্বতন্ত্র সামর্থ্য নেই।"

"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ।।"

"বৈকুণ্ঠ নির্বিশেষ লোকের উত্তর লোক। সেইটি ভগবানের সবিশেষ লোক দেবীধামে, বিরজায় ও ব্রহ্মলোকে ভগবানের চিদ্‌বিলাস বা সবিশেষত্ব আক্রমণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। দেবীধামস্থ মহামায়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত বহির্মুখ লোকসকল আপনাদিগকেই বিলাসী অভিমান করে। 'আমরাই জগৎ ভোগ করিব, আমাদেরই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ থাকিবে, আমরাই বিলাসী'—এই রকম বিচারে একমাত্র অদ্বিতীয় বিলাসীর অনুকরণে চিদ্‌বিলাসকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে। অচিদ্‌বিলাসিগণ অদ্বিতীয় চিদ্‌বিলাসীর আনুকরণিক ক্ষুদ্র প্রতিযোগী হইয়া স্ব-স্ব দুর্দশা বরণ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বিলাস করিতে পারিতেছে

না, বিলাসের চেষ্টা দেখাইতে গিয়া বদ্ধ হইয়া যাইতেছে। দেবীধাম ব্যাপ্ত হইয়া যে জলধি 'বিরজা' নামে খ্যাত, তাহাতে এই দেবীধামের মিশ্রসত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অধিষ্ঠান না থাকিলেও অর্থাৎ তথায়, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা হইলেও তাহা প্রারম্ভিক তটস্থ-ভাব-নির্গত। শাক্যসিংহাদির বিচার বা অচিন্মাত্রবাদ যে স্থানে পর্যবসিত হইতে পারে সেখানে বিলাসের কোন কথা নাই, কেবল স্থৈর্যভাব আছে মাত্র; সুতরাং বিরজাতেও চিদ্‌বিলাস আক্রান্ত। তৎপরে ব্রহ্মালোক বা নির্বিশেষধাম। এখানে অদ্বিতীয় বিলাসীর হাত-পা-নাক-কাণগুলি কাটিয়া ফেলিবার অবৈধ চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন মহাপ্রভু মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড।।
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
☆ ☆ ☆ ☆
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড করে বেটা ভালমতে।।
পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।
☆ ☆ ☆ ☆
সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস।।"

নির্বিশেষবাদীর বিচার,—'বিলাস' কথাটি থাকিলেই তাহাতে অচিৎ-এর হেয়তা মিশ্রিত হইতে হইবে। চিৎ এরই একমাত্র বিলাস হইতে পারে। পরিপূর্ণ পরমোপাদেয় নিত্য অখণ্ড চিদ্‌বিলাসেরই অসম্পূর্ণ, হেয়, অনিত্য, খণ্ড প্রতিফলনই যে অচিদ্‌বিলাস —ইহা মায়াবাদীর মস্তিষ্কে ধারণার বিষয় হয় না। সুতরাং নির্বিশেষলোকে চিদ্‌বিলাস আক্রান্ত।

বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ যেখানে যাবতীয় কুণ্ঠাধর্ম—কুণ্ঠ জগতের চিন্তাস্রোত বিগত হইয়াছে, সেই বৈকুণ্ঠ-হইতে চিদ্‌বিলাসের কথা আরম্ভ হইল। এইজন্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বৈকুণ্ঠ হইতে কথা আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের পূর্বের যত কথা, সেগুলি পারমার্থিক রাজ্যের পথিকের গণনার মধ্যেই আসিতে পারে না; কারণ, বৈকুণ্ঠের পূর্বে ভগবত্তার স্বরূপই আরম্ভ হয় নাই, সেই সকল স্থানে অজ্ঞেয়তা, নাস্তিক্য, অহংগ্রহোপাসনার উদ্যোগ-ভূমিকারূপ কুণ্ঠাধর্ম বিরাজমান। দেবীধামের অচিদ্‌বিলাসী সুখদুঃখভোগ, বিরজার অচিন্মাত্রবাদী বোধিসত্তা-অঙ্গীকারকারী যোগী, নির্বিশেষ ব্রহ্মালোকের চিন্মাত্রবাদ-অঙ্গীকারকারী জ্ঞানী—কাহারও চিদ্‌বিলাসের উপলব্ধি না থাকায় চিচ্ছুদ্ধ ভাগবতমধ্যেই গণ্য হইতে পারেন না। ঐ সকলের কুণ্ঠাধর্ম যেইস্থানে বিগত হইয়া

চিদ্‌বিলাসের কথা—চিন্ময় বাস্তবধর্মের কথা আরব্ধ হইল, সেই বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীরূপপাদ তাঁহার কথা আরম্ভ করিলেন। চিদ্‌বিলাসে অচিদ্-বিলাস-বিবর্ত-বুদ্ধি করিয়া বিবর্তবাদী 'নিরস্ত-নিখলদোষহনবধিকাতি শয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণযুতঃ' পুরুষোত্তমের ঐশ্বর্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলে—কেবল কল্যাণগুণগণ পুরুষোত্তমের অঙ্গকান্তির ঐশ্বর্যে বিমোহিত-চক্ষু হইয়া পড়িলে সত্যানুসন্ধিৎসু পারমার্থিকের জন্য নির্বিশেষ লোকের উত্তর মহৈশ্বর্যলোক—যেখানে ভগবান্ ঐশ্বর্য বহুল ভৃত্যাদিদ্বারা পরিসেবিত হইয়া বিলাস করেন, রত্নময় সিংহাসনে অনন্ত সহকারে লক্ষ্মীর সঙ্গে বিহার করেন—যেখানে অসংখ্য বিলাসের উপকরণ—অসংখ্য ঐশ্বর্যের সমাবেশ রহিয়াছে, সেই বৈকুণ্ঠলোক আবিস্কৃত হইল। সেই বৈকুণ্ঠলোকে বিলাসের কথা থাকিলেও মধুপুরীতে বিলাস আরও ব্যক্ত।

বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠ—'জনিতঃ'—অজের জন্মনিবন্ধন, বৈকুণ্ঠে অজের জন্ম নাই। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ মাতা-পিতা হইতে জাত নহেন। জন্মের উপাদেয়ত্ব ও নিত্যত্ব, নিত্যজন্মের নিত্যত্ব নারায়ণ-ধাম বৈকুণ্ঠে ব্যক্ত নয়। যাঁহাদের চিদ্‌বিলাস আক্রমণ করিবার প্রবৃত্তি, তাঁহারা বলেন—যেখানে জন্ম সেখানেই হেয়তা। মাতাপিতা হইতে প্রাপ্ত দেহ—নশ্বর ও হেয়তাযুক্ত। নশ্বর মাতা-পিতার নশ্বর পুত্র। চিদ্-বিলাস বিরোধীর এই আক্রমণের পূর্ণ বাস্তব-প্রতিবাদ সম্পূর্ণভাবে বৈকুণ্ঠে প্রদত্ত হয় নাই। কেন না সেখানে অজের জন্মকথা পরিব্যক্ত হয় নাই, কিন্তু অজের কিরূপে জন্ম হইতে পারে; যুগপৎ বিরুদ্ধ ব্যাপার চিদ্‌বিলাস রাজ্যে কিরূপে অতি সুন্দরভাবে সমন্বিত হইয়া চিদ্‌বিলাসের সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে পারে, তাহা মথুরায় প্রদর্শিত হইয়াছে, কাজেই বৈকুণ্ঠ হইতে মধুপুরী শ্রেষ্ঠা।

মধুপুরীতে বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা চিদ্‌বিলাস সৌন্দর্য অধিকতর ব্যক্ত হইলেও বৃন্দারণ্যে তদপেক্ষা অধিকভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। মথুরায় রাসোৎসব হয় না। তথায় বসুদেব দেবকীনন্দনের ঐশ্বর্যময় বাৎসল্যরস প্রকাশিত থাকিলেও নন্দনন্দনের মধুর রতি মহোৎসব মথুরায় প্রকাশিত হয় নাই। গোপীজনবল্লভ নন্দনন্দন কৃষ্ণের মধুর রসের মহামহোৎসব বৃন্দাবনীয় রাসক্রীড়ায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু এই রাসোৎসবে চন্দ্রাবলীর যুথ সমঞ্জসা-রতির নায়িকাগণও উপস্থিত থাকায় রাসোৎসবের সমন্বয়-বিচার কৃষ্ণের পরমমুখ্যা সর্বশ্রেষ্ঠা সেবিকার মনঃপূত হয় নাই। শ্রীমতী রাধিকা বিচার করিয়াছিলেন,—'আমি কি কৃষ্ণকে সর্বাপেক্ষা অধিক সেবা করি না যে, আমার জন্য কৃষ্ণ সকল নায়িকাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না? যদি পারেন, তবে জানিব, আমি কৃষ্ণসেবা করিতেছি।' এই বিচার করিয়া শ্রীরাধিকা রাসমণ্ডলীতে গোপীগণের সাধারণ প্রেমসুলভ মমতা-দর্শনে কৌটিল্য-বামতাহেতু রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

দুই দুই গোপীর মধ্যে রাসমণ্ডলে একমূর্তি কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার পার্শ্বে একমূর্তি কৃষ্ণ—এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। রাধিকা তাহাতে স্বীয় কুটিল প্রেমের বামতা প্রকাশ করিলেন—ক্রোধ ও মানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা, রাধিকা রাসোৎসবের রস পুষ্টি করেন; কিন্তু রাধিকা চলিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ মদনবাণে জর্জরিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রীমতীর অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন—

'কংসারিরপি সংসারবাসনা-বদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ।।
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী তটান্ত-কুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ।।'

রাসমণ্ডলীতে দক্ষিণা ও বামার বিচার—সমঞ্জসা ও সমর্থা বিচারের সমন্বয় থাকায়, চন্দ্রাবলীর যুথ প্রবেশ করায় বৃন্দাবনীয় রাসমণ্ডলী অপেক্ষা গোবর্ধন-গিরিগুহা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। কারণ, গোবর্দ্ধন-গিরিগুহা উদারপাণির রমণ-স্থান—ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের নির্জন কেলিকলার কন্দর। রাসোৎসবে কেবল মাধুর্য-প্রকাশ, কিন্তু গোবর্ধনে মাধুর্যের অন্তর্গত ঔদার্য উদারপাণিরমণের দ্বারা প্রকাশিত। চন্দ্রাবলীর যুথস্বরূপ শ্রীরূপানুগবিরোধীদল শ্রীবার্ষভানবীর চরণসেবাকাঙ্ক্ষী---শ্রীরাধিকার যূথ-স্বরূপ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রতিযোগিতায় বালগোপালের উপাসনা হইতে কিশোর গোপালের উপাসনা বা বৃন্দাবনে রাসোৎসব পর্যন্ত আসিবার চেষ্টা করিতে পারেন, আরও অধিকতর প্রতিযোগিতামূলে গোবর্ধনে আসিবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগকে গোবর্ধনে চতুর্ভুজ দেখান। তাঁহারা প্রকৃত শ্রীনন্দনন্দনের সেবা বা শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্য করিতে পারেন না; তাঁহারা বালগোপালের উপাসক সূত্রে গোকুল, প্রতিযোগিতামূলে কিশোর-গোপালের উপাসনা দেখাইতে যাইয়া বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবন হইতে গোবর্ধন পর্যন্ত আগমন করিতে চাহেন; কিন্তু রাধাকুণ্ডে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই। রাধাকুণ্ড একমাত্র রাধিকা-যূথের দুর্গ। তাঁহারা প্রতীপজনকে কখনও সেই কুণ্ডের তীরে আসিতে দেন না; এখনও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ রধাকুণ্ডের তীরে অপর বিচারাবলম্বীকে আসিতে দেন না; কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! ভাগ্যহীনের প্রাকৃতদর্শন অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডের অধিষ্ঠান কলুষিত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাধাকুণ্ডকে প্রাকৃত সহজিয়াগণের অধিকৃত মনে করে। ভাগ্যহীন প্রাকৃত সহজিয়াগণ রাধাকুণ্ডের তীরে বাস করিতে পারে না—অপ্রাকৃত রাধাকুণ্ডের জল স্পর্শ করিতে পারে না। রাধাকুণ্ড অপ্রাকৃত ভাব জগতের শিরোমণি-স্বরূপ। কেননা, সেই শ্রীরাধাকুণ্ড গোবর্ধন হইতেও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু তাহা প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু প্রেমের সংজ্ঞা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

'সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।।'

সেই প্রেমের পরিপূর্ণ প্লাবন—শ্রীরাধাকুণ্ডে। সেই গোবর্ধনতটে বিরাজিত রাধাকুণ্ডের সেবা বিবেকিগণই করিয়া থাকেন অর্থাৎ যাঁহাদের বস্তু বিচারে কোন্‌টি সর্বশ্রেষ্ঠ, সেব্যাধার-বিচারে কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেব্য—এই বিবেকোদয় হইয়াছে, তাঁহারাই রাধাকুণ্ডের সেবা করিবেন। রাধাকুণ্ডের তীরে বাস—রাধাকুণ্ডতটস্থিত কুঞ্জকুটিরে বাস অপেক্ষা রাধাকুণ্ডে অবগাহনের আরও অধিকতর বৈশিষ্ট্য আছে। শুধু তীরে বাস নয় —তীরস্থ কুঞ্জে বাস নয়, কুণ্ডে রাধিকার ভাব-বিশেষে অবগাহন করিয়া রাধাকান্তের সেবা আরও অনেক বেশী কথা। 'রাধিকার ভাবে অবগাহন' শব্দে আপনাকে মূলধনস্বরূপ আশ্রয়-বিগ্রহের অভিমান নয়—কারণ উহা অহংগ্রহোপাসনা; ললিতা বিশাখা প্রভৃতির অভিমানও অহংগ্রহোপাসনা। রাধিকার ভাব-পোষণী অনুচরীর অভিমানে, ললিতার ভাব-পোষণী মঞ্জরীর পরিচারিকা অভিমানে অবগাহন। অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা—এই আট প্রকার নায়িকার অন্যতমার ভাবনুসরণে মুক্ত আত্মা তাঁহাদের পরিচর্যামূলে রাধাকুণ্ডে অবগাহন করিয়া কৃষ্ণ সেবা করেন।

শ্রীরামানন্দ-সংবাদে যখন রামানন্দ রায় 'ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর' বলিয়া মহাপ্রভুকে প্রেম-বিলাস-বিবর্তের কথা বলিতে উদ্যত হইলেন, তখন মহাপ্রভু নিজ হস্তদ্বারা রামানন্দ রায়ের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। 'আত্মার চরম বিকাশের কথা ইহার পরে আর জগতে প্রকাশিত হইতে পারে না,—এই জন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

'বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী' শ্লোকে আধার বা স্থানের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বিচারিত হইয়াছে; তৎপরে 'কর্মিভ্যঃ পরিতঃ' শ্লোকে সেবকপাত্রসমূহের উত্তরোত্তর উৎকর্ষের বিচার হইয়াছে। অজ্ঞেয়, সগুণ, নির্গুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয়, পরকীয় প্রভৃতি বিচারে সেব্য-পাত্রের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ-বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞেয়ের অজ্ঞেয়-বিচার, সংশয়-বিচার হইতে অর্থাৎ আত্মার সম্পূর্ণ masked (মুখোস-পরা) অবস্থা হইতে ক্রমশঃ আরোহবাদে পরমার্থ ভূমিকায় পরকীয়-বিচার পর্যন্ত আরোহণ করা যায়। যেমন, প্রথমে অজ্ঞেয়তার কোষ ছিন্ন করিয়া ত্রিগুণের কোষ অচিৎসগুণের কোষ ছিন্ন করিয়া নির্গুণ-বিচারের কোষ, নির্গুণ-কোষ-বিচার ছিন্ন করিয়া ক্লীবব্রহ্মবিচারের কোষ, তাহা ছিন্ন করিয়া পুরুষ-বিচার বা চতুর্ব্যূহাত্মক বা বাসুদেববিচারের কোষ, তাহাও অতিক্রম করিয়া মিথুন বিচারের কোষ, তাহাও অতিক্রম করিয়া স্বকীয় বিলাসের কোষ এবং তাহাও অতিক্রম করিয়া পারকীয় বিলাসের কোষ। Immanent* (প্রকৃতিতে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত) হইতে transcendent (প্রকৃতির অতীত বা

---

*Transcendent শব্দের বিপরীত অর্থবোধক।

অপ্রাকৃত) এর বিচার অথবা অবরোহ-বিচারে অপ্রাকৃত হইতে অন্তর্যামিত্ব-বিচারে যেমন নারিকেলের হরিৎ ত্বগাবরণের অভ্যন্তরে ছোব্ড়া, তদভ্যন্তরে কঠিন কোষ্ঠ, তদভ্যন্তরে আর একটি সূক্ষ্ম আবরণ, তদভ্যন্তরে নারিকেল-শস্য এবং জল—রাধাকুণ্ডে অবগাহন। যদি রাধাকুণ্ড-তীরের কোন এজেন্ট জগতে আসিয়া আমার নিকট শ্রৌতপরম্পরায় সেই দেশের কথা বলেন এবং আমি কোষসমূহ ছিন্ন করিতে করিতে বৈকুণ্ঠ-দূতের কৃপারজ্জু ধরিয়া আরোহণ করিতে থাকি, তবেই ঐ রকম আরোহবাদ স্বীকৃত হইতে পারে। নতুবা নিজের চেষ্টায় ঐ রকম ছিন্ন করিতে করিতে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলে প্রাকৃত সহজিয়া বা এঁচড়ে পাকা হইয়া যাইতে হইবে। অথবা আর এক বিচারে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথমে পূর্ণতমা সেবার বিচারে পারকীয় বিচার এবং সেই সেবার বিচার ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া স্বকীয়-বিচার, মিথুন-বিচার, পুরুষ-বিচার, ক্লীবব্রহ্মবিচার, নির্গুণ-বিচার, সগুণ-বিচার, অজ্ঞেয় বা সংশয়-বিচার। এখানে transcendent হইতে phenomena (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃত ব্যাপার সমূহ) এবং তদভ্যন্তরে immanent। ক্লীবব্রহ্ম বা নির্বিশেষ বিচার অসম্যক্, পুরুষ-বিচারও আংশিক। পুরুষমাত্রবাদে ক্লীবত্ব নিরস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্ত্রীভাবের-অভাব থাকায় অর্ধপরিচয় মাত্র—পূর্ণ নহে। সুতরাং কেবল বাসুদেবের বিচার—আংশিক বিচার, কেবল-বাসুদেবের বিচার উন্নত হইয়া মিথুন-বিচারে পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। মিথুন-সমৃদ্ধিতে একপত্নীব্রতত্ব বা সীতারামের বিচারও পূর্ণতম বিচার নহে, উহা মধুররতি নামে পরিচিত হইতে পারে না, তাহা দাস্যরসের বিচার মাত্র। যেহেতু সেখানে তটস্থাশক্তির যোগ্যতা নাই। অপরে প্রকাশ-বিগ্রহাবতার রাঘবকে সীতার ন্যায় সেবা করিতে পারে না, তাহার প্রমাণ দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ যখন রাঘবপ্রকাশের কন্দর্প-বিনিন্দিত নব-দূর্বাদল-শ্যামকান্তি ভুজ দর্শন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের পুরুষশরীরে একপত্নীব্রতধর রামচন্দ্রকে স্বয়ং মধুর-রতিতে সেবা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই বহুবল্লভ কৃষ্ণকান্তা গোপীজন্ম বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। সীতার অনুগত হইয়া যে রামচন্দ্রের সেবা, তাহাও দাস বা দাসীত্ব বিচারে সেবা। রুক্মিণীশের সেবায় স্বয়ংরূপার যে স্বকীয়তা, উহাও সর্বচিন্ময়াঙ্গ-দ্বারা কান্তের সেবা নহে। দেবী জানকীর—সাধ্বীর পতিসেবা মাত্র। তবে দেবী রুক্মিণীর সেবা প্রকাশ-সেবার পরিবর্তে স্বয়ংরূপের সেবা। একপত্নীব্রতধর রামচন্দ্র পরকান্তার মুখ দর্শন করেন না, কিন্তু কৃষ্ণ স্বকীয় বিচারেও কোটিকান্তা-বিলাসী; দ্বারকায় স্বকীয়-বিচারে মর্যাদা-নীতি বর্তমান, কিন্তু স্বয়ংরূপের স্বেচ্ছাচারিতার নিকট তাহাও বিপর্যস্ত হইয়াছে। ডক্টর ভাণ্ডারকার জড়দর্শনে রাম-সীতার উপাসনা পর্যন্ত বুঝিয়া থাকেন, ইহার পরের কথা আর বুঝিতে পারেন না। স্বকীয় মিথুনে সেবার পরিপূর্ণতা প্রকাশিত হয় নাই, তাহাতে বহু আশ্রয়ের বিচার

থাকিলেও এবং তাহা ঐশ্বর্য্যমিশ্র মধুর হইলেও উহাও একপ্রকার দাস্যরসেরই অন্যতম। রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি স্বকীয়া মহিষীবৃন্দের অনুচরীবৃন্দ স্বকীয়ানুগত্যে স্বদরিদ্রতা মুখে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য সেবা করিতে পারেন। কেবল স্বকীয়-বিচারে ঐশ্বর্যভাব প্রকাশিত থাকায় কান্তরতির মধুরতা ও আগ্রহ পরিস্ফুট হইতে পারে না। ঐশ্বর্য-প্রবল স্বকীয়রসে রাসরসোৎসবের মাধুর্য প্রকাশিত হয় নাই। যে স্থানে আত্মার অনুরাগ আর্যধর্মের অন্তঃসীমা পর্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, সেই অনুরাগ পারকীয়বিচার-ব্যতীত স্বকীয় বিলাসে নাই। পারকীয় মিথুনেই চিদ্‌বিলাসসেবার পরিপূর্ণতা। পারকীয়-মিথুনের মাধুর্য-পরিমলে স্বকীয় শ্রীগণের শ্রীও বিশ্রী হইয়াছে।

মিথুনবাদে ত্রিবিধ মিথুন স্বীকৃত হইয়াছে; পুরুষবাদে তাহা নাই। প্রাঙ্‌মিথুন, মিথুন ও পরমিথুন। যেমন—দেবকী-বসুদেব, রুক্মিণী-বাসুদেব ও রতি-প্রদ্যুম্ন। পরকীয়-মিথুনে 'ইদং'-এর বিচারটুকু মাত্র নয়, পূর্ণতম 'সঃ' এর বিচার—'রসো বৈ সঃ'—পূর্ণতম সবিশেষ—স্বেচ্ছাচারী সবিশেষ—স্বরাট্ সবিশেষ—সুন্দরতম সবিশেষ। 'মিথুন' বলিতে এখানে প্রাকৃত স্ত্রী পুরুষ বা প্রাকৃত দাম্পত্য নহে। দেহ বা মনের বিচারের অন্তর্গত মিথুন বা প্রাকৃত সহজিয়াগণের জঘন্য ভণ্ড পারকীয়বাদের প্রাপঞ্চিক হেয় লাম্পট্য আমাদের আলোচ্য নহে, পরিচ্ছিন্ন অনুপাদেয় প্রাকৃত ভাবহীন অপরিচ্ছিন্ন পরমোপাদেয় অপ্রাকৃত ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের পারকীয় কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আনুকরণিক প্রতিযোগিতামূলে নিম্বার্কদলের কেহ কেহ—''অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা বিরাজমানমনুরূপ সৌভগাম্। সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্।।''—প্রভৃতি শ্লোক রচনা করিয়া যুগলভজনের বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেও তাঁহারা প্রকারান্তরে শ্রীরুক্মিণীশ স্বকীয়-মিথুন পর্যন্তই ধারণা করিতে পারেন; রাধাকুণ্ডের তীরে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই। রাধাকুণ্ড-স্নান শ্রীরূপের ভাণ্ডারের নিজস্ব সম্পত্তি—স্বরূপের ভাণ্ডারের গুহ্য সম্পুট; স্বরূপ-রূপানুগগণই উহা প্রাপ্ত হন, অন্যে নহে।

''আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার-কূপপতিতোত্তরণাবলম্বং গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।।

(ভাঃ ১০।৮২।৪৮)

গোপীগণ নাক টিপিয়া অগাধ বোধ যোগিগণের ন্যায় কৃষ্ণকে দূরের বস্তুবৎ কৃত্রিম ধ্যানে দর্শন করিতে চাহেন না—তাঁহাদের ধ্যান সহজধ্যান রেচক, পূরক, কুম্ভক কিংবা আসন, প্রাণায়াম-বলে অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়া সাময়িক অস্বাভাবিক ধ্যান নহে। যোগীরা অনেক চেষ্টা বেষ্টা করিয়া তাঁহাদের ইষ্ট বস্তুর ধ্যানের চেষ্টা মাত্র করেন। আর গোপীগণকে বিনা চেষ্টায় সহজভাবে কৃষ্ণের লীলা-লাস্যের ধ্যান এত দূর পাইয়া বসিয়াছে

যে, তাঁহারা শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের সহজ কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্ণসমাধি হইতে আপনাদিগের ক্ষণকালের জন্যও পৃথক করিতে পারেন না। কৃষ্ণ গোপীগণের সর্ব্বাঙ্গ আত্মসাৎ করিয়াছেন, গোপীর সর্ব্বাঙ্গ সহজ স্বাভাবিকরূপে কৃষ্ণধ্যান করিতেছেন—গোপীর চক্ষু কেবল কৃষ্ণ ধ্যান করেন, গোপীর হৃদয় কেবল কৃষ্ণ ধ্যান করেন তাহা নহে, গোপীর কেশ কৃষ্ণ ধ্যান করিতেছেন, কৃষ্ণ সমাধিগ্রস্ত হইয়াছেন, গোপীর নখদর্পণ কৃষ্ণ ধ্যান করিতেছেন, গোপীর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক বেশ ভূষা, প্রত্যেক অপ্রাকৃত লোমকূপ অপ্রাকৃত কৃষ্ণের ধ্যান করেন—কৃত্রিমতায় নহে, কল্পনায় নহে—সহজ বাস্তবতায়, কৃষ্ণ গোপীকে আত্মসাৎ করিয়াছেন,—সেখানে সৃষ্টিকর্ত্তা, পাতা প্রভৃতিরূপে গৌণ বৈভব-দর্শনে, ব্রহ্মের জ্যোতির্ম্ময় অসম্যক্ চিন্তা স্রোত, কিংবা পরমাত্মার আংশিক প্রতীতি, এমন কি নারায়ণের চতুর্ভুজ বা তুরীয় মানের কথা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তুরীয়াতীত পঞ্চমতান—পঞ্চম মানের কথা আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যময় বিগ্রহ তাঁহার নিজ স্বরূপে পঞ্চম-মুরলী তানের মূর্চ্ছনা প্রকাশ করিয়াছেন, গোপীগণ তাহাতেই আকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের সেই তুরীয়াতীত পঞ্চম-মুরলীরবে যে গোপীগণের চিত্ত আকৃষ্ট তাঁহাদের অনুগামিগণেই বৃন্দাবন পরিক্রমার অভিসার করেন,—কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে করিতে বনভ্রমণ করেন—শ্রীরাসস্থলীতে দৌড়ান—কখনও বা শ্রীরাধানাথের সহিত শ্রীরাধারাণীর মিলন করাইবার জন্য শ্রীরাধার কিঙ্করী অভিমানে শ্রীরাধাকুণ্ডে ধাবিত হন। তাঁহাদের সম্ভোগে বিপ্রলম্ভেরই উদয় হয়—আত্মসুখ বাসনা তাঁহাদের নাই, কৃষ্ণ কিসে সুখী হইবেন, কোটি ইন্দ্রিয়ে ইহাই তাঁহাদের সহজ সমাধি।

শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া নীলাচলে গান করিতেন,—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে।।

অর্থাৎ 'যিনি কৌমারকালে রেবা নদীর তীরে আমার চিত্ত-বিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার এখন কান্ত হইয়াছেন, সেই মধুমাসের রাত্রিও উপস্থিত, উন্মীলিত মালতী-পুষ্পের সৌগন্ধও আছে, কদম্ব কানন হইতে বায়ুও মধুর রূপে বহিতেছে, সুরতব্যাপারলীলা-সাধিকা আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত, তথাপি আমার চিত্ত এই অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবা তটস্থ বেতসীতরু তলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে এই শ্লোক শুনিয়া হয়ত প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বাহ্য লোকাচার মনে করিত; সন্ন্যাসী কিন্তু একমাত্র মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ-দামোদরই মহাপ্রভুর

অন্তর জানিতেন—মহাপ্রভু কেন ঐ শ্লোক পাঠ করেন, তাহা বুঝিতেন, আর বুঝিতেন শ্রীরূপ। তাই প্রাকৃত আলঙ্কারিকের সেই শ্লোকটির যে তাৎপর্য্য মহাপ্রভু আস্বাদন করেন, তাহা শ্রীরূপ অপ্রাকৃত ভাষায় অপ্রাকৃত ছন্দে প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভুর হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিয়া দিলেন,—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুর মুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি।।

'হে সহচরি, আমার প্রিয়তম কৃষ্ণ আজ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন সত্য, আর আমিও সেই রাধা সত্য, আমাদের মিলন সুখও তাই বটে, তথাপি বৃন্দাবনের বন-মধ্যে, লীলা লাস্যবিলাসী-মুরলীর পঞ্চমতানে আনন্দ বন্যা-বাহী যামুনপুলিনবনের জন্য আমার উৎকণ্ঠা হইতেছে।'

"কালিন্দী পুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি"—সম্ভোগে বিপ্রলম্ভের স্ফূর্ত্তি, হে কৃষ্ণ! কুরুক্ষেত্রে তোমার দেখা পাইলেও হাতী, ঘোড়া, রথ, রাজদণ্ড, রাজপোষাক, বহু লোকজন সারথি, অনুচর প্রভৃতির নিকট হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়া তোমার প্রিয় বৃন্দাবিপিনের কুসুম, কিশলয়, কদম্ব, যামুনসৈকত, ময়ূর, গাভী প্রভৃতির নিকট তোমাকে লইয়া যাইব।"

"'পঞ্চম-তান' অর্থে তুরীয়াতীত পঞ্চম মান (fifth dimension—Infinite dimensions) কৃষ্ণের বংশীর পঞ্চমতান একই সঙ্গে পঞ্চ প্রকার রসিকগণকে তাহাদের স্ব-স্ব অধিকারোচিত সেবায় আকর্ষণ করিতেছে। গো, বেত্র, বেণু, যমুনা, যামুন-পুলিন, কদম্ব, বংশীতানে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, বংশী স্বয়ং কৃষ্ণের অধরামৃত সংযুক্ত আকর্ষণে নিজ রবে নিজেই আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যাকুল হইতে ব্যাকুলতর হইয়া পড়িয়াছেন, কৃষ্ণ উত্তরগোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, বংশীরব শুনিয়া রক্তক, চিত্রক, পত্রক কৃষ্ণের পদধৌতের জলদানের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, সখাগণ বংশী রবে তাঁহাদের স্ব-স্ব সেবাধিকারে আকৃষ্ট ও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, নন্দ যশোদা কৃষ্ণকে স্ব স্ব অধিকারোচিত বাৎসল্য সেবা করিয়া পরোক্ষে বংশীবটবিহারী গোপীনাথের সেবায় আনুকূল্য ও লাস্যই করিতেছেন, কান্তাগণ বংশীধ্বনি শ্রবণে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সুখার্থ কৃষ্ণাভিসারে ধাবিত হইয়াছেন।

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষণ্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তুনঃ।।

(৪)

বেণুং করান্নিপতিতং স্খলিতং শিখণ্ডং ভ্রষ্টঞ্চ পীতবসনং ব্রজরাজসূনোঃ।
যস্যাঃ কটাক্ষশরঘাতবিমূর্চ্ছিতস্য তাং রাধিকাং পরিচরামি কদা রসেন।।

'যাঁহার কটাক্ষ-বাণে ব্রজরাজনন্দন মূর্চ্ছিত হন, হস্ত হইতে তাঁহার বংশী ভ্রষ্ট হইয়া যায়, শিখণ্ড স্খলিত হয়, পীতবস্ত্র শ্লথ হইয়া পড়ে অর্থাৎ যিনি ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণের মনোমোহিনী মন্মথ মন্মথেরও মনোমোহনকারিণী, সেই শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ কবে আমি ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে যে অপ্রাকৃত চমৎকার প্রাচুর্য্যের ভূমিকা স্বরূপ রসের প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তদ্দ্বারা সেবা করিতে পারিব।'

বৃন্দাবন ভগবানের নৈশ বিহারস্থলী, আর রাধাকুণ্ড মাধ্যাহ্নিক বিহার-ক্ষেত্র। কুণ্ডতীরে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা সেবিকা শ্রীরাধার নিজগণের exclusive position.

চন্দ্রাবলী প্রভৃতি পারকীয় বিচারে অবস্থিত হইলেও এবং মুখ্যা গোপীর মধ্যে পরিগণিত থাকিলেও চন্দ্রা, শৈব্যা প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত মিলনের জন্য শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করেন। চন্দ্রাসরোবর, নিম্বগ্রাম প্রভৃতি স্থান গোবর্দ্ধনের নিকট। চন্দ্রাদিযূথেশ্বরীর সহিত তত্তৎ স্থানে তাঁহাদের কুঞ্জে বাসকরা অপেক্ষা তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধাকুণ্ড তীরে চলিয়া গেলেন। আট প্রকার নায়িকা-ভাব যুগপৎ শ্রীরাধাতে মাত্র বর্তমান।

শ্রীগীতগোবিন্দ 'ইতস্ততস্তান্'' ও ''কংসারিরপি'' বৃন্দাবনের রাসস্থলী এবং পরাসৌলির রাসস্থলী উভয় স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধা সঙ্গলোভে লুব্ধ হন। গোবর্দ্ধনের রাসস্থলীর নিকট পৈঠাগ্রামে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া গোপীদিগকে বঞ্চনা করেন। কিন্তু শ্রীরাধিকা উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ আর চতুর্ভুজ রাখিতে পারেন নাই।

শ্রীরাধা নিত্যা কৃষ্ণ-পত্নী। জড় জগতে বহু নায়ক। কিন্তু গোলোকে একমাত্র কৃষ্ণই নায়ক। আর সকল নারী—রমা, লক্ষ্মী, ভগবতী প্রভৃতি সকলেই রাধার কায়ব্যূহ। এজগতের সাধারণ সুনীতি অপেক্ষা গোলোক-নীতি অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ জানাইবার জন্যই অপ্রাকৃত পারকীয় বিচার প্রকাশিত হইয়াছে।

গোপীজনবল্লভই একমাত্র পতি। ''গোপী'' শব্দের অর্থ 'রক্ষিতা'। অর্থাৎ তাঁহাদের সর্ব্ব-স্বত্ব একমাত্র কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রক্ষিত। কৃষ্ণই একমাত্র তাহাদের একচেটিয়া ভোক্তা।

''জগন্নাথ বল্লভ''—নাটকে শ্রীরায় রামানন্দ অরিষ্টাসুরের বাধা অপসারিত করিয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু এত আদর করিয়াছেন। কুণ্ডতীরে ২৪ ঘন্টাকাল শ্রীকৃষ্ণের রাধার নিকটে অবস্থান।

কিন্তু সর্ব্বক্ষণই কৃষ্ণ রাধাকুণ্ডে অবস্থান করেন।

চন্দ্রা, শৈব্যা, ভদ্রা প্রভৃতি রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিতে পারেন না। বল্লভাচার্য্য, হরিবংশ, নিম্বার্ক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের শ্রীরাধাকুণ্ডের ভজন রহস্যে প্রবেশ নাই। তাঁহারা যদিও রাধার অনুগত বলিয়া বলেন, তথাপি গৌড়ীয়গণের সহিত তাঁহাদের বিচারের পার্থক্য আছে। যদিও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দশশ্লোকীর মধ্যে গৌড়ীয় ভজনের অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি তাঁহারা গৌড়ীয়ের ন্যায় রাধার একচেটিয়া সর্ব্বস্ব মধ্যাহ্নবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করেন না। শ্রীরূপানুগভজন-পদ্ধতিতে শ্রীরাধাভাব বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত যে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন 'রাধাকৃষ্ণের' অনুশীলন তাহা অন্য সম্প্রদায়ের আনুকরণিক বিচারে নাই।

বৈকুণ্ঠ অজের অবস্থান ক্ষেত্র বটে, কিন্তু অজবস্তু অজত্ব পরিত্যাগের লীলা প্রকাশ করিয়া নিজের স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করিয়াছেন মথুরায়। মথুরা কেবল জ্ঞান-ভূমি। অজ জন্মগ্রহণ করায় মানব-জ্ঞানের দ্বারা অধিক বোদ্ধব্য হইয়াছে মথুরায় বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা।

বৃন্দাবনে গোপনে নৈশবিহার, আর গোবর্দ্ধনে গরু চরাইবার সময় গোপীগণের সঙ্গে বিহার এজন্য এখানে কৃষ্ণ উদারপাণি—broad-daylight-এ গোপীরমণ কৃষ্ণ। আবার গোবর্দ্ধন হইতে রাধা কৃষ্ণকে লইয়া নিজস্ব স্থানে শ্রীরাধাকুণ্ডে লইয়া যান মধ্যাহ্ন-বিহারের জন্য। শ্রীরাধার স্বায়ত্তীকৃত কৃষ্ণ একমাত্র রাধাকুণ্ডে। রাধাকুণ্ড গৌড়ীয় বৈষ্ণবভজনরহস্যের সর্ব্বোচ্চ দুর্গ। এজন্য স্বয়ং মহাপ্রভু আরিট গ্রামে শ্রীকুণ্ড দেখাইয়া দিলেন। শ্রীরাধিকার পদনখ-শোভায় সকল ethical principle আবদ্ধ আছে, এজন্যই রাধাকুণ্ডে সর্ব্ব তীর্থের আগমন।

"বরজ-বিপিনে যমুনা-কূলে
মঞ্চ-মনোহর শোভিত ফুলে।"

☆ ☆ ☆ ☆

"শত কোটি গোপী মাধব-মন।
রাখিতে নারিল করি' যতন।।"

☆ ☆ ☆ ☆

"রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণ ভজন তব অকারণ গেলা।।"

রাস তিনটি—(১) যামুন রাস (বৃন্দাবনের ধীরসমীরে), (২) পরাসৌলিতে রাস (গোবর্দ্ধনে) ও (৩) রাধাকুণ্ডে রাস। রাধাকুণ্ড হইতে রাধার চলিয়া যাওয়ার কথা নাই।

আশ্রয়-জাতীয় প্রতিকূল চন্দ্রাবলী, শৈব্যা প্রভৃতি এবং বিষয়-জাতীয় প্রতিকূল অভিমন্যু, গোবর্দ্ধন-গোপ প্রভৃতি অপ্রকট লীলায় অবাস্তব বস্তু—ভাব-মাত্ররূপে

বর্ত্তমান। ইহারা উভয় শ্রেণীই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল-বিলাসের ব্যতিরেকভাবে পুষ্টিকারক। বিষয় জাতীয় প্রতিকূলের গণ কৃষ্ণের ব্যতিরেকভাবে আনন্দবর্দ্ধক; আর আশ্রয়-জাতীয় প্রতিকূলের গণ শ্রীমতী রাধারাণীর ও তাঁহার গণের ব্যতিরেকভাবে আনন্দবর্দ্ধক। সুতরাং শ্রীরাধারাণীরগণ শ্রীরাধা ও তদভিন্ন শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা-ব্যতীত স্বয়ং-ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ বা ব্রজকেও চাহেন না।

সখীস্থলী বা চন্দ্রার স্থান শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণ দর্শন করিতে পারে না। সখীস্থলী হইতে আহৃত পলাশপত্রে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুকে মাঠা আনিয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাহা দূরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

'সখীস্থলী নাম শুনি' ক্রোধে পূর্ণ হইলা।
তক্রসহ দোনা দূরে ফেলাইয়া দিলা।।
কতক্ষণে স্থির হইয়া কহে দাস-প্রতি।
সে চন্দ্রাবলীর গ্রাম, না যাইব তথি।।"

শ্রীরূপানুগ-গণের সখীস্থলীর প্রতি আদর নাই। সমঞ্জসা আর তাঁহারই অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়। রতিরস্থান রাসস্থলীতেও তাঁহাদের অধিক-প্রীতি নাই। তাঁহারা শ্রীকুণ্ডতীরকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাসস্থান বলিয়া জানেন।

এই বৃন্দাবনের যে দিকেই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের দৃষ্টি পতিত হয়, সেখানেই তিনি শ্রীবার্ষভানবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহের স্ফুর্ত্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠেন। এই বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য শ্রীরাধাময় হইয়া নিত্য বিরাজিত।

'যতো যতঃ পততি বিলোচনং হরে-
স্ততস্ততঃ স্ফুরতি তদঙ্গ-সংহতিঃ।
ন চাদ্ভুতং তদিহ তু যৎ ব্রজাটবী
মুদে হরেরলভত রাধিকাত্মতাম্।।
তৈরুদ্দীপিতভাবালীবাত্যয়োচ্চালিতং মনঃ।
শশাক ন স্থিরীকর্ত্তুং কাশপুষ্পনিভং হরিঃ।।
(শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত ৬ষ্ঠ সর্গ ২৫, ২৬ শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গমকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলেন,—"হে লতাকুল! তোমরা আমার প্রিয়-সখি; তোমাদের কুশল ত'? হে তরুগণ! তোমরা আমার সখা তোমাদের মঙ্গল ত'? হে মৃগী-মৃগগণ! হে বিহগী-বিহগ-গণ! হে ভ্রমরী-ভ্রমরগণ! হে স্থাবর জঙ্গম! তোমাদের কুশল বিজ্ঞাপন কর। এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যখন গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন শ্রীরাধার প্রতি অনুধাবিত মনকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বয়স্যগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু সখাগণের সহিত ক্রীড়া ও বনশোভা শ্রীরাধাবিরহকে আরও অধিকতর উদ্দীপ্ত

করিয়া তুলিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—যদি শ্রীবার্ষভানবীকে আনাইবার জন্য বৃন্দা, সুবল বা মধুমঙ্গলকে পাঠান যায়, তাহা হইলে আর কিছু অনিষ্ট হউক, আর না হউক, জটিলা জানিতে পারিলে ইহাদের সঙ্গে কলহ করিবে এবং শ্রীমতীকে গৃহের মধ্যে অবরোধ করিয়া রাখিবে। আর যদি শ্রীরাধাকে আনিবার জন্য আকর্ষণী মুরলীকে নিযুক্ত করি তাহা হইলে তাহা শ্রবণ করিয়া সকল ব্রজ-ললনাই আসিয়া পড়িবে। তাহাতেও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং জটিলাকে কোন প্রকারে বঞ্চনা করিবার জন্য ধনিষ্ঠাকে জানাইলেন।'

এমন সময় তুলসী নাম্নী একজন শ্রীমতীর সখী সেখানে আসিলেন। কৃষ্ণ তুলসীর নিকট শ্রীরাধাপ্রাপ্তির ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। তুলসী শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত করিয়া পরে তিনিও শ্রীমতীর দূতীরূপে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতা-অনুসন্ধানের জন্য আসিয়াছেন জানাইলে এবং তাঁহাদের ক্রীড়াকুঞ্জের নির্দ্দেশ জানিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তুলসীকে আপন কণ্ঠের গুঞ্জাহার উপহার দিলেন। বৃন্দা শ্রীরাধাকুণ্ড-সমীপে কন্দর্পকেলি-নামক সুখদ নিকুঞ্জে শ্রীরাধাকে আনিবার জন্য তুলসীকে বলিলেন।

কিন্তু এমন সময়ে চন্দ্রাবলীর সখী শৈব্যা চন্দ্রাবলীকে সঙ্কেত-স্থানে রাখিয়া তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাইবেন—এই মনে করিয়া সেখানে আসিলেন এবং চন্দ্রার প্রদত্ত গুঞ্জাহার শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে প্রদানের সময় বৃন্দার সহিত তুলসীকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধা ও ব্যথিত হইলেন।

শৈব্যা তুলসীর সহিত কপটতা করিয়া শ্রীরাধার অবস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করায় 'শঠে শাঠ্যং' ন্যায়ানুসারে তুলসী শৈব্যাকে বঞ্চনা বাক্য বলিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাহিরে উদাসীন ভাব প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কপটতা করিয়া শৈব্যার নিকট চন্দ্রাবলীর অবস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শৈব্যা জানাইলেন যে, চন্দ্রাবলী কৃষ্ণসঙ্গের জন্য ব্যাকুল হইয়া সখীস্থলীতে অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে আনন্দ পুলকিত হইবার ছল দেখাইয়া বলিলেন—আমি সখাগণকে সাবধান ও গাভীসকলকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া যে পর্য্যন্ত না ফিরিয়া আসি, তুমি সেই পর্য্যন্ত চন্দ্রাবলীকে গৌরী তীর্থে রাখ। এদিকে মধুমঙ্গল ভঙ্গীতে কৃষ্ণকে জানাইলেন যে, ব্রজরাজ নন্দ ধনিষ্ঠাদ্বারা যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, সেই আদেশ এখনই প্রতিপালন করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ শৈব্যাকে বঞ্চনা করিবার জন্য মধুমঙ্গলের কথায় বলিলেন—হাঁ মনে পড়িয়াছে, পিতা নন্দ বসুদেবের দূতের মুখে শুনিয়াছেন যে, কংসচরগণ বৃন্দাবনের সমস্ত গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; সুতরাং সেই উপদ্রব শান্তির জন্য আমাকে কিছুকাল অন্যত্র থাকিতে হইবে। চন্দ্রাবলী যাহাতে উদ্বিগ্ন না হন, তজ্জন্য তাঁহাকে শৈব্যার প্রবোধ দেওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শৈব্যাকে প্রতারণা করিয়া যেন সখাগণের নিকট যাইতেছেন,—এইরূপ ভাবে চলিলেন। শৈব্যাও বঞ্চিত হইয়া হাসিতে হাসিতে চন্দ্রাবলীর নিকট আসিলেন।

এদিকে কৃষ্ণ কিছুদূর গমন করিয়া সে-স্থান হইতে নিবৃত্ত হইয়া শ্রীরাধার সঙ্গের জন্য বিপথ দিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিলেন।

অনেক পদ্মাকর মধ্য সংস্থিতং হরের্বিলাসান্বিতা তীর নীরকম্।
নানাব্জ-কান্ত্যচ্ছলিতং নিরন্তরং গুণৈর্জিতক্ষীরসমুদ্রমদ্ভুতম্।।

স্বসদৃক্তীর নীরেণ কৃষ্ণপাদাব্জজন্মনা।
নিজ পার্শ্বোপবিষ্টেনারিষ্ট কুণ্ডেন সঙ্গতম্।।

তীরে কুঞ্জা যস্য ভান্ত্যষ্ট দিক্ষু প্রেষ্ঠালীনাং স্বস্বনাম্না প্রসিদ্ধাঃ।
তাভিঃ প্রেম্না স্বীয়হস্তেন যত্নাৎ ক্রীড়াতুষ্ট্যৈ প্রেষ্ঠয়োঃ সংস্কৃতা যে।।

(গোবিন্দলীলামৃতং ৭।২৫-২৭)

'আহা! শ্রীরাধাকুণ্ডের তীর ও নীর শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের জন্য কি অদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়াছে! পক্ক ও অপক্ক, ফল, কিশলয়, কুসুম, মুকুল, মঞ্জরী ও লতাভরে অবনত বৃক্ষ-সমূহের ছায়ায় অনুক্ষণ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ বহু সরোবরের মধ্যগত-কমল-সমূহে সাতিশয় শুক্লবর্ণ ধারণ করায় বায়ু দ্বারা আন্দোলিত এবং মন্দ-মন্দ তরঙ্গমালায় লালিত সেই কুণ্ডের জল অকস্মাৎ দেখিলে মনে হয় যেন তাহা ক্ষীর-সমুদ্রকে উপহাস করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে আবির্ভূত কৃষ্ণকুণ্ডের সহিত মিলিত সেই রাধাকুণ্ডের তীরে উত্তরদিক হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুলেখা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, তুঙ্গবিদ্যা এবং সুদেবী এই অষ্ট প্রিয়তম সখীর নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধ কুঞ্জসমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ সকল কুঞ্জে শ্রীরাধামাধব কেলিকলা বিস্তার করিয়া থাকেন। ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্বের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সখীগণ স্বয়ং তত্তৎ কুঞ্জের সংস্কারাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন।'

জড়বুদ্ধিতে শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমনই হ'তে পারে না। ভোগোন্মত্ত ব্যক্তি মনে কর্‌তে পারে যে, সে রাধাকুণ্ডে এসেছে, রাধাকুণ্ড দেখ্‌ছে, তার জল স্পর্শ ক'র্‌ছে, তাঁ'তে স্নান কর্‌ছে। কিন্তু তা'র মধ্যেও অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যে একটা মস্ত ব্যবধান র'য়েছে। রাবণ যেমন মায়াসীতাকে স্পর্শ ক'রে অপ্রাকৃত লক্ষ্মী শ্রীসীতা দেবীকে হরণ ক'রেছে এরূপ মনে ক'রেছিলো, প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ও সেইরূপই মনে করে থাকে। যাঁরা অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হ'য়েছেন, তাঁরা যেখানেই থাকুন তাঁদের হৃদয়ে শ্রীরাধাকুণ্ডের স্মৃতি অনুক্ষণ বিরাজিত থাকে। তাঁ'দেরই প্রকৃত রাধাকুণ্ড বাস ও মঙ্গল হয়।

শ্রীমতী বার্ষভানবী সর্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবা করেন। তাঁ'র মত শ্রীকৃষ্ণের সেবক আর কেউ হ'তে পারেন না। অলঙ্কার শাস্ত্রে 'কলহান্তরিতা', 'প্রোষিতভর্তৃকা', প্রভৃতি

আট প্রকার সেবিকার কথা পাওয়া যায়; বৃষভানুনন্দিনীর পূর্ণমাত্রায় সেই আটপ্রকারের বন্ধু আছেন। এক এক প্রকার বিচারে এক একজন সখী এবং সখীর অনুগত মঞ্জরীগণেরও এক এক প্রকার বিচার। কিন্তু বার্ষবানবীতে সমস্ত বিচার কৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবার জন্য পূর্ণভাবে র'য়েছে।

বৃষভানুনন্দিনী অতি তরল পদার্থ, তাহাই শ্রীরাধাকুণ্ডরূপে প্রকাশিত। শ্রীরাধাকুণ্ডের অপ্রাকৃত বারি ও শ্রীমতী রাধারাণী একই বস্তু। সেই জলে যে সকল পরম সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি অবগাহন ক'রেন, তাঁ'রা চরম মঙ্গললাভ কর্‌তে পারেন। জীবের চরম প্রাপ্য—জীবের আকাঙ্ক্ষার শেষসীমা—প্রয়োজনের পরম প্রয়োজন—চেতন রাজ্যের শেষ কথা—শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান। সুতরাং কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সকল কথা বৃষভানুনন্দিনীতে সর্বক্ষণ পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত। অষ্টসখীর কুণ্ডে এক এক প্রকার ভাব পাই। কিন্তু রাধাকুণ্ড স্থানে যুগপৎ আট প্রকার ভাব লাভ হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু এই সকল কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা ক'রেছেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে মাধ্যহ্নিক অভিধেয়ের বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীরূপরঘুনাথের ভৃত্য কবিরাজ গোস্বামী প্রভু গোবিন্দলীলামৃতগ্রন্থে সেই ভজনপ্রণালী বিচার ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যেও বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট আলোচনা ক'রলে, সেই ভজন কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' ও ' প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভজনরহস্যে' রূপানুগ 'ভজনদর্পণে' এ সকল কথা বিশেষভাবে আলোচিত হ'য়েছে। শুদ্ধ হরিনামের সহিত এ সকল কথা আলোচিত হ'লেই আমাদের মঙ্গল হ'বে।

'কারুণ্যামৃত বীচীভিস্তারুণ্যামৃত-ধারয়া।
লাবণ্যামৃত বন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্।।'

প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভু যে সকল বিচার ক'রেছেন, শ্রীরায় রামানন্দ প্রভু (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদে) যে সকল বিচার ক'রেছেন তাহা আলোচ্য বিষয় হউক। শ্রীবার্ষভানবীর ভাবের অনুকূল যদি চিত্তবৃত্তি হয়, তা' হলেই পরমমুক্ত হ'য়ে যাঘ। শ্রীবার্ষভানবী এখন যে নেই তা' নয়। এখন তাঁকে কোথায় পা'ব? এখনই আমরা তাঁ'কে পেতে পারি, তাঁর সেবা লাভ করতে পারি। আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীবার্ষভানবীর পদনখশোভা' দর্শন করি, তা'হলে শ্রীবার্ষভানবীকে এখন কোথায় পাওয়া যেতে পারে, এরূপ বিচার নষ্ট হ'য়ে যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মেই শ্রীবার্ষভানবীর শ্রীপদনখসেবা আমরা লাভ করতে পারি। মধুর রসে শ্রীগুরুপাদপদ্মই বার্ষভানবীর সখী বা অভিন্ন বার্ষভানবী। যাঁদের ললিতাকুণ্ডাদি নিমজ্জন হ'য়েছে, তাঁ'দের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীবার্ষভানবীর পাদপদ্মে স্বতন্ত্র বিচার আসে না। শ্রীগুণমঞ্জরী প্রভুকে

দেখবার জন্য চক্ষুতারকা যখন অগ্রসর হয়, তখন গুণমঞ্জরীর গুণদর্শনে তাঁ'কে বার্ষভানবী হ'তে আলাদা মনে হয় না। ভজনচতুর ব্যক্তিগণ তা' হতে বুঝে নেবেন। বার্ষভানবীর পাল্য-বিচারে আসলেই আমাদের চরম মঙ্গল হ'বে।

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিত বিবিধ বিকারাদিভূষাপ্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললিতাদ্যালিনর্ম্মাপ্তশাতৌ।
দোলারন্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি।।

(গোবিন্দলীলামৃত ৮।১)

এইস্থান কেবল বৃন্দাবন নহে, কেবল মাত্র গোবর্দ্ধন নহে, সাক্ষাৎ শ্রীবার্ষভানবীর স্থান শ্রীরাধাকুণ্ড—Acme of planes aspired after by Gaudiya Vaishnavas—যাহা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

"বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা মথুরা-নগরী।
জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি।।
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবনধাম।
যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব-কাম।।
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন শৈল।
গিরিধারি-গান্ধর্ব্বিকা যথা-ক্রীড়া কৈল।।
গোবর্দ্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ডতট।
প্রেমামৃতে ভাসাইল গোপাল লম্পট।।
গোবর্দ্ধন-গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি'।
অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জ-পুষ্পবাড়ী।।
নির্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর।
কুণ্ডতীর সর্বোত্তম স্থান প্রেমাধার।।

☆ ☆ ☆ ☆

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্ম্মী।
হরিপ্রিয়জন বলি' গায় সবধর্ম্মী।।
কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরিপ্রিয়তর জন।
সুখভোগ বুদ্ধি জ্ঞানী না করে গণন।।
জ্ঞানমিশ্রভাব ছাড়ি' মুক্ত জ্ঞানীজন।
পরাভক্তি-সমাশ্রয়ে হরিপ্রিয় হন।।
ভক্তিমান্ জন হইতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।
প্রেমনিষ্ঠ হইতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ।।

গোপী হইতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ প্রিয়তমা।
সে রাধা সরসী প্রিয় হয় তার সমা।।
সে কুণ্ড-আশ্রয় ছাড়ি, কোন মূঢ় জন।
অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন।।

☆ ☆ ☆ ☆

অথৈত্য ললিতা মধ্যং তয়োঃ কৃষ্ণং ন্যবারয়ৎ।
কুন্দবল্ল্যাহ তং কৃষ্ণ! পঞ্চদেবার্চ্চনং কুরু।।
কৃষ্ণঃ কুন্দলতামাহ ত্বং মমাস্মিন্ স্মরক্রতৌ।
আচার্য্যা ভব সামগ্রীমধিষ্ঠানঞ্চ মে দিশ।।
সা চাহ না হমাচার্য্যা শ্রুতং নান্দীমুখীমুখাৎ।
সুগোপ্যমপি তদ্ব্রূয়াং যত্ত্বং মৎপ্রিয়দেবরঃ।।
অস্যাঃ পুরঃ সব্যকুচে গণেশ্বরস্ফুরচ্ছিরঃ কুম্ভতয়া প্রকল্পিতে।
নমো গণেশায় ত ইত্যুদীরয়ন্ সমর্পয়াদৌ করহল্লকং স্বকম্।।
নমঃ শিবায়েতি পঠন্ পরেহপরং বক্ষোজলিঙ্গেহর্পয় পাণিপঙ্কজম্।
হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ইত্যদঃ পুনঃ শিরস্যমুষ্যাঃ কুটিলভ্রুবোহপি তৎ।।
ত্বমথ নিজকরাভ্যামেতয়া বারিতাভ্যামপি সুচিবুকমস্যা বেণিমূলং চ ধৃত্বা।
মুখবিধুমনুযত্নাদোন্নমো বিষ্ণবেহস্মা ইতি মনুবরমাখ্যন্ স্বং মুখাব্জং নিধেহি।।
পুনঃ সবিত্রে নমঃ ইত্যুদীরয়ন্নস্যাস্তু ভাস্বত্যধরেহরুণে বলাৎ।
স্ব-দন্ত কুন্দাধর-বন্ধু-জীবকৌ কৃতাবরোধোহপ্যনয়া সমর্পয়।।
অথার্চ্চনায়াং বিহিতোদ্যমহসৌ তাং ভর্ৎসয়ন্তীংকিল কুন্দবল্লীম্।
স্বং তাড়য়ন্তীং শ্রবণোৎপলেন প্রিয়াং স পশ্যন্নবদৎ প্রিয়ালীঃ।।
সখ্যঃ! স্মরমখারম্ভে পঞ্চদেবার্চ্চনা ময়া।
কর্তব্যা বিঘ্নশান্ত্যৈ কিং শুভে খিদ্যতি বঃ সখী।।
(গোবিন্দ লীলামৃত ৯ম সর্গ ৬৮-৭৬ শ্লোক)

কুন্দলতার শ্রীকৃষ্ণকে রাধার নব অঙ্গে নবগ্রহের পূজার পরামর্শ বা শ্রীরাধা কর্তৃক কৃষ্ণকে অষ্ট দিক্‌পালের পূজার পরামর্শ প্রদান করিয়া নিজস্ব অষ্টসখীকে কৃষ্ণের দ্বারা সম্ভোগ করাইবার চেষ্টা ( গোবিন্দ লীলামৃত ৯ম সর্গ ৯১-৯৮) প্রভৃতি সকলই কৃষ্ণকন্দর্প-মহাযজ্ঞের সংবিধানের প্রয়াস, অর্থাৎ সর্বপ্রকারে, সর্বতোভাবে, সর্বেন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত মদনমোহন কৃষ্ণের-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছারূপ প্রেমাই ইঁহাদের কাম্য। এজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জনাইয়াছেন,—

'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম।।

কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমত' প্রবল।।
লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম-কর্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ মর্ম।।
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন।।
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম-সেবন।।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ।।
অতএব কাম-প্রেম বহুত অন্তর।
কাম-অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্কর।।
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ।।
আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে সব ব্যবহার।।
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।।
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।।
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে।।
তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহোত' কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত।।
এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ-কারণ।।
এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জন ভূষণ।।

মধুররতিতে আশ্রয়বিগ্রহগণের মধ্যে "সখী" ও 'মঞ্জরী' দুইটী শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মঞ্জরীগণ সখীর দাসী বা অনুগতা অভিমান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ সখীর অপেক্ষা শ্রীরাধিকার দাস্যই অধিকতর শ্লাঘ্য বিচার করিয়া থাকেন। 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলীতে' শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

'পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্।।'

'হে দেবি! রাধিকে তোমার পাদপদ্মের দাস্য ব্যতীত আমি কখনও অন্য সখিত্বাদি প্রার্থনা করি না। তোমার সখিত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক। আর তোমার দাস্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক।'

সখী কখনও বলেন না যে ''আমি সখী'', সখী কখনও কৃষ্ণসেবা করিতে ধাবিত হন না। সখীর আনুগত্যে বার্ষভানবীর সেবাই প্রকৃষ্ট কৃষ্ণ-সেবা।

''স্বরূপসিদ্ধি'' ও ''বস্তুসিদ্ধি'' নামে দুইটী কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম শরীর বা জড়ীয়-বাসনা কোষ হইতে মুক্ত না হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই সূক্ষ্মশরীরের পতন বা জড়ীয়বাসনা নির্ম্মুক্তির নামই স্বরূপ-সিদ্ধি। এই স্বরূপসিদ্ধি লাভের পর যখন ভজন করিতে করিতে এই জগৎ হইতে উৎক্রান্ত-দশা লাভ হয়, অর্থাৎ যখন এই শরীরের পতন হয়, তখনই তাহা বস্তুসিদ্ধি। বস্তুসিদ্ধি দশার পর আর জন্মগ্রহণ করিব না।

'শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি।
কৃষ্ণপ্রিয়া মধ্যে তাঁর সম নাহি ধনী।।
মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে।
গান্ধর্ব্বিকা তুল্য কুণ্ড করয়ে গগণে।।
নারদাদি প্রিয়বর্গে যে প্রেম দুর্লভ।
অন্য সাধকেতে তাহা কভুনা সুলভ।।
কিন্তু রাধাকুণ্ডে স্নান যেইজন করে।
মধুর রসেতে তার স্নানে সিদ্ধি ধরে।।
অপ্রাকৃতভাবে সদা যুগল-সেবন।
রাধা পাদপদ্ম লভে সেই হরিজন।।

চারপোয়া ধর্ম্মের প্রতীক হচ্ছে—বৃষাসুর বা অরিষ্টাসুর। আরিটগ্রামে কৃষ্ণের দ্বারা। অরিষ্টাসুর নিহিত হওয়ার পরই আধ্যক্ষিকতার চিন্তাস্রোত ধ্বংস হ'য়ে গেল। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কামনামূলে চতুষ্পাদ ধর্মঃ; পঞ্চম বিচারে শ্রীরাধাকুণ্ড। রাধিকার মনোবৃত্তিতে কৃষ্ণসেবা করার ন্যায় সর্ব্বোত্তম ব্যাপার আর নাই,—ইহাই হচ্ছে ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধাকুণ্ড পূর্ণ-সেবামৃতে প্লাবিত হ'য়েছে। এখানে নায়িকার অষ্ট প্রকার ভাবযুক্ত শ্রীরাধা পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণসেবা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রে যে পূর্ণতার বিচার প্রকাশিত হয়েছে, যে চরম সেবারসের প্লাবন প্রবাহিত হ'য়েছে তা শ্রীরাধাকুণ্ডেই দর্শন হয়। জয়দেবপ্রভু অষ্টপদী লিখে দশাবতারের কারণের কারণ ও অপ্রাকৃত যে

চরমলীলার কথা কৃষ্ণপাদপদ্মে আবদ্ধ র'য়েছে ব'লেছেন, সেই কৃষ্ণের সেবা শ্রীরাধার মনোবৃত্তিতে ক'রতে হ'বে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা—সর্ব্বশেষ কথা হ'চ্ছে কুণ্ড দর্শন।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপিষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা।।

আশা ভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ কালা ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে প্রাণৈর্ব্রজে ন চ বরোরু বকারিণাপি।।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেছিলেন যে কুণ্ডতীরে ভজন ক'রবার নাম করে এগারটা সহজিয়া তথায় জমেছে। তা'রা কুণ্ডকে মলিন ক'রবার চেষ্টা ক'রেছে। আজকাল বোধহয় তার অনেকগুণ অধিক প্রাকৃত সহজিয়া তথায় জুটে গেছে। অপ্রাকৃত হরিকথার টিউব দিয়ে খুব ভিতর থেকে শ্রীকুণ্ডের নির্মল জল বের ক'রতে হ'বে। প্রাকৃত সহজিয়াদের অত্যাচারে রাধাকুণ্ডের জলে তা'দের বিচারে সেওলা পড়ে গিয়েছে। অপ্রাকৃত শ্রীকুণ্ডের জল মলিন হয় নাই, প্রাকৃত-সহজিয়াদের ভজনের অভিনয় কতটা মলিনতাগ্রস্ত হ'য়েছে তা প্রদর্শনের জন্যই লোকে শ্রীকুণ্ডের অপ্রাকৃত-স্বরূপ ঐরূপ শৈবালদ্বারা আচ্ছাদিত দেখছে।

শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যকুঞ্জ আছে, সেস্থানে তিনি সেবাপ্রভাবে কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিয়াছেন; সে স্থান হইতে কৃষ্ণ একমুহূর্ত্তও অন্যত্র যাইতে পারেন না। গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে গোষ্ঠ নাই। ''রাধাকুণ্ডং গিরিবরোমহো রাধিকা-মাধবাশাং'' শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলেই শ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ সেবা লাভের আশা।

# সপ্তম অধ্যায়

## হরিসম্বন্ধিবস্তুনি প্রাকৃতবুদ্ধির্ন কর্ত্তব্যা

### (১)

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।

সত্রযাজী-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।।

সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।

বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।।

ব্রাহ্মণ-জীবনের একমাত্র কর্তব্য 'বৈষ্ণবতা' যাহা কোটি কোটি জন্ম বৈদান্তিক হইবার পর লাভ হয়; বাংলায় কেবলাদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন,—আমরাই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু অন্য কাহারো কথা নয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ব্যাসদেব লিখিয়াছেন,—"সহস্র সহস্র বাহ্মণের মধ্যে একজন যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের মধ্যে একজন বৈদান্তিক-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এইরূপ কোটি বৈদান্তিকের মধ্যে একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, আবার বিষ্ণুভক্তি সহস্রের মধ্যে একান্তিক-বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।" বিষ্ণুসেবা সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

কাহাকেও 'বৈষ্ণব' বলিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমেই জানিতে হইবে, তিনি ভগবানের নিত্য নাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ, নিত্যপরিকর বৈশিষ্ট্য ও নিত্যলীলা স্বীকার করে কিনা? তাহা না হইলে তিনি যদি নিজে নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলেন বা জগতের অসংখ্য নির্ব্বিশেষ বিচারপরায়ণ সিদ্ধ, ভক্ত বা অভক্তসমাজ তাঁহাকে বৈষ্ণব বলেন তাহা হইলে আমরা সেই মতে ভোট না দিয়া সতর্কতার সহিত সেই বিচার গর্হণ করিব।

নির্মল নিরপেক্ষ আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তিই ভগবৎসেবা, তাহাতে অশান্ত হইবার বিচার নাই। ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ 'ভোগ অথবা ধর্ম্মার্থকাম-বর্জ্জিত' 'ত্যাগ'—উভয়ই আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তিকে লাভ করিতে দেয় না। আবার আত্মার নিত্যস্বভাব ভজন-প্রবৃত্তি কথঞ্চিত উদিতা হইলেও বদ্ধজীবের বিপথ গমনে সম্পূর্ণ অধিকার থাকে। নিষিদ্ধ আচার, কৌটিল্য, পরহিংসা প্রতিষ্ঠাশা, অপরের নিকট সম্মানলাভের স্পৃহা ও জড়ভোগ্য বিষয়লাভের আকাঙ্ক্ষা আত্মার সেবাপ্রবৃত্তিকে জলাঞ্জলি দেয়। এই সকল উৎপাত উপস্থিত হইলে ভগবানে প্রীতি-রহিত হওয়া স্বাভাবিক। তখন আর আমাকে প্রকৃত ভক্ত হইতে দেয় না। প্রাকৃত অহঙ্কার আসিয়া কর্তৃত্বাভিমানে নিযুক্ত করে।

“হরিজন” পরম শুদ্ধ—পরম নির্ম্মল কিন্তু অধুনা ইহাকে বিকৃত করিবার জন্য কতকগুলি নিতান্ত ঘৃণিত কদাচারসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধেই ‘হরিজন’ শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। বৈষ্ণব হওয়া—‘হরিজন’ হরিজন হওয়া যে অত্যন্ত ঘৃণিত কার্য্য ইহাই প্রকারান্তরে সাব্যস্ত হইয়াছে! আজকালকার বিচার এমনই উল্টাপাল্টা! আত্মবিৎই ‘হরিজন’; কিন্তু অনাত্মবিৎকেই ‘হরিজন’ করিয়া দিতেছে! কি কুচেষ্টা!! ‘যে কোন কুলেই উদ্ভব হউন না কেন, “সর্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাশ্চ”—এই বিচার ছাড়িয়া দিয়া যে সকল পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে বলা যাউক ব্রাহ্মণ ইহাই হইয়াছে অধুনাতন বিচার।

‘হরিজন’ শব্দের ন্যায় ‘জয়ন্তী’ শব্দটিরও আজকাল যথেষ্ট অপব্যবহার হইতেছে। যাহারা এক চড়ে মরিয়া যায়—নানা অনর্থ প্রপীড়িত সে-সকল মরণশীল মানুষের জন্য ‘জয়ন্তী’ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ভাষার কি দুর্গতিই না হইয়াছে! কোটি কোটি ব্রাহ্মণ-জন্মের পর যে বৈষ্ণবপাদপদ্মে উপনীত হইবার যোগ্যতা লাভ হয়, সেই ‘হরিজন’ বা ‘বিষ্ণুজন’ শব্দদ্বারা depressed class-কে মাত্র উদ্দিষ্ট করা যে শব্দের কিরূপ অপব্যবহার, তাহা ভাষা-দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। ‘হরিজন’ শব্দ caste Hindus-এর জন্য উদ্দিষ্ট নহে। অতি নিকৃষ্ট পদবীকে সর্বোত্তম পদবীর সহিত এক করিবার বিচার যে কি প্রকার মাৎসর্য্য পরিপূর্ণ তাহা বিচার করিবার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কি নিতান্তই অভাব হইবে?

ওঃ! কি বিষ্ণু বিরোধের চেষ্টা! কর্ম্মফলবাধ্য মানবের জন্মদিনকে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের জন্মতিথির অনুকরণে “জয়ন্তী” বলা হইতেছে। ভগবৎ সেবায় যাঁহাদের চেতনতা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারাই ‘হরিজন’। তাঁহাদের নাম অনুকরণ করিয়া অস্পৃশ্য জাতি—‘হরিজন’ (?) হইল, দরিদ্রগণ হইল ‘নারায়ণ’ (?) এরূপ কুমত সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। অস্পৃশ্য জাতি যদি ‘হরিজন’ (?) হইল, দরিদ্রগণ যদি ‘নারায়ণ’ (?) হইল তাহা হইলে হরি বিরোধী জনগণই কি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিল? তবে ইহা সাক্ষাৎ কলির বিচার।

বর্ত্তমানে অবৈষ্ণবের সংখ্যাধিক্য অধিক বলিয়া অবৈষ্ণব ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণব স্মৃতির সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য অবৈষ্ণবের যে সকল স্মৃতিবিধান রাজস ও তামস শাস্ত্র হইতে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাই হিন্দুধর্ম্মের বিধি বলিয়া বঙ্গদেশীয়গণ মানিয়া লইয়াছেন। সাধারণ লোক সংখ্যাধিক্যের মতকেই সত্য মনে করে। কিন্তু সত্য সংখ্যাধিক্যের দ্বারা পরিমাপ করা যায় না।

যখন শ্রীমদনমোহন মালব্য মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট আমি হরিজন ও প্রকৃতিজনের পার্থক্যের কথা কিছু বলিয়াছিলাম। ‘হরিজন’

শব্দটী বৈষ্ণবের পরিভাষা। জীবমাত্রই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব বা হরিজন হইলেও যখন তাহাতে প্রকৃতিবশ্যতা দেখা যায়, তখন তাহার হরিজনত্ব অপ্রকাশিত। সাত্বত স্মৃতিশাস্ত্র বলেন,—

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতোরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ।।

William Pitt এবং Chatham Pitt এক পরিবারে দুইজন প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister) হইয়াছিলেন বলিয়া যে সেই বংশের সকলেই Prime Minister হইবেন তাহা নহে। ডাক্তারের ছেলে যে সকল সময়ে ডাক্তার হইবে তাহা নহে।

শ্রীচৈতন্যদেব সাধারণ লোকের ধারণায় জাতিভেদ মানা বা না মানা ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, বরং অভক্ত কর্ম্মজড় সমাজে যাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত না হয় এবং অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মিলে পাছে জগতে আরও অধিকতর উৎপাত উপস্থিত হয়, তজ্জন্য তিনি বঞ্চিত অভক্তকুলকে বিমোহিত করিয়া তাহাদের দৃষ্টিতে বাহ্যে লোক-ব্যবহার স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তগণে তিনি কোনদিন জাতিবুদ্ধি করেন নাই। তিনি অভক্ত ব্রাহ্মণব্রুবের অন্ন গ্রহণ করেন নাই; তিনি বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ, লক্ষ হরিনাম গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ, এমন কি অস্পৃশ্যতোয় সানোড়িয়ার হস্তে পর্যন্ত তাঁহাদের হরিভক্তি দর্শনে উঁহাদিগকে ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণবিচারে তাঁহাদের হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। আবার তিনি দাস গোস্বামীর নিকট হইতে মহাপ্রসাদ কাড়িয়া লইয়া খাইয়াছেন। তাঁহার অভিন্নস্বরূপ জগদ্‌গুরুনিত্যানন্দ দ্বারা তিনি যে কোন কুলব্রুব ভক্তগণের পাচিত অন্ন গ্রহণ করাইয়া বৈষ্ণবে ও মহাপ্রসাদে জাতিবুদ্ধি বা ভাত-ডাল বুদ্ধি করা অত্যন্ত অপরাধের কথা, এই উপদেশই জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। বর্তমান অদৈব কর্ম্মজড় স্মার্তসমাজ-প্রচলিত জাতিভেদ-প্রথা এবং ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্তিত উচ্ছৃঙ্খলতা উভয়ই মৎসরতাযুক্ত। কর্ম্মজড়স্মার্তগণ তথাকথিত ব্রাহ্মণ উভয়েই পরস্পর মৎসরতা ও প্রতিহিংসামূলে একে অন্যের প্রতি বিরোধ পোষণ করেন। কিন্তু বৈষ্ণববগণ নির্মৎসর, তাঁহাদের যাবতীয় কার্য কৃষ্ণসেবানুকূলপর পূর্বোক্ত পরস্পর বিরোধী সমাজের ন্যায় স্ব-স্ব ভোগপর নহে। বৈষ্ণবের বিচারে যে কার্যে কৃষ্ণসেবাগন্ধ নাই, সে কার্য জাগতিক বিচারে পরম শ্লাঘ্য হইলেও অত্যন্ত ঘৃণ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈব বিষ্ণুভক্তিপর বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া হরিভজনের আদেশ করিয়াছেন। বর্তমানে ধর্ম বিকৃত-সমাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—সমাজ চিরকালই বিশুদ্ধ ভক্তিধর্মের অধীন থাকিবে, তবেই হরিসেবানুকূল বলিয়া সমাজের মূল্য, নতুবা উহা অদৈব বা আসুর সমাজ।

জগতে দুই প্রকার সৃষ্টি এবং সৃষ্টিভেদে দুই প্রকার রুচি। শ্রীগীতা বলেন,—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

শ্রীব্যাসদেবও পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন,—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।।

একপ্রকার সৃষ্টি—দেবসম্বন্ধিনী সৃষ্টি, আর একপ্রকার সৃষ্টি—দেববিরুদ্ধ সম্বন্ধিনী সৃষ্টি। দেবসম্বন্ধিনী সৃষ্টিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আবদ্ধ। সত্যযুগের প্রারম্ভ হইতে এই দুইপ্রকার সৃষ্টি বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী বলিয়া 'অসুর'-নামে পরিজ্ঞাত। ইঁহারা কশ্যপ ঋষির সন্তান। কশ্যপঋষি ব্রাহ্মণ। হিরণ্যকশিপু ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভুত হইয়াও বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের বিরোধ-হেতু অসুর হইয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণকুলেও অসুর জন্মিয়া থাকে। আবার অসুরকুলেও বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিতে পারেন; যেমন, হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ। ত্রেতাযুগে বিশ্বশ্রবা ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের বিরোধ হেতু 'অসুর' বলিয়া পরিচিত।

সর্ব্বশাস্ত্র সম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবতে দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিচারে এইরূপ বিধি দৃষ্টি হয়,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।।"

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতি-মাত্রাদিত্যাহ,—যস্যেতি। যদ্‌যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ।।"

অর্থাৎ লক্ষণ বা বৃত্তিদ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে,—ইহাই দৈববর্ণাশ্রমবিধি। কেবল জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণতা-নিরূপণ—গৌণবিধি। বৃত্ত বা গুণ-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-নিরূপণই বৈদিক মুখ্যবিধি। অন্য বর্ণোৎপন্ন ব্যক্তিতেও যদি ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ ব্যঞ্জক গুণ দৃষ্ট হয়, তবে তাঁহাকে অবশ্য সেই সেই গুণানুসারে তত্তদ্‌বর্ণে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিবে—অন্যথায় প্রত্যবায় ঘটিবে।

কালের করাল গতিতে দেবতাগণের বিচারপ্রণালী বিপন্ন হওয়ায় আসুর বর্ণাশ্রম প্রচলিত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় বিচার ও আত্মবিচার শিথিল হইয়া শুক্রশোণিতজাত দৈহিকবিচার, অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গজ স্থূলদেহগত বিচার প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। তথাপি দৈববিধিরই পুনঃ প্রবর্ত্তন হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—হরিদাস নামক কোন বালক মাতৃক্রোড়ে অবস্থানকালে নগ্ন ছিল, তখন লোকে তাহাকে 'নেংটা হোরে' বলিয়া ডাকিত। কিছুদিন পরে ডি-এল পাশ করিয়া উকীল হওয়ার পর পাড়ার লোকেরা তাহাকে "নেংটা হোরে আবার উকীল!" বলিয়া বিদ্রূপ করিল। তাহাতে হরিদাসের ওকালতির বাধা হইল না।

বেদশাস্ত্রের মধ্যে ঋগ্‌বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। যে ব্যক্তি বেদবিরোধী, সেই অসুর বলিয়া কথিত। সেই ঋগ্‌বেদের একটী প্রধান মন্ত্র, যাহা ব্রাহ্মণমাত্রেরই আচমনীয়

মন্ত্র—যে মন্ত্র ব্রাহ্মণের নিত্যপাঠ্য—সর্ব্বাগ্রে পঠনীয় মন্ত্র,—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।
ওঁ বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।।"

সেই বিষ্ণুবস্তুই সদ্‌বস্তু—নিত্যবস্তু। সূরিগণ দিবালোকে সূর্য্যের ন্যায় সেই সদ্বস্তুর পরম বা শ্রেষ্ঠপদই নিত্যকাল ভজন করেন।

আপনারা ঋগ্‌বেদে অনেকগুলি দেবতার নাম পেয়েছেন, কিন্তু বিষ্ণুর পদই পরমপদ ও নিত্যপদ, সূরিগণের নিত্য ভজনীয় ও দর্শনীয় পদ; আর আর বাদবাকী সমস্ত পদই বৈষ্ণবপদ বা সূরিপদ। তেত্রিশকোটী দেবতা সকলেই বিষ্ণুর সেবকসম্প্রদায়। সকল দেবতার পরমদেবতা ভগবান্ বিষ্ণু। ভগবান্ বিষ্ণুকে যাঁহারা দর্শন করেন বা জানেন, তাঁহারাই দেবতা। দেবতা বা বৈষ্ণব হইলেই বুঝিতে পারা যায়,—কাঁহার আরাধনা সর্ব্বজীবের নিত্য কর্ত্তব্য, কাঁহার পদই বা পরমপদ এবং কাঁহার পরমপদ সর্ব্বদা দর্শনীয় ও ভজনীয়। যে-সকল লোক বিষ্ণুর সহিত অন্যান্য দেবতাকে সমজ্ঞান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে 'অবৈষ্ণব' বলা হইত। ব্রাহ্মণ-নামে পরিচয় দিয়া বৈষ্ণববিদ্বেষ, বিষ্ণুবিদ্বেষ, বিষ্ণুতে প্রাকৃতবুদ্ধি, নারায়ণে শিলা-জ্ঞান, পাদোদকে জলবুদ্ধি, শ্রীমহাপ্রসাদে ডাল-ভাত-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য প্রাগুদাহৃত উকিল হরিদাসকে নেংটা হোরে বলার ন্যায় মূর্খতা বা নাস্তিকতার পরিচয় মাত্র। বর্ত্তমান সাহজিক গৌড়ীয়-সমাজ অবৈষ্ণব; সুতরাং অবৈদিক পঞ্চোপাসক স্মার্ত্তপর সমাজের আনুগত্যে এরূপ মূর্খতা-প্রযুক্ত বৈষ্ণব-বিদ্বেষ অত্যন্ত ঘৃণার্হ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্যযুগের প্রারম্ভ হইতে এইরূপ বিষ্ণুবিদ্বেষ ও বৈষ্ণব বিদ্বেষ দেখা যায়।

অনর্থযুক্ত জীবের জন্য বর্ণাশ্রমের বিশেষ উপযোগিতা আছে। তবে অবৈধ বর্ণাশ্রম স্বীকার্য নহে। বর্ত্তমান-কালে বৈধ বর্ণাশ্রমের বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণের সন্তানকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া উপনয়নসংস্কার প্রদান করিলে তিনি যদি ব্রহ্মণ্যদেবের উপাসনায় মনোনিবেশ না করিয়া ইতর কার্য্যে ধাবিত হন, তবে তাঁহার উপনয়নসংস্কার-গ্রহণের প্রয়োজন ছিল কি? বিবাহের পূর্ব্বে যেরূপ কন্যাকে 'ভার্য্যা' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তদ্রূপ অষ্টম-বর্ষে ব্রাহ্মণের সন্তানকে যে 'ব্রাহ্মণ'-নামে নির্দ্দেশ, তাহাও প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণতা-মাত্র। শাস্ত্রে এইজন্য বৃত্তব্রাহ্মণতার কথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি ব্রাহ্মণবৃত্তে অবস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহাকে বলপূর্বক 'ব্রাহ্মণ' করা যায় না।

বালকের বৃত্তিদর্শনে আচার্য্য তাহার বর্ণনির্দ্দেশ করিবেন। সরলতা ও সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণতার পরিচায়ক। সরল ও নিষ্কপট ব্যক্তিই কৈতব-রহিত ভগবদ্ভক্তিকে আশ্রয় করেন। হারিদ্রুমত-গৌতম সত্যকাম জাবালের সত্য সারল্য-বৃত্তি দর্শন করিয়াই তাহার বর্ণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং বৃত্তব্রাহ্মণতাই শ্রৌতপথ। শ্রৌতপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া

গুণ-কর্ম্মের অনাদরপূর্ব্বক কেবলমাত্র সাধারণ মেয়েলীমতের অনুসরণ কখনও প্রকৃত আচার্য্যের ধর্ম্ম নহে। দীক্ষার পূর্ব্বে সরলতা ও সত্যবাদিতা অর্থাৎ শিষ্যের হরিভজন-স্পৃহা দর্শন করিয়া শ্রীগুরুদেব যে-কোন-কুলোদ্ভূত পুরুষকে পারমার্থিক-ব্রাহ্মণতায় অধিকার দেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের পঞ্চম-বিলাসে শ্রীল গোপালভট্ট-গোস্বামি-প্রভু শ্রীবিষ্ণু-যামলের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলেন,---

'কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভাবিতঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ।।
অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষমাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা।।''

সাত্বত আগম বা তন্ত্রই---পঞ্চরাত্র। সুতরাং কলিতে যে তন্ত্রবিধানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-প্রণালী বলিয়াই জানিতে হইবে। শ্রীনারায়ণ স্বয়ং পঞ্চরাত্র-বক্তা; শ্রীনারদ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভাগবতগণও পঞ্চরাত্রের বক্তা। শ্রীহরির উপাসনা ব্যতীত অন্য নশ্বর ভোগবাদ সাত্বত-তন্ত্রে স্থান পায় নাই।

মঃ ভাঃ শাঃ পঃ মোঃ ধঃ পঃ—৩৪৮ অঃ ৬৮ শ্লোক---

''পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্।
যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ।।
এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ।
পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পঞ্চরাত্রন্তু কথ্যতে।।''

সাত্বতপঞ্চরাত্রের মতে, দীক্ষিত বৈষ্ণবই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ। অসাত্বত তন্ত্র বেদবিরুদ্ধ বলিয়া বিষ্ণু-ব্যতীত অন্যান্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত কোন ব্যক্তিই বৈদিক ব্রাহ্মণতা লাভ করিতে পারেন না। ব্রহ্মসূত্রে পাশুপতাধিকরণই তাহার প্রমাণ। একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্যই বিষ্ণুদীক্ষা-দ্বারা দীক্ষিতকে ব্রাহ্মণজ্ঞানে বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার দিতে সমর্থ।

দীক্ষা দ্বিবিধ—বৈদিকী ও বেদানুগা। বেদানুগা দীক্ষা আবার দ্বিবিধা---পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী। যোগ্য-জনে সংস্কৃত দ্বিজের দীক্ষাই ' 'বৈদিকী', অযোগ্যজনে অধিকারি-জ্ঞানেই 'পৌরাণিকী' দীক্ষা' এবং অনধিকারী-বিচারে ভাবি-যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যেই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা, বিহিত। এইজন্যই শ্রীহরিভক্তি-বিলাস কলিকালে বৈদিকী দীক্ষার সম্ভাবনা নাই বলিয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস পৌরাণিকী দীক্ষার বিস্তৃতপদ্ধতির মধ্যে দীক্ষার অঙ্গ-বর্ণনে দশসংস্কার-বিধানের যোগ্যতা আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া ক্রমদীপিকা, সারদাতিলক,

রামার্চ্চনচন্দ্রিকাদির পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন এবং দীক্ষার অনুকূলে তত্ত্বসাগরাদি আগমবিধির কথাই সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন,—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।।"

দীক্ষা-বিধানের অন্তর্গত প্রণালীর মধ্যেই বৈদিক উপনয়নসংস্কার অন্তর্নিহিত থাকে। দীক্ষা-কালেই অনধিকারিমানবের দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়। দীক্ষা সমাপ্ত হইলে আর তাহার মধ্যবর্ত্তিকালীন মৌঞ্জিবন্ধনাদি অনুষ্ঠানসমূহ অবশিষ্ট থাকে না; —তাহা পূর্ব্বেই সাধিত হইয়া যায়।

কেবলমাত্র শৌক্রবিধানের পক্ষপাতী পঞ্চোপাসক স্মার্ত্তগণ শূদ্র-দীক্ষা-বিধান বলিয়া যে বিচার করিয়াছেন, তাহা দীক্ষা-শব্দ বাচ্য নহে। তাহাকে নামাপরাধ বা দীক্ষা-বাধ বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ দীক্ষা-দান-চাতুর্য্যদ্বারা যে কৃত্রিমতা সাধিত হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবগণ বা পারমার্থিকগণ বলেন যে, উহা—নব্যস্মার্ত্তের মনগড়া ও কাল্পনিক।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র (ভরদ্বাজ-সংহিতা—২।৩৪) বলেন,—

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ।।"

আচার্য্য গুরুদেব স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র প্রভাবে পুত্র ও শিষ্যাদির পুনর্জন্ম হয়। তখন বিনীত পুত্র ও শিষ্যদিগকে বৈদিক দশ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে 'ব্রহ্মচারী' করাইয়া মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ শিক্ষা দিবেন,—ইহাই পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-বিধি।

শ্রীমহাভারতের (অনু-শাঃ পঃ ১৪৩ অঃ ১৪৬)—

"শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।"

যে ব্যক্তি দীক্ষিত হইয়াছে সে ঠাকুরের সেবা করিবে ঠাকুরের ঘরে ঢুকিবে। শালগ্রামের পৈতা চুরি করিবার জন্য কি ঠাকুর ঘরে ঢুকিতে দেওয়া হইবে? যে ঠাকুরের ভোগের আগেই নৈবেদ্য খাইয়া ফেলিতে চাহে ঐরূপ ব্যক্তিকে ঠাকুর ঘরে ঢুকতে দেওয়াই কি উদারতা? common mob-কে দিব্যজ্ঞান কে দিয়াছেন? কাঠুরিয়া যদি কুঠার হস্তে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করে এবং কুঠার লইয়া বলে, দেখি আমি কুঠার দিয়া ঠাকুর চলা করিতে পারি কিনা তাহা হইলে কি ঐরূপ ব্যক্তিকে ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে? পরমহংস? ইন্দুরে শিবের পল্‌তে চুরি করিতেছে দেখিয়া শিব পূজা ছাড়িয়া দিলেন।

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।।"

স্মার্ত্ত ও আধ্যক্ষিকের বিচার কখনই গ্রাহ্য নহে। কিছু মন্ত্র আওড়াইয়া অচিৎ পদার্থকে কপটতা করিয়া পবিত্র বিচার করা অচেতনকে চেতন কল্পনা করা কাঠপাথরকে পূজ্য বুদ্ধি করা প্রভৃতি অচিতের কথা। বৈষ্ণব ও মহাপ্রসাদকে যিনি অসৎ মনে করেন তাঁহাতে খণ্ডিত বিচার করেন তাঁহার বিচার তাঁহাকে প্রাকৃত সহজিয়া ধারায় প্রতিষ্ঠিত করাইবে। শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দিরাদি Archaeological exploits নহে। শ্রীবিগ্রহ, নাম-মন্ত্র ও গুরু-বৈষ্ণবে প্রাকৃত-বুদ্ধি ও জাতি-সামান্য-বিচার নারকীয় কার্য্য।

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি-র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্য বুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।

চিন্ময় প্রতীতিযুক্ত ঠাকুরসেবা আর অচিন্ময় প্রতীতিযুক্ত ঠাকুরসেবার ছলনা এক কথা নহে। যাহারা পয়সার বিনিময়ে ঠাকুর সেবা ও ভাগবত পাঠ করে তাহাদের ঠাকুরসেবা হয় না। ভৃতকগণের কখনও ঠাকুর সেবা হয় না। ইতরার্থ-ও পরমার্থ-এক নহে। সেবা-বহির্ম্মুখ হইয়া জীব জন্মজন্মান্তর সংসার দুঃখ ভোগ করে।

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ পুংসো ভবেদ্ বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য।।
(ভাঃ ১২।৪।৪০)

বহির্ম্মুখ জীবমাত্রই ইহ জগতে আধ্যাত্মিক, আদি-ভৌতিক এবং আধি দৈবিক এই ত্রিবিধ ক্লেশে সর্ব্বক্ষণ জর্জ্জরিত হইতেছে। এত ক্লেশ ভোগ করিয়াও জীব কিছুতেই আত্মমঙ্গলের সন্ধান করিবে না জন্ম-মরণ-জরা ব্যাধিময় এই সংসারে যে কি সুখ তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। কপটতা ও জড়াশক্তির কবল হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবার কথা দূরে থাকুক, বহিরঙ্গ সেবাও হয় না। 'অহং-মম' ভাবযুক্ত অনুকারণিক ব্যক্তি নামাপরাধী। ভূতশুদ্ধি না হইলে নারায়ণের অর্চ্চনও হয় না; আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি পতি, আমি পত্নী, আমি স্বাধীন, আমি পরাধীন, আমি অমুকের পুত্র, আমি উচ্চবর্ণের, অমুক নীচবর্ণের—এই সকল প্রাকৃত উপাধি হইতে অবসর পাওয়া আবশ্যক। সচ্চরিত্র হইয়া গুরু-বৈষ্ণবের অনুসরণ না করিলে কনিষ্ঠাধিকার পর্য্যন্তও পৌছান যায় না। কনিষ্ঠাধিকারীর লক্ষণ,—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষ্যু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।।"

অর্চ্চন মার্গীয় কনিষ্ঠ,—

শঙ্খ-চক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্।
তন্নামকরণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে।।

অর্চ্চন মার্গীয় মধ্যমত্ব,—

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ।।"

অর্চ্চকের পক্ষে তাপাদি পঞ্চসংস্কার অবশ্য গ্রহণীয়। অসংস্কৃত ব্যক্তি কখনও অর্চ্চনের অধিকারী হইতে পারে না।

অর্চ্চন মার্গীয় মহাভাগবততত্ত্ব,—

"তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা কর্ম্মকারকঃ।
অর্থ-পঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ।।"

ভাগবত মার্গীয় মহাভাগবততত্ত্ব,—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।"

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।"

"পরিবদতু জনো যথা তথা বা ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরস মদিরা-মদাদিমত্তা ভুবিবিলুঠাম নটাম নির্ব্বিসাম।।"

যাহারা মিথ্যা কথা ও পাপাচরণ বজায় রাখিতে চায়, যাহারা ঠাকুর সেবার ছলনায় বিষয়ীর বিষয়-বিষ্ঠা সংগ্রহ করে, যাহারা সামান্য ethical principle পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারেনা শ্রীচৈতন্যের কৃপা দ্বার তাহাদের জন্য চিরতরে 'মানা' হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা হরিভজনেচ্ছু তাহাদের পক্ষে বিষয়ী এবং যোষিতের দর্শন অপেক্ষা বিষ ভক্ষণ করিয়া মরিয়া যাওয়া ভাল।

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভব সাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত! হন্ত! বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু।।"

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্বলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগাল-ভক্ষ্যে।।"

ভগবানের কৃপা এবং সেবকের নিষ্কপট আর্ত্তি একত্র হইলে জীবের অনায়াসে ভবক্ষয় ও কৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি হয়। যাহারা ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরা এবং ভাল ভাল দ্রব্য ভোজন করাকে প্রশ্রয় দেয় তাহারা ভজন-রাজ্য হইতে চিরতরে পতিত হয়।

"জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।।"

হরিভজন বাদ দিলেই জীব গৃহমেধী হয়। হরিভজনপরায়ণের গৃহ বৈকুণ্ঠ সদৃশ। তাই বৈষ্ণব মহাজন কীর্তন করিয়াছেন,—

"যেদিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণ সীধু, দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায়।।"

বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। গুরুসেবা করিতে হইবে এবং কৃষ্ণের অর্চ্চন করিতে হইবে। কিন্তু কোন অবস্থায়ও তাঁহাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। গৃহকে মঠ করিতে হইবে। কিন্তু মঠকে গৃহে পরিণত করিতে হইবে না। সাবধান হইতে হইবে, যেন ভোগ্য গৃহধর্ম মঠের স্কন্ধে আরোহণ না করে।

যাঁহারা অতিদুস্তর সংসার-সিন্ধুতে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছেন তাঁহাদের এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি নাই। তাঁহারা এমনি ফাঁপরে পড়িয়াছেন যে, শ্বাস ফেলিয়া আর শ্বাস লইতে পারেন না। ভগবানের লীলাকথা রসধারা নিরন্তর কর্ণপুটে পান করা ব্যতীত দুস্তর সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য পন্থা নাই।

"নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য লীলা কথা রস নিষেবনমন্তরেণ"

বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণই আমাদিগকে মায়িক-রাজ্যে আকর্ষণ করিতেছে। ভগবৎ-প্রসঙ্গ বিমুখ হইলেই সেই ছিদ্র পাইয়া মায়াদেবী আমাদিগকে হরিসেবা হইতে ছুটি করাইবার যত্ন করিতেছে।

ব্রাহ্মণেতর বিচারের প্রাবল্যে লোক ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র হয়। ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্যনীতি এবং শূদ্র-নীতি সকলই ঋষিনীতির অধীন। প্রকৃত ব্রাহ্মণের বিচার গ্রহণীয়। বৈষ্ণবতা ব্রাহ্মণতার উপরের অবস্থা। বর্ত্তমানে কলিকাল, তাই সর্ব্বত্র সাধু শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করাই যেন তথাকথিত ধর্ম হইয়া পড়িয়াছে। লোক শূদ্র থাকিয়াই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণ করিবে এবং নীচ ও অধার্ম্মিক থাকিয়া উত্তমের আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম ব্যাখ্যা করিবে।

যথা— "শূদ্রাঃ প্রতি গ্রহীষন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্।।"

যথার্থ সাধু ও ভণ্ড এক নহে। নারদের সাজ নেওয়া আর যথার্থ নারদের অনুসরণ করা এক কথা নহে। পূতনাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাতৃস্নেহ দেখাইয়া স্তন্যপান করাইতে গিয়াছিল। কৃষ্ণ তাহার কপটতা ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন।

বৈষ্ণবের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে।

কৃপাকর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউক দূর।।

'আমিত' বৈষ্ণব' এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী।।
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
'গুরু'-অভিমান ত্যজি।'
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজল-রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি।।
'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি উচ্ছিষ্টাদি-দানে
হ'বে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কার।।
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভুমি।।
(কল্যাণ কল্পতরু)

বৈষ্ণবের পাদপদ্মে ঐ রূপ প্রার্থনা হইলে নিজেকে বৈষ্ণবের ভৃত্য জ্ঞান হইলে বৈষ্ণবের কৃপায় নিজস্বরূপ পরিচয় পাওয়া যাইবে,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নোর্বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ।।"
(পদ্যাবলী—৬৩ শ্লোক)

"মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎ প্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্-ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ।।"
(মুকুন্দমালা-স্তোত্র শ্লোক ২৫)

"হে লোকরাথ ভগবন্, হে মধুকৈটভারে, আমার জন্মের ইহাই ফল, আমার ইহাই প্রার্থনা এবং ইহাই আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ যে, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য-

বৈষ্ণবের দাসানুদাসের দাসানুদাসের দাসানুদাস এবং তাঁহারও দাসানুদাস বলিয়া স্মরণ করিবেন।'

সেইপ্রকার শুদ্ধবৈষ্ণবগণ দাস বলিয়া অভিমান করিয়াছেন।

"কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ।।"

জীব তাহার নিত্যস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস--বৈষ্ণবের নিত্য 'জুতা বরদার'।

বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া যদি বিষ্ণুর সেবার জন্য চেষ্টা হয়, তাহা হইলে দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায়,—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিক স্মৃতঃ।।"

মানবগণ কাম-ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া দাম্ভিক হয়; দাম্ভিক হইলে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় আর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে না; তাহাতে বদ্ধদশার ফাঁসি গলায় আরও দৃঢ় বদ্ধ হয়। বৈকুণ্ঠ কথা শ্রবণ ভগবৎ সেবা নির্জ্জনে মানসিক চিন্তাস্রোত লইয়া থাকায় প্রভু হইবার দুর্বুদ্ধি প্রবল হয়। ভগবৎ প্রসঙ্গ বৈষ্ণবের নিকট শুনিতে হইবে, অবৈষ্ণবের নিকট নহে।

অবৈষ্ণব মুখোদ্‌গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথাপয়ঃ।। (পদ্মপুরাণ)

অসৎ লোকের কাছে হরিকথা শুনিতে গেলে অসতের প্রভাবে অসৎ হইয়া যাওয়া হইবে। যিনি বিষ্ণুর কীর্ত্তন করেন, তাঁহার হৃদয়ে কখনও পাপ আসিতে পারে না। অনর্থ নিবৃত্তি হয় নাই, অথচ কৃষ্ণনাম করিতে করিতে চক্ষু দিয়া জল ফেলিতেছে ইহা কপটতার দৃষ্টান্ত মাত্র। গিল্টির দোকানে সোনার গহনা পাওয়া যায় না। বিষের সহিত মিশ্রিত দুগ্ধ পুষ্টি কর নহে। নামাপরাধের প্রশ্রয় দিতে থাকিলে পরম প্রয়োজন লাভে বিঘ্ন ঘটিবে।

কীর্ত্তন বলিতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট যে শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়াছি তাহার পুনরাবৃত্তি। যখন কীর্ত্তন শুনিব বা করিব, তখন চিন্তার বিষয় হইবে,—আমরা কি? আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমরা কি করিতেছি? নিজের ভোগের জন্য যে অশ্ব, সারমেয় লৌহ প্রভৃতির সেবা করিতেছি, তাহাই কি আমাদের কৃত্য? ভোগ করিতে যাইয়া উহাদের ভৃত্য হইয়া পড়িতেছি কিনা? সেই ভৃত্যগিরিতে আমাদের অধঃপতন হইতেছে কিনা? শাস্ত্র আমাদিকে কি শিক্ষা দিতেছেন? আমরা কি শ্রবণ করিতেছি? কি কীর্ত্তন করিতেছি? আর কার্যতঃ কি করিতেছি? যদি কীর্ত্তন অর্থোপার্জ্জনের জন্য, উদরপূর্ত্তির জন্য হয় তাহা হইলে আর সুবিধা হইল না। সরলান্তঃকরণে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করিলে এবং শ্রবণে ও কীর্ত্তনেই ভগবৎ সেবা ইহা জানিলে ভগবৎ স্মৃতি, হৃদয়ে

দেদীপ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত রাখিবে,—

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্।।"

বিষ্ণুর কথা সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তন করিলে বিশ্বের আর কোনও কথা আমাদের স্মরণের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইবে না। যাঁহারা স্ত্রী পুত্রাদির কথায়, পুঁথি পত্রাদির বাগ্‌বিতণ্ডায় বা প্রাণায়াম্ কার্য্যে ব্যস্ত রহিলেন, তাঁহারা হরিজন-সেবা করিতে পারিলেন না, হরিকীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য আর তাঁহাদের হইল না। প্রাকৃত গুণোর্ম্মি-চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া আমরা এখন ভগবদ্‌ভজনের সময় পাইতেছি না; কিন্তু স্বরূপের অভিজ্ঞান হইলে সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্‌ভজনের চেষ্টা হইবে, তখন অন্য কার্য্যের সময় থাকিবে না। তখন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্ত ক্ষুব্ধ হইবে না। হরিসেবা ব্যতীত ক্ষণকালও অন্য-কার্য্যে নষ্ট করিতে প্রাণ ফাটিয়া যাইবে—হরিসেবা ব্যতীত বিন্দুমাত্র কালেরও ক্ষেপণ হইবে না, কৃষ্ণেতর বিষয়ে স্বাভাবিক বিরক্তির উদয় হইবে, নিজ উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও মানশূন্য অবস্থা হইবে, হৃদয় স্বভাবতঃই ভগবৎপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে দৃঢ় আশাপোষণ করিবে, অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সমুৎকণ্ঠা হইবে, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে সর্ব্বদা রুচি থাকিবে, ভগবদ্‌গুণ-বর্ণনে আসক্তি ও ভগবদ্‌বসতিস্থলে অবস্থানে প্রীতি হইবে।

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।।
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতে ভাবাঙ্কুরেজনে।।"
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে এই সব লক্ষণই প্রকাশিত হইবে, স্বরূপের বৃত্তি প্রকাশিত হইবে। অভক্তের স্বরূপ আবৃত বলিয়া তাহারা জগতের কথা লইয়াই ব্যস্ত থাকে।

Mysticism এর worldly efficacy আছে, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন প্রকার worldly efficacy নাই অর্থাৎ তদ্দ্বারা মানবের ইন্দ্রিয় তর্পণ হয় না। যাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষণ করিয়াছে, তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। প্রাকৃত সহজিয়াগণের ধর্ম্ম অথবা যাহারা ধর্মকে anthropomorphism বিচার করিতেছে তাহাদের প্রদর্শিত ধর্ম্মের আদর্শ দেখিয়া লোকে বৈষ্ণবধর্ম বলিয়া ভুল করেন এবং তাহাকেই mysticism মনে করেন।

প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম mysticism নহে তাহাকে Transcendentalism বলা যাইতে পারে কিন্তু তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিকের Transcendentalism নহে। অমিয়-নিমাই-চরিতে স্থানে স্থানে যে বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর্শ আছে, তাহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ বৈষ্ণব ধর্ম্মকে mysticism মনে করিতে পারেন। মনুষ্য তাহার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে

যাহা বুঝিতে পারে, তাহাই প্রচ্ছন্ন mysticism। সেই mysticism-কে ধ্বংস করিয়াছে বৈষ্ণবধর্ম্ম।

কেনেডি সাহেব "চৈতন্য মুভ্মেন্টে" ('Chaitanya's Movement') যে ধরণের আদর্শকে "বৈষ্ণবধর্ম্ম" মনে করিয়াছেন তাহা কতকটা mysticism. ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে যাহা বুঝায় তাহা এই জগতের বস্তু; আমরা তাহাকে মাপিয়া লইতে পারি। বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ বলিলেন,—

"লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত সংহিতাম্।"

লোকসকল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কিছুই জানেন না, "তাঁহাদের জন্য ব্যাসদেব সাত্বত সংহিতা রচনা করিলেন। লোকসকল ত্রিগুণ মায়ার বিক্রমে মোহিত হইয়া যাহা বুঝিতে পারে, অর্থাৎ যদ্দ্বারা তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইতে পারে তাহা আধ্যক্ষিকতা, অভক্তি—উহা কখনও বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। তবে কি যাহা মানুষ বুঝিতে পারে না, ধারণ করিতে পারে না, তাহাই "বৈষ্ণবধর্ম্ম"? তাহাও নহে। জড়জগতের অনেক ব্যাপারও অনেকে ধারণা করিতে পারেন না কিন্তু অপর আধ্যক্ষিকগণ তাহা ধারণা করিতে পারেন। যখন জীব পরাৎপর তত্ত্বে সর্ব্বাত্ম সমর্পণ করেন, যখন শ্রীগুরু কৃপায় তাঁহার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তখন তাঁহার নির্মল স্বরূপে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের যে নির্মল-জ্ঞান প্রতিফলিত হয়, উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা অজ্ঞেয় তত্ত্ব নহে, তাঁহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এইজন্য আত্মবৃত্তি ভক্তির দ্বারাই বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি হয়।

'সেবা' জিনিষটা abstract তাহার একদিকে concrete ভজনীয় বস্তু আর একদিকে concrete ভক্ত।

ভোগের মধ্য দিয়া বা ত্যাগের মধ্য দিয়া যে সকল ধর্ম্ম-যাজনের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা অবৈষ্ণবধর্ম্ম। ভোগের মধ্য দিয়া যে সকল ধর্ম যাজনের আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহার অন্যতম mysticism। কৃষ্ণ আমাদের cross examination এর dock-এর আসামী নহেন। অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবাই বৈষ্ণবধর্ম, অক্ষজের মধ্যে যাহা আপাত রহস্য বা প্রহেলিকাচ্ছন্ন, তাহাই mysticism।"

হরিসেবোন্মুখচেষ্টাময় চেতন-জীব ত্রিবিধ অবস্থায় আপনাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অবগত হন। সামান্য কনিষ্ঠাধিকারে বৈষ্ণবের ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র অর্চ্চনীয়। সাত্বত-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিহিত উপকরণাবলীদ্বারা ভগবদর্চ্চার অর্চ্চনই তাঁহার লক্ষ্য। তিনি উন্নত মধ্যমাধিকারে বিষ্ণুভক্তিনিরত ব্যক্তির কায়মনোবাক্যে ও ভগবদর্চ্চায়, উভয়ত্রই বিষ্ণুসম্বন্ধ দেখিয়া প্রেমবিশিষ্ট, ভগবদ্ভক্তের প্রতি অকৃত্রিম বন্ধুতা-সম্পন্ন, সমগ্র জগৎ

হরিসেবায় নিযুক্ত হউক; —এরূপ করুণা-বিশিষ্ট এবং বিষ্ণুবিমুখ বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষাযুক্ত হইয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগে যত্নবান্। উত্তমাধিকারে তিনি স্থূলশরীরের দ্বারা ভোগ করিবার বাসনা রহিত হইয়া জড়বস্তুকে আদৌ নিজভোগের উপাদান মনে করেন না এবং সকল বস্তুকেই প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবৎসেবনোন্মুখ হরিসম্বন্ধিবস্তুজ্ঞানে দর্শন করেন। দৃশ্যবস্তুমাত্রই—শক্তিপরিণত বৈষ্ণবস্বরূপে বিষ্ণুর অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশ। জগতে সকল বস্তু বিষ্ণুতেই অবস্থিত এবং বিষ্ণুর সেবার উদ্দেশ্যেই সর্ব্বদা নিযুক্ত।

'বৈষ্ণব' বলিলে বর্ত্তমানকালে সমাজের যে সম্প্রদায়বিশেষকে লক্ষ্য করা হয়, প্রকৃতপ্রস্তাবে 'বৈষ্ণব' সংজ্ঞা, তাদৃশ সামাজিকগণের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। যাঁহারা নীতি ও পুণ্য-বর্জিত, শিক্ষামন্দিরের সহিত যাঁহাদের বৈরিতা, শৌক্র বর্ণভেদ যাঁহারা কোথাও স্বীকার করেন বা করেন না, মৃতব্যক্তির সৎকারোপলক্ষে ভাড়াটিয়া গায়ক, মার্দ্দঙ্গিক, নর্ত্তকরূপে নিযুক্ত হইয়া যাহারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্মসমূহ লাঞ্ছনা করায় যাহাদের যথেচ্ছাচার—বৈধ সামাজিকগণের সর্ব্বদা কটাক্ষের বিষয় এবং যাহারা অবৈধ 'সংযোগী' বা জাতিবৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেই যে 'বৈষ্ণব'-সংজ্ঞা আবদ্ধ, তাহা নহে। আবার, যাহারা এই জাতি-বৈষ্ণবগণের গুরুগিরি ও পৌরোহিত্য কার্য্যে নিরত, মন্ত্রদানাদি ব্যবসায়াবলম্বনে স্ব-স্ব জীবিকা নির্ব্বাহে তৎপর ধর্ম্মোপদেশ, শাস্ত্রপাঠ, বিগ্রহ ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থোপার্জ্জনপ্রিয়, যাহারা ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জড়েন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টাকেও হরিসেবা বলিয়া জানেন, যাহারা প্রভুসন্তান, গোস্বামি-সন্তান, আচার্য্যসন্তান, অধিকারী বা গুরু বলিয়া পরিচয়াকাঙ্খী, তাঁহারাই যে বৈষ্ণব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবেন তাহা নহে। হিন্দুসমাজে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচয় দিয়া যাহারা বংশপরম্পরা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী বা পঞ্চোপাসকগণের অন্যতম উপাস্য বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুদেবতার সেবনতৎপর, যাহারা মুক্তির নির্ব্বিশেষত্ব বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই যে কেবল 'বৈষ্ণব'-সংজ্ঞা লাভ করিবেন, তাহা নহে। যাহারা ডোর-কৌপানাদি সন্ন্যাসবেষে বিভূষিত বৈধ-সংসারে বিধিগর্হণশীল, অক্ষক্রীড়া স্থান ও দেবালয়াদিতে হরিভজনবিহীন অলস হইয়া অবস্থিতিপরায়ণ, সচ্ছাস্ত্রাদির আলোচনে বিতৃষ্ণ, অথচ প্রাকৃত ভোগবাসনার ফল্গুনদী যাহাদের অন্তরে ধীরে ধীরে বহিতেছে, তাঁহারাই যে কেবল 'বৈষ্ণব'-সংজ্ঞা লাভ করিবার অধিকারী, তাহা নহে।

ফলতঃ কৃষ্ণসেবনোম্মুখতাই বৈষ্ণব-সংজ্ঞার মুখ্য পরিচয়। ভগবৎ-সেবায় সর্ব্বত্মদ্বারা যাঁহার অখিল চেষ্টা অনুক্ষণ নিযুক্ত, যিনি কায়মনোবাক্যে হরিসম্বন্ধি বস্তু-জ্ঞানে হরিসেবনোপযোগী বিষয় গ্রহণপূর্ব্বক যেকোন অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া হরির নিরন্তর অনুশীলনপর, যাহার হরিসেবা লাভের প্রয়োজন ব্যতীত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মুক্তির অভিলাষ নাই, তিনি উপরি উক্ত যে কোন পরিচয়ে পরিচিত থাকুন না কেন, তাঁহাকেই ' বৈষ্ণব' বলিয়া সকলে জানিবেন। যাবতীয় সদ্গুণাবলী নিত্যভাবে বৈষ্ণবেই

দেখিতে পাওয়া যায়। অবৈষ্ণবে সদ্‌গুণসমূহের স্থায়িভাবে অবস্থান করিবার অবকাশ নাই। বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব-সংজ্ঞা-লাভের যোগ্য না হইলেও আপনাদিগকে তাদৃশ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। বৈষ্ণবের লৌকিক-বৃত্তিগত সদাচারে আমরা দুইটী বিষয় লক্ষ্য করি,—প্রথমতঃ তিনি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর নিত্যদাসাভিমানী, এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি যোসিৎসঙ্গী নহেন। বৈষ্ণব—কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ, মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ ও মৌনী।

বৈষ্ণব প্রকৃতপ্রস্তাবে এসকল গুণে বিভূষিত হইলেও তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া নানা কারণে বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষা অবৈষ্ণবগণ তাঁহার গুণসমূহ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অনেক সময়ে বৈষ্ণবের নিষ্কপট দৈন্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া, নির্ব্বোধ মানব বৈষ্ণবের শিক্ষকসজ্জা নিজের অসৎ স্বার্থ পোষণ করিতে গিয়া বৈষ্ণবকেও কপট দৈন্য শিখাইতে অগ্রসর হন এবং অবৈষ্ণবোচিত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া, নিজের বৈষ্ণববিরোধী ভাবসমূহ বৈষ্ণবেরও ভূষণ হউক,—এরূপ ইচ্ছা করেন। এরূপ চেষ্টা দুর্ভাগ্যের পরিচায়কমাত্র। স্বয়ং বৈষ্ণব না হইলে প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণবের স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য লাভ সাধারণ বিচারহীন মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণব কোনদিনই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করেন না। পরমোদার আদর্শচরিত্র বৈষ্ণবকে না বুঝিয়া উদারতার ছলনায়, বিশ্বজনীন ভাবের কপটতায়, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনে করিলে নিজেরই সঙ্কীর্ণচিত্তের পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র।

বৈষ্ণবদর্শনে তত্ত্ববস্তুকে 'ভগবান্' বলা হইয়াছে। 'ভগবান্' বলিতে অবৈষ্ণবগণ যেমন মায়ার অন্তর্ভুক্ত নশ্বর-বস্তুর সংজ্ঞা-বিশেষ বলিয়া মনে করেন, সেরূপ নহে। মায়ার অন্তর্গত বস্তুমাত্রেই সংজ্ঞা, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে, কিন্তু মায়াতীত ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে সেরূপ জড়ীয় ভেদ নাই। তিনি অদ্বয়জ্ঞানময়। মায়িকজ্ঞানেই ভগবানের সহিত পরমাত্মা ও ব্রহ্মের পার্থক্য কল্পিত হয়; কিন্তু অপ্রাকৃত-বিচারে সেরূপ মায়ার ক্রিয়া লক্ষিত হইতে পারে না। বৈষ্ণবদর্শনে কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্ সৎ এবং অসৎ, উভয় প্রকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানযুক্ত। তিনি কাল রচিত হইবার পূর্ব্বে কালের জনকরূপে ছিলেন; তাঁহা হইতেই সৎ ও অসৎ, উভয়ই উদিত হইয়াছে; এই দুই সর্গের অপ্রকাশকালেও তিনিই থাকিবেন। যাহাতে ভগবৎসত্তার অধিষ্ঠান নাই এবং ভগবৎসত্তায় যাহার অধিষ্ঠান নাই, তাহাই ভগবানের 'মায়া'। সেই মায়া প্রকাশমানা হইয়া আভাস ও অন্ধকারের ন্যায় বদ্ধজীব ও ত্রিগুণাত্মক জড় বলিয়া কথিত হন।

জীব—অণুচৈতন্যস্বরূপ। চেতনার সদ্ব্যবহার—ভগবদুন্মুখতা বা ভগবৎ সেবানুকূল বিষয়ে স্পৃহা, আর চেতনতার অপব্যবহারই—ভগবদ্‌বিমুখতা বা ভগবৎ-সেবেতর কার্য্যে আগ্রহ। সেই ভগবদ্‌বিমুখতাই আমাদের স্বরূপবিভ্রম ঘটাইয়া থাকে আমরা তখন উচ্ছৃঙ্খল ও কুকর্ম্মরত হইয়া পড়ি। উচ্ছৃঙ্খলতা প্রণোদিত চিত্ত তখন প্রাকৃতজগতে শক্তির উপাসনাকেই আদরের বস্তু বলিয়া বরণ করে, অতঃপর জড়জগতে উত্তাপের শ্রেষ্ঠতা-জন্য জ্ঞানোত্থ সূর্য্যোপাসনা আমাদের নিকট মনোরম বলিয়া বোধ হয়; তৎপর পশুচৈতন্যের শ্রেষ্ঠত্বোপলব্ধিরূপ গাণপত্যধর্ম্ম-যাজনে আমরা ধাবিত হই; ইহার পর নরচৈতন্যের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞানোত্থশিবোপাসনা আমাদিগকে প্রমত্ত করিয়া থাকে। আবার কখনও বা বিষ্ণুকে উক্ত চতুর্ব্বিধ দেবতার অন্যতম ও সমানজ্ঞানে আরাধনা করিবার জন্য মুমুক্ষা আমাদিগকে চালিত করে। পঞ্চোপাসকগণেরই এইরূপ প্রাকৃত বিচার দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহা বৈষ্ণবঠাকুরের পাদুকাবাহী ভগবৎসেবকগণের অধোক্ষজবিচার নহে।

প্রত্যেক বদ্ধজীবহৃদয়ে ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ বিষ্ণু বাস করেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে জীব ও ভগবানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ও পরস্পরের নিত্য যুক্তাবস্থান কথিত আছে,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্য পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।।

প্রত্যেক জীবাত্মায় দুইটি করিয়া বস্তু আছেন—সেব্য ও সেবক। প্রত্যেক জীবের হরিসেবা ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য নাই। ভগবান্‌কে ষোলআনা সেবা প্রদান করাই ভক্তের কর্ত্তব্য। কর্ম্মকাণ্ডিগণ প্রভুর সেবা নিজেরাই গ্রহণ করেন। ভক্তি না থাকিলে ভগবান্‌কে বঞ্চনা করিয়া আমরা নিজেই জগৎ ভোগ করি। কর্ম্মকাণ্ডে অবস্থানকালে নিজেই ফলভোক্তা সাজিয়া আমরা অন্যের উপর প্রভুত্ব করি। জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অভিমানে মত্ত থাকিলে এবং নিজেকে প্রভু ও 'গুরু' বুদ্ধি করিলে জীবমাত্রকে কৃষ্ণের অধিষ্ঠানজ্ঞানে সম্মান প্রদানের পরিবর্ত্তে উহাদের নিকট হইতে সম্মান ও অভিবাদনাদি গ্রহণের স্পৃহা বলবতী হয়। অন্যে অভিবাদন করিলে তাহাকে প্রত্যভিবাদন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে জীবপ্রভু বিষ্ণু আছেন। সেই জীবপ্রভুকে উদ্বেগ দেওয়া কোনমতেই উচিত নহে। কোনও প্রাণীকে হীনজ্ঞানে অথবা অসূয়া বশতঃ কষ্ট দেওয়া ও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। নিজের অন্তঃস্থিত প্রভুর প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া বাস করা কর্ত্তব্য। অশ্বগোখর চণ্ডাল সকলকে বিষ্ণুর সেবক জ্ঞানে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবের হৃদয়েও ভগবান্ আছেন। ভগবানের প্রতি সেবাবিমুখ হওয়ার ফলে ইহারা lower creation হইয়াছে। চারি বর্ণাশ্রম বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত।

"মুখ-বাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।।" (ভাঃ ১১।৫।২)

জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেই 'কর্ত্তা' সাজিয়া পড়েন। তখন ভূতোদ্বেগ অথবা শ্রীগোবিন্দের সেবক বৈষ্ণবগণের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করিবার ইচ্ছা হয়। কৃষ্ণদাস জীবকে উদ্বেগ প্রদান করিলে কৃষ্ণসেবা হয় না। সেই জন্যই শাস্ত্র বলেন,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।।" (গীতা ২।২৭)

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু সঃ ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।।" (ভাঃ ১১।২।৪৭)

লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে যিনি অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত ও হরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অন্যজীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি কনিষ্ঠ।

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।"

ভগবানের সেবকগণ তাঁহার সেবকের সেবা করেন। হরিসেবাবিমুখগণ গুরুদাস নহে। এই মায়িক জগতে—এই বিবাদের যুগে হরিকথা ব্যতীত ইতর কথার প্রাবল্যই অধিক। সুতরাং আমাদের পক্ষে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত এই বিবদমান জগতে ভগবানের কথা প্রচার করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

ভগবান শ্রীঅনন্তদেবের কৃপা হইলে এবং কৃপাপ্রার্থী ব্যক্তি নিষ্কপট হইলে সেই জীব মায়ামুক্ত হইয়া তাঁহাকে লাভ করেন।

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে।।"
(ভাঃ ২।৭।৪২)

"বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতার কান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্।।"

যাঁহারা কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে গুরুমুখ হইতে সুষ্ঠুভাবে জানিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা জানিতে পারেন যে, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই গুরুগণ, ঈশভক্ত, ঈশ, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ ও ঈশশক্তিরূপে প্রকাশিত। আধ্যক্ষিক চেষ্টায় ভগবান্‌কে জানা যায় না। আবার ইহজগতে অবতীর্ণ ভগবদবতার ও ভক্তগণকে জাগতিক ব্যক্তিগণের সঙ্গে সমান জ্ঞান করা উচিত নয়। মধ্যমাধিকার হইতে হরিভজন আরম্ভ হয়। তাঁহার আচরণ যথা,—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।"
(ভাঃ ১১।২।৪৬)

আমি ভগবানের সেবা করিলাম, অতএব উহার বিনিময়ে তাঁহার নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইব, ইহা নারকীয় বিচার। ভগবানের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ

করিতে হইবে না, তাঁহাকে সেবা নিবেদন করিতে হইবে। লোক নাস্তিক হইয়া জল-বায়ু, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি কতরূপে ভগবানের সেবা গ্রহণ করিতেছে। অভক্ত কর্ম্মী ও স্মার্ত্তদের ethical principle ঈশ্বরকে নিজেদের ভোগের জন্য খাটাইয়া লওয়া। We think we are to receive or accept service from this universe which is His creation. ইতর জন্তুগুলিও ভগবানের সেবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। পশুগুলিকে আমাদের সেবায় নিযুক্ত করিলে ভগবানের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়। Altruistic idea must be avoided. We must be altruist in the fullest and unalloyed sense. All so called religion-ists seek after altruism.

শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিন্তাধারা জাগতিক চিন্তাস্রোতে বিপ্লব আনয়ন করে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মই আমাদিগকে একাদশটি পরতত্ত্বের সন্ধান প্রদান করিয়া প্রচুর কৃপা করেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্মের বন্দনায় বলিয়াছেন,—

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।।"

বৈষ্ণব হ'লেন জগতের একমাত্র গুরু আবার বৈষ্ণবাভিমানে গুরু হ'তে পারা যায় না। এজন্য আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম কখনও নিজেকে বৈষ্ণব ব'লতেন না। যে নিজেকে বৈষ্ণব বলবে, সে অবৈষ্ণব।

তাই আমরা মহাজনের পদে দেখ্‌তে পাই,—

"কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া, ভজিতে ভজিতে,
অভিমান হউক দূর।।"
(কল্যাণ-কল্পতরু ৮।৬৯)

হাড় মাংসের থলের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই এগুলিকে শোধন ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্মে লাগাতে পারলে সুবিধা হ'বে। জাগতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি নরকে যাওয়ার সেতু। কিন্তু ঐসকল ভগবানের সেবায় লাগালে লোককল্যাণ হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর নিকট শুনেছিলেন,—

'ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।।"
(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৮৭)

প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক পদবিক্ষেপে মনের দ্বারা প্রত্যেক চিন্তায় যদি কৃষ্ণ সেবা লক্ষিত হয়, তবেই তা' ঠিক হ'ল। প্রহ্লাদ মহারাজ ব'লছেন,—

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদ্দাম্নি বদ্ধাঃ।।"
(ভাঃ ৭।৫।৩১)

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।"
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

এজন্য পূর্ব্বে পৃথু মহারাজের কালেও—

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ।"
(ভাঃ ৪।২১।১২)

গৃহস্থদিগকে 'ব্রাহ্মণ' আর পারমার্থিক দিগকে 'বৈষ্ণব' বলা হয়। জম্বুদীপ, শাকদ্বীপ প্রভৃতির অধিপতি ছিলেন পৃথু মহারাজ। কেবল ব্রহ্মজ্ঞ ও বৈষ্ণবের উপর তিনি দণ্ড পরিচালনা করতেন না। কেন না তাঁরা দণ্ড-বিধানের অতীতরাজ্যে বাস করেন।

যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিসেবা করেন তিনি অচ্যুতগোত্রীয়। যারা ব্রাহ্মণ ধর্ম হ'তে বিচ্যুত তা'দের উপরই দণ্ড বিধান, ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের উপর কোন দণ্ড নাই।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবস্তু অনুসন্ধান করেন। যিনি দেহধর্ম্মী ও মনোধর্ম্মী নহেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎপ্রৈতি স কৃপণঃ।
য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রতি স ব্রাহ্মণঃ।।"
(বৃহদং ৩।৮।১০)

যা'দের বৈকুণ্ঠজ্ঞানের অভাব তা'রাই অবৈষ্ণব। তা'রা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি দিয়ে সমস্ত জিনিষ মেপে নিতে চায়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বৈষ্ণব হতে পারেন। এজন্য বৈষ্ণবের প্রথমমুখে ব্রাহ্মণ হওয়া একান্ত দরকার। বৃহৎবস্তুর ধারণা না হলে বিষ্ণুর সেবা হয় না, খণ্ড সঙ্কীর্ণবস্তু কখনও ব্রহ্ম বা বিষ্ণু নহে বা হতে পারে না। অনাত্মবিচারে কৃপণতার লক্ষণ। ব্রাহ্মণ হয়ে পূর্ণতালাভ না করলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। অন্ততঃ আত্মার ব্রাহ্মণ হওয়া দরকার। ব্রাহ্মণের অন্য কোন কৃত্য নাই—বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত। অন্য দেবতার পূজো করলে ব্রাহ্মণ ছোট হয়ে যান। সাধারণের ধারণা ব্রাহ্মণ সকল দেবতার পূজো করতে পারেন। কিন্তু বেদ বলেন,—ব্রাহ্মণ একমাত্র বিষ্ণুরই পূজা করেন। ব্রাহ্মণগণের আচমনীয় "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।"

রাস্তায়, ঘাটে বৈষ্ণব পাওয়া যায় না। একজন বিষয়ী হয়তো ব'ল্লে—দু'শ বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ ক'রে এস। আর অম্‌নি পালে পালে বৈষ্ণবচেহারাওয়ালা ব্যক্তিগণ চলে আসলো বিষয়ীর নিমন্ত্রণ খেতে। বৈষ্ণব অত সোজা নয়। পৃথিবী উজাড় হ'য়ে যাবে, বৈষ্ণব পাওয়া যাবে না। কম্বলের লোম বাছার ন্যায় বৈষ্ণব পাওয়া সুকঠিন। ঐ সকল 'বৈষ্ণব' নামধারীকে খাওয়ালে বিষয়ীর ভোগবুদ্ধি হবে, আর এ সকল বৈষ্ণব নামধারীও নরকে চ'লে যাবে।

গীতায় একটি শ্লোক আছে,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" এখানে কদর্থকারী বলছেন,—কৃষ্ণকে বাগানের মালী ব'লে ডাকা যায়, তিনি বাগানের মালী হয়ে আমার কাজে আসবেন। "মায়ামিশাইয়া এস ভগবান্" প্রভৃতি কথাগুলি কৃষ্ণকে আমার বাগানের মালী কর্‌বার চেষ্টা। ভগবান্ যা আছেন—তিনি যা'তে তাঁর নিজের সুবিধা বোধ করেন, আমার তা tamper ক'রতে যাওয়া উচিত নয়। আমার চিন্তা দ্বারা তাঁ'কে বাগানের মালী করা—আমার কল্পনাও যথেচ্ছাচারিতার পোষাকে তাঁকে সাজাবার চেষ্টা করলে তিনি তা' না হ'তে পারেন। তাঁকে আমার ভোগের ঈন্ধনরূপে দেখতে চাই, তখন তিনি তাঁ'র কৃষ্ণ-স্বরূপে আসেন না আমার কাছে—তাঁর মায়ার রূপ প্রকাশ করেন। আমি যেরূপ কপটতা ক'রে প্রপন্ন হ'য়েছিলাম, তিনিও আমাকে তদনুরূপই ভজনা করেন।

সম্বন্ধ পাঁচপ্রকার—(১) পতি-পত্নী, (২) পিতা-পুত্র, (৩) সখি-সখা, (৪) প্রভু-ভৃত্য এবং (৫) নিরপেক্ষ। সম্বন্ধ রহিত ব্যক্তিগণ বলেন,—শান্ত ভাবটাই প্রধান। তাঁরা আর চারটিতে বড় বিপদ অমঙ্গল দেখেন। কেননা জড় জগতের অভিজ্ঞতায় তাদের মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ। জড় জগতের যত আকর্ষণ আছে, তা' হতে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁরা শান্তরসকে বহুমানন ক'রে থাকেন। কিন্তু অপ্রাকৃতের আকর্ষণও জড়ের আকর্ষণ এক নয়।

এই শরীরটাকে 'আমি' বললে কুকুর শেয়ালে খেয়ে ফেল্‌বে। আর সূক্ষ্ম ভাব নিয়ে mental speculation হ'লেও সুবিধা হবে না। কৃষ্ণও কাষ্ণের আশ্রয় করলেই সুবিধা হবে।

প্রপত্তি পাঁচ প্রকারের। পাঁচ প্রকারের সম্বন্ধ বিশিষ্ট না হ'য়ে যদি কৃষ্ণকে হাড়মাংসের থলি দেখাই হাত উচু ক'রে থাকি, কিম্বা নির্ব্বিশিষ্ট হওয়ার জন্যে চেষ্টা করি, তা' হ'লে কৃষ্ণও আমাদিগকে সেরূপভাবেই ভোগা দেবেন।

ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়ে যাব—এ দুর্ব্বুদ্ধি হতে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টাই প্রকৃত মুক্তি। যে ব্যক্তি 'আমি কর্ত্তা' মনে করে তা'র কখনও মঙ্গল হয় না। "অহং ব্রহ্মাস্মি"'র অর্থ—'তৃণাদপি সুনীচ', 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণু' 'অমানী মানদ' হ'য়ে সর্বদা হরিকীর্তনে

রত থাকা। যে-বস্তু ব্রহ্মের সহিত সমানধর্ম্ম-বিশিষ্ট, তাঁর জড়ের বা ক্ষুদ্রের অভিমান থাকতে পারে না।

শ্রীরূপ-সনাতন মূঢ়-অনাচারী ব্যক্তিগণের নিকট ভক্তিসদাচার প্রচার করলেন। অবৈষ্ণব স্মার্ত্ত-সমূহ অনাচারী। পশ্চিমের লোক হয় কর্ম্মী, না হয় জ্ঞানী। চৈতন্যকে 'কৃষ্ণ' জেনে কিরূপে ভজন হয়, শ্রীরূপ সনাতন তাই প্রচার করলেন।

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে।"

আত্মার বৃত্তি উন্মেষিত ক'রতে হ'লে অকৃত্রিম ভক্তের সঙ্গলাভ করা দরকার। ভক্তব্রূবের সঙ্গের দ্বারা মঙ্গল হ'বে না। কৃত্রিম ভক্ত, কৃত্রিম ভক্তি, কৃত্রিম সাত্ত্বিক বিকার দ্বারা কখনও সুবিধা হয় না। বেপথু প্রভৃতি ভক্তির লক্ষণ বটে—যদি অকৃত্রিম কৃষ্ণ স্মৃতিতে হয়। আর যদি কৃষ্ণেতর স্মৃতিতে হয়, তবে তা' কপটতা ও অভক্তি। ঐগুলি hysteric fit or emotion. ঐগুলি কামেরই বিকার। কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা-ব্যতীত সকলই অসুবিধা। ধর্ম্ম-কামনা অর্থকামনা, কামকামনা এইগুলি ভক্তি নয়।

কেবল কৃষ্ণভক্তি-ব্যতীত পরমহংসেরও পূর্ণতা সিদ্ধ হয় না। বাস্তব বৈদান্তিক হ'লে বৈষ্ণব হওয়া যায়। ব্রহ্মের সহিত নির্ব্ভিন্ন হওয়ার বিচার পরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও পরমহংস পদবীতে আরোহণ করতে পারেন না। কুটিচক, বহূদক ও হংস এরা পরমহংস পদবীতে আরূঢ় ন'ন। পারমহংস্যজ্ঞানের অভাবে অবৈষ্ণবতা উদিত হয়। পারমহংস্য মুক্তাবস্থায় সুষ্ঠুভাবে ভগবৎসেবা হয়। মুক্তাবস্থায় নিত্য সেবার ব্যাঘাত হয় না, কোন কালে সেবা-বুদ্ধি কমে যায় না।

"নিজে শ্রেষ্ঠ জানি, উচ্ছিষ্টাদি দানে,
হ'বে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা'
না লইব পূজা কার।।"

(কল্যাণ কল্পতরু ৮।৬৯)

"আমি সেব্য, তোমরা সব আমার সেবা কর"—এই বিচার—অবৈষ্ণবের বিচার। এইরূপ অবৈষ্ণব কখনও 'গুরু' হ'তে পারে না। যে সকল গুরু শিষ্যের সেবা গ্রহণ করেন, তাঁরা বাস্তবিক গুরু শব্দ বাচ্য ন'ন। তাঁ'রা শিষ্যও হতে পারেন নাই। ভগবানের পার্ষদগণ ভোগিগণের অধর্মের বা ধর্মের সংসার হ'তে মুক্ত। ঠাকুর মহাশয় বলেছেন,—

"পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপী জন,
তা'রে মন দূরে পরিহারি'।
পুণ্য সে সুখের ধাম তা'র না লইও নাম,
'পুণ্য' 'মুক্তি' দুই ত্যাগ করি'।।

প্রেমভক্তি-সুধানিধি তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।।
(প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা)

মহাভাগবত নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট মনে করেন। আমি শিষ্য হয়ে অনেকদিন দাস্য ক'রলাম এখন শিষ্যগিরি আর ভাল লাগে না। আমার গুরুগিরি করা দরকার। ইহা তিনি বলেন না। যিনি গুরুর কার্য্য করেন, কিন্তু তাঁর গুরুর অভিমান নাই। শতকরায় একশত কার্য্য মহাভাগবতের জন্য ক'রতে হ'বে।

যিনি শতকরা একশত পারমহংস্য-ধর্ম্মলাভ করেছেন, তাঁর চোখ-কান-নাক মুখ সব দিয়ে তাঁ'র শতকরা শত কাজগুলিই aural reception এর সাহায্যে জেনে নিতে হ'বে। তাঁ'র কীর্ত্তন শুনতে হ'বে। তিনি কি করেন? কেবল কীর্ত্তন করেন। আর তাঁর কোন কার্য্যই নাই। তাই ব'লে রা-এর কীর্ত্তন, চ-এর কীর্ত্তনের কথা বলছি না। এ সকল দুশ্চরিত্র লোক কীর্ত্তনকারী হ'তে পারে না। ঐ সকল লোকের মুখে হরিকীর্ত্তনামৃত বে'র হয় না। লোকচিত্তাকর্যক সুর-তাল-লয়-মান ভাবভঙ্গীর ভিতর দিয়ে যা' বে'র হয়, সেগুলি মায়ার কুহক বা বিষ।

"অবৈষ্ণব-মুখোদগীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ।। (পদ্মপুরাণ)

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারংপরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।।
(চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ৮।২৪)

বিষ খেয়ে ম'রে যাওয়া অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ, তথাপি বিষয়ী ও যোষিৎ সঙ্গীর সঙ্গ করা ভাল নয়। যা'রা হরিসেবক নয়, তা'রাই যোষিৎসঙ্গী। ভোগ-বুদ্ধিতে বিষয় গ্রহণই যোষিৎসঙ্গ।

সত্য সত্য অকৃত্রিম সাধুর অনুসন্ধান করা দরকার। আমার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী মুদীর দোকানে আরশোলার নাদি ভরা চা'ল ও দ্রব্যাদি পাওয়া যায় কে পরিশ্রম স্বীকার ক'রে আর দূরে যায়, এখান হতেই চা'ল কেনা যা'ক এরূপ আলস্যের বশবর্ত্তী না হয়ে বাজারে ঢুকে ভাল চা'ল খোঁজাই দরকার।

আমাদের চিত্তে যদি জাড্য, দুর্বলতা কপটতা বা অন্যাভিলাষ থাকে তা'হলে সেরূপ গুরুই মিলবে। চিত্তে মায়াবাদ থাকলে মায়াবাদী গুরু মিলবে। ঐশ্বর্য্যভাব থাকলে সীতারাম বরাহ-নৃসিংহাদির উপাসক হ'য়ে যাব। শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তনকারী গুরুপাদপদ্মের আশ্রয়েই নিখিল বিশ্ব বাস্তব চরম মঙ্গল লাভ হবে,—

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জয়যুক্ত হউন। ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ কামনার অর্গলে আবদ্ধ হ'য়ে আমাদের গতি রুদ্ধ হ'য়ে যা'বে। হরিপ্রেমের পরিচয় যিনি

পেয়েছেন, তিনি ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষের হাতে পড়াকে মাঝ-পথে ডাকাতের হাতে পড়া মনে করেন। অকিঞ্চনা ভক্তিই সর্ব্বজীবের নিত্যা আত্মবৃত্তি। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মধ্যে যাঁরা আছেন, তাঁ'দের ঐ সকল কথা দুর্বোধ্য। তাই ব'লে অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে উচ্ছৃঙ্খল হ'তে বলা হ'চ্ছে না।

"এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ।।"

(চৈঃ চঃ ২২।৯০)

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।"

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

বৈষ্ণবগণ ২৪ ঘন্টা হরিভজন ক'রছেন। আবার ২৪ ঘন্টা বিষয়কার্য্যের অভিনয় করলেও তাঁদের মধ্যেই হরিকথানুশীলন আছে। তাই হরিভজনকারীদের মধ্যে কি কি কথা হচ্ছে তা' অভক্তদের কাছে আগে থেকে ভেঙ্গে বললে ত' কাজ পণ্ডই হ'ল, বাইরের লোককে ডাকতে হ'বে, আবার No admission বলতে হ'বে, নচেৎ অভক্তরা যে খেলো ভাববে। সকলের অধিকার কিছু সমান নয়। বলবার মত লোককে বলা যায়, সকলে বোঝে না। স্কুলে অনেক ক্লাস, কোন ছেলে full marks পেয়ে পরীক্ষায় ভাল পাশ করে, কোন ছেলে বা '0' পেয়ে ফেল হয়। গুরু-বৈষ্ণবগণ কিজন্যে কি করছেন, তা' যদি অভক্তরা বুঝতেই পারতো,তা' হ'লে ত' তা'রা বড়ই হ'য়ে যেত। ভোগী ত্যাগী চিরকাল বিচার ক'রেও ভক্ত ভগবানের আচার বিচার বুঝ্‌বে না। শ্রীরামানন্দ রায় দোলায় চড়ে বহুত বাজনা বাজিয়ে গোদাবরী-স্নানে আসছেন, শ্রীগৌরসুন্দর তখন সেখানে। গোদাবরী পুষ্করে গৌরসুন্দরের সঙ্গে তাঁ'র দেখা হ'ল। মহাপ্রভু তাঁ'কে আলিঙ্গন ক'রলেন। বাইরের দৃষ্টিতে তখন রামানন্দ রাজমহেন্দ্রীতে Governor, জাতিতে করণ শূদ্রাখ্যা প্রাপ্ত আর মহাপ্রভু সন্ন্যাসী, সুতরাং উভয়ের এ রকম মিলন লোকের কাছে অসামঞ্জস্য মনে হ'য়েছিল। সাধারণ লোকে বুঝতে পারছে না—"চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হ'য়ে কেন তাঁ'কে আলিঙ্গন ক'রলেন? এর সঙ্গে এমন কি সংস্রব আছে? গৃহ পরিত্যাগ ক'রে যিনি প্রেমোন্মাদে নৃত্য করছেন, তাঁর এরূপ ব্যক্তির সঙ্গে কি প্রয়োজন?" যাঁ'রা বৈষ্ণব হরিজনের ভিতরে ঢুকেছেন, তাঁ'রাই জানেন যে এদুজনের চিত্তবৃত্তি একইরূপ ছিল, কিন্তু রামানন্দের সঙ্গী-কর্ম্মী ব্রাহ্মণেরা তা' বুঝতে পারেন নি, তাঁদের ধারণা—"গোদাবরী স্নানাদির ফল পুণ্যার্জ্জন, রামানন্দ তজ্জন্যই বড় ব্যস্ত, তাঁ'রা রামানন্দকে তদ্বিষয়ে সাহায্য ক'রবেন।"

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তিতে আবদ্ধ ক্ষুদ্র বিচারদ্বারা কেউ ভক্তির বিচার বুঝতে পারেন নি। ভক্তির বিরোধী কর্ম্মী, তা'দের ভক্তি বিদ্ধা বা মিশ্রা, প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মিগণের

প্রাপ্য অভক্তি। জ্ঞানীদেরও প্রাপ্য অভক্তি। কর্ম্মীজ্ঞানী-উভয়েই অভক্ত-পর্য্যায়ে গণিত। কিন্তু শুদ্ধ-ভক্তি সকল আত্মার নির্ম্মল ধর্ম—স্বাভাবিক বৃত্তি। পিতা-মাতার নিকট হ'তে আমরা যে দেহ পেয়েছি, সেই দেহের ধর্ম-কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। যারা বহির্জ্জগতের কার্য্যে চিন্তায় অত্যন্ত ব্যস্ত, তা'দের বুদ্ধিকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'মাটিয়া' সংজ্ঞা দিয়েছেন। তা'রা এই সব দেহের দুনিয়ার গণ্ডী বা মনোধর্ম transcend করতে পারে নি। যা'রা phenomenal range-কে cross over ক'রতে পারে নি, তাদের বুদ্ধিই মাটিয়া। কু-কর্ম বা সৎ কর্ম কর্ত্তৃত্বাভিমানে করা হয়। সে রকম অভিমানের কোন কাজই প্রশংসার্হ নয়। ভক্ত এসকল বিচার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করেন। অধোক্ষজের সেবার বৃত্তি অন্য প্রকার।

"বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।।"

(বিলাপকুসুমাঞ্জলী)

কৃষ্ণ—সনাতন বস্তু। তিনি সকলের প্রভু, তাঁর দাসসকলও প্রভু। যাঁ'রা তাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'রাই প্রভু। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।" সেই কৃষ্ণবস্তু উপদেশকসূত্রে নিজেই সেবা করেন। কৃষ্ণ সেবাবিমুখ প্রতীতিকে সেবোন্মুখ করবার যিনি যত্ন করেন, তিনিই গুরুর কার্য্য করেন, আমরা লঘু, অপণ্ডিত, বিপরীতবুদ্ধিবিশিষ্ট প্রকৃতির দাস। 'আমি কর্ত্তা' বুদ্ধি হ'তেই কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা—এই তিনটে এসেছে। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে গান শুনিয়েছেন, সেই গানের মধ্যে এইটি নিষেধ ক'রেছেন,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।।"

"আপনি নিরহঙ্কারী অন্যে দিবে মান" বিচারটা যিনি পরিত্যাগ করেছেন তিনি ভক্তিপথ হ'তে বিচ্যুত। আত্মবিৎ আত্মা কি জানেন।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।।"

"কেশাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ।।"

আমরা চিৎকণ জীব—অনেক, একটা চুলের প্রস্থ অংশকে শতভাগ ক'রে তা'রও যে শত ভাগ, সেইটি 'আমি'। সেই 'আমি'কে ভোগা দেবার জন্য অনেক জিনিষ এসেছে। যাঁ'র যেরূপ ক্ষমতা, সেই অনুসারে সকলেই প্রভু হ'বার জন্য—নিগ্রহানুগ্রহ করবার জন্য ব্যস্ত। এই কার্য্য ক'রতে হ'লে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—এই তিনটির দরকার। কনক, কামিনী ছোট কথা, প্রতিষ্ঠাশাটাই বড়। মনুষ্য-জীবনে এ'ছাড়া জঘন্য কার্য্য আর নাই। প্রতিষ্ঠাশা বড় দৌরাত্ম্যজনক।

সনাতন গোস্বামীকে সনাতন-কৃষ্ণ গৌর-লীলায় যে উপদেশ দিয়েছেন, তা'তে আমরা দেখছি যে কৃষ্ণ-বিস্মৃতি ফলেই আমাদের দুর্গতি হ'য়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামী সাংসারিক পরিচয়ে সনাতনের অনুজ, কিন্তু তিনি সনাতনকে 'গুরু'-রূপে জানেন। সেই রূপ গোস্বামী হ'তে রূপানুগ সম্প্রদায়।

শ্রীল দাস-গোস্বামীও সনাতনের শিষ্য। তিনি যেরূপভাবে গুরুপূজা ক'রেছেন, সেটি বিলাপ-কুসুমাঞ্জলিতে আছে,—'বৈরাগ্যযুগ' প্রভৃতি।

বিরাগের ভাব—বৈরাগ্য, ভক্তিরস—প্রভুতা রস নহে। বৈরাগ্যবন্ত বৈষ্ণবগণ প্রতিষ্ঠার আশা করেন না। যদি প্রত্যহ সকালে উঠে নিজেকে শত ঝাঁটা মারা যায়, তা'হলে গুরুদ্রোহী হ'তে হয় না—প্রতিষ্ঠা আসে না। গুরু সাধারণের নিকট একরূপ পরিচিত, অন্তরঙ্গ-জনের নিকট অন্যরূপে। অন্তরঙ্গ জনগণের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেরূপ পরিচিত, সেটি বিলাপ-কুসুমাঞ্জলিতে গান হ'য়েছে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠ ও তদভিন্ন। তাঁ'র (শ্রীগুরুদেবের) দাস্য ব্যতীত কৃষ্ণদাস্যের সম্ভাবনা নাই। যাঁ'রা তাঁ'র দাস্য করেন, তাঁ'রা প্রভু; আর বাদবাকী—অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা—সোজা কথায় ভোগী হবার বাসনাযুক্ত। কিন্তু মানুষ ভোগী বা ত্যাগী হ'তে পারে না।

প্রতিষ্ঠা—শূকরী-বিষ্ঠা, এটা ছাড়লে মঙ্গল হ'বে। আমি ত্যাগ ক'রে বাহাদুরী নেব এটাও প্রতিষ্ঠাশা। এজন্যে বলি, এখানে যতগুলি কথা আছে, সব শেষ করে নাও। গৌরসুন্দরের পাদপদ্ম আশ্রয় করলে সব সুবিধা হবে। তাঁ'র পুত্রত্ব, ভৃত্যত্ব ও কলত্রত্বেই সব আছে। তাঁ'র কথা তিনি সনাতনের শিক্ষায় অতি সহজ ভাষায় ব'লেছেন, আমি সেবাবিমুখ জীব, কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করলেই মানুষ হ'তে পারব। প্রতিষ্ঠা এখানে পাওয়া যায় না, প্রতিষ্ঠাশার ঢেউ খাওয়া মাত্র সার হয়। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ প্রকৃত প্রতিষ্ঠার কথা শিক্ষা দিয়েছেন। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় বৈরাগ্য হওয়ার দরকার। তাহ'লেই প্রকৃত বৈষ্ণব হ'তে পারব।

বর্ণাশ্রম-ধর্মের উচ্চস্তরে পারমহংস্যধর্ম্ম, তা'কেই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বলে। সেখানে পরিপূর্ণ সেবাপ্রবৃত্তি, সেটি কেবল বার্ষভানবীতে আছে; তাঁ'র আংশিক তিনি যাঁ'কে যতটুকু দিয়েছেন, তাঁ'তে ততটুকু বৈষ্ণবতাবর্ত্তমান। আমরা যদি অমানী মানদ হই, তা হ'লেই সব সুবিধা হবে, নচেৎ সবই অসুবিধাজনক হ'বে।

আমি অযোগ্য বটে; কিন্তু আমার যোগ্যতা হওয়া আবশ্যক, আর যোগ্যতালাভের অন্য উপায়ও নাই, একমাত্র বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত। বিষ্ণুসেবা কি প্রকারে করতে হয়, তা আমরা প্রথমেই জানতে পারি না। তারতম্য বিচার ক'রতে গিয়ে বুঝি, যাঁরা বিষ্ণুসেবা করেন, তাঁ'দের সেবা যাঁ'রা করেন তাঁ'রাই সবচেয়ে বড়। বিষ্ণুর কোনপ্রকার সন্ধান ইহজগতে না পেলেও যাঁ'রা বিষ্ণুর সেবা করেন, তাঁ'দের সেবা করলে কি প্রকারে বিষ্ণুর সেবা করতে হয় জানতে পারি।

ইহ্ জগতে থাকাকালে বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানসমূহ প্রভাবিত করে। ভগবানের সেবার কোন কথাই জানবার সম্ভাবনা নাই।

এরূপ অজ্ঞেয় দুর্জ্ঞেয় বস্তুর প্রতি যত্ন করা অসম্ভব ব'লে নিরাশ হ'বারও কোন কারণ নাই। ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। যাঁ'রা অধোক্ষজ বস্তুর সেবায় নিযুক্ত, তাঁ'রাও ন্যূনাধিক অধোক্ষজ বস্তু। তাই তাঁদের নিকট অধোক্ষজের সেবা অজ্ঞেয়, দুর্জ্ঞেয় বা পরোক্ষ নহে, অধোক্ষজ-সেবা অধোক্ষজ ভগবৎসেবকগণের সেবা প্রস্ফুটিত আত্মার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্যাপার।

অক্ষজ বস্তুর সেবাপর মানব—ভোগপর, অধোক্ষজ বস্তুর সেবাপর মানব ত্যাগপর, আর অধোক্ষজ বস্তুর সেবাপর মানব—হরিসেবাপর। অধোক্ষজ সেব্য বস্তু অক্ষজ সেবকের গোচরীভূত পদার্থ নহেন। সুতরাং ভগবদ্ভক্ত সাধারণ কর্ম্ম-প্রবণ বা নির্ব্বেদ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয় জ্ঞানাধীন নহেন। বৈষ্ণব অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সেবা ক'রে থাকেন। প্রাকৃত অপ্রাকৃত বিবেক সাধারণ-মানবের নাই, গুরুপাদপদ্মের ও গুরুপাদ-পদ্মাশ্রিত মানবের অনুকম্পায় যে সেবাবিবেক লাভ হয়, তা' সাধারণ মানবের গম্য নয়, অধোক্ষজ-সেবক সাধারণের ন্যায় প্রতিভাত হ'লেও সাধারণ মনুষ্য ন'ন। মনুষ্যজাতির পাঁচ সাত হাজার বৎসরের ইতিহাস বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণিত আছে, নিত্যজীব সেরূপ পাঁচ সাত হাজার বৎসরের ইতিহাসের অন্তর্গত ন'ন। নিত্যজীব, নিত্যজৈব-ধর্ম আলোচনা ক'রে থাকেন। তাঁরা যে মূর্ত্তিতেই থাকুন, স্থাবর-জঙ্গম যে কোন প্রাণী, যে কোন উদ্ভিদ যেভাবেই থাকুন, সকল অবস্থায় ভগবৎ-সেবাই তাঁদের অন্তর্নিহিত বৃত্তিরূপে অবস্থান করে, ভোগপরতা ও ত্যাগপরতা যে পরিমাণে অবসর লাভ করে, সেই পরিমাণে অধোক্ষজ বস্তুর সেবা করবার জন্য গুরুপাদপদ্মাশ্রিত জীবের যত্ন হয়। এইরূপ সেবায় অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট বৈষ্ণবই বাঞ্ছাকল্পতরু; সেইসকল বৈষ্ণবের সেবায় জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকাই সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য।

যেদিন আমরা ভোগপর বা ত্যাগপর হই, সেদিন যথেষ্ট লাভবান্ হ'লাম মনে ক'রলেও আমাদের সেই লাভ অতি অল্পকালস্থায়ী, কিন্তু বৈষ্ণব-সেবাই চিরস্থায়ী—নিত্যস্থায়ী।

বিষ্ণুসেবা বৈষ্ণবের সেবা দ্বারাই হয়। একমাত্র বৈষ্ণবের কৃপাই ভোগ ও ত্যাগ উভয়ের অপ্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ ঐসকল যে আত্মধর্ম নহে, মনোধর্ম মাত্র—ইহা জানাইয়া দিতে পারে।

জগতে মনুষ্যজাতি মনোধর্ম্মে ব্যস্ত ও ব্যাকুল আছেন; কেননা তা'তে তাৎকালিক কার্যসিদ্ধির লোভ ও উত্তেজনা র'য়েছে; কিন্তু বৈষ্ণবের সে বুদ্ধি নাই, তিনি অধোক্ষজ বস্তুর সেবক, সর্ব্বদাই পরম নিত্য-বিচারে অধিষ্ঠিত।

ভগবদ্ভক্ত জল, বায়ু, খাদ্য প্রভৃতি কিছুই ভোগ করেন না, সকল দ্রব্য দ্বারা তিনি ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। তাঁহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসাদি গ্রহণও ভগবৎ সেবার জন্য। ভগবৎসেবা ব্যতীত তাঁহার পৃথক অস্তিত্ত্ব নাই। সুতরাং তাঁহার কোন কার্যই জড় বা মায়িক নহে পক্ষান্তরে অভক্ত সর্বদাই ভোগের জন্য প্রধাবিত হয় এবং ভগবান্‌কে প্রকৃতিজাত বিবেচনা করে। তাহার বিবেচনায় ভগবান্ বড়জোর সত্ত্বগুণের দেবতা বিশেষ। বিশুদ্ধ তত্ত্বের কথা কিছুমাত্র তাহার বোধগম্য হয় না।

বিষ্ণুবস্তু আমাদের নিকটে পাঁচ প্রকারে উপস্থিত হ'ন—পরতত্ত্ব, ব্যূহতত্ত্ব বৈভবতত্ত্ব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা। শ্রীজগন্নাথের অর্চা তিনি কৃপা করিয়া পূজকের নিকট আসিয়াছেন। আমরা যদি সেবক হইয়া তাঁহার সেবা করি, তাহা হইলে সব ঠিক। আর যদি সেবার ভান দেখাইয়া জগন্নাথের নিকট হইতে কিছু আদায় করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে বণিকবৃত্তি হইল মাত্র।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।"

সকল কার্য্যের পূর্ব্বেই মঙ্গলাচরণ বিহিত হয়। সুতরাং ভগবানের কথা যাঁ'রা আলোচনা করেন—যাঁ'রা ভগবানে সর্বতোভাবে নির্ভর করেন, তাঁদের পাদপদ্মে শরণ-গ্রহণ করাই আমাদের সর্ব্বমঙ্গলাচরণের আধার। সেই বৈষ্ণবদিগকে নমস্কার করি। সেই বৈষ্ণবগণ—পতিতপাবন, আমি—পতিত, তাঁ'দের শরণাপন্ন হ'লে তাঁ'রা আমাকে রক্ষা করবেন। আমি অভাবগ্রস্ত জীব—নানাপ্রকার অভাবে পিষ্ট হচ্ছি; বৈষ্ণবগণ কল্পতরু—তাঁ'রা সর্বাভীষ্ট পূরণ ক'র্‌তে সমর্থ। তাঁ'রা যদি কৃপণ হতেন, তা' হ'লে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হ'ত না। কিন্তু ভগবান্ তাঁদের সর্ব্বাপেক্ষা বদান্য ক'রে জগতে প্রেরণ ক'রেছেন। তাঁ'রা সর্বাপেক্ষা অধিক ধনী। আমরা মঙ্গলপ্রার্থী হয়েও যদি বৈষ্ণব ব্যতীত অপরের নিকট গমন করি, তা' হ'লে ত' অভীষ্ট-লাভ হবেই না, পুনরায় তা'র উপর আমাদের অমঙ্গলই হ'বে।

বৈষ্ণবের গুরুত্ব অবৈষ্ণবের লঘুতা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়। শাস্ত্র বলেন,—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্‌বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ।।"

এই শ্লোকের আলোচনা-মুখে সর্ব্বাগ্রে আমাদের বিচার্য্য এই যে, বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কোন্ জিনিষ আছে? 'বৈষ্ণব' ব্যতীত 'বিষ্ণু' ব'লে একটী বস্তু আছেন, আর 'অবৈষ্ণব' ব'লে একটী কথা আছে। যাঁ'রা নিত্যকাল বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁ'রা বৈষ্ণব;

যাঁ'রা বিষ্ণুর পূজা করেন না, কিন্তু তাঁ'দেরও বিষ্ণুর পূজা করা উচিত, তাঁ'রা—'অবৈষ্ণব'। যাঁ'রা বিষ্ণু-কথা ব্যতীত ইতর কথা-শ্রবণ, বিষ্ণুস্মৃতি ব্যতীত ইতর-চিন্তা, জগতে খাওয়া-দাওয়া থাকাকেই 'ধর্ম' মনে করেন, তাঁ'রা—'অবৈষ্ণব'। বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য, বিষ্ণুর প্রসাদ, বিষ্ণুভক্তের উচ্ছিষ্টই আমাদের নিত্য গ্রহণীয় বস্তু। বিষ্ণুর কথা শুনা ও বলাই আমাদের নিত্যকৃত্য। বৈষ্ণবের অনুগত থাকাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। সেই সকল সেবা-বঞ্চিত হ'য়ে যদি আমরা অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হই, তবে আমরা 'অবৈষ্ণব' হ'লাম।

আমাদের মনে হ'তে পারে—"কেউ বা 'বৈষ্ণব' হয়, কেউ বা নিজ রুচি অনুসারে 'অবৈষ্ণব' হয়—ইহাতে আর দোষ কি?" অবৈষ্ণব হ'লে আমাদের নানা অসুবিধা এসে' উপস্থিত হয়। আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক, আধি-দৈবিকাদি ক্লেশ এসে' উপস্থিত হয়। ভগবদ্বিমুখতাই ক্লেশের একমাত্র কারণ। ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য করার দরুণ আমরা ক্লেশ পাচ্ছি। জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা-ক্রমে ভগবানের উপাসনা বাদ দিয়ে, যা'তে অন্যলোকে আমাদের উপাসনা করেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে চেষ্টান্বিত করাচ্ছে। এইরূপ চেষ্টা নিয়ে আমরা 'কর্ত্তা' সাজ্‌ছি। স্বরূপের উপলব্ধির অভাবক্রমেই এই সব বিচার এসে' উপস্থিত হয়—'আমি কর্ত্তা', আমি ভোক্তা', আমি দ্রষ্টা, 'আমি ধ্যাতা' ইত্যাদি। যেদিন আমরা সাধুসঙ্গ করি, সেদিনই জানতে পারি,—"আমি কর্ত্তা নই ভগবান্‌ই আমাদের সেব্য বস্তু।"

ভগবানের শুদ্ধা অনুভূতি এজগতে অতি অল্প। 'আমরা কর্ম্মমার্গে বিচরণ ক'র্‌বো—এবিচারেই আমরা বিশেষ-আগ্রহান্বিত। কর্ম্মমার্গে বিচরণকারী ব্যক্তির নামই 'কর্ত্তা'। আমরা সৎকর্ম্মের দ্বারা সমগ্র জগতের প্রীতিভাজন হ'তে চাই। ভগবানের ভক্ত আমাদিগকে কৃপা ক'রে জানান যে, "ভগবানের সেবাই একমাত্র কৃত্য; দেবতা, পশুপক্ষী, মানুষ, সকলেরই কর্ত্তব্য—ভগবৎসেবা।" আমাদের মনে হয়,—পাথর হ'য়েছি, পাথরের কার্য্য আছে; গাছ হ'য়েছি, গাছের ফলদান-কার্য্য আছে; যখন মানুষ হয়েছি, তখন মানুষ হওয়া—শিক্ষিত হওয়া—সভ্য হওয়া—সমাজ-সংসার গঠন করা—দেশের উন্নতি করা প্রভৃতি বহু কার্য্য আছে। আমরা গৃহে থাক্‌বো, নৌকায় চড়্‌বো ইত্যাদি অসংখ্য সঙ্কল্প এসে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। ইহারই নাম 'অবৈষ্ণবতা'।

বৈষ্ণবের নিকট কথা শুন্‌লে, পাছে তিনি বিষ্ণুসেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য—এই কথা জানিয়ে দেন, এজন্য তাঁর কাছে হরি-কথা শুন্‌তেও ভয় হয়। মোহাচ্ছন্ন আমি, আমার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা নিয়ে তখন তাহা বৈষ্ণবের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করে বলে থাকি,—'বৈষ্ণব আমার মনের উচ্ছৃঙ্খলতা—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ-সাধনে যখন প্রশ্রয় দেন না, তখন তিনি সাম্প্রদায়িক বা একঘেয়ে!' যেদিন আমরা "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্"—এই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্‌বো, সেদিন আমরা দৃশ্যজগতের ভোগময় দর্শন হ'তে

মুক্ত হ'ব—সেদিন আমরা পরমাণুবাদীর চিন্তাস্রোত, প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী বা বিরোধিকুলের চিন্তাস্রোত হ'তে অবকাশ পাব। যাঁরা ভগবানের সেবা বিশেষরূপে অবগত হ'য়ে নিরন্তর ভগবানের প্রীতির জন্য অখিলচেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, তাঁ'দের আনুগত্যে কর্ণের সার্থকতা সম্পাদন করতে পার্‌বো।

কিন্তু যদি অবৈষ্ণবের কথা শুনি—অবৈষ্ণবের পরামর্শ নেই, তা হলে দৃশ্যজগতের প্রত্যেক পরমাণুর সেবা কর্‌তে কর্‌তে আবৃত অবস্থায় আমার অনন্ত-কোটি জীবন কেটে যাবে। বৈষ্ণবের নিকট শুন্‌তে পাবো যে, বিষ্ণুর সেবা কর্‌লেই সমগ্র চেতন-অচেতন পরমাণুর সেবা হ'য়ে যায়। বিষ্ণুর সেবাই আমাদের কার্য্য।

বৈষ্ণব—নিষ্কিঞ্চন। তাঁ'কে কোনও বস্তু লুব্ধ করতে পারে না। পরজগতে বা এজগতে এমন কোনও লোভের বস্তু নাই, যা কৃষ্ণপাদ-নখাগ্রের শোভা হ'তে অধিকতর লোভনীয় হ'তে পারে। যেখানে আমরা ভগবানের সেবায় লুব্ধ না হই, সেখানেই জান্‌তে হবে,—মোহিনী মায়া বহুরূপিণী হ'য়ে আমাদিগকে জাপটে ধরেছে—আক্রমণ করেছে।

যিনি অখণ্ডবস্তুর সেবা করেন, তাঁহার আনুগত্য-দ্বারাই জীবের মঙ্গল-লাভ হয়। দরিদ্র ব্যক্তি যদি দাতার বেষ গ্রহণ করে, তা হলে সম্পত্তি তার যতটুকু ততটুকু হতেই সে অপরকে দান করতে পারবে। কিন্তু বৈষ্ণবের নিত্যসম্পত্তি—'সাক্ষাৎ নারায়ণ'। স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজেকে নিজে দিয়ে দেন, তা' হ'লেও তাঁ'র কিছু দেওয়া বাকী থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণ ভাবেই ভগবান্‌কে দিয়ে দিতে পারেন। তাতে ভগবানের কিছু ক্ষতি হয় না।

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় মূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।"
(ঈশ-উপনিষৎ ১।১)

গণিতশাস্ত্র হ'তে জানতে পারা যায় যে, কোনও জিনিষ ব্যবকলিত হলে সেই বস্তুর অবশিষ্টাংশেরই অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু অখণ্ডবস্তু হ'তে বস্তু গৃহীত হ'লে মূলবস্তুর অখণ্ডত্বের কোনও হানি হয় না। অখণ্ডবস্তু বাস্তবজ্ঞান যাঁর সম্পত্তি,—যিনি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা তৎপর, তাঁ'র অতুলনীয় পাদপীঠের সহিত অন্যবস্তুর তুলনা হয় না।

সেই বৈষ্ণবের সেবা সকলের কৃত্য। বিষ্ণু সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণবের সেবার মাহাত্ম্য অধিক। বৈষ্ণবের সেবা-দ্বারাই বিষ্ণুর সেবা হয়।

কৃষ্ণকে তর্কপন্থি-লোকসকল সেবা করতে নারাজ হ'লো; দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি মনে করলো যে, ইনি পূর্ণতত্ত্ব নহেন, সুতরাং আমরাও এঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি! সমস্ত খণ্ডধর্ম্মের অতীত হয়ে তিনিই যে একমাত্র অখণ্ডবস্তু, তা জানিয়ে তিনি 'সর্ব্বধর্ম্মান্' পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—একথা বল্লেন। কিন্তু মহাবদান্য গৌরসুন্দর

সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হয়েও জীবের মৎসরতা দূর করবার জন্য নিজেকে 'কৃষ্ণ না বলে 'কৃষ্ণের একজন ভক্তমাত্র বলে পরিচয় দিলেন। দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ বলেছেন, 'আমার শরণাগত হও,—এতে কোন কোন মৎসর তর্কপন্থীর কৃষ্ণকে বুঝ্‌বার অভাব ঘটেছিল। কিন্তু গৌরসুন্দর যখন বললেন,—"আমি কৃষ্ণ নই, আমি তোমাদের মত একজন; তোমরা মনে করো না যে, কৃষ্ণকেই ভজন করলে কৃষ্ণেরই স্বার্থসিদ্ধি হবে; এতে তোমাদেরই যোল-আনা স্বার্থ-সিদ্ধি হতে পারবে।" তাই তিনি কখনও বা বললেন, "আমি ক্ষুদ্র জীব, জীবকে 'বিষ্ণু বলতে নাই।" কেউ তাঁকে 'বিষ্ণু বললে আচার্যরূপী লোকশিক্ষক কৃষ্ণ কাণে হাত দিতেন। গৌরসুন্দর মৎসর জগতের নিখিল জীবের উপকার করবার জন্য—তাদের কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি দূর করবার জন্য কতপ্রকার অভিনয় করলেন। তাই এখনও জগতের তর্কপন্থিসম্প্রদায় নত শিরে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ অর্চ্চন করছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর জগতে গুরুদেবের যে কার্য্য করলেন তার দ্বারা আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ হতেও গুরুপাদ্‌পদ্মের অধিক প্রয়োজনীয়তাই জানিয়েছেন। স্বয়ং কৃষ্ণ নিজেকে 'ভক্ত বলে প্রচার করলেন; তাতে অন্যভক্তগণও জানতে পাল্লেন,—'আমিও ভক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণই আমার আরাধ্য। কৃষ্ণই ভক্তরূপে কৃষ্ণান্বেষণ শিক্ষা দিয়ে জীবের কৃষ্ণান্বেষণ ব্যতীত যে অন্য কোন কর্ম্ম নাই, তাই শিক্ষা দিলেন,—জীবের চোখে আঙ্গুল দিয়ে জানালেন,—খণ্ডিত পদার্থের অন্বেষণে জীবের মঙ্গল হতে পারে না। গৌরসুন্দর কৃষ্ণ হয়েও নিজেকে 'বৈষ্ণবের দাসানুদাস বলে প্রচার করে তর্কপন্থিগণের উপকার করেছেন—শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশের পরেও যে-সকল তর্কপন্থী উদিত হয়েছিল,—সেই তর্কপন্থিগণের তর্কাগ্নিতে তিনি প্রভূতরূপে জল প্রদান করেছেন। "গীতা" পড়ে যে সকল ব্যক্তি তর্কপন্থী হয়ে গিয়েছিলেন অর্থাৎ পরমকৃপাময় ভগবানকে 'আত্মম্ভরী, 'স্বার্থপর প্রভৃতি বলে ধারণা করেছিলেন, তাঁরাও গৌরসুন্দরের চরিত্র দেখে স্বরাট্ পুরুষে মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। গৌরসুন্দর সর্ব্বগুরুগণের গুরু। তিনি জানালেন, গুরু ভগবান হতে অভিন্ন হলেও ভগবদ্ভক্তের প্রধানতত্ত্বরূপে গুরুতত্ত্বের অবস্থান।

পরিকরবিশিষ্ট গৌরসুন্দরই আমাদের পূজার সামগ্রী। পরিকর বাদ দিয়ে গৌরসুন্দরের পূজা হয় না। বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। বৈষ্ণবের অনুকরণ-দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না—'অনুশরণ দ্বারাই মঙ্গল হয়। কৃষ্ণের অনুকরণ জীবের সম্ভবপর নয়। কৃষ্ণের অনুকরণ করতে গিয়ে আউল-বাউলাদি অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে—শুদ্ধাদ্বৈতবাদের নামে বিদ্ধাদ্বৈত বা কেবলাদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হয়েছে।

গৌরসুন্দরের অন্য উপদেশ নাই—বৈষ্ণবের অন্য কোন কৃত্য নাই—ভগবান্‌কে ডাকা ছাড়া আর কোনও কথা নাই। যাঁরা কৃষ্ণকে আহ্বান করেছেন, সেই কৃষ্ণকে

ডাকা-কার্য্যটি স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের কার্য্যের অন্যতম নহে। পরন্তু কৃষ্ণের যে চিন্ময় শরীর—তাঁর সেবা করবার জন্যই তাঁরা ডাক্‌ছেন।

মনের মনিব আত্মা যখন জাগ্রত হন, নিজের বিষয়-কার্য্য নিজেই দেখতে থাকেন, তখন আত্মার প্রতিনিধিত্ব বা 'নায়েব মন ইতর-কার্য্যে ধাবিত হ'তে পারে না অথবা মনিবকে ঠকাতে পারে না; মনিবের আদেশ পালন করে চলে। তখন নায়েব মন যে-সকল কার্য্য করে, তা'র প্রত্যেকটিই মানবরূপী আত্মার ইচ্ছার অনুকূলে যান যদি কোনরূপে অন্য-কার্য্যে যেতে চায়, তখন তখন জাগ্রত মনিব নায়েবকে বাধা দেয়; তখন বলে,—"তুমি নিজে ভালমন্দের বিচার করবে, কর্ম্মবীর হ'বে, তোমাকে এ-সকল বৃথা কার্য্যে নিযুক্ত হতে দেবো না, তুমি পরমাত্মার সেবার সাহায্য কর।"

সমগ্র বদ্ধজীবের ভবরোগ-চিকিৎসক হ'য়ে যে-সকল ভগবৎপার্ষদ জীবের মঙ্গল চেষ্টা ক'রেছেন, তাঁদের কথা শুনলেই জীবের মঙ্গল হ'বে। অনন্ত-কোটি বৎসরব্যাপী প্রাণায়াম দ্বারা মন নিগৃহীত হবে না, ওসকল চেষ্টা কুঞ্জরশৌচবৎ। নায়েব মন যখন তাহার মনিব-আত্মাকে ঠকাতে চেষ্টা করে, তখনই জীব কর্ম্মরাজ্যের পথিক হয়। বাহ্য-চিন্তা-দ্বারা যে সকল ধর্ম্মসাধন প্রণালীতে জগতে প্রচারিত হয়েছে—যে সকল প্রণালী দ্বারা ভগবদুপাসনা প্রণালী বিপন্ন হয়েছে, তা' হতে ত্রিতাপতপ্ত জীবকে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। 'পরমাত্মবস্তু শ্রীবিষ্ণুর সেবক সম্প্রদায় বৈষ্ণবকে দিয়ে কর্ম্মফলের কাজ করিয়ে নেবো, সাময়িক শান্তি (temporary relief) করিয়ে নেবো—এ সকলই সঙ্কীর্ণ ভোগী মনোধর্ম্মীর কথা। এরূপ মনোধর্ম্মীর কথাগুলিকে আত্মধর্ম্মী দুইশত যোজন দূরে রাখেন। কই, আমরা এরূপ কর্ম্মিগণের দ্বারা পৃথিবীর অভাব, অসুবিধা কতটুকু মোচন করাতে পেরেছি? নিজ অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্বের নামই মনোধর্ম্ম। গীতা বলেন,—"অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে;" এই মনোধর্ম্মে চালিত হলে জীব ভগবানে শরণাগতি ভুলে গিয়ে কর্ম্মবীর সাজতে চায়।

জগতের সমস্ত লোকের প্রতিষ্ঠা থাকে থাকুক্, তা'দিগকে সে সকল প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত রেখে'—নিজের প্রতিষ্ঠা কিছুই নাই জেনে' ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবা করবার জন্য আমরা যেন অনন্তকাল প্রস্তুত থাকি। সকল অবৈষ্ণব-বিচার ছেড়ে' আমরা বৈষ্ণব-মহাজনের অনুসরণ পূর্ব্বক ভগবৎসেবায় যেন নিযুক্ত থাকি, তদ্ব্যতীত অন্যান্য চেষ্টায় আমাদের নরক পাতের ও যমদণ্ডের আশঙ্কা নিবারিত হয় না। সেইজন্য বৈষ্ণবের সেবক হলেই জীবের সাফল্য।

সেবকের ধর্ম—সেবা করা। সেবকের সেবা গ্রহণ করা, না করা সেব্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 'ভক্ত' শব্দের অন্যতম পর্য্যায়ে 'সেবক' শব্দটি স্থিত। 'ভজ্' ধাতুঃ সেবায়াম্—'ভজ্, ধাতু সেবার্থে প্রযুক্ত হয়। পূজ্যকে যিনি পূজা করেন, তিনি ভক্ত, আর যিনি পূজ্য বা সেব্য সূত্রে—ভক্ত, সেবক বা পূজকের সেবা গ্রহণ করেন তিনিই

ভক্তের একমাত্র সেব্য-'ভগবান'। ভগবান্‌কে যাঁরা সেবা করেন, সেই সেবকগণও ভগবানের ন্যায় পূজ্য। পূজা দুই প্রকার—সেব্য-ভগবানের পূজা, সেবক-ভগবানের পূজা। সেব্য ভগবানের পূজা অনেক সময় সেব্যের নিকট নাও পৌঁছতে পারে; কিন্তু সেবক-ভগবানের পূজার দ্বারে যে সেব্য-ভগবানের পূজা হয়, সেই পূজা অব্যর্থ—তাহা ভগবানের নিকট না পৌঁছে থাক্‌তে পারে না; কারণ, সেখানে সমস্ত ভার ভগবানের নিত্যসেবক গ্রহণ করেন—তাঁর নিত্যসেব্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের সেবা করেন না; যাঁরা ভগবানের নিত্যসেবা করেন, ভগবদ্ভক্ত তাঁ'দেরও সেবা করেন। 'ভগবদ্'—শব্দে নাম-রূপ-গুণ পরিকর-লীলা লক্ষিত হয়।' ভাগবতগণও 'ভগবদ্' শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট—ভগবৎসম্বন্ধীয় ভগবত্বা ভগবদ্ শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট। ভাগবতগণ ভগবান্ হইতে পৃথক্ পদার্থ ন'ন। ভগবান্ পূর্ণবস্তু—ভাগবতগণ তাঁ ছাড়া ন'ন। আমাদের পূর্ব্বগুরু কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন,—

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্।।"

ভগবান্ ছয় প্রকার প্রকাশে প্রকাশিত। তন্মধ্যে ভক্ত বা সেবককে বাদ দিয়ে সেব্যের বিচার—আংশিক বিচার মাত্র। ভক্ত বা সেবককে ভগবান্ বা সেব্য হইতে পৃথক্ করলে ভক্তের ভজন-বৃত্তি রহিত ক'রে তাঁকে অসম্পূর্ণ বা স্বতন্ত্র ক'রে ফেলা হ'লো। অভক্তগণের এরূপ বিচার। ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণপরতন্ত্র, আর কৃষ্ণ—ভক্তপরতন্ত্র, তাঁরা পরস্পর অভিন্ন—অঙ্গাঙ্গীভাবযুক্ত—একজনকে আর একজন হ'তে পৃথক্ করা যায় না। ভক্তকে বাদ দিলে ভগবান্ ব'লে কোন বাস্তব বস্তু থাকে না,—ভক্তপূজা বাদ দিলে "ভগবান পূজা ব'লে কোন ব্যাপারই হ'তে পারে না।

যাঁর ভগবদ্ভক্তি আছে, তিনি ভক্ত। 'ভক্ত, বল্লে ভজনীয় বস্তু সংশ্লিষ্ট থাকেন। যেমন 'পুত্র' বল্লে 'পিতা' নিশ্চয়ই থাক্‌বেন। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্—এই তিনটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সংশ্লিষ্ট।

আমরা উপরি উক্ত যে শ্লোকটি আলোচনা করেছি, তা'তে 'শ্রীচৈতন্যদেব' বল্‌তে দীক্ষা-শিক্ষা-ভেদে গুরুদ্বয়, ঈশ-ভক্ত শ্রীবাসাদি, ঈশাবতার অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি, ঈশপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দাদি, ঈশ-শক্তি শ্রীগদাধরাদি এবং ঈশ-স্বরূপ মহাপ্রভুকে সাকল্যে বুঝায়। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব' বল্‌তে নরাকৃতি একল ঐতিহাসিক পুরুষ মাত্র ন'ন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যুগে যুগে তাঁ'রই অভিন্ন পার্ষদ-সেবক-গুরু-আচার্য্য-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপাসনা শিক্ষা দেন—জীবের নিত্য বৃত্তি উন্মেষ করেন।

ভগবান্—একজন; কিন্তু ভগবৎপরিকর বা ভাগবত—অসংখ্য। বৈকুণ্ঠ বা গোলোকে এই সেব্য-সেবক বিচার নিত্যকাল অবস্থিত। মূল আকরবস্তু পরতত্ত্ব অন্যান্য বস্তুর দ্বারা সেব্য। এরূপ কথা নয়, যেমন ইহজগতে সেবক সম্প্রদায় ভজনীয় বস্তুর

প্রতি অবহেলা করে নিজের তৎপরতা প্রার্থনা করেন। সেব্যের সেবাই সেবকের ধর্ম। যে অংশ সেব্যের সেবা করে না, সে অংশটি 'সেবক' নামের অযোগ্য। ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি এক মুর্হূত্ত অন্য কার্য্য বা ইতর কার্য্যে ব্যস্ত থাকা যায় কিম্বা অন্যের নিকট হ'তে সেবা প্রার্থনা করা হয়, তা হ'লে সেবকের ধর্ম বাধা প্রাপ্ত হয়। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্‌ভক্ত বলেন,—

"চিরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধাগুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্ কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্।।"

"অহো! পথে কি ছেঁড়া কাপড় পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষগুলি কি ভিক্ষা দেয় না? নদী প্রভৃতি কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? গুহাসকল কি রুদ্ধ হইয়াছে? ঈশ্বর কি শরণাগতকে পালন করেন না? তবে পণ্ডিতগণ কেন ধন সুর্ম্মদান্ধগণের ভজন করেন?"

'ভাগবতের' ঐ শ্লোক থাকিলেও ভগবানের সেবকগণ কেন বাজে লোকের তোষামদ করেন? কেন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে যান? উত্তর—শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশক্রমে সকলেরই কল্যাণ সাধন করিতে তাঁহারা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তিটি পাইয়াছেন, তাহা সকলকেই বিতরণ করিয়া দিবার জন্য—সকলকেই কৃষ্ণসেবা মহোৎসবে আহ্বান করিবার জন্য। তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কোথাও বিচরণ করেন না। যদি কেহ তাহা করেন, তিনি ভগবানের সেবক নহেন। ভাগবতগণের করুণার তুলনা হয় না।

"মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য নাহি তবু যান তা'র ঘর।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।৩৯)

"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহীণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ।।"

(ভাঃ ১০।৮।৪)

সকল ব্যক্তির সঞ্চিত সকল সম্পত্তিই ভগবানের। শ্রীভগবানের সেবার জন্য ঐসকল সম্পত্তি ভগবৎ-সেবকগণেরই প্রাপ্য।

"অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষামাশাবাসো বসীমহি।
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্ব্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ।।"

যে সকল লোক বড় হইয়া পড়িয়াছে, পতিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট তাহাদের করুণা লাভের জন্য যাইব না। ভিক্ষা করিয়া খাইব। যাঁহারা ভগবানের কথা শুনিবেন, সেই সকল ব্যক্তি নিতান্ত দরিদ্র হইলেও তাঁহাদের নিকট যাইব। রাস্তায় শুইয়া থাকিব, তথাপি বিষয়ীর ঘরে যাইব না। ভিক্ষা করিবার সময় যদি লোকে গালাগালি দেয়, সেই

গালাগালি খাইয়া আসিব, তথাপি ধনদুর্ম্মদান্ধের সঙ্গ করিব না। যাঁহারা বলেন—"আমরা নিষ্কিঞ্চন, আমরা কাহাকেও শিষ্য করিব না, আমরা নিজ জ্ঞানে আপন মনে ভজন করি", তাঁহারা মহাপ্রভুর কোনও সেবকের শিষ্যত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা মহাপ্রভুর—"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তা'র এই দেশ।।"—এই উপদেশ পালন করিতেছেন কি? 'নির্জ্জন ভজনানন্দী'র প্রতিষ্ঠাশা তাঁহাদের হৃদয়ে অন্তঃপুরে কি লুকায়িত নাই? নিজেকে নিজে ফাঁকি দিলে ত' আত্মহত্যা করা হইল। দম্ভের নামই কি হরি ভজন? দুঃখের বিষয় আজকাল ব্রজমণ্ডলের মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বনকারী বাবাজীর সংখ্যা খুবই কম। কোন কোন বিষয়ী বা ধনবান্ মাসে মাসে টাকাদিবে, সেই টাকা দিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া নির্জনে ভোজনের নামে আলস্যের ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিলে ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখের কথা কি হতে পারে? শ্রীরূপ-সনাতন কখনও কর্ম্ম-জড় স্মার্ত্তবাদ বা মায়াবাদ শিক্ষা দেন নাই। বৈষ্ণবের ভৃত্য হইবার শুদ্ধ অভিমান হইল না। বৈষ্ণব দর্শনের যোগ্যতা ত' হইল না।

যে ভক্তের দর্শনে সকল প্রাণীই ভগবানের সেবোপকরণরূপে প্রতীত হয়, অদ্বয়জ্ঞান—হইতে ভিন্ন প্রতীত হয় না, তাহাতেই ভাবব্যঞ্জক অনুকূলতা প্রদর্শনের প্রতীতি হয় এবং পৃথক্‌ভাবে জীবভোগ্য পদার্থ-বিশেষের ধারণা হয় না, ভক্তির প্রতিকূল আশ্রয়-বিবেকের ধারণা যাঁহার নাই, জ্ঞেয়-অধিষ্ঠানে যে সেবক অনুকূল ধারণা করেন, ভগবদিতর বস্তুর প্রতিকুল ভাব যিনি কোথাও দর্শন করেন না, সকল বস্তুই একাধারে অন্বয় ব্যতিরেক ভাবে অবস্থিত হইয়া ভগবৎসেবার সাহচর্য্য করিতেছে, এরূপ ধারণা করেন, তিনিই উত্তম ভাগববত।

যাহারা ভোগ্য বা দৃশ্যজ্ঞানে দর্শকসূত্রে ত্রিগুণতাড়িত হইয়া ভাল-মন্দের বিচার করেন, নিজের দ্বিতীয়াভিনিবেশ প্রযুক্ত বাস্তব বস্তু হইতে পৃথক্ বুদ্ধিতে স্থূলবস্তুসমূহ ও ভাবসমূহ ধারণা করেন এবং ভগবৎসম্বন্ধ রহিত বিচার করিয়া নিজেদের সংকীর্ণ দর্শনের বিচার মাত্র বোধে আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের কুদর্শনের সহিত মহাভাগবতের সুদর্শন এক বা সমান নহে।

যাঁহাদের অনুকূলতার পরিমাণ পূর্ণতা লাভ করে নাই, প্রতিকূল ব্যাপারে প্রতীতির সহিত যাঁহারা অসহযোগ সম্পন্ন, তাঁহারাই ক্রমশঃ পরম উগ্র হইয়া মহাভাগবতের পদবী লাভ করেন। যাঁহারা ভক্তাভক্তবিচার-দর্শনহীন বলিয়া ভক্তপূজা-রহিত হইয়া ভগবৎ-পূজাকালে ভক্তের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন এবং যাঁহাদের প্রাকৃত অধিকারে অধোক্ষজের পূজার মধ্যে অধোক্ষজ-সেবকের আনুগত্যের পরিমাণ অল্প, তাঁহারা অধিকারের উন্নতিক্রমে ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিতে করিতে পরোপকার-রত

হইয়া সৌভাগ্যবন্ত জনগণকে সঙ্গদ্বারা মঙ্গল বিধান করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা কপট ভগবদ্বিমুখ জনগণের দুঃসঙ্গ পরিহার কামনা করেন। তাদৃশ মধ্যমাধিকারে পূর্ণতাভিমুখে অভিযানকালে উত্তমাধিকারের বিচার উপস্থিত হয়।

কনিষ্ঠাধিকারের গুরুত্ব কেবল জ্ঞান-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট প্রতিভাত, কর্ম্মনিষ্ঠাধিকারের সাফল্য জ্ঞান-নিষ্ঠাই ত্যক্তকুকর্ম্মাধিকার জীবকে সৎকর্ম্মাধিকারে প্রবৃত্ত করায় এবং সৎকর্ম্মাধিকারী জীবের কৃষ্ণেতর বিষয়-বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ করায়। জ্ঞাননিষ্ঠের ভজনোন্মুখতা তাহাকে কনিষ্ঠাধিকারীর চরণে প্রপত্তি করায়। কনিষ্ঠাধিকার উন্নত হইলে মধ্যমাধিকারের বিচার প্রণালীর শিক্ষক তাঁহাকে স্বশ্রেণীভুক্ত করেন এবং সেই শ্রেণীতে পারদর্শিতা হইলে মহাভাগবত গুরুর সেবন প্রভাবে সেই মহাভাগবতের বিচার তাঁহার শুদ্ধচিত্ত ক্রমশঃ অধিকার করে। তখন তিনি পরমহংস ভাগবতাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার প্রত্যেক আচরণ, বিচরণ ও প্রচারণে একান্তভাবে কৃষ্ণানুশীলন হইয়া থাকে। তখন আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি তাঁহার নিকট হইতে নিরস্ত হয়। তখন তিনি শ্রীরূপের উপদেশামৃতে প্রদত্ত—"শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিত সঙ্গ লব্ধা"—বিচারে প্রতিষ্ঠিত হন।

মহাভাগবতের এইরূপ অলৌকিক শক্তি যে, তিনি ভক্তপ্রসাদজ কৃপাশক্তি বিতরণে মধ্যমাধিকারী নিজানুগজনগণকে উন্নত করেন এবং কনিষ্ঠাধিকারীকে মধ্যমাধিকারে যোগ্যতা প্রদান করেন। মহাভাগবত ভগবান্ ও ভক্তবিদ্বেষী জনগণের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার পরিবর্ত্তে মৌনাবলম্বন করেন এবং মধ্যমাধিকারী ও কনিষ্ঠাধিকারীর দ্বারা বহির্ম্মুখ জীবগণের চিত্তবৃত্তি শোধন করিবার সুযোগ প্রদান করেন। যাহারা ভক্তি রাজ্যের কনিষ্ঠাধিকারের মহিমা বুঝিতে অসমর্থ মধ্যমাধিকারের অধিকতর কল্যাণজনক ভাবের স্তাবক নহে, তাহারা উত্তরাধিকার আদৌ বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী হইয়া কংস, অঘ, বক ও পূতনাদির আনুগত্যক্রমে শ্রীহরিকর্ত্তৃক নিহত হয় এবং ভোগিকূল নিজ-নিজ অপস্বার্থ প্রভাবে ভগবৎসেবাবিমুখ থাকিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করে। তাহাদের ভজন ঔৎসুক্য দেখা যায় না।

উত্তমভাগবত অনর্থমুক্ত হইয়া স্বীয় ভোগ্যানুসন্ধান রহিত হন; সেইকালে নির্ম্মুক্তাভিলাষ হইয়া তিনি ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া প্রপঞ্চস্থিত মায়িক আবরণ ও বিক্ষেপদশা অতিক্রম করিয়া নিজস্থায়ী ভাবরতির বিক্রম স্তব্ধ করিতে না পারায় চিদচিৎ সমস্ত বস্তুকেই নিজাভীষ্ট ভগবৎপ্রাকট্য দর্শন অনুভব করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার বহির্দ্দর্শনে সাধারণোচিত বুদ্ধি অপসারিত হইয়া আত্মবিকাশ হইতে থাকে। তাঁহার সেব্যবস্তুটি চিদুপকরণের আধারে সমাগত—এরূপ বোধ হয়। নিত্য বিষয়াশ্রয় ভাবসমূহ তাঁহার চিত্তকে প্লাবিত করিতে থাকে এবং বন, লতা ও তরুতে ভোগবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া তমালাদি বৃক্ষে

ভগবদ্দর্শন হয়। নিত্যসেবকের স্বীয় সিদ্ধভাবের উদ্যমে ভগবৎপ্রেমা বহির্দর্শনে দৃষ্ট চিদচিৎ বিচারকে প্লাবিত করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ আপ্লুত করায়।

ভগবানে প্রণয়াধিক্যবশতঃ সর্ব্বত্র নিজাভীষ্ট দর্শন মহাভাগবতেই সম্ভব। মায়াবাদীর বিচারে প্রাকৃতবুদ্ধি ও অবিবেক গতি লক্ষিত হয়, কিন্তু ভাগবতোত্তমের অধিকারের তদ্রূপ বিবর্ত্তের অবকাশ নাই। যেখানে সেবোপকরণ দর্শন সেখানে সেব্য-সেবক-বিচার হইতে বিচ্যুত ভাবের দর্শন নাই; যেহেতু উহাতে পূর্ণতা তিরোহিত হয় নাই; সুতরাং চিদ্‌বিলাসময়ী লীলার দর্শনে বিসদৃশতা আরোপিত হইতে পারে না। এইজন্য ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বলেছেন,—"যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।"

ভগবানের তটস্থাশক্তি-পরিণত জীবগণ বদ্ধাবস্থায় আনন্দরহিত হওয়ায় ভগবৎ-সেবাকার্য্যে প্রীতিরহিত, ভগবৎসেবকে বন্ধুত্ব বর্জ্জিত, সেবা নিরপেক্ষের প্রতি কৃপাহীন এবং সেবাবিমুখ ভোগী অহংকারী জনগণের মুখাপেক্ষাযুক্ত। প্রেমধনে বঞ্চিত হওয়ায় সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা প্রেমে তাঁহাদের অন্তঃকরণ সম্যক মসৃণিত নহে এবং তাহারা ভগবদ্‌বিগ্রহে মমতার লেশমাত্র পরিপোষণ করে না। ভগবৎসেবা প্রেমান্বিত জনগণে শুশ্রূষারহিত হইয়া এবং ঈশসেবক জনগণের আনুগত্য না করিয়া কিঞ্চিৎ ভগবৎ সেবোন্মুখ জনগণে আদরাভাবে সেবোন্মুখ সমাজের প্রতি বন্ধুত্ব বর্জ্জিত। দয়ার স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে নিষ্ঠুর হইয়া জীবের ভগবদ্বৈমুখ্যের সহায়তা করিতে সর্ব্বদা উন্মুখ এবং ভগবদ্বিমুখ আশ্রয় বিহীন জনগণের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। জীবকে ভগবদুন্মুখ করাই সর্ব্বোত্তম কৃপা। বিমুখজীবের দ্বারা অভিভূত না হইয়া তৎপ্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ ও তাহার প্রতি সদয়চিত্ত বৃত্তিরই পরিচয় মাত্র। বিমুখের সহিত সেবোন্মুখের মিত্রতা করিতে গিয়া যে সমদর্শন, উহা ভগবজ্জনে মিত্রতার বিমুখতা মাত্র।

সাধনরাজ্যের পূর্ণাধিকার প্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থায় দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের ও সৎসঙ্গ গ্রহণের অনুপলব্ধি থাকিলে জীব কনিষ্ঠাধিকারে অবস্থিত হন, তখন তাহার ঈশ্বর সেবায় কিঞ্চিৎ অধিকার হইলেও ভগবৎ পরিকর-বৈশিষ্ট্যের তারতম্যনির্দ্দেশে মিত্রতার তারতম্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। সেইকালে তিনি ভগবন্মুখ, ভগবৎসেবানিরপেক্ষ ও ভগবদ্‌বিদ্বেষীকে সমপর্য্যায়ে দৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহার ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় নাই, জানিতে হইবে। যেকালে ভক্তাভক্ত বিবেক উদিত না হয়, তৎকালে জীব সেবোন্মুখতার অনুমোদন করিলেও তাঁহার ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবার অধিকার হয় নাই, জানিতে হইবে। বিদ্বেষীর সঙ্গ সাধনকালে পরিত্যাগ না করিলে দুঃসঙ্গের প্রতারণা জীবকে অধঃপতিত করিয়া ভগবৎ সেবাবিমুখ করায়। সেবনের সুষ্ঠুতা ও স্বরূপজ্ঞানের উপলব্ধি জন্য সেবাবিমুখজনের অর্থাৎ মায়াবাদী, ফলকামী, ভোগী, কর্মী ও জ্ঞানীর বিচার হইতে পৃথক্ থাকিবার উদ্দেশ্যে মায়াবাদী, কুতার্কিক ও কর্ম্মনিষ্ঠগণের বিচারের

বহু মানন হইতে আত্মসংরক্ষণ আবশ্যক। যেরূপ দুর্ব্বল ব্যক্তির মৃত্যুঞ্জয়ত্ব ধর্ম্মের পূর্ণবিকাশ না হওয়া পর্যন্ত বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তদ্রূপ অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সাধনের উন্নতিক্রমে অধিকারের উৎকর্ষের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। যখন তিনি সুষ্ঠুভাবে স্বীয় যোগ্যতা লাভ করেন, তখন প্রতিকুল সঙ্গ তাঁহার মৃত্যুঞ্জয়ত্বধর্ম্মের ব্যাঘাত করিতে পারে না। তাই বলিয়া কনিষ্ঠাধিকারীর অমঙ্গল বরণ-কার্য্যকে কখনই উত্তমাধিকার বলা যাবে না। অথবা মায়াবাদী, কুতার্কিক ও কর্ম্মনিষ্ঠগণের মধ্যমাধিকারকে গ্রহণ করিয়া সাধারণ সামঞ্জসতার পক্ষ গ্রহণ করা কখনও আদরণীয় নহে। অনধিকারী যে কালে সমন্বয়বাদ-প্রচার-কল্পে যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেন এবং অবৈধভাবে স্তাবক-সংগ্রহের জন্য ভগবদ্ভক্তের অধিকারের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে অনুদার বলিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন সেইকালে অহঙ্কার বিমূঢ়াত্ম হইয়া জীবের কবলে ধর্ম্মাধিকারের বা ফলভোগাধিকারের তাণ্ডব-নৃত্য পরিলক্ষিত হয়। কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিয়া ভগবদ্ভক্ত সাধনের পথে অগ্রগামী হইলে তাঁহার নিকট চারিপ্রকার বস্তুর বিলাস অন্বয় বা ব্যতিরেকভাবে উপস্থিত হয়। তত্তদ্ বিলাসের উপকরণিক সেবন-যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে ভগবানের প্রীতি সংগ্রহে তৎপর হওয়া আবশ্যক। ভগবৎ সেবারত জনগণের প্রতি শুশ্রূষামুখে গাঢ় বন্ধুত্ব, প্রণতিমুখে আনুগত্যাত্মক, বন্ধুত্ব, অপরাধ-ক্ষয়কামী কনিষ্ঠাধিকারীকে নাম ভজন উৎসাহ-প্রদান এবং ভগবদ্ভক্তি-বিরোধি জড়প্রমত্ত অহঙ্কারী জনগণের সঙ্গ বর্জ্জন মধ্যমাধিকারের লক্ষণরূপে প্রকাশিত হয়। নিষ্কপট অনভিজ্ঞগণের মঙ্গললাভ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তাহাদের সেবেন্মুখতায় রুচি প্রদর্শন কালে সাহায্য করাই মধ্যমাধিকারের লক্ষণ। মহাভাগবতের দক্ষিণহস্তরূপে ভুজ-প্রসারণ করিয়া পরোপকার ব্রত গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-কার্যের সহায়তা করাই বালিশের প্রতি কৃপার মুখ্য লক্ষণ; কৃপার তটস্থলক্ষণ সেবানুকূল্যের মহিমা-প্রচারই লক্ষিত হয়। অনভিজ্ঞ ফলভোগী কর্মী যে কৃপার আদর্শ বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে যে তাৎকালিক ইন্দ্রিয় তর্পণের সুযোগ আছে, সেই সুযোগে ইন্ধন প্রদান করা কপট কৃপার উদাহরণ মাত্র। যদি প্রকৃতকৃপা জীবকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত না করিতে পারে এবং ভোগিপর্য্যায়ে রাখিবার যত্ন করে, তাহা হইলে সেইরূপ আদর্শ প্রতারণা-মাত্রেই পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ 'ভোগা দেওয়া'হয়, 'দয়া' করা হয় না। বৈষ্ণব-লেখকগণ ইহাকে 'অমায়ায় দয়া' বলেন না। উপেক্ষা মন্দ ভাগ্যেরই প্রাপ্য পুরস্কার। তাহাতে উভয় পক্ষেরই অপ্রীতিকর বৈরিতা স্তব্ধ হয়। ভগবানের এবং ভগবদ্ভক্তে যে স্থলে বিদ্বেষ দেখা যায়, সেস্থলে সমর্থপক্ষে জিহ্বা-ছেদন বিধি কৃপার অন্তর্গত হইলে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার সঞ্চিত কুফল-লাভে অমঙ্গলবরণ করিতে দেওয়াই সঙ্গত। অভক্তজনের ভক্তিরাহিত্য-বর্ণনে জীবের মঙ্গল পথে বিচরণ-প্রদর্শন কল্পে উপকার করা হয়। কিন্তু সেই বদ্ধজীব যদি উহাকে

উপকার বুঝিতে না পারিয়া অভক্তের প্রতি উদাসীন থাকাকে মধ্যমাধিকারী শিক্ষকের বিচার ভাবিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরনিন্দাজ্ঞানে আত্মবঞ্চনা করে, তাহা হইলে তাদৃশ কপটের কাপট্যই দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। ভগবদ্ভক্তের কৃপা বুঝিতে না পারিয়া ভগবদ্ভক্তের নিকট উপেক্ষিত হইবে মাত্র।

শ্রীচৈতন্যবিমুখতা ও শ্রীচৈতন্যদাস বৈষ্ণবগণের প্রতি অসম্মান করিতে গিয়া যদি কেহ ভক্তিসিদ্ধান্তের বাণীসমূহকে স্বীয় ভজনের ব্যাঘাত মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার কৃষ্ণে সুদৃঢ়মানসের সম্ভাবনা থাকিবে না। তিনি ক্রমশঃ ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশকেই কৃষ্ণভজন-জ্ঞানে নিজের অমঙ্গল বরণ করিবেন। অশ্রদ্ধধানে হরিনাম দান বা 'ভক্ত' বলিয়া ভ্রান্তোপলব্ধি কখনই জীবকে নাম-ভজনে উন্নত করিতে পারিবে না। বালিশজন আপনাকে মহাভাগবত-জ্ঞানে যে বৈষ্ণব-গুরুর দ্রোহিতা আচরণ করেন, তাহা তাঁহার কৃপালাভের অন্তরায় মাত্র। ক্রমশঃ এইপ্রকার অহঙ্কারবিমূঢ় ভক্তাভিমানী শুদ্ধভক্তের মধ্যমাধিকারের বিচার-মতে উপেক্ষণীয় হইয়া পড়ে এবং ভক্তপ্রসঙ্গজ কৃপা বঞ্চিত হইয়া নামাপরাধ করিতে করিতে অসাধু হইয়া পড়ে। শুদ্ধভক্তগণ এইজন্যই বিদ্ধভক্তাভিমানিগণকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এতাদৃশী উপেক্ষাই তাঁহাদের দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয়। মধ্যমাধিকারে অর্চনের সুষ্ঠুতা সমৃদ্ধ হইয়া ভজনে পরিণত হয়। অর্চ্চন ও ভজনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটি মর্য্যাদাপথের অনুষ্ঠান ও অপরটী নামাশ্রয়ে মর্য্যাদাপথের বহির্ব্বিচারে শৈথিল্য-জ্ঞাপক হইলেও সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সেবন-চেষ্টা।

অর্চ্চকের অর্চ্চ্য ও মধ্যবর্ত্তী বৃত্তি অর্চ্চনই প্রধানভাবে লক্ষীতব্য বস্তু। অর্চ্চনাঙ্গের উন্নতিক্রমে তদ্দ্বারা ভজনাঙ্গ সাধিত হয়। ভজনে অর্চ্চনের প্রাথমিকতা না থাকিলেও উহা গৌরবিচারের বিরোধী নহে। অর্চ্চাবিগ্রহ বাস্তব বস্তুর অবতার বিশেষ। পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চা—এই পঞ্চবিধ প্রকাশবিশেষে উপাস্যের নিকট উপাসক সম্মুখ হইতে পারেন। অর্চ্চার অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামী,উহা বৈভবান্তর্গত। ব্যূহ হইতে ভগবানের বৈভব-প্রকাশ। মূলবস্তু পরতত্ত্ব, তাঁহারই অভেদকায়ব্যূহ ও তাঁহা হইতেই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ নৈমিত্তিক অবতারসমূহ, তাঁহারা অর্চ্চাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্য্যামিত্ব প্রদর্শন করেন। ভগবদ্বৈভবসমূহ প্রপঞ্চে কালবিশেষে অবতীর্ণ হন, কিন্তু অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চা-বিগ্রহ সর্ব্বকালিকী সেবকপ্রতীতির অধিগম্য।

জড়ভোগতৎপরতায় আবদ্ধ হওয়া ভগবদ্‌বিমুখের স্বভাব। তিনি সেই কালে ভগবদিতরানুভাবের দ্বারা চালিত হইয়া আপনাকে ভোগ্যজগতের ভোক্তৃত্বে বরণ করেন, সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতি অধিক লোলুপতা বৃদ্ধি পাইয়া বহির্জ্জগতের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসবর্দ্ধনের চেষ্টা হয়। মধ্যমাধিকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রাকৃতবস্তু-বিশেষের অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামী, তদভ্যন্তরে বৈভব ও তাহার কারণরূপে ব্যূহ ও পরতত্ত্ব-

পর্য্যন্ত উপাস্য-বিচারে উন্নত হইতে থাকে। ভগবানের ভাবসমূহ বৈভব-প্রকাশ, ব্যূহ ও পরতত্ত্বের বৈচিত্র্য এবং অন্তর্য্যামিসূত্রে অর্চ্চাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্চ্চামুখে জীবের অধিগম্য-বিষয় হন। ভগবৎপ্রতীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে গিয়া উন্নতার্চ্চক ভজনানন্দিগণের অধিক বৈশিষ্ট্য দর্শন করেন না। সেইকালে তাঁহার প্রকৃত বিচার অতিক্রম করিতে গিয়া উপাস্যের সর্ব্বতোভাবে প্রচুর পরিমাণ গৌরবসেবার বিচার উপস্থিত হয়। যে-কালে তিনি ভক্তের তারতম্য দর্শন করিবার রুচি লাভ করেন, সেইকালে তাঁহার প্রাকৃত অধিকার উন্নত হইয়া মধ্যমাধিকারে পরিণত হয়।

কনিষ্ঠাধিকার থাকাকালে ভগবানের পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অপ্রাকৃতত্বোপলব্ধির অবকাশ হয় না। প্রকৃতির অন্তর্গত রাজ্যে বাসকালে, মায়াবাদী ও কর্মী সম্প্রদায় প্রাকৃত আধ্যক্ষিক জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া পূর্ণ পুরুষের সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহাদের ন্যূনাধিক প্রাকৃতবাদ বা মায়াবাদেরই অনুসরণ করিতে হয়। মায়াবাদীর প্রাকৃত বিচার ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অবস্থিত হওয়ায় ভগবদ্‌বৈমুখ্য ও ভগবদ্‌সেবা-বৈমুখ্য তাঁহার অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যোপলব্ধির পথ অবরোধ করে। অবরোধ-বিচার প্রাকৃতক্ষেত্রে কার্য্যদক্ষ হইয়া যে একটু ভক্তির সন্ধান করেন, তাহার 'প্রাকৃত-ভক্ত' আখ্যা হয়। শত শত জন্ম বাসুদেবের অর্চ্চায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বহিরুপকরণদ্বারা সেবা করিতে করিতে চিন্ময়-নামের ও চিন্ময় মন্ত্রের স্বরূপোপলব্ধিক্রমে প্রাকৃত বিচারের বন্ধন ন্যূনাধিক শ্লথ হইতে থাকে। ভক্তের মানসিক চেষ্টা উপলব্ধি করিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে কনিষ্ঠাধিকারী প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার প্রাকৃত ভাবসমূহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তখন ভজনীয় বস্তুতে প্রীতিসেবা, ভগবদ্‌ভক্তে প্রেমানুগ-মিত্রতা, অনভিজ্ঞ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার প্রতি প্রেমানুগা মিত্রতার ফলে তত্তদ্ধর্ম্মে প্রবেশাধিকার দিবার জন্য অলৌকিক বদান্যতা এবং বিদ্বেষীজনের বিরোধিভাবের প্রতি নিরুৎসাহিত করিবার জন্য তাহার সহিত অসহযোগমূলা উপেক্ষা বা সহযোগে বিতৃষ্ণতা ও অনুপযোগিতা-প্রদর্শনমুখে শাসনরূপা হিতাকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। মধ্যমাধিকারে অবস্থিত হইয়া যখন ভজনের পরিপাকবাবস্থা দৃষ্ট হয়, তখন বৈভব-প্রকাশ-বিশেষের অন্তর্য্যামিত্ব ও প্রাকৃত জন্মোপযোগী উপলব্ধির আধারবিগ্রহ অর্চ্চাকে ভগবদবতার শ্রেণী-বিচারে বৈভবপ্রকাশের ভাবসমূহে পরিপ্লুত হন। বৈভবপ্রকাশসমূহ ব্যূহান্তর্গত, ব্যূহ পরতত্ত্ব বাসুদেবে অবস্থিত, বাসুদেব পরাৎপরতত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশতত্ত্বে অবস্থিত এবং প্রকাশতত্ত্ব—পরমপরাৎপর অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনে অবস্থিত,—এইসকল কথার উপলব্ধি হয়। চিজ্জগতের অন্বয় সেবোন্মুখতায় প্রপঞ্চে আগত। বহির্ম্মুখ জগৎ বদ্ধজীবকে ভোগী সাজাইয়া ভোগীর সেবায় উন্মাদের ভাব প্রদর্শন করে। বদ্ধজীবের প্রকৃত মুক্তিবাসনা ভগবৎপাদপদ্ম-সেবায় উত্তরোত্তর উন্নতির উপর নির্ভর করে। অর্চ্চা ব্যতীত ইতর প্রাকৃত-বস্তুতে জীবের ভোগপ্রবৃত্তি প্রবলা, তজ্জন্য ভগবদর্থে অখিল চেষ্টাপর হইয়া যে প্রাথমিকী চেষ্টা, তাহাই ভক্তের

প্রাকৃতাধিকারে ইতরবস্তু পরিহার করিয়া পূজ্যের সম্বর্ধনে যত্ন। যেকালে তাঁহার অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য প্রতীতিতে চিন্ময়ভেদ উপলব্ধি হয়, তখনই তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেবলাদ্বৈতবাদীর প্রাকৃতবিচারে ঔদাসীন্য লাভ করেন এবং ন্যূনাধিক শুদ্ধ-দ্বৈতবিচার শুদ্ধাদ্বৈতবিচার, দ্বৈতাদ্বৈতবিচার এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবিচারের অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া সংখ্যাগত হেয়তা পরিহারপূর্ব্বক অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদাসের সর্ব্বচিৎ-সুষ্ঠু-সমন্বয়তা এবং মায়াবাদীর কুতার্কিক কর্ম্মনিষ্ঠগণের কুচিন্তার বিরোধাচরণপূর্বক তাহাদের অনাত্মপ্রতীতি পরিহার করিতে সমর্থ হন। অদ্বয়জ্ঞানেই ভাবরাহিত্য বর্ত্তমান। তাঁহার নিরপেক্ষতা লাভ হইলে এই প্রাপঞ্চিক বিচার আর তাঁহাকে ক্লেশপ্রদানে সমর্থ হয় না। ভগবদ্ভক্তিতে নিজফলভোগময় যত্ন নাই, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানমূলক জড়ত্বলাভরূপ কৈবল্য নাই।

যিনি হরিসেবা করেন, তিনি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনজ্ঞান করেন। সর্ব্বাপেক্ষাহীন অভিমান হইলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হইতে পারেন,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিভক্তির কথা বলিতে পারেন। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি' মানে।"

"যদ্যদ্ভুতক্রম-পরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্যক্জনা অপিকিমুশ্রুতধারণা যে।।"

'বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।'

ভক্তগণ অদ্ভুতক্রম ভগবৎ-পরায়ণ। আমরা apperent বা বাহ্যদর্শনে ভ্রান্ত না হই। বাহ্যবিচারে অনেকেই বিবর্ত্তে পতিত হইয়া শুক্তিতে মুক্তা, সর্পে রজ্জু এবং মঙ্গলে অমঙ্গল ভ্রম করিয়া থাকেন। যখন মানুষকে ভ্রান্তিতে গ্রাস করে, তখন বহির্জগতের অধিবাসী-বিচারে বহির্জগতের অভাব পরিপূরণের জন্য ইন্দ্রিয়সকল লালায়িত হয়। মায়ার এই দৌরাত্ম্য হইতে পরিত্রাণ পাইব কি করিয়া, তাহাই বিবেচ্য। যদি মনে করি ভগবদ্ভক্ত-দাসমনোবৃত্তি (slave mantality) গ্রহণ করিয়াছেন, আমি lord mentality লইয়া এই ineligibility পরিপূরণ করিব, তবে উহা দ্বারা কখনই সুবিধা হইবে না; ঐ বিচারে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির পরিচালনায় নরকের পথেই অগ্রসর হইতে হইবে।

নিজে শ্রেষ্ঠতা লাভের জন্য যদি ভগবদ্ভক্তকে অসম্মান করি—অবজ্ঞা করি তাহা হইলে তিনের dimension এর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া সঙ্কীর্ণতার পরিবর্ত্তে বৃহত্তের দিকে ছুটিতে হইবে। আমি ভাল হইব,আমার ব্যাধি যাউক মঙ্গল হউক—এই বিচারই ভাল পরন্তু আমি বড় হইব, জগতের সকলকে নামাইয়া দিয়া আমার হিংসা বৃত্তি চরিতার্থ হউক,—এই ধারণা আদৌ প্রশংসনীয় নহে। নিজের শ্রেষ্ঠতা লইয়া ভক্তের পূজ্যতাকে বাধা দেওয়া উচিত নহে। শ্রৌত-পথ বিকৃত হইয়াছে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের কদর্থে।

আমরা তলবকার উপনিষদ্ হইতে এই বিচার পাইয়াছি যে, যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের প্রভু—ভগবানের প্রভু হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অত্যন্ত দাম্ভিক। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"জানন্ত এব জানন্ত কিং বহূক্ত্যা ন যে প্রভো"

জড়-জগতের যেসকল রাস্তা, তাহার একটিও ভগবৎসেবার রাস্তা নহে। ভগবদ্ভক্তের প্রভু হইবার বিচার কেবল নরক-গমনের রাস্তা! ----এই সকল পথে অনুগমন অমঙ্গলকর।

ভগবদ্ভক্তের অনুগমনই মঙ্গলের পথ; তাঁহার সকল ব্যবস্থাই আদরের।

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।।"

আমাদের জন্ম-জন্মান্তর হউক, আমরা যেন ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের ধূলি হইয়া শ্রীরূপানুগপদ্ধতি অনুগমন করিতে পারি। স্বীয় অযোগ্যতার উপলব্ধিরূপ দৈন্যই ইহার মূল। আমি অযোগ্য—এই বিচার স্বতঃ পরতঃ যদি আসিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের শোভা লক্ষ্য করিতে পারিব। সাধারণ মনুষ্যজাতির যে কথা, তাহাতে ইন্দ্রিয়-তর্পণ কি প্রকারে সাধিত হইবে,তাহার বিচারই প্রবল । তাহাকে যদি ধর্মপথ বলিয়া বিচার করি, তাহা হইলে আর প্রকৃত ধার্মিক হওয়া হইল না।

ভগবানের শ্রীচরণের অর্চ্চন সকলেই করিয়া থাকেন, কিন্তু 'ভগবান্ আমাদের কিছু সুবিধা করিয়া দিন্'—এই বিচার দোকানদারি ছাড়া আর কিছুই নহে। কোন জিনিষের বদলে কোন জিনিষ পাইব,—এই বিচার ভগবদ্ভক্তের বিচার নহে। এইরূপ রাস্তা ধরিবার চেষ্টা করিলে কৃষ্ণের সেবা বুঝা যাইবে না। ভগবান্ পরম মঙ্গলময়, তাঁহারর নিকট পরম মঙ্গল প্রার্থনা করিবার পরিবর্ত্তে কামাদি প্রার্থনা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। কৃষ্ণকে কি প্রকারে ভজনা করা যায়। সেই বিচারই অনুসরণীয়।

যাঁহারা তাঁহার সেবায় সমর্পিতাত্মা, তাঁহাদের সেবা ব্যতীত কৃষ্ণ সেবা-লাভ সুদূরপরাহত। ভক্তসেবাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলপ্রদ।

এখানে আমরা ভগবান্‌কে দেখিতে পাইতেছি না। ভগবান্‌কে যাঁহারা সেবা করেন, সেই ভক্তবৃন্দ কৃপা করিয়া আমাদিগকে দর্শন দান করেন। তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ অনুসরণীয় এবং আমাদের একমাত্র মঙ্গলের উপায়। স্বল্প শিক্ষাফলে নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় অনেকেরই ভগবদ্ভক্তের বিচারকে (slave mentality-র) সহিত সমানজ্ঞান হয়। mental aberration-এ চালিত হইয়া যাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় বলুন; কিন্তু আমাদের বিচার হইবে,—

"পরিবদতু জনো যথা তথা বা ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরস-মদিরা-মদাতিমত্ত ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশাম্।।"

## (৪)

আমাদের যে কাজটা পড়েছে তা' নিত্যকাল হরি-কীর্ত্তন। তবে তা'তে আমাদের নিজেদের কোন দায়িত্ব নেই। যদি অহঙ্কারবশে ত্রিগুণতাড়িত হ'য়ে কোন কথা আমরা বলি, তা' হ'লেই আমাদের অসুবিধা ও দায়িত্ব এসে যায়, কিন্তু যদি ভগবানের কথা তা'রই নিজ-জনের আজ্ঞাবাহি দাস-সূত্রে বলি, তা' হ'লে আর দায়িত্ব থাকে না। সুবিধাই হউক আর অসুবিধাই হউক তা'তে আমাদের বক্তিগত দায়িত্ব নেই। যদি মনিবের পক্ষে কোন পিয়ন বা সংবাদ-বাহক সংবাদ বহন করে এনে দেয় বা সংবাদগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিলি ক'রে দেয়, তা' হ'লে সংবাদ-সম্পর্কে বাহকের কোন দায়িত্ব নেই।

আমরা বড় আশা-ভরসা পেয়েছি, আমাদের কথা কিছু নেই আমরা কেবল ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কথা বল্‌ব। তা'তে প্রতিবাদের কিছু থাক্‌তে পারে না। আমরা যা'দের বাণী বহন ক'রে থাকি, জগতের কোন প্রতিকূল মত তাঁ'দের প্রতিযোগী হ'তে পারে না, সে সূত্রে আমাদের হৃদয়ে যথেষ্ট বল আছে। আমরা সেই শ্রৌতবাণীর সম্মুখে শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে উপনীত হওয়ার চেষ্টা ক'রব মাত্র। আমরা সর্ব্বদা শ্রীহরির শ্রবণ ও শ্রীহরির কীর্ত্তন ক'রব, তা'তে আমাদের কোনই অসুবিধা হ'বে না,—

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।।"

অর্থাৎ আমাদের নিজেদের যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, আমাদের বড় ভরসা, আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাক্য বলব। তা'তে আমাদের কোন অসুবিধার কথা নেই, বরং আমরা প্রচুর পরিমাণে আশ্বস্ত হ'য়েছি, অত্যন্ত ভরসা পেয়েছি একমাত্র অদ্বিতীয় বাস্তব সত্য জগতে প্রচারিত হ'লে আমরা যদি শ্রৌতবাণীর বাহক হই, তা'তে আমাদের আত্মশ্লাঘা আসবে না, বরং আমরা আরও অনেক কথা প্রচুর পরিমাণে শুন্‌তে পেয়ে অধিকতর মঙ্গল-লাভ করতে পারব।

কৃপণতাময় মনোভাব থাকলে আমাদের ভাণ্ডার সঙ্কীর্ণ হ'য়ে যা'বে, আমরা অধিক ফল লাভ করতে পা'রব না। যা'রা কৃপণ তাঁ'রা তা'দের নিকট হতে অধিক সাহায্য পান না; যাঁ'রা অধিক দান করেন, তাঁ'রাই দানবীরগণের নিকট হ'তে অধিক সাহায্য পান।

বিশ্বের সর্ব্বত্র সত্যপিপাসুর অনুসন্ধান ক'রতে হ'বে। কোথায় কোন্ সত্যানুসন্ধিৎসু পড়ে রয়েছেন, তাঁ'কে সেখান হ'তে অনুসন্ধান ক'রে কুড়িয়ে নিতে হ'বে। পৃথিবীর সর্বত্র সত্যের পসারা নিয়ে ঘুরতে হ'বে। কোন্ সময় কা'র ভাগ্যোদয় হয়, কোন্ সময় কে সত্যের প্রতি উন্মুখ হন, তজ্জন্য সত্য-প্রচারকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে বিচরণ ক'রতে হ'বে। তখন আমরা দেখতে পা'ব,—জানতে পা'রবো যে,

সর্ব্বত্রই অনেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি পাওয়া যেতে পারে, যা'দের নিকট হরিকীর্ত্তন ক'রে আমাদেরও তাঁ'দের যুগপৎ মঙ্গলোদয় হ'বে।

দাম্ভিকলোক কখনও প্রচার-কার্য্য করিতে পারে না। দাম্ভিক কি প্রচার করিবে? দাম্ভিক প্রচারকের সজ্জা গ্রহণ করিয়া 'আমিই প্রচারক' এই প্রকার অভিমান করে; বাস্তবসত্য তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না, সুতরাং তাঁহার দ্বারা জগতের কোন বাস্তব-মঙ্গল বিহিত হইতে পারে না। কেহ কালীঘাটের অমেধ্যভোজী হইবে, কেহ বা স্বদেশপ্রীতির নামে স্ব-পর ভেদদর্শী হইয়া মাৎসর্য্যানলে দগ্ধীভূত হইবে, কেহ ভুক্তি কেহ মুক্তিপিশাচীর কবলে কবলীকৃত হইবে, কেহ বা ভক্তির ভাণ লইবে—এই শ্রেণীর ভক্তি নিরস্তকুহক বাস্তবসত্যের কি সন্ধান রাখিবে? ইহারা ত হাস্যরসের পাত্র। ঘন্টাবাজান, তথাকথিত তীর্থবাস, জাতগোঁসাইগিরি, ভাগবত পড়িয়া পেট চালান'র নামই লোকে 'ভক্তি' বলিয়া জানিল। কাহাকে বলে আরাধ্যের আরাধনা, কাহাকে বলে প্রকৃত তীর্থবাস, কাহাকে বলে সত্য সত্য গোস্বামীত্ব, কাহাকে বলে শুদ্ধভাগবতানুশীলন, বিদ্ধা বা মিশ্রা ভক্তি,অবিদ্ধা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি ইত্যাদির কোন অনুসন্ধান হইল না। পরোপদেশে পণ্ডিত সাজিয়া পরচর্চ্চায় দিন চলিয়া গেল? তাই প্রতিদিন সকালে উঠিয়া আমাদের এই দুষ্ট মনকে শুনাইতে হইবে,—

ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ।
(ভজন বিনা গতি নাই রে)
(ভজ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দ।।
(জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি রে)
(ভজ) গৌর-গদাধরাদ্বৈত গুরু নিত্যানন্দ।
(গৌরকৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)
(গুরু কৃষ্ণপ্রিয় জেনে রে)
(স্মর) শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ।।
(গৌরপ্রেমে স্মর, স্মররে)
(স্মর) রূপ-সনাতন-জীব রঘুনাথদ্বন্দ্ব।
(যদি ভজন করবে রে)
(স্মর) রাঘব-গোপালভট্ট-স্বরূপ-রামানন্দ।।
(কৃষ্ণপ্রেম যদি চাওরে)
(স্মর) গোষ্ঠিসহ কর্ণপুর, সেন শিবানন্দ।
(অজস্র স্মর, স্মররে)
(স্মর) রূপানুগ সাধুজন ভজন-আনন্দ)
(ব্রজে বাস যদি চাওরে)।।

মনকে ব্রজবনে রাধাগোবিন্দের ভজন করিতে বলিতে হইবে। কৃষ্ণসর্ব্বরসাশ্রয়, সর্ব্বরসদ্বারা যাঁহার সেবা করিতে হইবে, তাঁহার সেবা-বিমুখ হইয়া ইতরানুশীলনে দিনাতিপাত করা অত্যন্ত মূর্খতার পরিচয়। অখিলরসামৃতমূর্তিকৃষ্ণের ভজনই অখিলরস fixed হইবে। তাহা না হইলে কৃষ্ণের ভজন হইতে অবসর লইতে লইতে ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠনাথ নৈমিত্তিক অবতার সমূহ ও পুরুষাবতারত্রয় এবং তাহা হইতেও অবসর লইয়া ক্রমে নির্ব্বিশেষবাদই চরম প্রাপ্য হইয়া পড়ে। ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈব মনুষ্যজাতির আর কি হইতে পারে!

প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া আমাদের "ভজরে ভজরে আমার মন অতি মন্দ।" এই গানটিই ভাল করিয়া গাওয়া উচিৎ। "তৃণাদপি সুনীচেন" বিচারেই 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।' 'তৃণাদপি'-বিচার ছাড়িয়া কখনও কৃষ্ণ কীর্ত্তন হইতে পারে না। আমাদের ভজনীয় পদার্থ কি? ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণচরণাবিন্দই একমাত্র ভজনীয় বস্তু, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া রাগানুগ ভক্তিযাজীর আচার বর্ণনা করিতেছেন,—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।।
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে।।"

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে" হইতে "ভাল না পরিবে"—এইটি negative (নিষেধ-বাচক), আর অমানী মানদ হঞা সদা নাম লইবে, মানসে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা করিবে —এইটিই positive (বিধিজ্ঞাপক)। শুদ্ধমনে স্বীয় স্বরূপদেহে যে ব্রজসেবা, তাহাই মহাপ্রভুর উদ্দিষ্ট। মানুষ উহা বুঝিতে ভুল করিয়াই প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়েন।

"কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হবে তায় অনুরক্ত,
শুদ্ধভজনেতে কর মন।
ব্রজ-জনের যেই মত তাতে হবে অনুগত,
এই সে পরমতত্ত্ব ধন।।

Mental speculation (মানসিক চিন্তাধারা) যত রকম আছে, তাহা লইয়া মানুষ বড় ব্যস্ত। তাহাতেই তাহাদের দিন কাটে। ঐসকল ছাড়িয়া দিয়া "আমার ভাল কিসে হয়",—ইহাই বিচার্য্য হওয়া আবশ্যক। "পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে" —ইহাই মহাজন-বাক্য। অন্যাভিলাষী অন্য কর্ম্ম করুক, আমার তাহা লইয়া কি দরকার? অন্যলোকের অসুবিধা হইয়াছে বলিতেছে, কিন্তু আমি ত' তাহাদের অপেক্ষা মন্দ।

"আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।

☆ ☆ ☆ ☆

পর সুখে দুঃখী সদা মিথ্যাভাষী,
পরদুঃখ সুখকর।।''

—এই গানটি আমাদের সর্বক্ষণ মনে রাখা দরকার। আমার মন্দ মনকে সর্ব্বক্ষণ ভজনের জন্য নিযুক্ত রাখিতে হইবে।। Dissuading policy (নিরসনপন্থা) লইয়া অন্যলোককে আক্রমণ করিয়া বেড়াইব,—ইহা কখনও প্রচারকের কার্য্য নহে, উহা প্রতারকের কার্য্য।

কর্ম্মী-জ্ঞানীর পথ জগতে নানা অসুবিধা আনয়ন করে। অসৎস্বরূপ ছায়ার বিচারেই মানুষ প্রমত্ত হইয়া পড়ে, কাহার ছায়া, তাহার অনুসন্ধান করিবে না। জড় প্রত্ন-তাত্ত্বিক কাঠের ঠাকুর, মাটীর ঠাকুর ইত্যাদি লইয়াই ব্যস্ত। কেহ বা iconographer, কেহ বা iconoclast; কেহ বা ওখানকার বাগানে শেওলা, মুতো বেশী হইয়াছে, ওদের জমিতে আবর্জ্জনা বেশী ইত্যাদি আলোচনায় খুব উৎসাহ প্রদর্শন করেন। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে যে আবর্জ্জনা জমিয়াছে তাহা weed out করিবার জন্য যত্ন হইতেছে না। যদিও এটা আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ তথাপি উহাই আমার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে।

ভজন করিব কাহার? Mammon-এর---ইন্দ্রিয়তর্পণের ভজন করিব---American Republic এর President হইব ইত্যাদি নানাবিষয়ে যত্ন পড়িয়া যাইতেছে! কিন্তু "ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণচরণারবিন্দ ভজন বিনা গতি নাই" ইহা বিচারের বিষয় হইতেছে না। কেহ বলিতেছেন---দ্বারকানাথের ভজন করিব, শত সহস্র মহিষী যাঁহাকে সেবা করেন। কেহ বলেন,—বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের ভজন হউক, যেখানে কুণ্ঠা-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিগত হইয়াছে, মর্য্যাদাপথে মস্তক হইতে নাভি পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধাঙ্গ দ্বারা গৌরব-বিচারে তাঁহারই সেবা করা যাউক। কিন্তু কৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিতেছেন,--নাভি হইতে পদদেশ পর্য্যন্ত যে বিচার আছে, তাহার কি কোন কার্য্য থাকিবে না? তবে সেগুলি আসিল কোথা হইতে, যদি চেতন জগতে তাহার কোন ব্যবহার না থাকে? সেব্যের সেবার তৎসমুদয়ের নিয়োগই উক্ত অঙ্গ সমূহের proper adjustment—প্রকৃত সদ্ব্যবহার। নতুবা কর্ম্মপথ বা জ্ঞানপথের পথিক হইয়াও সমূহ অমঙ্গলই বরণ করিতে হয়।

ব্রজবনই বরণীয় বা ভজনীয়—'তদ্বনম্ উপাসিতব্যম্'। এখানেই আমাদের নিত্য-বাসস্থান। সেজন্য "চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।" ব্রজবনে যে কৃষ্ণকথা আছে, তাহা সমগ্র জগতের লোক জানুক, ইহাই মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট। যাহার যে বাহাদুরী আছে তাহা থাকুক, রাধাগোবিন্দের ভজনই একমাত্র প্রয়োজনীয় হউক।

ব্রজবন—দ্বাদশবন—দ্বাদশরসের স্থান। শান্তাদি পঞ্চমুখ্যরস ও হাস্যাদি সপ্ত গৌণ-রস। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি বনবিহারী কৃষ্ণ এই ব্রজবনে দ্বাদশরসে সেবিত হইতেছেন,

ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণচরণারবিন্দ একমাত্র ভজনের বস্তু।

মথুরাবাস আমাদের আরাধ্য বটে, তবে প্রশ্ন হইতে পারে, কংসও ত' মথুরাবাস করিয়াছিলেন। কংস কৃষ্ণের সুখ কামনার পরিবর্ত্তে নিজের সুখ কামনা করিয়াছিল। কৃষ্ণের প্রাপ্য সুখ নিজে আত্মসাৎ করিতে চাহিয়াছিল। তাই "সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হিরণা হতাঃ" এই উক্তির অনুযায়ী গতি লাভ করিয়াছিল। মথুরাকে ভোগ্য-বুদ্ধি না করিয়া সেব্য-বুদ্ধি করিলেই মথুরাবাস সফল হয়। মথুরা—কৃষ্ণ জ্ঞানের ভূমিকা—শুদ্ধ সত্ত্বময়ী স্বতঃকর্তৃত্ব ধর্মবিশিষ্টা। তাহা অচেতন দেশমাত্র নহে। অচেতন দেশকে যেরূপ আমরা ভোগ করিয়া লইতে পারি, সেরূপ বুদ্ধিতে মথুরাবাসের চেষ্টা দেখাইতে গেলে মথুরা বাস হয় না।

প্রপঞ্চের অতীত স্থানের নাম বৈকুণ্ঠ। পঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি বা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ স্থূল ভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, প্রকৃতি, বদ্ধজীব ধারণার অন্তর্গত ঈশ্বর ও জীব, কাল ও কর্ম—এই প্রাকৃত ব্যাপারের অতীত স্থানে বৈকুণ্ঠ—যাহা হইতে কুণ্ঠাধর্ম্ম বিগত হইয়াছে। প্রপঞ্চ হইতে বৈকুণ্ঠ স্বতন্ত্র।

বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরার শ্রেষ্ঠতা কেন? বৈকুণ্ঠ এ জগতে আসেন না, কিন্তু যে বৈকুণ্ঠ সে-জগৎ হইতে এ জগতে আসেন, তাহাতে অধিক স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম আছে। মথুরা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ প্রপঞ্চাতীত পরম করুণাময় ধাম বৈকুণ্ঠ তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ধর্ম রক্ষা করিয়া সর্ব্বদাই প্রপঞ্চাতীত স্থানে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু যে বৈকুণ্ঠ পরম করুণা বিস্তারার্থ তাঁহার সেই স্বতন্ত্র শক্তিকে ঔদার্য্যময়ী করিয়া আজ কৃষ্ণের জন্ম-লীলা বিস্তারের জন্য প্রপঞ্চাতীত ভাবে প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মথুরার বৈকুণ্ঠ হইতেও বৈশিষ্ট্য আছে। মথুরা কেবল কৃষ্ণজ্ঞানময় ভূমি, তাহা অজের জন্মস্থান। বৈকুণ্ঠ-পদার্থ ব্যতীত বৈকুণ্ঠের ভোক্তা আর কেহ নাই। মথুরা প্রাপঞ্চিক জীবনিচয়ের নিকট দৃশ্যপদার্থরূপে আসিতে পারেন, অথচ তাহা জীব-ভোগ্য নহেন। যেমন গর্দ্দভ ভার বহন করে, সেরূপ ভারবহন কার্য্য মথুরার নহে। যাঁহারা মথুরার সেবা করেন তাঁহারা সারগ্রহণকারী। তাঁহারা মথুরার শিষ্যরূপে তাঁহাদিগের হৃদয়-মথুরায় কৃষ্ণের আবির্ভাবকে ধারণ করিতে পারেন। এখানে আপেক্ষিক সত্ত্বগুণ নাই। ইহা শুদ্ধ-সত্ত্বময় ভূমিকা। এজন্য আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ গাহিয়াছেন,—

"শ্রবণে মথুরা বদনে মথুরা, নয়নে মথুরা হৃদয়ে মথুরা।
পুরতো মথুরা পরতো মথুরা, মথুরা-মথুরা, মথুরা মথুরা।।"

"মথুরা মথুরা" এই পুনরুক্তিতে কোনও পুনরুক্তি দোষের সম্ভাবনা নাই। এই পুনরুক্তিদ্বারা চেতনের গুণই গ্রহণ করিতে হইবে, হৃদয়কে মথুরা বিচার—যে হৃদয়--জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গের অধীন নহেন। মথুরাকে গুরুজ্ঞানে সেবা করিতে হইবে,—যে স্থানে পরম প্রয়োজনীয় নিত্যধাম প্রকটিত হইয়াছেন,—নিত্যধাম তাঁহার পরিপূর্ণতা

ও স্বতঃকর্তৃত্ব ধর্ম সংরক্ষিত করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই মথুরাই বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ,—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজে মে নমসা বিধীয়তে।।"

মাথুর সকল কৃষ্ণের সেবক। এখানে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত—কৃষ্ণসেবক ব্যতীত ইতরানুভূতি বা ইতর বিষয় নাই। এইরূপ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে "তৃণাদপি সুনীচ" হইতে হইবে। মথুরার প্রত্যেক তৃণগুল্ম লতা হইতে আমি নিম্নে অবস্থিত। ইহারা প্রত্যেকেই আমার গুরু—আমার কৃষ্ণের সেবক। এইরূপ বুদ্ধি হইলেই মথুরাবাস সম্ভব।

মাথুর তরু সকল লোককে আশ্রয় দেন। তাঁহারা তাপিত জনকে শীতল করেন। তাহাদিগকেই আহ্বান করিয়া কৃষ্ণবিরহ তাপিত ব্রজাঙ্গনাগণ বলিয়াছিলেন, (ভাঃ ১০।৩০।৭-৯)—

"কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্ব্বিভ্রৎ দৃষ্টস্তেহতিপ্রিয়োহচ্যুতঃ।।
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ।।

চূত-পিয়ালপনসাসন-কোবিদার-জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেহন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ।।"

"হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে কল্যাণি তুলসী, যিনি ভ্রমর কুলের সঙ্গে তোমাকে ধারণা করেন, তোমার অতি প্রিয়তম সেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছ কি?

হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি, হে যূথিকা, করস্পর্শে তোমাদের পুলক উৎপাদন সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে যাইতে দেখিয়াছ কি?

হে চূত, পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ এবং যমুনার উপকূলবাসী পরহিতব্রত তরু সকল! শূন্যমনা আমাদিগকে কৃষ্ণ কোথায় আছেন, তাহা বল।"

মথুরামণ্ডলের বৃক্ষসকল সর্ব্বক্ষণ গোপীকুল ও গোপীনাথের সেবা করিতেছেন। গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের সেবাব্যতীত তাঁহাদের আর কোনও কৃত্য নাই।

মথুরাবাস-শব্দের অর্থে যাঁহারা কৃষ্ণের জন্মস্থানের সকলপ্রকার সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের সেবা করার যোগ্যতা লাভ। এখানে বৈকুণ্ঠবস্তু জীবের মঙ্গলের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন,—গুরুদেব আসিয়াছেন উন্মুখ জীবের সেবা করিবার জন্য—সর্ব্বশক্তিমত্তা এতদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক ধামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার সেবা

করিবার পরিবর্তে আমার যদি তাঁহার সেবা গ্রহণ অর্থাৎ তাঁহাকে ভোগ করিবার দুর্বুদ্ধি করি, তাহা হইলে আমাদের কৃষ্ণ-জন্মস্থান মথুরায় বাস হইবে না। আমরা কংসের রাজ্যের অধিবাসী হইয়া যাইব,—পরিশেষে ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উন্মাদনায় কংসের ন্যায় নির্ব্বিশেষবাদী অর্থাৎ কৃষ্ণকে সমস্ত ভোগ হইতে বিরহিত করিয়া নিজেই সমস্ত আনন্দের মালিক সাজিবার দুরাশা করিব।

যখন কৃষ্ণ ও রাম মথুরায় প্রবেশ করিলেন, তখন উহা কংসের রাজ্য ছিল, প্রথমে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, কংসের কোনও সেবকাভিমানী কংসের শৃঙ্গারের প্রয়োজনীয় উপকরণ বসনাদি লইয়া গমন করিতেছে। কৃষ্ণ ও রাম কংস দ্রবিণ (বস্তুতঃ যাহা কৃষ্ণেরই দ্রব্য, কিন্তু স্বরূপবিস্মৃত কংস যাহা নিজের দ্রব্য বলিয়া ভ্রম করিতেছে, তাহা) গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। ভোজপুর রাজ্য কংসপিতা উগ্রসেনের ছিল। কংস বিচার করিল,—যদি উগ্রসেনের হস্ত হইতে সমস্ত রাজ্য কাড়িয়া লওয়া না যায়, তাহা হইলে হয়ত উগ্রসেন দেবকীকে ঐ সকল সম্পত্তির কিছু দান করিয়া ফেলিবে এবং ঐ সম্পত্তি দৌহিত্রদের অর্থাৎ কৃষ্ণের হইয়া পড়িবে। কৃষ্ণকে ফাঁকি দেওয়াই কংসের উদ্দেশ্য। এইজন্য কংস উগ্রসেনের রাজ্য অধিকার করিয়া লইল। কৃষ্ণকে ফাঁকি দেওয়াই ভোগী ও নির্ব্বিশেষ বাদী ত্যাগীর মূল উদ্দেশ্য।

রজোগুণের দ্বারা তমোগুণ নিরস্ত হয়, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণও নিরস্ত হয়। আবার নির্গুণ বিশুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা আপেক্ষিক সত্ত্বগুণও নিরস্ত হয়। নির্গুণ ও শুদ্ধ সত্ত্বের বৈশিষ্ট্য কি? নির্গুণে গুণজাত reference রহিয়াছে আর গুণজাত reference যেখানে বিদূরিত ও সম্পূর্ণ শুদ্ধিলাভ করিয়াছে, যেখানে সন্ধিনী শক্তির অনাবিল ক্রিয়া রক্ষিত হইতেছে, তাহাই শুদ্ধসত্ত্ব! জড় ত্রিগুণ—তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব। অজড় ত্রিগুণের ভাব নির্গুণতায় লক্ষিত হয়। এই নির্গুণতায় একটি ব্যতিরেক reference আছে। নির্গুণতাও যেখানে বিশুদ্ধতা ও সম্পূর্ণ চিন্ময়তা লাভ করিয়াছে, সেইখানেই শুদ্ধসত্ত্ব। সেই শুদ্ধসত্ত্বই বাসুদেব, "হরির্হিনিগুণৈঃ সাক্ষাৎ" কথাটি ঠিক। সেই নির্গুণ ও বিশুদ্ধ সত্ত্ব একই বস্তু, কিন্তু মায়াবাদী যে "নির্গুণ" শব্দ ব্যবহার করে, তাহা জড় ত্রিগুণের ব্যতিরেক ভাব অজড় ত্রিগুণ।

শ্রীমদ্ভাগবতী শ্লোকে যে "সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান বাসুদেবঃ" প্রভৃতি উক্তি আছে, তাহা মায়াবাদিগণের "নির্গুণ"-শব্দ বাচ্য ভাবের সহিত এক নহে, সেখানে বেদ্য বাস্তব-বস্তু বাসুদেবের জন্মপ্রসঙ্গ নাই।

দেবকী গর্ভজাত বস্তুকে গোকুলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তথা হইতে বর্দ্ধমান কৃষ্ণ নন্দীশ্বরে আসিয়াছিলেন, কৈশোর-ধর্মলাভ করিয়া কৃষ্ণ যামুনতটে রাসবিহারের জন্য আসেন। আর গোবর্ধনে উদার পাণিরমণ-কৃষ্ণরূপে বিহার করেন। সেই

উদারপানিরমণের লীলার per excellence stage রাধাকুণ্ডে বা আরিটগ্রামে—যেখানে অরিষ্টাসুর বধ হইয়াছিল—যেখানে Aristotlism বা যাবতীয় আধ্যক্ষিক যুক্তিবাদ বিনষ্ট হইয়া স্বরাট লীলাপুরুষোত্তমের সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্রতা বা নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতার পূর্ণতমতা প্রকাশিত।

শ্রীধাম মায়াপুর—অভেদ মথুরা। এখানে বৈকুণ্ঠেশ্বর স্বয়ং অজ হইয়া অনজধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন,—এখানে বৈকুণ্ঠ initiative নিয়াছেন।

"শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস।।"

সেই অপ্রাকৃত শ্রীধামের কেন্দ্র-স্থল শ্রীমায়াপুর—ব্রহ্মার হৃদয়। ব্রহ্মা এইস্থানে গৌর-কৃষ্ণের তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার হৃদয়ে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই নিরস্তকুহক পরমসত্য,—তাহাই বিজ্ঞান-সমন্বিত রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত পরমভগবজ্‌জ্ঞান—তাহাই 'বেদান্ত' বা 'ব্রহ্মসূত্র'; সূত্রের যে-ব্যাখ্যা ভক্তিবিরোধী-সম্প্রদায় অন্যপ্রকারে করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যা সবিশিষ্ট হইলেই শ্রীনবদ্বীপধাম অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি। শ্রীগৌরসুন্দরের পত্নী—শ্রী, ভূ ও নীলা বা লীলা; শ্রীই কমলা গৌর-নারায়ণের দক্ষিণ-পার্শ্বে বিরাজমানা; প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া বামপার্শ্বে শোভিতা, এবং লীলা বা দুর্গা-শক্তি ধামস্বরূপিণী হইয়া সম্বন্ধজ্ঞান-প্রতিপাদ্য-লীলা-পুরুষোত্তমের পাদপদ্মালিঙ্গিতা।

শ্রীনামের স্ফুর্ত্তি শ্রীধামের স্ফূর্ত্তির সহিত প্রকটিত। তাই (চৈঃ চঃ মধ্য ১২ পঃ)—

"আনের হৃদয়-মন মোর মন-বৃন্দাবন,
মনে-বনে 'এক' করি' মানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।।"

শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থে আমরা শ্বেতদ্বীপ, সিতদ্বীপ, গোলোক, বৈকুণ্ঠের বর্ণন দেখ্‌তে পাই। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ-সনাতন শিক্ষার মধ্যে ভগবানের শ্রীধাম-সমূহের বিস্তৃতি ও বিভিন্ন বৈভবের কথা শব্দমুখে প্রকটিত র'য়েছে। আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় আছে, যখন মহানুভবগণের দ্বারা শব্দ উদ্‌গীত হন, তখন কর্ণ সেবোন্মুখতা প্রাপ্ত হ'লে কর্ণদ্বারা শব্দ প্রবিষ্ট হ'য়ে চেতনময় রাজ্যে স্থায়ী ভাবের উদ্দীপনা করায়। বাহ্যবিষয় ও ইন্দ্রিয়সমূহ যে-সকল বাধা উপস্থিত করে, বৈকুণ্ঠশব্দ সেই সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়ে বৈকুণ্ঠ-গোলোকের চিন্ময়-ভাব-স্রোত প্রবলবেগে উচ্ছলিত ক'রে দেয়। যাঁরা মনোময় ভূমিকায় অবস্থিত আছেন, বহিঃপ্রজ্ঞার বিচার অবলম্বন ক'রেছেন, তাঁ'রা ব্রহ্মগায়ত্রীর প্রতিপাদ্য বিষয় 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' বুঝতে পারেন না। যে 'ধী' বা 'বুদ্ধি'র কথা বল্‌তে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত (১।১১।৩৮) ব'লেছেন,—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।। *

ব্রহ্মা যে গানের দ্বারা জড়জগতের আধাক্ষিকতা হ'তে উৎক্রান্ত হ'বার আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন, সেই ত্রাণকারী গানের বা গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ভূমিকায় আমরা যে বুদ্ধির কথা পাই, তা' স্থিরা বুদ্ধি, অচঞ্চলা মতি, ভগবানের সেবাময়ী বৃত্তি; সেটী ব্রহ্মবৃত্তি, ক্ষুদ্রবৃত্তি নয়, সকল শক্তি-সমন্বিতা পালনীশক্তি প্রচারিকা বৃত্তিবিশেষ। জীব-হৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হ'লে আমরা সেই বৃত্তি জান্‌তে পারি। প্রকৃত প্রস্তাবে অবিমিশ্র চেতনাবস্থায় নীত হ'লে সেরূপ বৃত্তি আমাদের চেতনে উদ্ভাসিত হয়।

কেবলমাত্র স্থূলবুদ্ধিজনগণের ধামের যেরূপ নির্দ্দেশ বা বিচার, সেরূপ ভোগময়ী ভূমিকা শ্রীধাম নহেন। শ্রীনামাপরাধের ন্যায় শ্রীধামাপরাধও দশটি। শ্রীধামবাসের ছলনা ক'রে ইন্দ্রিয়তর্পণ 'ধাম-সেবা' নহে। শ্রীগৌরসুন্দর প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপ-শিক্ষার মধ্যে প্রকৃতি-সম্ভূত জগতের অতিক্রান্ত অবস্থায় ধামের কথা ব'লেছিলেন।

আপনারা এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করুন। এই জগতের যাবতীয় বস্তুই কৃষ্ণ-সেবার সামগ্রী। যেদিন আপনারা দ্বিতীয়াভিনিবেশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন, বাসুদেবময় জগৎ দর্শন করিতে পারিবেন, সেইদিন আপনাদের এই বিশ্ব-স্বরূপেই গোলোক দর্শন হইবে। আপনারা সমগ্র নারীজাতিকে কৃষ্ণকান্তারূপে দর্শন করুন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করুন, তাঁহাদের উপর কোনপ্রকার ভোগবুদ্ধি করিবেন না। তাঁহারা কৃষ্ণভোগ্যা, জীবের কখনও ভোগ্যা নহেন। আপনারা পিতামাতাকে নিজের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীরূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণের পিতৃমাতৃগণরূপে দর্শন করুন, আপনারা পুত্রকে নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের সামগ্রী না ভাবিয়া শ্রীবাল-গোপালের সেবকেরগণরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা করুন, কদম্ব দর্শন করুন, যমুনা ও যামুন-সৈকত দর্শন করুন, চন্দ্রিকা দর্শন করুন, আপনাদের বিশ্বানুভূতি থাকিবে না, গোলোক-দর্শন হইবে, গৃহে গোলোকের সৌন্দর্য প্রকাশিত হইবে।

ভগবানের নাম-সেবা, ধাম-সেবা ও কাম-সেবা এই তিন সেবায় যাঁহারা যোগদান করেন, তাঁহারাই জগতের বরেণ্য। নাম-সেবা ব্যতীত জীবমাত্রেরই প্রাপঞ্চিক-বিচার হইতে উদ্ধার লাভের উপায় নাই। নাম-সেবার ফলে মানব-জগৎ সকল কুসংস্কারের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া কৃষ্ণ কাম-সেবায় প্রতিষ্ঠিত হন। ধামসেবা হইতে মায়াবাদ —অর্থাৎ 'আমি প্রভু,—ঈশ্বর, ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা তদ্রূপ-বৈভবাদি নাই—এই ভীষণ অসৎ মতবাদের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়, আর

*প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়াসন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না।

কৃষ্ণ-কাম-সেবা হইতে নিজের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষরূপ ভীষণ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, নশ্বর কাম হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা, কাম গায়ত্রীর সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

স্থূল শরীর ধারণ করিতে যাইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে যে সকল ইতর বাসনার উদয় হইয়াছে, সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিতে যাইয়া ভগবৎ-সেবা-চেষ্টায় উদাসীন হইয়া যে সকল মনোধর্মচালিত বিপরীত পথে ধাবিত হইতেছি, সেই মুখটা উল্টাইয়া যায়, যদি আমাদের কৃষ্ণ-কাম-সেবায় রতি উদিত হয়। সেই কৃষ্ণ-কাম-সেবা আবার লাভ হয়, যদি আমরা ধামসেবা করি।

ধাম অর্থে—রশ্মি, প্রভাব, তেজঃ, গৃহ, স্থান, শরীর, জন্ম প্রভৃতি। বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে যেখানে আত্মহিংসা, মৎসরতা ও নশ্বরতা নাই—যাহা নিত্য স্বপ্রকাশ—যাহা চিন্ময়, যাহা নিত্য আনন্দময় তাহাই শ্রীধাম। সেই শ্রীধামে শ্রীচৈতন্যদেব উদিত হইয়া জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছেন।

ধামসেবা হইলে শ্রীনাম-সেবা হইবে, শ্রীনাম-সেবা হইলে কৃষ্ণ-কামসেবা হইবে। ধামে যিনি সম্বন্ধ-স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার গ্রামে রতি, গ্রাম্য সম্বন্ধ অচিরেই বিদূরিত হয়। ধামে সম্বন্ধ-স্থাপিত হইলে শ্রীনামসেবারূপ অভিধেয় অত্যল্পকাল মধ্যেই কৃষ্ণ-কামরূপ প্রয়োজন লাভ করায়—ইহাই মানব জীবনের একমাত্র প্রয়োজন-তত্ত্ব।

একমাত্র বৈকুণ্ঠ-নাম কৃপা করিয়া ইহজগতে আগমন করিয়াছেন। এই নাম যাঁহার উপর আহিত, তাহা শ্রীধাম,—সেই শ্রীধামের সেবাদ্বারা আমাদের নাম-সেবা বা কৃষ্ণ-কামসেবা লাভ হয়। শ্রীধামের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া নাম-সেবার ছলনা কখনও কৃষ্ণ কাম-সেবারূপ প্রয়োজন প্রদান করে না। সর্বতোভাবে শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। কেবল চেতনের ধর্ম কি, তাহা যদি কখনও বিদ্যুতের কণার ন্যায়ও চৈতন্যজনগণের কৃপাবলে আমাদের দৃষ্টিপথে আগমন করে, তাহা হইলে অন্ধকার রাজ্যের মানবজাতির পরামর্শ হইতে আমরা উদ্ধৃত হইতে পারি। বিদ্যাবধূজীবন শ্রীনামের সেবা শ্রীধামে অবস্থিত না হইলে হইতে পারে না। শ্রীনাম-সেবা না হইলে কৃষ্ণ-কাম-সেবাও হয় না।

কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-সেবাই যে একমাত্র কৃত্য,—যতদিন পর্য্যন্ত ইহা আমরা উপলব্ধি ক'রতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বঞ্চিত। আমরা আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি হ'তে ছুটী পেতে পারি কখন?—যখন আমরা নিষ্কপটে কার্ষ্ণের শরণ গ্রহণ করি। সূর্য্য বহুদূরে অবস্থিত, কিন্তু তথাপি সূর্য্যরশ্মি যেমন আমাদের নিকট নির্বাধ হইয়া বহুদূর হইতে একায়েক উপস্থিত হন, তদ্রূপ ভগবান্‌ও প্রপঞ্চে আমাদের নিকট আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন। নিরন্তর যাঁহারা ভগবদুপাসনা করেন, তাঁহাদের আশ্রয়েই—তাঁহাদের শ্রীহস্তদ্বারা উন্মীলিত চক্ষেই আমাদের ভগবদ্দর্শন সম্ভবর হয়। যদি যাত্রার দ্বারা সাজা নারদকে

'ভক্তরাজ নারদ' ব'লে মনে করি, খড়ি-গোলোকে 'দুধ' মনে করি, তাহ'লে প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা প্রতারিত হ'ব। যিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভজনে চেষ্টাবিশিষ্ট--যিনি সর্ব্বতোভাবে প্রতিপদ-বিক্ষেপে ভগবানের সেবা করেন—সর্ব্বস্ব দিয়ে ভগবানের সেবা ছাড়া কিছুই করেন না, এমন পুরুষের সেবাই আমাদিগকে শুদ্ধ কৃষ্ণভজন দিতে পারে। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আমাদের অন্য কৃত্য নাই। গৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হ'য়েও কার্ষ্ণের বেশে নানা-প্রকারে, নানা-ভাবে, নানা-ভাষায়, 'একমাত্র কৃষ্ণের ভজন কর'—ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। কৃষ্ণ হ'তে জগৎ উদ্ভূত, কৃষ্ণে জগৎ স্থিত, কৃষ্ণে জগতের লয়। আমরা যখন আবৃত থাকি, তখন কৃষ্ণ তাঁ'র নিজত্ব দেখান না। আমাদের যতদিন কাদা, জল, মাটী প্রভৃতি ধারণা আছে, ততদনি অপ্রাকৃত রাইকানুর অপ্রাকৃত রসকেলিবার্ত্তা বুঝা যাইবে না। ঐশ্বর্য্যগন্ধলেশ-হীন বিশ্রম্ভসেবা-ময়ী কৃষ্ণানুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনের দ্বার রুদ্ধ থাকে। আবার, বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইলে শ্রীরূপ-রঘুনাথের আনুগত্য ব্যতীত আর কোনও কৃত্য নাই। প্রাণহীন দেহের যেমন কোন মূল্য নাই, তদ্রূপ শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত জীবস্বরূপের কোনও সার্থকতা নাই। যদি কেহ শ্রীগৌরকৃষ্ণের ঔদার্য্য-মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে চা'ন, তবে শ্রীরূপানুগজনের আনুগত্য করুন। আমরা শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত কিছুতেই যুগলসেবার অধিকার পাইতে পারিব না। বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের সেবা—শ্রীরূপেরই; যথা,—

"দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।।"

জ্যোতির্ম্ময় শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষতলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরি অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দকে পরম-প্রেষ্ঠা সখীগণ সেবা করিতেছেন। আমি সেই শ্রীযুগলমূর্ত্তিকে স্মরণ করি।

গৌড়ীয়ের সেব্য তিনটী বিগ্রহ—মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে এই তিনটী নাম উদ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীসনাতনপ্রভু মদনমোহনের সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিলে শ্রীরূপপ্রভুর আনুগত্যে জীবের গোবিন্দ-সেবায় অধিকার উদিত হয়।

'মা প্রেক্ষিষ্ঠস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেহস্তি রঙ্গঃ।'

(৫)

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।।"

বর্ত্তমানকালে এই চতুর্ব্বিধ বৈকুণ্ঠবস্তুতে বিশ্বাস হারাইয়াছি বলিয়াই আমাদিগকে নানাবিধ অনর্থ গ্রাস করিয়াছে! 'মহা-প্রসাদ', 'গোবিন্দ', 'নাম' ও 'বৈষ্ণব'—এই চারিটী

বস্তুই অভিন্ন-'বিষ্ণু'; কিন্তু আমরা মায়ার জগতে—পাপের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া এই বস্তুবিজ্ঞানে বিশ্বাস হারাইয়াছি। 'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'—যাহা দ্বারা মাপা যায়, তাহাই 'মায়া', কিন্তু উপরি-উক্ত চারিটী বস্তু মাপিয়া লইবার বস্তু নহেন। 'বৈষ্ণব'কে আমরা মাপিয়া লইতে পারি না—'বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞেও না বুঝয়' আমরা অনেক-সময়ে 'শ্রীগোবিন্দ'কেও মাপিয়া লইতে চাই। এদিকে শব্দটীকে মুখে 'বৈকুণ্ঠ' (কুণ্ঠা' অর্থাৎ মায়িকধর্ম্ম তিরোহিত যাঁহাতে অর্থাৎ অপ্রাকৃত) বলি, আবার, তাঁহাকে মাপিয়া লইতেও কৃতসঙ্কল্প হই। যে-ডালে বসিয়া আছি, সেই ডালই কাটিয়া ফেলিতে চাই। চতুঃসীমাযুক্ত বস্তুকেই মাপিয়া লওয়া যায়; কিন্তু 'গোবিন্দ' প্রভৃতি বস্তুচতুষ্টয় সেই সসীম-জাতীয় বস্তু নহেন। বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে মাপিবার ধৃষ্টতা করিলে উহাকে কুণ্ঠা ধর্মে প্রবেশ করাইবার চেষ্টাই দেখান হয়।

এই জগতে শ্রৌতপথের দ্বারা বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে পারদর্শিতা লাভ হ'তে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে নাস্তিকসম্প্রদায় বা হিন্দুবিদ্বেষী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী চিন্তাস্রোতের উদয় হ'য়েছিলর। তাঁ'রা বলেছেন যখন শব্দব্রহ্মের সাহায্যেই সমস্ত অজ্ঞান তিরোহিত হয়, তাহ'লে আর প্রতিমা-পূজার আবশ্যক কি? প্রতিমা-পূজা তাঁহাদের মতে শ্রুতিপথের বিরোধী। তাঁ'রা বলেন—বৈষ্ণবদের প্রতিমা-পূজা বৌদ্ধ-পদ্ধতির অনুগমন মাত্র, শ্রৌত পদ্ধতি নহে। পরজগতের ব্যাপার, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য proxy বা প্রতিভূ-সূত্রে লেপ্যা, লেখ্যা প্রভৃতিরূপে প্রতিমা এসে উপস্থিত হয়। অদ্বয়জ্ঞানের বিরুদ্ধবুদ্ধি হ'তে আমাদের প্রতিচ্ছবি জ্ঞান উপস্থিত হয়।

নামই—নামী; নামীর রূপ, গুণ, লীলাবৈচিত্র্যে-ভেদবুদ্ধিই অদ্বয়-জ্ঞানের বিরুদ্ধ বুদ্ধি। কিন্তু আমার শ্রীগুরুদেব বলেন, 'শ্রীমূর্ত্তিকে অপর জড় বস্তু বা তোমার ভোগের বস্তুর সমান বস্তু মনে কর্‌তে নাই।' মন্ত্রার্থ-জ্ঞানের অভাবে অদ্বয় জ্ঞানাভাবে অর্চ্চা ও অর্চ্চ্যে পার্থক্য বুদ্ধি উদিত হয়। অর্চ্চা ও অর্চ্চ্যে যেখানে অদ্বয় জ্ঞান, সেখানে ওরূপ ভেদজ্ঞান নাই।

শ্রীগুরুদেব ভগবানের সহিত ভক্তিযোগের দ্বারা সম্বন্ধ করিয়া দেন—সেবা ক'রবার ভার দিয়ে দেন। শ্রীগুরুদেব যোগ্যকে মন্ত্রের অর্থ বলেন, অযোগ্যকে বলেন না। শ্রীগুরুদেব সংস্কার দেবার পর মন্ত্রের অর্থ বল্‌বেন।

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতনাথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ।।"

(নারদ-পঞ্চরাত্র-ভরদ্বাজ-সংহিতা ২য় অঃ ৩৪ শ্লোক)

আচার্য্য গুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র-প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্য-পুত্রদিগকে বৈদিক দশ, ষোড়শ, চত্বারিংশৎ বা অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন।

ইহাই দীক্ষা-বিধি।

পৌত্তলিকতা বড় খারাপ জিনিষ। কাঠের সিংহ চুপ ক'রে ব'সে থাকে। কাঠের ঠাকুর, মাটীর ঠাকুর, যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান উদিত হচ্ছে না। প্রাকৃত-সাহজিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে পুতুল-পূজার ব্যবস্থা আছে। এই জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি কেহ কেহ ব'লে থাকেন, বৈষ্ণবগণ বৌদ্ধ সহজিয়ার একটী শাখা বিশেষ। 'বৈষ্ণব' বল্‌তে গিয়ে তাঁ'রা প্রাকৃত সহজিয়াকেই আলোচনা বা বৈষ্ণবের আদর্শ জ্ঞান ক'রেছেন, প্রাকৃত-সহজিয়া-বাদকেই 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' মনে করছেন।

কতকগুলি লোকের বিচার, প্রাকৃতবস্তুসমূহে দেবজ্ঞান সংহিতাংশে বর্ণিত আছে। আর্যগণ নিজেদের দরিদ্রতা অনুভব ক'রে প্রাকৃত বস্তু যথা নাসিক্য বায়ু প্রভৃতি সৃষ্ট বস্তুতে দেবত্ব বা ঐশ্বর্য্য আরোপ ক'রে "অগ্নিমীলে" প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা আরোপিত প্রাকৃত বস্তুর আরাধনা ক'রেছেন। পরন্তু শ্রুতি-মৌলি উপনিষদে 'ব্রহ্মবস্তু-বিচারে এরূপ পৌত্তলিকতা স্বীকৃত হয় নাই।

ঔপনিষদ-বিচার বৌদ্ধ-বিচারদ্বারা বিধ্বংসিত হ'য়েছে। বর্ত্তমান তথাকথিত পঞ্চোপাসক হিন্দুদিগের প্রতিমা-পূজা—পুতুল-পূজা পৌত্তলিকতা। আমরা বলি, বৈষ্ণবেরা ঐরূপ প্রতিমা পূজা করেন না। তাঁহারা সাক্ষাদ্বস্তুর পূজা ব্যতীত কখনও অন্যবস্তুর পূজা করেন না।

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল-কলুষহে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।"

(পদ্মপুরাণ)

"যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানব-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণবপাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল-কল্মষ-বিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।"

পৌত্তলিকগণ—অধঃপতিত, তা'দের অর্চ্চ্যে শিলাধী। শালগ্রাম—গণ্ডকী শিলা, গুরুদেব—মনুষ্যের সহিত সমান বা মনুষ্যজাতি প্রভৃতি বিচার পৌত্তলিক নারকীদের বিচার। বৈষ্ণবগণ সেই প্রকার পৌত্তলিক নহেন; তাঁ'রা অর্চ্চ্য বস্তুতে শিলাবুদ্ধি করেন না—ভূতশুদ্ধি না ক'রে পূজা কর্‌তে বাসেন না—যে ইন্দ্রিয়-দ্বারা বাহ্য রূপ-রসাদি গ্রহণ করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁ'রা তাঁ'র পূজা করেন না।

আমরা কিছু সাধারণ প্রতিমার পূজক নহি। আমরা আত্মবৃত্তিতে পরমাত্মার পূজা করিবার জন্য লালায়িত। আমাদের আত্মা ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্ত। কিন্তু সেই বুদ্ধিটি বর্ত্তমানকালে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।

যে কোন দেবতাই আসুন না কেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্তর্য্যামি-সূত্রে বিষ্ণু পরতত্ত্ব ভগবান্‌কেই দর্শন করেন, যেমন আকাশে সূর্য্যের উদয়, সূর্য্যের অন্তর্ভুক্ত সূর্য্যদেবতা, তদন্তবর্ত্তী বলদেব প্রভুর হৃদ্দেশে মহালক্ষ্মী, মহালক্ষ্মীর হৃদ্দেশে চিল্লীলা-মিথুন রাধাগোবিন্দ। রাধাগোবিন্দের বশ্যতত্ত্ব বলদেব প্রভু আমার। লোকে দেবতার মূর্ত্তি দর্শন করে, দেবতা দর্শন করে, কিন্তু তদন্তর্ভুক্ত বলদেব-কৃষ্ণ দর্শন করে না। অণু-পরমাণুতে এইরূপ পঞ্চতত্ত্ব আছে। ভূতশুদ্ধি হয় না ব'লে সকলের পঞ্চতত্ত্বদর্শন হয় না। লোকের যদি এই বিচারের অভাব হয়, তবে পুতুল পূজা হ'য়ে যা'বে।

শ্রৌতপথ গ্রহণ কর্‌বার বিধি পরিত্যাগ ক'রে যদি আমরা অন্য পথ গ্রহণ করি, তবে পৌত্তলিক, প্রাকৃত সহজিয়া, অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তির যাজক, বিবর্ত্তবাদী হ'য়ে যাব।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীজগন্নাথদেবকে সাক্ষাদ্‌ব্রজেন্দ্রনন্দন দর্শন কর্‌বার লীলা প্রদর্শন ক'রেছেন। 'নিম্বকাষ্ঠ বা নিম্বকাষ্ঠের অভ্যন্তরে ভগবান্ আছেন'—পৌত্তলিকের এইরূপ শ্রীবিগ্রহে দেহদেহীভেদ-বিচার তিনি প্রদর্শন করেন নাই। তিনি অন্যত্র ব'লেছেন,—
"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।
বিষ্ণু-নিন্দা আর নাহি ইহার উপর।।"

শ্রীজগন্নাথদেবের কলেবর বিষ্ণুকলেবর, আর নিম্ব-কাষ্ঠ-দর্শন প্রাকৃত। Henotheist-গণ ঠাকুর ঘরে প্রবেশের অভিনয় করিলেও বিষ্ণুপূজা করেন না; তাঁহারা ভাগবত-পাঠ, ভাগবত-ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন-নৃত্যাদির অভিনয় করিলেও ভক্ত নহেন। কামুক ব্যক্তির স্ত্রীদর্শন ও রামানন্দ রায়ের দেবদাসী-দর্শন এক নহে। রামানন্দ রায় জানেন, মানুষ, দেবতা, পশুপক্ষীর ভোগ্যা কোন স্ত্রী নাই, যোষিতই একমাত্র কৃষ্ণভোগ্য। শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার জন্য ঠাকুর ঘরে প্রবেশ বা পূজার অভিনয় আর সত্য-সত্য পূজা করিবার জন্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতে এক হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব Henotheist ও শুদ্ধ ভক্তের জগন্নাথ দর্শন এক নহে। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পুতুল "শ্রীবিগ্রহ" নহেন। শুদ্ধ ভক্তের উপলব্ধিতে "আমি দৃশ্য ও জগন্নাথ দ্রষ্টা" "আমি ভোগ্য, জগন্নাথ ভোক্তা" আর Henotheist মনে করেন আমি দ্রষ্টা, জগন্নাথ দৃশ্য।" "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" শ্লোকার্থ ভক্ত ও নির্ব্বিশেষ-বাদীর পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যেখানে শ্রীজগন্নাথেতে কাষ্ঠবোধ, সেইখানেই পৌত্তলিকতা। বিধর্ম্মী সম্প্রদায় যে তথাকথিত হিন্দুগণকে পৌত্তলিক বলেন, তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। যাহারা নিরাকার পুতুল পূজা করে, তাহারাও পৌত্তলিক। আমিত' জানিনা—শ্রীজগন্নাথদেব. কাঠ, গোপীনাথ পাথর; আমি জানি—আমার নিত্য উপাস্য বস্তু আমার সহিত নিত্য-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট-বস্তু, পূর্ণ-চেতন-বস্তু, তিনি স্রষ্টা, তিনি ভোক্তা, আমি দৃশ্য, ভোগ্য।

বৈষ্ণবদর্শনে কখনই পৌত্তলিকতা স্বীকৃত হয় নাই, বরং বৈষ্ণবেতর-দর্শনে মুখে না হউক, মনে ন্যূনাধিক পৌত্তলিকতাই স্বীকৃত আছে। ভগবান্—এই শব্দে মানব-চিন্তায় এবং মানবাতীত চিন্তায় যত প্রকার চমৎকারিতা আছে সেসমুদয়ই একত্রীভূত হইয়াছে। সমগ্র ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বৃহত্ত্ব ও সূক্ষ্মত্ব এই উভয়ের সীমা ভগবানের একটি লক্ষণ। সর্বশক্তিমত্তা—তাঁহার দ্বিতীয় লক্ষণ। সর্বশক্তিমত্তা বলিতে মানব বুদ্ধিতে যাহা ধারণা যোগ্য কিংবা মানবে যাহা সম্ভব, যদি কেবল তাহাই হয়, তাহা হইলে উহাকে 'সর্বশক্তি-মত্তা বলা যায় না।' মানব-বুদ্ধিতে যাহা অখণ্ডনীয়, তাহা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির অধীন বলিয়া ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা। ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও সাকার। "ভগবান্ সাকার হইতে পারেন না কিম্বা তিনি নিত্যসাকার নহেন, সাময়িক সাকার মাত্র, পরিণামে তিনি নিরাকার"—এইরূপ বলিতে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি অস্বীকার করা হইল। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিক্রমে তিনি তাঁহার শক্তি বিজ্ঞানজ্ঞ মুক্তজীবের নিকটে নিত্যলীলা মূর্তিময়। কেবল নিরাকার চিন্তা অস্বাভাবিক ও বিশেষ চমৎকারিতাশূন্য। ভগবান্ সর্বদা মঙ্গলময় ও যশোপূর্ণ; তিনি সৌন্দর্য্যপূর্ণ। অপ্রাকৃত নয়নে সেই সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। ভগবান্ বিশুদ্ধ, পূর্ণ ও চিৎস্বরূপ জড়াতীত বস্তু, তাঁহার চিৎস্বরূপই তাঁহার শ্রীমূর্তি। পরমেশ্বরের ভৌতিক আকার নাই সত্য কিন্তু ভূতাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বময় বিভুর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নির্মলচক্ষে গ্রাহ্য। প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত চক্ষের পক্ষে তিনি চিদাকার বা সাকার। যাঁহারা প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নিত্য বাস্তব-চক্ষে পরমেশ্বরের চিদাকার দর্শন করেন নাই, তাঁহারা যে-মূর্তি প্রস্তুত করেন বা পূজা করেন তাহা অবশ্যই পুত্তল এবং সেই পুত্তল-পূজক মাত্রেই পৌত্তলিক। ভগবানের কল্পিত মূর্তি-পূজাকে পৌত্তলিকতা বলা যাইতে পারে। যেমন আমি জ্যাকবকে দেখি নাই, মনে মনে জ্যাকবের একটি মূর্তি কল্পনা করিয়া অঙ্কন করিলাম। এই অঙ্কিত-মূর্তি ঠিক জ্যাকবের মূর্তি হইল না। তারপর জ্যাকব যদি ইহজগতের জীববিশেষ হ'ন—যে জ্যাকবের দেহ, মন ও আত্মাপরস্পর পৃথক সেই জ্যাকবের ফটোগ্রাফ জ্যাকবের জড়শরীরের প্রতিচ্ছায়াবিশেষ হওয়ায় তাহাও জ্যাকবের নিত্যস্বরূপ হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। কিন্তু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ-ভগবান্ এইরূপ বস্তু নহেন, তাঁহার দেহ ও আত্মা পৃথক নহে, তাঁহার নামও আত্মা পৃথক নহে, তাঁহার রূপ ও আত্মা পৃথক নহে, তাঁহার গুণ ও রূপ পৃথক নহে, তাঁহার গুণ ও আত্মা পৃথক নহে, তাঁহার লীলাও আত্মা পৃথক নহে, তাঁহার লীলা ও রূপ পৃথক নহে, তাঁহার লীলা ও গুণ পৃথক নহে। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বা নির্মল আত্মার সেই ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিয়া ভগবানের যে নিত্য-মূর্তি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব নিজ নির্মল আধারে প্রাপ্ত হ'ন, সেই অপ্রাকৃত শ্রীমূর্তি ভগবৎস্বরূপের উদ্দীপক—তত্ত্বরূপে হৃদয় হইতে জগতে স্থাপন করিলে তাহা কখনই 'পুত্তল' পদবাচ্য হইল না যেমন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও অচিন্ত্য শক্তিবলে

ভগবান্ প্রপঞ্চাতীত থাকেন, তেমনি ভক্তগণের বিশুদ্ধ-সত্ত্বে প্রকাশিত ভগবৎ-স্বরূপ ভক্তগণের দ্বারা জগতে অবতারিত হইয়াও প্রপঞ্চ ধর্মের অতীতই থাকেন। এইজন্য বৈষ্ণব-দর্শনে শ্রীমূর্তিকে অর্চ্চাবতার বলা হইয়াছে। ভগবৎ-স্বরূপ দর্শনাধিকারীর পক্ষে ভগবানের মিথ্যা কল্পিত-মূর্তি যেমন অমঙ্গলজনক স্বরূপাভাবরূপ নিরাকারভাবও তদ্রূপ অনর্থকর। এই সকল ক্ষুদ্রপ্রক্রিয়া বাস্তববস্তু লাভ হইবার পূর্বেই ঘঠিয়া থাকে ইহাকে বস্তু হাতড়ান বলে। বৈষ্ণবদর্শনের শ্রীবিগ্রহ-ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন ব্যতীত অন্য বস্তু হইতে পারেন না; আংশিক উপমা দ্বারা বলা যাইতে পারে, শিল্প ও বিজ্ঞানে যে অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহ সেরূপ জড়চক্ষের অলক্ষিত ভগবৎ-স্বরূপের প্রতিভূ-স্বরূপ। ভক্তগণের ভগবৎস্বরূপ-প্রতিভূ যে যথার্থ তাহা বাস্তব বৈজ্ঞানিক-ভগবদ্ভক্তগণ বিশুদ্ধ প্রেম-বিজ্ঞানরূপ কলের দ্বারাই অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎ-পদার্থের সহিত বিদ্যুৎ-যন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ তাহা কেবল বিদ্যুৎ ফলকোৎপত্তি রূপ ফলের দ্বারাই লক্ষিত হয়। যাহারা তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাহারা বিদ্যুৎ যন্ত্র দেখিয়া কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে বাস্তব-বিজ্ঞান-রূপ আত্মধর্ম প্রেমভক্তি নাই তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা ছাড়া আর কি বলিতে পারে? বৈষ্ণবদর্শনের বিচার অতি সূক্ষ্মতম। তাঁহারা অতীব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, জগতে যাঁহারা আপনাদিগকে নিরাকার 'বাদী' বা 'জড়-সাকারবাদী', বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা সকলেই ন্যূনাধিক পৌত্তলিক। বস্তুজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করে সেই সকল অসভ্য জাতিগণের অন্তর্গত অগ্নিপূজকগণ জোভ শেঠর্ণ প্রভৃতি গ্রীকদেশীয় গ্রহপূজক ব্যক্তিগণ যেমন স্থূল পৌত্তলিক জড়কে তুচ্ছজ্ঞান-পূর্বক জড় বিপরীতভাবকে 'নিরাকার' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করিয়া যাঁহারা নির্বিশেষবাদী হ'ন তাঁহারা তেমনি বা তদপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম পৌত্তলিক। যাঁহারা বিচার করেন, ঈশ্বরের নিত্য চিদানন্দ-স্বরূপ নাই কিন্তু স্বরূপ ব্যতীত চিন্তার বিষয় পাওয়া যায় না সুতরাং উপাসনা সুলভ করিবার জন্য ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা করা আবশ্যক---এইরূপ বিচারপরায়ণ Henotheist অথবা বেদোক্ত দেবগণের অন্যতমের উপাসক বা পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় কল্পিত মূর্তির সেবক বলিয়া পৌত্তলিক-শ্রেণীর অন্তর্গত। যাহা রচিত শুদ্ধির বা চিত্তবৃত্তি শুদ্ধির জন্য ঈশ্বর কল্পনা করিয়া তাহার কোন কল্পিত মূর্তির ধ্যানাদি সাধনা করেন, সেই সকল যোগী প্রভৃতির আচরণ পৌত্তলিকতার অন্তর্গত। যাহারা জীবকে ঈশ্বর মনে করে তাহারা সর্বাপেক্ষা অপরাধী (blasphemers) পৌত্তলিক, কারণ মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া কল্পনাই-পৌত্তলিকতা। সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিরাকার চিন্তা-অত্যন্ত জড়কুণ্ঠিত পৌত্তলিকতা। বৈষ্ণব-দর্শনের শ্রীমূর্তি-সেবা ও অন্যান্য মানব চিন্তার সাকার নিরাকার বাদে বিস্তর ভেদ আছে। বৈষ্ণব-দর্শনে পরমেশ্বরের নিত্য স্বরূপের অর্চাবতারের পূজাবিহিত হইয়াছে,

আর অন্যান্য মানব-চিন্তাস্রোতে কল্পিত জড়াকাশ-সদৃশ সর্বব্যাপী ও নিরাকারের কল্পনা বা প্রকৃতির কোন চাকচিক্যময় পদার্থের সাকার কল্পনা, কখনও জড় বিপরীত-ভাবকে পরমেশ্বর কল্পনা, কখনও ঈশ্বরের বাস্তব-স্বরূপ অস্বীকার করিয়া জড়ীয়-রূপ-কল্পনা; জীবে পরমেশ্বর বুদ্ধি প্রভৃতি কল্পনা-রূপ পৌত্তলিকতার তাণ্ডব নৃত্য রহিয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সেইরূপ সকল পৌত্তলিকতা নিরাস করিয়া ভগবানের অবিচিন্ত্য শক্তি ও পরম করুণাময় অর্চাবতারের কথা জানাইয়াছেন।

বৈষ্ণব-দর্শনে কোন প্রকার কল্পনার অবসর নাই। বর্ত্তমান জগতের পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতা কেন, লক্ষ লক্ষ যুগ-যুগান্তরের সভ্যতার চরম-সীমায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুসভ্য মানবজাতি যাহা কল্পনায়ও ধারণা করিতে পারিবেন না, তাহা অপেক্ষাও অনন্ত কোটি গুণে অসমোর্ধ ভগবদ্-বিজ্ঞানের কথা বৈষ্ণবদর্শন বা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্বজনীন ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। সভ্যতার চরমসীমায় মানব প্রকৃত বাস্তব সত্যের উপাসক হইলে তাঁহার দেহ মনের অতিরিক্ত আত্মার সেবাবৃত্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎ শুদ্ধ সত্ত্ব-স্বরূপে সেবাবৃত্তির ক্রমবিকাশানুযায়ী ভগবানের যে যে নিত্য অপ্রাকৃত মূর্তির স্ফুরণ বা অবতরণ হয়, সেই সকল নিত্য মূর্তি কোন প্রকার অবাস্তব বস্তু মানবজাতি মনোধর্মে গঠিত কাল্পনিক প্রতিমা অসভ্য জাতির কল্পিত ব্যুৎস্পরস্ত—যেমন ব্যাঘ্র দেবতা, সর্পদেবতা, ঘোটক-দেবতা প্রভৃতির ন্যায় কাল্পনিক পুত্তলী বা কোন প্রকার রূপক বস্তু নহে। যাঁহারা Henotheist (পঞ্চোপাস্যের অন্যতম দেবতার উপাসক) তাঁহাদের মধ্যে যে পঞ্চ-দেবতার অন্যতম কোন দেবতার প্রাধান্য স্বীকারপূর্বক 'ব্রহ্মের রূপ কল্পনা' প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেইরূপ কল্পনাযোগে যে-সকল দেবতা পূজার বিধি প্রচলিত হইয়াছে, মৎস্য কূর্মাদি বিষ্ণুতত্ত্বের উপাসনা সেরূপ কল্পনা-প্রসূত ব্যাপার নহে। Henotheist (পঞ্চোপাসক) সম্প্রদায় ভগবানের সবিশেষত্ব বা অপ্রাকৃত নিত্য ব্যক্তিত্ব (Transcendental personality of Godhead) স্বীকার করেন না। থিওসফিষ্ট প্রভৃতি রূপক-বাদি-সম্প্রদায়ও ভগবানের সবিশেষত্বে সন্দিহান বলিয়া অর্থাৎ বাস্তব-সত্যে আস্থাবান্ না থাকিয়া প্রকৃত আস্তিক নহেন বলিয়াই রূপক কল্পনার দ্বারা ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা ও অচিন্ত্যশক্তিপ্রসূত নাম-রূপ-গুণ লীলাবলীকে খর্ব করিতে চাহেন। বৈষ্ণব-দর্শন বা ভারতীয় সনাতন-দর্শন কখনই এইরূপ ব্রহ্মের রূপ-কল্পনাবাদী কিম্বা রূপক-বাদী প্রভৃতির নাস্তিক্যমতের সমর্থন করেন নাই। ভারতীয় সনাতন-দর্শন বিশুদ্ধ বাস্তব অবতার বাদের কথাই বর্ণন করিয়াছেন। বৈষ্ণব-দর্শনের মৎস্য-কূর্মাদি অবতার সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন অসভ্য মানবগণের রুচি-অনুযায়ী কল্পনা বিশেষ নহে, কিম্বা "ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা" ন্যায়াবলম্বনে মায়াবাদীর পৌত্তলিকতা বা আধ্যাত্মিক-বাদীর রূপক নহে তেমনি তথাকথিত সভ্য মানবগণের উদ্ভাবিত Anthropomorphism অর্থাৎ ঈশ্বরকে মানবীয় আকারে

কল্পনা বাদ, কিম্বা Therianthropism (পশু মানব মিশ্র মূর্ত্তিতে ইষ্টদেবতা কল্পনা বাদ) বা Apotheosis ('মনুষ্যকে ঈশ্বর সাজাইয়া তোলা'-বাদ অর্থাৎ মানবে ইষ্টদেব কল্পনায় ঈশ্বরত্বের আরোপ বাদও) নহে। Anthropomorphism (মানব-ঈশ্বর-কল্পনা-বাদ) এবং Therianthropism (পশু এবং মানবের মিশ্রিত মূর্ত্তিতে ইষ্টদেবতা কল্পনা বাদ) মনোধর্মী আরোহবাদিগণের পৌত্তলিকবাদেরই এক একটি প্রকাশ বিশেষ।

ভারতীয় সভ্যতার কুফল স্বরূপ মায়াবাদের অনুকরণে গ্রীস ও রোমে Anthropomorphism এবং মিশর দেশ প্রভৃতিতে Therianthropism নামক মতবাদসমূহ উদ্ভাবিত হইয়াছে।

ভারতীয় মায়াবাদী সম্প্রদায় জীবে 'নারায়ণ'—বুদ্ধি, দরিদ্রে 'নারায়ণ'—বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলা কল্পনার প্রশ্রয়ে মানুষ বা পশুকে ঈশ্বরত্বে আরোপ এবং "ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা" প্রভৃতি ন্যায় অবলম্বন করিয়া যে 'মানব-দেহ-বাদ' প্রভৃতির কল্পনা করিয়াছিলেন, ভারতীয় সভ্যতার পণ্যদ্রব্যের সহিত যখন গ্রীস, রোম, মিশরাদি দেশে এই সকল নবীন মতবাদ প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তখন তদ্দেশীয় মনোধর্মি-লোকসমূহ ভারতীয় সেই সুলভ বিকৃত মতবাদসমূহ আত্মসাৎ করিয়া উহাদের উপর নূতন নূতন নামের লেবেল লাগাইয়া মতবাদ-ধর্মের বাজারে ঐ সকল মতবাদপণ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পরন্তু ভারতীয় বাস্তব-বৈষ্ণব-দর্শন কোনদিনই ঐরূপ কোন কাল্পনিক মতবাদের প্রশ্রয় দেন নাই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই সমস্ত কাল্পনিক মতবাদ বা পৌত্তলিকতা নিরাস করিয়াছেন। তিনি জন্তু-মানবে ঈশ্বরত্বের আরোপবাদ বা ঈশ্বরের মানব-রূপ-কল্পনাবাদ উভয়ই নিরাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—(চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১৬)

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বে নৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্।।"

ঈশ্বরে মানব-রূপ-কল্পনা'-বাদ কতকটা বাউল মতবাদের মত। এই সকলমতবাদ বুদ্ধ-বিষ্ণুর উপদেশ বঞ্চিত বৌদ্ধ এবং শ্রীচৈতন্য-বিষ্ণুর উপদেশ বঞ্চিত বাউলগণের বা নাস্তিক সম্প্রদায়ের মানসিক কল্পনা। মায়াবাদি-সম্প্রদায়ও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবতীয় বাস্তব বৈজ্ঞানিকদর্শন এবং চৈতন্যদেবের প্রচারে নর-বপুকেই ভগবৎস্বরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই নরবপু মানব-দেহ-কল্পনাবাদ বা বাউলবাদ নহে, তাহা নিত্য অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, সর্বকারণ, লীলা-পুরুষোত্তমের কথা।

"যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরংপদং ভূষণভূষণাঙ্গম্।।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২।১২)

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ।।"

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

মানবাত্মার সর্ব-বিজ্ঞান সম্পত্তির পরিপূর্ণতা লাভ হইলে ঐরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। বৈষ্ণব-দর্শন বলেন,—ভগবানের বিলাস দুই প্রকার। চিদচিদাত্মক ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি ও অসংখ্য নিয়ম সকলের দ্বারা জগতের ব্যবস্থা করণই ঈশ্বরের একপ্রকার বিলাস। সাধারণ আধ্যক্ষিক জ্ঞানিসম্প্রদায়ও ঈশ্বরের এই প্রকার বিলাস যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন। এই রচিত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যে অপ্রাকৃত লীলার অবতরণ তাহাই দ্বিতীয় প্রকার বিলাস। জীবই ভগবানের লীলার সহচর। জীব ভোগেচ্ছাপূর্ব্বক নিজস্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া জড়-সঙ্গে অভিনিবিষ্ট হয়। কিন্তু যখন আবার কোন ভগবৎ প্রতিনিধির নিকটে ভগবদ্রাজ্যের দিব্য-জ্ঞান লাভ করিতে করিতে তাহার আত্মা শুদ্ধস্বরূপে বিকশিত হইতে থাকে আত্মার সেই ক্রমবিকাশ অর্থাৎ শরণাগতি, প্রপত্তি বা আস্তিকতার ক্রমবিকাশে তত্তৎ সেবাধারের যোগ্যতানুসারে ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত মূর্ত্তি-সমূহ সেই সেই শুদ্ধজীবাত্মার উপাস্য বস্তুরূপে লক্ষিত হয়। সুতরাং সেখানে কল্পিত মানব-দেব-মতবাদী পঞ্চদেবতাবাদী বা আধ্যাত্মিকবাদী কিম্বা ভূত, প্রেত, পশু, দেবতা কল্পনা-বাদী তথাকথিত সভ্য বা অসভ্য-মানব-মনের কোন প্রকার কল্পনাবাদেরই লেশমাত্র অবকাশ নাই। বাস্তব, নিত্য অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহসমূহ মানবাত্মার সেবোন্মুখতার ক্রমবিকাশের যোগ্যতা তাঁহাদের নিত্য মূর্তিসমূহ তত্তৎ শুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। জীবের প্রতি অপার কারুণ্যই এই সকল ভগবদাবির্ভাবের একমাত্র কারণ। লেমার্ক বা ডারউইনের জড়ীয় দেহগত ক্রমবিকাশবাদের কথা পাশ্চাত্ত্য দেশে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু আত্মার সেবোন্মুখতার ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবিকাশমান মুক্ত আত্মার সেব্য এক একটী নিত্য অপ্রাকৃত ভগবৎ স্বরূপের বাস্তব ধারণা একমাত্র বৈষ্ণবদর্শনেই পরিপূর্ণ-বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দৃষ্ট হয়। আমরা প্রাণী-দেহের ক্রমবিকাশে অদণ্ডাবস্থা হইতে মনুষ্যের পূর্ণাবস্থা পর্যন্ত স্তরগুলি লক্ষ্য করিতে পারি। এই স্তরগুলি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ঋষিগণ দশটী ভাগে বিভক্ত কিরয়াছেন—প্রথমে অদণ্ডাবস্থা, দ্বিতীয়ে বজ্রদণ্ডাবস্থা, তৃতীয়ে মেরুদণ্ডাবস্থা, চতুর্থে উত্থিত মেরুদণ্ডাবস্থা অর্থাৎ নরপশু অবস্থা, পঞ্চমে ক্ষুদ্রনরাবস্থা, ষষ্ঠে অসভ্যনরাবস্থা, সপ্তমে সভ্যনরাবস্থা, অষ্টমে জ্ঞানাবস্থা, নবমে অতিজ্ঞানাবস্থা এবং দশমে প্রলয়াবস্থা। জীবের ঐপ্রকার ঐতিহাসিক অবস্থা। জীবাত্মার সেবোন্মুখতার ক্রমবিকাশের নির্দ্দেশস্বরূপ এই সকল অবস্থার ক্রম-অনুযায়ী মৎস্য,

কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী এই দশটী অবতার নিত্য অপ্রাকৃত নাম রূপ গুণ লীলাবিশিষ্ট উপাস্য তত্ত্বরূপে লক্ষিত হ'ন। যাঁহারা বিশেষ আলোচনার দ্বারা এই অবতার বিজ্ঞান উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শিক্ষায় শিক্ষিত দার্শনিকগণের অনুগ্রহে কৃষ্ণতত্ত্ব, বিশেষতঃ ব্রজবিলাসের একান্ত মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ঈশ্বরতত্ত্বের অর্চ্চা আমাদের উপাস্য। অর্চ্চার সেবার ভূতশুদ্ধির প্রয়োজন, বিগ্রহকে যদি matter কিছু মনে করা যায়, তাহা হইলে ভূতশুদ্ধি হয় নাই, বুঝিতে হইবে। spiritual (animistic নহে) অর্থাৎ transcendental self-illuminating তত্ত্ব না দেখিতে পাইলে অর্চ্চন আরম্ভ হয় নাই জানিতে হইবে। অর্চ্চনকারী অর্চ্চা বিগ্রহের সেবা করেন। তিনি 'ভূতশুদ্ধি' ও প্রোক্ষণ করেন। 'প্রোক্ষণ' বলিতে এই বুঝায়, যে intermediate ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিষ সেবার বাধা দেয়, তাহা বিদূরিত করিতে হইবে। প্রোক্ষণ অর্থাৎ জলের দ্বারা ধুইয়া ফেলা—impurity দূর করা। আমরা বদ্ধাবস্থায় অর্চ্চার নিকট যে ভক্তি করি, তাহার কারণ ঐ জিনিষটি আমাদের নিকট দাতা এবং আমরা গ্রাহক। আমাদের impoverished idea আছে। আমরা নিজেকে উপাসক বলিতেছি অথচ নিজেকে মনে মনে হাড়-মাংসের পিণ্ড মনে করিতেছি। কেহ বলিতেছেন—আমাকে অর্চ্চার কাছে লইয়া যাইবেন। আমাদের ধারণা—অর্চ্চা inanimate, কিন্তু যিনি অর্চ্চা, তিনি জড় নহেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব intermidiate রূপে আমাকে সাহায্য করেন। অর্চ্চা, অর্চ্চন ও উপাসকের মধ্যস্থলে guide এর কথা শুনিয়া আমাদের একটা বাধা উপস্থিত হইয়াছে। যদি অর্চ্চা ও অর্চ্চকের স্বরূপজ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে বিগ্রহ পূজা ছেলেপিলের পুতুল খেলা হইয়া যাইবে। ভালকরিয়া বেদান্তের 'শ্রীভাষ্য' ও 'গোবিন্দভাষ্য' না পড়িলে গোবিন্দের পূজা হয় না। Intellectual man মনে করিতে পারেন—যত অশিক্ষিত লোক আছে, তাহাদিগকে পূজারী নিযুক্ত করিব। এইরূপ চিন্তা উপস্থিত হইলে বুঝিতে হইবে—আমরা morphological things-এ আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর ontological aspect neglected হইতেছে। পুতুল পূজার দরকার নাই, কিন্তু ভগবানের পূজার দরকার আছে।

যাঁহাকে পূজা করিতে বসিয়াছি, তিনি অর্চ্চা। আমি অর্চ্চা শ্রালগ্রামে হরিপূজা করিতে বসিয়াছি। অর্চ্চক ঈশ্বরের প্রতি reverential service offer করেন। আমাদের জড় মাংসের হাত পা দ্বারা অর্চ্চনের ফুল তোলা বা পূজা হয় না। অন্যের দৃষ্টি'তে অর্চ্চা প্রতিমা মাত্র। বাহিরের লোক দেখিতেছেন, অর্চ্চা যায় না, initiative নিতে পারে না।

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যাচ সৈকতী।
মনোময়ী মনিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।।

(ভাঃ ১১।২৭।১২)

(১) শিলাময়ী (২) কাষ্ঠময়ী (৩) লৌহ, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুময়ী, (৪) মৃন্ময়ী, (৫) চিত্রপটময়ী (৬) বালুকাময়ী, (৭) মনোময়ী, (৮) মনিময়ী।

লোকাচার্য্যপাদ বলেন, ভগবান জীবের নিকট পাঁচ প্রকারে প্রকাশিত হন। (১) পরতত্ত্ব, (২) ব্যূহতত্ত্ব, (৩) বৈভবতত্ত্ব, (৪) অন্তর্যামি তত্ত্ব এবং (৫) অর্চ্চাবতার। পরতত্ত্ব- বৈকুণ্ঠে বিরাজমান তুরীয় বস্তু পরমেশ্বর-সর্ব্বজীবারাধ্য ভগবান্। ব্যূহতত্ত্ব- বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। বৈভবতত্ত্ব রামনৃসিংহাদি অবতার। অন্তর্যামি-তত্ত্ব—পরমাত্মা। অর্চ্চাবতার-নিত্যনাম রূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট ভগবদ্বিগ্রহের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ জীবের মঙ্গলের জন্য লোকলোচনে স্থূল অর্চ্চনকালে প্রকটিত।

জগতে একই কালে ব্যক্তিবিশেষের নিকট দ্বিপাদ দর্শন, ত্রিপাদ দর্শন ও চতুষ্পাদ দর্শন সম্ভব নহে। বহির্জ্জগতে আমরা ১৮০° ডিগ্রী অংশ মাত্র দর্শন করি। আর বাকী ১৮০° ডিগ্রী অংশ পশ্চাদ্ভাগে আমাদের অগোচর থাকে। খগোলেরও আমরা অর্দ্ধভাগ দর্শন করি, আর অর্দ্ধগোল আমরা দেখতে পাই না। সুতরাং দ্রষ্টৃসূত্রে এক কালে এখানে ত্রিপাদ দর্শনের কথা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। একপাদ ভূমিকায় অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগতে এককালে পূর্ণবস্তুর দর্শন হয় না। ভগবানের চারপ্রকার প্রকাশভেদের কথা না জানলে আমরা পুর্ণজ্ঞানের কথা জানতে পারি না। একই সময়ে ভগবানের চারপ্রকার দর্শন ভগবৎকৃপায়ই সম্ভব হতে পারে। একেশ্বরপরায়ন ব্যক্তিগণ চতুষ্পাদ দর্শন করতে পারেন। ভগবান্ চতুর্ব্যূহ প্রকটিত হয়ে একই সময়ে তাঁর চার প্রকার চতুষ্পাদ দর্শন প্রকাশিত করেন। কিন্তু বেদান্তের উৎপত্ত্যসত্ত্ব বাধিকরণ ৬ষ্ঠ পাদের শঙ্কর শারীরক ভায্যে সেই চতুষ্পাদ দর্শনের কথা আক্রান্ত হয়েছে। অবিচিন্ত্য শক্তিময় ভগবান যুগপৎ চতুর্দ্ধা প্রকাশিত হয়েও তাঁর অদ্বয়ত্ব পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করেন। সর্ব্বশক্তিমান ভগবান জীবের ন্যায় খণ্ডিত বা অপরের দ্বারা পরিমাপ যোগ্য বস্তু নন যে তিনি চতুর্দ্ধা প্রকাশিত হলেও তাঁর অদ্বয় সত্তা সংরক্ষণে অসমর্থ হ'য়ে পড়বেন।

বিষ্ণোস্তু ত্রীনি রূপানি পুরুষাখ্যান্য যো বিদ্ধঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্ট্র দ্বিতীয়ংত্বংগুসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভুতস্থংতানি জ্ঞাতা বিমুচ্যতে।।

ব্যূহতত্ত্বের পর তৃতীয় বৈভবতত্ত্ব। সৌভাগ্যবন্ত জনগণের নিকট ভগবান্ মৎস্য-কূর্ম্ম-রাম নৃসিংহাদি নৈমিত্তিক অবতাররূপে যথাকালে আবির্ভূত হন। বৈভব-দর্শনের যোগ্যতা সম্প্রতি আমাদের সাধারণ জীবের হয় না। এ জন্য অন্তর্যামি পরমাত্মসূত্রে

ভগবান্ আমাদের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হয়ে আমাদের চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত করেন। তাতেও যোগ্যতা না হলে পঞ্চম অধিষ্ঠানের অর্চ্চাবতার শৈলী, দারুময়ী, লেপ্যা, লেখ্যা প্রভৃতি রূপে জগতে প্রকাশিত হন। এই বস্তুটী বৈভবতত্ত্বের ন্যায় প্রকটকালীয় তত্ত্ব মাত্র নন। কিন্তু আমার ন্যায় ভাগ্যহীনের নিকট পরম উপযোগী ও করুণাময়। অর্চ্চাবতারের সঙ্গে অপর চারপ্রকার তত্ত্বের কোন ভেদ নাই, কেবল তাঁদের মধ্যে বিলাসবৈচিত্র্য মাত্র বর্ত্তমান। অর্চ্চাবতার জীবের মনের কারখানার কোন কাল্পনিক সামগ্রী নন। কিন্তু ভগবানের নিজ নিত্যরূপের নিত্যনামের, নিত্যগুণের, নিত্যলীলার মূর্ত্ত অবতার।

মূর্ত্তিগঠনকারী (Iconographer) ও মূর্ত্তিধ্বংসকারী (Iconoclast) উভয়েই কোন না কোনপ্রকারে পৌত্তলিক। বিষ্ণুর অর্চ্চামূর্ত্তির উপাসকগণ সেইরূপ পৌত্তলিকগণের আক্রমণের বস্তু নন। কারণ তাঁহারা Iconographer-এর ন্যায় মূর্ত্তি কল্পনা করেন না বা Iconoclast-এর ন্যায় মূর্ত্তি ধ্বংস বা বিসর্জ্জন করেন না। তাঁরা কাঠের ঠাকুর, মাটীর ঠাকুর দর্শন করে আপনাদিগেকে ভোগময় দার্শনিকের অন্তর্গত বিচার করেন না।

চেতন-ধর্ম্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি হবে কর্ণে ভগবৎকীর্ত্তন প্রবিষ্ট হলে। কর্ণে ভগবৎকীর্ত্তন প্রবিষ্ট হলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন, বাক, পানি প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়গুলিই সংশোধিত, সংযমিত ও সৎপথে চালিত হবে। চেতনময় কীর্ত্তন প্রবিষ্ট হলে বহির্দর্শন ও জড়হস্তের স্পর্শ হতে পরিত্রাণ লাভ করে পূর্ণবস্তুর দর্শন লাভ হবে।

ভগবদ্বস্তুর দর্শন, আরাধনা প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ভগবদ্বস্তুর দর্শন হচ্ছে না। বহির্জ্জগতের দর্শন ভগবদ্দর্শন নয়। ভগবান প্রকাশিত হলে প্রকাশ-বাধ ইন্দ্রিয়সকল আর বাধা প্রদান করিতে পারে না। সেই বাধা একমাত্র শ্রবণের দ্বারাই অপসারিত হতে পারে। শ্রবণফলে জীব ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ ও ভগবৎকৃপালাভের অধিকারী হয়, —'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।'

আমাদের যখন চক্ষু আছে তখন ভগবান কি, আমাদের দেখবারও একটা ইচ্ছা হয়, কিন্তু সেই বস্তুর দর্শন কি প্রকারে সম্ভব হতে পারে? তিনি যে অধোক্ষজ অর্থাৎ প্রাণিমাত্রের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু। পরতত্ত্বদর্শন কিংবা ব্যূহতত্ত্ব-দর্শন কিংবা বৈভবতত্ত্ব-দর্শন বর্ত্তমানে আমাদের অধিকারের অন্তর্গত নহে। অন্তর্যামিতত্ত্ব-দর্শন সামান্যভাবে সম্ভব হ'লেও তা' নানা বিপদ্গ্রস্ত। পরতত্ত্ব, ব্যূহতত্ত্ব, বৈভবতত্ত্ব ও অন্তর্যামিতত্ত্ব চক্ষুদ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। শ্রীভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে ব'লেছেন,—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।

ভগবানের স্বরূপটি কি তাঁর কি রূপ, তাঁর কি গুণ, কি লীলা, এ সকলের বিজ্ঞান তাঁর অনুগ্রহ না হ'লে জানা যায় না। আমরা তাঁ'র দর্শন লাভ ক'রে তাঁ'র যে সেবা করব তাঁর রূপের অভিব্যক্তি না হ'লে সেই সেবা করা যায় না। তাঁ'র অভিব্যক্তি কি জীবের ভোগ্য? তাঁ'কে ঈক্ষণ করবার পূর্ব্বে তাঁ'র কথা শ্রবণের দরকার। যে চক্ষুর অন্য কোন কৃত্য নেই ভগবানের সেবা ছাড়া সেই চক্ষুর দ্বারাই ভগবানের দর্শন হ'বে। পরতত্ত্ব ব্যূহ, বৈভব,অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—এই পাঁচ প্রকারে ভগবৎ প্রকাশের মধ্যে বর্ত্তমানে আমাদের অর্চ্চা-দর্শনে অধিকার ও অর্চ্চন-যোগ্যতা হ'তে পারে। আমরা দর্শন ক'রে তাঁর সেবা করতে পারি; কিন্তু সেই দৃশ্যপদার্থ জড় নহেন—তিনি অপ্রাকৃত ও সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। জড় হ'লে তিনি আমাদেরই সেবা ক'রবেন। আমরা কাঠ, পাথরের পূজা ক'রব না; জড় জগতের ভোগ্য বস্তুর অনুসন্ধান ক'রব না, আমাদের নিত্য-নিয়ামক আরাধ্য বস্তুরই সেবা ক'রব।

যাঁ'রা বলেন—ভগবান্‌কে যে ভাবেই ডাকিনা কেন, তিনি দেখা দিবেন, তাঁরা ভাবেন না যে, ভগবান্ আমাদের বাগানের মালি বা রায়ত ন'ন। চাকর ব'লে ডাকলেও তিনি আস্‌বেন—এটা অভক্তির কথা। যিনি হরিকথা শ্রবণ ক'রে তারপরে তাঁর দর্শন করেন, তা'রই প্রকৃত দর্শন হয়। হরিকথা না শুনে যদি তাঁ'কে দর্শন করার চেষ্টা হয়, তা হ'লে ভোগ্য দর্শন হ'য়ে যায়। আমি যদি আমাকে হাড়মাংসের থ'লে জ্ঞান ক'রে তাঁর দর্শন চাই, তা'হলে ভোগ্য বস্তু দর্শন হ'য়ে যা'বে।

অপ্রাকৃত বস্তুকে আমি প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা দর্শন ক'রতে পারি না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী আমার চক্ষুর প্রাকৃত আবরণ অপসারিত ক'রে দিব্যচক্ষু দান ক'রলে সেই সেবোন্মুখ চক্ষে—শ্রুতির দ্বারা নিয়মিত নেত্রে আমার শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের যোগ্যতা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুনপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।"

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

আমরা কাঠ পাথরের নিকট মস্তক অবনত করি না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের এই চক্ষের ছানি দূরীভূত ক'রে দিলে সেই দিব্য চক্ষে আমরা অর্চ্চাবতার দর্শন করতে পারি।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

ভগবানের অন্যান্য প্রকাশসমূহ আমরা ইচ্ছা ক'রলেই দর্শন করতে পারি না; কিন্তু তাঁ'র সময়মত উপস্থিত হ'লে প্রত্যহই অর্চ্চাবতারকে দর্শন ক'রতে পারি—তাঁ'র অবশেষ গ্রহণ ক'রে জীবন ধারণ ক'রতে পারি—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁ'র সেবা ক'রতে পারি। আমরা পৌত্তলিক বা অপৌত্তলিক হ'তে চাই না। আমরা অধোক্ষজের সেবক হ'তে চাই।

বৈষ্ণবের ইহাই বিশেষত্ব যে, তাঁহারা প্রসাদভিক্ষু; 'প্রসাদ' অর্থাৎ অনুগ্রহ। উপক্রম ও উপসংহারে তাঁহারা বৈষ্ণবের নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন। মহাভাগবত-বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সমগ্রজগৎকে শ্রীভগবানের প্রসাদ-রূপে দর্শন করেন, প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন। যাঁহার সম্পত্তি আছে, তিনিই আমাদিগকে সম্পত্তি দান করিতে পারেন। যে ভগবান্ সমস্ত সম্পত্তির মালিক, সেই ভগবানের সেবাব্যতীত যাঁহাদের অন্য কোন কৃত্য নাই—সমগ্র জগৎ যাঁহাদের নিকট 'প্রসাদ',—জড় সুখাশ-বাদি (optimist)-সম্প্রদায় যেরূপ বিচার করেন, সেইরূপ কথা বলিতেছি না, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তগণ সমগ্র-জগৎকে প্রসাদরূপে প্রদান করিতে পারেন। সমগ্র জগৎ—ভগবদ্ভক্তগণের প্রসাদপ্রাপ্তির জন্য লালায়িত। কে ভগবানের প্রিয়তম,—কে ভগবানের প্রসাদের মালিক, তাহার নির্দ্ধারণ আমাদের ভাগ্যহীনতা ও ভাগ্যবিশিষ্টতার উপরই নির্ভর করে। যদিও ভগবানের প্রসাদ আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়, তথাপি ভগবানের প্রসাদ যাঁহারা লাভ করেন—ভগবদ্বস্তু যাঁহাদের সম্পত্তি, তাঁহাদের প্রসাদও আমাদের অপ্রয়োজনীয় নহে। ভগবৎপ্রসাদকে 'মহা-প্রসাদ' বলে। ভগবানের প্রসাদ লাভ করিয়া যাঁহারা মহান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রসাদই 'মহা-মহা-প্রসাদ'।

ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ-গ্রহণ সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণচেতাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। ভারতীয় সামাজিক-বিচারে আমরা দুইপ্রকার মতভেদ লক্ষ্য করি—(১) যাঁহারা কর্ম্মফল-প্রভাবে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রেষ্ঠতা লাভ না করিলেও তাঁহাদিগকে অবৈধরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদেরই প্রসাদ বাঞ্ছনীয় বলিয়া কোথাও স্বীকৃত হয়; আর, (২) যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে নৈষ্কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের প্রসাদগ্রহণই নিত্য-শ্রেষ্ঠ-সৌভাগ্য-লাভের উপায় বলিয়া কোথাও বিশ্বাস করা হয়। একপ্রকার বিচার এই যে, হাজার হাজার বিমূঢ় লোক যে মত পোষণ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে মতভেদ করা উচিত নহে; দ্বিতীয়প্রকার বিচার এই যে, মতভেদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রকৃত-সত্য বিচার করা আবশ্যক।

ভগবৎ প্রসাদের প্রতি আমাদের অবজ্ঞা এবং ভগবৎপ্রসাদ যাহা নহে, তাহাতে আমাদের অনুরাগ-বৃদ্ধি হইলে ভগবানের ভুক্তাবশেষ ভাল না লাগিলে, 'ভগবান্' নয় যাহা বা 'সত্যস্বরূপ' নয় যাহা অর্থাৎ যাহা—অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের প্রসাদের জন্যই আমরা লালায়িত হই। আমরা তখন মৎস্যাদি ও পশু-পক্ষীর মাংসভোজী হইয়া পড়ি।

ঐগুলি (মৎস্য-মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য)—ভগবানের ভোগ্য নহে কারণ, উহা হিংসা-মূলে উৎপন্ন। আর্য্য-বিধবা-স্ত্রীগণের আচরণ বা চতুর্থাশ্রমিগণের আচরণের মধ্যেও আমরা ঐসকল অমেধ্যগ্রহণ-চেষ্টা দেখিতে পাই না। পতিসুখে বঞ্চিত আর্য্য-বিধবা-স্ত্রীগণ, বিষ্ণুকে যাহা দেওয়া চলে না, তাহা কখনও গ্রহণ করেন না—ইহা সামাজিকগণের মধ্যেও দেখিতে পাই। বলিরূপে অর্পিত পশুর মাংস যদি 'প্রসাদ' হইত, তবে চতুর্থাশ্রমী বা বিধবাদিগকেও উহা দেওয়া যাইতে পারিত। সাধারণতঃও দেখা যায় যে, কোনও ভদ্রলোক কোনও হিংসার প্রশ্রয় দেন না। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, 'তবে কেন শাস্ত্রে বিধিমূলে ঐরূপ হিংসা-কার্য্যে অনুমোদন দেখা যায়? তদুত্তরে সাত্বতশাস্ত্রসমূহ বলেন,—যাহাদের অত্যন্ত শুক্রশোণিতের জন্য লোভ রহিয়াছে, তাহাদের শুক্রশোণিতের প্রবল-বুভুক্ষা ক্রমশঃ খর্ব্ব করাই ঐসকল বিধির উদ্দেশ্য।' সুতরাং যে-যেস্থলে নিরপেক্ষ বিচার উপস্থিত হইয়াছে, সেই সেইস্থলেই 'অমেধ্য' আমিষাদি কখনও 'ভগবৎ-প্রসাদ' বলিয়া গৃহীত হয় না।

ভগবদ্দাসগণ ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করেন। 'ভগবানের দাস' বলিয়া যাঁহারা অভিমান করেন না অর্থাৎ যাঁহারা ভূতশুদ্ধির পূর্ব্বেই ভগবানের নৈবেদ্য বা ভোগ্য-বস্তুতে লোভ করিয়া বসেন, যাঁহাদের বিচার—'ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য, মাঝ-পথে একটা ঠাকুর দাঁড় করাইয়া 'ভগবৎ-প্রসাদ' বলিয়া বোকা লোকগুলিকে ভোগা দিব'—ভোগের আগেই প্রসাদ বলিব এবং তদ্দ্বারাই সত্যস্বরূপ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তে ফাঁকি দিতে পারিব', তাঁহারা ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের অপ্রাকৃত প্রসাদ-লাভে বঞ্চিত—এই বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটী—'বিশেষ অনুগ্রহ', আর একটী—'বিশেষ-বিশেষ-অনুগ্রহ'। 'বিশেষ-বিশেষ-অনুগ্রহ'-লাভে সকলের ভাগ্য বা শ্রদ্ধা হয় না অর্থাৎ মহা-মহা-প্রসাদে বিশেষ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি-ব্যতীত অপরের অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয় না। অতএব ভগবানের প্রসাদ ও ভগবদ্ভক্তের প্রসাদই গ্রহণীয়। ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কোনও অভাব নাই।

আচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর 'হরিভক্তিবিলাস'-নামক বৈষ্ণবস্মৃতিনিবন্ধ-গ্রন্থের সহিত মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিনিবন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে; —একজনের বিচার-সম্মত-বিধি, আর একজনের দণ্ডবিধি। একজন বলেন, —ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া ঈশ্বরসেবার অনুকূল বস্তুসমূহ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য; সর্ব্বদা বিষ্ণুস্মরণই 'বিধি', বিষ্ণুবিস্মরণই 'নিষেধ', সুতরাং বিষ্ণুস্মৃতির প্রতিকূল কর্ত্তব্যগুলি দেশ, সমাজ বা সংসারের কার্য্যনির্ব্বাহের অনুকূল হইলেও উহাই 'নিষেধ'; আর একজন বলেন, ঈশ্বর কেহ মানুক আর নাই মানুক, দেশাচার-পদ্ধতি ও লোকাচার-পদ্ধতি মানিয়া চলাই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ভগবান্‌কে কে ডাকিয়া খাওয়াইতে পারেন? আর কে-ই বা ডাকিতে পারেন না বা খাওয়াইবার অযোগ্য? শ্রীমদ্ভাগবত (১।৮।২৬) বলেন,—

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমান-মদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্।।"

—ভগবান্‌কে ডাকিয়া ত' খাওয়াইবেন? কিন্তু তাঁহাকে বিষয়মদান্ধ ব্যক্তিগণ ডাক্‌তেই যে পারে না! এইজনই শাস্ত্র বলেন,—"গৃহ্লীয়াদ্ বৈষ্ণবাজ্জলম্"—পক্কান্নপ্রসাদ না পাইলেও বৈষ্ণবের নিকট হইতে অন্ততঃ প্রসাদ-জলও লইতে হইবে।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের বিচার—জড়জগতের বস্তু-গত।

মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিয়াছেন,—ভগবৎ-প্রসাদ হউক আর নাই হউক, তাহাতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—দ্রব্যসমূহের শুদ্ধ্যশুদ্ধির বিচার—ভোগোন্মুখ-মনেরই বিচার। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় পয়ঃপানকারি-ব্রহ্মচারীর ও ভক্তপ্রবর শ্রীধর প্রভৃতির চরিত্রে আমরা উক্ত বাক্যের সার্থকতা দেখিতে পাই।

এইরূপে পারমার্থিকব্রুব অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালীতে পরমার্থ বাধা প্রাপ্ত হয়। পরমার্থ প্রতিহত হইবার বিচার গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই বিষম সাম্প্রদায়িক-ভেদ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। পারমার্থিকব্রুবগণের আচরণ-দর্শনে 'পরমার্থ সত্যের বিচারও ভ্রমযুক্ত'—এইরূপ যে বিচার-প্রণালী, তাহা সুষ্ঠু নহে। কোনও বস্তু দ্রষ্টার খণ্ড-দর্শনে আসে না বলিয়াই যে তাহার কর্ত্তৃসত্তা-গত অধিষ্ঠানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, এরূপ নহে।

'তাতস্য কূপঃ'—এই ন্যায়ানুসারে 'আমার ঠাকুর-দাদা এই কূপের জল পান করিয়াছিলেন, সুতরাং পঙ্কোদ্ধার না করিয়া আমিও বংশানুক্রমে সেই জল পান করিতে থাকিব এবং ঐ জল পান করিয়া মৃত্যুর করাল কবলে আমাকে উৎসর্গ করিয়া মূর্খতায় একনিষ্ঠারূপ বীরত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করিব'—এরূপ বিচার বুদ্ধিমানের বিচার নহে। 'ধামা-চাপা বিড়ালে'র গল্প অনেকেই জানেন। 'কোনও এক গৃহস্থের বাড়ীতে বিড়ালের অত্যন্ত উৎপাত হইয়াছিল। উক্ত গৃহস্থের পুত্রের বিবাহবাসরে একটী বিড়াল বিশেষ উৎপাত আরম্ভ করিলে গৃহকর্ত্রী উহার উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটী ধামা দিয়া উহাকে চাপা দিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে সেই দেশের গৃহস্থমাত্রেই বিবাহবাসরে একটী করিয়া বিড়াল ধামা চাপা দিবার ব্যবস্থা আরম্ভ করিলেন; এমন কি, যাঁহার বাড়ীতে বিড়ালের অসদ্ভাব হইল, তিনি অন্য স্থান হইতে বিড়াল ধার করিয়া আনিয়া সেই বিধি-পালনে সচেষ্ট হইলেন।' জনপ্রিয়তা-লিপ্সা-বশে অনভিজ্ঞ সমাজের আচার বা দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের বিচার কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই গ্রহণ করা উচিত নহে।

মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণ—ভারবাহী, তাঁহারা সারগ্রাহী নহেন। ভারবাহিসূত্রে শাস্ত্রের মর্ম্ম অধিগমন করা যায় না। মনোধর্ম্মী অসৎকে 'সৎ' ও সৎকে 'অসৎ' বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বিচারোত্থ 'ভাল' ও 'মন্দ', উভয়ই সমান অর্থাৎ উভয়ই ভ্রমযুক্ত মনোধর্ম্ম ও কপটতা-মূলক। একটী গল্প শুনা যায়,—একদা একজন ব্যবসায়ী গুরুবব্রুব শিষ্যের বাড়ী গমন করিয়া আহার করেন। গুরুর ভোজন-সমাপ্তির পর শিষ্য গুরুকে একটী হরীতকী প্রদান করিবার জন্য উপস্থিত হইলে, গুরু হরীতকীটী ছাড়াইয়া দিবার জন্য শিষ্যকে আদেশ করেন। বুদ্ধিমান্ শিষ্য হরীতকীর উপরের অংশটী খোসা ভাবিয়া উহাকে ছাড়াইয়া গুরুদেবকে হরীতকীর অভ্যন্তর-ভাগ অর্থাৎ কেবল বীজাংশটী প্রদান করিলেন। গুরু মহাশয় হরীতকী ভক্ষণ হইতে বঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পরদিন পরম গুরুভক্ত উক্ত চতুর বা নির্ব্বোধ শিষ্যমহাশয় পূর্ব্বদিনের কার্য্যে অনুতপ্ত হইয়া গুরুদেবকে একটী বীজহীন এলাচ প্রদান করিতে আসিলে গুরুজী দেখিলেন,—শিষ্য-প্রবর এলাচের দানাগুলি বাদ দিয়া কেবল খোসা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন!' মনোধর্ম্মীর বিচারও এইরূপ; —মনোধর্ম্মী বাস্তববস্তুকে 'অবস্তু' বলিয়া পরিত্যাগ করেন, এবং অবস্তুকে 'বস্তু' বলিয়া গ্রহণ করেন।

'বিপ্রলিপ্সা' বলিয়া মানবের একপ্রকার দুর্ব্বলতা আছে; আমরা সেই জ্ঞান-কৃত পাপের জন্যও প্রায়শ্চিত্তার্হ। কোন্য ব্যক্তি ইচ্ছা করেন না যে, তিনি যে-যানে আরোহণ করিয়াছেন, তাহাতে চাপা পড়িয়া কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হউক। কিন্তু যদি কেহ তাঁহার গাড়ীর নীচে চাপা পড়ে, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ-বাক্য—

"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ।।"

—এই বাক্যটী মহামহোপাধ্যায় শ্রীরঘুনন্দন তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধার করিয়া ইহাকে 'বৈষ্ণবপর' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। অমেধ্য অপ্রাসাদের উপর যে নিষেধ-ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহা যদি বিষ্ণুপ্রসাদের উপরও গ্রহণ করি, তাহা হইলেই আমরা প্রায়শ্চিত্তার্হ। একটী বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের কাছে শুনিয়াছি যে, জনৈক ব্রাহ্মণতনয় মহা-প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতৃদেব 'চান্দ্রায়ণ-ব্রত' করাইয়াছিলেন! ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবার ফলে উক্ত ব্রাহ্মণকুমারের ক্রমশঃ কুক্কুট-ভোজনের স্পৃহা বলবতী হয় এবং তিনি রাজধানীর বিলাসভোজনাগারে গিয়া কুক্কুট-ভোজনে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। যখন কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ঐ ব্রাহ্মণতনয়ের ঐরূপ আচরণের কথা তাঁহার পিতৃদেবকে জানাইলেন, তখন বিচক্ষণ পিতাঠাকুর বলিয়া উঠিলেন,—'এখন আমার পুত্র ছেলে-মানুষ, সে বড় হইলে ঐ রোগটা কাটিয়া যাইবে!"

ভগবান্ যাহাকে সৌভাগ্য প্রদান করেন নাই, সে কখনও প্রসাদ গ্রহণের যোগ্য হইতে পারে না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৯ম বিঃ) আচার্য গোস্বামিপাদ শ্রীগোপাল ভট্টপ্রভু শ্রীপ্রহ্লাদ-পঞ্চরাত্রের বচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবদিগকে ভগবৎপ্রসাদ প্রদান করিবে এবং সদাচারী ও আভিজাত্যাভিমানী কর্ম্ম-জড়গণকে অনিবেদিত দ্রব্য, সামাজিক সম্মান ও অর্থাথি প্রদানপূর্ব্বক বঞ্চনা করিবে,—

"স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ।।"

অধোক্ষজ-বস্তুর সেবায় বিমুখ মায়া-বিমোহিত মনোধর্ম্মি-ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই বঞ্চিত হইতে অভিলাষ করেন। তাঁহারা—বঞ্চক ও বঞ্চিত। যাবতীয় অদৈবপর শাস্ত্রবিধি তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্যই জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা পারমার্থিক-শাস্ত্রের কথা আলোচনা করেন না; কারণ, আলোচনা করিলেই বিপদ্ উপস্থিত হইবে! কেহ কেহ ভোগ-বুদ্ধিতে ঐসকল আলোচনা করিয়াও কর্ম্মজড়ীকৃত-বুদ্ধিবশতঃ পারমার্থিক শাস্ত্রের সত্যবাণীতে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারেন না। 'কাজীর নিকট হিন্দুর পর্ব্ব জিজ্ঞাসা' যেরূপ, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের নিকট পারমার্থিকের বিচার-জিজ্ঞাসাও তদ্রূপ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ নারদপঞ্চরাত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

'লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।"

—যিনি ভক্তি ইচ্ছা করেন, তিনি লৌকিকী বা বৈদিকী যে-কোন ক্রিয়াই করিবেন, তাহা হরিসেবার অনুকূলরূপেই করা তাঁহার উচিত। হরিসেবার প্রতিকূল-কার্য্যে আগ্রহ অত্যন্ত কর্ম্মজড়তা-বিজড়িতবুদ্ধি ব্যক্তিগণেরই হইয়া থাকে। হরিজনকে অবজ্ঞা করিয়া কখনও হরিসেবা হয় না। হরিজনকে অসন্তুষ্ট করিয়া কখনও আমরা হরি-প্রসাদ লাভ করিতে পারি না। আবার, যাঁহারা মুখে নিজদিগকে 'হরিজন' বলেন, অথচ হরিজন ব্যতীত অপর ব্যক্তির আনুগত্য করেন, হরিসেবার প্রতিকূল আচরণগুলিকেই 'সদাচার' বলিয়া লোক-বঞ্চনা সাধনপূর্ব্বক 'আমাদের আচরণ অনুকরণ কর' প্রভৃতি বাক্যদ্বারা কোমলমতি লোকদিগকে বিপথগামী করেন, তাঁহাদের অনুগমন করিলে কখনও আমরা শ্রীহরির প্রসাদ লাভ করিতে পারিব না।

যাঁহারা—সত্য-সত্য হরিসেবক, অনুক্ষণ হরিসেবা-রত, তাঁহাদিগের প্রতি অসূয়া না করিয়া তাঁহাদিগের আনুগত্য করিলেই আমরা ভগবানের 'প্রসাদ' লাভ করিতে পারিব। হরিজনের প্রসাদেই হরির প্রসাদ-লাভ হয়; হরিজনের অপ্রসাদে জীবের কোনও

প্রকারেই মঙ্গল-লাভ হইতে পারে না; শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন ('গুর্ব্বষ্টকে' ৮ম শ্লোকে)—

"যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।"

ভক্তের মুখেই ভগবান্ ভোজন করেন; (ব্রহ্মপুরাণে)—

"নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তংদৃষ্টে ব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ।।"

—এইসকল পারমার্থিক বিচার স্থূলবুদ্ধি স্মার্ত্তের দ্রব্যশুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচারের মধ্যে আমরা আদৌ লক্ষ্য করি না। ভগবদুচ্ছিষ্ট মহা-প্রসাদ, ভগবদ্ভক্তের উচ্ছিষ্ট মহা-মহা-প্রসাদ অশুচি কুক্কুরাদি-কর্ত্তৃক পুনঃ উচ্ছিষ্টীকৃত হইলেও তাহা সমগ্র ভগবদ্বিমুখ অশুচিগ্রস্ত মানব বা জীব-জাতিকে পবিত্র করিতে সমর্থ; স্কন্দপুরাণে—

"কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্।।"

কুক্কুরের মুখ-স্পর্শে মহা-প্রসাদ অপবিত্র হইয়া যায় না;—পতিত পাবন বস্তু কখনও স্বয়ং নিজে পতিত হইয়া যান না। এ কথার সাক্ষ্য—শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অনাদিকাল হইতে এখনও প্রচারিত ও বিদ্যমান। শ্রীজগন্নাথ—জগতের সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং তাঁহার ভক্তগণ জগতের যে-স্থানেই অবস্থান করুন না কেন, জগন্নাথের প্রসাদই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার ভক্তের প্রদত্ত মহা-প্রসাদে বা ভক্তের উচ্ছিষ্ট মহা-মহা-প্রসাদে যাঁহারা প্রাকৃত-বুদ্ধি করেন এবং প্রাকৃতবুদ্ধি-নিবন্ধন অপ্রাকৃত-বস্তুকে দেশ, কাল ও পাত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত বা খণ্ডিত বলিয়া বিচার করেন, তাঁহারা স্বল্পপুণ্যবান্ অর্থাৎ পাপাত্মা।

কর্ম্মজড়মতি উৎকৃষ্ট শাব্দিক বা বৈয়াকরণ মন্ত্র বা শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির নিকট যে নৈবেদ্য উপস্থিত করিবার ছলনা প্রদর্শন করেন, ভগবান্ সেই বৈয়াকরণের মন্ত্রপূত প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁহার প্রদত্ত পাচিত আতপ-তণ্ডুলের ঘৃত সংযুক্ত অন্ন, নানাবিধ সুখাদ্য ব্যঞ্জন প্রভৃতি কিছুই ভগবানের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু অধোক্ষজসেবোন্মুখ ভিক্ষুকের যে-কোনরূপ অন্ন যে কোন-প্রকারেই প্রদত্ত হউক না কেন, শ্রীভগবান্ প্রীতিভরে তাহা গ্রহণ করেন।

পাছে আমাদের বিষয়কথা ও গ্রাম্যকথা থামিয়া যায়,—পাছে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভগবান্ শ্রীহরি আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হইয়া পড়ে, পাছে আত্মা পবিত্র হয়,—এই ভয়ে আমরা কেহ-কেহ অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবার পরিবর্ত্তে 'উইলসন হোটেলে'র অমেধ্য খাদ্যের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়াকেই 'গৌরবের বিষয়' বলিয়া মনে করি। আবার, কেহ-কেহ আস্তিকতার আবরণে নাস্তিকতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণ অবাধে

চালাইবার জন্য পূর্ব্বেই ভগবানকে মুখ, হস্ত, পদাদি ইন্দ্রিয়ের বিলাস প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হই!—তাঁহাকে 'নিরাকার' 'নির্ব্বিশেষ' কল্পনা করিয়া নিজেরাই 'সাকার' ও 'সবিশেষ' হইয়া একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা সেই ভগবানের ভোগ্যবস্তুগুলিকে ভোগ করিবার জন্য প্রধাবিত হই! 'পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ'—এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ হরিবিমুখ-মোহিনী মায়া-দেবী আমাদিগকে বুঝিতে দেন না। তাই আমরা ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত রূপকে অক্ষজ-জ্ঞানে মাপিতে গিয়া অধঃপতিত হইয়া পড়ি!

কেহ কেহ আবার—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং', (ঋক্-সং ১ম মণ্ডল, ২২শ সূক্ত, ২০শ ঋক্) 'ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে' (শ্বেঃ উঃ ৬৮) প্রভৃতি বেদমন্ত্র মুখে কপ্‌চাইয়াও শ্রীবিষ্ণুর পরমপদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না! পরন্তু, নির্ব্বিশেষবুদ্ধি লইয়া পঞ্চোপাসক বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদী হইয়া পড়ি এবং বিষ্ণুকেও অন্যান্য দেবতার সহিত 'সমান' বুদ্ধি করিয়া বিষ্ণুর অপ্রাসাদকেই 'প্রসাদ' বলিয়া মনে করি! কখনও বা অন্য দেবতার প্রসাদ আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের অধিকতর অনুকূল জানিয়া তাহাতেই আসক্ত হই! তখন শাস্ত্রের বাক্য আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না; (পদ্মপুরাণে)—

"বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে।।"

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।"

—সকল বুদ্ধিমান্ লোক মানবের প্রয়োজন-তত্ত্বে 'সর্ব্বোত্তমতা' ব'লে নির্ণয় ক'রেছেন যে চতুর্ব্বর্গকে—সেই চতুর্ব্বর্গকেও ধিক্কার ক'র্‌তে পারে—'কৃষ্ণপ্রেম' বা 'পঞ্চমপুরুষার্থ'। চা'র প্রকার পুরুষ-প্রয়োজনকেও ধিক্কার ক'র্ত্তে পারে—পঞ্চম-পুরুষার্থ—'কৃষ্ণপ্রেম'। সেই কৃষ্ণপ্রেমের প্রদাতা তুমি। তুমি 'কৃষ্ণ,—'কৃষ্ণ' হ'য়েও কৃষ্ণপ্রেমের প্রদাতা। তুমি 'কৃষ্ণচৈতন্য' নামধৃক্। তুমি গৌরাঙ্গ, তুমি মহাবদান্য। যে গৌরসুন্দর জগৎকে 'অমানী' 'মানদ' হ'বার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন—সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব কি প্রকারে রূপ-গোস্বামীর নিকট নিজ স্তুতি শ্রবণ ক'রলেন?

শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে শ্রীদামোদরস্বরূপ ব'লছেন,—

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।"

"হে দয়ার সাগর শ্রীচৈতন্য, আপনার কৃপার উদয়ে চিত্তখেদরূপ ধূলি হৃদয় হইতে অনায়াসে উড়িয়া যায়, সুতরাং হৃদয় নির্ম্মল হয়। তখন হৃদয়ে কৃষ্ণসেবা-জনিত পরমানন্দ প্রকাশ পায়। শাস্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যাভেদে বিবাদসমূহ চিত্তে উদিত হইয়া নানা বাদ-প্রতিবাদ করে। আপনার কৃপালাভ করিলেই লব্ধকৃপ হৃদয়টি ভগবদ্রসে উন্মত্ত হয়; আবার কৃষ্ণ-রস-প্রদা মত্ততাও আপনার কৃপাবলেই উদিত হয়; সুতরাং শাস্ত্রবিবাদ শান্তি লাভ করে। আপনার কৃপা নিরন্তর ভক্তিবিনোদন করিয়া থাকে অর্থাৎ জীবকুলকে স্ব-স্বভাবে প্রেরণ করাইয়া থাকে। আপনার কৃপা কৃষ্ণেতর-তৃষ্ণারহিত করাইয়া জীবকুলকে অপ্রাকৃত মাধুর্য্যরসের চরম সীমায় উপনীত করায়। হে দয়ানিধি শ্রীচৈতন্য, আপনার সেই অমন্দোদয়া দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।"

একথা যখন শ্রীস্বরূপদামোদর শ্রীচৈতন্যদেবকে ব'ল্‌ছেন, তখন ত' চৈতন্যদেব শুন্‌ছেন। তবে মূঢ়লোকসমূহকে 'বিনয়' শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনও কখনও এরূপ আচরণ প্রদর্শন ক'র্‌ছেন,—"আমাকে ঐরূপ ব'লতে নেই"—উহা কিন্তু 'কপটতা' শিক্ষা দেওয়ার জন্য নয়।

আমি একজন প্রধান মূর্খ। 'দাম্ভিক' ব'লে আমাকে কেহ সদুপদেশ দেন না। আমাকে যখন কেউ উপদেশ দেন না, তখন আমিই মহাপ্রভুকে জানালাম। তখন ভাব্‌লাম আমার ভারটা তাঁ'র উপরই ছেড়ে দেই—দেখি তিনি আমাকে কি ক'র্‌তে বলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তখন আমাকে ব'ল্লেন,—

"যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।।
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ।।"

এখানে স্বয়ং মহাপ্রভু 'হুকুম-ওয়ালা'—তাঁর' হুকুম—আমারই মত 'গুরুগিরি' কর।' —যা'দের দেখ তাঁ'দেরও এ কথা বল। চৈতন্যদেব ব'ল্‌ছেন,—তা'দিগকে "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ—একথা বল। লোকের বুদ্ধিহীনতা হ'তে তা'দিগকে পরিত্রাণ দাও।

'না বাধিবে বিষয়-তরঙ্গ,—পাবে মোর সঙ্গ'

একথা যে যে শুন্‌ছে,সে হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌ছে—আমি যে একটা পাষণ্ড—অধম, আমি "গুরু" হ'ব! আপনি ভগবান্, আপনি জগদ্‌গুরু; আপনি 'গুরু' হইতে পারেন। তা'র উত্তরে মহাপ্রভু ব'ল্‌ছেন,—

'ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি—পাবে মোর-সঙ্গ।।"

মহাপ্রভু আরও বল্‌লেন,—

"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।"

"হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবে দয়াবিশিষ্ট হও। হিংসা কর্‌বার জন্য "গুরুগিরি" কোরো না। নিজে বিষয়ে ডুবে যা'বার জন্য 'গুরুগিরি' কোরো না। কিন্তু যদি তুমি আমার নিষ্কপট ভৃত্য হ'তে পার, আমার শক্তি লাভ ক'রে থাক, তা'হলে তোমার ভয় নাই।"

আমার কোন ভয় নাই। আমার গুরুদেব, তাঁ'র গুরুদেবের নিকট এ'কথা শুনেছেন। তাই তিনি আমার ন্যায় পাষণ্ড ব্যক্তিকেও গ্রহণ ক'রেছেন এবং আমাকে ব'লেছেন,—

"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ"।

যা'রা গৌরসুন্দরের এ'কথা শুনে নাই, তা'রাই বল্‌ছে,—"কিরূপে আত্মস্তুতি শুন্‌ছে!" গুরু যখন শিষ্যকে একাদশ স্কন্ধ উপদেশ দিচ্ছেন, তখন কিরূপ 'পাষণ্ডতা'ই (!) না তাঁ'র কর্‌তে হচ্ছে! "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আচার্য্য কি কর্‌বেন? "আচার্য্যকে কখনও অবমাননা করিও না। তোমার সঙ্গে 'আচার্য্য' সমান-—এ'কথা কখনও মনে করিও না।"—কৃষ্ণের এই সকল বাণী—যা'তে জীব মঙ্গল লাভ কর্‌বে, সেই সকল কথা ব্যাখ্যা কর্‌বার আসন থেকে (আচার্য্যের আসন থেকে) কি তিনি পালাবেন? তাঁ'কে যে অধিকার তাঁ'র গুরুদেব দিয়েছেন—যদি তিনি তা' পালন না করেন, তা'হলে গুর্ব্ববজ্ঞা—নামাপরাধ-ফলে তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী—যদিও তখন আমার দাঁড়ে ছোলা ব্যাখ্যা হ'য়ে যায়। যখন গুরু শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান ক'র্‌ছেন, তখন কি তিনি ব'লে দেবেন না,—এই মন্ত্র-দ্বারা 'গুরুপূজা' কোরো? না ব'লে দেবেন,—গুরুকে জুতাকয়েক—ঘা কতক দিয়ে দেবে? "গুরুকে কখনও অসূয়া কর্‌তে হ'বে না, গুরু—সর্ব্বদেবময়"—এই সকল কথা ভাগবত পড়ান'র সময়ে কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'লে দেবেন না? "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ" শ্রীকৃষ্ণে যেমন পরা ভক্তি, গুরুদেবেও যাঁ'র তদ্রূপ নিষ্কপট পরা ভক্তি বিদ্যমান, তাঁর নিকটই গুহ্য বিষয়সমূহ প্রকাশিত হয়,—একথা কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'ল্‌বেন না? আদৌ গুরুপূজা" সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজা —কৃষ্ণেরই ন্যায় গুরুকে ভক্তি ক'র্‌বে—এইরূপে গুরুর উপাসনা কর্‌তে হয়—এ সকল কথা কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'লে না দিয়ে পালিয়ে যাবেন?

কোণে (angle) সম্পূর্ণতা—সমতলতা ১৮০° ডিগ্রী বা ৩৬০° ডিগ্রীর অভাবরূপ হেয়ত্ব আছে—কিন্তু সমতল ভূমিতে—৩৬০° ডিগ্রীতে সে হেয়ত্ব নাই। মুক্ত অবস্থায় যে, সে অবস্থাটা (হেয়ত্ব) থাকে না, তা' সাধারণ মূর্খ সম্প্রদায় বুঝে উঠ্‌তে পারে না।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।"

"নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহ-রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি—মহাপ্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।"

সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্ব্বে, কোনও অংশে কম মনে ক'র্ব্বে না। সাধু সকল—পণ্ডিত সকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা—যদি তা' না করেন, তবে শিষ্য-স্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন।

মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বল্লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হবে না। তা'র একটা প্রমাণ আছে শ্রুতিতে,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।

তিনিই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন, যাঁ'র গুরু ও ভগবানে অভিন্নবুদ্ধি আছে।

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।"
"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।।"

সচ্চিদানন্দ ভগবানের গায়ে হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তিনি যেন তাঁ'র পা' চুল্‌কুচ্ছেন। ভগবানের হাতও তাঁ'র দেহ-ই—ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা ক'র্‌ছেন। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমার গুরুদেবও সেইরূপ ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের সহিত একদেহ—'সেব্য-ভগবান্' আর 'সেবক-ভগবান্'—'বিষয়-ভগবান্' আর 'আশ্রয়-ভগবান্'। মুকুন্দ—সেব্য-ভগবান্—বিষয় ভগবান্, আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্। আমার গুরুদেবের তুল্য প্রিয় ভগবানের আর কেহ নাই। তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। আমাদের গুরুদেব এরূপ ব'লেছেন,—

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুর পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূণুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।।"

"হে মন, বেদ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মই হউক অথবা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মই হউক, তুমি তাহা কিছুই করিও না। তুমি ইহজগতে বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা বিস্তার কর এবং শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে নন্দ-নন্দন হইতে অভিন্ন এবং গুরুবরকে 'মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ' জানিয়া নিরন্তর স্মরণ কর।"

"গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরাময়ে
স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ।।"

গোষ্ঠে—নবদ্বীপে—বৈকুণ্ঠে—শ্বেতদ্বীপে—বৃন্দাবনে; নবদ্বীপবাসী—ব্রজবাসী গৌরকৃষ্ণ-সেবকগণকে অমর্য্যাদা কোরো না। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে অবজ্ঞা কোরো না।

যেমন, খেতে ব'সে যদি কপটতা ক'রে ভদ্রতার নামে অল্প খাই, তবে পেট ভ'র্‌বে না। কামারকে যদি ইস্পাদ ফাঁকি দেই—যদি কোন অঙ্ক বুঝে উঠ্‌তে না পেরে—মাষ্টারের নিকট "বুঝতে পারি নাই" ব'ল্‌তে লজ্জা বোধ করি, তা' হ'লে আমার কার্য্য-সিদ্ধি হ'বে না।

"নাচ্‌তে ব'সে ঘোম্‌টা টান্‌লে হ'বে না"। আমি গুরুর কার্য্য কর্‌ছি কিন্তু যদি আমার 'জয়' দিতে হ'বে না—এ'কথা প্রচার করি অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলি বেশী ক'রে আমার 'জয়' দাও', তা' হলে সেটা 'কপটতা' ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের গুরুদেব এরূপ কপটতা শিক্ষা দেন নাই—মহাপ্রভু এরূপ কপটতা শিক্ষা দেন নাই। অত্যন্ত সরলতার সহিত ভগবানের সেবা কোর্‌ব—ভগবানের বাক্য আমার গুরুদেব পর্যন্ত আছে—আমি সেই বাক্য সরলভাবে পালন কর্‌বো।

আমি মূর্খ-সম্প্রদায়ের—হিংসা-পরায়ণ-সম্প্রদায়ের কোনও কথা শুনে গুরুর অবজ্ঞা কোর্‌ব না। যখন শ্রীগৌরসুন্দর আমাকে আজ্ঞা ক'রেছেন—"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ"। আমর গুরুদেবের কাছে এই আজ্ঞা পৌছেছে—গুরুদেব আবার আমাকে সেই আজ্ঞা ব'লেছেন—আমি সেই আজ্ঞা পালন কর্‌তে কপটতা কোর্‌ব না—মূর্খ-সম্প্রদায়ের—কপট-সম্প্রদায়ের—ফল্গুত্যাগি-সম্প্রদায়ের আদর্শ নেবো না—আমি কপটতা শিখ্‌বো না। বিষয়িগণ—মৎসরগণ—ফল্গুত্যাগি-গণ—স্বার্থপরগণ বুঝ্‌তে পাবে না—ভগবানের ভক্তগণ কিরূপ জগতের সর্ব্ববিষয়ে পদাঘাত ক'রে ভগবানের আজ্ঞায় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে লবমাত্রও ভগবানের নিষ্কপট সেবা হ'তে বিচ্যুত হন না।

কপট-সম্প্রদায়—বৈষ্ণবব্রুব-সম্প্রদায় অন্তরে জড়প্রতিষ্ঠাকামি-সম্প্রদায় মনে ক'রছেন, গুরুর আসনে ব'সে শিষ্যগণের স্তুতি শুন্‌ছে কিরূপে! প্রত্যেক বৈষ্ণব প্রত্যেক বৈষ্ণবকে 'শ্রেষ্ঠ' জ্ঞান করেন। যখন হরিদাস ঠাকুর বিনয়-নম্র ভাব দেখাচ্ছেন, তখন মহাপ্রভু ব'ল্‌ছেন—"তুমি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—পৃথিবীর শিরোমণি, এসো এক সঙ্গে ভোজন করি। তিনি ঠাকুর হরিদাসের সচ্চিদানন্দ দেহ ক্রোড়ে বহন ক'র্‌ছেন। রূপানুগ সম্প্রদায়ে 'অমানী-মানদ' ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে র'য়েছে।

বৈষ্ণবগুরুর আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে যদি আমাকে 'দাম্ভিক' হ'তে হয়, 'পশু' হ'তে হয়—অনন্তকাল নরকে যেতে হয়—আমি অনন্তকালের তরে contract ক'রে

সেইরূপ নরকে যেতে চাই। আমি গুরু আজ্ঞা ছেড়ে অন্য হিংসাপরায়ণ লোকের কথা শুন্‌বো না—জগতের বাদবাকী কারও কথা শুন্‌বো না। জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতেবিদূরিত ক'রব—আমি এতদূর দাম্ভিক। আমার গুরুপাদপদ্ম-পরাগের একটু কণা ছড়িয়ে দিলে আপনাদের মত কোটী কোটী জীব উদ্ধার লাভ কর্‌বে। এমন কোনও পাণ্ডিত্য জগতে নাই—এমন কোনও সদ্‌বিচার চতুর্দ্দশ ভুবনে নাই—কোন মনুষ্য-দেবতায় নাই—যা নাকি আমার গুরুদেবের পাদপদ্মের ধূলির একটী কণা হ'তেও ভারি হ'তে পারে।

শ্রীরূপানুগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আমাদের এই জরদ্গবতুল্য দেহটাকে আমরা সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে আহুতি দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি। আমরা কোন প্রকার কর্ম্মবীরত্বের বা ধর্ম্ম-বীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে জন্মে শ্রীরূপপ্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্বস্ব। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই,—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্‌রূপপদাম্ভোজ ধূলিঃ স্যাং জন্ম জন্মনি।।"

"রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি।।"

☆ ☆ ☆ ☆

"শ্রীরূপমঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন।।
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্রজপ
সেই মোর ধরম করম।।"

## দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত